চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

মূল্য ৮০ টাকা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬
এলাহাবাদ :: পাটনা

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬
বিক্রয়কেন্দ্র :
১১১।১ বিধান সরণি
শাখা :
এলাহাবাদ—৩৪, নেতাজী সুভাষচন্দ্র মার্গ, এলাহাবাদ—৩
পাটনা—অশোক রাজপথ, পাটনা—৪

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

Bookland (P) Ltd.
Rs. ২৫·০০
৫০·৫০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে শ্রীজানকীনাথ বসু এম, এ. কর্তৃক
প্রকাশিত ও জে জি প্রেস হইতে শ্রীগীতা বসু এম এ কর্তৃক
৪২।১ সিকদার বাগান স্ট্রীট কলিকাতা—৪ হইতে মুদ্রিত

৩০৲

অতিরিক্ত জমা...... টাকা

পূজ্যপাদ

অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

করকমলেষু—

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অভিমত

শঙ্করীপ্রসাদ নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাবান কবি ও সমালোচক। কাব্য না লিখিলেও সে যে কবি তাহা তাহার "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রন্থখানি আমি ডক্টরেট থীসিস পরীক্ষকের মনোবৃত্তি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। জানি না কখন সেই পরীক্ষকের চোখ ও মন অনুরাগের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে; কখনই-বা নিজেকে নিঃসঙ্কোচে গ্রন্থকারের কাছে সঁপিয়া দিয়া তাহার পথপ্রদর্শনের অনুসরণে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কাব্যজগতে সঞ্চরণ করিতেছি। লেখার কি ভঙ্গী, কি ব্যঞ্জনা, স্বাধীন চিন্তার কি অকুণ্ঠ প্রকাশ। এরূপ সমালোচনা আমি কখনও পড়ি নাই।

[২।৯।৬০ তারিখে লিখিত একটি পত্রের অংশ]

তোমার "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" গ্রন্থ রুদ্ধ আবেগে অতিশয় আনন্দের সহিত পাঠ করিয়া এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আমার সুদীর্ঘকালের সাধনা তোমাকে দিয়া লীলাময় প্রভু সার্থক করিলেন। তোমার মত একজন গবেষক ও বিদগ্ধ পাঠক পাইলে যে-কোনো গ্রন্থকার তাঁহার শ্রম সফল মানিবেন। আমাদের দেশে গতানুগতিকতার প্রভাব এত বেশী যে, সত্য কথা শুনিবার ও মানিবার লোক বড় কম।...তোমার সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও রসনিপুণতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।...

তোমার ভাষা বা রচনাশৈলী বহু সাধনার ফল। তুমি জহুরী, রত্ন শুধু পরখ করিয়া বাহির কর নাই, তাহাকে কাটিয়া সুন্দর করিয়াছ, সুতীক্ষ্ণ করিয়াছ; আর সেই রত্ন সুতীক্ষ্ণ বাণের মতন পাঠককে বিদ্ধ করিতেছে।...তুমি স্বভাব কবি, তাই কাব্যরস উপলব্ধি করিয়াছ এবং অনবদ্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছ। বিদ্যাপতির

কাব্যরস যাঁহারা উপভোগ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে আমাদের সংস্করণের পরিপূরকরূপে তোমার গ্রন্থখানি পড়িতে হইবে।...

তুমি অনেক বিনয় ও সঙ্কোচ দেখাইয়া বারংবার বলিয়াছ যে, গ্রন্থখানি আকারে বড় বলিয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে। আমি কিন্তু পরীক্ষার কাগজ দেখার মতন জরুরী কাজ ফেলিয়াও তন্ন তন্ন ভাবে তোমার বই পড়িলাম। একটুও ক্লান্তি বা অবসাদ তো বোধ করিই নাই, বরং তোমার বিশ্লেষণী প্রতিভার নব নব পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইয়াছি।

তোমার অলঙ্কার-অধ্যায়ের পিছনে যে অসাধারণ শ্রম রহিয়াছে তাহা আমি যতটা বুঝিব অন্যে তাহা বুঝিবে না। কেননা প্রশংসার উদ্দেশ্যে নহে, অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তিদোষ দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমি তথাকথিত বড়ুর কৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছি।... তোমার অলঙ্কার বিশ্লেষণের গুণে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।...

[১০।৯।৬০ তারিখে লিখিত একটি পত্রের অংশ

ভূমিকা

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীকে বলা চলে 'শাশ্বত আধুনিক'। সাহিত্যের নিত্য রসের ইহা অক্ষয় উৎস। বৈষ্ণব সাহিত্যের রসবিচারের চেষ্টা কিছুদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছি। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির পদাবলীর বিস্তৃত বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছি জানি না, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য, কবিমন সম্পর্কে আমার কতকগুলি বক্তব্য আছে। সেগুলি মৌলিক এমন দাবী করি না। কোনো চিন্তাই এখন আর উদ্ভট না হইয়া মৌলিক হইতে পারে না, আমরা এমনই পুরাতন পৃথিবীর অধিবাসী। তবে বক্তব্যগুলিকে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি নিজস্বভাবে, এবং যাহা বলিয়াছি তাহার পক্ষে যথাসম্ভব প্রমাণও দিয়াছি।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমার মূল বক্তব্য—তিনি সর্বাঙ্গীণভাবে আধ্যাত্মিক কবি; আর বিদ্যাপতি হইলেন লৌকিক প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। আধ্যাত্মিক চণ্ডীদাসের কাব্যের রূপমূল্য অধিকন্তু উপস্থাপিত করিয়াছি, এবং ইন্দ্রিয়প্রেমের কবি বিদ্যাপতি কোথায় আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি-বিষয়ক আলোচনা দুইভাগে বিভক্ত—'শৈব কবি বিদ্যাপতি, এবং 'প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি।' 'শৈব কবি'—এইরূপ ভাগ করার কারণ, আমার মতে, বিদ্যাপতি শেষ পর্যন্ত ধর্মতঃ শৈব ছিলেন। বিদ্যাপতি যে শৈব ছিলেন, ইহা তাঁহার পদাবলীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছি। বিদ্যাপতির শিব-পদের বিস্তৃত পরিচয় ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। কবির শিব-পদাবলীর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে প্রায় হয় নাই।

'প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি'—এই অংশের আবার দুই ভাগ। প্রথম ভাগে প্রেম-পদাবলীর আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে কবির সৌন্দর্যসাধনার

পরিচয়। এই অংশে একটি বৃহৎ অধ্যায়ে কবির আলঙ্কারিক চিত্রসমূহের রস ও রূপের বিশ্লেষণ পাওয়া যাইবে। চিত্রগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যার যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার গুণগত উৎকর্ষ যাহাই হউক, বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া এই জাতীয় প্রচেষ্টা এই প্রথম। ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে উন্নততর আলোচনার পথ নির্মুক্ত হইলে কৃতার্থবোধ করিব।

বিদ্যাপতির নিসর্গমূলক কবিতার বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থে বিদ্যাপতিকে সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রেম-কবিতার ধারাপথে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদের ও আলঙ্কারিক চিত্রের যে বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা অন্ততঃ সংস্কৃত-প্রাকৃত খণ্ড প্রেম-কবিতার বিষয়গত রূপ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা সম্ভব হইবে, কারণ বিদ্যাপতি বিশেষভাবে ঐতিহ্যানুসারী, এবং তাঁহার অনেক কবিতা কার্যতঃ ভাষান্তর। তাই বিদ্যাপতির প্রেমকবিতা সম্বন্ধে আমার সাধারণ বক্তব্য এই জাতীয় সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রেম কবিতা সম্বন্ধেও অংশবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে।

বিদ্যাপতির কাব্যালোচনায় দেহরূপের ও দেহমিলনের পদগুলির খুঁটিনাটি আলোচনার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে; বিশেষতঃ পদগুলি যখন অধিকাংশক্ষেত্রে মোটেই 'শ্লীল' নহে। আমার উদ্দেশ্য বিদ্যাপতির পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করা। সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং তাহা করিয়াছি যথাসাধ্য নির্বিকার-ভাবে। কবির আংশিক পরিচয় কবিপরিচয় নহে।

একথা না বলিলেও চলে বিদ্যাপতি এবং বিদ্যাপতির আদর্শ সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিগণ দেহসম্বন্ধে আধুনিক সুসভ্য শুচিতার অনধিকারী ছিলেন।

গ্রন্থে বহু দোষ রহিয়া গেল। কয়েকটি জানা, অধিকাংশই অজানা। পাঠকগণ দোষ-অংশে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাধিত হইব।

জানা দোষের কয়েকটির উল্লেখ করিতে পারি, অন্ততঃ একটির। যথা গ্রন্থের কলেবর। ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার কোনো গ্রন্থের পাঠযোগ্যতা প্রায় থাকে না, অন্ততঃ এই আকারের গ্রন্থকে আকর্ষণীয় করিবার মত ক্ষমতা আমার নাই একথা সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি। আমার বিশেষ আশঙ্কা,

হয়ত এই গ্রন্থের অংশ-বিশেষ নীরস হইয়াছে, যে নীরসতাকে কোনো লেখার প্রধান দোষ বলিয়া আমি মনে করি। তবে আকার যে এরূপ হইল সে অগত্যা, কারণ এই গ্রন্থ কেবল সমালোচনাত্মক নয়, পরিচায়কও। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যের বস্তু-পরিচয় দিয়া তবে সমালোচনা করিয়াছি।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনার প্রেরণা আসিয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমার প্রথম গ্রন্থের পাঠকগণের অসন্তোষ হইতে। সে গ্রন্থে চণ্ডীদাসকে লইয়া কোনো পৃথক প্রবন্ধ ছিল না। আমার কোনো কৈফিয়তে তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই। চণ্ডীদাসকে লইয়া আলোচনা করিবার সময় তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ আক্ষেপকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে বারবার স্মরণ করিয়াছি।

বিদ্যাপতি বিষয়ক আলোচনায় আমার প্রধান কৃতজ্ঞতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের নিকট, যিনি কিন্তু সাক্ষাতে আমাকে কোনো সাহায্য করেন নাই। কিন্তু তিনি বিদ্যাপতি-পদাবলী এমনভাবে সম্পাদনা করিয়াছেন, যাহার জন্য বিদ্যাপতিকে লইয়া নূতনভাবে ভাবিতে ও লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের যৌথ সম্পাদনায় "বিদ্যাপতির পদাবলীর" নূতন সংস্করণ ১৩৬৯ সালে শ্রীশরৎকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি পদাবলীর এই নূতন সংস্করণ মূলতঃ ডঃ মজুমদারের কীর্তি—একথা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'মুখবন্ধে' জানাইয়াছেন। সংস্করণটি হাতে না পাইলে এই গ্রন্থের বিদ্যাপতি প্রবন্ধ লিখিত হইত কিনা সন্দেহ। এই সংস্করণের নিকট আমার ঋণ বহুভাবে বলিয়াও শেষ করা যায় না। 'পদ-নির্বাচন' ও পদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্তকে বিনীত ছাত্রের মত মানিয়া লইয়াছি এবং আলোচনার সময় পদের সংখ্যানির্দেশ করিয়াছি এই সংস্করণের পদসংখ্যা অনুযায়ী।

মিত্র-মজুমদার সংস্করণের নিকট আমার আর একটি অপরিশোধনীয় ঋণ আছে। গ্রন্থমধ্যে অতি বিস্তারিতভাবে বিদ্যাপতির পদ উদ্ধৃত করিয়াছি—আসলে বিদ্যাপতির পদ নয়—পদের অনুবাদ। মূল উদ্ধৃত না করিয়া অনুবাদ এত বেশী পরিমাণে উদ্ধৃত করিলাম কেন, তাহার কৈফিয়ত দেওয়া উচিত। অনুবাদের উপর নির্ভরশীল আলোচনার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমি

অচেতন। তথাপি অনুবাদ ব্যবহার করিবার কারণ, প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ, অনুবাদের সৌন্দর্য। এমন সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, সাহিত্যগুণান্বিত অনুবাদ সহজে দেখা যায় না। অনুবাদের সৌন্দর্যের প্রমাণ, বক্তব্যের দৃষ্টান্তরূপে মূলের পরিবর্তে অনুবাদ উদ্ধৃত করিতে আমার দ্বিধা হয় নাই। অনুবাদ আরো উদ্ধৃত করিয়াছি এই জন্য যে, আমার গ্রন্থ বিশেষজ্ঞের মত অবিশেষজ্ঞ রসিক পাঠকের জন্যও লিখিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা বিদ্যাপতির পদ মূলে বুঝিতেন না। আমি অবশ্য প্রতিক্ষেত্রে মূল ও অনুবাদ একসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। সেক্ষেত্রে এমনিতে বৃহৎ এই গ্রন্থ কোন্ আকার ধারণ করিত, ভাবিতেও ভয় হয়। এই প্রসঙ্গে জানানো যায়, বিদ্যাপতির মূল রচনার নমুনা কিছু কিছু দিই নাই এমন নয়।

মিত্র-মজুমদার সংস্করণের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি, তিনি একান্ত সহৃদয়তাবশে পদাবলীর অনুবাদ-অংশ উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার সহিত যোগাযোগ করাইয়া দিয়াছেন, ইহাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

আরো অনেকের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা আছে। প্রথমেই আসেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রজীবন হইতে তাঁহার সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টির অধীনে আছি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কার্যতঃ তাঁহার দৈনন্দিনের ঔৎসুক্য। শুধু তাঁহার নয়, তাঁহার স্ত্রী অধ্যাপিকা বিনীতা বন্দোপাধ্যায়েরও। উভয়ে আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। অধ্যাপক অনিলকুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক অশোক ঘোষ, ডঃ শীতাংশু মৈত্র এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা সময়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার জন্য অধ্যাপক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক ননী সেনের নিকট উপস্থিত হইয়াছি—তাঁহারা সাগ্রহে তাহাতে যোগ দিয়াছেন।

শ্রীসুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় এই গ্রন্থের জন্য কতখানি পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা তিনি জানেন এবং আমি জানি।

আত্মীয় ও ব্যক্তিগত বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই কোনো কিছুর প্রত্যাশা না রাখিয়া সাহায্য করিয়াছেন, ধন্যবাদ তাঁহাদের নিকট সামান্য কথা। তথাপি কয়েকজনের নাম আমি করিবই, যেমন, শ্রীমতী মায়া বসু, শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ সুনীলকুমার মিত্র, শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শঙ্কর)।

অগ্রজকল্প শ্রীজানকীনাথ বসু এই গ্রন্থের প্রকাশভার লইয়াছেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ইহার মূলে, আমি মনে করি, আমার প্রতি প্রীতি।

বাংলাদেশের সহৃদয় পাঠকের প্রশ্রয় পূর্বে পাইয়াছি, পুনশ্চ প্রার্থনা করিতেছি।

১, নস্কর পাড়া লেন,
কাসুন্দিয়া, হাওড়া
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৭

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা ... ৶০

পদাবলীর চণ্ডীদাস ... ৩-১১৬

১। ভাবসাধনার আদি কবি ... ৩-৭

চণ্ডীদাসের সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব—চণ্ডীদাস কয়জন?—৩-৪; বাঙালীর চণ্ডীদাস-চেতনা—৪; চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব না চৈতন্যোত্তর?—৫-৬; চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের যত নিকটে চৈতন্য-তত্ত্বের ততখানি দূরে—৫; চণ্ডীদাসের স্বাতন্ত্র্য—৬; বাঙালীর বৈষ্ণব-ভাবনা চৈতন্য-চণ্ডীদাসের যৌথ সৃষ্টি—৭

২। জীবনকথা ... ৮-১১

৩। জীবন ও কাব্য ... ১২-১৫

চণ্ডীদাস-রামী কাহিনী চণ্ডীদাসের প্রেমবেদের পুরাণকাহিনী—১২; জীবন-কথার প্রামাণিকতা—১২; ব্যক্তিজীবনের ঘটনার সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক—১২-১৩; জীবন-কাহিনী অনুযায়ী কবির ধর্মবোধ—১২-১৩; জীবনের সঙ্গে কাব্যে সম্পর্ক, বিভিন্ন রসপর্যায় ধরিয়া বিচার—১৪-১৫

৪। চণ্ডীদাসের ধর্ম-দর্শন ... ১৬-২২

বৈষ্ণব তত্ত্বাদর্শের সঙ্গে চণ্ডীদাসের ধর্মবোধের পার্থক্য, চণ্ডীদাসের মর্ত্য ও মানবপ্রীতি—১৬-১৭; চণ্ডীদাসের সহজ-তত্ত্ব, পদের দৃষ্টান্তসহ বিচার—১৭-২২

৫। বাংলা কবি-ভাষার জনক ... ২৩-৩৫

'বাঙালী কবিত্ব' কি?—২৩; কবিভাষা সৃষ্টিতে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও রামপ্রসাদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনামূলক বিচার—২৩-২৫; চণ্ডীদাসের ভাষার বৈশিষ্ট্য—২৫-২৮; ভাষাসৃষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা—২৬-২৭; চণ্ডীদাসের ভাষার দৃষ্টান্ত—২৮-২৯; চণ্ডীদাসরচিত প্রেমপ্রবাদের দৃষ্টান্ত, চণ্ডীদাস গণপ্রাণের কবি—৩০-৩৩; চণ্ডীদাসের পদে প্রকৃতি ও মানুষসহ গ্রাম-বাংলা—৩৪-৩৫

৬। রাধার অপূর্ব পূর্বরাগ ৩৬-৪৮

'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম' পদের বিশ্লেষণ—৩৬-৩৭ ; চণ্ডীদাস কর্তৃক পূর্বরাগের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন—৩৭ ; পূর্বোক্ত পদ সম্বন্ধে মোহিতলালের বিরূপ সমালোচনা ও সে বিষয়ে আলোচনা—৩৮-৪০ ; চণ্ডীদাস-পদাবলীতে শ্রীরাধার পূর্বরাগের বিশেষ মূল্য—৪০-১ ; 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার', 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা', 'কাহারে কহিব মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত' প্রভৃতি পদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা—৪১-৪৮

৭। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে দেহচেতনা ৪৯-৫৫

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বাঙালীর সাধারণ ধারণা ও চণ্ডীদাসের শুদ্ধিকরণ—৪৯ ; শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ চণ্ডীদাসের পক্ষে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপভোগের একমাত্র অবসর—৫০ ; বিভিন্ন পদ বা পদাংশের বিশ্লেষণ, তাহার কয়েকটির নাম,—'সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল', 'চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে', 'থির বিজুরী বরণ গোরী', 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী', 'সজনি, ও ধনি কে কহ বটে', 'মগন করিয়া গেল সে চলিয়া।'—৫১-৫৫

৮। দৌত্য—সমাজ-প্রতারণার কৌশল ৫৬-৬০

দৌত্যের বিভিন্ন কৌশল—৫৬ ; সমাজ-প্রতারণার কৌশলের প্রতি সামাজিকের আকর্ষণের কারণ—৫৭ ; 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' পদের বিশ্লেষণ—৫৮-৬০

৯। আনন্দঘন রসোদ্গার ৬১-৬৮

রসোদ্গারের লক্ষণ—৬১ ; রসোদ্গারে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস—৬২-৬৩ , পদ-বিশ্লেষণ,—'রজনী বিলাস কহয়ে রাই',—'আমি যাই যাই যাই বলি বলে তিন বোল',—'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি। নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥',—'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি। পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥'—৬৩-৬৮

১০। বাসকসজ্জিকা—বিপ্রলব্ধা—মানিনী—খণ্ডিতা—কলহান্তরিতা ৬৯-৭৩

পর্যায়গুলির ভাবগত ঐক্য—৬৯ ; চণ্ডীদাসের কাব্যে ইহাদের গৌণমূল্য—৬৯ ; চণ্ডীদাসের মানের প্রকৃতি—৭০ ; খণ্ডিতা—৭০ ; 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু' প্রভৃতি পদের বিশ্লেষণ—৭১-৭২ ; অতুলনীয় ব্যঙ্গ : বাহিরে রোষ ভিতরে অশ্রু—৭২-৭৩

১১। চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ ৭৪-৯৪

আক্ষেপানুরাগের বৈশিষ্ট্য—৭৪ ; এই পর্যায়ে সমাজ-প্রাধান্য, গোবিন্দদাসের

সঙ্গে এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, গোবিন্দদাসের 'রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি' পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের 'সত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে' পদের তুলনামূলক আলোচনা—৭৫-৭৬ ; আক্ষেপানুরাগের লক্ষণ—৭৭-৭। —আক্ষেপানুরাগের নানা ভাগ :—(ক) প্রিয়-সম্বোধনে : ('কি মোহিনী জান বন্ধু' পদের বিশ্লেষণ) ৭৮-৭৯ ; (খ) বংশী-নিন্দনে : বড়ু চণ্ডীদাসের বাঁশীর টান ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের বাঁশী—৭৯-৮০ ; (গ) স্বগত কথনে : প্রেমে ব্যক্তি-মুক্তির দাবী—৮১-৮২ ; (ঘ) সখী-সম্বোধনে : চণ্ডীদাসের মর্মসন্ধানে সখীসম্বোধনের পদগুলির মূল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সখীবিষয়ক ধারণার সঙ্গে চণ্ডীদাসের ধারণার পার্থক্য, চণ্ডীদাসে সখীরা রাধার 'সমপ্রাণা' সঙ্গিনী নন ; সখীর গৌণ ভূমিকা ('এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে' পদের ব্যাখ্যা)—৮২-৮৮ ; (ঙ) পিরীতি-গুঞ্জনে : চণ্ডীদাস কর্তৃক বিশেষার্থে 'পিরীতি' শব্দের ব্যবহার ; চণ্ডীদাসের সহজিয়া মন ; ভণিতায় চণ্ডীদাসের মনের রূপ—বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উদ্ধৃতি সহ—৮৯-৯৪

১২। আত্মনিবেদনের ভক্তিস্তোত্র ৯৫-১০১

বিদ্যাপতির 'প্রার্থনার' সঙ্গে চণ্ডীদাসের 'নিবেদনের' তুলনা—৯৫ ; বৈষ্ণব সাহিত্যে একমাত্র 'মহাজন'-কবি চণ্ডীদাস—৯৬ ; রাধার আত্মনিবেদন—৯৬-৯৮ ; কৃষ্ণের আত্মনিবেদন—৯৮-৯৯ ; আত্মনিবেদনের 'শান্ত রস', চণ্ডীদাসের মধুর রস ও শান্ত-শরণ—৯৯-১০০ ; রাধাকৃষ্ণ-লীলায় অপ্রাকৃতত্ব আনিবার পদ্ধতি—১০০-১

১৩। চণ্ডীদাসের কাব্যে রূপ-সাধনা ১০২-১১৩

রূপের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের সীমাবদ্ধতা (?)—১০২, চণ্ডীদাসে 'অবৈষ্ণব' নিরাকার-চেতনা—১০৩-৪ ; চণ্ডীদাসও বৈচিত্র্যময়, ঐ বৈচিত্র্যের প্রকৃতি—এক বর্ণের অনন্ত রূপের মহাশিল্পী—১০৪-৫ ; চণ্ডীদাসের অলঙ্কারে রূপজ্যোতির অভাব, প্রাণচ্ছন্দের প্রকাশ—১০৫-৭ ; সৌন্দর্যচঞ্চল পদাংশের দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা,—উপমায় বাংলা দেশ ও বাঙালী জীবন,—বৈষ্ণবকাব্যে বিরল ট্রাজিক শূন্যতাবোধ—১০৮-১১৩

১৪। কবিতাপস চণ্ডীদাস ১১৪-১১৬

পরম আধ্যাত্মিক কবি—১১৪ ; চৈতন্য-নামবিহীন শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচিত্রের রচয়িতা ১১৫ ; পূর্বরাগ হইতে ভাবোল্লাস পর্যন্ত পর্যায়ে আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ—১১৫ ; চণ্ডীদাসের রাধা ; রাধাকবি চণ্ডীদাস—১১৬ ; রবীন্দ্র-কণ্ঠে চণ্ডীদাসের আত্মকথা—১১৬

বিদ্যাপতি ১১৬-৬১৪

শৈব কবি বিদ্যাপতি ১১৯-১২১

১। মধ্যযুগের সার্বভৌম কবি বিদ্যাপতি ১১৯-২১

সৌন্দর্য ও প্রেম-মনস্তত্ত্বের কবিরূপে মধ্যযুগের ভাষাসাহিত্যের অদ্বিতীয় কবি —১১৯ ; লৌকিক প্রেমের কবিরূপেই বিদ্যাপতির স্থান নির্ধারিত হওয়া উচিত—১১৯-২১

২। বিদ্যাপতির ব্যাপক অভিজ্ঞতা, রচনায় তার প্রভাব ১২২-১২৯

বিদ্যাপতির জীবৎকাল—১২২ ; মিথিলার রাজপরিবারের সঙ্গে বংশগত ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ—১২৩-২৪ ; সমসাময়িক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি—১২৪ ; কবির ব্যক্তিজীবনের উত্থানপতন এবং ইতিহাসগত অভিজ্ঞতা—১২৫ ; ঐ অভিজ্ঞতার প্রভাব জীবনে ও কাব্যে—১২৫-২৬ ; কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকায় ইতিহাসবোধ—১২৭ ; ভাগবতের অনুলিপি (?)—১২৭ ; বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য ও রচনার বিষয়বৈচিত্র্য- ১২৭ ; মাতৃভাষাপ্রীতি—১২৮ ; পদাবলীর জন্য মৈথিল ভাষা ব্যবহারের কারণ ও ব্যবহারের গুরুত্ব—১২৮-২৯ ; বিপরীত চিন্তায় বিক্ষত কবি, তাঁহার দ্বিতীয় স্বভাব—১২৯

৩। প্রার্থনা-পদে বিদ্যাপতির মনের রূপ ১৩০-১৩৮

আত্মকথন পদের দৃষ্টান্ত ১৩০-৩১ ; কামাসক্তি, কাঞ্চনাসক্তি, ও শেষ জীবনের নিঃসঙ্গত্ব,—কবির এই তিন বিষয়ে স্বীকারোক্তি—১৩২ ; প্রার্থনাপদে জীবনের শূন্যতার রূপ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা—১৩৩-৩৪ ; প্রার্থনার কাতরোক্তি ও ভাবসম্মিলনের আনন্দবাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের সমস্যা—১৩৫-৩৮

প্রার্থনা-পদের কাব্যরসের বিচার : শিব ও মাধব উভয় দেবতার নিকট প্রার্থনা—১৩৪ ; প্রার্থনা-পদে ব্যাপক জীবনবোধ—আধ্যাত্মিক অশান্তির দীর্ঘশ্বাস—১৩৩-৩৫ ; বিদ্যাপতির শিশু-সত্তা—১৩৫ ; শিব-প্রার্থনা পদ হইতে এই বিষয়ক দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা—১৩৭-৩৮

৪। বিদ্যাপতির ধর্মবোধ, পদাবলীর সাক্ষ্যে ১৩৯-১৫৮

কবি শৈব, বৈষ্ণব, না পঞ্চোপাসক ?—১৩৯ ; যাঁহারা কবিকে বৈষ্ণব বলিতে চান তাঁহাদের যুক্তি—১৩৯ ; ঐ যুক্তির বিচার—১৪০-১৪৪ ; (যেমন—(ক) ভাগবত-প্রতিলিপির তথ্য—১৪০-৪১ ; (খ) রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনার গুরুত্ব—১৪১-৪২ ; (গ) মাধব-বিষয়ক প্রার্থনা-পদ—১৪৩-৪৪) ; আমাদের সিদ্ধান্ত—কবি শৈব ; ঐ সিদ্ধান্তের কারণ—প্রার্থনা-পদের সাক্ষ্য—১৪৪-৪৫ ; ভণিতার সাক্ষ্য—১৪৫-৪৬ ; পুনশ্চ প্রার্থনা-পদের সাক্ষ্য—১৪৬-৪৯ ; নিজ প্রদেশে কবির ধর্মমতবিষয়ে ধারণা—১৪৯-৫১ ; পদাবলী ছাড়াও কবির

অন্য শৈব-শাক্ত রচনা—১৪০ ; কবির শৈব উদারতা—১৫২ ; কালিদাসে ঐ উদারতার দৃষ্টান্ত—১৫২-৫৩ ; বিদ্যাপতির সমন্বয়ী মনোভাব—১৫৩ ; কবির অদ্বৈত-ভাবনা—১৫৩-৫৫ ; কবি যতখানি শৈব ততোধিক শাক্ত—১৫৫-৫৮

৫। ভারতবর্ষের শিব : কালিদাস—বিদ্যাপতি—রবীন্দ্রনাথ ১৫৯-৭২

ভারতবর্ষে শিব-বিষয়ক ধারণা, বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক—১৫৯-৬০ ; কালিদাসের শিব—১৬০-৬২ ; রবীন্দ্রনাথের শিব—১৬২-১৬৩ ; কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্য—১৬৩-৬৪ ; কবির বৈষ্ণবপদের সঙ্গে শিবপদের তুলনা—১৬৫-৬৭ ; কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের শিবভাবনার সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাবনার পুনশ্চ তুলনা—১৬৭-৬৯ ; শিবকেন্দ্রিক কল্পনার সর্বোত্তম আধার রবীন্দ্রনাথ—১৭০ ; বিদ্যাপতির গ্রামীণ শিব—১৭০ কালিদাসের ক্লাসিক শিবের মধ্যে লৌকিক শিবের অবস্থান—১৭০-৭২

৬। শিবপদের কাব্যমূল্য ১৭৩-৮৭

(ক) উমার পূর্বরাগ হইতে বিবাহ ১৭৩-৮৭

উমার পূর্বরাগ বর্ণনায় কুমারসম্ভব-ঐতিহ্যের অনুসরণ ও প্রত্যাখ্যান—১৭৩-৭৪ ; জননী ও প্রতিবেশিনীদের বেদনার ছবি—১৭৪-৭৬; কালিদাসে উমাসজ্জার বিবরণ—১৭৬ ; পিতামাতার বেদনার পিছনে সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব—১৭৭-৭৮ ; অনুরূপ ক্ষেত্রে কালিদাসের যুগের চিত্র—১৭৮ ; বিদ্যাপতি-অঙ্কিত প্রশান্ত মঙ্গলচিত্র—১৭৮-৭৯

(খ) পাগল শিবের জন্য উমার আত্মহারা ভালবাসা ১৭৯-৮৩

এই অংশে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব—১৭৯ ; লোক-ধারণায় শিব—১৮০ ; রবীন্দ্রনাথের পাগল শিব—১৮১-৮২ ; বিদ্যাপতির পদে উমার ভালবাসার রূপ : কুমারী প্রেমিকা, মানিনী বনিতা এবং সংসারের গৃহিণীরূপে—১৮২-৮৩

(গ) হরগৌরীর সংসারদৃশ্য ১৮৩-৮৫

দরিদ্র গৃহস্থালীর রূপ—১৮৩ ; সংসারে শিবের জ্বালা—১৮৪-৮৫, গৌরীর রক্তপিপাসা—১৮৫ ; শিবপদে বিদ্যাপতির মিশ্র পরিচয়—রাধাকৃষ্ণ পদে তিনি কবি—১৮৬-৮৭

প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি ১৮৯-৮৬

৭। প্রেমকবিতার ঐতিহ্য এবং বিদ্যাপতির আদর্শ কবিগণ ১৯১-২০৭

বিদ্যাপতিকে মূলতঃ লৌকিক প্রেমের কবি বলার কারণ—১৯১-৯২ ; সংস্কৃত ও প্রাকৃতে ক্ষুদ্র প্রেমকবিতা—১৯২-৯৩ ; বিদ্যাপতির উপর বিভিন্ন

কবি ও কাব্যের প্রভাব : হাল-অমরু, শৃঙ্গারশাস্ত্র, ভাগবত—১৯২-৯৬ ; বিদ্যাপতির মধ্যে লৌকিক হইতে আধ্যাত্মিক প্রেমের সর্ববিধ রূপ—১৯৭ ; বিদ্যাপতির উত্তমর্ণ : কালিদাস—১৯৭ ; জয়দেব—১৯৮ ; জয়দেবের কাব্যের স্বরূপ, চরিত্রাঙ্কনে অনৌচিত্য—১৯৮-২০০ ; বিদ্যাপতি ভর্তৃহরিজাতীয়—২০১ ; ভর্তৃহরির মনোরূপ—২০২-২০৩ ; বিদ্যাপতি ও অমরু—২০১ ; প্রেমধারণায় কালিদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলনা—২০১-০৩ ; রবীন্দ্রনাথের প্রেমাদর্শ—২০৩ ; সামঞ্জস্য আনয়নে বিদ্যাপতির অসামর্থ্য—২০৪ ; রাজসভার কবি—২০৪ ; শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর পাঠকের জন্য কবির রচনা—২০৪-০৫ ; সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের প্রতি কবির আনুগত্য, কামশাস্ত্রের নাগরক চরিত্র—২০৫-০৭

৮। বিদ্যাপতি-পদাবলীতে প্রেমের লৌকিক রূপ — ২০৮-২৮

(ক) সাধারণী নায়িকা ও লৌকিক পরকীয়া নায়িকার প্রেম — ২০৮-১৪

(খ) লৌকিক প্রেমে দূতীপ্রয়াস — ২১৪-২০

(গ) রাধা-কৃষ্ণের পার্থিব প্রেম — ২২০-২৮

৯। নাগরিক প্রেম : বয়ঃসন্ধি — ২২৯-৪৭

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-পদের বৈশিষ্ট্য—

বৈষ্ণবতত্ত্বে বয়ঃসন্ধি—২২৯-৩০ ; চৈতন্যোত্তর বয়ঃসন্ধি পদের গুণগত অপকর্ষ—২৩১ ; উজ্জ্বলনীলমণিতে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ—২৩০-৩১ ; বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বয়ঃসন্ধি—২৩১-৩২ ; বিদ্যাপতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য—২৩২ ; অধুনাপূর্ব ভারতীয় সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি-পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব—২৩৩ ; বয়ঃসন্ধি-পদে ভাবরস অপেক্ষা চিত্ররসের প্রাধান্য—২৩৩ ; বয়ঃসন্ধিতে কবিমানসের মুক্তিচেষ্টা—২৩৪-৩৫ ; এখানে রূপের রহস্য ও এখানকার মনের রূপ—২৩৫-৩৬ ;

(ক) বয়ঃসন্ধির প্রথম অবস্থা—শৈশবের প্রাধান্য — ২৩৬

(খ) দ্বিতীয় অবস্থা—শৈশব-যৌবনের তুল্যমূল্য সংগ্রাম — ২৩৬-৩৮

(গ) যৌবনের জয়ের সূচনা — ২৩৮-৪৩

(ঘ) যৌবনের জয় — ২৪৩-৪৬

বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতির প্রৌঢ় দৃষ্টিশক্তি—২৪৬, শরীর ও মনের ক্রমবিকাশে সামঞ্জস্য—আধুনিক সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি—২৪৬-৪৭

১০। অভিসারের বহুমুখী রূপ — ২৪৮-৭৯

(ক) অভিসারের সূচনা : মন্মথ-প্রণাম — ২৪৮-৫০

(খ) তিনশ্রেণীর অভিসার : অমরু-জাতীয়, জয়দেবীয়, গোবিন্দদাসীয় : সৌন্দর্যাভিসার ২৫০-৫৭
(গ) অভিসারের নানাপ্রকার মানসিক পর্যায় : লৌকিক অভিসার ২৫৭-৬২
(ঘ) অভিসারে দূতীর ভূমিকা ২৬২-৬৫
(ঙ) অভিসারে ঋতুবৈচিত্র্য : বর্ষাভিসারের শ্রেষ্ঠত্ব : অভিসারের আধ্যাত্মিক রূপ ২৬৫-৭৩
(চ) অভিসারের দুই শ্রেষ্ঠ কবি—বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ২৭৩-৭৯

১১। পূর্বরাগ হইতে মিলন ২৮০-৩০৯
মিলনের নানা স্তর ২৮০-৮৪
(১) নায়িকার প্রথম-মিলন-ভীতি ২৮৪-৮৮
(২) নায়িকার অনুরাগের সূচনা ২৮৮-৯৩
(৩) পূর্ণ মিলন :—
(ক) ক্ষুধার্ত নায়ক ও গতলজ্জা নায়িকার চিত্র ২৯৪-৯৭
(খ) অপরাজেয় লজ্জার ভূমিকা ২৯৭-৯৮
(গ) প্রেমের পরিবেশসৌন্দর্য এবং ভোগবৈচিত্র্য ২৯৮-৩০১
(ঘ) নূতন অনুভূতির সঞ্চার ৩০১-০২
(ঙ) কামনার চরম এবং কবির সাহস ৩০২-০৬
(চ) মিলনান্তে ৩০৬-০৯

১২। মান—প্রেমের জটিল ও কুটিল রূপ ৩১১-৪২
(ক) জয়দেবের কাব্যে মান ৩১১-১৩
(খ) মানে দূতীর ভূমিকা ৩১৩-১৭
(গ) মানিনী নায়িকার বক্তব্য : সমাজে পুরুষ-প্রাধান্যের রূপ ৩১৭-২৩
(ঘ) মানে নায়কের তৎপরতা ৩২৩-২৮
(ঙ) মানের প্রখরতম অবস্থা ৩২৮-২৯
(চ) মানবিরহিণী নায়িকার দেহসৌন্দর্য ৩২৯-৩০
(ছ) মানবিরহে নায়ক ও নায়িকার বিপর্যস্ত অবস্থা ৩৩০-৩২
(জ) মানভঙ্গ : মানভঙ্গের কারণ ৩৩২-৩৩৬
(ঝ) মানান্তে মিলন ৩৩৬-৩৪০

(এ) বিদ্যাপতির মান-পদের বৈশিষ্ট্য : চৈতন্যোত্তর মান-পদের সঙ্গে তুলনা ৩৪০-৪২

১৩। সৃষ্টির আগুনজ্বালা বিরহ ৩৪৩-৯৫
(১) যৌবনের বিরহগান ৩৪৩-৫৩
(২) সংস্কৃতকাব্যে বিরহের রূপ—বিদ্যাপতির ঋণ ৩৫৪-৬০
(৩) বিরহ পদের মূল তিন ভাগ : ৩৬০-৯৫
(ক) বিচ্ছেদ দেহ ও মনোবিকার ৩৬০-৭০
(খ) বিরহিণীর রূপচিত্র : আলঙ্কারিক বর্ণনা ৩৭০-৭৭
(গ) উদাত্ত আধ্যাত্মিক বিরহ ৩৭৭-৯৫

১৪। ভাবসম্মিলন : কেন্দ্রীয় অগ্নির আলিঙ্গন ৩৯৬-৪১১
বিদেশীয় মিস্টিক উক্তি-সঞ্চয়ন, সঞ্চয়নের কারণ—৩৯৬-৪০ ; নিত্যমিলনের বৈষ্ণবকাব্য বিরহে সমাপ্ত হয় কিভাবে?—৪০০ ; ভাবসম্মিলন নামের প্রাচীনত্ব—৪০০-০১ ; বিরহান্তে সাধারণ মিলন-চিত্র—৪০১-০২ ; মিলনের স্বপ্নভাবনা—৪০৩-৪০৪ ; যথার্থ ভাবমিলন—'নবপ্রেমে'র স্বরূপ—৪০৪-০৫ ; অভঙ্গ প্রেমের রূপ—৪০৫-৪০৮ ; রাধার দেহরূপে কৃষ্ণব্রতের রূপক—৪০৮-০৯ ; প্রেমের চিরন্তন প্রশ্ন—৪১০-১১

১৫। বিদ্যাপতির প্রকৃতিদৃষ্টি ৪১২-৪৮
(১) প্রাচীন ও আধুনিক প্রকৃতিদৃষ্টির রূপ ৪১২-১৪
(২) বিদ্যাপতির পদে বর্ষা : কালিদাসের ঋতুসংহারে বর্ষার রূপ ৪১৪-২১
(৩) বিদ্যাপতির পদে বসন্ত
(ক) বসন্তের জীবনকাহিনী ৪২১-২৭
(খ) বিরহে বসন্ত ৪২৭-৩৩
(গ) মিলনে বসন্ত ৪৩৩-৩৬
(ঘ) বসন্তবিষয়ে কালিদাস ও বিদ্যাপতি ৪৩৬-৪০
(ঙ) বিদ্যাপতির বসন্ত-কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের মহুয়ার বসন্ত-কবিতা ৪৪০-৪৬

১৬। রূপানুরাগ : রূপ হতে রূপে ৪৪৮-৫৭
(ক) শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগ ৪৪৮-৫১

রূপানুরাগ পদের ভাগ—

(১) আলঙ্কারিক [illegible] পদ — ৪৪৯
(২) দেহের সর্বাঙ্গের ক্রমিক বর্ণনামূলক পদ — ৪৪৯
(৩) বিস্রস্তবাস দেহের কিংবা অরক্ষিত দেহের সৌন্দর্য — ৪৪৯
(৪) স্নানমূলক পদ — ৪৪৯-৫১
(৫) স্বপ্নে রূপদর্শন — ৪৫১-৫২
(৬) চন্দ্রকেন্দ্রিক পদ — ৪৫২-৫৩
(৭) দেহে বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তুর আশ্চর্য জনক সমাবেশ — ৪৫৩-৫৪

(খ) শ্রীরাধার রূপানুরাগ — ৪৫৪-৫৭

১৭। বিদ্যাপতির সৌন্দর্য সাধনা : আলঙ্কারিক কবি — ৪৫৮-৫৪১

ভূমিকা — ৪৫৮-৬০

অলঙ্কারের সঙ্কলন—

মুখমণ্ডল — ৪৬১-৪৯০

মুখ—৪৬১-৬৬; নয়ন—৪৬৬-৭৩; ভ্রূ—৪৭৩-৭৪; কটাক্ষ—৪৭৪-৭৬ ; অশ্রু—৪৭৬-৭৮ ; অধরোষ্ঠ—৪৭৯-৮১, দন্ত ও হাসি—৪৮১-৮৪ ; নাকঃ কান : কপাল : চিবুক—৪৮৩-৮৫ ; সিন্দূর—৪৮৫ ; কেশ : বেণী—৮৬

মুখমণ্ডল ও কেশের যৌগিক অলঙ্কার—

(ক) মুখ এবং—৪৮৮-৮৯ মুখ-নয়ন—৪৮৯-৯০ ; মুখ-নয়ন-কাজল—৪৯০ মুখ-নয়ন-পক্ষ্ম—৪৯০ ; মুখ-নয়ন-অধর—৪৯১ ; মুখ-নয়ন-কেশ—৪৯১ ; মুখ-কেশ—৪৯১-৯৬ ; মুখ-অধর—৪৯৬ ; মুখ-হাসি—৪৯৬ ; মুখ-ঘর্ম : মুখ-শ্রমজল—৪৯৬-৯৭ ; মুখ-তিলক—৪৯৭ ; মুখ-বস্ত্র—৪৯৮

(খ) নয়ন-এবং—৪৯৮ ; নয়ন-কাজল-ভ্রূ : নয়ন-কাজল-কটাক্ষ : নয়ন-কাজল—৪৯৮-৫০২ ; নয়ন-অশ্রু—৫০২-৩ ; নয়ন-নাসা—৫০৩ ; নয়ন-হাসি—৫০৩ ; নয়ন ও প্রেম—৫০৩-৪

(গ) ভ্রূ এবং—৫০৪ ; ভ্রূ-কাজল : ভ্রূ-কাজল-কটাক্ষ : ভ্রূ-কটাক্ষ : ভ্রূ-অধর-দশন — ৫০৪-৬

(ঘ) অধর এবং — ৫০৬-৭

(ঙ) দশন এবং — ৫০৮

(চ) কেশ এবং — ৫০৮-১০

বক্ষদেশ — ৫১১-৪১

কুচ—৫১১-২১ ; হার—৫২১ ; গ্রীবা : কণ্ঠ : কণ্ঠস্বর : বচন : পঞ্জর—৫২১-২২ ; কর : কর-নখ : নখরেখা : করতল : করাঙ্গুলি—৫২২

বক্ষদেশের যৌগিক অলঙ্কার—

(ক) কুচ এবং—৫২৩ ; কুচ এবং মুখ—৫২৩ ; কুচ-কেশ : কুচ-কেশ-মুখ : কুচ-কেশ-অধর : কুচ-কেশ-হার—৫২৪-২৬ ; কুচ-হার—৫২৬-২৯ ; কুচ-অশ্রু : কুচ-কাজল-অশ্রু : কুচ-চন্দন—৫২৯-৩০ ; কুচ এবং বস্ত্র—৫৩০ ; কুচ-কর : কুচ-করতল—৫৩১-৩৩ ; কুচ-হাত-নখ—৫৩৩-৩৪ ; কুচ-হাত-আঙুল-বস্ত্র—৫৩৪-৩৫ ; কুচ-নখরেখা : কুচ-হার-নখরেখা : কুচ-নখরেখা-কাঁচুলী—৫৩৫-৩৮

(খ) হার এবং — ৫৩৮-৩৯

(গ) কর এবং — ৫৩৯

(ঘ) করতল এবং — ৫৩৯-৪০

(ঙ) নখ এবং — ৫৪১

নিম্নদেহ — ৫৪২-৪৮

সাধারণ বক্তব্য—৫৪৪ ; রোমাবলী—৫৪৪ ; কটি—৫৪৪ ; কিঙ্কিণী—৫৪৪ ; নীবি—৫৪৪-৪৬ ; নাভি : ত্রিবলী—৫৪৬ ; নিতম্ব—৫৪৬ ; উরু : জঙ্ঘা—৫৪৭ ; চরণ : আলতা—৫৪৭-৪৮ ; পদনখ—৫৪৮

নিম্নদেহের যৌগিক অলঙ্কার—

(ক) রোমাবলী এবং ৫৪৮-৫১

(খ) কটি এবং ৫৫১-৫২

(গ) ত্রিবলী এবং ৫৫২-৫৩

(ঘ) উরু এবং ৫৫৩

(ঙ) চরণ এবং ৫৫৩-৫৪

সমগ্র দেহের রূপ, ছন্দ, গতি এবং কার্য ৫৫৫-৬৫

সাধারণ বক্তব্য—৫৫৫ ; নায়ক-নায়িকার দেহরূপ—৫৫৬-৬০ ; নায়িকার গতিভঙ্গি—৫৬০-৬১ ; দেহের অনুভাব—৫৬১-৬২ ; আলিঙ্গন—৫৬২-৬৩ ; বিরহে দেহাবস্থা—৫৬৪-৬৫

অবশিষ্ট অলঙ্কার ৫৬৬-৯১

সাধারণ বক্তব্য ৫৬৬

প্রেমের রূপ ঃ মনোরূপাত্মক ও ভাবাত্মক অলঙ্কার—

প্রেম-রূপক ঃ আদর্শ প্রেম—৫৬৭-৬৮ ; অধম প্রেম— ৫৬৯-৭০ ; প্রেমের ক্রমবিকাশ—৫৭০ ; প্রেমের গভীর ও অনির্দেশ্য রূপ—৫৭০-৭১ ; প্রেমের অন্যান্য রূপ—৫৭১-৭২ ; প্রেমের বাসনা-রূপ—৫৭২-৭৩ ; প্রেমের বিহ্বল ও আত্মহারা রূপ—৫৭৫ ; মদন—৫৭৫-৭৬ ; নায়ক ঃ নায়িকা ঃ নায়ক-নায়িকার একত্র রূপ—৫৭৬-৭৮ ; মুগ্ধার প্রেমের রূপ—৫৭৮-৭৯ ; মিলনের রূপ—৫৭৯-৮০ ; ভোগোত্তর অবস্থা—৫৮০-৮১ ; মানাবস্থা—৫৮১ ; বিরহের ভাবরূপ—৫৮১—৮৩ ; বিরহ-কারণ—৫৮৩-৮৪ ; বিপরীত ভাগ্য ঃ ভ্রান্ত বুদ্ধি—৫৮৪-৮৬ ; কিছু বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার—৫৮৬ ; অস্থির অব্যবস্থিত মন ঃ মনের নৈরাশ্য—৫৮৬-৮৮ ; দেহবিকারের দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ—৫৮৮-৯০ ; নানা বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার-৫৯০-৯১।

প্রকৃতি বিষয়ক অলঙ্কার ৫৯১-৯৩

বিদ্যাপতির সৌন্দর্যসাধনার স্বরূপ : অলঙ্কারের ত্রুটি ৫৯৪-৯৭

১৮। শেষ কথা ৫৯৮-৬১৪

(ক) কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ ৫৯৮-৬৬২

(খ) সৌন্দর্যসাধনার পরিণাম ৬১২-৬১৪

পদাবলীর চণ্ডীদাস

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৮১...
পরিগ্রহণ সংখ্যা ১১১১৮
পরিগ্রহণের তারিখ ৮.৭.৭১

ভাব-সাধনার আদি কবি

যাঁহার কবি-ব্যক্তিত্ব সংশয়াচ্ছন্ন তিনিই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সর্ব-প্রধান কবি-ব্যক্তিত্ব। বাঙালীর ভাব-সাধনার সেই আদি কবিগুরুর নাম চণ্ডীদাস। তিনি কে, কয়জন, কোথায় তাঁহার জন্ম, কবে জন্ম,—চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অজস্র সমাধানহীন প্রশ্ন। জীবনে পিরীতির জ্বালায় জ্বলিয়া কবির রাধা বলিয়াছিলেন, "সই আমার মরণ ভাল।" চণ্ডীদাসের ভাগ্য!—তাঁহার কাছে মরণও ভাল নয়,—কেননা জীবনে আত্মলোপের সাধনা করিলেও তাঁহারই মৃত্যুসমাধির অন্ধকার হইতে নানাকণ্ঠে আত্ম-প্রতিষ্ঠার হাহাকার উঠিতেছে, দিব্যকর্ণে আমরা শুনিতেছি: আমি বড়ু চণ্ডীদাস, আমি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, আমি 'শুধু' চণ্ডীদাস, আমি আদি চণ্ডীদাস, আমি দীন, দীনহীন, দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস। কাহার তর্পণ করিব?

অথচ এমন স্মরণীয় তর্পণীয় কবি আর কে! আমাদের সমগ্র জাতি-চৈতন্যের মূলে তাঁহার আসন। তাঁহার স্পষ্ট ব্যক্তিপরিচয়কে মুছিবার পিছনে বোধ হয় কালের চক্রান্ত ছিল: স্পষ্টতার কঠিন মূর্তি ঘুচিয়া একটা ভাবতনু গড়িয়া উঠুক, ভাবুকের যে আরাধ্য দেবতা। কিন্তু কাল জব্দ ঐতিহাসিকের কাছে। গবেষণার পর গবেষণায় চণ্ডীদাসের রঙ্ ও রাঙ্ দুই-ই ঘুচিয়াছে—কাঠামোয় নাড়া দিতে গিয়া দেখা গেল জরাসন্ধের মত জোড়া মূর্তি—বেশ কয়েক জোড়! স্নেহের রচনায় জরা রাক্ষসীও ছিল শিল্পী—আর আমরা?

না কৌতুক নয়, সত্যই চণ্ডীদাস একজন হইতে পারেন না। অন্ততঃ দুইজন, কয়েকজনও সম্ভব। তাহার মধ্যে সুনিশ্চিত দুইজনের নাম,—চৈতন্য-পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য-পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। এই দুই-জনকে লইয়া ভাবুক বাঙালীর কোন উচ্ছ্বাস নাই। তৃতীয় একজন, রসের কবি-প্রদীপ যিনি, তিনি কে, এবং কোন সময়ের? কেহ বলিলেন, তিনি বড়ু চণ্ডীদাসই, কোনো এক অলৌকিক রূপান্তরে পদাবলীর কবি। বলা হইল, পদাবলীর চণ্ডীদাস পৃথক অস্তিত্বহীন,—অল্প 'বড়ু'র, বেশি 'দীনের' এবং কিছু অন্যের পদ-মৃত্তিকা মাজিয়া এই কবির দেহ-গঠন। অর্থাৎ 'বস্তু' কিছু

ভাবিলেন, 'দীন' কিছু উঠিলেন এবং অন্তে কিছু ছাড়িলেন, ফলে একজন নূতন কবি-'তিলোত্তমা'র আবির্ভাব হইল। এক্ষেত্রে অশিক্ষিত লিপিকর, ভাবোন্মত্ত কীর্তনীয়াগণ ধন্য, আপনার অজ্ঞাতে তাঁহারা মহৎ সৃষ্টির প্রজাপতি।

কোনো এক দিক দিয়া কিন্তু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ঐ কথাগুলিকে আমরা স্বীকার করি। চণ্ডীদাসের নামে বিপুল সংখ্যক পদ যুক্ত হইয়াছে—দীন চণ্ডীদাসের দুই সহস্রাধিক পদকে বাদ দিলেও থাকে সহস্রমত। পদগুলি এক মানের নয়, এক কবিরও নয় বোধ হয়। কিন্তু অধিকাংশই যেন এক কবির, এমন অস্পষ্ট বিশ্বাস জাগে। চণ্ডীদাসের বিষয়ে এই যে সাধারণী ধারণা, আমরা ইহার নাম দিব চণ্ডীদাস-চৈতন্য। বাঙালীর একটা চণ্ডীদাস-চৈতন্য আছে। যাঁহারা চণ্ডীদাসীয় সুরে ধরা পড়িয়াছেন বা ধরা দিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের রচনা চণ্ডীদাসের নামে যুক্ত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। যেখানে তাঁহারা পশ্চাৎপদ, সেখানে অগ্রসর কীর্তনীয়া। পদটি চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে—তবে হয় নাই কেন? কীর্তনীয়ারা ত্রুটি (!) সংশোধন করেন, ফলে অন্যের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যায়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যে ভক্তির মধুর আবদারের দাবি করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের পদ চিনিতে পারেন,—আমরা তাঁহার আন্তরিকতাকে নমস্কার করিয়া বলিব, তিনি চণ্ডীদাসের পদ নিশ্চয়ই চিনিতে পারিতেন—তবে সেগুলিকে এক কবির রচনা হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আসলে তিনি চিনিতে পারিতেন চণ্ডীদাসের ভাবানুপ্রাণিত পদ। চণ্ডীদাসগণ মূল চণ্ডীদাসে এমনই বিলীন হইয়াছিলেন যে, আসলে নকলে পার্থক্য করা অসম্ভব। এইখানেই আত্মদানের পরমতা, 'মাধব সোঙরিতে' 'সুন্দরী ভেলি মধাঈ'।

এত কবি যদি চণ্ডীদাস-সঙ্গমে উপস্থিত হন, এত প্রীতির আত্মোৎসর্গ যদি সেই পুণ্যতীর্থে ঘটে, তবে তীর্থকে অস্বীকার করি কিরূপে? চণ্ডীদাসহীন চণ্ডীদাস-চেতনা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই কোনো একজন কবি ছিলেন যিনি নিজের জীবনে ও সাধনায় বাঙালীকে তাহার পবিত্রতম কাব্যাধিকার দিয়াছেন। একজন চণ্ডীদাস ছিলেন, ছিলেনই, পদাবলীর চণ্ডীদাস,—তিনি অন্য কিছুর চণ্ডীদাস হইতে পারেন, নাও পারেন।

সকলেই লক্ষ্য করিবেন, আমরা দায়িত্ব এড়াইতেছি, এবং এমন কোনো কুশলী কৌশলে নয়, যাহাতে কৌশলটি অদৃশ্য থাকে। বাস্তবিক আমাদের

সাধ্য নাই চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান করি। তবে দায়িত্ব এড়াইতেছি কথাটি শোধন-সাপেক্ষ। পদাবলীর চণ্ডীদাসের সাহিত্যালোচনায় চণ্ডীদাসের পরি-সংখ্যান সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব আমরা বোধই করি না। আমার নিজের জন্য এই বিশ্বাস যথেষ্ট, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ অংশটুকু সাধারণভাবে একজন কবির রচনা।

এ কৈফিয়ৎ যথেষ্ট নয়। বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনার পক্ষেও প্রয়োজন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব কি চৈতন্যোত্তর নির্ধারণ করা। বাঙালীর ভাবজীবন গঠনের বৃহৎ প্রশ্নটি আছে। চণ্ডীদাস চৈতন্যোত্তর হইলে ঐ দায়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্যের উপর অর্পিত হয়। শ্রীচৈতন্য কি পদাবলীর চণ্ডীদাসকেও নির্মাণ করিয়াছিলেন?

একজন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সেকথা বলা চলিবে না, যিনি স্বয়ং চৈতন্যকে রসাবিষ্ট করিতেন। তিনি যদি বড়ু চণ্ডীদাস হন, তাঁহার কাব্য-কৃতিত্ব মানিয়াও বলিব, বাঙালীর মনোজীবনে তাঁহার দান সামান্যই। কিন্তু পদাবলীর পরিচিত চণ্ডীদাসের সর্বাঙ্গে এত বেশি পরিমাণে 'চৈতন্যদ্যুতি' যে, বলিতে লোভ হয়, তিনি চৈতন্যের পরেই আসিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদের সঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণির অংশবিশেষের গভীর ঐক্য আছে। যদি সেগুলি উজ্জ্বলনীলমণি-কার চণ্ডীদাস হইতে গ্রহণ না করেন (করিয়াছিলেন কি?) চণ্ডীদাসই তবে চৈতন্যপরিকরের নিকট ঋণী।

আবার সেই সঙ্গে বিপরীত একটি কথা অনুভবশালী পাঠকের মনে উঠিবে। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের যত নিকটে—চৈতন্য-তত্ত্বের ঠিক ততখানি দূরে। চৈতন্যে চণ্ডীদাস আলোকিত, অথচ চৈতন্য-শাস্ত্র তাঁহার নিকট কী ভাবে না অস্বীকৃত! চণ্ডীদাসকে কেন শেষ পর্যন্ত চৈতন্য-পূর্ব মনে হয়?—এই জন্যই। চৈতন্যের প্রেমকে জীবন-সর্বস্ব করিয়া তাঁহার প্রেমের দার্শনিক ভিত্তিকে এমন করিয়া অতিক্রম আর কেহ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পরিমণ্ডলীতে আবির্ভূত কোন কবির এতখানি বিজয়ী ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিতেও কুণ্ঠা হয়। এই ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ আছে কাব্যগঠনব্যাপারে চণ্ডীদাসের স্বাধীনাচারে, বৈষ্ণব অলঙ্কারশাসনের বাহিরে লোকজীবন হইতে উপমাদি সংগ্রহে। অন্য বৈষ্ণব কবি একদিকে মানবজীবন ও জীবন-পিপাসাকে চরম সম্মান দিয়াছেন,—মানবজীবনের বাসনাগভীরের

শিহরণ তাঁহাদের অধ্যায় কাব্যে বরণীয় হইয়াছে; তেমনি অপরদিকে, প্রাকৃত জীবন-পাত্রের উচ্ছলিত সুরাকে দিব্য সুরায় রূপান্তরিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাব্যের বন্ধনীবদ্ধ বৃন্দাবন রচনা করিতে হইয়াছিল। সেখানে 'মণিদীপদীপ্ত কুঞ্জ'; আরো ঠিকভাবে, নিত্য চন্দ্রোদ্ভাসিত কাননভূমি। জীবনরসের কাব্য যে কতখানি জীবনের মৃত্তিকাবর্জিত হইতে পারে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকাব্য তাহার দৃষ্টান্তস্থল। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা যেন সশরীরে স্বর্গ-গমনের কাহিনীতে বিশ্বাস করিয়াও শেষ পর্যন্ত মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করাইয়া তবে মর্ত্য-তনুতে স্বর্গবিভা আনিতে পারিয়াছেন। (বলা বাহুল্য এখানে আমি রাধাকৃষ্ণ-লীলার আপোষহীন অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা স্মরণ রাখিতেছি না)। কিন্তু চণ্ডীদাসের যদি কোন স্বর্গ থাকে, তবে তাহা পৃথিবীতেই আছে। সর্ববিধ মহাসত্ত্বের প্রকাশ সত্ত্বেও বলিতে লোভ হয়, চণ্ডীদাসের ছিল পবিত্র পার্থিবতা, অন্য কবির ক্ষেত্রে যাহা অপার্থিব পবিত্রতা।

এবং জগতে সবচেয়ে কঠিন বস্তু এই পার্থিবের পবিত্রতা। স্বতন্ত্র করা যত সহজ, উন্নীত করা তেমনই কঠিন। ইহা ঐশ্বরিক, অতএব ইহার আস্বাদনে 'স্বতন্ত্র' দৃষ্টি ও মন প্রয়োজন,—এইরূপ নিষেধ ও নির্দেশে প্রাকৃত-জনকে বশীভূত করার পরেই অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির অতীন্দ্রিয়তা স্বীকৃত হয়। চণ্ডীদাস কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সকলের অবাধ অধিকার। অচির জীবন তাঁহার কাব্যে জীবনের চিরন্তনতায় উন্নীত হইয়া মানুষের অধিকারলোককে বিস্তৃত করিয়াছে স্বর্গ-সীমারও প্রান্তে। মৃৎপীঠে স্থাপিত রাধিকার স্বর্ণদেহ ভেদ করিয়া একটি শুদ্ধ সত্ত্ববিভা তাঁহাকে একই সঙ্গে কাছের ও দূরের, ঘরের ও বাহিরের, বচনীয় ও অনির্বচনীয়ের করিয়া তুলিয়াছে।

এই স্বাতন্ত্র্যই চণ্ডীদাসের গৌরব। তিনি চৈতন্যপূর্ব কি চৈতন্যোত্তর—এ প্রশ্নের গুরুত্বকে বহুলাংশে মূল্যহীন করিয়াছে ঐ স্বাধীন কবিচিত্ততা। চৈতন্যোত্তর হইলেও ক্ষতি নাই,—চণ্ডীদাসের রাধা চণ্ডীদাসেরই। এই রাধাকে তিনি চৈতন্যের মধ্যে দেখিতে পারেন, কিংবা নিজের মধ্যে, কিন্তু সৃষ্টির গৌরব তাঁহারই থাকিয়া যায়। বাঙালীর বৈষ্ণব-ভাবনা, আমরা সাহসের সঙ্গে বলিব, চৈতন্য ও চণ্ডীদাসের যৌথ সৃষ্টি। তবে ভূমিকার ব্যাপকতার তারতম্য যথেষ্ট। আরো বলিতে পারি, গোবিন্দদাস যেমন চৈতন্য-দর্শনের

শ্রেষ্ঠ কবিতাস্রষ্টা, চণ্ডীদাস তেমনি চৈতন্য-অন্তর্লোকের অধিকারী রসকবি। উপলব্ধির কবি চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা, রাধাভাবিত চৈতন্যকে 'প্রমাণ্য' হইতে 'প্রামাণ্য' করিয়াছে।

চণ্ডীদাস কেন বাঙালীর রসজীবনের শ্রেষ্ঠ কবি-পুরুষ, ক্রমেই তাহা উদ্ঘাটিত হইবে। আমরা যখন তাঁহার পদের আধ্যাত্মিক ভাবভিত্তি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব, তাঁহার কাব্যের স্বাধীন উপমা-সন্ধান এবং বাঙালীর কবি-ভাষাসৃষ্টিতে তাঁহার ভূমিকার রূপ পর্যবেক্ষণ করিব, এবং পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কাব্যস্বরূপের বিবরণ দিব, তখন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমাদের দাবি দৃষ্টান্ত-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে। তাহার পূর্বে চণ্ডীদাসের জীবন-কাহিনী ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাই। চণ্ডীদাসের প্রচলিত জীবনকথা সমালোচকদের বহু কটাক্ষের লক্ষ্যবস্তু। অথচ আমাদের বিশ্বাস, ঐ জীবনকাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীদাস-সত্যের মূল সূত্রটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রেরণা পাইয়াছিলেন হৃদয়ে, কেবল মস্তিষ্কে নয়। ফলে তৎকৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ভাববিহ্বলতা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সত্যেও অধিকার ছিল তাঁহারই—তাঁহার প্রেমিক হৃদয়ের। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে দীনেশচন্দ্রের প্রেমমুগ্ধ প্রবেশ। এক পরম আবেগের ক্ষণে দীনেশচন্দ্র তাঁহার প্রেরণার স্পর্শমণির সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসের মহাজন পদদ্যুতিই ছিল এই সাহিত্য-সাধকের কৃচ্ছ্রগম্য পথের আলোকদিশা। তিনি সেকথা অকুণ্ঠ সরলতায় ঘোষণা করিয়াছেন। যাহা এক দৃষ্টিতে অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস, ভিন্ন চোখে সে বস্তুই আত্মনিবেদনের মন্ত্রগীতি। নিম্নে উদ্ধৃত অংশটিকে আমি দীনেশচন্দ্রের আত্মনিবেদনের গদ্য-স্তোত্র বলিতে চাই :

"পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্ডীদাসের কবিতা আমার আশৈশব সুখদুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ, হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতার আলোচনা সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারি না। আর একটি বক্তব্য এই,—চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে হয়ত আমি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য আলোচনা করিতাম না। আমি বহু বৎসর যাবৎ চণ্ডীদাসের গান গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় প্রায় একরূপ জপ করিয়া আসিয়াছি; এই মহাকবি আমার যতটা অন্তরঙ্গ, আমার দারা পুত্র স্বগণের কেহ তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ নহেন; তিনি আমাকে যতটা আনন্দ দিয়াছেন, পৃথিবীতে আর কেহ ততোধিক আনন্দ দেন নাই।"

চণ্ডীদাসের জীবনলোকে প্রবেশের কালে সশ্রদ্ধ চিত্তে আমি অগ্রপথিক দীনেশচন্দ্রকে অনুসরণ করিব।

প্রথমে দীনেশচন্দ্র-কৃত পদাবলী-সাহিত্যের মাঙ্গলিকী :—

"বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙালা কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়।...পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য।...

মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; পদাবলী-সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।"

অতঃপর দীনেশচন্দ্রের কণ্ঠে চণ্ডীদাস-ধন্য নান্নুর গ্রামের বন্দনা—

"কেন্দুবিল্ব ও বিল্ফী হইতে নান্নুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ।...প্রেমিকের নিকট নান্নুর পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবনতুল্য সুদৃশ্য। কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি লেখকের স্মৃতি-বহন করিতে সেই স্থানে কোন সমাধিস্তম্ভ নাই—আমাদের দেশের লোকে অনুরূপ স্মৃতিরক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল ...তাহারা ঘরে ঘরে মূর্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুণ্যশ্লোক মহাজনগণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত।"

নান্নুরের বাসুলী-মন্দিরের পূজারী কবির জীবন স্বল্পজ্ঞাত, কয়েকটি মহামুহূর্তের স্মৃতিসমষ্টি। সেই জীবনের নিবিড়তম অধ্যায়টিতে প্রবেশের মুখে দীনেশচন্দ্রের লেখনীর প্রথম বাক্যটি অপূর্ব পুলকে উচ্চকিত,—চণ্ডীদাসের প্রথম দর্শনের রসোল্লাসের মতই,—

"তিনি (চণ্ডীদাস) বাশুলী-মন্দিরে, স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্যের আলোকে এক সোনার পুতুলীকে দেখিয়াছিলেন, সেই শুভদৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল ; তিনি বাশুলীর নিকট ধন্না দিয়া পড়িয়াছিলেন, 'আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি আমি কত তপস্যার দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকি, আমার একি হইল, তোমা অপেক্ষা রামী আমার নিকট সত্য হইল ? আমি পতিত হইয়াছি, আমি কি করিব বলিয়া দাও।' বাশুলীর আদেশ তিনি শুনিলেন, 'তুমি ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া এই নারীকে ভালবাস, ইনি তোমার হৃদয়কে যে পবিত্রতা দিবেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু কিংবা আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব না।"

বলা বাহুল্য চণ্ডীদাস দেবীর আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ফল শুভ হইল না। দেবীর প্রত্যাদেশ শুনিবার উপযুক্ত তৃতীয় কর্ণ চণ্ডীদাসের থাকিতে পারে কিন্তু সমাজ সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। চণ্ডীদাস সমাজে পতিত হইলেন। অতঃপর বিবরণ এইরূপ :

"রজকিনীর কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। একদা

তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে বলিলেন, 'শুন শুন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সর্বনাশ॥ তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব-ভোজন করিঞা উঠাব কুলে॥' কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না; তবে ভ্রাতা নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে জাতিতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব বেশি প্রতিপত্তি ছিল; তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। প্রথমত গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসকে 'নীচ প্রেমে উন্মাদ' বলিয়া, এবং 'পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার, তাহারা সম্মতি নহে,' ইত্যাদিরূপ আপত্তি করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শেষে নকুল ঠাকুরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া 'তুমি একজন, বট মহাজন, সকল করিতে পার' ইত্যাদি আদরবাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ-সূচক পান দান করিলেন।

এদিকে একথা শুনিয়া রামী—'নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে।' এবং 'গৃহকে জাইঞা, পালঙ্ক পড়িয়া, শয়ন করিল তায়। কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায়॥' কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই, আবার উঠিয়া রামী বকুল-তলায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে।...ব্রাহ্মণগণ গণ্ডূষ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রজকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং যখন 'দ্বিজগণ ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে, ধোবিনী তখন ধায়।' এই বর্ণনা দ্বারা যে অনর্থোৎপাত সূচিত হইয়াছিল, তাহার শেষাঙ্ক আর জানা গেল না, ইহার পরে পুঁথির অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"*

* এই প্রসঙ্গে বিধাতার একটি রসকৌতুকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—যে পুথিটিতে চণ্ডীদাসের সমাজে পুনরুত্থানচেষ্টা ইত্যাদির বর্ণনা আছে, সেই পুথিটির শেষাংশ খণ্ডিত। চণ্ডীদাসের সহসা-জাগ্রত সমাজপ্রীতির কথা শুনিয়া যখন রামী সভাস্থলে লজ্জারহিতা উন্মাদিনীর মত আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেখানে বিধাতার (কীটরূপী ভগবান?) হস্তক্ষেপ সহসা যবনিকাপাত হইয়াছে। একটি অসাধারণ অসমাপ্তি। এমন কাব্যিক কাব্য-খণ্ডন সহজে দেখা যায় না। সেই সভাস্থলে রামী কি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন? অথবা অলৌকিক কিংবদন্তী

চণ্ডীদাসের জীবনের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে রামীর রচিত গীতিকার উপর নির্ভর করিয়া দীনেশচন্দ্রের বর্ণনা—

"চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের রাজসভায় গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন। সেই গানে বেগম মুগ্ধ হইয়া যান এবং চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিণী হন। নবাবের নিকটে তিনি নির্ভীকভাবে এই কথা স্বীকার করেন। নবাবের আদেশে চণ্ডীদাস হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া দারুণ কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।...রামী ও বেগম সকলেই কবির এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও রামীর দিকে দুইটি নিশ্চল চক্ষুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বেগম এই দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্ছিত হন। সেই মূর্ছা তাঁহার ভঙ্গ হইল না। বেগমের মৃত্যুতে রামীর হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি মৃতদেহের পদযুগল স্পর্শ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন।

এই অপূর্ব শোকগীতিকা হইতে ইহাও জানা যায় চণ্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রামী অনুযোগ দিয়া বলিতেছে, 'বাশুলী তোমায় শুধু আমাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেন?'...

রাণী বাদশাহকে বলিয়াছিলেন—'যাঁহার সুস্বরে ভুবন মুগ্ধ—যিনি প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ, তাঁহাকে সামান্য মানুষ মনে করিও না, তাঁহাকে বিনষ্ট করিলে পৃথিবীতে এ লজ্জা রাখিতে পারিবে না।' রামী বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি রাজ-পাটে বসিয়াও প্রেমের আস্বাদ পায় নাই তাহার জীবন নিরর্থক।'

চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য কিংবদন্তী,—তিনি কীর্তন করিবার কালে নাট্যশালা চাপা পড়িয়া নিহত হন। ঐ নাট্যশালা নাকি নবাবের কামানের গোলায় ধ্বংস হইয়াছিল।

অনুযায়ী, চণ্ডীদাসের পৃষ্ঠদেশ হইতে অকস্মাৎ নির্গত অতিরিক্ত দুই হস্তের অপার্থিব আলিঙ্গনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন? দুইটি ক্ষেত্রেই কাব্যের সর্বনাশ। পুথিখণ্ডন সেই সর্বনাশকে মহৎ কাব্যসিদ্ধিতে রূপান্তরিত করিয়াছে;—একদিকে পুরুষের কাপুরুষতা, অন্যদিকে সর্বস্বের বিনিময়ে অর্জিত সর্বস্ব-নাশের বিরুদ্ধে মর্মান্তিক সংগ্রামের মুহূর্তে পুথিখণ্ডন সেই সংগ্রামকে অনিশ্চিত পরিণতির ট্রাজিক সৌন্দর্য দিয়াছে। মানুষের কাব্যে ইহাই বিধাতার সংশোধন।

চণ্ডীদাস-রামীর জীবন-কাহিনীকে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম। কারণ আমাদের বিশ্বাস, এই কাহিনী চণ্ডীদাসের প্রেম-বেদের পুরাণ-কাহিনী। চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ চণ্ডীদাস-রামীর পশ্চাৎপটে চিত্রিত।

বিশুদ্ধ কাব্যালোচনার মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনকে আনয়নের যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন আসিতে পারে, বিশেষভাবে যখন ঐ জীবনকথা নিঃসংশয়ে প্রামাণ্য নয়। কিন্তু কবিজীবন যদি কাব্য-জীবনের পরিপূরক হয়, যদি কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও রসসংবেদনার উৎস কবিজীবনের উপর স্থাপিত থাকে, যদি কবির ব্যক্তিজীবন ও ভাবজীবন স্বরূপে একাকার হয়, অর্থাৎ যদি তাঁহার বাস্তব জীবনের অকপট অভিব্যক্তিই নামান্তরে উপস্থিত হয় কাব্যরূপে,—তবে অবশ্যই কবি-জীবনের কাহিনী সন্ধানের প্রয়োজন আছে। চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে সে বস্তুই ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবনই যে তাঁহার কাব্য, তিনি যে বঙ্গের ভাবসিদ্ধ মহাজন কবি, দীনেশচন্দ্র কথিত "অপূর্ব শোক গীতিকাটি" তাহার প্রমাণ। চণ্ডীদাসকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলার গৌরচন্দ্রিকা রামী-চণ্ডীদাসলীলা।

এইখানেই আমাদের সন্দেহ। জীবন এমন কাব্যানুরূপ! নিজের ভাবজীবনের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ করিয়া কি কবি নিজ ব্যক্তিজীবন গঠন করিয়াছিলেন—করা কি সম্ভব? সন্দেহ তাই। তবে কি যাহাদের হৃদয়-সম্পদকে চণ্ডীদাস উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, তাহারা, সেই বাঙালীরা, কৃতজ্ঞতায় একটি আদর্শ প্রেমমূর্তি রচনা করিয়া কবিকে উপহার দিয়াছে? চণ্ডীদাস-রামী কাহিনী কি বাঙালীর 'কবি'-কল্পনা?

অথচ চণ্ডীদাস-রামী-কথা অতি প্রাচীন কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু। একেবারে অর্বাচীন বলার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা চলে। তারা ধুবনী সম্বন্ধে (তারা ধুবনী বোধ হয় রামতারার অপভ্রংশ) চৈতন্য-সমকালীন নরহরির উক্তির সাক্ষ্যকে উড়ান যায় কিরূপে? চণ্ডীদাসের মৃত্যুবিষয়ে রামী-রচিত পদগুলি কতখানি পুরাতন বলা কঠিন হইলেও বেশ কিছু পুরাতন নিশ্চয়ই।

চণ্ডীদাস-রামী কথার সত্যতার উপরে আর একটি বিষয় নির্ভরশীল।

কবি কি সহজিয়া ছিলেন? কবিকে সহজিয়া ভাবার প্রয়োজন আছে, নচেৎ তাঁহার মনোবৈশিষ্ট্যের অনেকখানি অব্যাখ্যাত থাকে। পদাবলীর চণ্ডীদাসকে চৈতন্যোত্তর ধরিলে গৌড়ীয় রসাদর্শের সঙ্গে এই কবির ভাব-পার্থক্যের একমাত্র বোধ্য ব্যাখ্যা মিলিবে তাঁহার সহজিয়া স্বভাব ও মতের মধ্যে। তাহা ছাড়া চণ্ডীদাসের পদের অন্তর্জ্বালা, কুলজ্বালা, অতিরিক্ত সমাজ-সচেতনতার সমর্থন আছে কবির পূর্বকথিত ব্যক্তিজীবনে। চণ্ডীদাস-রামীর অবৈধ পরকীয়া প্রেম, চণ্ডীদাসের সমাজচ্যুতি, সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, তাহাতে রামীর আহত অভিমান, অসংবরণীয় আবেগে সভাস্থলে ছুটিয়া যাওয়া—এই সকল ঘটনা স্মরণ রাখিলে চণ্ডীদাসের পদের ভাবভূমিকা ব্যাখ্যার প্রভূত সুবিধা হয়।

চণ্ডীদাসের প্রাণেশ্বরী ও রসেশ্বরী রামীই যে রাধিকা—কোনো 'উজ্জ্বল নীলমণি'র উৎপাদন নয়—একথা এইবার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত। রামীর জীবনজ্বালা আর রাধার জীবনজ্বালা একই। শুধু রামীর কেন চণ্ডীদাসের নিজের প্রাণযন্ত্রণার সৃষ্টি-প্রতিমাও ঐ রাধিকা! চণ্ডীদাস আত্মবিভক্ত হইয়াছিলেন রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে। যেখানে তিনি ও রামী একসঙ্গে সামাজিক আঘাতের লক্ষ্য, সেখানে তাঁহার ও রামীর অশ্রুজল একত্রে রাধার অশ্রুজলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পুরুষদেহ এ পথে প্রতিবন্ধকতা করে নাই। পুরুষ হইয়াও তিনি কৃষ্ণ নন, তিনি রজকিনী সংশ্রবে সমাজ-পতিত এবং তাঁহার অবৈধ প্রেমে সমাজের মৌন সমর্থন ছিল না। তাঁহাকেও রামীর মতই সহিতে হইয়াছে। তবে সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য বলিয়া পুরুষের অশ্রুজল কাব্যিক প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বতঃই নারীকে অবলম্বন করিয়াছে। রাধার অনেক দুঃখকথা চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত কথা।

চণ্ডীদাসের জীবনের আর একটি রূপ ছিল যেখানে তিনি সত্যই পুরুষ, অনুচিত আচরণের পুরুষবীর, বিশেষ অধিকারভোগী সম্প্রদায়ের অংশ-ভোগী চরিত্র। পূর্বকথিত জীবনের দুইটি ঘটনা স্মরণ করিতে বলি,—চণ্ডীদাস রামীকে ছাড়িয়া জাতিতে উঠিতে চাহিয়াছেন, এবং তিনি বেগমের প্রতি আসক্তি বোধ করিয়াছিলেন। পুরুষের এই অব্যবস্থিতচিত্ততা নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ। দুই ক্ষেত্রেই রামীর সীমাহীন মর্মপীড়ন। চণ্ডীদাসের

মত ভাবময় কবির পক্ষে, স্বয়ং রামীর বেদনার কারণ হওয়া সত্ত্বেও, রামীর বেদনাকে অনুভব করা কঠিন ছিল না। বেগমের প্রতি ভালবাসা যদি জীবনের শেষাংশে হয়, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জীবন-খণ্ডনের জন্য যদি অধিক কাব্য রচনা কবির পক্ষে সম্ভব না হয়—তথাপি পুরুষ-স্বভাবের অস্থিরতা (নিজের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়াও) চণ্ডীদাস সহজেই অনুভব করিতে পারেন। সেই বোধশক্তি নিজের আচরণকে রামীর ক্ষুব্ধ দৃষ্টির আলোকে সমালোচনার লক্ষ্য করিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার ক্ষোভ-নিঃশ্বাসের প্রাধান্যের ইহা অন্যতম কারণ।

বাস্তবিক আক্ষেপানুরাগে চণ্ডীদাসের সাম্রাজ্যবিস্তারের মূল হেতু এইখানেই। আক্ষেপানুরাগে সমাজের প্রাধান্য, প্রেমসম্পদের বঞ্চনায় হাহাকার, নিজ লোভের জন্য আত্মধিক্কার—সমস্তই ঐ জীবনাগত। বেগমের প্রতি পরবর্তী অনুরক্তির পূর্বভাবনাও ইহার সঙ্গে ছিল, যাহা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতার চেতনায় নিশ্চয় কবিমনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

কেবল আক্ষেপানুরাগ কেন, অন্যান্য পর্যায়েও কবির ব্যক্তিজীবনের প্রভাব সুগভীর। শ্রীরাধার পূর্বরাগ বাদ রাখিতেছি, কারণ সেখানকার ধ্যানময়ী রাধা, কতখানি রামীর অধ্যাত্মপ্রকৃতি আর কতখানি চণ্ডীদাসের ধ্যানী স্বভাবের সৃষ্টি জানি না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ? অতিরিক্ত রসচাঞ্চল্যযুক্ত এই পর্যায়ের পদগুলি চণ্ডীদাসের কিনা সে সমস্যায় এখনি প্রবেশ করিতে চাই না, কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়বেদ্য পদগুলির নেপথ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ময়ীর দিকে ইঙ্গিত করি, যদি বলি, সেগুলি একটি 'সুবর্ণময়ী' নারীর বাস্তব দর্শন-পুলকের সৃষ্টি? আমরা তো জানি, চণ্ডীদাসের চোখের সামনে একটি বিনোদিনী নারী ছিল, সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্যের আলোকে যাহার সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রথম নয়ন বিনিময় দীনেশচন্দ্র মুগ্ধ চোখে দেখিয়াছিলেন।

রসোদ্গার, মান, খণ্ডিতা প্রভৃতি পর্যায়ে প্রেমের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার মধ্যে কবির প্রবেশ। ইহার সবটুকু অংশেই রামী আছে এমন বলার প্রয়োজন নাই,—বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবিরা কল্পনার অভিজ্ঞতার উপরও নির্ভর করেন। কিন্তু একথা মানিতেই হইবে চণ্ডীদাসের পরকীয়া প্রেমের বিশেষ

রূপটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল রাধার প্রেম-স্বভাবের উপর। যশোদাগারে রাধিকা তাঁহার তীব্রতম আনন্দক্ষণকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আশঙ্কাকম্পিত। মান খণ্ডিতাদি পর্যায়ে তিনি নায়ক চরিত্রের প্রতি সন্দেহে রোষক্ষুব্ধ। ঐ আনন্দের নশ্বরতার ভীতি ও সন্দেহের পীড়ন পরকীয়া প্রেমের স্বভাবধর্ম এবং চণ্ডীদাসের পরকীয়া প্রেম তাহার কিছু ব্যতিক্রম নয়।

চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্যতম লক্ষণীয় বস্তু—প্রকৃত বিরহপদের স্বল্পতা—যে চণ্ডীদাসে কান্না ছাড়া গান নাই!! সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে কারণটি বোঝা যায়। রাধাকে বিরহগ্রস্ত করিতে কৃষ্ণকে মথুরা-প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল না চণ্ডীদাসের জন্য। চণ্ডীদাস কোনো দিন রাধাকৃষ্ণের মিলনের উপর আস্থাই রাখিতে পারেন নাই। তাই কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়া বেশি শোক সৃষ্টি কবির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এখানেও চণ্ডীদাসের জীবন-তথ্য চণ্ডীদাসের কাব্য-সত্যের ব্যাখ্যারূপে উপস্থিত আছে। চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত পরকীয়া প্রেম তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি ক্ষণে করুণকাতর ও বিরহসন্ত্রস্ত।*

শেষ পর্যায় আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন কত গভীরভাবে চণ্ডীদাসের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত তাহা বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। রাধাকৃষ্ণের আত্মনিবেদন চণ্ডীদাসের জীবনদর্শনের গভীরতা হইতে উদ্ভূত। আত্মনিবেদন আলোচনার পূর্বে চণ্ডীদাসের জীবনদর্শনের পর্যালোচনা করা যাক।

* অপর পক্ষে বিদ্যাপতির মত কবির পদে মাথুরের কাহিনীগত বিরহের প্রতি নির্ভরতা কত বেশি। বিদ্যাপতি মিলন পদে সুখানুভূতির চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন, তাই সুখ-বঞ্চনার আর্তনাদ তাঁহার পদে সমান তীব্র; তাই কৃষ্ণের মথুরা-প্রস্থানে বঞ্চিত নারীর হাহাকার বিদ্যাপতির কবিতাবার ঐরূপ শোণিতময়।

চণ্ডীদাসের ধর্ম-দর্শন

চণ্ডীদাসের কাব্যের একটি মূল সুর মানবপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা কহিতে গিয়াও তাঁহার পক্ষে এই 'মানব'-কে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয় নাই। এইদিকে কবির কাব্যে আছে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অমৃত মন্ত্র : 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', অন্যদিকে দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ কখনই মৃত্তিকাস্পর্শ পরিহার করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, চৈতন্যোত্তর অন্যান্য বৈষ্ণব পদকারের সঙ্গে এইখানে চণ্ডীদাসের পার্থক্য—গোস্বামীকৃত অপ্রাকৃততত্ত্বকে অতিক্রম করার ব্যাপারে। আমি আলোচনার সুবিধার জন্য চণ্ডীদাসকে বর্তমানে চৈতন্যোত্তর ধরিতেছি।

বৈষ্ণব তত্ত্বাদর্শের সঙ্গে চণ্ডীদাসের যে ভাব-পার্থক্যের কথা নানাভাবে বলিয়া আসিয়াছি, এইবার তাহার মূল কারণে আসিয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অস্বীকারের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনচিত্ততাই যথেষ্ট নয়, কোনো এক সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থনও প্রয়োজন। চণ্ডীদাসের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস সেই শক্তি দিয়াছিল। চণ্ডীদাস সহজিয়া বৈষ্ণব ছিলেন। এবং সহজিয়া বৈষ্ণবতার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচুর প্রভেদ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও মানবমহিমা স্বীকৃত। মানবজীবন ধন্য, কেননা মানবের সাধন-নির্মল নয়ন রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা দেখিতে পারে। তাহার নিবেদিত হৃদয়ের সেবাধিকার বৃন্দাবন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তবু সে জীব তটস্থ ; পুরুষরূপে কৃষ্ণ, বা নারীরূপে সে রাধিকা নয়। সাধারণ মানুষ কর্তৃক নিজের উপর মঞ্জরী-সখীভাবের অতিরিক্ত রাধা বা কৃষ্ণভাবের আরোপ বৃন্দাবনী শাস্ত্রদৃষ্টিতে অননুমোদিত।

বৈষ্ণব আবার রাধাকে জীবাত্মাও বলিবে না। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি কখনো জীবাত্মা হয় ? রাধিকা সাধিকাও নন,—সাধনা মানুষের জন্য—স্বয়ং আনন্দ-প্রকৃতি আবার সাধনা করিবেন কি ? তবে রাধার আচরণের মধ্যে যে মানুষের সাধনার প্রতিফলন দেখা যায়—সে দেহ ধারণ করিয়া দেহলীলা আস্বাদনের জন্য। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ-লীলা ঈশ্বরলীলা, অপ্রাকৃত। বৈষ্ণব কবিরা যেখানে মানবজীবনের বাসনার দৃষ্টান্তে এই দিব্য প্রেমকে আঁকিয়াছেন,

সেখানেও তাঁহারা তত্ত্বকে শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া (তাহাদের ঘোষণায় অবিশ্বাস করিবার অধিকার আমাদের নাই) মানবভাষায় ঈশ্বর-ঈশ্বরীর অমানব প্রেমলীলাই কীর্তন করিয়াছেন।

কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবির ক্ষেত্রেই কি আমরা তাপসী রাধার সঙ্গে প্রেমাভিলাষী জীবাত্মার সাযুজ্যের কথা বিস্মৃত হইতে পারিব—অন্ততঃ চণ্ডীদাসের মত কবির কাব্যের ক্ষেত্রে? চণ্ডীদাসের রাধা জীবাত্মাই—পরমাত্মাও বটেন। জীবাত্মা বলিতে স্খলন-চঞ্চল জীবযাত্রীকে বুঝিতেছি না;—এ জীব ঈশ্বরময়, অনন্তনিষ্ঠ, গৃহত্যাগী, অন্তরে ও বাহিরে আলোকিত। প্রিয়তম বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিবার অধিকার এই জীব-ভক্তের আছে; এমন সমুচ্চ ভাবাত্মতায় তাহার অবস্থান যে, সেক্ষেত্রে ক্ষণমাত্র অদর্শনও 'কোটি বরষে'র অগ্নিদহন। চণ্ডীদাসের রাধা শুদ্ধ সত্ত্বের বিকাশ, কিন্তু তাঁহার আত্মার শিখা মৃৎভাণ্ডে জ্বলিয়াছে।

দেহ হইতে দেহোত্তরতায় উন্নয়ন চণ্ডীদাসের কাব্যে তাই এত স্বাভাবিক। চণ্ডীদাসের ধর্মমতের রূপই এই। কাব্যরচনার সময় চণ্ডীদাস কোন নির্দিষ্ট ধর্মদাসত্ব করেন নাই—এরূপ বিশ্বাসেই আমরা এতক্ষণ উৎসাহ-সঞ্চার করিয়াছি। এখন একটি সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিব,—গোবিন্দদাসের মত চণ্ডীদাসেও তাঁহার নিজস্ব ধর্মমতের প্রতিফলন; তবে এমন অসাধারণ নৈপুণ্যে যে, কাব্যের পশ্চাৎবর্তী তত্ত্বটি সাধারণ পাঠকের নিকট অগোচর থাকে, অথবা তত্ত্বরূপটি জীবনরূপের এমনই সন্নিকট যে, তাহা তত্ত্ব না জীবন, এরূপ বিভ্রম পর্যন্ত ওঠে না।

তত্ত্বের নামটিও এক্ষেত্রে অনুকূল,—'সহজ-তত্ত্ব'। সহজিয়া চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস যে সহজিয়া—তাঁহার সহজিয়া পদগুলি পড়িয়া আমি সে সিদ্ধান্তে আসি নাই। আমার এখনো বিশ্বাস, সহজিয়া পদের অধিকাংশই পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচনা নয়। সহজিয়া পদগুলির মত চণ্ডীদাস-রামীর সহজিয়া কাহিনীকেও যদি বাতিল করি, তথাপি চণ্ডীদাসকৃত রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর আভ্যন্তর সাক্ষ্যকে তো অবিশ্বাস করিতে পারি না। চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর মধ্যেই চণ্ডীদাসের সহজিয়াত্ব আছে। এবং তাহা আছে বলিয়াই আমাদের নিকট চণ্ডীদাসের সহজিয়া জীবনতথ্য বাস্তব সত্য।

(সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনাতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ন্যায় মানবমহিমা স্বীকৃত, কিন্তু, ব্যাপকতর, গভীরতর অর্থে। এখানে মানুষই সবকিছু—'সবার উপরে মানুষ সত্য।') মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরলীলা। এখানে নিজের উপর পুরুষ কৃষ্ণ-ভাব এবং নারী নিজের উপর রাধা-ভাব আরোপ করে।)

এই আরোপের অবস্থায় নরনারীর 'শ্রীরূপলীলা'; নরনারী কৃষ্ণ-রাধা হইবার সাধনায় কৃষ্ণ-রাধা সাজিয়াছে। এই অবস্থায় নরনারীর যে মিলনানন্দ তাহা গুপ্তচন্দ্রপুরস্থিত রাধাকৃষ্ণলীলার রসপুষ্ট। এই 'আরোপ-সাধনা' যদি চিরকাল আরোপেই সীমাবদ্ধ থাকিত তবে নরনারীর জীবনমহিমা চূড়ান্ত স্বীকৃতি পাইত না। ঐ আরোপ-সাধনার একটি সিদ্ধির অবস্থা আছে, যখন নরনারী আর ভাবারোপে কৃষ্ণ-রাধা নয়, সত্যই কৃষ্ণ ও রাধা হইয়া যায়—তখন চরম সুখাবস্থা,—'সমরস সহজ' অবস্থা। তখন 'শ্রীরূপলীলা'র 'স্বরূপলীলা'য় পরিণতি, সে-স্বরূপলীলা রাধাকৃষ্ণেরই একান্ত।

এই সহজিয়া সাধনার অঙ্গরূপে রহিয়াছে পিরীতি তত্ত্বের বন্দনা ও কিশোরী ভজনা। চণ্ডীদাসের পদে কত অজস্রবার পিরীতিতত্ত্ব ও কিশোরী-তত্ত্ব বিশ্লেষিত ও বন্দিত হইয়াছে। নরনারীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অবস্থায় উভয়ের মিলনে সৃষ্ট হয় 'পূর্ণ সামরস্যজনিত অসীম অনন্ত আনন্দানুভূতি'। সহজিয়া বৈষ্ণবের নিকট এই অবস্থার নাম 'প্রেম'। তন্ত্র ইহাকে বলে 'সামরস্য সুখ', বৌদ্ধ বলে 'মহাসুখ', অন্য বৈষ্ণব বলে 'মহাভাবস্বরূপ'। সহজিয়া বৈষ্ণবের এই প্রেমেরই প্রতিশব্দ 'পিরীতি'। আর কিশোরী অন্য কেহ নন—স্বয়ং রাধিকা। সাধারণ বৈষ্ণব রাধাকে বয়সের হিসাবে কিশোরী বলে, সহজিয়ার নিকট কিশোরীর সঙ্গে ভজন শব্দটি যুক্ত আছে। সহজিয়াগণ রাধা-কিশোরীর ভাবারোপে নিজ কিশোরীর সেবা করিয়া থাকে।*

চণ্ডীদাসের সহজিয়া মতের কথা স্মরণ রাখিলে চণ্ডীদাসের প্রেমস্বরূপ সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব হইবে। চণ্ডীদাস যে খাঁটি বৈষ্ণব নন, সহজিয়া বৈষ্ণব, রামী-স্তুতিই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পরিচিত দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

---

* ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে এই তত্ত্ব অতীব চমৎকারভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি। * * *
রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

*

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্বত
তুমি সে নয়নের তারা॥

বুঝিতে বিলম্ব হয় না, রজকিনী রামী সম্বন্ধে উচ্চ উচ্চ সম্বোধনগুলি নিছক প্রেমোচ্ছ্বাস নয়, ইহার পিছনে আছে চণ্ডীদাসের ধর্মদর্শন। প্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ প্রাধান্য স্বীকারকারী এ সেই ভারতীয় শক্তিবাদ। তবে সহজিয়াগণ এই শক্তির রসরূপকেই স্বীকার করেন। তাই একদিকে চণ্ডীদাসের মতই চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাধার মহিমার নিকট সর্বাত্মক নতি স্বীকার করিয়াছেন (দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন অংশে দিব), অন্যদিকে চণ্ডীদাস নিজ নায়িকা-প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনায় "রসের অধিকারী", "রসের কল্পতরু", "রসের কূপ," "রাধিকা-স্বরূপ"—প্রভৃতি কথাগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কবিভাষায় পিরীতির মতই 'রস' শব্দটির অজস্র ব্যবহার। স্মরণ রাখিতে হইবে, রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে ব্যবহৃত হইলেও সাধারণ বৈষ্ণবের নিকট রস শব্দের যে লৌকিক বা 'অলৌকিক' অর্থ, চণ্ডীদাসের নিকট তদতিরিক্ত আরো একটি অর্থ ছিল। সহজিয়াগণের পারিভাষিক 'রস' চণ্ডীদাসের লেখনীমুখে অবলীলায় আসিয়া পড়িত।

রজকিনী প্রেম 'কামগন্ধহীন' এবং 'নিকষিত হেম',—চণ্ডীদাসের এই দাবির অর্থ সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই ভুল বুঝি। সহজিয়া চণ্ডীদাসের প্রেম

দেহ-সম্পর্কহীন হইতে পারে না। তবে কামগন্ধহীন হয় কিরূপে? ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উক্তিতে প্রকৃত ব্যাখ্যা পাইতেছি—"সহজিয়াদের প্রথম সাধনা তাই হইল শুধু বিশুদ্ধির সাধনা। সোনাকে যেমন পোড়াইয়া পোড়াইয়া নিখাদ করিয়া তুলিতে হয়, তেমনি মর্ত্ত্যের প্রাকৃত দেহমনকেও পোড়াইয়া পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধতম দেহমনকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম তাহা তখন হইয়া ওঠে 'নিকষিত হেম'।" সুতরাং এখানেও প্রেমে দেহমিলন, তবে রূপান্তরিত দেহে।

চণ্ডীদাসের কাব্য বুঝিতে তাঁহার ধর্মমতের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া সে বিষয়ে কিছু বলিলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই কবির ধর্ম-মতমূলক পদগুলির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। ঐ পদগুলি তাঁহার মানস-প্রকৃতি বুঝিতে আমাদের সাহায্য করে। তত্ত্বমূলক পদগুলি আবার একেবারে কাব্যরসহীন নয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সহজিয়া পদের সবগুলিকে চণ্ডীদাসের মনে করা শক্ত। কিন্তু চণ্ডীদাস যদি সহজিয়া হন, কিছু অবশ্যই চণ্ডীদাসের, এবং শুধু সন্দেহের অজুহাতে শ্রেষ্ঠ কয়েকটি পদ বা পদাংশের গৌরব হইতে চণ্ডীদাসকে বঞ্চিত করি কেন? একথা সত্য, এই সকল পদের রসাস্বাদের অধিকারী রসিকেরাই এবং চণ্ডীদাসও একটি অনুপম গঞ্জনায় অরসিকের শৃঙ্গাঘাত নিবারণ করিয়াছেন:

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিকে গোটিক হয়॥

কিন্তু জগতে মানবদেহ ধারণ করিয়া নিশ্ছিদ্র অরসিক কেহ নাই; তাই নিম্নলিখিত ভাবগূঢ় আপাত-দুর্বোধ্য পদটির ভিতরকার রহস্যরস দুর্নিবার শক্তিতে আমাদের আকৃষ্ট করে:—

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥

বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
(তোরা) নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিয়া আলা॥
আলার ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা॥
পর পতি সনে সদাই গোপনে
সতত করিবি লেহা।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা॥
তোরা না হৈবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমত হইলে
তবে তো পিরীতি সাজে॥

কিন্তু কেবল বোধের অভাবের জন্যই কি কবি অনধিকারীকে দূরে রাখিতে চান, বঞ্চিত করিতে চান রসাস্বাদে, মৃদু-মধু ভাষাতে যে রসিক-রসিকার আস্বাদন-মূর্তি তিনি আঁকিয়াছেন নিম্নলিখিত ভাবে?—

অবলা মুরতি রসের বান।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস বিলাস॥

না, শুধু সেই কারণেই নয়—চণ্ডীদাস ঐ প্রেমরসকে যে অগ্নিরস হইতে দেখিয়াছেন। তাহাতে পতঙ্গবৎ লুব্ধ মানুষ পুড়িয়া মরে। কামের মধ্য দিয়া কামগন্ধহীনতায় উঠিতে হয় বটে, কিন্তু মধ্যপথ নাই—হয় উত্থান, নয় পদস্খলনের সর্বনাশ। রসলোভে ধাবিত নরনারীকে কালভুক্ত দেখায় আতঙ্ক চণ্ডীদাসের মত কবির ভাষাতেও নিয়তি-শিহরণ আনিয়াছে।—

যেমত দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥

তেমন রসজ্ঞ কোটিতে গোটিক, সত্যই! কে অস্বীকার করিবে!

বাংলা কবি-ভাষার জনক

চণ্ডীদাসের মর্ত্য ও মানবপ্রীতির দার্শনিক পটভূমিকা লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু কাব্যে তাহার প্রতিফলনের পরিমাণ? তাহা যে যথেষ্ট সে বিষয়ে আমাদের ধারণা খুবই দৃঢ়। আমরা বলিতে চাই—চণ্ডীদাস মধ্যযুগের খাঁটি বাঙালী কবি এবং বাংলা কবিভাষার আবিষ্কর্তা। স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমই ছিল এই কবির নিকট মর্ত্য ও মানবপ্রীতির অবলম্বন। বিশ্বপ্রেমকে ছন্দ-বক্তৃতায় গাঁথিবার দায়িত্ব চণ্ডীদাস বোধ করে নাই। চণ্ডীদাস অকৃত্রিম বাঙালী কবি।

এই বাঙালী-কবিত্বটি কি?

ঈশ্বর গুপ্তের খাঁটি কবি-বাঙালীত্বের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন। বঙ্কিম-ভক্ত আধুনিক সমালোচক কিন্তু বঙ্কিম-কথিত এই 'বাঙালীত্ব' লইয়া বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। বাঙালীত্ব বস্তুটি কি? খাঁটি বাঙালী কিসে হয়? ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালী, রবীন্দ্রনাথ কি অবাঙালী? অর্থাৎ বাঙালীয়ানা কারো কারো মতে মনঃকল্পিত বাঙালীপনা।

তবু কথাটা যায় না। এটা বাঙালী-সঙ্গত, ওটা বাঙালী-সঙ্গত নয়,—এমন কথা প্রায়ই বলি। কৃষ্ণচর্ম বাঙালীই বলে না, শ্বেতচর্মের শ্রীমুখেও এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়। ইংরাজের মতে, ডাঃ জনসন খাঁটি ইংরাজ, চার্চিল দুর্ধর্ষ জন্‌বুল। দেখা যাইতেছে, বুদ্ধি নয়, বুদ্ধির দুর্বলতাই সর্বদেশীয়।

মধ্যযুগের বাঙালীত্ব সন্ধানে আমরা একটু বেশি সাহসী। আমাদের মধ্যযুগীয় পূর্বপুরুষগণ প্রগতির মুক্তধারায় ভাসিতে পারেন নাই। তাঁহারা সর্বাংশে মধ্যযুগীয়। সুতরাং তাঁহাদের সব কিছুকে 'বাঙালী' বলিলে সম্ভবতঃ আপত্তি উঠিবে না। আলোক-প্রাপ্তের নিকট মধ্যযুগীয়ত্ব ও বাঙালীত্ব অতিক্রান্ত কুসংস্কার।

ক্ষমাপ্রার্থনা-সূচক এই ভূমিকার পর হয়ত সে-যুগের সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে বাঙালীত্ব সন্ধান করিতে পারি। তাহা হইলে ঐ কালের কোন্ কবির রচনা ও রচনাশ্রিত জীবন অকৃত্রিম বাঙালীর? চারজন কবি সেই সন্ধানে আমাদের নিকট বাঙালীর জাতীয় কবিরূপে উত্থিত: কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস,

মুকুন্দরাম ও রামপ্রসাদ। নিছক কাব্যোৎকর্ষেই ইঁহারা জাতীয় কবি নহেন —এ ব্যাপারে আমি জাতির সমাদর ও স্বীকরণের হিসাবেও অবলম্বন করিয়াছি। এই চারজনই মধ্যযুগে জাতির দ্বারা সর্বাধিক বন্দিত ও গৃহীত কবি।

ঐ চারজনের মধ্যে বাঙালীর হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা নিকট বোধহয় চণ্ডীদাস। 'বোধহয়' কথাটির দ্বারা আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি, কৃত্তিবাস বা রামপ্রসাদকে হৃদয়ের নিকটে নয় বলিবার কোন অধিকার আমার নাই।

হৃদয়ের কে অধিক নিকট, সে তর্ক থাক; জাতির মর্মসাধনার রূপভেদের সীমা নাই; এবং বিশেষ সাধনা অবস্থাবিশেষে কবিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে। কিন্তু একথা বোধহয় সাহসের সঙ্গে বলা চলে, বাঙালীর প্রাণরস সর্বাধিক উৎসারিত চণ্ডীদাসের অশ্রুসজল কাব্যে এবং তিনিই খাঁটি বাংলা কবিভাষার আবিষ্কর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে' বঙ্গবাণী অপরূপ রূপে বাহির হইয়াছেন চণ্ডীদাসের কাব্য-অঙ্গনে।

চণ্ডীদাস বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন এবং বাঙালীর ভাষায়। কিন্তু বর্তমানে যাঁহাকে পাইতেছি, তিনি তো গঙ্গাসাগরের কবি-নদী,—কীর্তনীয়া, লিপিকর, ভক্ত-রসিক ও অপর কবি-উপনদীর সহস্র ধারাপুষ্ট এবং বহুভাব-ভূমিতে পরিবর্তিত চণ্ডীদাস। তাঁহার ভাষার গঙ্গোত্রী-রূপ ছিল কিরূপ?

আমরা জানি—জানিবার উপায় নাই—যদি পদাবলীর চণ্ডীদাসকে কৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস হইতে পৃথক মনে করি। এবং তাহা মনে করিয়াছি, কাজের সুবিধার জন্য।

চণ্ডীদাসের আসল ভাষা পাইবার উপায় নাই, তিনি ঠিক কতখানি বাংলা ভাষার রূপগঠনে সাহায্য করিয়াছেন জানিতে পারিব না—এই না-জানিতে পারাই চণ্ডীদাসের বিপুল প্রভাবের প্রমাণ। চণ্ডীদাস কেবল নিজে পরিবর্তিত হন নাই, সেইসঙ্গে সমস্ত দেশের মনের ভাষাকে নিজের ছাঁচে পরিবর্তিত করিতে পারিয়াছেন। চণ্ডীদাসের ভাষার মধ্যে বাঙালী নিজ মর্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশের যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, তাহার দ্বারাই একদিকে যুগে যুগে চণ্ডীদাসের ভাষাকে নিজের মত করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছে, অন্যদিকে ঐ রূপান্তরিত অথচ চিরকালীন চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাবলোকে নিজ বেদনার গান গাহিয়াছে

বাস্তবিক, এই কবির কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা অবিলম্বে জাতির হৃদয়কে সিক্ত করিয়াছিল এবং সে বস্তু যে কী, তাহার সহজ ও একমাত্র উত্তর—তাহা কবির ভাষা ও ভঙ্গির অকৃত্রিম বাঙালীত্ব। এইখানে আমরা বাঙালীত্ব কথাটিকে সঙ্কীর্ণতর অথচ শুদ্ধতর অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ঠিক কোন্ অর্থে ব্যবহার করিতেছি, দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাইবে।

মুকুন্দরাম খাঁটি বাঙালী কবি, চণ্ডীদাসও তাই। (বুকের স্পন্দনটুকু গানের ভাষায় ধরাই চণ্ডীদাসের একমাত্র চেষ্টা।) তাই তাঁহার ভাষা-পরিধি সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে মুকুন্দরাম সমগ্র জাতীয় জীবনের রূপকার। শব্দচয়ন ব্যবহারে তাঁহার প্রয়াস অনেক ব্যাপক। সেক্ষেত্রে মুকুন্দরামের তুলনায় চণ্ডীদাসকে ভাষা-ভূমিকায় অধিক সমাদর করিবার কি কারণ? জাতির ভাষা কি কেবল বেদনার ভাবোচ্ছ্বাস, তাহার কি দেহরূপ নাই?—জাতির আচার আচরণ, সংস্কার ও সংস্কৃতি, তাহার জীবনকামনা ও জীবন-অতিক্রমী বীর্যবিপুলতা—ইহার পরিচয় যে ভাষায় নাই, তাহাকে কি করিয়া জাতির ভাষা বলি? বাস্তবিক চণ্ডীদাসের ভাষায় সমগ্রকে প্রতিফলিত করিবার সামগ্রিকতা ছিল না।

তবু মুকুন্দরামের নয়, চণ্ডীদাসের ভাষাই আমাদের মধ্যযুগীয় জীবনের একান্ত ভাষা এবং সেই ভাষা এখনো পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ও ভঙ্গিমার অভ্যন্তরেও একটি ক্ষীণস্রোত নিত্য পুণ্যের রসসঞ্চার করিয়া চলিয়াছে।

এরূপ হইল কেন? ইহার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের মনঃপ্রবণতা দায়ী। বাংলা ভাষার শক্তি ও দুর্বলতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাংলা ভাষা গীতিকাব্যের—সংক্ষুব্ধ মহাকাব্যের নয়। গীতিরসে বাঙালী যত সহজে সিক্ত হয়, সঙ্গীতে যত আনন্দে সাড়া দেয়, এমন আর কিসে? (বাঙালী মহাকবির বীরাঙ্গনার বর্মতলে ব্রজাঙ্গনার স্পন্দকোমল বক্ষ। এবং বাঙালীর গীতিরস বেদনারসও বটে। এইখানেই চণ্ডীদাসের জয়। তিনি গানের স্রোতে অশ্রুর লবণ মিশাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে কানের ভিতর দিয়া 'মরমে' সঙ্গীত চালিয়াছেন; তারপর অবশিষ্ট রাখিয়াছেন একটি নিরুপায় ব্যাকুলতা—'কি করিব, কি হবে উপায়?' এ যিনি করিয়াছেন, তাঁহার নাম চণ্ডীদাস,—

গানের ও প্রাণের যিনি কবি ; করিয়াছেন তাহাদের জন্য যাহারা বাঙালী— গীতি ও প্রীতি লইয়া যে বাঙালী—যে গীতি, রসের, যে 'পিরীতি', মরণের।

চণ্ডীদাস আমাদের গভীরতম আবেগ-মুহূর্তকে স্পর্শ করিয়াছেন—এই কথাটিই যথেষ্ট নয়, কি ভঙ্গিতে করিয়াছেন, সাহিত্যের বিচারে তাহাই বড় কথা। আবেগের কথা মুখে যথেষ্টই বলা যায়, নয়নে অশ্রুপাত এবং হৃদয়ে শোণিতপাতের বিবৃতি দেওয়াও কিছু কঠিন নয়—সাহিত্য কিন্তু প্রমাণ চায়। প্রমাণ করা মানে সাহিত্য-জগতে প্রতীয়মান করা। 'পাঁজিতে দশ আড়া জলের কথা লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নিঙ্‌ড়ালে এক ফোঁটাও জল মেলে না।' মহৎ সাহিত্য জলের বৈজ্ঞানিক বা ভৌগোলিক তথ্য নিবেদন করে না, আমাদের সায়র-সান্নিধ্য দান করে। সত্তার বাচনিক পরিচয়ের পরিবর্তে চণ্ডীদাস ঐ সত্তাকে স্পন্দিত করিয়াছেন তাঁহার কাব্যে। এবং সেই স্পন্দন তুলিবার উপযোগী করিয়া তাঁহার ভাষার একতারাটি বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। বাঙালীকে আত্মদর্শন ইহার আত্মনিবেদনের বাণীসৌভাগ্য চণ্ডীদাসই দিয়াছিলেন মধ্যযুগে এবং সেখানেই তাঁহার কবিগৌরব।

চণ্ডীদাস যে দিতে পারিয়াছিলেন এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ, সেদিন আমরা চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম। চণ্ডীদাসের ভাষাই বৈষ্ণব সাহিত্যের সাধারণ ভাষা। আবার বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষাই ভাবময় সজলপ্রাণ বাঙালীর আত্মপ্রকাশের সাধারণ ভাষা। চণ্ডীদাসের ভাষা সেখানে কি বিপুল পরিমাণে গৃহীত, আমরা অল্প পরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। শুধু উদ্ধৃত করিলেই চলিবে,—সে ভাষাকে আমরা সহজেই নিজের ভাষা বলিয়া চিনিতে পারিব। অন্য বৈষ্ণব কবির ভাষার সঙ্গে তাঁহার ভাষার তুলনা করিয়া তাঁহাদের উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব নিরূপণের প্রয়াস অবান্তর, কারণ চণ্ডীদাসই ঐ কবিভাষার জনক।

আধুনিক কালে যিনি বাঙালীর কবিভাষাকে নির্মাণ করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাষাগঠন ব্যাপারে চণ্ডীদাসের মধ্যযুগীয় ভূমিকার তুলনা করা চলে। আধুনিক বাঙালীর কাব্যভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আরো গ্রাসকারী মনে হয়। তবে, রবীন্দ্রযুগে বাস করিতেছি বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা যতখানি বলা সম্ভব, অর্ধাবৃত মধ্যযুগীয় এই কবির প্রভাবের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা ঠিক সেইভাবে সম্ভব নয়। তাছাড়া গীতিকবিরূপে

রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ। সমসাময়িকের সঙ্গে প্রতিভার পার্থক্যের পরিমাণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যতখানি, চণ্ডীদাস ঠিক সেরূপ পার্থক্যের দাবি করিতে পারেন না।

তাহা হইলেও বাঙালীর কবিভাষা-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপেক্ষিক তুলনাতে চণ্ডীদাসের ভূমিকা গৌণ নয়। চণ্ডীদাসের প্রয়াসের বিশেষ প্রকৃতি ইহার কারণ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চণ্ডীদাসের ভূমিকার পার্থক্য হইল—রবীন্দ্রনাথ যেখানে বহুলাংশে গীতিকবিতার ভাষাকে নূতন কল্পনা-ভঙ্গির আশ্রয়ে নূতনভাবে গঠন করিয়াছেন, চণ্ডীদাস সেখানে পুরাতনকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কালে এ দেশে নূতন সভ্যতার সংক্রমণ,—প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য এই দুই সংস্কৃতির বাণীমিলনের অধিনায়কোচিত দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নূতন যুগের রসসংস্কার-সৃষ্টিতে তাঁহার সারস্বত-সাধনার মূল্য তাই অত্যধিক। যুগের ভাষাকে গঠন করিয়া জাতিকে তাহা গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের কথা উঠে না*—এই গ্রাম্য কবির সে দায়িত্ব বরণের ইচ্ছাও বোধ হয় ছিল না। তাঁহার জীবনে একটিমাত্র প্রভাব স্বীকার্য—যদি তিনি চৈতন্যোত্তর হন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের ভাবপ্রেষ তাঁহার মধ্যে নিশ্চয় সংক্রামিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের আশ্চর্য প্রতিভা এইখানে যে, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও তিনি ভাষা ও ভাবদৃষ্টিতে জাতির আত্মসাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোনো এক অসামান্য অন্তর্দৃষ্টিবলে বাঙালীর দ্বারা ব্যবহৃত সংস্কৃত-প্রাকৃত আরবী-ফারসী ও দেশজ শব্দ সমুদ্রের ভিতর হইতে সেই সেই মণিখণ্ডগুলি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, যেগুলি হৃদয়ের নিকটবর্তী, অনুভূতির রেখাঙ্কিত, এবং বহু নিভৃত স্বপ্ন সাধ ও সাধনার স্মৃতিময় ভাষাপূর্ণ। অনেক তরঙ্গের সঙ্গীত এবং শান্তির মৌন শব্দখণ্ডগুলির সর্বাঙ্গে। চণ্ডীদাস বাহির হইতে সংযোগ করেন নাই, ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের ভাষা যে বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর গীতিক্রন্দন যে এই কবির ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার

* বৈদেশিক শাসনকীলক প্রবিষ্ট হইয়াছিল বটে। চণ্ডীদাসাদির কাব্যে দুঃখের আতিশয্য ঐ রাষ্ট্রীয় যন্ত্রণার পরোক্ষ ফল—অনেক সমাজতাত্ত্বিকের এরূপ মত।

প্রমাণ উদ্ধৃতিগুলি হইতে মিলিবে। এই মর্মস্পর্শী শব্দাবলী বাঙালীর জীবন-রূপকে মুক্তার লাবণ্যে বাঁধিয়াছে। বাঙালীর জীবনের নিতান্ত গ্রাম্যরূপ, ঐ জীবনে সমাজের প্রভাব, সমাজপতির শাসন, সহজ সংস্কার, নীতি ও সতীত্ববোধ, সেখানে প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া, প্রেমের মত বিপ্লবকারী চেতনাকে প্রথমে উৎপাতরূপে গ্রহণ, নিজের পূর্বাগত সংস্কার ও সমাজের রক্তচক্ষুর সঙ্গে সহসা-উন্মত্ত বাসনার সংঘর্ষ ও তাহার দ্বারা মূর্ছিত কিংবা উন্নীত সত্তা,—এ সকলের প্রাণখচিত অভিব্যক্তি চণ্ডীদাসের ভাষায় মিলিতেছে। সেখানে আরো দেখিব, শত বাধার মধ্যেও প্রেমের দুরন্ত বিজয়ীরূপ, বাংলার কোমল মৃত্তিকাপীঠে প্রেমের সর্বত্যাগী যোগিনী মূর্তি, কিংবা সর্বনাশিনী অগ্নিপ্রতিমা। বিলম্ব না করিয়া উদ্ধৃত

কৃষ্ণের বর্ণনা : গঞ্জনা ও স্নেহের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ স্বভাবের রূপ :—

কালিয়া বঁধু ; কালা ; বিনোদ বঁধুয়া ; শ্যাম-শেল ; কালিয়া ফাঁদ ; মোহনিয়া ফাঁদ ; রসের সাগর ; রসশিরোমণি ; সোনার বঁধু ; বিনোদ রায় ; বাঁশীয়া-নাগর ; নাটের গুরু কালা ; নয়নের তারা ; পরাণ পুতলী ; শ্যাম-মন-পাখী ; গুণের নিধি ; কালা জপমালা ; শ্যাম চিকন ধন ; পরাণ বঁধু ; টিটপনা ; চিটের চিটানি ; কালোমাণিকের মালা ; রসের কানু ;

রাধারূপ ও কৃষ্ণরূপ—সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে :—

ত্রিভঙ্গ হৈয়া ; সোনার নাতিনী ; আউলাইয়া বেণী ; পায়ের উপর থুয়ে পা ; চূড়ার টালনি ; চিকন দেহা ; সুধা ছানিয়া (দেহ) ; চাঁদ নিঙাড়ি (দেহ) ; চিকন বরণী ; রূপের নিছনি ; চাঁচর চিকুর ; রসের কূপ ; যৌবনের ডালা ; রসে চলচল ; হৃদয় ভিতরে মেলা ; হিয়ার পুতলী ; রসময়ী নিধি ; রসের মোহিনী ; রস-সরসিজ ; হাসি-রসখানি ; রসের তনু।

পিরীতির রূপ : তাহার দুঃখের ও সুখের রূপ :—

প্রেমের ফাঁসী ; পিরীতি আরতি ; পরাণে পরাণে বান্ধা ; বিষম-পিরীতি ; (পিরীতি) তিল জনি টুটে ; ঠেকিয়া পিরীতি রসে ; ছার পিরীতি ; পিরীতি কণ্টক ; পিরীতি-সায়র ; সুখ দুখ দুটি ভাই ; পাপ পিরীতি ; (পিরীতি) বিষম চিতা ; (পিরীতি) বিষম দায় ; পিরীতি আখর ; পিরীতি বাণ ; পিরীতি কুহকের রীতি ; পিরীতি আঠা ; পরবশ পিরীতি ; লেহ দাবানল।

সমাজ : পড়শী : স্বামী-শাশুড়ী-ননদিনী : ধর্মবোধ ও ধর্মনাশ : গৃহকর্ম ও কর্ম বিস্মরণ : কুল ও কুলকলঙ্ক : লোকলাজ ও লজ্জাহীনতা : বাঁশী :—

কুলবতী ধনী ; দারুণ মুরলী ; ননদী দারুণ ; কলঙ্কের ডালি ; আনল ভেজাই ; কলঙ্কের হার ; যুবতী ধরম ; যৌবন যাচায ; নিরমল কুলখানি ; অকুরাণ গৃহকাজ ; ননদী প্রহরী ; স্বতন্তরী নই ; শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ; ননদিনী জ্বালা ; বিষম বাঁশী ; গুরু-গরবিত ; লোক চরচাতে ; কালা পরিবাদ ; কুজন বচন ; খলের বচন ; পাপ পড়শী ডাকিনী সদৃশী , কুলের খাঁখার ; ঘরে গুরু-জ্বালা ; পড়শী জিয়ল মাছ ; কুল পানিফল ; কলঙ্কপানা ; কুবচন-জ্বালা ; কুলটা হৈল খ্যাতি ; জগৎ ভরিয়া রৈল লাজ ; করে ঠাবাঠারি ; ননদী ভাঁড়াতে ; লোকে অপযশ কয় ; কুৎসা রটে ; পাপ ননদিনী ; ননদী কাঁটা ; পড়শী ফাঁসী ; কুলের বোহারী ; পোড়া পড়শী ; ননদী দারুণ বাদী ; পড়শী সাখী ; কুবচনে ভাজা দেহ।

রাধারব্যাকুলতা : যোগিনী, উন্মাদিনী রূপ : অসহায়তা : আত্মধিক্কার : ক্রন্দন : আক্ষেপ : পুলক : ঔদাসীন্য :—

প্রাণ করে উচাটন ; কি মোহিনী জান ; অবলা অখলা ; ভখিমু গরলে ; সোয়াস্তি নাই ; দগধে পরাণ ; দুখিনীর দিন ; বাউরী পারা ; যোগিনীর পারা ; মরমে পশিল ; ঝুরে দুটি আঁখি ; 'ধৈরয না ধরে প্রাণ ; বাঢয়ে ব্যাধি ; বাঢয়ে লালস ; সোঙরি সোঙরি ; ঝুরে আঁখি ; কাঠের পুতলী ; অবলার বধ ভাগী ; অথির পরাণী ; শপথি দেই ; বিদরে পরাণ ; হিয়া দগদগি ; দরশ-লালসে ; চিত বেয়াকুল ; তিলে পাসরিতে নারি ; টুটে ভুক ; দরবয়ে হিয়া ; পুলকে পুরয়ে আঁখি ; ভিন্ না বাসিও তুমি ; অনাথীর প্রাণ ; বড় অভাগিনী ; পিয়াসে হরি ; প্রাণ আনচান ; শ্যাম-গন্ধ ; ধিক রহু ; জারিলেক তনু মন ; পরাণ পোড়নি ; এ রসে মজিল ; গুমরিয়া মরি ; না জীয়ে তিলেক ; ভেল পরাধীন ; হিয়া বিদরিয়া ; পরাণ বাঁটিয়া দি ; পাঁজর ফাটিয়া ওঠে ; দ্বিগুণ ব্যথা ; পরের অধিনী ; পুড়িছে পরাণী ; মুখে নাহি সরে কথা ; সদাই অন্তর দহে ; তিলেক বাসিয়ে হারা ; তনু জরজর ; দুখের বারু ; দুখের মকর ; অন্তর বাহিরে কুটুকুটু করে ; পরাধিনী বালা ; খানু আপন মাথা ; পাপ পরাণ ; এ জ্বালা জঞ্জাল ; ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ; যে বলে বলুক মোরে ; হিয়া নহে থির ; পরাণ সহিত টানে ; করিল পাগলী ; আনলে বেড়িল মোরে ; অঝোরে নয়ন ঝরে ; খসিল পাঁজর ; কলেবর কাঁপে থরথর ; মনের পোড়নি ; স্বপ্নসম দেখি তারে ; নয়ানে নয়ানে খেলা ; সাধল মরণ নিজ ; আমার সুখের ঘর ; মুণ্ডে পড়ে বাজ ; পাঁজর বিঁধিল ঘুণে ; বুকে খেয়েছি ঘা ; মনের আগুনি ; বুক ফেটে মরে।

বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে মনে হয় না, কেবল লক্ষ্য করিতে বলি উদ্ধৃত শব্দগুলি বৈষ্ণবের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বাঙালীর ভাবজীবনের কিরূপ

নিত্য ব্যবহৃত শব্দ। কথাগুলি মনে মনে এবং মুখে মুখে ফেরে। আমাদের কথা বলিবার বিশেষ ছাঁদটির সবটুকু যেন এই কবি তাঁহার কোমল ভাষা-মৃত্তিকায় ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্ভুত এই, অত নরম শব্দগুলি কিভাবে না কঠিন কালের সঙ্গে যুঝিয়া এতদিন টিকিয়াছে!

উদ্ধৃত অংশগুলিতে—যেভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে সত্যই 'অংশ'—অনুভূতির পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিবর্তে ঐ সকল স্থানে আবেগের স্ফুলিঙ্গ-উৎক্ষেপ। এইবার আমরা পূর্ণতর বাক্য উদ্ধৃত করিব। অনুভূতির পূর্ণাঙ্গিক প্রকাশের চেষ্টা আছে বলিয়া বহুক্ষেত্রে এই বাক্যগুলি প্রবাদ প্রবচনের রূপ লাভ করিয়াছে। তবে মানুষের অন্তর্জীবনের সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট বলিয়া এগুলি সর্বক্ষেত্রে লৌকিক প্রবাদ নয়। এগুলিকে প্রেম-প্রবাদ বলাই সঙ্গত। জীবনের অতি নিবিড় অধ্যায়ে এই প্রেম-প্রবাদগুলি উচ্চারণ করিয়া মানুষ আত্মোদ্‌ঘাটনের সুযোগ লাভ করে। তাহাতে তাহার উৎকণ্ঠার উপশম ঘটে। আবার একথাও সত্য, আমাদের পূর্বের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, চণ্ডীদাস গণপ্রাণের কবি, অতি গভীর সত্যকে সাধারণীকৃত করার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না। তাই চণ্ডীদাসের, একমাত্র চণ্ডীদাসের মর্মগ্রাহিতা ও সংবেদনাশীলতাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে হৃদয়-রহস্যকে প্রেমের বন্ধনে ক্ষুদ্র রেখায় বাঁধিতে পারিয়াছে। কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করা যাক:

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ

হাত বাড়াইলা চাঁদে

কানুক ঔষধ কেবল রাধা

বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে

হাতের রতন কেনে পায়ে ফেলাইনু

শাশুড়ী ক্ষুরের ধার, ননদিনী জ্বালা

জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে

পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে

আপন করম লেখা, দোষ কারে দিব

চণ্ডীদাস বলে, বনের ভিতরে কভু কি রোদন সাজে

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে

হাম নারী অবলার বধ লাগে তার

গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল, ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল

শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে

সোনার গাগরি, যেন বিষ ভরি, দুধেতে পুরিয়া মুখ

বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি

মরম না জানে ধরম বাখানে

বঁধুর পিরীতি শেলের ঘায়

লাখ হেম পারা, যতনে বাঁধিতে, পড়িল অগাধ জলে

যদি পাখা পাই পাখী হৈয়া যাই

কলঙ্ক ঘোষিল লোকে

তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে

পাপ পড়শী ডাকিনী সদৃশী

মধুর বলিয়া যতনে খাইনু, তিতায় তিতিল দে

পিরীতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটিল

পরবশ পিরীতি আন্ধার ঘরে সাপ

ঘরে পরে চাতরে কুলটা হৈল খ্যাতি

হাতের কালি গালে দিলাম, মাখিলাম চুণ

বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা, সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা

সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা

পোড়া কড়ি সমান করিলু নিজ দেহা

কলঙ্ক কলসী লৈয়া ভাসিব পাথারে

জগৎ ভরিয়া রৈল লাজ
আনি চাঁদ হাতে দিল
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী
বাহু পসারিয়া বাউল হৈয়া
লাজ ধুইলে না ঘুচে
লোকে অপযশ কয়
আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা
সাপিনী দংশিলে, বিষেতে ছাইলে, তনু জরজর করে
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
আনলে বেড়িল মোরে
যুবতী ধরম ধৈর্য ভুজঙ্গম
হেরিয়া সে মুরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিযা
কানুর পিরীতি কুহকের রীতি
অনুরাগ ছুরি বৈসে মনোপরি
সাধল মরণ নিজে
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ
তখন প্রথম পিরীতি করিলে দেখি আকাশের চাঁদ
সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি
ননদিনী দেখে চোখের বালি
ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই
মুণ্ডে পড়ে বাজ

পিরীতি আঠা, ননদী কাঁটা, পড়শী হৈল কাঁরী
মহাজন ঘরে চোরে চুরি করে, পড়শী হৈল সাখী
জ্বলে ওঠে বিনি ফুঁকে
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া পাথারে ভাসাব কুল
দেহ-দাবানলে মন যে জ্বলে, হরিণী পড়িল ফাঁদে
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে
ক্ষুরের উপর রাধার বসতি
আনি চাঁদ হাতে দিল
গৃহকর্মে থাকি, সদাই চমকি, গুমরি গুমরি মরি
নাহি হেন জন, করে নিবারণ, যেমন চোরের নারী
মনের আগুনি ঝলকে ঝলকে ওঠে
নয়নিয়া পাখি, চঞ্চল তাহার মন
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা, তাহাতে নুনের ছিটে
কেবল বিষের কাঁদ
কলসে কলসে ছিঁচে, না ঘুচে পাথার
পাষাণেতে দিই কোল, পাষাণ মিলায়
যেন বেড়াজালে, সফরী সলিলে, তেমত আমার ঘর
পাছে সিঁধ দিয়া যবে যাই নিদ, কেহ বা কর়য়ে চুরি
সোনার প্রতিমা গড়াগড়ি যায়, কুবুজা বসিল খাটে
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল
কুবচনে ছাজা দেহ
সোনায় সোহাগা যেন মিলে, তেমত নাগরী নাগর কোলে

উদ্ধৃতি যথেষ্ট হইল। যদি এখন চণ্ডীদাসের পক্ষে দাবি করা যায়, বাঙালীর 'মূক মুখে' ভাষা দিবার দায়িত্বই কেবল তিনি উপলব্ধি করেন নাই,

বাংলা দেশও শতচ্ছন্দে তাঁহার কাব্যে উজ্জ্বল হইয়াছে, তবে আশা করি সে দাবি অনুচিত বিবেচিত হইবে না। চণ্ডীদাসের কাব্যে গ্রাম-বাংলা তাহার প্রকৃতি ও মানুষ লইয়া উদ্ভাসিত। সমস্ত বৈষ্ণব কবিকুলের মধ্যে এই দিক দিয়া চণ্ডীদাস অনন্য। বাস্তব জীবনের এমন মুখোমুখি আর কোন কবি দাঁড়ান নাই। কাহারো কাব্যে এমন করিয়া জাতির দেহজীবন ও প্রাণজীবন এক প্রবাহে নির্গলিত হয় নাই। রমণীয় কোনো কল্পলোকে নয়, জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার তথ্যভিত্তিতে কাব্যকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা বাঙালী পদকারদের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই করিয়াছেন, এবং 'জীবনরসরসিকতা' কথাটি অসঙ্কুচিত অর্থে যদি কোন পদকর্তা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, সে চণ্ডীদাসের বিষয়ে।

চণ্ডীদাসের কাব্য হইতে উদ্ধৃত প্রবাদরূপী কাব্যাংশে আমাদের নিত্য বাংলার উদ্‌ঘাটন। দীর্ঘ কয়েকশত বৎসরে অপরিবর্তিত এই বাংলা, অনাড়ম্বর, অনুচ্ছল, বর্ণহীন, নদীমাতৃক আমার মাতৃভূমি। চণ্ডীদাস তাঁহার বেদনার বাণীকে স্থাপন করিয়াছেন এই বাংলা দেশেরই উপর। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বাধ্য অনুকারিগণ যেখানে কৃত্রিম আলোকের উৎসব সাজাইয়াছেন, সেখানে চণ্ডীদাসের কাব্যের সহজতায় মুক্তির আনন্দ কি বিস্মৃত হইবার! এই কারণেই চণ্ডীদাসে আমাদের এমন বিশ্বাস। তিনি আমাদেরই কবি, বাংলাদেশের কবি। সৌন্দর্যের দাস নন, সহজের সন্তান। বাংলাদেশকে আমরা কীভাবে না আবিষ্কার করি, এই কবির পদাবলী হইতে! অজস্র উপমা-উৎপ্রেক্ষায় এই দেশ ও দেশবাসীর স-ছন্দ অবতরণ। নদীমাতৃক পূর্ণবারি এই ভূমিতে আসিয়া পড়ে—ধীবর, মৎস্য, মৎস্য-শিকারের সরঞ্জাম, পুষ্করিণী, শৈবাল, পানিফল, পানা, কলসী, নৌকা, বাঁধ, খাল, জলের ছিঁচ, জোয়ার ভাঁটা, কুম্ভীর, মকর—চণ্ডীদাসের পদেও ইহারা আসিয়াছে। অনার্য-অধ্যুষিত এই দেশে ব্যাধ আছে, আছে শিকারের নানা প্রক্রিয়া ও প্রকরণ :—হাতি, হরিণী, পাখি, পিঞ্জর, আঠা, ফাঁদ, ফাঁস, চাকু, শেল, জাল, করাত। এদেশে বেদিয়া আছে, আছে ওঝা—তাহাদের পুতুল-নাচানো, ঝাড়ফুঁক, বিষের বড়ি। ভূতে পাইলে যেমন ওঝারা সহায়, অসুখ করিলে বৈদ্যেরা। এরা বাংলা দেশেরই। ওঝা-বৈদ্যেরা সহজেই কালকূট বিষ পায়, কারণ এদেশ স্বাভাবিকভাবে সর্পসঙ্কুল। মকর কুম্ভীরসঙ্কুলও বটে। এদেশে

মেয়ে কেশ এলাইয়া আগুনের ধারে বসিয়া চুল বাঁধে। ধুঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদে। রান্নার পদ অনেক প্রকার, মোদক ও ইক্ষুগুড়ের বিশেষ ব্যবহার। দেশভর্তি বাঁশ ঝাড়, সুতরাং বাঁশের বাঁশী বাজে; সে বাঁশী শুনিয়া মধুস্বপ্নে মন ভরিয়া যায়—চোখের সামনে স্পর্শমণি, কল্পলতা ভাসিয়া বেড়ায়। হাতে চাঁদ-ধরার অসম্ভব কল্পনায় মন নাচিয়া ওঠে; কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙিতে দেরি হয় না। ছিন্নস্বপ্ন নারী সঙ্কুচিত বেদনায় কখনো চোরের মা বা চোরের নারীর মত রুদ্ধক্রন্দনা, কখনো মুক্ত দুঃসাহসে তপস্বিনী—বাউরী, যোগিনী—জপমালা ও কুণ্ডলধারিণী। আবার যখন জীবনের জ্বালা মরণের নিবারণ চায়—তখন আত্মহত্যা করিতে যায় পুরাতন প্রচলিত পদ্ধতিতে—তাহার জন্য দীঘির কালো জল, আগুনের লাল শিখা, নীল গরল কিংবা কঠিন ফাঁস। এই আমাদের 'আ মরি বাংলাদেশ'—যে বাংলাদেশ চণ্ডীদাসের।

বাঙালীর কবিভাষার রচয়িতা চণ্ডীদাস—এই পর্যায়ের আলোচনা দীর্ঘ হইয়াছে। যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে চণ্ডীদাসের প্রতিভার প্রায় অনালোচিত এই দিক সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। চণ্ডীদাস কেন জাতীয় কবি, এখানে তাহার প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু চণ্ডীদাস কেবল সামাজিক কবির দায়িত্বই পালন করেন নাই, বিশুদ্ধ কবিদায়িত্বও পালন করিয়াছিলেন,—সে আলোচনায় এ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারি নাই। অতঃপর সেই আলোচনাই চলিবে। বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবন হইতে সংগৃহীত যে সকল উপমাদির তথ্যমূলক উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলির কাব্য-সৌন্দর্য প্রয়োজনমত পরবর্তীকালে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিব।

রাধার অপূর্ব পূর্বরাগ

চণ্ডীদাসের কাব্যাস্বাদনের সূচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর উষা-রাগিণী স্বরূপ পদটিকে অগ্রে রাখিতেছি :—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মম প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

প্রেমের একটি মধুর মঙ্গল প্রভাতী সুর। প্রথম তিন ছত্র বৈষ্ণব কাব্যের গায়ত্রী স্বরূপ। ইহার মধ্যে সত্যের সরলতা ও উপলব্ধির জ্যোতির্ময়তা আছে। এত সহজে বলা সম্ভব—এই প্রশ্নের উত্তর—এত সহজেই বলা সম্ভব। চণ্ডীদাস এই সহজের কবি। সমস্ত পদটি তন্নতন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিলেও খুঁজিয়া পাইব না, ইহার সৌন্দর্য যথার্থ কোথায়! এখানে আমাদের দৈনন্দিনের ভাষাতেই কথা বলা হইয়াছে—ভাষার সৌন্দর্য, অলঙ্কারের নিপুণতা, ভাবের চাতুর্য—কিছুই নাই। কিন্তু এতবড় কাব্যও নাই, যদি কাব্য আত্মার প্রকাশরূপ হয়। পুনরায় বলিতে পারি, সহজতাই ইহার সবচেয়ে বড় সত্য, কারণ সত্য সহজ। সেই সত্য পরিচর্যা-হীন একটি পদ্মের মত সংসার-সরোবরের উপর ফুটিয়া ওঠে। চণ্ডীদাস

আমাদের প্রেমের স্বর্গোষ্ঠানে লইয়া গিয়াছেন, যেখানে কৃষ্ণ আছে, রাধা আছে, আর আছে মধুর শয়তান, প্রেম। সে প্রেম-সর্পের দংশনের পর আনন্দে অনুভবে ও বেদনায় আচ্ছন্ন রাধার মুখে প্রথম যে-ভাষা ফুটিবে, চণ্ডীদাস সেই ভাষাই 'দর্শন' করিতে পারিয়াছেন। সমস্ত পদটি সেই সনাতনী ব্যাকুলতার বাণী-স্পন্দন।

সুবিখ্যাত পদটির দ্বারা 'গৌরচন্দ্রিকা' করিয়া আলোচনার সূচনা করিলাম। চণ্ডীদাস 'মরম' আর 'ধরমের' কবি! তাঁহার কাব্যে রূপের ঐশ্বর্য-তরঙ্গ, শব্দের চূর্ণ ঝঙ্কার, বর্ণের বাসন্তী উচ্ছ্বাস কিংবা রসকৌতুকের নর্মলীলা প্রত্যাশামত পাইব না। স্বাদবৈচিত্র্যের অভাবের ক্ষোভ পাঠককে অবশ্যই বোধ করিতে হইবে। চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রস্তুত হইয়া প্রবেশ করাই ভাল। একটি মেদুর মেঘকজ্জল দিবসে এই কবি আমাদের চিরদিনের অধিকার দিয়াছেন। সে দিবসের সর্বত্র আচ্ছন্ন আছেন কৃষ্ণ; কৃষ্ণের দেহে যতটুকু রাধাদেহের আলো, ততটুকুই আমাদের দৃষ্টির গোচর। চণ্ডীদাসের বৃন্দাবন পূর্ণিমাধৌত যমুনাতটে নয়—কৃষ্ণ যমুনার অশ্রুজলতলে।

উদ্ধৃত পদটি শ্রীরাধার পূর্বরাগের প্রথম পদ। বৈষ্ণব পদাবলীতেও বোধ হয় এইটিই চণ্ডীদাসের প্রথমার্পণ। গৌরচন্দ্রিকা তাঁহার নাই, বাল্য-লীলা, কালীয়দমনে তিনি কালক্ষেপ করেন নাই (দীন চণ্ডীদাসের যে দায়িত্ব ছিল), তিনি একেবারে পূর্বরাগে পৌঁছিয়া গেলেন। প্রেমের আরম্ভ পূর্বরাগে, সমাপ্তি কোথায় জানি না—বোধহয় অপূর্বরাগে। মিলন, বিরহ, ভাবমিলন—সব কিছু জড়াইয়া অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণার অপূর্ব অগ্নিস্নান এই প্রেম। সেই অগ্নির কৃষ্ণনামরূপী একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইল রাধার হৃদয়ে; প্রথম প্রতিক্রিয়ার নাম দিলেন কবি—শ্রীরাধার পূর্বরাগ।

অথচ আমরা জানি, এ পূর্বরাগ নয়। কোথায় পূর্বরাগের পরিচিত প্রকরণ,—বয়ঃসন্ধির মুকুলবিকাশ, দেহে মনে অনির্দেশ্য অস্থিরতার শিহরণ, প্রাণলতার অবোধ বৃক্ষসন্ধান এবং কোনো একটি আশ্রয়দৃষ্টে সমর্পণস্বপ্নে নিশাযাপন কিংবা ব্যর্থনিশায় 'রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি'—সে জিনিস কোথায়? চণ্ডীদাস পূর্বরাগের সমস্ত নীতি নিয়ম ভাঙিয়াছেন, তবু পূর্বরাগ বলিতে হইবে? এইখানেই চণ্ডীদাসের সীমাবদ্ধতা ও সীমামুক্তি। তিনি পূর্বরাগেই রাধাকে যৌবনে যোগিনী করেন, নাম শুনিয়াই তাঁহার

রাধা কাঁদিয়া আকুল হন; আহারে বিরত এবং সত্তায় উন্নীত রাধাকে দেখিতে পাই। প্রেমের জগতে চণ্ডীদাসের এই নূতন দর্শন।

লোকমুখে শুনিয়াছি, মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় বহুশ্রুত ও গীত এই বিখ্যাত পদটির মৌখিক আলোচনায় ইহার ভিতরকার ভাববিরোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। পদটির প্রথমার্ধে চিত্রিত রাধিকার আত্ম-সমাহিত ভাবদেহটি দ্বিতীয়ার্ধের দেহচেতনায় খণ্ডিত হইয়াছে।

পদের ত্রুটি সম্বন্ধে মোহিতলালের সিদ্ধান্ত তাঁহার সূক্ষ্ম মননশীল মনেরই উপযুক্ত। বৈষ্ণব ভাবভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার করিলে ঐ সমালোচনার যাথার্থ্য অবশ্য স্বীকার্য। শ্যাম-নাম মর্মে প্রবেশ করিয়া যাহাকে নিরন্তর নাম-জপে নিরত রাখিয়াছে, তাহার পক্ষে অনতিবিলম্বে, কয়েক ছত্র পরেই, অঙ্গপরশের চিন্তা, যুবতীধর্মের লুপ্তি সম্বন্ধে আনন্দময় আশঙ্কা—ইহা অতি দ্রুত রূপান্তর; সে রূপান্তরের আকস্মিকতা রসিক মনকে আঘাত করে। এমন কি এই রূপান্তর কবির ভণিতার ভাষাতে পর্যন্ত অমার্জিত প্রবলতা আনিয়াছে—"কুলবতী কুল নাশে, আপনার যৌবন যাচায়।"

তবু কয়েকটি কারণে বলিতে হয়, বর্তমান পদ সম্বন্ধে মোহিতলালের সমালোচনায় পুথিঘেঁষা তাত্ত্বিকতারই প্রাধান্য। তিনি বিশুদ্ধ শিল্পের বিচার আনিয়াছেন,—কিন্তু বৈষ্ণব পদের আস্বাদনে এতখানি নিরপেক্ষ কলাবিচার সর্বক্ষেত্রে সঙ্গত কিনা সন্দেহ। যে বাঙালী-মন দীর্ঘদিন ধরিয়া পদটি আস্বাদন করিয়াছে, সে মন এই পদের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি দেখে নাই। ভক্ত বলিয়া দেখে নাই—ইহা বলাই কি যথেষ্ট? যাঁহারা বৈষ্ণব নন, তাঁহারাও দেখেন নাই। এবং আস্বাদনকারীদের অনেকেই রসসংস্কারের ও কাব্যানুশীলনজাত স্বচ্ছ মনের অধিকারী। তাঁহারা দেখিলেন না কেন? একটি কারণ আমাদের মনে হয়, পদটির প্রথমার্ধে যে অতীন্দ্রিয় নিবিড়তার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার স্পন্দন দ্বিতীয়ার্ধের দেহচেতনাকে (যদি থাকে) অভিভূত করিবার পক্ষে যথেষ্টই শক্তিশালী ছিল।

দ্বিতীয় কারণটিকে গুরুতর মনে করি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে নানা পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। এই সকল পর্যায় মানবজীবনেরই প্রেমপর্যায়। কবিরা পদ রচনার সময় রাধাকৃষ্ণকেও ঐ মানবীয় অবস্থাগুলির অধীন

ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি রাধাকৃষ্ণ কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রেমাবস্থার অধীন হইতে পারেন? তাঁহারা যে অধীন—এইটুকু কবিরা কল্পনা করিতেছেন মাত্র। কবিরা আবার জানেন, তাঁহাদের কল্পনা কত বেশি সীমাবদ্ধ। তাই একদিকে বিভিন্ন প্রেমপর্যায়ে স্থাপন করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে দর্শন করা হয়, অন্যদিকে কবিরা প্রায়ই পর্যায়গুলির নির্দিষ্ট লক্ষণ ভুলিয়া রাধাকৃষ্ণের লোকাতীত কালাতীত প্রেমস্বভাবের স্মরণ করেন। নিত্যস্বরূপের এই স্মরণ যাঁহার কাব্যে যত স্বাভাবিক, তিনি তত অধিক আধ্যাত্মিক। চণ্ডীদাসে অধিকতম। এই কথাগুলি—রাধাকৃষ্ণের প্রেম যুগপৎ বর্তমান ও চিরন্তন—মনে না রাখিলে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদ আস্বাদন কিভাবে সম্ভব? নাম বা বাঁশী শুনিয়া এমন প্রেম, যে-প্রেমে যোগিনী হইতে হয়! ইহার চেয়ে হাস্যকর আতিশয্য আর কি আছে? ইহা অসঙ্গত আড়ম্বর তখনি হয় না, যদি রাধাকৃষ্ণের কালরহিত প্রেমকে স্বীকার করি। সুতরাং শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদটিতে যে অসঙ্গতি দেখিয়াছেন, সে অসঙ্গতি সমস্ত বৈষ্ণব কাব্যের, কবিরা যেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে দ্বৈত মনোভাবকে লালন করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম পর্যায়ে বদ্ধ, আবার ঐশ্বরিক প্রেম বলিয়া সকল পর্যায়ের মধ্যেও অনন্ত প্রেমের শুদ্ধ স্বরূপে চিরমুক্ত।

এই কারণে আমাদের বক্তব্য, আলোচ্য পদের দ্বিতীয়াংশে দেহচেতনার প্রবেশ রসাভাস সৃষ্টি করে নাই। প্রেমের চিরন্তন লীলার পটভূমিকায় অচেতনে ঐ দেহবোধ আসিয়াছে; এবং রাধিকা যে, কৃষ্ণের 'নাম-পরতাপে' নিজের ভগ্নদশা দেখিয়া ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ দর্শনে বা অঙ্গস্পর্শে কি হইবে তাহারই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছেন—তাহা ঘটিয়াছে সুনিশ্চিতভাবে পূর্বতন প্রেমস্মৃতির জন্য। শ্রীরাধা জন্মান্তরীণ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধা।

পদটির এইরূপ বিস্তৃত আলোচনার কারণ, পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি—এটি চণ্ডীদাসের সমগ্র কাব্যের শ্রেষ্ঠ গৌরচন্দ্রিকা। এই পদের আলোকে চণ্ডীদাসের সৃষ্টিসাধনা ও মনোধর্ম বুঝিয়া লওয়ার বড় সুবিধা। এই কারণেই আমি মোহিতলালের সমালোচনার সুযোগ লইয়াছি। মোহিতলালের ঐ সমালোচনা আমি যেভাবে বিবৃত করিয়াছি, তাহা কতদূর তাঁহারই কৃত জানি না, কারণ কথাগুলি আমি লোকমুখে শুনিয়াছে। যদি তাঁহার মত

বিকৃত করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং বক্তব্য প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁহার সমালোচনা বলিয়া কথিত বক্তব্যকে একদিক দিয়া আমি নিজে অত্যন্ত যথার্থ মনে করি। বৈষ্ণব পদের আলোচনায় বিশুদ্ধ রসদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি এবং আমিও পদাবলীর আলোচনায় সামান্যভাবে সেই চেষ্টাই করিয়াছি। তথাপি এই একটি ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তত্ত্বদৃষ্টির প্রতিবাদ করিলাম এই জন্য যে, (প্রত্যেক কাব্যকেই—বিশুদ্ধ রস-পরিবেশনের ক্ষেত্রে ঐ কাব্য যতই নিত্যত্ব লাভ করুক—তাহার নিজস্ব ভূমিতে স্থাপন করিয়া বিচার করা উচিত। এই তত্ত্বের প্রবক্তা স্বয়ং মোহিতলাল।) ইহা যদি সত্য হয়, তবে ধর্মকাব্য তাহার নিজস্ব পটভূমিকায় স্থাপিত হওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় কেন? অবশ্য ধর্মকাব্যের পক্ষে প্রথমে কাব্য হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য আলোচ্য পদটিকে আমরা কাব্য মনে করি,—মনে করি যে, স্পর্শমাত্রে মনে আগুন ধরাইয়া দেয় এমন বিরল সৃষ্টির অন্তর্গত এই পদটি।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ সম্বন্ধে তাহা হইলে ইতিমধ্যেই আমাদের প্রায় সব বক্তব্য বলা হইয়াছে। এখন কেবল দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টান্তগুলির সৌন্দর্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা। তার আগে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শ্রীরাধার পূর্বরাগের মূল্য সম্বন্ধে কিছু সাধারণ আলোচনা দরকার।

(চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রধান পাঁচ পর্যায়—শ্রীরাধার পূর্বরাগ, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও আত্মনিবেদন।) পাঁচ পর্যায়ের মধ্যে শ্রীরাধার পূর্বরাগকে আত্মনিবেদন গ্রাস করিয়া আছে এবং বিরহকে আক্ষেপানুরাগ। চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে সেইগুলিকেই বিশুদ্ধ বিরহ পদ বলা হয়, যেখানে রাধা নিজের দুঃখপ্রকাশের সময় অভিযোগ বা আক্ষেপ করেন নাই। সেরূপ পদ চণ্ডীদাসে নিতান্তই অল্প। তাছাড়া মাথুরের বলিয়া কথিত পদেও আক্ষেপের সুর বাহির করা কঠিন নয়।

(পূর্বরাগকে আত্মনিবেদন গ্রাস করিয়াছে বলা একটু সাহসিক উক্তি; কারণ পূর্বরাগে—অনুরাগের সূচনা, মিলনপূর্ব অন্তরাবেগ, অচেতন দেহচেতনা ও সচেতন প্রিয়কামনায় মেশামেশি একটা অবস্থা। এই অবস্থার সঙ্গে

বৈষ্ণব আত্মনিবেদনের স্থূলবিসর পার্থক্য। আত্মনিবেদন বৈষ্ণব কাব্যে অবধারিতভাবে ধর্মকাব্য ;—তখন সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য...শরণং 'ব্রজ'। তখন সমান্য আত্মোৎসর্গ, সমস্ত আত্মাহুতি। দেহ তখন সূর্যমুখী, মন তখন মানস-পদ্ম। চণ্ডীদাসের কাব্যে এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। 'দেহবদ্ধ' পূর্বরাগ, কিছু ভঙ্গির পার্থক্য বাদ দিলে, আত্মনিবেদনের যোগসাধনা। পূর্বরাগে রাধা এমনই যোগিনী যে, বরং আক্ষেপানুরাগ অপেক্ষা এখানে রাধার বাহ্যরূপে আধ্যাত্মিকতা বেশি। শ্রীকৃষ্ণকে একবার পাইবার পর ও একেবারে হারাইবার পূর্বে—আক্ষেপানুরাগে—ষোল আনা সাধিকা হওয়া চণ্ডীদাসের রাধিকার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। প্রেমিকের অস্তিত্বের আনন্দে রাধা তখন প্রেমোন্মাদ ;—আক্ষেপানুরাগের আক্ষেপটুকু উন্মাদের আর্তি ও অনুরাগের আনন্দমিশ্রণে প্রস্তুত। অপরপক্ষে পূর্বরাগে রাধিকা যথার্থই সাধিকা,—কারণ বাঁশীর সুর ও অঙ্গের সৌরভ ভাসিয়া আসিয়াছে, রূপের চকিত দর্শনও ঘটিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ এখনও ধরা দেন নাই। সেই অধরার জন্য মহৎ তপস্যার শিখাবেষ্টিত তখনকার একটি উমা-রাধিকার দর্শন মেলে। এই কারণেই চণ্ডীদাসে আমরা আত্মনিবেদনের প্রশান্ত ধ্যানশীলতার সঙ্গে পূর্বরাগের অশান্ত সাধনার্তির একটি সাদৃশ্য দেখিতে পাই এবং আত্ম-নিবেদনের ঠিক পূর্বেই পূর্বরাগের ধারণা করিতে বাধে না।

সখীমুখে ব্যক্ত পূর্বরাগের রাধার দুইটি পরিচিত বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক—

১। ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।
সই এমন কেন বা হইল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে।

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

২। রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

(প্রথম পদে রাধার মানসিক অস্থিরতা, দৈহিকও। চণ্ডীদাসের পদে আত্মার কথাই বেশি, কিন্তু কবি কোন সময়ই দেহবাস্তবকে বিস্মৃত হন নাই। মনের সঙ্গে দেহের এমন স্বাভাবিক মিশ্রণ অন্য কোন পদকর্তার মধ্যে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। এবং শেষ পর্যন্ত আবেগের শুদ্ধতা, ঐকান্তিকতা, গ্রাম্য সরলতা এই প্রেমের নীতিবিরুদ্ধতার চিন্তা মুছিয়া দিয়া ইহার উচ্চতর ঔচিত্যকে পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দেয়।)

রাধার প্রেমের এই অভাবিত রূপে সখীরা সন্ত্রস্ত, বহিঃসংসার সম্বন্ধে রাধার নির্বিকার মনোভাবে তাহারা বিস্মিত। বিবেচনাহীন এ প্রেম

পূর্বরাগেরই। কারণ পরবর্তীকালে রাধা হয়ত প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে,—কিন্তু তাহার সমাজসচেতনতা একেবারে ঘুচে নাই, অথচ এখানে,—'গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন।' প্রথম প্রেম রাধাকে অলক্ষিত আঘাতে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে। সূচনার অসঙ্কুচিত অধ্যায়ে রাধার কামনা এমন দ্বিধাহীন ও দীর্ঘবিস্তার যে, সখীরাও বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া বলিয়াছে—'হাত বাড়াইল চাঁদে।'

প্রেমের প্রথমস্পর্শের ঐ ভাববিপর্যয় দ্বিতীয় পদে বেদনাসঞ্চারে স্থির গভীর। প্রথম পদে শরবিদ্ধের প্রাথমিক দীর্ণ যন্ত্রণা; সেই শর আরো গভীরে প্রবেশ করিয়া চিরসঞ্চিত অনুভবের বহিরাবরণকে ভেদ করিয়াছে এবং ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত অনুভূতি-ধারা রাধিকাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রথম-ভেদের দেহ ও মনোমুখরতা এখন উচ্ছলতা হারাইয়া নির্জন-মৌন। সেই স্তব্ধ বেদনার আয়ত্ত প্রকাশ—'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা'।

বাস্তবিক দ্বিতীয় পদে আমরা ভালবাসার আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে তাহারই একটি অবিস্মরণীয় চিত্র পাইতেছি। প্রেম রাধাকে যাহা অর্পণ করিল—তাহাতে সে একেবার নূতন হইয়া গেল। এত নূতন যে, সহচরীরা পর্যন্ত যেন তাহাকে অচেনার আলোকে, অনির্বচনীয় রহস্যের মায়ায় আচ্ছন্ন দেখিল। রাধার বসনে পর্যন্ত পরিবর্তন। নীলাম্বরীর পরিবর্তে রাঙাবাস। রাধা যে রাঙাবাস পরিয়া যোগিনী সাজিয়াছে, তাহা সচেতন ধর্মসাধনার বশে নয়, তাহার মনের রঙে নীলাম্বরী 'রাঙা', তাহার বুকের আগুনে 'রাঙাবাসে' বৈরাগ্যের তাম্রধূসরতা।*

ভাবাবেশের এমন কাব্যচিত্র দুর্লভ।

এই পদের ভণিতায় আছে—"চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে।" পূর্বরাগ পর্যায়ের যে-কোন পরিচয়কে নবপরিচয় বলা যায় একথা সত্য। তবু নবপরিচয়ের যথার্থ উদ্‌ভ্রান্তি দ্বিতীয় পদের তুলনায় প্রথম পদেই অধিক পরিস্ফুট। দ্বিতীয় পদে অঙ্কিত রাধা-চিত্রকে নবপরিচয়ের চিত্র বলিলে কিছু অতিভাষণ করা হয়।

* চণ্ডীদাসের রাধিকার এই 'রাঙাবাস' কি গৈরিকবাস? কবি কি 'রাঙা'-কে গৈরিকের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহা হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা সহজিয়া তান্ত্রিকের রক্তবাস, যাহা নারী-পুরুষ উভয়েই পরিয়া থাকে, চণ্ডীদাস সেই রক্তবাসেরই কথা বলিয়াছেন, এবং পদাবলীর সকল চণ্ডীদাসই সহজিয়া।

এই অতিভাষণ চণ্ডীদাসের পদের আধ্যাত্মিক সাহসিকতা।

পূর্বরাগের ঐ বিচিত্র অবস্থা—'বাউরী পারা', 'সদাই রোদন', 'বিরস বদনের' কথা অন্যান্য পদেও আছে, উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই। শ্রীরাধার পূর্বরাগের আর দুটি লক্ষণীয় বস্তু হইল : এক, শ্রীরাধার রূপানুরাগ, দুই, স্বয়ং শ্রীরাধা কর্তৃক নিজ মানসিক অবস্থার উদ্‌ঘাটন। আলোচিত পদগুলিতে সখীদের মুখে রাধার দশা-বর্ণনা। কিন্তু পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধার নিজেরও কিছু বলিবার থাকিতে পারে। প্রথমেই আসে কৃষ্ণ-রূপ সম্বন্ধে রাধার বক্তব্যের কথা। পূর্বরাগে গুণের পরিচয় গাঢ় হওয়ার কথা নয়, রূপই মন-যোগের প্রধান সেতু। রাধা তাই কৃষ্ণরূপে বড় মুগ্ধ। "সজনি, কি হেরিলু যমুনার কূলে" এবং "সুধা ছানিয়া কেবা সুধা ঢালিয়াছে রে"* পদ দুইটিকে রাধামুখে কৃষ্ণরূপ-কথনের চিহ্নিত দৃষ্টান্ত বলা চলে। পদগুলি চণ্ডীদাসীয়—চণ্ডীদাসীয় ব্যর্থতার জন্য। রূপের খুঁটিনাটি বর্ণনায় কবির সন্দেহাতীত অসাফল্য। চণ্ডীদাসের রাধা রূপবর্ণনার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রথম পদটি যদিবা চলে, দ্বিতীয় পদের পাঠযোগ্যতা পর্যন্ত নাই। একে হৃদয়বতী রাধার পক্ষে রূপদর্শনের ধৈর্যরক্ষা অসম্ভব—সেক্ষেত্রে যদি বা কোন রকমে একবার দেখিলেন,—সেখানে দৃষ্ট রূপকে আবার আলঙ্কারিক চাতুর্যের সঙ্গে ফুটাইতে হইবে! সে আলঙ্কারিকতা কী নীরস ও ক্লান্তিকর! চণ্ডীদাসের সীমাবদ্ধতা অবিলম্বে প্রকট—রীতিগত অলঙ্কারের মধ্যে রূপের তড়িৎস্পর্শ আনিবার ব্যক্তিগত অক্ষমতা।

তবু পদ দুইটিতে চণ্ডীদাস আছেন। রূপবর্ণনার প্রথম পদে কৃষ্ণের এই মনোহারী বর্ণনাটি—"পায়ের উপরে পা, কদম্বে হেলায়ে গা, গলে দোলে মালতীর মালা", কিংবা দ্বিতীয় পদের কয়েকটি অমার্জিত তবু নিজত্ব-চিহ্নিত অলঙ্কার—'জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড', 'বিন্তারি পাষাণ কেবা রতন বনাইল রে' (বুক সম্বন্ধে),—চণ্ডীদাসের সপক্ষে যাইবে। চণ্ডীদাস সর্বাধিক বর্তমান আছেন, যেখানে রাধা সরল বিস্ময়ে চমকিয়া ওঠেন—"সজনি কি হেরিলু যমুনার কূলে",—ব্যাকুল বেদনায় বলেন—"বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা", অভিযোগ করেন—"গোকুল নগর-মাঝে আর যত নারী

* চণ্ডীদাস পদাবলী, হরেকৃষ্ণ-সুনীতি সংস্করণের ১০ ও ১২ সংখ্যক পদ।

আছে, তাহে কেন না পড়িল বাধা" ; সব শেষে একটি অনবদ্য ছত্র মর্মরিত হয়—"চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ"।

সত্যই শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদ পড়িবার পর কৃষ্ণরূপের সম্বন্ধে অন্য সব ধারণা মুছিয়া গিয়া সহজ দু' একটি কথাই মনে থাকে—ঐ চূড়ার টালনি, গলার মালতী, সুধামাখা গণ্ড, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি, নয়ন হিল্লোল, কালিয়া বরণ এবং মারাত্মক বাঁশের বাঁশীটি।

আর মনে গাঁথিয়া থাকে রাধিকার একটি মর্মচ্ছিন্ন অনুরোধ—'না যাইও যমুনার কূলে,' কারণ সেখানে 'চিকন কালা করিয়াছে থানা',—যে কালার দিকে চাহিলে—'পরাণে বাঁচিবে সখী কে?'

রাধার অনুনয়ের চেহারা হইতে কৃষ্ণের শক্তি বুঝিতেছি। কৃষ্ণকে দেখিয়া অবধি রাধা দুঃখে পুড়িতেছেন। আর কেউ, বিশেষতঃ প্রিয়জন, যেন সে দুঃখভাগী না হয়, এই রাধার একান্ত ইচ্ছা। নবজলধর রূপ, গলার ভুবন-বিজয়ী মালা, নয়নের কটাক্ষ-ছাঁদ দেখিলে আর কি কাহারো রক্ষা আছে?—বড় ভয়ে রাধা এই কথা ভাবিতেছেন।

কিন্তু অপরকে বাঁচাইয়া সবটুকু আঘাত নিজের উপর তুলিয়া লওয়ার এই উৎকণ্ঠায় মাধুর্য অপরিসীম। ইহার সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা কি আমাদের চোখ এড়াইবে? বাহ্যতঃ ইহা কৃষ্ণ-কবলে ধরা পড়ার অনিচ্ছার কথা যত বেশি ঘোষণা করিতেছে, ততই সেই রূপাগ্নিতে নিজেকে পুড়াইবার আশাময় আনন্দের ব্যঞ্জনা ফুটাইতেছে।*

আমাদের জন্য একটি করুণ অভিজ্ঞতা উপস্থিত আছে—'মোহনিয়া ফাঁদে' ধরা পড়িয়া দিশাহারা বালিকাটির বিপর্যস্ত চেহারা দেখিতে হইল। সরল যাতনার কি বিস্ময়ভরা চাহনি! উন্মত্ত অভিযোগের অপেক্ষা করুণ মিনতির আবেদনটুকু আমাদের কুণ্ঠিত ও লজ্জিত করে। কি প্রয়োজন ছিল প্রেমদংশনে জাগাইবার, যখন অজ্ঞানের সরলতা অত সুন্দর? সেই মুগ্ধ বালার দীর্ঘশ্বাস অভিজ্ঞতার রূঢ় রূপ দেখাইয়া (অভিজ্ঞতা যত মহৎই হোক না কেন) আমাদের পীড়িত করে—

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই
বাঁশী কেনে ডাকে থাকি থাকি।

* ঐ—৯ সংখ্যক পদ।

সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সংবরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি॥
*
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হোল
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনী কানু সে পরশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে॥

এই সরলতাই চণ্ডীদাসের ঐশ্বর্য। সরল ভালবাসার একটি শ্রেষ্ঠ রস-চিত্রের আলোচনা করিয়া শ্রীরাধার পূর্বরাগ-প্রসঙ্গ শেষ করিব। পদটি কোথাও কোথাও আক্ষেপানুরাগে গৃহীত। কিন্তু এখানকার আক্ষেপ এতই মৃদু করুণ, প্রায় অনুপস্থিত যে, পদটিকে পূর্বরাগের সমাপ্তি এবং আক্ষেপানুরাগের সূচনা বলিতে পারি। সমাজ বা দয়িতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই পদে খুবই অল্প। সে কারণে, আমাদের বিবেচনায় ইহাতে পূর্বরাগেরই প্রাধান্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ইহাকে পূর্বরাগ-অনুরাগের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। টীকায় বলা হইয়াছে রসোদ্গারের পদ। অর্থাৎ অনুরাগের ব্যাপক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। পদটি এইরূপ :—

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত॥ ১

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥ ২

সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥ ৩

কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিনু সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥ ৪

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ—তাঁহার রচনা রূপের শৃঙ্খলায় বঞ্চিত। তাহার অজস্র প্রতিবাদ চণ্ডীদাসের পদে মিলিবে। রূপের পুটে যেমন ভাব ধৃত ও আকারিত হয়, তেমনি ভাবেরও একটি আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আছে—তাহার দ্বারাও রূপেরও অবয়ব গঠিত হয়। চণ্ডীদাসের রচনা যেখানে ভাবদেহের আত্মসংযমে মূর্তিপ্রাপ্ত, সেখানে অসাধারণ সৃষ্টি-সুষমা। বর্তমান পদটি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। গঠনরূপটি বিশ্লেষণ করা যাক।

পদটিতে মোট ষোল ছত্র,—প্রত্যেক চার ছত্রের এক একটি অংশ। অর্থাৎ মোট চার অংশ। প্রত্যেকটি অংশে রাধা নিজেকে স্থাপন করিয়া আত্মদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম অংশ : বেদনাভোগে নিজের নিঃসঙ্গত্ব। হৃদয়ভার সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করিবার কোনো সঙ্গীও যেন নাই। নিরন্তর চমকিত যন্ত্রণা—যাহা একাকী সহনে মর্মান্তিক।

দ্বিতীয় অংশ : গুরুজনের সামনে রাধার অবস্থা, আত্মসংবরণে অক্ষমতা। গুরুজনের সামনে তাঁহার ভয়, এই সমস্ত তথাকথিত শুভার্থীদের হৃদয়হীনতায় অভিমান, এবং স্পর্শকাতর অন্তরের অনিচ্ছার উন্মোচন। 'সদা ছল ছল আঁখি'—তাহার বাহ্য অভিব্যক্তি। গুরুজনদের অগ্নিদৃষ্টিও রাধাদৃষ্টির শ্যামসঙ্গকে দগ্ধ করিতে অক্ষম—'সব শ্যামময় দেখি।'

রাধিকার অবস্থা খুবই মনস্তত্ত্বসম্মত। শুদ্ধ আবেগ অন্তরের মালিন্য ঘুচাইয়া 'সংযমের' শক্তিকে হ্রাস করিয়া ফেলে। হৃদয় এতই সুকুমার ও স্পর্শকাতর হয় যে, সামান্যতম আন্দোলন হৃদয়পাত্র উছলিয়া দেয়, অনেকটা বর্ষাবারিপূর্ণ পুষ্পপর্ণের বায়ুস্পর্শে ঝরঝর ঝরিয়া পড়ার মতো।

তৃতীয় অংশ : গুরুজন হইতে সরিয়া এবার শ্যাম-সন্নিকট রাধা। পূর্বে ছিল—সব শ্যামময় ; এবার, সামনে এক-শ্যাম। অবশ্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে নয়, যমুনার 'ঝলমল' জলে। "যমুনার সেই উচ্ছল কালো জল যে শ্রীকৃষ্ণের ঝলমলে কালোরূপের কথা মনে করাইয়া দেয়"—বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের এই ব্যাখ্যা আংশিক। আসলে যমুনায় কৃষ্ণের বাস্তব ছায়াপাত হইয়াছিল। যমুনা ঝলমল করিয়াছে সত্যকার কৃষ্ণরূপকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল বলিয়া। রাধিকা যতক্ষণ সর্ববস্তুতে শ্যামকে দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ অবলীলায় বলিতে পারিয়াছেন—'সব শ্যামময় দেখি।' কিন্তু যখন সত্যই

কৃষ্ণের বাস্তব রূপবিম্বকে দেখিলেন, তখন তাঁহার বাক্‌শক্তি তিরোহিত—'সে কথা কহিবার নয়।' সেই সঙ্গে নিজের অনিবার্য পরিণামও জানাইলেন,—'তাহে কি পরাণ রয়!')

চতুর্থ অংশ : ঐ পরিণাম যে সত্যই অনিবার্য, প্রথম দুই ছত্রে তাহা পুনরায় ঘোষণা করিয়া নিজের সুনিশ্চিত আত্মসমর্পণকে রাধা অকপট সাহসের সঙ্গে উন্মুক্ত করিলেন,—'কুলের ধরম রাখিতে নারিনু, কহিনু সবার আগে।' অতপর বাকি রহিল কবির কথা—চণ্ডীদাসের প্রশান্ত সমর্থন—'কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে।'

বিস্ময়কর সংযমের সঙ্গে আত্মরূপকে, ভাবাচ্ছন্নের পক্ষে যতখানি সম্ভব, দেখিয়া কয়েকটি পরিস্থিতির মধ্যে রাধিকা তাহা গাঁথিয়া দিয়াছেন।

আঙ্গিক বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, পদটিতে এমন একটি পরিস্ফুট সামগ্রিকতা, বাচ্যার্থ-অতিক্রমী রস-ব্যঞ্জনা আছে, যাহা আমাদের মুগ্ধ করে। (এই পদে রাধার সরলান্তঃকরণকে দেখিতেছি, যে সরলতা মূঢ়তার পরিবর্তে অন্তরের স্বচ্ছতার আভা। সেই স্বভাব-সৌন্দর্যই পদটির বিনম্র ছত্রগুলিতে অসীমতা দিয়াছে। আমরা জানি, চণ্ডীদাস তাঁহার রাধিকাকে পাইয়াছেন মাটি আর মায়ায় মোড়া, কাজল-কালো দীঘিতে ডোবা একটি হৃদয়বতী যুবতীর তনু-দেহ হইতে। সে কোমল-মধুরার নিকট প্রেম একটি অজ্ঞাত অপরিচিত সম্পদ। সম্পদের অধিকার যে এমন অনির্দেশ্য শিহরণের সঞ্চার করে, কে জানিত! কিন্তু এই নিতান্ত অবোধ ভালবাসার অপূর্বতা কোথায়—যে অপূর্বতা দিব্যচেতনার স্মারক? চণ্ডীদাস বলেন, ঐ ভালবাসা কেবল অবোধ নয়, "অবোধপূর্ব" এবং শুদ্ধ শান্ত কুমারীর হৃদয়-মুকুর ব্যতীত সে ভালবাসার প্রতিফলন সম্ভব নয়।) কুমারী জননীর মত একটি নিত্য কুমারী প্রেমিকাকে চণ্ডীদাস পাইয়াছেন। এই প্রেমের পবিত্র আদিমতা এমনই যে, যেন মনে হয় 'অমানবিক,'—যেন কোনো এক হরিণীর ভালবাসা—শুদ্ধতায় স্নাত জান্তব ব্যাকুলতা। হরিণী আর শকুন্তলা—তপোবনের নিকুঞ্জচ্ছায়ায় হরিণীর কণ্ঠ জড়াইয়া শকুন্তলার ছবি—চারিটি আয়তোজ্জ্বল নয়নের মৌন বিনিময়।

ঐ রাধা একমাত্র চণ্ডীদাসের।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে দেহচেতনা

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের আলোচনায় অবতরণের পূর্বে বাঙালীর চণ্ডীদাস প্রীতি বিষয়ে কিছু ভূমিকা করিলে মন্দ হয় না। এইখানে ভালবাসার অত্যাচারের কিছু নিদর্শন দিবার চেষ্টা করিব।

বঙ্গের মহাজন কবি চণ্ডীদাসের চরিত্ররক্ষার জন্ম সকল বঙ্গীয় সামাজিকের একনিষ্ঠ প্রয়াসের কথা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জানা আছে। কবির জীবৎ-কালেই এ চেষ্টার শুরু,—রামীঘটিত কলঙ্কের পর তাঁহাকে জাতে তুলিতে উদ্যমের পরিমাণ দেখিয়াছি। তারপর কবি সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস-শুদ্ধিকরণ প্রচেষ্টা স্থগিত ছিল না; ভক্ত, ভাবুক কবি ও কীর্তনীয়া, সকলে মিলিয়া এই দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর ধরিয়া যত ভাবময় ও ক্রন্দনময় পদ বাছিয়া বাছিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছেন। একেবারে আধুনিক কালেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বলিয়া চণ্ডীদাসের উল্লেখ হওয়ামাত্র কি কঠোর ভাষাতে না সেই 'অশ্লীল' অভিপ্রায়ের প্রতিবাদ হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে কয়জনই হোন না কেন, 'আমাদের চণ্ডীদাস' নিকষিত হেম—আধ্যাত্মিকতা ছাড়া তাঁহার ভাব নাই, ভক্তি ছাড়া আবেগ নাই এবং পূজা ছাড়া প্রয়াস নাই।

আশ্চর্যের বিষয়, সাহিত্যের নিরপেক্ষ গবেষণাও চণ্ডীদাসের বিমল সাত্ত্বিকতা বিষয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসময় ধারণার সমর্থন করিয়াছে। চণ্ডীদাস-পদাবলীর যে নির্ভরযোগ্য সংস্করণ কঠোর পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং যাহার উপর বর্তমান আলোচনায় আমরা অনেক সময় নির্ভর করিয়াছি,—সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের সন্দেহহীন পদ একটিও মেলে না। পরিশিষ্টে ঐ পর্যায়ের যে দুটি মাত্র পদ আছে, সেগুলির ভণিতান্তর বর্তমান, অন্য কবির রচনা হওয়া বিচিত্র নয়।

এই দুটি মাত্র পদকে বর্জন করিতে পারিলে খুশি হইতাম। তখন চণ্ডীদাসের অখণ্ড ভক্তিমূর্তির নিরঙ্কুশ অর্চনা করা চলিত। কিন্তু নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ ও তদুপরি নির্ভরশীল বসুমতী সংস্করণে শ্রীকৃষ্ণের

পূর্বরাগের যৌবন-চাঞ্চল্যপূর্ণ আরো কয়েকটি পদ মিলিতেছে। সেই সব কয়টি পদই কি বর্জন করিতে হইবে চণ্ডীদাসের সাধুমূর্তিকে চপলতাহীন করিতে?

পদগুলি বর্জনের বিপক্ষে আরো একটি কথা আছে। চণ্ডীদাসের রাধা বলিয়াছেন—'হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কাঁদিতে জনম গেল।' সকলে জানে, হাসির 'জনম' অপেক্ষা কাঁদার 'জনম' চণ্ডীদাসের কাব্যে অপরিসীম দীর্ঘ। তবু কি হাসির কোনো সময়ই ছিল না—ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য কি রামী-প্রেমিক কোন সময়ই বোধ করেন নাই?—খলদঞ্চলায় মুকুলিত দেহ কি কবির নিকট চিরকালই 'মরণ অধিক শেল',—একবারও জীবন লুঠিবার মধুবাণ নয়?

পূর্বরাগে চণ্ডীদাসের রাধাকে মহাযোগিনী জানিলেও, এবং তিনি 'দুঃখের কবি' হইলেও তাঁহাকে একেবারে সুখবঞ্চিত করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। পূর্বরাগই চণ্ডীদাসের পক্ষে একটু চঞ্চল আনন্দের কাল, কারণ চণ্ডীদাসের মিলনের পদ মেলে না, এবং রসোদ্‌গারে ভোগের কথা বলিতে গিয়া অপরিজ্ঞাত কারণে রাধিকার কণ্ঠ নিশ্বাসময় হয়। কিছু দেহচেতনার পরিচয় আছে খণ্ডিতায় (তাও সন্দেহজনক পদ), কিন্তু সে বড় পরোক্ষ দেহচেতনা এবং রাধিকার ঘৃণাব্যঙ্গে সেখানে কৃষ্ণের অনুচিত শারীরিকতা মসীবর্ণ। একমাত্র পূর্বরাগে—মুক্ত ও সুস্থ রসোন্মাদনা। সেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের কবিস্রষ্টার দায়িত্ব হইতে চণ্ডীদাসকে অব্যাহতি দেওয়ার মত নিষ্ঠুরতা অন্ততঃ আমাদের নাই।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদগুলি আবার কাব্যরূপে প্রশংসাযোগ্য। নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতিই এই পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধার পূর্বরাগে চণ্ডীদাসের, এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ অন্য এক গ্রন্থে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।* সেই আলোচনাকালে যদি এই ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-পূর্বরাগ নিকৃষ্ট—নিশ্চয়ই আমরা সে মনোভাবের সংশোধন করিব। যে চণ্ডীদাস নারীর চোখ ও মন (মন নয় 'মরম') দিয়া সব কিছু দেখেন, তিনি এই একটি ক্ষেত্রে পুরুষের

* মধ্যযুগের কবি ও কাব্যে (প্রথম খণ্ড) বিদ্যাপতি প্রবন্ধ

সহায়তা লইয়াছেন। পুরুষের তৃষ্ণাকুল নয়নে রাধার লাবণ্যতরল দেহটি একটি অপরূপ রসের কূপ। তনু দেহটি নিশ্চয় অনুমানে সুন্দর, আবার কিছু পরিমাণে অনাবৃত সুন্দরও বটে। কিশোরীকে অসংবৃতা দেখার সুযোগ কৃষ্ণ পাইয়াছেন। এই দেখার পিছনে কৃষ্ণের চেষ্টা এবং রাধার সহায়তা উভয়ই আছে। কৃষ্ণের চেষ্টার দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, স্নানের ঘাটে তাঁহার গতায়াত ছিল এবং সুন্দরীর স্নানলীলা না দেখিবার সংযম ছিল না। কৃষ্ণ চিরকালই সুরসিক। এক্ষেত্রে রাধিকার আচরণই কিছু বিস্ময়কর, অন্তত: চণ্ডীদাসের কাব্যে। এখানে দেহের আবেগে রাধা একটু বেশি অস্থির; সেই অস্থৈর্যের আক্রমণ-লক্ষ্য—বলিতে সঙ্কোচ হয়—দেহবসন। এই অস্থিরতা বহুক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যরহিত, প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক আত্মরতির তাড়নায়, যথা—

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥
(পদটি শ্রীরাধার পূর্বরাগের)

এবং—

চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ, আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥

কিন্তু সর্বত্র রাধিকা এরূপ নন, স্বেচ্ছাকৃত ছলনাবিস্তারও আছে, তার দ্বারা নায়ককে নাড়া দিবার সচেতন তাগিদ। লজ্জাহীনা যুবতীটির সপক্ষে অবশ্য একথা বলা চলে, এই সমস্ত অংশে রাধিকার দেহসচেতনতা অচেতনও বটে—যে জাগাইতেছে, সে পরিণাম না জানিয়া জাগাইতেছে—তার এক কুতূহলী অপরিণামদর্শী প্রভাব-প্রয়োগ—

থির বিজুরী বরণ গোরী
পেখিনু ঘাটের কূলে।......
সই মরম কহিয়ে তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে॥

ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ বসনে ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥

এবং—

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।......
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিত মরম কৌতুকে
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি দেখাল কামিনী
পরাণ হারানু তাহ"॥

—তবু নিশ্চিতভাবে জানি না, এই শারীর-প্রদর্শনী সত্যই রাধার ইচ্ছাকৃত কিনা! পদগুলি কৃষ্ণমুখে কথিত। রাধার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক অসংবরণ, তাহাকেই দেহমুগ্ধ কৃষ্ণ হয়ত নিজের প্রতি রাধার পক্ষপাতের ইঙ্গিত মনে করিয়াছেন। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে কৃষ্ণের বক্তব্যকে আমাদের সমাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। নীল সাড়ির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ দুর্বার, সখিসঙ্গে রাধাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দোলায়মান। নীল সাড়ি রাধার দেহাবরণ; দেহের সঙ্গে দেহাবরণের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতির কারণ বোঝা যায়, কিন্তু সখী-আবৃতা রাধাকে দেখিয়া এত সুখ কেন? স্পষ্টতঃ এইজন্য যে, নীল বসনের মতই পূর্বরাগ অধ্যায়ে সখীরা রাধাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিভৃত নিশায় এখনো দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই। তবে আসল কারণ—রাধিকা এখন কৃষ্ণ-হৃদয়ে যে সৌন্দর্যের বান ডাকাইয়াছেন, যে প্রবাহের শীর্ষ-তরঙ্গ ঐ রাধাদেহ—কৃষ্ণের "রসচেতনা সখিসহিত সেই সমগ্র হিল্লোলে তরঙ্গিত হইতে চায়। সখিসঙ্গে রাধার অনেকগুলি উল্লেখের মধ্যে মদচঞ্চলা যুবতীর অলজ্জতায় উল্লসিত এই কয় ছত্র উৎকৃষ্ট—

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখীর সহিত যায়।

সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ
হসিত বদনে চায়॥

এহেন রূপের বন্যা দেখিয়া কৃষ্ণ একেবারে বিপর্যস্ত—কখনো পাঁজর কাটিয়া ধ্বসিয়া যায়; হিয়া জরজর, দেহ থরথর করে; পরাণ জলিয়া যায় অথবা লুটাইয়া পড়ে,—সেই কামাহত নিশ্চেতন চেহারা দেখিয়া কবি কিন্তু যে কঠিনতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। কৃষ্ণের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়ভাবেই জানাইয়াছেন, তাহা 'ব্যাধি,—সমাধি নয়।' কবির এই মানসিক কাঠিন্য কৃষ্ণের মুক্ত রূপতৃষ্ণার জন্যই হয়ত ঘটিয়াছে, যাহার চিত্র কবিকে আঁকিতে হইয়াছে অথচ তাহাতে তাঁহার পূর্ণ প্রাণের সমর্থন ছিল না। তথাপি কবি কৃষ্ণের চোখে রাধাকে না দেখিয়া পারেন নাই, তাঁহার ব্যক্তিগত রূপপ্রীতি অবশ্যই আছে; বিশেষভাবে সেই রূপ যদি নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে বর্ণিত রূপের তুল্য হয়। যে-পদটি উদ্ধৃত করিব তাহা বৈষ্ণব রূপানুরাগের একটি শ্রেষ্ঠ পদ (কোনো একটি সুন্দরী যুবতীর অরক্ষিত সৌন্দর্যের এইরূপ কামমধুর, রসোজ্জ্বল অথচ সংযত চিত্র বৈষ্ণব কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। চিত্রটি যে বঙ্গদেশীয় কোনো সৌন্দর্যের 'পুষ্করিণীতীর্থ' হইতে সংগৃহীত, কোনোমতে অতীন্দ্রিয় নয়, ইহা যে কবির নয়নমুকুরে প্রতিফলিত চিত্রের ভাষায় পুনঃপ্রতিফলন—তাহা সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারি।) রেনেসাঁস যুগের ফ্লোরেন্স-শিল্পীরা এমন একটি ছবি যথেচ্ছ খুশীতে আঁকিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরাগী ও অনুকারী যে-সকল ভারতীয় চিত্রী ঘাটের সিঁড়িতে মুক্ততনু কিংবা গৃহপথে সিক্ত-বস্ত্র গৌরাঙ্গীর বর্ণোজ্জ্বল রক্তরসময় দেহার্চনা করিয়াছেন—তাঁহাদের বহু জনের বহু চিত্রের আদর্শ-প্রতিমা হইয়াছে চণ্ডীদাসের এই পদের শ্রীমতী রাধিকা। 'চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি' ছত্রটি তো নাগরিক দেহ ও প্রাণোৎকণ্ঠার প্রবাদবাক্য :—

সজনি, ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিলু ঘাটে॥......
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥

অঙ্গের বসন করাছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে হেমহার দুলে
সুমেরু শিখর জিনি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়া আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি।......
চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর॥

শেষপর্যন্ত চণ্ডীদাস কিন্তু এতখানি বিশুদ্ধ দেহবাদী নন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগেও। আমাদের জন্য এমন কয়েক ছত্র কাব্য প্রস্তুত আছে, যেখানে রূপের সঙ্গে প্রাণের, তৃষ্ণার সঙ্গে মুগ্ধতার অপরূপ মিশ্রণ—সেখানে 'মগন সঘন' রূপ 'অনুপম ছায়ায়' পর্যবসিত, বিদ্যুদ্দেহ পর্যন্ত রসাবেশে স্থির। যথা—

মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতলী কায়া।
তাথে নীল সাড়ি ভেদিয়া অঁাচল
রূপ অনুপম ছায়া॥
বসন ভেদিয়া রূপ ওঠে গিয়া
যেমন তড়িত দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক এই আলোচনা চণ্ডীদাসের মর্যাদাহানিকর কিনা জানি না, কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত এই পর্যায়ের পদগুলির কাব্যসৌন্দর্যের জন্য সেগুলিকে অবজ্ঞা করা সম্ভব হয় নাই। যদি কোনো দিন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, ঐ ধরনের কোনো পদই চণ্ডীদাসের রচনা নয়,

সেদিন নিশ্চিন্ত নিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনা প্রত্যাহার করিব। সেদিন আমার চণ্ডীদাস, ষোল আনা সাত্ত্বিক, নিখাদ সোনা। কেবল একটি প্রশ্ন তোলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-পূর্বরাগের ঐ লাবণ্যোচ্ছল পদগুলি কি সত্যই চণ্ডীদাসকে ক্ষুণ্ণ করে? কাব্যের এই অংশে অবশ্যই চণ্ডীদাসের রাধিকা খুব বেশি বুকের বসন সরায়, 'মুচকি মুচকি' হাসে, প্রলোভনের যে ছলনায় প্রাকৃত নায়িকার অধিকার, অনাধ্যাত্মিকভাবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করে, তথাপি, আশ্চর্যের বিষয়, দেহচেতনার এই স্পষ্ট পরিচয়ও চণ্ডীদাসকে ইন্দ্রিয়-লুব্ধ করিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া এই কবির অতীন্দ্রিয়তা নয়। যে অকপট সরলতার সঙ্গে জৈবস্বভাবকে মানিয়া লইয়া কবি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রাধিকার আন্তরিক নির্মলতাকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। এই সরল কামনার পবিত্রতা একদিন বিরহের যন্ত্রণার মধ্যে রাধিকার চরিত্রকে দিব্যজ্যোতি দান করিবে।

দৌত্য—সমাজ-প্রতারণার কৌশল

পূর্বরাগের পরে প্রধান পর্যায় রসোদ্গার। মধ্যে আরো দু'একটি গৌণমূল্য অধ্যায় আছে—হরেকৃষ্ণ-সুনীতি সংস্করণে সেগুলির নাম দৌত্য, সঙ্কেতকুঞ্জে মিলন ইত্যাদি।

দৌত্যের বিবিধ কৌশলের সঙ্গে বৈষ্ণবকাব্যের পাঠক পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বল-দৌত্যের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে দৌত্যের কৌশলগুলি মধুর, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যের পদে। কৌশলের সংখ্যাও মন্দ নয়। রাধার দরশন পরশন আশে কৃষ্ণ কখনো বাদিয়া, কখনো পসারী,—বাজিকর, চিকিৎসক, গ্রহবিপ্র, বেণ্যানী, দেয়াশিনী, মালিনী, নাপিতানী,—সবকিছু। তবে মনে হয়, সকল সাজের মধ্যে সেরা সাজ মালিনী, নাপিতানী ও চিকিৎসকের,—কৃষ্ণের মধুরতম অভিজ্ঞতা যে তিনটি সাজে। অসতর্ক সৌন্দর্য উপভোগের অমন সুযোগ কোথায় আছে? আর সুযোগ গ্রহণে কৃষ্ণ সদাতৎপর একথা কে না জানে? কৃষ্ণ মালিনী সাজিয়া গিয়াছেন; পুষ্পমাল্যের মূল্য জিজ্ঞাসিত হইলেন; তখন—"মালিনী কহয়ে সাজাই আগে। পাছে কড়ি দিবা যতেক লাগে॥ এত কহি মালা পরায় গলে। বদন চুম্বন করিল ছলে॥" চিকিৎসকরূপে, না বলিলেও চলে, রাধার দেহ-পরীক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব কৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেরা সুখ পাইয়াছিলেন অবশ্যই নাপিতানীর ছদ্মবেশে। তখন কৃষ্ণের তুরীয় আনন্দ—

রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি হাসয়ে ঈষৎ হাসি
নিরখি নিরখি অবিরাম॥

এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিষিদ্ধ ফলের দিকে হস্তপ্রসারণ:—

হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ-রতন দেহ॥
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥

এই দৌত্যের অধ্যায়ে কেবল রাধার বুকের চেহারা নয়, বুকের ভিতরে যে কাঁটাটি বিঁধিয়া আছে—সেটুকুও দেখিবার নিভৃত দুর্লভ অবসর কৃষ্ণ পাইয়াছেন। নায়কের প্রতি নায়িকার আসক্তির স্বীকারোক্তি নায়িকার স্বমুখে নায়ক ছদ্মপরিচয়ে শুনিতে পাইয়াছেন—তাঁহার জীবনে বিরল ধন্য সেই মুহূর্ত! যখন দেয়াশিনীরূপে কৃষ্ণ বলিলেন, 'আনন্দ থাকিবে, সকলি পাইবে, কলঙ্ক নহিবে কুলে,' তখন—

শুনিয়া সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি
এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার ব্যথাটি ঘুচয়ে
তবে সে জানি যে তোয়॥

—তখন ব্যথাকাতর অশ্রুআঁখি চণ্ডীদাসের প্রত্যাবর্তন!

দৌত্য ইত্যাদিতে বর্ণিত সমাজ-প্রতারণার ফন্দীগুলিকে আমরা যে সস্নেহ প্রশ্রয়ের সহিত উপভোগ করি, তাহার কারণ মানুষের মনে সমাজ-গঠনের আদর্শের পাশাপাশি সমাজ-বিদ্রোহের উচ্ছৃঙ্খলতাও আছে। গঠনের চেয়ে বরং ভাঙনের প্রতি তাহার বেশি প্রীতি। অথচ জীবনযাত্রায় সমাজের অপরিসীম মূল্য; সামাজিক মানুষরূপে সমাজদ্রোহীকে সে শাস্তি দিতে বাধ্য। কিন্তু যদি কেহ লীলার মধুর অবহেলায় সমাজবিধিকে অতিক্রম করিয়া যায়, যাহাতে সমাজের প্রত্যক্ষ ক্ষতির সম্ভাবনা আপাতত দৃষ্টিগোচর নয়, তখন সে প্রলুব্ধ উল্লাসে ঐ সমাজলঙ্ঘনকে সংবর্ধনার মাল্যার্পণ করে। এই কারণেই সাহিত্যে গর্হিত প্রেমের এত বিস্তার।

আবার ঐ গর্হিত প্রেম যখন ঐশ্বরিক, তখন তো মানুষের আনন্দোৎসব বাধাহীন। নিজের আস্বাদনের স্বার্থপরতায় তখন সমাজনায়কই সমাজশত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ। তখন শাশুড়ী ননদিনী রচিত দুর্গের বিরুদ্ধে সে কৃষ্ণের সহযোদ্ধা। স্বয়ং দৌত্যের সুন্দর চোরটি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া নানা ছলে বহির্গত।

হরেকৃষ্ণ-সুনীতিকুমার সংস্করণে মাত্র কয়েকটি পদ দৌত্য পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট। আমরা তাঁহাদের বিচারকে শ্রদ্ধা করিয়া দৌত্যের অন্যান্য পদকে (অল্পপূর্বে যে সকল পদ হইতে দৃষ্টান্ত তুলিয়াছি) দীন চণ্ডীদাসের মনে করিতেছি।

এরূপ করাতে পদাবলীর চণ্ডীদাসের কোনো ক্ষতি নাই, কারণ উদ্ধৃত ছত্রগুলি ছাড়া অন্যত্র কাব্যসৌন্দর্য প্রায় মিলিবে না। হরেকৃষ্ণ সংস্করণ হইতেও দৌত্যের পদ তুলিতে আমাদের উৎসাহের অভাব। কারণ সেখানে কৃষ্ণের যে অবস্থাচিত্র দূতী উপস্থিত করিয়াছে, তাহা রাধার বিরহাবস্থা হইতে নিতান্তই ধার করা। কৃষ্ণসম্বন্ধে বর্ণনাগুলি আতিশয্যে পূর্ণ, সেগুলিতে বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছা হয়। শুধু দৃষ্টান্তের জন্য একটি পদের অংশবিশেষ তুলিতেছি,

না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
সোঙরি সোঙরি তোহ'বি নাম।
সোনার বরণ হৈল শ্যাম॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রহিছে চাই॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥··
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কানুক ঔষধ কেবল রাধা॥

অত্যন্ত অনুচিত বক্তব্য। এই রাধা-পদটি কৃষ্ণের বেনামী করিয়া চণ্ডীদাস সাহিত্যিক সাধুতার পরিচয় দেন নাই।

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' পদটি সুপরিচিত হইলেও আলোচনার সুবিধার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী ॥

রসোদ্গারের বলিয়া কথিত এই পদটিকে হরেকৃষ্ণ-সুনীতিকুমার সঙ্কেত-কুঞ্জে মিলনের পদ বলিয়াছেন। এরূপ করিবার পক্ষে তাঁহারা যুক্তি দিয়াছেন,—"পদের বিষয় বর্তমান ও প্রত্যক্ষ।……শ্রীরাধা কুঞ্জে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্বেই কুঞ্জে আসিয়া আঙিনার মাঝে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধার আগমন পথ-প্রতি চাহিয়া আছেন, বারিধারায় সর্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে সে দিকে দৃষ্টি নাই। এই অবস্থায় শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—'এ ঘোর রজনী' ইত্যাদি। তিনি নিজেও এই দুর্যোগে বাহির হইয়াছেন, ঘরের গুরুজনদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া অনেক কষ্টেই তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু সেসব কথা তাঁহার মনে হইতেছে না, তিনি বলিতেছেন 'বঁধু কেমনে আইল বাটে'।"

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার প্রেমবিবশ চেনা চেহারার পরিবর্তে এখানে একটি সংগ্রাম-প্রস্তুত রূপ। এই দৃঢ়তা সচরাচর দেখা যায় না। চণ্ডীদাসের রাধা অভিসার করেন না। কিছু সন্দেহজনক পদে বড় জোর দুটি কমল-চরণ স্মরণ করিয়া 'শ্যামমন্ত্রমালা জপিতে জপিতে', 'প্রেম রসভরে' রসময়ী রাধার যাত্রার কথা বলা আছে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কোথায় যাহা গোবিন্দ-দাসের—সেই আত্মস্থির সাধনশক্তি? বিদ্যাপতির উদ্দীপ্ত উচ্ছ্বাস, অনন্ত বড়ুর আবেগময় আত্মঘোষণার পাশে পদাবলীর চণ্ডীদাস-কবির সশঙ্ক ব্যাকুলতা কত বেশি শিথিল, অন্ততঃ অভিসারজাতীয় পদে? চণ্ডীদাসের ক্ষেত্র ভিন্নতর। যে আত্মবোধ তামসী পথে অভিসার করায়, সে কাঠিন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিলনা তাঁহার রাধিকায়। যাহা ছিল, অন্য কাহারও

আবার তাহাতে অংশ নাই। নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যখন রাধিকা বিজয়ী—তারপরে পথযাত্রায় প্রস্তুত—তখন নূতন জয়ের জন্য সংগ্রামের চিন্তা পর্যন্ত তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। পথে কি আছে না আছে, সে বিষয়ে রাধা ভ্রূক্ষেপহীন। অভিসারের গোপন যাত্রার প্রস্তুতি তখন রাধিকার কাছে অপ্রয়োজন আড়ম্বর। অন্য কবিরা যেখানে 'বাঁধন ছিঁড়িয়া আসিয়াছি' —ইহারই গৌরবে অস্থির, সেখানে 'আসিতে পারিতেছি না'-র দীর্ঘশ্বাস রন্ধনশালায় বসিয়া এই কবি মোচন করিতেছেন। অন্য বৈষ্ণবপদে বন্ধনের কঠোরতা লক্ষ্যভূমে উপস্থিতিকে গৌরবান্বিত করার জন্য কল্পিত, চণ্ডীদাস সেখানে সমাজশিকলে মাথা কুটিয়া মূর্ছিত। কিন্তু একবার যদি সে মূর্ছা ভাঙে, তখন রাধা আবার 'মুগধিবালা'—ভাবের ভরে প্রকাশ্য অভিসারের মুগ্ধা অভিযাত্রিনী। প্রেমের রাজপথে এই নিঃশঙ্ক গতিকে 'অভিসারও বলা যায়, অভিযানও বলা যায়'।

আলোচ্য পদটিতে চিত্রিত রাধামূর্তিকে চণ্ডীদাসের পক্ষে কিছু অসাধারণ মনে হইলেও ইহাতে চণ্ডীদাসের নিজস্বতা গ্রথিত। রাধিকাকে বজ্রবারি মাথায় করিয়া সঙ্কেতকুঞ্জে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ে বিকারমাত্র নাই। একমাত্র চিন্তা দয়িত কি করিয়া আসিল! চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার চিরকালীন আক্ষেপ। সে কৃষ্ণের প্রেমকৃচ্ছ্রের যথার্থ নিদর্শন যদি সত্যই মিলিল—তখন একটি চরম প্রতিজ্ঞায় কঠিন হইয়া ওঠেন রাধিকা —'কলঙ্কের ডালি মাথায় কারিয়া আনল ভেজাই ঘরে।' যে বঁধুর বিরুদ্ধে আপন আঙিনা দিয়া আন বাড়ি যাওয়ার অভিযোগ করিতে হইয়াছে, সেই বঁধুয়া ঘোর রজনীতে মেঘের ঘটার মধ্যে আঙিনায় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছেন— এখন রাধার উচ্ছ্বাসে বাধা দেয় কে? সেই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আত্ম-সজ্ঞানতারহিত ত্যাগশক্তি মিলিত হইয়া পদটিকে গৌরবদান করিয়াছে।

এইবার রসোদ্গার। চণ্ডীদাসে সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী। সেই ক্ষণস্থায়ী সুখের স্মৃতিমাখা অধ্যায় রসোদ্গার। এইখানেই প্রাপ্তিসুখের পূর্ণতা, আনন্দমোহের চরম। 'মিলন'ও এই রসোদ্গারের অন্তর্গত।

মিলনে নয় রসোদ্গারেই মিলনানন্দ চণ্ডীদাসের কাব্যে শিখরস্পর্শী, এরূপ বলিলাম কেন, তাহার কৈফিয়ৎ খুব সহজে দেওয়া যায়,—চণ্ডীদাসে মিলনের পদ প্রায় নাই। নাই কেন?—চণ্ডীদাসের পক্ষে মিলনমত্ততাকে প্রত্যক্ষে ছন্দায়িত করা সম্ভব ছিল না বলিয়া। ইন্দ্রিয়-জীবনকে কবি কোনো সময়েই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তবু জীবনে মিলন আছে, চণ্ডীদাসের কাব্যেও। মিলনের গাঢ়তার কথা না বলিলে বিচ্ছেদের আর্তনাদে কেহ বিশ্বাস করে না। তাই নান্যোপায় কবি, প্রত্যক্ষ মিলনবর্ণনা তাঁহার পক্ষে কঠিন বলিয়া, মিলন-স্মৃতিকেই কাব্যোপজীব্য করিলেন।

রসোদ্গারে সে স্মৃতি নিকটের। প্রেমবর্ষণ-রজনীর অব্যবহিত পরবর্তী সুধৌত প্রভাত; এখন উন্মত্ততা গিয়াছে, কিন্তু শিহরণের ভাবশেষ আছে দেহে মনে; গাঢ় সুখের ঘুমঘোর, ক্লান্তির জড়িত মধুরতা; জোয়ার সরিয়া যাওয়ার পর তটের নরম মাটিতে জলের রেখা দেখিতে জলের যে সুখ—রসোদ্গারে সেই সুখ—চর্বণা ও রসরোমন্থন। এই হইল চণ্ডীদাসের নিজস্ব ক্ষেত্র; প্রেমের কবিরূপে মিলন-গীতি রচনার দায়িত্ব কবি এইখানে পালন করিয়াছেন,—রসোদ্গারে রাধাকণ্ঠের আনন্দঘনতায় চণ্ডীদাসের রসহর্ষ। চণ্ডীদাস আবার বেদনার কবি,—রসোদ্গারের রোমন্থনে তাই মধুর ঔদাস্য ভরিয়া গিয়াছে; বর্তমান মিলনের কলকথায় জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের দূরস্মৃতি মিশিয়া রহস্যের গোধূলিমায়ায় সে কণ্ঠ সমাচ্ছন্ন।

রসোদ্গারের বিপরীত অংশে আছে মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা। রসোদ্গারে যেখানে প্রাপ্তির সুখ, ঐ সকল পর্যায়ে সেখানে অপ্রাপ্তির নৈরাশ্য ও ক্ষোভ। রসোদ্গার হইতে কলহান্তরিতা পর্যন্ত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিময় পর্যায় সমূহে চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা অধিক নয়। এবং সবগুলি পর্যায়ই ইন্দ্রিয়বর্ণে রঞ্জিত। এগুলি মিলনলোকের অন্তর্ভুক্ত,—মান, খণ্ডিতাও। মিলনের মূল

কথাটা শুধু 'পাইলাম'—নয়, 'পাইতেছি না'—ইহাও। আমারি আঙিনা দিয়া দয়িত আন বাড়ি যায়—এই হৃদয়ক্ষয় আমার মনাঙ্গনে দয়িতের পদধ্বনিকে গভীর করিয়া তোলে। (খণ্ডিতা ইত্যাদির তিক্ততায় মিলনব্যঞ্জনের স্বাদবৃদ্ধি। খণ্ডিতাদিতে নৈরাশ্যের মূল অগভীর, মুষ্টিস্খলিত রত্নের জন্য কিছুকালের উৎকণ্ঠার আর্তনাদ, শুধু সেইটুকু। নচেৎ সত্যকার অতৃপ্তি? তাহার জন্য তো আছে আক্ষেপানুরাগ-মাথুরের অতলস্পর্শ গভীরতা, চণ্ডীদাস যাহার কবিপ্রেমিক।)

রসোদ্‌গারের পদের স্বত্বাধিকার লইয়া চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসে বড় বিরোধ। অনেকগুলি পদের উপরই দ্বৈত দাবি। হরেকৃষ্ণ-সুনীতিকুমার সংস্করণে সে তালিকা দেওয়া আছে। কে কাহার পদ লইয়াছেন বলা শক্ত। তবে চণ্ডীদাস নামটির দাবিদার অনেকে বলিয়া বিচারের 'পক্ষপাত' জ্ঞানদাসের দিকে। আমরা দুই কবিকেই প্রণিপাত করি। আমাদের কাছে এই কথাটি স্পষ্ট যে, সাধারণ কবিত্বভাবে উভয় কবির ঐক্য আছে, এবং সেই ঐক্যের ধারণা রসোদ্‌গার, আত্মনিবেদন প্রভৃতি কয়েকটি পর্যায়কে অবলম্বন করিয়া মুখ্যতঃ গঠিত। প্রেমের রহস্যসত্তা সম্বন্ধে জ্ঞানদাসের বিশ্বাস চণ্ডীদাসের অনুরূপ ছিল। সে কারণে বিশেষভাবে রসোদ্‌গারের রহস্যরসময় পদগুলি এই দুই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবির নামগৌরব পদভুক্ত করিয়াছে।

তবে উভয় কবির ভণিতাযুক্ত পদগুলি সংখ্যায় বেশ কয়েকটি হইলেও সবগুলি উৎকর্ষে উচ্চ নয়। এমন কি উল্লেখযোগ্যের সংখ্যা অল্পই। তেমন অংশের মধ্যে পড়ে—"শিশুকাল হইতে, বন্ধুর সহিতে, পরাণে পরাণে নেহা। না জানি কি লাগি, কো বিহি গড়ল, ভিন্ ভিন্ করি দেহা॥" কিংবা স্বপ্ন-মিলনের খুশিতে চকিত বর্ণনাটি, যাহা চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সঙ্গে যদুনাথদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যায়—

পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেসর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিয়ল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মোছে।

শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বলে।

পদটি জ্ঞানদাসেরই, অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস, যেমন 'শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে' অংশভুক্ত পদটিও। তাহা ছাড়া যে পদটিতে রাধিকা কর্তৃক নিদ্রাবশে ননদিনীকে প্রিয়ভ্রমে আলিঙ্গনের কথা আছে, সে পদের এত সংখ্যক ঈষৎ ভিন্নরূপ জ্ঞানদাসের নামে পাওয়া যায় যে, মনে হয় জ্ঞানদাস পদটির মূল পর্যন্ত টান দিবার অধিকারী। পদটি বর্ণনার উৎকর্ষে না হউক, ঘটনারূপের দিক দিয়া কাম-বিবশতার প্রকৃষ্ট প্রকাশক। দেহার্তি এখানে পরোক্ষতায় বেশি ফুটিয়াছে। প্রিয়ভ্রমে রাধা যেখানে বৃক্ষাদি অপ্রাণীকে আলিঙ্গন করেন, সেখানে তিনি সাধিকা। যেখানে করেন দয়িত-দেহকে, সেখানে প্রেমিকা। কিন্তু তমালও নয়, কৃষ্ণও নয়, ননদিনীকে ভ্রমে জড়াইয়া ধরায় পদে আসিয়াছে অনুচিত মধুর শারীর শিহরণ। চণ্ডীদাস এই পদের দায়িত্ব না লইলেও পারেন।

তাহাতে চণ্ডীদাসের কিছু ক্ষতি হয় না—কয়েকটি হইলেও এমন কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদে চণ্ডীদাসের নিঃসপত্ন অধিকার আছে যে, রসোদ্গারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে তাঁহার আসন অবিচল।

রসোদ্গারিকার প্রথাগত চিত্রও চণ্ডীদাসের কাব্যে মেলে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত—

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখিগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলুঢুলু আলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে বুক।
দেখি সখী কহে কহ না দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা॥
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্ধা॥

পরিচিত চিত্র, তবু চণ্ডীদাস-ভাবান্বিত। আঁখি ঢুলুঢুলু অলস বিলাসিনীর সখীক্রোড়ে ঢলিয়া পড়াটি খুবই বাস্তব। তারপরেই সহসা কান্না,—'ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।' একি! সকলেই, নায়ক পর্যন্ত, ধাঁধায় পড়ে। কান্নার হেতু কবি বিশ্লেষণ করেন নাই, পাঠকের অনুমানের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। কারণটি, একালের রোমান্টিক পাঠক আমরা, সকলেই জানি—সুখের রীতিই এই। পূর্ণতার ভরাপাত্র সামান্য আন্দোলনেই উছলিয়া পড়ে। যে সুখ হৃদয়পাত্র পূর্ণ করে, সেই সুখই পূর্ণতার ভারে শিহরিয়া ওঠে—তাহাতেই তরঙ্গ—চোখ ছাপাইয়া, বুক ভাসাইয়া নামিয়া আসে। সুখের বুকভরা প্রশ্বাস ত্যাগকালে বিষাদের নিশ্বাস।

রসোদ্গারের অন্যান্য পদ বাদ দিয়া তিনটি পদ বিচারের জন্য লইতেছি। প্রতিভার পরিমাপক হইবার উপযুক্ত পদ তিনটি। 'আমি যাই যাই বলি'—প্রথম পদ। অনির্বাণ তৃষ্ণা কিরূপ স্নেহকোমলতায় পরিণতি লাভ করিতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত এখানে। চণ্ডীদাস জানিতেন, জীবনের সবচেয়ে গভীর ক্ষণ, মিলন-ক্ষণকে, ভাষায় ধরা যায় না। মানুষের ভাষা কী শীর্ণ আর সঙ্কুচিত। কবি তাই মিলনচ্ছন্দের মর্মস্পর্শ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া ঐ মিলনবৃত্তের চারিপাশে ব্যঞ্জনার রেখা টানিয়া গিয়াছেন। কুঞ্জের পথমুখী অভিসারী প্রাণকে একবার দেখাইয়াছেন, তারপর দেখাইয়াছেন প্রভাতে নিকুঞ্জ হইতে ব্যথাদীর্ণ নিরুপায় অপসৃতি। একদিকে আছে অভিসার-যাত্রার হৃদয়াবেগ, অন্যদিকে কুঞ্জভঙ্গের হৃদয়ভঙ্গ। অভিসার ও কুঞ্জভঙ্গ, মিলনকুঞ্জের বাহিরের দুই প্রগাঢ় প্রাণরেখা। ইহাদেরই আলোকে ও সঙ্গীতে অকথিত 'মিলন' পাঠকের কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। রাধা-কথিত দুটি কৃষ্ণচিত্রের দ্বারা চণ্ডীদাসের এই কবিপ্রয়াসকে বোঝা যায়। একটির উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, সঙ্কেতকুঞ্জে মিলনের সেই পদ—যেখানে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া কৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রাধার প্রতীক্ষায় আঙিনায় ভিজিতেছিলেন। দ্বিতীয় চিত্র পাইতেছি আলোচ্য পদে—প্রেমের অনন্ত অতৃপ্তি যেখানে প্রভাতেও নির্বাপিত নয়—যেখানে কৃষ্ণ—

আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্ব দেই কত দেই কোল॥

করে কর ধরিয়া শপথি দেই মোরে।
পুন দরশন চাহি কত চাপে কোরে॥
পদ আধ যায় পিয়া চাহে উলটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হৈয়া॥
নিগূঢ় পিয়ার প্রেম আরতি রহু বহু।
চণ্ডীদাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহু॥

রসোদ্গারের তিনটি পদ আলোচনা করিব বলিয়াছি। প্রথম পদের আলোচনা হইল। এইবার দ্বিতীয় পদ। ইহার সূচনার দুই ছত্র :—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥

কী অপরিসীম ভাষা! নিগূঢ়, স্পন্দিত। প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি চক্ষুর মত, আত্মাকে সুনির্মল স্বচ্ছতায় ভাষাময় করিয়া তুলিয়াছে।

এই পদের মূল কথা, 'অবধি না পাই'। নিরবধি আর নিরন্তর মানুষের প্রেম। জীবনও এতখানি জীবন্ত নয়, যতখানি এই প্রেম। জীবনের স্বাদ-হীন বর্ণহীন মুহূর্ত আছে,—প্রেমজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ—দীপ্ত! তাই প্রেম অশান্ত—যত জ্বলে আরো জ্বলার কামনায় আর্তনাদ করে। তাই প্রেম আশঙ্কিত—কোনো এক নির্বাপণের অঙ্গারকে সে যেন জানিয়াছিল, অগ্নিহীন অঙ্গারের সে চেতনা কী ভয়ঙ্কর! যদি তাহাই আবার ঘটে! অপূর্ব এই, চণ্ডীদাসের মত স্নিগ্ধ কবিও আতঙ্কিত আত্মার বাণীরূপকে জানিয়াছেন! তিনি সন্তারসে ডুবাইয়া একটির পর একটি ঘনরস শব্দ সাজাইয়া গিয়াছেন। পদটি সমগ্রতঃ এইরূপ :—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমেখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর প্রাণ যেন চলি যায়॥

সেকথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে সই সব পরমাণ॥

পদটিতে আতঙ্কিত আত্মার কথা বলিয়াছি; পদটির প্রকাশভঙ্গির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিন্তু ইহার মধুময় মন্থরতা। আসঙ্গলিপ্সার তীব্রতা এখানে একটি স্নেহময় প্রশান্তিতে পর্যবসিত। গাঢ় প্রেমে 'স্নেহ' আছে, 'কামের' মতই—তখন দয়িত বা দয়িতার অন্তর প্রিয়জনের প্রতি নিবিড় মমত্বে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই পদে যেখানে বিষয়-বক্তব্যে অস্থির উৎকণ্ঠার কথা, সেখানেও অন্তরের গাঢ়তার ভার কবির ভাষাকে অতিরিক্ত চঞ্চল হইতে দেয় নাই।

পদটির আবার দুটি ভাগ,—প্রথম চার ছত্রে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুত ও অদৃষ্টপূর্ব স্বভাবের স্তুতি করিয়াছেন রাধিকা। দ্বিতীয় চার ছত্রে রাধা আপনার প্রেমস্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। পদের প্রথম চার ছত্র আমাদের চমকিত করে। কৃষ্ণের প্রেমের যে অপূর্বতার কথা কবি কিংবা অন্য কেহ বলিতে পারেন, রাধা সেকথা বলেন কিরূপে? কৃষ্ণের যে প্রেমের বন্দনা রাধিকা করিতেছেন, সে প্রেমের নায়িকা তো স্বয়ং তিনি! তিনিই আহুতি-রূপে কৃষ্ণশিখাকে ঊর্ধ্বায়িত করিয়াছেন। সুতরাং এখানে কৃষ্ণের পিরীতির প্রশংসা করিলে তাহাতে পরোক্ষে আত্মপ্রশংসা করা হয়! এক অসাধারণ আত্মবিস্মরণের সহজতায় রাধিকা আত্মশ্লাঘার কটুতাকে এড়াইয়াছেন। দয়িতের গুণে রাধা একেবারে মজিয়াছেন। তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মবিলয় ঘটিয়াছে। কৃষ্ণের প্রেমাশ্রয় যে তিনি স্বয়ং—এ আত্মচেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া দয়িতের গুণগানে রাধাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা আত্মপ্রীতির রূপভেদ হইতে পারিত, তাহাই এ স্থানে নিঃশেষ আত্মলুপ্তির কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য।

রসোদ্গারে আমাদের আলোচ্য তৃতীয় পদটি কিন্তু যথার্থ রাধিকার রসোদ্গারের পদ নয়—পদাবলী সংস্করণে ইহার শিরোনামা 'শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমের তুলনা।' পূর্ব পদে আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে কবির কথা রাধিকা কিভাবে কাড়িয়া নিজেই কীর্তন করিয়াছেন। কবি কিন্তু পরাজিত হইবার পাত্র নন। তিনি জানেন, রসোদ্গারের উন্মাদনায় কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ে রাধা যেকথা বলিলেন, সে বক্তব্য রাধার নিজের প্রেম

সম্বন্ধে সমতুল সত্য তো বটেই, হয়ত অধিকতর সত্য। বর্তমান পদে অবশ্য কবি আপোষমুখী। তুলনায় রাধাপ্রেমের অধিকতর মাহাত্ম্য খ্যাপনের লোভ সংবরণ করিয়া যুগল প্রেমের গৌরব তিনি পরিশুদ্ধ ভাবনায় নিবেদন করিয়াছেন। আমরা পদটিকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত প্রেম সম্বন্ধে কবির রসোদ্গারের পদ বলিতে পারি। যথা—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনে মীন যেন কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট কবি-লক্ষণ উদ্ধৃত পদটি হইতে পাওয়া যায়। ইহার প্রথম চারটি ছত্র বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহাতে 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'-এর মত ছত্র থাকা সত্ত্বেও ইহাতে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা মানিয়া মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদানুভূতি প্রকাশের সচেতন চেষ্টা করা হইয়াছে—এমন বলিতে পারি না। কিংবা এমনও মনে করি না যে, কবি সাড়ম্বরে প্রেমের বিপরীত ধর্ম—মিলনের মধ্যে রহস্যময় বিরহ-বোধকে—প্রকাশ করার সচেতন চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সকল তত্ত্ব উদ্ধৃত অংশ হইতে মিলিবে না, এমনও বলিতেছি না। চণ্ডীদাসের সহজ গভীরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের ইচ্ছা, যাহা কৃষ্ণ-রাধার প্রেম সম্বন্ধে বলে, 'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।' তাই বলিয়া কি কবির বক্তব্য, এ প্রেম ঐশ্বরিক? তাও নয়। প্রেম মানবসমাজেরই, কিন্তু মানবসমাজে

অনন্ত। এই অনন্তত্ব জ্ঞাপনই কবির উদ্দেশ্য।) (এমন সাবলীল ভাবচ্ছন্দে চণ্ডীদাস তাঁহার গভীরতম কথাটি প্রকাশ করেন যে, তাহাতে তত্ত্ব-গ্রন্থন থাকে না, অথচ সর্বতত্ত্বের প্রাণালোক বিচ্ছুরিত হয়।) এই পদে কিছু কিছু আলঙ্কারিক কবি-দায়িত্ব পালনের চেষ্টা আছে। রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেম সম্বন্ধে যুগ্মপ্রেমসূচক প্রসিদ্ধিগুলি কবির মনে পড়িয়াছে,—ভানু-কমল, চাতক-জলদ, কুসুম-মধুপ, চকোর-চাঁদ। প্রসিদ্ধিগুলি প্রসিদ্ধ হইলেও কবি আবিষ্কার করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে তুলনায় সেগুলির দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা। অসম্পূর্ণতা দেখানোর জন্যই সেগুলির উল্লেখ। (কবির বলিবার ভঙ্গি হইতে বুঝিতে পারি, তিনি তুলনাগুলি করিবার সময় মোটেই স্বস্তি বোধ করেন নাই এবং পদের প্রথম দিকের রসময় ছত্রগুলির পরে পরবর্তী অংশ যথেষ্টই নীরস। পরবর্তী ছত্রগুলি আপেক্ষিক ভাবহানির দৃষ্টান্তরূপে অর্থাৎ কবিশক্তির পরাজয় রূপে সমালোচিত হইতে পারে। কিন্তু কবি নিজের আন্তরিকতার শক্তিতে অদ্ভুতভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য—'ত্রিভুবনে হেন নাহি।' অন্তরের মধ্যে ইহাকেই মাত্র তিনি সত্য বলিয়া জানেন। কিন্তু এও জানেন, কবির দায়িত্ব সত্যকে প্রতীয়মান করা, আরো যথার্থভাবে—অনুভূয়মান করা। তাই উপমার সন্ধান —উপমার ব্যর্থতা প্রমাণ করিতে। যে উপমার মণিসম্পদ বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের হাতে জ্বলিয়া উঠিত, চণ্ডীদাস সেগুলিকে উপেক্ষার মন্থর কণ্ঠে বর্ণনা করিয়াই শেষ কথাটি জানাইবার জন্য ব্যস্ত রহিলেন—'ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।')

বাসকসজ্জিকা-বিপ্রলব্ধা-মানিনী-খণ্ডিতা-কলহান্তরিতা

বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি পর্যায়গুলির একত্রে বিচার চলে। চণ্ডীদাসের কাব্যে ইহাদের গৌণমূল্যের জন্যই নয়, এগুলির ভিতর ভাবগত ও কালগত ঐক্য আছে বলিয়াও বটে। রসোদ্‌গারের (অন্য কবির কাব্যে মিলনের) আশেপাশে এই পর্যায় সকল ছড়াইয়া আছে। সব কয়টি পর্যায়ই নায়িকা-কেন্দ্রিক। নায়ক দূরে নয়, অথচ বাহুবন্ধনের বাহিরে—এই পীড়ায় আর্ত নায়িকার কখনো নৈরাশ্য, কখনো ক্ষোভ, রোষ, অভিমান, ব্যঙ্গ ও বেদনা। সব কিছুই কিন্তু লীলার অংশ। নায়কের অবিবেকী আচরণের বিপর্যয় অল্প পরেই মিলনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে। কারণ, বহুবল্লভেরও রুচি বা প্রীতির পক্ষপাত থাকে। কৃষ্ণ রাধার কাছে ফিরিবেনই।

বলা বাহুল্য ঐ পর্যায়গুলির উপর চণ্ডীদাসের কবিগৌরব নির্ভর করিতেছে না, করা সম্ভবও নয়—পদসংখ্যা এতই অল্প। বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা ও কলহান্তরিতার পদগুলি গতানুগতিক। কেবল মান ও খণ্ডিতা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলার আছে। চণ্ডীদাসের মানের পদ প্রায় মেলে না, * হয়ত এই কবির রাধার পক্ষে মান অসম্ভব ছিল বলিয়া। মান করিতে যেটুকু আত্ম-বুদ্ধির প্রয়োজন চণ্ডীদাসের রাধায় তাহার নিতান্তই অভাব। মান ও খণ্ডিতার পর দ্রুত কলহান্তরিতায় পৌঁছিয়া রাধা সুস্থ হন, কারণ সেখানে

* চণ্ডীদাসের নামে সংগৃহীত মানের অনেক পদ চণ্ডীদাসের না হওয়াই সম্ভব। চণ্ডীদাসের বহু পদে অনুভূতির একরূপতা সুতরাং বৈচিত্র্যহীনতা আছে। কিন্তু ঐ সকল অনতিগভীর পদেও একটি চণ্ডীদাসীয় কবিস্পর্শ পাওয়া যায়, কাব্যপাঠের পরিশ্রমকে যাহা পুরস্কৃত করে। সে সকল পদ প্রতিমুহূর্তে স্ফুলিঙ্গময় না হউক, পশ্চাদ্‌বর্তী অগ্নির অস্তিত্বকে কখনই ভুলাইয়া দেয় না। কিন্তু প্রতিভাহীনের রচনা ভিন্ন জিনিস। সেখানে কাব্যের ন্যূনতম আয়োজন—পাঠযোগ্যতারই অভাব। অকাব্যই নীরস। নীলমণি-(বসুমতী) সংস্করণে সঞ্চিত মান পর্যায়ের অকাব্য কখনই আমাদের আলোচ্য চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে না।

এই নিজস্ব কথাটি বলা চলে—'ছি ছি মানের লাগি শ্যাম বঁধুরে হারাইয়াছিলাম।' হরেকৃষ্ণ-সুনীতিকুমার সংস্করণে আক্ষেপানুরাগের 'যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু' পদটি ('আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'র মত বিখ্যাত পংক্তি যাহার অন্তর্ভুক্ত) মানের পদরূপে নির্দেশিত আছে। কিন্তু যদি ইহা মানের পদও হয়, তবু মান অপেক্ষা মানভঙ্গের ভাবই ইহাতে প্রধান; সম্পাদকদ্বয় তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"মানিনী রাধা দূতীকে যেন বলিতেছেন, এবারের মত ক্ষমা করিলাম" ইত্যাদি।)

(মান করিবার অক্ষমতা চণ্ডীদাসের রাধার বিশেষ ক্ষমতা।) সে দিক দিয়া বরং বাসকসজ্জা বা বিপ্রলব্ধার কিছু কিছু অংশ উল্লেখযোগ্য। যেমন—

পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখলো সজনী
বঁধুর শবদ শুনি॥

কিংবা—

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাছে না মিলিল কান॥

খণ্ডিতার পদগুলি সংখ্যায় কিছু বেশি ও আমাদের নিষ্কলুষ চণ্ডীদাস-বোধের কাছে অবাঞ্ছিত; এগুলি বিশেষ বিচারের অপেক্ষা রাখে। যে রাধা মানের ভার বহিতে পারেন না, তিনি এত ঝাঁঝালো গাল দেন কিভাবে? (খণ্ডিতায় ব্যঙ্গের সূচিকা, রোষের জ্বালা, ঘৃণার আতিশয্য, তিক্ততার চরম। রাধিকার বাচনিক গরলের রূপ দেখিয়া কবিকেও সন্ত্রস্ত হইয়া আপত্তি করিতে হইয়াছে।)

বর্ণনাভঙ্গিও যথেষ্ট চটুল। আমাদের আহত চণ্ডীদাস-বোধ কিছু শুশ্রূষা পায় একথা শুনিয়া যে, কয়েকটি বিখ্যাত পদে ভণিতান্তর আছে—সেগুলি চণ্ডীদাসের না হইলেও হইতেও পারে। পদ বা পদাংশ উদ্ধার করা যাক—

(১) আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর।
অধরে কাজল দিল কপালে সিন্দুর॥……
না এস না এস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥……
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি॥
—হরেকৃষ্ণ সং—৭১ (খ)

(২) ভাল হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
(খ পরিশিষ্ট—১৬)

(৩) ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজ ভাল॥
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥……
নীল কমল ঝামরু হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী রসনিধি পাঞা
নিঙাড়ে লয়েছে সেহ॥

(৪) ছেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥

বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ॥……
কপোলে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥

(৫) এস এস বঁধু করুণার সিন্ধু
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি
ভাল তো সুখেতে ছিলে॥

৬) আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
কপালে কলঙ্ক দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমনে গোঙারী॥……
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ার আসিয়া॥

(অতুলনীয় ব্যঙ্গ। মনে হয়, রোষ ক্ষমাহীন। নয়ানের কাজর যার বয়ানে লেগেছে—এমন একটি অপরূপ কৃষ্ণকে রাধিকা প্রণাম জানাইতেছেন। অবশ্যই সে কৃষ্ণ প্রণম্য—কেননা তাঁহার অত গুণ,—বড় সুন্দর একটি চাঁদ-মুখ, 'নয়ন ভরিয়া' যাহা দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে মুখ শুধু লোচনরোচন নয়, পবিত্রদর্শনও বটে—প্রভাতে দেখিলে 'দিন যাবে ভাল।' আবার নায়কটি বড় সরল, প্রায় নির্বোধ, সহজেই প্রবঞ্চিত হয়, কোন্ রসবতী না-জানি সুযোগ পাইয়া রস নিঙড়াইয়া ঝামর করিয়া দিয়াছে! তদুপরি তাহার পাইয়া হারাইবার দুঃখ, 'সে ধনী বিহনে কৃষ্ণের আঁখি ছল ছল।' আহা-হা, —রাধিকার প্রাণ না-সেয়ানা নাগরটির দুর্দশায় বড় কাতর হয়,—'কাছে বস, আঁচলেতে মুখানি মুছাই, বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।')

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এই শক্তি প্রতিভাহীনের অনায়ত্ত। খণ্ডিতা পর্যায়ে রাধার ক্রুদ্ধবচন (৪র্থ দৃষ্টান্তে) অপেক্ষা শান্ত বিদ্রূপের ক্ষেত্রে কবি-শক্তির অধিকতর প্রমাণ মেলে। নায়িকার অশ্রু বা রোষের ক্ষেত্রে নায়কের সুবিধা আছে,—নায়িকা সেখানে নিজের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে—তাই ক্ষমা

সংগ্রহ সহজতর। কিন্তু যেখানে রোষ অতি তীব্রতায় আপাত শান্ত, সেখানে রোষের সংযমে ফাটল ধরান বড় সহজ কথা নয়। খণ্ডিতা নায়িকার কাছে নায়ক সহজে ক্ষমা পাইবেন কিনা সন্দেহ।)

খণ্ডিতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ চণ্ডীদাসের লিখিতে পারার কারণ পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি,—দীর্ঘস্থায়ী মান-সহনের সামর্থ্য তাঁহার রাধিকার ছিল না। অথচ (রাধিকার জীবনে ক্ষোভের এত কারণ আছে! যে কৃষ্ণ বাসকসজ্জিতার রাত্রিকে ব্যর্থ করিয়াছেন এবং নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত পরবর্তী প্রভাতকে মলিনতর করিতে মথিত দেহে কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার উপর রাধিকা যেন নিজের শেষ শক্তিতে যত-কিছু অন্তর্দাহের গরল ছিল, ঢালিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, এর পরেই সেই নিঃশেষিত নারীটির নিরুদ্ধ ক্রন্দন কুঞ্জভবনের লতা-পত্রকে পর্যন্ত আর্ত করিয়া তুলিবে। চণ্ডীদাস চির ক্ষমাময়ী প্রেমবতী রাধার ক্ষণকালীন অন্তর্জ্বালার উদ্‌গিরণ-ক্ষেত্ররূপেই খণ্ডিতাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।)

কিন্তু কেবল ব্যঙ্গমুখে উৎকৃষ্ট ভাষায় রোষ-প্রকাশই খণ্ডিতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়; ঐ রোষ রাধার—চণ্ডীদাসের রাধার—যে রাধা ক্রোধের অধিকারে বঞ্চিত। (যেখানে তিনি আঘাত করেন, সেখানে শতগুণ আঘাত ফিরিয়া পান। সেই আত্মদংশনের যন্ত্রণা, একটা চাপা কান্নার মূঢ় আবেগ, আপাত নিশ্চিন্ত ব্যঙ্গভাষণের অভ্যন্তরে বোবা যন্ত্রণায় কাঁপিয়াছে। ভালবাসিতে পারিবেন না—ইহার চেয়ে অভিশাপ রাধিকার জীবনে আর কি আছে? কৃষ্ণের বিশ্বাসঘাতকতায় দীর্ণচিত্ত রাধিকা ভালবাসার সমাধির মত সর্বনাশ চাহিতেছেন! অথচ রাধার প্রেম সর্বজয়ী—দুঃখজয়ী, সুখজয়ী, আত্মজয়ী—প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তুচ্ছ হিসাবনিকাশের ঊর্ধ্বাঙ্গীণ নিত্যসিদ্ধি। কৃষ্ণের অনুচিত ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি অক্ষুব্ধ, তিনি মহীয়সী মহাভাবময়ী শ্রীমতী সীমন্তিনী। রাধা মথুরাপ্রত্যাগত কৃষ্ণকে সত্যই ব্যঙ্গহীন কল্যাণপ্রশ্ন করিতে পারেন—'দুখিনীর দিন দুখেতে গেল, মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল?' এমন রাধাকে প্রভাতেই ক্লান্ত-মলিন কৃষ্ণকে, নিশা-গ্লানির কারণে হইলেও, বিঁধিয়া বিদায় দিতে হইতেছে—সে কাঁটা রাধার বুকে ফুটিয়া আছে। খণ্ডিতার উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের শেষেরটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ-কাব্য,—সামান্য পরিবর্তনে করুণার অমৃতকাব্য হইতে পারিত।)

চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ

চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস। এতক্ষণ আমরা আক্ষেপানুরাগে পৌঁছিবার ভূমি প্রস্তুত করিয়াছি। পৌঁছিয়া দেখিতেছি, নূতন আর কিছু বলার নাই। পূর্বের সমস্ত বক্তব্যই আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে প্রযোজ্য। এখানে মাত্র দৃষ্টান্ত চয়ন করিয়া আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

পুনরায় স্মরণ করা যাক আক্ষেপানুরাগের বৈশিষ্ট্যগুলি,—ইহাতে আছে চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব, সমাজ-সচেতনতা, স্বতন্ত্র রসদৃষ্টি ও ধর্মবোধ। চণ্ডীদাসের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিয়া আলোচনার সূচনা করিয়াছিলাম। আক্ষেপানুরাগের আলোচনা সুরু হোক অন্য কবি হইতে স্বাতন্ত্র্যের পুনরালোচনায়।

স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি সমাজপ্রাধান্য। অপর বৈষ্ণব কবির অপেক্ষা চণ্ডীদাস অনেক বেশি মান্য করিয়াছেন লোকগঞ্জনা ও সামাজিক সংস্কারকে। সমাজ চায় না, গুরুজনে নিন্দা করে, ভুবনে কলঙ্ক ঘোষিত হয়, তবু প্রেম আনন্দের অক্ষয় উৎস। সংসার-মরুতে এই প্রেম ভিতর হইতে নিত্যতৃপ্তির রসসঞ্চার করে। তৃপ্তি অত গাঢ়, কারণ মরুভূমি অমন ভয়ঙ্কর। প্রেম যদি সমাজবিধিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিত, তবে আনন্দের আরতি-দীপটি অমন ভাবে জ্বলিত না। পরবর্তী বৈষ্ণব পদে চণ্ডীদাসের মত এতখানি সমাজ-মান্য নাই। নিশ্চয় সেখানে কুটিল লোকলোচনের কথা আছে, কিন্তু সে নয়নগ্লানিকে তুচ্ছতায় নিক্ষেপ করিয়া সর্বজয়ী প্রেমের গরিমা অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। প্রেমের সেই অপ্রতিহত সংশয়রহিত জয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ধর্মকাব্যের রূপকরূপে চিহ্নিত করে। সমাজ সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের আচরণ আরো মৃদু, কুণ্ঠিত ও ভীত। সমাজ চণ্ডীদাসের রাধার নিকট তুচ্ছ বা অগ্রাহ্য করার বস্তু নয়—একেবারে অসহ্য সময়টি ছাড়া। সেই মুহূর্তটি—সমাজসিংহের বিরুদ্ধে সশঙ্ক হরিণীর অশ্রুসজল দুঃসাহসী যুদ্ধঘোষণার ক্ষণটি—অপূর্ব ও অনন্ত; সেইক্ষণেই জীবনকাব্য—ধর্মকাব্য; সেইখানে সকল কাঁটা ধন্য করিয়া অমের প্রেমের রক্তগোলাপ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসাদর্শের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের একটি প্রতিনিধি-মূলক পদের সহিত চণ্ডীদাসের পদের পাশাপাশি তুলনা করিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইতে পারে।

গোবিন্দদাসের পদ—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ॥
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তঁহি এক মনোরথ যদি হয় অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস॥

চণ্ডীদাসের পদ—

যত নিবারয়ে চিতে নিবার না যায়রে।
আন পথে যাই পদ কানু পথে যায়রে॥
এ ছার রসনা মোর হৈল কি বাম রে।
যার নাম না লইব লয় তার নামরে॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবু তো দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥
তার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
চণ্ডীদাস বলে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

চণ্ডীদাসে বাঙালীর গৃহসংস্কারের প্রাধান্যের কথা বলিয়াছি। সংস্কার-বশে সমাজভীতি ও সতীত্ববোধ রাধার জীবনে দৃঢ়মূল। সতীত্ব, স্বামী-প্রীতি না হোক, অন্ততঃ স্বামী-ভীতি। এদিকে বাহিরে টান দিতেছে কানুপ্রেম। ঘরের সঙ্গে বাহিরের টানাপোড়েন যত তীব্র, সেই মর্মান্তিক বিরোধের সংঘর্ষে রাধাহৃদয়ে ততই রক্তপাত। ঐ রক্তবিন্দুগুলি প্রেমপ্রতিমার 'ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার'। চৈতন্যোত্তর রসাদর্শে সঞ্জীবিত গোবিন্দদাসাদিতে অবশ্যই গৃহসংস্কারের বন্ধন অমন সুকঠিন নয়। রাধা যে, সব ছিঁড়িয়া পথে নামিয়াছেন, এই আনন্দেই কবি উল্লসিত। রাধিকার যাহা কিছু দুঃখ—সে পথে নামিয়াও পথের কৃষ্ণকে না পাইবার জন্য। অপরপক্ষে চণ্ডীদাসের রাধাকে ঘর ছাড়িতে একবার কাঁদিতে হইয়াছে; তাঁহার দ্বিতীয় ক্রন্দন কৃষ্ণের প্রবঞ্চনায়। এই দুই কান্নায় বদ্ধ চণ্ডীদাসে হাসির অবসর চিররুদ্ধ। চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদ দুইটি দুই বিভিন্ন চরিত্র লইয়া উপস্থিত। গোবিন্দদাসের রাধা এই পদে কী খুশী—খুশীতে উচ্ছ্বসিত—কারণ তাঁহার ইন্দ্রিয়পথে কৃষ্ণপ্রবেশ ঘটিতেছে। বন্ধনে এত সুখ! রূপে নয়ন পূর্ণ, স্পর্শস্মৃতিতে রোমাঞ্চপূর্ণ দেহ, মোহন মুরলীতে শ্রবণ পূর্ণ আর নাসিকা পূর্ণ দেহসৌরভে। এ রাধিকার কাছে ধর্মের বা আত্মসংযমের উপদেশ নিতান্ত ব্যর্থ, কেননা উন্মত্ততা চিরদিনই যুক্তিহীন,—সম্ভবতঃ 'ধর্মহীন'। তাই গোবিন্দদাসের রাধা বলেন,—'তনু মন মাতল, না শুনে ধরম লব-লেশ' এবং 'গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে, অন্তরে উপজয়ে হাস।'

গৌড়ীয় রসাদর্শের সমর্থনে গোবিন্দদাসের রাধা ঐরূপ লোকধর্মহীন উন্মত্ত। প্রমত্ত রাধিকাকে চণ্ডীদাসেও পাইনা তাহা নয়, কিন্তু সে একটা অনুভূতির চরম অবস্থায়। তার পূর্বে ঐ চরমতা লাভের পথে, সংস্কার-রাহিত্যের ক্লেশকঠিন সংগ্রামের কথা চণ্ডীদাস বারবার জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদে যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তার পরাকাষ্ঠায় রাধিকার পরমোল্লাস, চণ্ডীদাসের রাধা যেখানে অবাধ্য ইন্দ্রিয়ের বিপরীত ব্যবহারে গ্লানিক্ষুব্ধ। কৃষ্ণমুখী নিজের সর্বাঙ্গ—রসনা, নাসিকা, শ্রবণ—প্রাণ ও মনকে নিবারণের কত চেষ্টা রাধা করেন, সেই আপ্রাণ চেষ্টার শোচনীয় বিফলতা একটি লজ্জিত ও পরাজিত আত্মধিক্কারের মধ্যে ফুটিয়া ওঠে,—'ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥'—ইহা পরাজয়, তবু এ পরাজয়

সূক্ষ্ম সুখের স্বাদময়। গোবিন্দদাসের উন্মুক্ত আনন্দের বিশাল স্বাচ্ছোর নিকট এই ক্ষীণতনু সুখানুভূতিটি তপঃকৃশ, তথাপি প্রাপ্তির গোপন সঞ্চারে পুলকপূর্ণ।

আলোচ্য পর্যায়ের নাম 'আক্ষেপানুরাগ', প্রত্যাশার অপূরণ-জনিত ক্ষোভ তাই ইহার বিষয়বস্তু। অহেতুক প্রেমে প্রেমই একমাত্র প্রত্যাশা। কিন্তু প্রেম বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তি হইলেও ঐ হৃদয় দেহাধারে ধৃত, সমাজপীঠে স্থাপিত, বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা বেষ্টিত। প্রেমকে প্রকাশ করিতে গেলে তাই সর্বপ্রকার আধারসহিত প্রকাশ করিতে হয়। আক্ষেপানুরাগে রাধিকার প্রেমনৈরাশ্য বর্ণিত, ঐ নৈরাশ্য অবশ্যই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘর্ষের ফল। একদিকে আছে রাধিকার অসংবৃত অপরিণামদর্শী অন্তর ও প্রবঞ্চক প্রেমিক; অন্যদিকে বিরূপ সমাজ। ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে রাধার আক্ষেপ। সেই আক্ষেপকে নানা ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সঙ্কলকদের মতানুসারে সেগুলি যথাক্রমে—প্রিয়-সম্বোধনে, বংশী-নিন্দনে, স্বগত-কথনে, সখী-সম্বোধনে, দূতী-সম্বোধনে, বিধাতৃ-নিন্দনে, পিরীতি-গঞ্জনে, গুরুজন-নিন্দনে। প্রধান 'গঞ্জনা'গুলির কিছু আলোচনা করিব।

প্রিয়সম্বোধনে—

কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ :—

অনাথীর প্রাণ করে আনচান
দিনে কতবার মরি॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমারি তুলনা তুমি।

*

শয়নে স্বপনে বন্ধু ওই ওঠে মনে।
পরাণ কেমন করে পরাণ সে জানে॥

*

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমন ভ্রমর-রীত।

*

চরণে শরণ নিলাম, না বাসিহ ভিন।
একেত অবলা জাতি পরের অধীন॥

প্রিয়-সম্বোধনের মধ্যে একদিকে অনুনয়, অন্যদিকে অভিযোগ। নায়কের স্বভাব এবং নিজের লুব্ধতা সমালোচনার বস্তু। দোষ না করিয়াও যেখানে শাস্তি পাইতে হয়, সেখানে অবশিষ্ট থাকে অনুতাপ ও আত্মগ্লানি। নায়িকা বুঝিতেছেন, ভ্রমর-রীত নায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্ফল। একদিন যদিও নায়ককে অমূল্য ও অতুলনীয় মনে হইয়াছিল—নায়কের মুরতি শয়ন-স্বপনের সাথী ছিল—সে প্রেমের মোহলগ্নে। তারপর দগ্ধ বাস্তবে জাগরণ: ভুল, ভুল, সকলই ভুল। আত্মদংশনে এখন যদি কিছু অন্তর্জ্বালার নিবারণ হয়—'সকলি আমার দোষ হে বন্ধু।' পরিশেষে অভিমান গলিয়া আত্মসমর্পণ—'চরণে শরণ নিলাম।'

প্রিয়-সম্বোধনের শ্রেষ্ঠ পদ—চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণব কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ পদ এইরূপ :—

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে বন্ধু বলি॥
বন্ধু যদি তুমি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

ক্লান্ত করুণার অপরূপ কবিভাষা। প্রথম দুই ছত্রের মূর্চ্ছাপন্ন অনুযোগের পর রাধিকার প্রেম আত্মপরিচয় দিতে গিয়া এমন দিব্যশক্তি লাভ করিল,

যাহার ফলে পরবর্তী চারিটি ছত্র ('ঘর-কৈনু বাহির' ইত্যাদি) উন্নীত হইল নিখিল প্রেম-সাধনার অমৃতকাব্যে। ঘর ও বাহির, আপন ও পর, দিবস রাত্রির ব্যবধান মুছিতে পারে প্রেম—কিন্তু প্রেম আপনাকে মুছিতে পারে না। প্রেম সব দেখিতে পায়, আপনাকে ছাড়া, নয়ন সব দেখে নয়নটি ছাড়া। তাই স্বয়ং পিরীতি-প্রতিমাও বলে—"বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।"

ঐ চারি ছত্রের মহাবাক্য উচ্চারণের পর আবার বিষাদাচ্ছন্ন কণ্ঠ—'এমন ব্যথিত নাই ডাকে বন্ধু বলি।' আমার তো মনে হয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে 'ঘর কৈনু বাহির' প্রভৃতি গৌরবময় চারি ছত্রের মূল্য যতই হোক, বর্তমান পদে সেগুলি ঈষৎ আতিশয্যপূর্ণ, তাঁহাদের অতিরিক্ত উদ্দীপ্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে পদের সুকুমার ভাবদেহকে। বেদনাম্লানতাই এ পদের মূল ভাব, তার মধ্যে ঐ তপস্যাধন্য আত্মকথন প্রয়োজনের তুলনায় উচ্চকণ্ঠ।

সত্যই রাধিকা যেন কি! "হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়"—তাঁহার কঠিনতম দিব্য, আমার যেমতি হয়, তেমতি হউক সে"—নিষ্ঠুরতম অভিশাপ, "মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও"—প্রিয়তমকে কঠিনতম শাস্তি!!—এই অবলা নারীটির সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভাব দেখিয়া মন করুণায় ভরিয়া যায়। অমন দুর্দান্ত অভিশাপ আর শাস্তির বহরে পৃথিবীর ঝুনো বুদ্ধি অট্টহাস্য করিবে—বোধহয় যাহাদের বিরুদ্ধে সেগুলি নিক্ষিপ্ত—তাহারাও। প্রেমের পরাজয়ে আমাদের মন ক্লিষ্ট, ম্রিয়মান। কিন্তু এই সাংসারিক পরাজয়টি কত বড় বিজয়ের স্মারক! না জানি, সে কোন্ শুদ্ধতম হৃদয় হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে, যে আঘাতের আঘাত বুঝিতে পৃথিবীকে তপস্যা করিতে হয়! প্রেম সোনা করে মানুষকে, তখন তার ক্রোধ সোনার তরবারির আন্দোলন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সোনার তরবারিতে হিংসা করা যায় না।

বংশী নিন্দনে—

বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাবান্বয়িকতার শক্তিশালী দৃষ্টান্ত মেলে বংশী ব্যাপারে। কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের দর্পিতা চন্দ্রাবলীরাহী কোনদিন 'গমার রাখোয়ালের' নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে স্বেচ্ছায়—ইহা যেন একেবারে অবিশ্বাস্য! সেই রাহীই যখন কৃষ্ণকামনায় আর্তনাদ করিতে

লাগিল, ভাবিয়া পাইলাম না কিসের আকর্ষণে ? আমাদের সংশয়-ভঞ্জনের জন্ম কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শ্রেষ্ঠশক্তি অতিখ্যাত পদটি কবি তাঁহার কাব্যে যোজনা করিয়াছেন,—'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নঈ কূলে' পদটি। রাধার রূপান্তরের জন্ম বাঁশীই দায়ী। সব কিছু এড়ান যায়, কিন্তু সর্বগামী বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যখন বাঁশীর আক্রমণ সুরু হয়, তখন—অন্য কিছু না হউক, রাধার প্রাণটি যায় এবং বড়ু চণ্ডীদাসের একটি ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের দু'একটি উচ্চাঙ্গের পদের সৃষ্টি হয়।

বাঁশীর টান—'টান' শব্দটি অব্যর্থ প্রয়োগ—আক্ষরিকভাবে সত্য চণ্ডীদাসের বংশীমূলক পদবিষয়ে। জ্ঞানদাসের রোমান্টিক বাঁশী কিংবা গোবিন্দদাসের মুরলী নয়—বিশুদ্ধ বাঁশের বাঁশী, প্রাণের শিকড় ছিঁড়িয়া অশক্ত অবশ দেহটিকে যাহা অভিরুচিমত নাচাইয়া ফেরে। অবস্থাটি প্রমাণ করিতে চণ্ডীদাসের উপমায় প্রাকৃতিক শক্তি—"কেশে ধরি লইয়া যায় শ্যামের নিকটে। পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥" তরল বাঁশের বাঁশীতে এই বর্বরতার বল চণ্ডীদাস দেখিয়াছেন। এর নাম বিশুদ্ধ ডাকাতি, আধ্যাত্মিক হইলেও—যখন বিষম বাঁশী 'ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়।' যেন নিতান্ত বিদ্বেষের বশে রাধা বলেন,—'সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মন। শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥' বাহিরে সরল, অন্তরে কঠিন বাঁশীর বিরুদ্ধে রাধার ক্ষমাশূন্য কামনা—'যে ঝাড়ের বাঁশী তুমি তাহার লাগি পাও। ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥' কিন্তু কবি জানেন কিছুতেই কিছু হয় না, 'প্রাণ নিল বাঁশী'ই শেষকথা। সর্পদংশনে যেমন অবধারিত মৃত্যু, বংশীদংশনে তেমনি বা ততোধিক,—"বাঁশীয়া দংশিল তোমায়, আমি করি কি ?" 'বাঁশীয়া' শব্দটি অর্থচ্ছুরিত, কবি ও রাধার গরলানুরাগের দংশনে শব্দটি রস-বিষাক্ত।

বংশীমূলক শ্রেষ্ঠ পদটির প্রথমাংশে আছে বংশীশ্রবণে আত্মহারা রাধিকার সমাজের সঙ্গে আপোষরক্ষা করার শেষ প্রয়াসের বিবরণ—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিন কাঁদি তবু হাসি লোক লাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥ ইত্যাদি

এখানে লক্ষণীয়, যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে বাঁশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন বাঁশী সত্যই জীবন্ত কিছু। বাঁশী যে জড়, তাহাকে যে বাজান হয় ইচ্ছামত, যে বাজায়, সেই যন্ত্রীরই ভূমিকা বেশি,—রাধা তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত। রাধার গৃহবদ্ধ জীবনে বাঁশীই প্রবলতম শমন-সত্য। ইহাতে প্রমাণ হয়, প্রেমের জগতের বাস্তবতা আমাদের পরিচিত বাস্তবতা হইতে ভিন্নতর, চেতন-অচেতনের ভেদরেখা সেখানে লুপ্ত। কামোন্মাদ যক্ষ এবং প্রেমোন্মাদ রাধায় সূক্ষ্ম তারের ব্যবধান। জড় বাঁশীর উপর রাধার আত্মবিস্মৃত আক্রমণ তার সাক্ষ্য।*

স্বগত-কথনে

অন্তের সমক্ষে করা হইলেও আক্ষেপ বস্তুটি চরিত্রে ব্যক্তিগত। তাই যদি হয়, আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের মধ্যে 'স্বগত-কথনে' এই বিশেষ অংশভাগ কেন? ভাগ না করিলেও চলিত। তবে এমন কিছু কিছু আক্ষেপানুরাগের পদ আছে, যেখানে নায়িকা আক্ষেপকালে নায়ক বা সখীদের সামনে পান নাই। সেখানে তাঁহার একান্তে অনুতাপ। সেগুলিই স্বগত-কথনের পদ।

স্বগত-কথনের মধ্যে দুটি আক্ষেপ বিশেষ প্রাধান্ত পাইয়াছে,—প্রথম, দেশে আরো আরো কীর্তি-নন্দিনীরা থাকিতে শুধু রাধাকেই বা দোষী করা কেন? দ্বিতীয় প্রেমের ব্যাপারে সমাজ হস্তক্ষেপ করে কেন? অর্থাৎ কার্যতঃ প্রেমের ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবি। প্রথম আক্ষেপটি স্পষ্ট; দ্বিতীয়টি ইঙ্গিতে মাত্র। যথা—

> ঘরে পরে কি না বলে করিব হায় কি।
> কে বা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥

* বাঁশির টান যে কী টান, মুসলমান কবি চাঁদ কাজির দুত্র দুইটি হইতে বুঝি—

> ও পার হইতে বাজাও বাঁশী এ পার হইতে শুনি।
> অভাগিয়া নারী হে সাঁতার নাহি জানি॥

তবে কি রাধা সাঁতার না জানার জন্য নদীকূলে থামিয়া পড়িবেন? কদাপি নয়, নদীতে ঝাঁপ দিবেন ও ডুবিবেন। উক্ত দুর্ঘটনা নিবারণে আমাদের দুটি মাত্র ভরসা—এক, প্রেম-নদীতে কেহ ডুবিলে সে অমর হয়; দুই কাণ্ডারী কৃষ্ণ ডিঙে বাহু বাড়াইয়া আছেন।

গোকুল নাগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥

*

সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমতি না হয় কারে।
এ পাপ পড়শী ডাকিনী সদৃশী
সকল দোষয়ে মোরে॥

উদ্ধৃতিগুলিতে অন্য অন্যায়কারিণী থাকিতেও কেবল রাধাকে দোষারোপে ক্ষোভ। রাধা এখানে কুপিতা মানিনী। প্রেমের ব্যাপারে ব্যক্তিমুক্তির অস্ফুট চেতনা এই ছত্রদ্বয়ে মিলিতেছে—

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন নিল কোন পাকে গো॥

আক্ষেপের ভঙ্গি বাঙালী বধূর, সম্ভবতঃ অন্যাসক্তার কণ্ঠাহৃত। অন্যের দোষ দেখাইয়া নিজ দোষ লাঘবের করুণ প্রযত্ন।

স্বগত-কথনের আর একটি প্রধান ভাব নিঃসঙ্গ-সহনের। সখী-সম্বোধন প্রসঙ্গে তার আলোচনা করিব।

সখী-সম্বোধনে

সখী-সম্বোধনের নিম্নলিখিত পদটি উল্লেখযোগ্য—

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥
গড়ন ভাঙিতে সই আছে কত খল।
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদ মুখে হাসি হেরে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥

নিজস্ব-ভাবে রাধা একটি মহাসত্য বলিয়াছেন—ধ্বংসের শক্তিই সুলভ, সৃষ্টিশক্তি বিরল। প্রেম বড় সুকুমার; অনেক অঞ্চলের আশ্রয়ে, হৃদয়ের

লালনে তাহাকে রক্ষা করিতে হয়,—তাহার স্বভাব 'তিলে জনি টুটে।' এ হেন প্রেমের ধ্বংসকারীরা মধুরের শত্রু, সুন্দরের সংহারক, সুতরাং বিশ্বছন্দের বিনাশক। ইহারা যে কোনো অভিশাপের যোগ্য।)

রাধিকা বিশ্বসত্যকে যেমন নিজের বিশেষ মানসিক অবস্থার রঙ দিয়াছেন, তাঁহার অভিশাপের ভাষাও একেবারে তাঁহারই নিজস্ব—'হায় নারী অবলার বধ লাগে তায়।' কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর একটিকে মারিয়া আদি কবির শাপে নিষাদ মানবমন হইতে শাশ্বতকালের জন্য ভ্রষ্ট হইয়াছিল। (রাধিকার শেষ ভরসা, জগতে নিষাদবৃত্তি হয়ত কিছু কমিয়াছে, হয়ত 'নারী অবলার বধ লাগে তায়'-এর মত দিব্য দিবার পরে, খলেরা যত বড় খলই হউক, সত্যই প্রেমমোহিত রাধিকাকে বধ করিবে না।)

আর একটি পদেও ('কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে') রাধিকার প্রেমমাহাত্ম্য প্রকাশিত। (সেখানে কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার মনে কৃষ্ণের বর্ণানুষঙ্গী সমস্ত জিনিস কৃষ্ণস্মৃতি জাগাইতেছে। সাধারণ প্রেমের সঙ্গে রাধাপ্রেমের পার্থক্য এইখানে,—সাধারণ প্রেমে ব্যবধান বিস্মৃতি আনে, রাধার বড়ো প্রেমে আনে বিশ্ববিস্তৃতি। প্রিয়তম নিকটে থাকিলে সর্বেন্দ্রিয়, মনপ্রাণ তাঁহার দ্বারা গ্রস্ত; যখন দূরে, তখন তাঁর রূপের স্মৃতিতে প্রতিটি দৃষ্ট বস্তু কম্পিত; প্রতিটি তৃণশীর্ষ পর্যন্ত প্রিয়মূল্যে অর্থপূর্ণ। তাই কৃষ্ণস্মৃতি পরিহারের সব চেষ্টাই ব্যর্থ চেষ্টা,—পরিত্রাণ নাই। শ্যাম-শেলে আহত শ্রীমতীর জন্য একটি পরম শ্যামমৃত্যু অপেক্ষমান—"চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান। নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥")

সখী-সম্বোধনের অন্যান্য পদগুলি কাব্যগুণে বিচার্য না হোক, চণ্ডীদাসের মর্মসন্ধানে সেগুলি মূল্যবান। সখীদের সম্বন্ধে রাধার ও কবির মনোভাব এখানে উদ্‌ঘাটিত। এই মনোভাবের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সখীবিষয়ক মনোভাবের পার্থক্য আছে। (গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বাদর্শে সখীর প্রাধান্য সর্বথা স্বীকৃত। রাধার সখীরা মধুর রসের রসিকা। তাঁহারা বৃন্দাবনের গোপী, তাঁহাদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসবিহারের ভাগবত-বর্ণনা বহুল পরিচিত। বৃন্দাবনীয় ভাবাদর্শে রচিত চৈতন্যচরিতামৃততে সখীদের বিষয়ে বলা হইতেছে,—তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেয়সিগণের শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরকীয়া নায়িকা। অবশ্য চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবের সখীধারণায় নূতনত্বও আছে। সখীরা

কৃষ্ণের প্রেয়সী হইবার অধিকারিণী হইলেও সে অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন। এইখানে আত্মবিলোপী প্রেমের নূতন ব্যাখ্যা পাইতেছি। সখী-রূপ মধুর রসিকারা গোস্বামীকথিত 'প্রেম'-সংজ্ঞার বিশুদ্ধতম বিগ্রহ। প্রেমের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' প্রেমের প্রতিপক্ষ (?) কাম, যা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা। কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রীতি মহাভাবময়ী রাধিকার সঙ্গে প্রেমে ও সঙ্গমে। সুতরাং সখীরা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ দিতে রাধার সঙ্গে তাঁহার মিলনে সহায়তা করেন। সখীদের প্রত্যক্ষ দেহবাসনা সম্পূর্ণ উৎসাদিত; তাঁহারা কুঞ্জপথের দূতী, ফুলসজ্জার মালিনী, শয়ন-মন্দিরের প্রহরিণী এবং নিশিভোরের সুখসারী; তাঁহারা দুঃখনীতের অগ্নি-শুশ্রূষা এবং আনন্দ-বসন্তের কুঞ্জকোকিলা; কিন্তু কদাপি কামনার প্রতিদ্বন্দ্বিনী বা ঈর্ষার সর্পিণী নন। এ হেন সখী-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর প্রশস্তিবাক্য মোটেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ নয়—

> সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
> কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
> কৃষ্ণসহ রাধিকার, লীলা যে করায়।
> নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
> রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা।
> সখিগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥

এখন স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের সখীর সঙ্গে চণ্ডী-দাসের সখীর চরিত্রগত পার্থক্য আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই সখী-পরিকল্পনাতেও চণ্ডীদাস গৌড়ীয় শাস্ত্রলক্ষণের বাহিরে ছিলেন। তাঁহার কাব্যে সখী-ভূমিকার অপেক্ষাকৃত অপ্রাধান্যই দেখিতে হয়। নিশ্চয় শ্রীরাধার সখী বলিয়া কবি যখন ঘোষণা করিয়াছেন, তখন সুমিত্রাদের আচরণে বন্ধুকৃত্যের পরিচয় মিলিবে। আমরা দেখিব, চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধিকা 'প্রাণ প্রিয় সই' বলিয়া সখীদের সম্বোধন করিয়াছেন, 'তেঁই সে তোমারে কই' বলিয়া সখীর নিকট হৃদয় খুলিয়াছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম-ব্যবস্থাপনাতেও সখীদের নিশ্চয় কিছু অংশ ছিল। কেননা বিরহাবস্থায় রাধিকা সখীদের বলিয়াছেন—'না বল না বল সই সে কানুর গুণ' কিংবা 'আপনা খাইয়া সখীর বচনে তা সনে করিনু প্রেম।'

সখীরা এত করিলেও বলিব, সাধারণ বান্ধবী-কৃত্যের অধিক কিছু করেন নাই এবং তাঁহারা কোনোমতে অধ্যাত্মসাধনার সমপ্রাণা সঙ্গিনী নন। আমার উক্তি যথেষ্ট সাহসিক, ইহাকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণের দায়িত্ব আমারই। প্রথমেই বলা চলে, চণ্ডীদাসের রচনায় সখীদের সম্বন্ধে রাধার প্রশংসার অপেক্ষা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনুযোগ অল্প নয়, হয়ত বেশি। 'প্রাণের অধিক' হইলেও তাঁহারা কোনোদিনই রাধার আত্মার সঙ্গিনী নন। রাধার প্রাণের নিভৃততম কক্ষ তাঁহাদের নিকট চিরকালই দ্বাররুদ্ধ। রাধার আনন্দবেদনা রাধারই, তাহা এত তীব্র ও ব্যক্তিগত যে, সমবেদনায় তাহাকে লাঘব করা সখীদের অসাধ্য। রাধা বারবার আক্ষেপের সঙ্গে মর্মভাবিনীর অভাবের কথা বলিয়াছেন। কেবল প্রেমিক বা পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে নয়, সখীদের বিরুদ্ধেও রাধার আক্ষেপ। পূর্বে আলোচিত স্বগত-কথনের মধ্যেও এই নিঃসঙ্গ সহনের ভাব,—আমার দুঃখের মর্ম কেউ বোঝে না,—এই অনুযোগ। যথা :—

কাহারে কহিব মনের মরম কেবা যাবে প রতীত

*

মনের মরম জানিবে কে

*

কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত
এ দুঃখ কহিয়ে কারে।

*

কাহারে কহিব কেবা পিত্যাইব
কে জানে মনের দুখ।

প্রাণ-সঙ্গিনীর অভাবজ্ঞাপক এই সকল আক্ষেপ রাধা বিরলে করিয়াছেন, 'স্বগতকথনে'। ইহাদের দ্বারা রাধার মানসিক নিঃসঙ্গতা পরিস্ফুট। এতো গেল স্বগতোক্তির কথা, যখন রাধার কাছে সম্ভবতঃ কেহ নাই। এ ছাড়াও যদি দেখি রাধা সখী-সমক্ষেও একই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তবে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। তেমন অংশ আছে। দুঃখ বুঝিবার কেহ নাই, প্রাণের ভার নামাইবার ঠাঁই নাই—এমন অভিযোগ সখীদের সামনেই রাধা করিয়াছেন। যদি বলা হয়, সেগুলি অভিমানসঞ্জাত, যে যত প্রিয় সে তত অনুযোগভাজন,—সে ক্ষেত্রে ঐ অনুযোগের প্রকৃতি

সম্বন্ধে কিছু মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। রাধিকা সখীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনিয়াছেন—সখীরা তাঁহাকে 'ধরম' শিক্ষা দিতেছেন, যে ধর্ম কুলধর্ম ও গৃহধর্ম—পরকীয়া প্রেমের স্বভাবনাশক সতীধর্ম। যথা—

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি সে কালারবরণ॥

*

যুক্তি যদি বলেঁ পাসরোঁ কান
মন সে না লয়ে আন।

*

কি আর বুঝাও ধরম বিচার
মন স্বতন্তর নয়।

এবং সখীদের সামনে রাখিয়া যেভাবে রাধিকা অপর মানুষের সহানুভূতি-হীনতা, অ-মর্মগ্রাহিতা বিষয়ে অনুযোগের পর অনুযোগ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ অভিযোগের পরোক্ষ লক্ষ্য সখীরা নন কিভাবে বলিব? যদি আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সেগুলি করা হয়, তবে বলা যায়, নিশ্চয় রাধা তাঁহার বেদনা-সহনে সাহচর্য পান নাই এবং তাহার জন্য নিগূঢ় অভিমান আত্মবিস্মরণকালে অজান্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সখী-সম্বোধনের পদগুলিতে রাধিকা যে ধরনের উপমা-উৎপ্রেক্ষার দ্বারা নিজ দুঃখের শতকথা কহিয়াছেন, তাহাতেও—ঐ বর্ণনা-ভঙ্গীতেও—পরোক্ষ অনুযোগ আছে। মর্মজ্ঞাতার কাছে দুঃখের ফিরিস্তি সাধারণতঃ এভাবে পেশ করা হয় না। কিছু বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত লওয়া যাক,—

একটি পদের আরম্ভ—

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বেদনা যে জন জানয়ে
পরাণ বাঁটিয়া দি॥

আর এক পদের আরম্ভ—

হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।

মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥

অন্য একটি পদের অংশ—

দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়িল
এ দুখ কহিব কাকে।

অনুরূপ অংশ—

বড়ই বিষম সই বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহি যে মরম ॥

এবং অন্যত্র—

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে ॥
(জ্ঞানদাসের ভণিতান্তর আছে এই পদে)

সখীদের এই পিরীতি-প্রতিবন্ধকতা এবং কুলশীলের পক্ষে প্রচারের বিরুদ্ধে রাধিকার চরম আঘাত যে পদে আছে, জ্ঞানদাসের ভণিতান্তর সত্ত্বেও, পূর্ব আলোচনার পটভূমিকায়, সে পদের চণ্ডীদাসত্ব ঘুচে নাই। সখীদের সঙ্গে নিজ স্বভাবের মৌলিক পার্থক্যও রাধার বক্তব্যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গমুখে সুস্পষ্ট :—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দুখানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বন্ধু বিনা
আর কেহ মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিধি ঘটায়ল মোরে।

তোমরা কুলবতী দেখিলুঁ যুকতি
কুল লইয়া থাক ঘরে॥

পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবের কাছে 'ধরমে'র চেয়ে বড় অধর্ম নাই এবং কুলপ্রীতির চেয়ে কলঙ্ক নাই।

উপরে বিশ্লেষিত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সেখানেও শ্রীরাধার প্রেমাবস্থা অনুধাবনে সখীদের নিতান্তই অসামর্থ্য। (রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা',—'রাই এমন কেন বা হৈল',—'কোথা বা কি দেব পাইল',—এই সব কথার দ্বারা সখীরা রাধার অবস্থা লইয়া প্রভূত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। রাধার মর্মসাথী, প্রেম-সহায়িকা ব্রজগোপী সখীদের বিস্ময় যেন সীমা ছাড়াইয়াছে। এবং—'বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা, কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা', ইত্যাদি উক্তিতে সাধারণ সামাজিক সংস্কারের পোষকতা তাঁহারা করিয়াছেন।)

এত বলিবার পরেও, একথা বলা চলে, কুলধর্মের প্রতি সখীদের সপক্ষতা রাধার প্রতি প্রেমবশে। সখীরা জানেন, অবৈধ প্রেমের কি দুঃখ। রাধাকে নিবারণ করা তাঁহাদের দায়িত্ব।)সবিনয়ে তাহা স্বীকার করিয়া বলিব, আমাদের বক্তব্যও তাই। কেবল যোগ করিব, (সখীদের নিষেধ রাধার প্রতি প্রেমবশে তো নিশ্চয়, লোকসংস্কারের প্রতি আনুগত্যেও বটে। লোকসংস্কারকে যেখানে চণ্ডীদাসের রাধা স্বয়ং স্বীকার করেন, সেখানে সখীরা অস্বীকার করেন কি ভাবে? অবশ্য কুলমুক্ত প্রেমকে সখীরাও প্রণাম করিয়াছিলেন, তবে অনেক বিলম্বে।)

(তাছাড়া চণ্ডীদাস যে ভাবের ভাবুক, সেই সহজিয়া সাধনায় প্রেমের ঐকান্তিক নিভৃতিই বৈশিষ্ট্য। তার বড় গোপ্য প্রকৃতি। রসিক ছাড়া সে রস কেউ বোঝে না, আর রসিক 'কোটিকে গোটিক'।) সব বড় প্রেমই তাই। ভাব আস্বাদনে অন্তরঙ্গ চাই। (চণ্ডীদাসের নিজ ভূমে রসিকের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত মাত্র দুই—প্রেমিক এবং প্রেমিকা। চণ্ডীদাসের নিজ জীবনে চণ্ডীদাস-রামী। কবি-জীবনে রাধা-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-প্রভাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ক্রন্দন-কীর্তন যেখানে রাধার দুঃখকে বিজয়ার সার্বজনীন চণ্ডীমণ্ডপে শান্তিবারিতে ও বচনে নিষিক্ত করিয়াছে, সেখানে

চণ্ডীদাসের রাধা নিজের নির্জন সত্তায় প্রস্থান করিয়া, এমনকি সখীদের সামনে পর্যন্ত কপাট লাগাইয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন—"কাহারে কহিব মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত"।

পিরীতি-গঞ্জনে

চণ্ডীদাসের কাব্যে পিরীতির ছড়াছড়ি। পিরীতি হইল কমল, সে কমল ফোটে রসের সায়রে—'পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে'। ঐ একপদ্ম পিরীতির সৃষ্টি-বিষয়ক অলৌকিক কাহিনী কবি লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাস যে এত 'পার্থিব', পিরীতিকে কিন্তু তিনি স্বরূপে অপার্থিব রাখিয়াছেন। কবি বলেন, বিধাতা কোনো এক সময় পরম ভাবনার পরে 'পি' কথাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর রসের সায়র মন্থন করিয়া 'রী' উঠিল। এখনো যথেষ্ট হয় নাই, সুতরাং পুনরায় মন্থনে 'তি'-এর আবির্ভাব। তারপর তিনের অনিবার্য আসঙ্গলিপ্সায় পি-রী-তি-র সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের কবিতায় তাই রসের আকর তিন-আখর 'পিরীতি'র পুনঃপুনঃ প্রশস্তি।

কবির কাছে পিরীতি সাধারণ প্রেমের প্রতিশব্দ মাত্র নয়। পিরীতিই তাঁহার জীবনের ধৃতি ও ভিত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'প্রেমের' মতই 'পিরীতি' কবির নিকট সাধ্য ও সাধন উভয়ই। পিরীতি যদি প্রবৃত্তিজীবনের আবেগ-মাত্র হইত, তবে এমন করিয়া কবি পিরীতির সর্বাত্মক স্বীকরণের জন্য সংগ্রাম করিতেন না। চণ্ডীদাস যদি সাধক হন তবে পিরীতি তাঁহার ঈশ্বর; পিরীতি যদি ঈশ্বর হয়, তবে চণ্ডীদাস অদ্বৈতবাদী সাধক। নিজের স্থূল দেহকে পিরীতির সত্তায় একীভূত করাই তাঁহার সাধনা। চণ্ডীদাস পিরীতি-ব্রহ্মের বৈদান্তিক প্রেমিক।

এহেন পিরীতির গঞ্জনামূলক পদগুলিকে গঞ্জনা না বলিয়া বন্দনা বলাই ভাল। তবে গঞ্জনার ভঙ্গি কেন, না, গঞ্জনার মধ্য দিয়া যেন শক্রভাবে পিরীতির অর্চনা। বামার বাম্যতার চেয়ে মধুর কি আছে! নিছক পিরীতি-তত্ত্ব উপস্থাপক কিছু পদও চণ্ডীদাসে পাই। সেগুলির তুলনায় গঞ্জনাত্মক পদগুলি কাব্যগুণে উচ্চতর। তাত্ত্বিক পিরীতি জীবনপ্রবিষ্ট হইয়া আনন্দ-বেদনার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিলে তবে কাব্যের সূচনা হয়। পিরীতি-

গঞ্জনায় সেইরূপ জীবনভেদী পিরীতির শিহরণ দেখিতেছি। এই কারণেই পিরীতির তত্ত্বসূচক পদ অপেক্ষা গঞ্জনামূলক পদগুলি মোটামুটি উচ্চ মানের। তার মধ্যে নিম্নলিখিত পদটির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব—

সই, কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল। ইত্যাদি

বেদনার এমন অনলঙ্কৃত প্রকাশ অল্পই আছে।

আরো কিছু অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য—

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়।

*

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া যতনে খাইনু
তিতায় তিতিল দে।.....
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মৈনু।
কহিতে কহিতে তনু জরজর
বাউলি হইয়া গেনু॥

*

সই না কহ ওসব কথা।
কালার পিরীতি যাহারে লাগিল
জনম অবধি ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়নে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।

তবু তো সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হইল জপমালা ॥

*

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব ॥

*

কি জ্বালা হৈল মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
খাইতে সোয়াথ নাহি নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু করি ঝুরে ॥

এরূপ আরো অজস্র, ত্যাগময়, ভাবময়, প্রেমার্তিময় অংশসমূহ,—চণ্ডীদাসের কবিপরিচয়ের ভিত্তিস্বরূপ। এই পদগুলি, করুণাবর্ষী মেঘখণ্ডের মতো, তপস্যাপূর্ণ বর্ষারাত্রিকে চিরদিনের জন্য বহন করিয়া আছে।

আক্ষেপানুরাগের 'পিরীতি-গঞ্জনে' অংশে—তাই বা কেন, চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলীতে,—ভণিতার বিশেষ মূল্য আছে। ভণিতা, প্রতিপদের শেষে কবির আত্মনিবেদন। অন্য কবির ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের মত ভাবগভীর ভণিতা পাই না। অন্য কবিরা মূল পদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষকথা বলিতে চাহিয়াছেন। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে ভণিতা শিথিল পাদপূরণ মাত্র, বড় জোর পদবিষয়ে কবির 'কটাক্ষ ঈক্ষণ'। চণ্ডীদাস কিন্তু ভণিতায় বিশেষ উদ্দীপিত। পদগুলি যে তাঁহার নিবিড়তম অনুভূতির বাণীবাহন—কাব্যপ্রয়াস মাত্র নয়—তার প্রমাণ ভণিতায় মেলে। চণ্ডীদাস রাধাভাবিত কবি। রাধামুখে তিনি নিজেকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের দাস-দূরত্ব চণ্ডীদাসের ছিল না। তবু হয়ত রাধার মুখের কথা সম্পূর্ণ চণ্ডীদাসের কথা নয়, এরূপ সন্দেহ হইতে পারে। ভণিতার আত্মকথনে চণ্ডীদাস সে সন্দেহ একেবারে দূর করিয়াছেন। ভণিতায় কবি নিজের মুখে নিজের কথা বলেন। চণ্ডীদাসের সেই নিজের কথার সঙ্গে পদমধ্যগত রাধার নিজের কথার ভাবগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই। তাই বলা চলে, চণ্ডীদাসের ভণিতা তাঁহার সংক্ষিপ্ত পদের সংক্ষিপ্ততর ভাবসার—মন্ত্রের মধ্যেও বীজমন্ত্র।

মল্লাক্ষর ভাবখণ্ডগুলি লক্ষ্য করা যাক—

কহে চণ্ডীদাস কুলশীল নাশে
কালিকা প্রেমের মধু।

*

চণ্ডীদাস কহে ধনী কানু সে পরশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে।

*

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দপানে
পরাণে বাঁচিবে সখী কে।

*

চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ।

*

চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কানুক ঔষধ কেবল রাধা॥

*

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥
নিগূঢ় পিয়ার প্রেম আরতি করু বহু।
চণ্ডীদাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহু॥

*

ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।

*

চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
যেন দরিদ্রের হেন।

*

কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা।

*

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার ঝি।
বংশীয়া দংশিল তোমায় আমি করি কি॥

*

চণ্ডীদাস কয় ছাড়হ আশয়
তবে সে পাইবে সুখ।

চণ্ডীদাস কয় শুনহে সুন্দরী
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে॥

*

চণ্ডীদাস কয় কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।

*

চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরমে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে॥

*

পিরীতি পরম সুখ দুখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।

*

পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা।
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

*

চণ্ডীদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে জাগিয়া॥

*

চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি।

*

চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক যাতনা যার অধিক পিরীতি॥

চণ্ডীদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতিকুলশীল ছাড়া।

চণ্ডীদাসের ধিক্কার মনে গাঁথিয়া বসে—

চণ্ডীদাস ভণে মনের বেদনে
কহিতে পরাণ কাটে।
সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসিল খাটে॥

শুধু ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া শ্যামচন্দ্রের চরিত্র যতখানি পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছি, বিশ্লেষণের পক্ষে তা অসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সৌভাগ্য অসীম। তিনি চণ্ডীদাসের পুরুষ-দেহে একটি প্রেমিকা পাইয়াছিলেন। তবে পুরুষ, প্রেমিকা হইলেও তাহার পুরুষসুলভ বিশ্লেষণ-ক্ষমতা যায় না। তাই কালা-জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে রাধামুখে যে কৃষ্ণ-চরিত্র পরিব্যক্ত, তাহাতে সেই নিরপেক্ষতা নাই, যে বস্তু ছিল 'প্রেমিকা' চণ্ডীদাসের ভণিতায়। পদের মধ্যে রাধা-কণ্ঠে কৃষ্ণচরিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া পদশেষে নিজ কণ্ঠে কবি সিদ্ধান্তটি জানাইয়াছেন। ভণিতা সেই সিদ্ধান্ত।

আক্ষেপানুরাগের 'সরল-ক্রোধের' বিস্তারিত পদ-পরিচয়ের পর, নিশ্চয় আমাদের নিকট এই তথ্যটি স্পষ্ট হইয়াছে, রাধা ভিতরে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। অশ্রুর অগ্নিকে শেষবারের মত জ্বালাইয়া, নিজেকে জাগাইয়া, অবশেষে নিঠুরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িবেন। তার নাম আত্মনিবেদন।

আত্মনিবেদনের ভক্তিস্তোত্র

চণ্ডীদাসের পদে একটি সুদীর্ঘ প্রণাম, যুগ-যুগ, জীবন-জীবন দীর্ঘ। বংশীশ্রবণে নতমূর্ছিত, 'দরশনে' নত-বেপথু, মিলনে নত-বিনীত, এবং বিরহে মরণ-নত—সকলই প্রণামের রূপভেদ। 'নিবেদনে'র নতিতে সেই প্রণামেরই পরাকাষ্ঠা। বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' আর চণ্ডীদাসের 'নিবেদন'—উভয়ের কবিচরিত্রের স্বরূপ-প্রকাশক দুটি পর্যায়। বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' তাঁহারই প্রার্থনা—শিব ও মাধবের নিকট কবি আপন হৃদয়ভার লাঘব করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের 'নিবেদন' কিন্তু কবির নিজের নয়, তাঁহার রাধিকার। বিদ্যাপতি ও বিদ্যাপতির রাধিকা এক মন, তাই কবির নিজস্ব প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাসের রাধিকা বহু সময়ই একাত্ম, রাধার নিবেদন তাই চণ্ডীদাসেরও নিবেদন।

বিদ্যাপতি জীবনে ভার বহিয়াছেন। দীর্ঘ জীবনের ঐশ্বর্যবহনের সেই সংঘাতময় অভিযাত্রা। বর্ণে বৈভবে কবির ছিল আভিজাত্য। বিদ্যাপতির কাব্যসূচনায় রাধা ও কৃষ্ণ সে আভিজাত্যের সুন্দর পুতুল। তারপর বিদ্যাপতির জীবন অগ্রসর হয়, জীবনের ভার বাড়ে—যতই বাড়ে জীবনের রেখাও তত গভীর হয়। মধ্যদিনে কাম-প্রেমের মিলিত রসোল্লাস বিদ্যাপতির কাব্যে। তারপর আসে সন্ধ্যা ও রাত্রি, আসিয়া দাঁড়ান মাথুরের বিদ্যাপতি। সেই রাত্রিতে একদিকে বিদ্যাপতির রাধিকা কাঁদিয়াছেন, অন্যদিকে কাঁদিয়াছেন স্বয়ং কবি—কাঁদিয়াছেন আর প্রার্থনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ভোগ-শ্রান্ত জীবনের আর্তনাদ নিশীথ-সিন্ধুর গর্জনধ্বনিতে নূতন সুরের সংযোগ করিয়াছে। কৃষ্ণের বিরহে আকুল রাধিকা—জীবনের বিতৃষ্ণায় অধীর বিদ্যাপতি। অধীরতার সঙ্গে আরতি, আরতির সঙ্গে প্রার্থনা।

চণ্ডীদাসের জীবনের রূপই পৃথক। চিন্ময় সূর্যকে তিনি প্রভাতেই দেখিয়াছেন। সেই সূর্যকে তৎক্ষণাৎ মানিয়া মৃত্তিকায় সূর্যবরণের সাধনায় মাতিয়াছেন। দ্বিধা, সন্দেহ তাঁহার ছিল না, শুধু ছিল বরণ আর নিবেদন। চণ্ডীদাস এবং তাঁহার রাধিকা বেদনার গান গাহিয়া সূর্য-সত্যকে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। তাই চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদন 'ভক্তিস্তোত্র', বিদ্যাপতির

প্রার্থনা সেখানে সাধনসঙ্গীত। চণ্ডীদাসের মত পবিত্র আত্মসমর্পণ বৈষ্ণব সাহিত্যে আর কোথাও নাই। 'মহাজন' শব্দের অর্থ যদি হয় সিদ্ধ চরিত্র, তবে চণ্ডীদাস-কথাই একমাত্র মহাজনগীতি। দেবতার মন্দিরের দ্বার কবির করস্পর্শে নয়, যেখানে প্রাণ-স্পর্শে মুক্ত হয়, কাব্য সেখানে স্তোত্রে উন্নীত। দেবতার একেবারে সামনে বসিয়া গান গাহিবার অধিকার চণ্ডীদাসের ছিল। কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিতে পারি :—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী;
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লৈনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় বাঁধিয়া মরি॥

*

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম*
তোমার চরণখানি॥

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হইতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন-জন-মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।

*'মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার ভালো, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—প্রথম খণ্ড।

অবলার ত্রুটি হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা ॥

*

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণ বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন ঘনশ্যাম।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ ॥

বঁধু তুমি সে পরশমণি হে
বঁধু তুমি সে পরশমণি।
ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার
সোনার বরণখানি ॥

'আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।' চণ্ডীদাস দেহদীপের আলোক-লেখাতে তাঁহার আত্মনিবেদন লিখিয়াছেন।

আর কৃষ্ণ কি বলিলেন—রাধিকার আত্মনিবেদনে? তিনিও নিজেকে সঁপিয়া দিলেন। তিনিও আর একটি রাধা হইয়া উঠিলেন—সেই শঠ লম্পট নিঠুর কালা কানাই। উদ্ধৃত পদগুলির শেষেরটিতে দেখি রাধা বলিতেছেন, তিনি কৃষ্ণ-পরশমণির স্পর্শে সোনার বরণ পাইয়াছেন—হয়তো। অপর-পক্ষে কৃষ্ণকে স্পর্শমণি করিল কে? নিঃসন্দেহে রাধা। নচেৎ যে চণ্ডী-দাসের কাব্যে কৃষ্ণের প্রায় কোনো সন্ধান পাই না—(ঈষন্মুক্ত নারীদেহের দর্শন-রসিক, বিরহসৃষ্টির পুরুষ-যন্ত্র এবং খণ্ডিতার অসম্মানকারী ভিন্ন)—সেই কৃষ্ণ এমন ভাষায় কথা বলিতে পারেন?—

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম-তলাতে থাকি।

শুনহ কিশোরী চারিদিক হেরি
যেমন চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥

*

জপিতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুযা প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ ॥

*

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়নতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হোল আঁখি।

*

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়নতারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধা, ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙা চরণে
শরণ লইনু আমি ॥

আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি।
রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি।

দেখিতেছি রাধার 'প্রণয় মহিমা'য় মথুরার রাজ্যপাট ছাড়িয়া, বৃন্দাবনের রূপলোক পর্যন্ত ছাড়িয়া, কৃষ্ণকিশোর বাঙলার গ্রামপথে একতারা হাতে সহজিয়া।

ভক্তির পরিচিত মূর্তি হইল ঈশ্বরের রূপ-গুণ-গান—তাঁহার কাছে ঐহিক ও পরমার্থিক প্রার্থনা। এ ভক্তির শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ রূপ, ভক্তের নিষ্কাম আত্মনিবেদন। সাধনার আর্তক্ষত অধ্যায়ের শেষে সাধক একটি সঙ্গোপন চিরশান্ত মেঘচিহ্নহীন শুভ্রবর্ণ মিলনলোককে লাভ করে। বাহিরে বিক্ষোভ-শেষ, অন্তরে আত্মার পূর্ণ স্নান। ঝঞ্ঝা-উত্তর শান্ত সায়রে সাধনার পরিসমাপ্তি। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা কিন্তু প্রায়ই এহেন একরূপ অনুভূতিতে আশ্রয় চান নাই। 'শান্ত' তাঁহাদের নিকট 'প্রথম রস' এবং রাগপ্রেমের পাদপীঠ মাত্র। প্রেমের রূপলীলায় যাঁহাদের একান্ত বিশ্বাস, তাঁহাদের পক্ষে ঐ প্রেম যখন চমকিত ও চঞ্চল, যখন উন্মত্ত ও আত্মহারা —তখনই তাহাকে দর্শন-চিত্রণের ইচ্ছা স্বাভাবিক। প্রেমের সক্রিয় রূপকে রসশাস্ত্রপথে ফুটাইতে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবি তাই ব্যাপৃত। তাত্ত্বিক বৈষ্ণবতার অনেকটা দূরবর্তী ছিলেন চণ্ডীদাস। তাই একদিকে কবি রাগাত্মিক প্রেমকে কেবল রাধাকৃষ্ণের মধ্যে নয়, (গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে রাগাত্মিক প্রেমের আশ্রয় কেবল কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেয়সীরা) নিজ জীবনেও অঙ্গীকার করিয়াছেন, অন্যদিকে সাধারণ হিন্দু দৃষ্টিসম্মত শুদ্ধা ভক্তির বিভিন্ন অবস্থাকে স্বীকার করিয়াছেন কাব্যে। তাঁহার রচনায় ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুল তরঙ্গের মতই শান্তি-পারাবারকেও পাওয়া যায়—সেখানে অন্য বৈষ্ণব কবির অননুরূপ শান্ত রসের তরঙ্গহীন বিস্তার। আত্মনিবেদনের রস শান্ত। চণ্ডীদাসের মধুর রসও শান্ত-শরণ। অন্যান্য বৈষ্ণব কবি তত্ত্বানুসরণে প্রেম-প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ রূপকার, তার ফলে তত্ত্ব ঠেলিয়া দিলে বহু সময় বিশুদ্ধ

লৌকিক প্রেমের কবি, চণ্ডীদাস সেখানে প্রায় সর্বত্রই শাস্ত্রশাসিত অধ্যাত্মকবি।*

*রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় অপ্রাকৃতত্ব আনিবার প্রয়াস সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিদের পক্ষে মানব-প্রেমের প্রয়োগরূপকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কারণ তাঁহারা রূপকথা বা উদ্ভট উপকথা রচনা করিতেছিলেন না। সে ক্ষেত্রে মানুষের নিজ জীবনের সাক্ষ্যবহুল ভাষাই একমাত্র বোধ্য ভাষা। কিন্তু ঐ প্রেমকথাকে মানবোর্ধ্ব প্রমাণ করিবার দায়িত্বও কবিদের। প্রেমবর্ণনায় দুইমুখী আতিশয্য সৃষ্টির দ্বারা তাঁহারা সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম অণু হইতে অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতে মহীয়ান্, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। সে চেষ্টায় কবিকুল একদিকে ঐ প্রেমের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা-বিশ্লেষণ করিলেন, যাহার অতি সামান্য অংশই মানব-জীবনে সম্ভব। রাধাকৃষ্ণের প্রেম সর্ব সূক্ষ্মের একত্র অঙ্গীকার। অন্যদিকে ত্যাগশুদ্ধ অনুভূতির এমন বিশালতা আনিতে চাহিলেন, মানবের মহত্তম উপলব্ধিতে হয়তো যার কণবিস্তার মাত্র সম্ভব। অতি সূক্ষ্মের বিভক্তি এবং অতি বিশালের বিস্তার এমন সম্ভ্রমকর সমগ্রতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে স্থাপিত করিয়াছে যে, সাধারণ মানুষ নিজ জীবনের প্রেম-ভঙ্গীকে সেখানে অনুকৃত ও অনুবর্তিত দেখিলেও তাহার সঙ্গে সাযুজ্য কল্পনায় সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে, ইহার অধিক, ঐশ্বরিক সংস্কার তো আছেই। সূক্ষ্ম হইতে সুমহানে এই গতায়াত যেখানে সাবলীল, বৈষ্ণব কাব্য সেখানে সার্থক, কিন্তু বহু স্থানেই ঐ দুরূহ চেষ্টা প্রেরণাহীন অলঙ্কার-শাসনের সাক্ষ্য।

চণ্ডীদাসের কাব্যে 'রূপ'-সাধনা

অকুণ্ঠিত অবাধ উচ্ছ্বাসে আমরা দীর্ঘস্থান ব্যাপিয়া চণ্ডীদাসের প্রশস্তি করিয়াছি। পূজাই সমালোচনা—রবীন্দ্রনাথের নির্দেশের বাধ্য অনুসারক আমরা। ভাবের পূজায় বিচারের প্রয়োজন হয়—কিন্তু রূপের পূজায়? বোধহয় এইবার দেবতার নাক-চোখ-মুখের গড়ন-বিচারের সময় আসিয়াছে। চণ্ডীদাস শুধু সাধক নন, কবিও। কবিরা রূপের মালাকর। কাম-গন্ধহীন প্রেমের ঝাঁপ দিবার পূর্বে রামীর সুবর্ণাঙ্গী শ্রী চণ্ডীদাস একবার দেখিয়া লইয়াছিলেন। "হায় দেহ, নাই তুমি ছাড়া কেহ"।

চণ্ডীদাসের সীমাবদ্ধতা এইখানে, এই দেহরূপের ক্ষেত্রে। আধুনিক কবি-দার্শনিকের মত তিনি মানেন, 'অপরূপ রূপখানি' যখন নিরাকারে মিলিয়া যায়, তখন 'সারা ধরণীর বায়ুমণ্ডল প্রেমিকের চোখে করে ছলছল'। তা বলিয়া এতদূর নয় যে, প্রেম শুধুই 'দেহের কাঙাল' বা 'দেহেরি সীমায় চেতনার শেষ'। কবি রূপকে মানেন, আবার ভাবকে মানেন। রূপ গলিয়া ভাব-পারাবারে তরঙ্গিত হয়। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় রূপকঠিনতা অপেক্ষা ভাবতরঙ্গের প্রতি তাঁর আপেক্ষিক আসক্তি। কবির রাধা সত্তার উপর আবরণ প্রায় রাখেন নাই। কবিও ঐ রাধা-দেহের উপর প্রায়ই বসনের আবরণ ঘন করিয়া চাপান নাই; তাঁহার স্বচ্ছ বসনাবৃত গৌর তনু। ঘন বসন, আবরণ ও মোচনের নিপুণ বিন্যাসে মুগ্ধ ও লুব্ধ মনকে দেহসীমায় বাঁধিয়া রাখে; অন্তর্বাসমোহন সংস্কৃত কাব্যের ঐতিহ্যপুষ্ট বৈষ্ণব কবিরা সে প্রচেষ্টার কবিশ্রমী। অন্যপক্ষে, বাঙলাদেশের স্বল্পাবৃত প্রকৃতি-লাবণ্য চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধাতরঙ্গ।

সে দেহও এক সময় ভাঙিয়া যায়। তখন বাঁশী থামিয়া যায়, রাধার পায়ে নূপুর বাজে না, যমুনা ছলছল করে না—রাধার কান্না, কৃষ্ণের হাসি কিছুই থাকে না—তখনকার সে মুহূর্তটি ভয়ঙ্কর—সেইটি রূপশক্র অদ্বৈত মিলনের মহালয়। সে মুহূর্তকে ধরিবার অধিকার হইতে লীলাবাদী বৈষ্ণব স্বেচ্ছাবঞ্চিত। মিলনের অসহ নিরাকার ঐক্যানুভূতি শেষ হওয়ার অনেক

পরে বৈষ্ণব কাব্যের রাধার ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হয়—'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। এই বিচ্ছেদ-চেতনাকে রোমান্টিক বলা হইয়াছে—পাওয়ার মধ্যে হারাণোর চিরন্তন চিন্তা। এ ক্ষেত্রে রোমান্টিক কথাটিকেই শেষ কথা মানিতে পারি না। সচ্চিদানন্দের আনন্দকামনায় হ্লাদিনীর মূর্তি; অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার আনন্দলোকে রাধার জন্ম। সে রাধা আর ভেদলোপের অজ্ঞেয় লোকে ফিরিতে চান না। অথচ গভীরতম মিলনে রাধা যেন সেই অভেদকে জানিয়া ফেলেন, যে সর্বগ্রাসী অভেদ তাঁহার নিয়তি। তাহারই বিরুদ্ধে ভালবাসার তনুজীবনের মরণান্ত হাহাকার রাধার কণ্ঠে ফুটিয়া ওঠে। সমস্ত বৈষ্ণব কবির মধ্যে বিদ্যাপতির কিছু এবং চণ্ডীদাসের মানস অংশের অনেকখানি ঐ আকার-নিরাকারের চেতনাসমৃদ্ধ। উভয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলীর বহির্ভূত।

এমন কবিতে রূপের প্রাধান্য ঘটে না। নিজস্ব দার্শনিকতা এবং ভাব-তান্ত্রিকতা চণ্ডীদাসের রূপকে ঘুচাইয়াছে। তাছাড়া কাব্যিক বৈদগ্ধ্যের অভাবও ছিল, যার ফলে বর্ণনীয়কে বর্ণরঞ্জিত করিতে তিনি অসমর্থ। এইখানে চণ্ডীদাসের সামর্থ্য-সঙ্কোচ। শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই হয় না,—নিশিদিন অনুরাগে জপমালা ঘুরাইতে যাহারা প্রস্তুত নয়, তাহাদের জন্য, যদি কাব্যের দ্বারা মনোহরণ করা কবির অভিপ্রায় হয়, বহিরঙ্গ রূপের চাঞ্চল্যকে বিলসিত করা আশু প্রয়োজন। জীবনের লুব্ধতার রূপে বর্ণবিরলতাকে রক্তহীনতা বলিয়া মনে হইতে পারে এবং অভিযোগ করিয়া বলা চলে—চণ্ডীদাসের পদ, প্রবল কৃচ্ছ্রসাধনা ও অনশনে প্রায়ই নীরক্ত দুর্বলতায় আচ্ছন্ন।

চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার বিরুদ্ধে ঐ সব অভিযোগ আংশিকভাবে মাত্র স্বীকার্য, নিতান্ত আংশিকভাবে। এবং সে অভিযোগের দায় হইতে কবিকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম, যদি জানা সম্ভব হইত, চণ্ডীদাসের যথার্থ পদ কোনগুলি। পূর্বে চণ্ডীদাসচৈতন্যের কথা বলিয়াছি। এই চণ্ডীদাস-পরিমণ্ডল যাঁহাদের 'প্রাণে' ভাষা দিয়াছিল, তাঁহারা চণ্ডীদাসের মতই কথা বলার সাধুতায় বৈচিত্র্যকে একেবারে পরিহার করিয়াছেন (সমস্ত ব্যাপারটা নিছক অনুমান)। ফলে চণ্ডীদাসের নামে সংযুক্ত বিপুল পদপুঞ্জ একনিষ্ঠ অনুসরণের আনুগত্যে বৈচিত্র্যশূন্য গণপদ। নচেৎ চণ্ডীদাস সত্যই বৈচিত্র্যহীন

পদ লেখেন নাই। তবে সে বৈচিত্র্যের চরিত্র ভিন্ন। চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভা একটি পরম বিস্ময়কে বাঙলা সাহিত্যে সম্ভব করিয়াছে এবং সে বস্তু চণ্ডীদাসেরই সাধ্য। একটি অনুভূতিকে—কৃষ্ণানুভূতিকে—একই ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে এতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, তাহা চণ্ডীদাসই প্রমাণ করিয়াছেন। এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে কবির নিম্নাবতরণ ঘটিত না বলিয়া। এই তাপস-কবির অন্তরাত্মা প্রেমের সপ্তম লোকে নিত্য অধিষ্ঠিত। সেই অত্যুচ্চ প্রেমবোধকে কাব্যবস্তু করার কালে অতি সূক্ষ্ম ভাব-পার্থক্য মাত্র ভাষায় ফোটানোর চেষ্টা করা চলে। নানা-বর্ণের সমাবেশে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা শিল্পীর পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু শিল্পীমাত্রই জানেন, একই বর্ণের অনন্ত রূপকে কেবল মহাশিল্পীই আবিষ্কার করিতে সমর্থ। আবার সকল বর্ণের মধ্যে কালোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই কঠিনতম। অবনীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চলল না; বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হোল বিশদ অন্ধকার।……কালো দিয়ে যে, আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দর ভাবে, তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন'। এবং—'সবশেষে এল রাতের কালো পাখী আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখা মেলে—পৃথিবীর কোনো ফুল, আকাশের কোনো তারায় মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো'।

চণ্ডীদাস আলোর এই কালো কবি। কঠিন তাঁহার সাধনা। বর্ণলাস্যের প্রলোভনকে পদে পদে এড়াইতে হইয়াছে। অথবা স্বকীয় প্রতিভা-ধর্মে তিনি সুলভ উজ্জ্বলের কোনো মোহই বোধ করেন নাই। সেই যাই হোক, তিনি যাহা পাইয়াছেন, সে যে কত বড় পাওয়া, অবনীন্দ্রনাথের কথায় তাহার স্বীকৃতি আছে—'মন যতক্ষণ কালি হইতে পৃথক আছে, কালি ততক্ষণ কালো কালি মাত্র। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে, অমনি কালি আর কালো নাই, সে ষড়ঙ্গের বরণডালায় আলোর শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।' চণ্ডীদাস কালোর কালো, আলোর আলোকে পাইয়াছিলেন তাদাত্ম্য সাধনায়।

তাই চণ্ডীদাসের কাব্যে রূপজীবী রূপ নয়—প্রাণরূপ;—প্রাণের উৎকণ্ঠা

যতখানি রূপকে আকর্ষণ করে, ততটুকুই আমন্ত্রণ। তাঁহার অলঙ্কার প্রয়োগ-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলেই কথাটি বোঝা যায়। সহজেই ভাবের অতল-প্রস্থান ঘটিত বলিয়া কল্পনার বিস্তার যথেষ্ট নয় চণ্ডীদাসের কাব্যে। তাঁহার অলঙ্কার-সন্ধানেও রূপের চমক অপেক্ষা প্রকাশ-ব্যাকুলতাই অধিক। সাধারণতঃ কবিরা উপমা ব্যবহার করেন আত্মসম্ভোগের জন্য। হয়ত আহ্লাদজনক রূপকল্পনা জাগিয়াছে অন্তরে; সেই দৃষ্ট বা কল্পিত রূপকে একটি প্রতিকল্পের মধ্যে বিম্বিত দেখিলে চিত্তচমৎকার ঘটে। তখন রূপে ও সমরূপে সৌন্দর্যবিনিময়,—তাহাতে দ্রষ্টা ও স্রষ্টার উল্লাস। চণ্ডীদাসের মত ভাববিভোর কবি কিন্তু ঐ প্রকার রূপসম্ভোগের জন্যই উপমাদি আলঙ্কারিক প্রতিরূপকে চান না। অনুভূত ভাবকে প্রকাশ করাই তাঁহাদের সাধনা। প্রকাশের বেদনায় এই শ্রেণীর কবিরা অনুভূত ভাবের তুল্য অপর একটি বস্তু বা ভাবের সাহচর্য চান,—ঐ সহমর্মিতায় অধিকন্তু তাঁহাদের হৃদয়োৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হয়। উপমার ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের মত কবি জগৎ-জীবনের সমমূর্তি নির্মাণ করিয়া আরতি করেন।

কথাটি বুঝাইতে পারিয়াছি কিনা জানিনা, অন্ততঃ ইহা স্পষ্ট হইয়াছে, অলঙ্কার-প্রয়োগে চণ্ডীদাস যথেষ্ট সচেতন শিল্পী নন। অথচ উপমাদিও প্রচুর, কারণ বিশ্বছন্দ চেতনায় ধরা দিলে, ভাবের সঙ্গে ভাবের, রূপের সঙ্গে রূপের মিলন-সন্ধান কবির পক্ষে অপরিহার্য কর্ম। সেই রূপে-রূপে মিলন-কামনা, অজস্র, প্রায়ই অমার্জিত অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। দুই পৃথিবীকে পরিমার্জনার চেষ্টামাত্র না করিয়া কবি সহজ আবেগে কাব্য-বদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের নিতান্ত পরিচিত প্রবাদগুলিকে কোথাও সামান্য পরিবর্তনে, কোথাও অবিকৃত রূপে ভাববাহন করিয়াছেন। সে সকল অংশে প্রায়ই রূপজ্যোতির অভাব—কবির মানবিকতা ও বাস্তবতার নিদর্শন হিসাবেই সেগুলির মূল্য। সেরূপ অংশ আমি 'জাতীয় কবি' প্রসঙ্গে যথেষ্টই উদ্ধৃত করিয়াছি; কবির গ্রহিষ্ণু ক্ষমতার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য ঐ সব অংশ। নির্বিচারে দৃষ্টবস্তুকে কাব্য-উপাদান করিতে রামপ্রসাদ ভিন্ন চণ্ডীদাসের অনুরূপ মানসিক ঔদার্য আর কাহারো ছিলনা মধ্যযুগে। এই মানসিক ঐশ্বর্য বহুস্থানে প্রকাশ-সারল্যের গুণে কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত না তুলিয়া পারিতেছি না:—

জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে

ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ

বাহু পশারিবা বাউল হৈয়া

হিয়ার মালা যৌবনের ডালা

স্বপ্নসম দেখি তারে

নয়নিয়া পাখী, চঞ্চল তাহার মন

পাষাণেতে দিই কোল, পাষাণ মিলায়

আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া

অনুরাগ ছুরি বৈসে মনোপরি

কলসে কলসে ছিঁচে ঘুচে না পাথর

স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি

আকাশে পাতিয়া ফাঁদ

অফুরাণ হোল গৃহকাজ

যদি পাখা পাই পাখী হইয়া যাই

ক্ষুরের উপর রাধার বসতি

কাঁপে দুটি অধর সুন্দর

নয়ানে নয়ানে খেলা হৃদয় ভিতর মেলা

লোহার পিঞ্জরে থাকি বেরইতে চাহে পাখী
তার হইল আকুল পরাণ

সৌন্দর্যচঞ্চল অংশ কি সত্যই চণ্ডীদাসে অল্প, প্রথমাবধি যে সব পদ-পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি এবং সদ্য যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহার

পটভূমিকায় ? চূর্ণ বর্ণরস কিরূপ অপর্যাপ্ত চণ্ডীদাসে—বারম্বার তাহা দেখাইয়াছি। 'বাঙলা কবিভাষার জনক' অধ্যায়ে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। এখানেও দেখা যাক : অতি সাধারণ তথ্য নিবেদনটি—আহারে অগ্রসর সফরীর মুখে বড়শী বিঁধিল—উৎপ্রেক্ষাটি কী ভাবে না রাধাকে প্রকাশ করিয়াছে! অলঙ্কারটির শক্তি এইখানে—উপমেয় (রাধিকা) যেন উপমানের (মৎস্য) তুলনায় অধিকতর বাস্তব। অথচ মৎস্যশিকার আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ-বাস্তব, আর রাধাপ্রেমের উক্ত অবস্থা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। এখানে কল্পনার কাছে (আসলে অনুভূতির কাছে) বাস্তবের পরাজয়। রাধার সরলতা, প্রেমে বিশ্বাস, তাঁহার পরম নির্ভরতার মুখে নিষ্ঠুর প্রেমিকের কঠিন টান—এর সঙ্গে টোপের প্রলোভনের সাহায্যে নিষ্ঠুর শিকারীর শিকার-সন্ধানের তুলনা। কোন্‌টি আমাদের মনোজীবনে বেশি সত্য—রাধার প্রেমশিকল না মৎস্যের মরণশিকল—বোধ হয় রাধার প্রেম-শিকলই! তেমনি অন্যান্য কয়েকটি সৌন্দর্যবিদ্ধ কাব্যছত্র :—বাউলের ছুটিয়া চলার মধ্যে গৃহত্যাগের ছন্দ; নয়নিয়া পাখীর চঞ্চল গতিতে রূপচঞ্চল প্রাণের দৃষ্টি-পিপাসা; পুষ্পিত যৌবনকে হৃদয়-মাল্য রূপে কল্পনা; বাস্তব দর্শনকে স্বপ্নবৎ রহস্যসুন্দর মনে করা; প্রিয়ের প্রতি নয়নপাতকে তারা-খসার সঙ্গে তুলনা; দুটি সুন্দর অধরের কম্পন; অনুরাগ ছুরির হৃদয়-বিদ্ধকরণ;—এ সমস্তই শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যপংক্তিরূপে সমাদর পাইবে। কবি যখন গৃহবদ্ধ নারীকে ফুটাইতে বলেন—'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'; কিংবা সন্দেহপ্রবণ স্বামীর স্বভাব বুঝাইতে বলেন—'স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি'; কিংবা অসম্ভব প্রয়াসের চিত্র আঁকিতে বলেন—'কলসে কলসে ছিঁচে ঘুচে না পাথার'; কিংবা রাধার কলঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত ও সাধনময়ী স্বভাবের বর্ণনায় বলেন—'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি';—তখন কবির সামর্থ্য ঐ জীবনরসে পূর্ণবারি অলঙ্কারগুলিতে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহাতেও যদি যথেষ্ট না হয়, কবির রূপশক্তি প্রমাণের জন্য আমি কতক-গুলি উপমার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিব সংক্ষেপে :—

প্রথমে দুটি চিত্র :—

যেমন চিত্রের পুতলী চলিছে
ও চাঁদবদনী রাধা।

এবং

নয়ন কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি
যেন বা দিয়াছে দেখা॥

কবি চন্দ্রবদনী রাধাকে 'চিত্রের পুত্তলী' বলিয়াছেন। সাধারণতঃ বিপরীতই বলা হয়—কোনো চিত্রের প্রশংসা করিতে বলা হয়—যেন জীবন্ত! অথচ এখানে 'জীবন্ত' রাধার বিষয়ে বলা হইল, যেন চিত্র—চিত্রের চলমান পুত্তলী। একদিকে ইহার দ্বারা কবি রাধার রূপের চরম প্রশংসা করিলেন,—রাধার রূপ যে শিল্পীর কল্পনা ও তুলিকার রচনা ভিন্ন মর্ত্যে সম্ভব নয় বুঝিলাম, অন্যদিকে অলঙ্কারটির দ্বারা রাধার রূপের সুকুমারতা, পেলবতা ও স্পর্শকাতরতা ব্যঞ্জিত হইল। তুলিকার মধুকোমল টানে স্বপ্নময়ীর সৃষ্টি; সে যখন চলে, মাটিতে তাহার চরণরেখাও পড়ে না। কবির বর্ণনায় ভাবের পুতলী রাধার অপার্থিব স্বপ্নগতির রূপ ফুটিয়াছে অসামান্যভাবে।

পরের উৎপ্রেক্ষায় নির্মল নয়নপ্রান্তের কাজলরেখার সঙ্গে যমুনাকিনারের মেঘরেখার তুলনাও অপরূপ প্রকৃতি-রস-চেতনার সাক্ষ্য। এখানে একটি মৌলিক উপমা প্রয়োগ, কবির স্বাধীন সৌন্দর্য-বুদ্ধির সঞ্চয় যাহা। নদীকূলে মেঘের রেখা যাঁহার প্রত্যক্ষে দেখা আছে, এবং যিনি স্বচ্ছ তরল নদীগতির সঙ্গে গভীর নির্মল নয়নের সাদৃশ্য কল্পনা করিতে সাহসী, তিনি ঐ প্রকৃতি-চুম্বিত অলঙ্কারের ব্যবহারে বা আস্বাদনে সমর্থ।

পিরীতির স্বরূপ লইয়া একটি অলঙ্কার-পংক্তি—

পরবশ পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ।

অর্থে নিখুঁত নয়, কিন্তু ব্যঞ্জনায় অসাধারণ। আতুর রাধার মুখ হইতে ছটফট করিতে করিতে তুলনাটি ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। সর্পাকুল বাঙলাদেশের অনেক দুঃখ আছে সাহিত্যের এই অগ্নিসর্পের পিছনে। গ্রামবাঙলায় অবিরল দুর্ঘটনার চিত্রাভাস:—অন্ধকার কক্ষে নিশ্চিন্ত শয়ন, স্বপ্নঘোরে (সুখস্বপ্নে!) দেহসঞ্চালন, পদপ্রান্তের আহত সর্পের প্রতিশোধ-

দংশন, নিশাবসানের পূর্বেই যন্ত্রণানীল প্রাণাবসান। নীল সর্প আর নীল কৃষ্ণ—রাধার কাছে কার্যতঃ এক। জলন ও মরণ উভয়তঃ। এই বেদনাহত তুলনাটি রাধার প্রেম-দুঃখ সম্বন্ধে যতকথা বলিয়াছে—অনেক বিবরণ বা বিশ্লেষণ ততখানি বলিতে অসমর্থ।

বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে

পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে

লেহ-দাবানলে মন যে জ্বলে, হরিণী পড়িল ফাঁদে

নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে ব্যাধ-শর নিল বুকে

শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়।

ব্যাধ-বাণ খায়্যা ঘাইল হইয়া
চারিদিকে যেন চায়॥

হরিণীর উপমান বৈষ্ণব কবির কাছে অপরিত্যাজ্য। রসকথায় স্থাপিত-চিত্ত বিদ্যাপতির রাধা-কুরঙ্গীর সঙ্গে পূর্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছে। বিদ্যাপতির হরিণী যতখানি চাক্ষুষ, চণ্ডীদাসের হরিণী ততখানি নয়। চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্য ভাবমোচন। রাধার প্রেমতৃষ্ণার্ত হৃদয়ের চিন্তায় তাঁহার 'পিয়াসে হরিণী'র কথা মনে পড়ে; মৃত্যুমেয়াদ যাহার স্থির এমন কিরাতঘরের হরিণীর সঙ্গে কৃষ্ণায়ত্ত রাধা একাকার হইয় যান; শরাঘাতে ভূমিপতনের ঠিক পূর্বে হরিণীর উদ্‌ভ্রান্ত আতঙ্ক ও দিশাহারা চাহনির সঙ্গে কৃষ্ণবিদ্ধ রাধার মৌন নয়নার্তির কোনো পার্থক্য থাকে না। এমন করিয়াই হরিণী বৈষ্ণব কবিকে টানিয়াছে। অরণ্যে হরিণীর অসীম মুক্তি, লীলায়িত গতি, দীঘল নয়নের অবোধ ভালবাসা এবং অজ্ঞাত মৃত্যুর সহসা সাক্ষাৎ। এ তো রাধিকা! হরিণীর যত মুক্তি তত মৃত্যু। রাধিকারও। রাধিকারূপী অসহায় অরক্ষিত সৌন্দর্যের হরিণীই একমাত্র উপমান।

মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।

নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
ঢেঁই পুরে হাসিয়া হাসিয়া ॥

নিষ্ঠুরতার সীমা আছে—মানবীয় নিষ্ঠুরতার। কৃষ্ণ-ভগবান কিন্তু ভগবৎ নিষ্ঠুরতায় দায়িত্বহীন। তাঁহার বাঁশীর সুরে যেহেতু শক্তি আছে, তার সামনে যেহেতু প্রতিরোধ নিষ্ফল, অতএব তিনি ঐশ্বরিক নিষ্ঠুরতার আনন্দে বাঁশী বাজাইবেন। এবং বাঁশী তো বাজিল! বাঁশীর ধ্বনি-প্রতিক্রিয়ার বিবরণে বৈষ্ণব সাহিত্য পূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলিব, উপরে উদ্ধৃত অংশের প্রথম দুই ছত্র অসামান্য। বাঁশীর প্রাণশক্তির ইহার চেয়ে বড়ো পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই। বাঁশী শুনিয়া রাধার ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়। রাধা কানে শুনিলেন বাঁশী, চোখে দেখিলেন শিলারাজি মিলাইতেছে, শশী নিকটে আসিয়া নাচিতেছে। সর্বগ্রাসী অদ্বৈতানুভূতি লাভের সূচনায় অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়। চণ্ডীদাস অতি প্রবল অধ্যাত্ম-উপলব্ধিকে প্রেমানুভূতিতে স্নিগ্ধ করিয়া ভাষায় ধরিয়াছেন।

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে
গৃহকর্মে থাকি সদাই চমকি গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ যেমন চোরের নারী ॥

কান্নার স্বাধীনতা নাই যেখানে, তেমন পাষাণ-সমাধি কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। গৃহবদ্ধ রাধা সেই জীবন্ত নরকে প্রোথিত। অশ্রু বড় পবিত্র—পুণ্যের গাঙ্গ্যবারি। কান্নার ধ্বনিই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত—সৃষ্টি-সঙ্গীতের সঙ্গে তাহার উৎস-সম্পর্ক। প্রকাশ্যে কাঁদিতে পারিবে না—রাধিকার উপর এই অভিশাপ। এই অভিশাপ আরো দুটি নারীর জন্য,—চোরের মা ও চোরের স্ত্রী। জাতিহৃদয়ের ভিতর হইতে নির্গত সহানুভূতিসূত্র তিনটি অন্যায়কারিণী নারীকে একত্র বাঁধিয়াছে। দুঃখের সহানুভূতিতে ঈশ্বর-নায়িকা ও তস্কর-আত্মীয়ারা একত্রিত।

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে
কলঙ্ক কলসী লইয়া ভাসিব পাথারে
কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ

কলঙ্ক রাধার কাছে 'জিত জলে, না যায় ত্যজন'। কলঙ্ক যেন প্রেমেরই প্রতিশব্দ। কলঙ্কের পরিমাণে প্রেমের পরিমাণ। তাই চণ্ডীদাস পিরীতি-বিষয়ে যেমন, তেমনি কলঙ্ক সম্বন্ধেও নিন্দা-প্রশংসায় মুখর। নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসা, অগৌরব অপেক্ষা গৌরব আপনই অধিক। কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া নিজ গৃহে আগুন লাগানোর ইচ্ছা, বা কলঙ্ককলসী লইয়া (ডুবিবার পরিবর্তে) ভাসিবার বাসনা—এসব ক্ষেত্রে কলঙ্কের অক্ষুণ্ণ মর্যাদা। চণ্ডীদাস 'কলঙ্ককে' কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া প্রেমের দ্বারা বরণীয় করিয়াছেন—মৃত্যু-সুখময় অসাধারণ পংক্তিটিতে তাহা দীপ্তরাগ—'তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।'

(১) সাঁঝে নিবাইল বাতি কবে পোহাইবে রাতি
গুণগণি হৃদয় বিদরে।

(২) যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি।...
জোয়ারের পানি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙানু
বঁধু ফিরে নাহি এল॥

(৩) ছায়ার আকারে ছায়াতে মিলায়
জলের বিম্বকি প্রায়।
যেন নিশাকালে নিশার স্বপন
তেমন পিরীতি তায়॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতুল
নাচায় যতন করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটি
বাজিকরে করে কেলি॥

তেমতি তোমার পিরীতি জানিল
শুনহে নাগর রায়। . . .

যৌবন ও প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্বসূচক ঐ তুলনাগুলিতে অপরিসীম নৈরাশ্য। এ নৈরাশ্য অনেকাংশে ট্রাজিক। বৈষ্ণবকাব্যে ট্রাজিক অনুভূতি অল্প; করুণ রসেরই প্রাধান্য। ট্রাজেডির উপজীব্য শূন্যতাবোধ, বৈষ্ণব পদে তাহা থাকা সম্ভব নয় সাধারণভাবে। কারণ একদিকে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ সব কিছু নিত্যমিলনের অন্তর্গত। অন্যদিকে, যদি আমরা কিছুকালের জন্য ঈশ্বরের চিরন্তনলীলার প্রসঙ্গ বিস্মৃতও হই, আধ্যাত্মিকতাকে ভুলি কিরূপে? আধ্যাত্মিক প্রেমে মাথুর বিরহেরও শান্তি আছে 'ভাবসম্মিলনে',—বহিরঙ্গে দর্শন বন্ধ হইতে পারে, অন্তরঙ্গ দর্শনকে নিবারণ করে কে—মথুরা-প্রস্থিত কৃষ্ণেরও তাহা অসাধ্য। এইখানে ভক্তের, প্রেমিকার জয় এবং সে জন্যই বিচ্ছেদে দুঃখাশ্রু আছে, কিন্তু অশ্রুস্তম্ভিত শোক নাই বৈষ্ণব কাব্যে। একেবারে কি নাই, আছে। একটি দৃষ্টান্ত বিখ্যাত,—জ্ঞানদাসের 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' পদ। চণ্ডীদাসের মধ্যে শূন্য শোকের কিছু অতিরিক্ত অবস্থান। এখানে উল্লেখের প্রয়োজন যে, 'সুখের লাগিয়া' পদটি জ্ঞান-দাসের মত চণ্ডীদাসেরও হইতে পারে।

বর্তমান আলোচনায় অলঙ্কারের যাথার্থ্যই আমাদের লক্ষ্যবস্তু। প্রথম উদ্ধৃতিতে অকাল সুখখণ্ডনের বেদনামথিত তুলনাটি যথেষ্টই প্রশংসাযোগ্য। রাত্রি দীর্ঘ ও অন্ধকারময়। দীপহীন সুদীর্ঘ নিশাযাপনের আশঙ্কায় কালো মন, রাধিকার। এই রাত্রিই ক্ষণমাত্র মনে হয়, যখন প্রিয়তমের বাহুবন্ধনে নায়িকা অবস্থান করে। তখন রাত্রি আলোক-রোমাঞ্চিত। দয়িতই রাত্রির দীপ—থাকিলে দীপালি, নইলে কালী অমাবস্যা—সমস্তই অলঙ্কারটির দ্বারা পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে অলঙ্কার-ব্যবহারে যেন নিজ স্বভাবকে রাধা লঙ্ঘন করিয়াছেন। পদটিতে যৌবন-বিলয়ে রাধার হতাশের আক্ষেপ। যৌবন বহিয়া যাইতেছে অথচ প্রিয়তমের সেবায় লাগিতেছে না,—এই ধরনের উচ্চমার্গীয় ভালবাসার রূপ বলিয়া রাধিকার প্রেমের ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু আমি পদটির বর্ণনাভঙ্গির দিকে একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে বলি। এখানে যৌবন-অর্ঘ্যে প্রিয়ার্চনার বঞ্চনা-দুঃখ অপেক্ষা যৌবন-

অপসৃতির জন্য আত্মপ্রীতিময় দুঃখই যেন সমধিক। যৌবন-সায়রে ভাঁটা পড়িতেছে, নারীর যৌবন জোয়ারের পানি, গেলে আর ফিরিবে না, যৌবনের গাছে ফুল না ফুটিতে ভ্রমর উড়িয়া গেল,—এই সকল অলঙ্কারে আছে যৌবন-প্রস্থানের নির্মম প্রত্যক্ষ বেদনাবোধ। সবচেয়ে মারাত্মক ছত্র—'জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব, যৌবন মিলন ভার।' অ-চণ্ডীদাসীয় এই ছত্রগুলিতে যাঁহারা যত বিব্রত বোধই করুন, বা ভিন্ন ব্যাখ্যায় তত্ত্ব বুঝাইতে চান (যেমন, তাঁহারা বলিতে পারেন যৌবন থাকিলে প্রিয়তমকে বেশি সুখ দান করা সম্ভব, সেইজন্যই রাধার নিজ যৌবনের প্রতি প্রীতি ইত্যাদি) মানবজীবনের সত্য-কাব্যরূপে আমরা ইহার রসপান করিতেছি।

তৃতীয় উদ্ধৃতি। প্রেমের স্বপ্নভঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের নৈরাশ্য উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশিত। 'নিশার স্বপন', 'জলবিম্ব', 'বাদিয়ার কাঠের পুতুল',—এগুলি সুখের ক্ষণরূপের অব্যর্থশক্তি উপমা। উপমান বস্তুগুলি রূপের প্রলোভন দেখাইয়া দর্শনমুগ্ধের প্রাণরস নিঙড়াইয়া লয়। একটি ছায়াচ্ছন্ন ব্যর্থতার ঔদাস্যময় না-দিবা না-রাত্রিলোকে আমরা উপস্থিত হই। মধুসূদন কি আত্মবিলাপ লিখিবার পূর্বে এই পদটি পড়িয়াছিলেন?

কবিতাপস চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাসের আলোচনা শেষ করিলাম। দীর্ঘ স্থান ধরিয়া প্রয়োজন অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তের অর্ঘ্য তুলিয়া ধরিয়াছি। চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর এত প্রীতি ও প্রণতির উৎস-সন্ধানই আমার উদ্দেশ্য ছিল এ আলোচনায়। এই আলোচনায় আমরা অধিকন্তু দেখিয়াছি, চণ্ডীদাস কেবল ভাবুক নন, কবিও বটেন। আলোচনাকালে এই তথ্যে আশ্বস্ত হইয়াছি যে, ভাবরসে ডুবিবার কালে আমার দেশবাসী কাব্যরস পান করিতে ভোলেন না। চণ্ডীদাস-গাথার সমাপ্তি-সঙ্গীতটুকুই এখন শুধু বাকি।

অথচ তাহা গান হইবে না। আমাদের কণ্ঠ রূঢ় কর্কশ ও রসহীন। পরমা শান্তির জগৎ হইতে আমরা নির্বাসিত, যে রাত্রি-রাজ্যের সভাকবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস কি আধ্যাত্মিক কবি? এখনো যদি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে একটিই উত্তর আছে—চণ্ডীদাসের মত কবিরা আছেন বলিয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি বাঙ্ময় হইতে পারিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের মত জীবন, চণ্ডীদাসের মত কাব্য—আধ্যাত্মিকতার এত বড় সাক্ষ্যপ্রমাণ আর কোথায় পাইব? যাঁহারা অধ্যাত্মদর্শন লিখিবেন, দৃষ্টান্তের জন্য তাঁহাদের বারবার ঐ প্রেমজীবন ও কবিজীবনের আঙিনাদ্বারে আসিতে হইবে। চণ্ডীদাস আত্মসমর্পণ করিয়া, নিজের সমগ্র চেতনার রূপান্তরে দিব্যসঙ্গীত শুনিয়াছিলেন,—তিনি যখন ভাবের ও রূপের কথা বলেন, তখন একরূপে, নিত্য চেতনার স্বরূপে, তাহাই চূড়ান্ত সৃষ্টি হইয়া যায়। চৈতন্যের পূর্বে বা পরে হউন, চণ্ডীদাস চৈতন্যের অনামাঙ্কিত যে স্বরূপ-চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহাই অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচিত্র—চৈতন্যতত্ত্বের মুখ্য কবি গোবিন্দদাসও সেখানে পরাভূত প্রজাপতি। ভাবাবিষ্টতায় সুস্নাত চিত্রটি স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না—

> অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
> যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
> পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
> সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লুটায়॥

কিংবা অভিনবের আবির্ভাবে সরল বিস্ময়ের চমৎকৃতি—

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু।
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল॥....
চণ্ডীদাস মনে মনে হা'.স।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥

'চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে'। চণ্ডীদাস শুধু হাসেন না, দেখেনও—'চণ্ডীদাস দেখে যুগযুগ।' গভীরতম অর্থেই তিনি আধ্যাত্মিক। তাঁহার রাধার প্রেমকে প্রাণময় বা সত্তাময় বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না—তাহা রক্ত, মাংস, এমনকি অস্থিময়। যেখানে প্রেমে নিত্য 'সতীদাহ'—যেখানে চূর্ণ পঞ্জরাস্থির উপরে প্রেমনিশান ওঠে—সে প্রেমকে গতানুগতিক অর্থে ধর্মীয় প্রেম বলিলে অসম্মান করা হয়—তাহা চরমার্থে আধ্যাত্মিক। পূর্বরাগে সত্তার জাগরণ, রূপানুরাগে দৃষ্টিপ্রদীপের আরতি, আক্ষেপানুরাগে বেদনাগ্নিতে আত্মশোধন, মিলনে একরাত্রির দীপান্বিতা, রসোদ্গারে স্মৃতিচর্বণ, প্রেম-বৈচিত্ত্যে জন্মান্তরীণ ভাবোদ্বোধন, মাথুরে নিশাগাহন এবং ভাবোল্লাসের নিত্যবৃন্দাবন। অধ্যাত্মসাধনার এমন বিকাশক্রম আর কোথায় পাইব! বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই মিস্টিক। রাগাত্মিকতার সঙ্গে মিস্টিসিজমের গভীর সম্পর্ক; চণ্ডীদাস রাগাত্মিকতার ভাবুক ও সাধক। তিনি মৌনের মহান সঙ্গীতকার। তিনি এত বলিয়াছেন, তবু যেন কিছুই বলেন নাই। তিনি নৈঃশব্দ্যের মহাকবি। শব্দ লইয়া কাব্য। সে শব্দ প্রাণধ্বনিকে উন্মুক্ত করে। প্রগলভ চঞ্চলতা, সহর্ষ উচ্ছ্বাস, উদ্দীপ্ত উল্লাস, সমুদ্রবিস্তার ব্যাপ্তি, নীরব-সায়রে গাহন—প্রাণের কত 'রূপ'-ই আছে!

চণ্ডীদাসের রাধা অপরপক্ষে জীবনের ঐকান্তিক অপস্তৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাপ্তির উৎসবরাত্রে লোককণ্ঠের কোলাহল ;—এ রাধা পাইল না। 'কূলে কূলে স্তব্ধ নিটোল গভীর ঘন কালো' একটি অশ্রুময় চিরবিশ্রাম,—তাহার জন্য। সেখানে কেহ নাই, সখীরা পর্যন্ত নয়—নৈঃশব্দ্যের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে চেতনার স্বর্ণরেখার মত একটি রূপকে—রাধিকাকে—দূর হইতে দেখার সৌভাগ্য—সে আমাদের যুগযুগের সৌভাগ্য।

সেই রাধার পাশে রাধা-কবি। বেদনার কালীদহে সিত পদ্মের মত এই কবি। চণ্ডীদাস কবি-তাপস। এত অনাবরণ অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে! প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, কান্না যে বিগলিত নয়ন, এবং হাসি যে ছলোছলো আত্মা—চণ্ডীদাসই তাহা জানাইয়াছেন। যত মৃদুকণ্ঠে করা হোক না কেন, 'তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত স্তোত্র বা বন্দনাই কর্কশ ও শব্দমুখর মনে হয়।' তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে তাই ভয় জাগে। এত শান্ত, সুস্থির, শিশিরবিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা।

রবীন্দ্রনাথের কথায় শেষ করি। চণ্ডীদাসের রাধার সৃষ্টিরহস্য মহাকবির ভাষায় এইরূপ—

> হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু-
> সলিল-মাঝে
> আজি এ অমল কমলকান্তি
> কেমনে রাজে।
> একটিমাত্র 'রাধা'-শতদল
> আলোক-পুলকে করে চলচল
> কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
> এমন সাজে
> আমার অতল অশ্রু-সাগর-
> সলিল মাঝে।

একটি শব্দ পাল্টাইয়াছি—'শ্বেত শতদলের' বদলে 'রাধা'-শতদল। একটি মাত্র শব্দের পরিবর্তনে রবীন্দ্র-কণ্ঠে চণ্ডীদাসের আত্মকথা পাইলাম। আমি ক্ষমা পাইব।

শৈব কবি বিদ্যাপতি

মধ্যযুগের সার্বভৌম কবি বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি-বিষয়ক এক আলোচনায় অন্যত্র তাঁহাকে মধ্যযুগের পূর্ব-ভারতের কবি-সার্বভৌম বলিয়াছি। কবি সম্বন্ধে সেই আখ্যা পুনশ্চ স্বীকার করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ আরম্ভ করা চলে। বিদ্যাপতি-বিষয়ে আরো প্রশংসা করিবার আছে। (কেবল মধ্যযুগের পূর্বভারতে নয়, আধুনিক-পূর্ব ভারতের সমগ্র কবিসমাজে বিদ্যাপতি আসন দাবি করিতে পারেন। এবং সৌন্দর্য ও প্রেম-মনস্তত্ত্বের কবিরূপে মধ্যযুগে ভাষা-সাহিত্যে তিনি সম্ভবতঃ অদ্বিতীয়।)

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমি যে গুরু গৌরব দাবি করিতেছি, তাহার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। বিদ্যাপতির সমকালে বা সন্নিহিত কালে ভারতবর্ষের নানা-স্থানে মহৎ প্রেরণার নানা কবি আবির্ভূত হইয়াছেন। ভারতের জনমানসে তাঁহাদের স্থান বিদ্যাপতি অপেক্ষা নিম্নে নয়। বাংলাদেশে চণ্ডীদাস, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে কবীর, দাদূ, সুরদাস, মীরাবাঈ, তুলসীদাস,—ইঁহাদের সঙ্গীত ও কবিতার অতি গভীর প্রবেশ লোকমনে। যথার্থ জাতীয় কবিরূপে ইঁহারা আসীন। 'মহাজন' কবিরূপে গৃহীত এইসকল কবির কাহাকেও অবনত করার কথা আমরা চিন্তাও করিতে পারি না। তবে বিদ্যাপতি সম্পর্কে ঐ উচ্চ বিশেষণের অর্থ কি? ইহার অর্থ—বিদ্যাপতি সম্পর্কে আমাদের দাবি মহাজন কবিরূপে নয়, —নিছক কবিরূপে—এবং বিদ্যাপতিকে যদি ঐ কবিদের বা ঐ যুগের অন্য কোন মহান কবির উপরে স্থাপন করিয়া থাকি, সে লৌকিক কবি হিসাবেই। বিদ্যাপতি ভক্তকবি হইতে পারেন—তাঁহার ভক্তিকাব্যের সঙ্গে অন্য ভক্ত কবির রচনার তুলনা-মূলক বিচার চলিতে পারে—কিন্তু তিনি, আমরা সুস্পষ্টভাবে জানাইতে চাই, মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ সাধারণ প্রেমের কবি ছিলেন। কবিরূপে তাঁহার গুণ-মহিমা তাঁহার প্রেমকাব্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। আমরা প্রধানতঃ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবিরূপেই বিদ্যাপতির

বিচার করিব। অবশ্য আধ্যাত্মিক কবিকেও অস্বীকার করিব না। বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিকতা দেহপ্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি; প্রেম গভীর হইলে অগ্নিশুদ্ধ, ত্যাগপূত হয়—অনিবার্যভাবে আপনার মধ্যে আহ্বান করে অধ্যাত্ম সত্যের ভাস্বরতা। বিদ্যাপতির কাব্য তাহাতে বঞ্চিত নয়। দেবদেবীকে অবলম্বন করিয়া প্রেমকবিতা লিখিতেছেন—এ ধারণা বিদ্যাপতির অবশ্যই ছিল, সুতরাং তাঁহার প্রেমকাব্য একাংশে নিশ্চিতই অধ্যাত্মকাব্য। কিন্তু যদি সমস্ত ভারতবর্ষের কবি-সমাজে বিদ্যাপতিকে উপস্থাপিত করিতে হয়, তবে লোকরসের কবি হিসাবেই করিতে হইবে। বিস্তারিতভাবে আমি সেই চেষ্টাই করিব। ব্যর্থ হইলেও যদি ভবিষ্যতে এই সামান্য প্রয়াসের দ্বারা 'বিদ্যাপতি একজন কবি ছিলেন'—এই ধারণার কিছু সৃষ্টি হয়, আমি গৌরব বোধ করিব। বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন—ইহা প্রথমেই ধরিয়া লইয়া ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার লাভ ও ক্ষতি দুইই হইয়াছে। একদিকে তিনি বিনা চিন্তার ভক্তি পাইয়াছেন, অন্যদিকে, আধুনিক কালের অনাধ্যাত্মিক উদাসীনতায় পরিত্যক্ত হইয়াছেন। বিদ্যাপতিকে ভারতীয় প্রেমকাব্যের ধারাবর্তী কবিরূপে স্বীকার করা হয় নাই তাহা নয়—সে বিষয়ে মূল্যবান ইঙ্গিতসহ নাতি বিস্তারিত আলোচনা ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের গ্রন্থে মিলিবে—কিন্তু বিদ্যাপতির প্রেমকবি পরিচয় এখনো কোনো বিস্তারিত আলোচনার বিষয়বস্তু হয় নাই।

মূল প্রতিপাদ্যে প্রবেশের পূর্বে কিছু পরিবেশ-সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। বিদ্যাপতির মনোগঠনের উপাদানসম্ভার কিভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল, সে আলোচনা না করিলে কবিকে পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝা শক্ত। সে জন্য বিদ্যা-পতির ব্যক্তিজীবন—বংশ, পারিপার্শ্বিক, শিক্ষাদীক্ষা, বৃত্তি, জীবনের উত্থান পতন, যুগজীবন, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে অবতরণ করিতে হইবে। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সেই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পুরাতন তথ্য-গুলিকে প্রতিপাদ্যের প্রয়োজনে নূতনভাবে সাজাইয়া লওয়া ছাড়া এ অংশে আমাদের অধিক কিছু করণীয় নাই। কেবল বিদ্যাপতির ধর্মমত বিষয়ক আলোচনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। বিদ্যাপতির ধর্মদৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে

নির্ধারণের প্রয়োজন আছে, কাব্য-বিচারেও। কী সে প্রয়োজন আমরা আলোচনাকালে জানাইব। সেই সঙ্গে বিদ্যাপতির কাব্যবিচারে এখনো পর্যন্ত অবহেলিত শিব-শক্তি বিষয়ক পদগুলির মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা চলিবে। আলোচনা সেই অংশে মূল উপজীব্যের পক্ষে ঈষৎ দীর্ঘায়ত হইলেও বিদ্যাপতির মনোরূপের সন্ধানে তাহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

বিদ্যাপতির ব্যাপক অভিজ্ঞতা—রচনায় তার প্রভাব

বিদ্যাপতির জীবনের ব্যাপ্তিকাল পণ্ডিতগণের হিসাব অনুযায়ী প্রায় এক শতাব্দী—চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সুন্দর আলোচনা করিয়া জীবনকাল মোটামুটি ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ পর্যন্ত ধরিয়াছেন। তাঁহার গবেষণামূলক সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে বাধা পাই।

তার মানে বিদ্যাপতি শত শরতের সব কয়টি দেখিতে পান নাই। একশো শরৎ দেখিব, বাঁচিব, এবং শুনিব—এই আর্ষ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ ছিল কবির জীবনে। কিন্তু যাহা পূর্ণ হইয়াছিল—তাহাই যথেষ্ট। শতাব্দীর স্পর্শস্পর্ধী তাঁহার জীবনে ছিল শতাব্দীর অর্জন এবং ক্ষয়। মিথিলার কবি-পিতামহ দেহত্যাগ করিবার পূর্বেই নিশ্চয় বহু জীবনে শান্তিপর্বের প্রজ্ঞাবাণী বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ অনুমান করিয়া আমরা আনন্দিত।

সে অনুমানের কারণ আছে। ভারত-ইতিহাসের সঙ্কটক্ষণের দ্রষ্টা-পুরুষ তিনি। ইতিহাসকে তিনি কেলিকোকিল কবির মত অস্বীকার করেন নাই। তাহার ইতিহাস-চেতনার পরিচয় প্রথম যৌবনে রচিত 'কীর্তিলতা' গ্রন্থেই লভ্য। ঐ কাব্যে তিনি সমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন,—যুদ্ধের ফলে সমাজের নীতি-বিপর্যয় ও কেন্দ্রোৎখাত, সামাজিক মূল্যবোধের বিনাশের রূপ,—তাহাতে কেবল জীবন্ত উজ্জ্বল সমাজচিত্রই মিলিতেছে না—চিত্রের পশ্চাৎবর্তী ইতিহাসদ্রষ্টা এক দার্শনিক চিত্তকেও পাইতেছি। তদুপরি প্রথম যৌবনেই কবি নির্লিপ্ত রসিকতার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সে শক্তি যথার্থ শিল্পীর—কালায়ত্ত হইয়াও নিজ সত্তাকে কালোত্তীর্ণ করিবার আশ্চর্য স্রষ্টা-শক্তি। বিদ্যাপতি কত বড় প্রবুদ্ধ মনের অধিকারী ছিলেন কীর্তিলতা তাহার প্রমাণ।

যৌবনে যে মন লাভ করিয়াছেন, সেই তীক্ষ্ণ গভীর অনুভূতিময় মনকে তিনি দীর্ঘ জীবন বহন করিয়াছেন। মিথিলার ওইনিবার-কামেশ্বর বংশের

সঙ্গে কবির পূর্বপুরুষাগত সংযোগ। বিদ্যাপতির পূর্ব-পুরুষেরা অমাত্যাদি সম্পর্কে এই রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতি এই বংশের রাজকবি। কবির বুদ্ধি ও শিক্ষার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি এই রাজবংশের কাছে কেবল কবিরূপেই গৃহীত ছিলেন, মনে হয় না; মনে হয়, সে পরিচয় ছিল নানামুখী,—তিনি যেন এই রাজবংশের 'বন্ধু ও দার্শনিক'; কবি তো বটেনই। এবং সে কি একজন রাজার? বিদ্যাপতির যুগে ভারতবর্ষে রাজরক্তে হোরিখেলা চলিতেছে—মিথিলাও বাদ পড়ে নাই। রাজা আসিয়াছে, গিয়াছে, বিদ্যাপতি সিংহাসনের পাশে বসিয়া কবিতা কহিয়াছেন, এবং আরও কিছু কহিয়াছেন। রক্ত, ক্লেদ, হিংসা ও শৌর্যের রাজপ্রাঙ্গণে দু'দণ্ডের শান্তির মত একদিকে উৎসারিত হইয়াছে কবি বিদ্যাপতির মদনমথন গীতি, অন্যদিকে, হয়ত সেই সঙ্গে উচ্চারিত হইয়াছে চিরদিনের কোন অমৃত অভয় আশ্রয়-বাণী।

এত যিনি দেখিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাঁহার চোখের কোণে কালির রেখা গাঢ় হয়ই। সহজ জীবন হইতে বিক্ষত অভিজ্ঞতায়, তরল আনন্দ হইতে গাঢ় সুখে, সরল রেখা হইতে বক্র ভঙ্গিমায়, উৎফুল্ল প্রণয় হইতে উত্তেজিত ইন্দ্রিয়লিপ্সায় তিনি নিক্ষিপ্ত হনই। বিদ্যাপতির কাব্যে সে মনের স্বাক্ষর আছে। আমরা সে মনের যথেষ্ট পরিচয় পরে লইব। এখন পুনরায় বিদ্যাপতির ব্যক্তিচরিত্র লক্ষ্য করা যাক।

বিদ্যাপতির জীবনের দুইটি পরিচয় আমাদের নিকট স্পষ্ট—এক, তাঁহার জীবনের প্রবৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, দুই, বিপুল পাণ্ডিত্য। অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিয়াছি, তিনি কামেশ্বর রাজবংশের উত্থান-পতনের দ্রষ্টা। কেবল দ্রষ্টা বলিলেই সব বলা হয় না, তিনি ঐ বংশের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে গাঁথিয়াছিলেন যে, রাজবংশের উত্থান-পতন তাঁহার ব্যক্তিভাগ্যের উত্থান-পতনও বটে। বিদ্যাপতির বয়স যখন অনধিক পঁচিশ, তখন তিনি, শোনা যায়, নৈমিষারণ্যে ছাত্ররূপে বাস করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির এই অরণ্যবাস প্রাচীন ভারতীয় ছাত্রের মত তপোবনবাস—এমন মনে করিতে অনেকে অনিচ্ছুক। দেবসিংহ, কীর্তিসিংহ তখন পৈতৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছেন, বিদ্যাপতিও হয়ত তাই নৈমিষারণ্য-বাসী। এরপর আবার তিনি দেশে ফিরিয়াছেন, কারণ কীর্তিসিংহ-

দেবসিংহ-শিবসিংহও করিয়াছেন। পুনরায় দেখা গেল বিদ্যাপতি 'সিংহ'-প্রতাপের আশ্রয়ে পরম সুখে কাব্যরচনায় নিযুক্ত আছেন। কামেশ্বর বংশের ভাগ্যবিপর্যয় আবার ঘটিল,—সুতরাং বিদ্যাপতিরও। তিনি রাজবনৌলিতে অশিক্ষিত রাজা পুরাদিত্যের আশ্রয়ে পলাতক জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। মিথিলায় অতঃপর আবার কামেশ্বর-বংশ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিদ্যাপতিও পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠ হইলেন,—পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবীর বিদগ্ধ সাহচর্যে তাঁহার জীবন কাটিতে লাগিল। ইহার পরেও বিদ্যাপতির জীবন-বিপর্যয় হইয়াছিল কিনা জানি না, আমাদের নিকট সেরূপ কোনো তথ্য নাই, কিন্তু না হইলেই আশ্চর্য—বিদ্যাপতি শান্ত জীবন যাপন করিতেছেন, ইহা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না।

বিদ্যাপতির জীবনের যে ঘটনা-বন্ধুরতার কথা বলিলাম, সে বিপর্যয়ের কোনো মূল্য নাই যদি তাহা জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে না পারে। আসল কথা, ইতিহাসের পরিবর্তন মনঃস্বরূপে কি পরিবর্তন আনিল? বিদ্যাপতির বিষয়ে বলা চলে, নিরুদ্ধ মন লইয়া তিনি ইতিহাস-তরঙ্গে মথিত হন নাই—তাঁহার মনও মথিত হইয়াছিল—তাঁহার রচনার সাক্ষ্যে বলা যায়, ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একেবারে প্রথম জীবনের কথাই ধরা যাক—অনধিক পঁচিশ বৎসর বয়সে বিদ্যাপতি রচনা করেন 'ভূপরিক্রমা'। মিথিলা হইতে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত ভূভাগের তীর্থাদির বিবরণ এই রচনায় মেলে। বিদ্যাপতিকে পলাতকরূপে (বা ছাত্ররূপে) নৈমিষারণ্য পর্যন্ত ভূভাগ পরিক্রমণ করিতে হইয়াছিল; উদাসীন অন্যমনস্ক পথিক বা কেবল সন্ত্রস্ত আশ্রয়-প্রার্থীরূপে তিনি স্থান পরিক্রমণ করেন নাই,—তিনি সতর্ক চোখে দেখিয়াছিলেন ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—এতভাবে করিয়াছিলেন যে, তাহার দ্বারা একটি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পরে বিদ্যাপতির দুই উল্লেখযোগ্য রচনা—অবহট্ট ভাষায় রচিত কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা। কীর্তিলতার বিষয়বস্তু—অসলানকে পরাভূত করিয়া কীর্তিসিংহের রাজ্যলাভ, এবং কীর্তিপতাকার বিষয়—শিবসিংহের শৃঙ্গারলীলা ও বীরকীর্তি।

এই দুই গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য সম্বন্ধে মন্তব্য পূর্বেই করিয়াছি—ইহারা বিদ্যাপতির ইতিহাসবোধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই

দুই রচনায় যুদ্ধাদি বর্ণনায় বাস্তবতায় প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান করেন, হয়ত কবি স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। যদি সেকথা সত্য হয়, তাহা হইলে, আমরা বিদ্যাপতির মধ্যে চতুর্দশ শতকের এক সৈনিক-কবিকে পাইতেছি।* ইতিহাসাশ্রিত গ্রন্থ দুইটির পরে শিবসিংহাদির রাজাশ্রয়ে কবি বৈষ্ণবপদ রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তারপরে আবার ভাগ্যবিপর্যয় হইলে যখন রাজবনৌলিতে তিনি পুরাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেখানে রচনা করিলেন পত্ররচনার রীতি-সম্বলিত 'লিখনাবলী'। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমান, অশিক্ষিত রাজা পুরাদিত্যের প্রয়োজনে রচিত এই গ্রন্থ বিদ্যাপতির সন্তুষ্ট মনের সৃষ্টি নয়।

সেকথা সত্য হইতে পারে, নাও পারে, আশ্রয়লাভে কৃতজ্ঞ কবি ঋণশোধের জন্যও 'লিখনাবলী' লিখিতে পারেন—কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট—বিদ্যাপতি বসিয়া নাই। জীবনের এই অধ্যায়ে বিদ্যাপতি যে, মনে মনে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার একটা পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া হয়। এইকালে বিদ্যাপতি স্বহস্তে ভাগবতের অনুলিপি করিয়াছেন (?)—ইহা উদ্‌ভ্রান্ত কবির অধ্যাত্ম শান্তি-সন্ধানের প্রয়াস—এইরূপ কোনো কোনো ভাবুক পণ্ডিতের মত। এরপর আবার বিদ্যাপতি কামেশ্বর বংশের আশ্রয়ে ফিরিয়াছেন, 'বিশ্ববিখ্যাতকীর্তি' বিশ্বাসদেবী ও 'সংগ্রামে ভীম সদৃশ' পদ্মসিংহ —এই রাজদম্পতির সাহচর্যে তাঁহার দীর্ঘজীবন কাটিয়াছে এবং তিনি নানা গ্রন্থ ও পদ রচনা করিয়াছেন অক্লান্তভাবে।

বিদ্যাপতির উপর অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া দেখিলাম। এইখানে দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে; এক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিদ্যাপতির পরবর্তী রচনার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই;

* একমাত্র ইন্দ্রিয়কামনার কবিরূপে জয়দেব সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করিয়া আছি, তা সম্পূর্ণতঃ সত্য না হইতেও পারে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জয়দেবের অন্য পরিচয়, বিস্ময়কর কথা, ঐ 'সৈনিক কবি' পরিচয় কিছুটা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।—"এই গ্রন্থে (সদুক্তিকর্ণামৃতে) জয়দেবের ৩১টি শ্লোক আছে, তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দের শ্লোক; কয়েকটি আছে প্রকীর্ণ শ্লোক, দু'একটি লক্ষ্মণসেনের স্তুতি-শ্লোক, বাকি সবগুলিই যুদ্ধ, শৌর্যবীর্য, তূর্যনিনাদ, সংগ্রামকীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধীয়। সন্দেহ হয়, জয়দেব বীররসেরও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্লোকগুলি সেই কাব্যের; কিন্তু সে কাব্য আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই।"

কীর্তিলতাদি রচনা তাঁহার প্রথম জীবনেরই। ইতিহাসবোধের যে পরিচয় ঐ রচনাদিতে পাওয়া যায়, ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করিব, সে জাতীয় রচনা পরবর্তীকালে মিলিতেছে না। ইহার কারণ, হয়ত বিদ্যাপতি মধ্য-জীবনে অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক সুস্থিরতার মধ্যে বাস করিয়াছেন, অথবা, তিনি তখন অধিকতর পরিমাণে কবি—সমাজবার্তার পরিবর্তে হৃদয়বার্তা নিবেদনের জন্য উদ্‌গ্রীব। তবে বিদ্যাপতির সমাজবোধ যাইবার নয়; পদাবলীতে ব্যবহৃত লৌকিক প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে তাহা ছিন্নাকারে ধৃত।

বিদ্যাপতির গ্রন্থতালিকায় দৃষ্টি বুলাইয়া গেলেও তাহার বিষয়-ব্যাপ্তিতে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতিভার বহু-ব্যাপকতা, ইচ্ছা ও রুচির বৈচিত্র্যের প্রমাণ সেখানে মেলে। ভূপরিক্রমা, কীর্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিপতাকা, লিখনাবলী, শৈবসর্বস্বহার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসাগর, দানবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী—অর্থাৎ ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়, স্মৃতি, নীতি ও পত্র-রীতি—সর্ব বিষয়ে তাঁহার আকর্ষণ ও অধিকার। তদুপরি আছে সহস্রমত বৈষ্ণব ও শৈব পদ, যাহাদের উপর তাঁহার কবি-মহিমার ভিত্তি।

বিদ্যাপতির বৃত্তিজীবন-বিষয়ে আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাইতেছি, এই রাজকবি অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকও ছিলেন। কবির বয়স যখন আশীর মত তখনও তিনি স্মৃতির অধ্যাপকরূপে ব্রাহ্মণসর্বস্বের অধ্যাপনা করিতেছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনাও তিনি নিশ্চয় সারা-জীবন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ বিদ্যাপতি শুধুই কবিতা লেখেন নাই—জ্ঞানের দুরূহ কৃচ্ছ্রগম্য পথে শেষদিন পর্যন্ত পরিক্রমণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি পণ্ডিত ছিলেন।

এই কবি কিন্তু তাঁহার মাতৃভাষাকে ভালবাসিয়াছেন। প্রথম যৌবনেই। সংস্কৃতের অতবড় পণ্ডিত ও গ্রন্থকর্তার এই দেশভাষাপ্রীতি গৌরবজনক মানস-বিস্তৃতির পরিচায়ক। বিদ্যাপতি যখন প্রথম যৌবনে খেলন কবি—'খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী'—তার পূর্বেই তিনি সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যার বশে বলিতে পারিতেছেন—'বালচন্দ্র ও বিদ্যা-পতির ভাষা, এই দুই জিনিসে দুর্জনের উপহাস লাগে না, কারণ বালচন্দ্র পরমেশ্বর হরের শিরে শোভা পায় এবং বিদ্যাপতির বাণী নাগরজনের মন মুগ্ধ করে',—তখনো তিনি দেশভাষা-প্রেমিক। মানস-প্রগতির প্রমাণ রাখিয়া

এইকালেই তিনি বলিয়াছেন—'সংস্কৃত-বাণী ভাবনা করে বুধজন ; প্রাকৃতের রসের মর্ম কেউ পায় না ; দেশআলি বচন সর্বজনমিষ্ট। তাই তেমনি করিয়া দেশী ঢঙে আমি অবহট্‌ঠে কথা বলিতেছি'।*

সাহিত্যের পক্ষে প্রসাদগুণ, মিষ্টতা, জনবোধ্যতার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিদ্যাপতি যেমন সচেতন, তেমনি সচেতন—যে সচেতনতা আরো মূল্যবান—সাহিত্যের যোগ্য ভাষাবাহন সম্বন্ধে। বিদ্যাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছেন প্রথম জীবনের কীর্তিলতায়। সমাজ বা রাষ্ট্রের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ইহার পরেও তিনি সংস্কৃতে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, কিন্তু মৌলিক সাহিত্যরচনা দেশীয় ভাষা ভিন্ন করেন নাই। বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী তার প্রমাণ। বিদ্যাপতির রচনায় ভাষা-বৈচিত্র্য তাই কবির মনোধর্ম বুঝিবার সহায়ক। তিনি সংস্কৃতে, অবহট্‌ঠে এবং মৈথিলে লিখিয়াছেন। সর্বভারতীয় প্রয়োজনে সংস্কৃত, একেবারে স্থানীয় প্রয়োজনে অবহট্‌ঠ এবং পূর্বভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমাদর কামনায় মৈথিল। এ বিষয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অভিমত গ্রহণযোগ্য—"মনে হয় যেসব বিষয়ে কবিতা পড়িবার আগ্রহ কেবলমাত্র মিথিলাবাসীদেরই হইবার কথা, এরূপ বিষয় লইয়া কবি অবহট্‌ঠ ভাষায় রচনা করিয়াছেন ; পূর্বভারতের কাব্যরসিকেরা যেরূপ কবিতা শুনিতে উৎসুক হইবার সম্ভাবনা তাহা তদানীন্তন বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য-যুক্ত মৈথিলী ভাষায় লিখিয়াছেন ; আর সমগ্র ভারতের পণ্ডিত সমাজের জন্য যখন 'ভূপরিক্রমা', 'পুরুষপরীক্ষা', 'বিভাগসাগর', 'শৈবসর্বস্বহার' প্রভৃতি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, তখন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।"

বিদ্যাপতি কর্তৃক পদাবলীর জন্য মৈথিলভাষা ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের ধারণা যদি সত্য হয়—তাহা হইলে বিদ্যাপতি সত্যই যুগোত্তীর্ণ কবি। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কাব্যমূল্যের হিসাবে তাঁহাকে যুগোত্তীর্ণ কবি বলিতেছি না—কাব্যমূল্যে. নিশ্চয় কিয়দংশে তাঁহার

---

*সক্কয় বাণী বুহঅন ভাবই
পাউঅ-রস কো মম্ম না পাবই।
দেসিল বঅনা সবজন-মিট্‌ঠা
তেঁ তৈসন জম্পওঁ অবহট্‌ঠা।

যুগোত্তীর্ণতা আছে—আমি অগ্রগামী চিন্তার নায়ক বিদ্যাপতির কথাই ভাবিতেছি। বিদ্যাপতি সচেতনভাবে বাংলা-উড়িষ্যা-আসামের বোধগম্য মৈথিল ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার মৈথিল পদাবলী যে প্রদেশগণ্ডি অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা সকলেরই জানা আছে। বরং নিজ প্রদেশের বাহিরেই তাঁহার অধিক কবি-সমাদর। যদি তিনি সত্যই সমগ্র পূর্বভারতের সাধারণ কবিভাষার কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এক মহান স্বপ্নের দ্রষ্টা বলিতে বাধা থাকে না।

কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকার কবিরূপে বিদ্যাপতি ইতিহাসবোধ এবং যুগপ্রয়োজন বুঝিবার সামর্থ্য দেখাইয়াছেন, একথা বলিয়াছি। কাব্যের উপযোগী ভাষা-বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তের পর্যালোচনাও করা হইল। দেখা গেল, এ সকল ব্যাপারে বিদ্যাপতি কিরূপ প্রগতিশীল। তথাপি শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতির জীবন বিপরীত চিন্তায় ও কর্মে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। নিজ জীবনের অন্তর্বিরোধময় ভাবধারা সম্বন্ধে তিনি কতখানি সজ্ঞান ছিলেন জানি না, কিন্তু ঐ সংঘাত যে ছিল, তাহা দূর হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কবিরূপে বিদ্যাপতি সারা জীবন মদনমুজ্জ্বল গীতি গাহিয়াছেন। যিনি রাষ্ট্রের ভাঙ্গাগড়ার স্রোত-মধ্যে ছিলেন, তরবারির রক্তচুম্বন অসংখ্য বার দেখিয়াছেন, রাষ্ট্র-বিপর্যয়কালে বেশ্যার স্তন সন্ন্যাসীর বক্ষে বিমর্দিত দেখিয়া কৌতুককারুণ্য বোধ করিয়াছেন, তাঁহাকে কিন্তু সারাজীবন স্তন-চুম্বনের কাব্য লিখিয়া যাইতে হইয়াছে। অথচ ব্যঙ্গভরে তাহা করেন নাই, ভারতচন্দ্রীয় সিনিসিজ্‌ম্ তাঁহার ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্র যেমন বিনাযুদ্ধের মহাসেনাপতি, দেবসিংহ-কীর্তিসিং-শিবসিংহ-পদ্মসিংহ সত্যই তাহা ছিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধের বর্ম পরিতে পারিতেন এবং যুদ্ধান্তে বর্ম ছাড়িয়া কপাট-বক্ষে অগুরুচন্দন লেপিয়া মদনকুঞ্জে প্রবেশ করিতেন। বিদ্যাপতি ছিলেন এই পরিবেশের কবি। রাজসভাশ্রয় একদিকে তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ার্চনার পুরোহিত-কবি করিয়াছিল, অন্যদিকে ঐ রাজসভাশ্রয়ই এমন একটি বিপুল বিক্ষুব্ধ অভিজ্ঞতার অধিকার দিয়াছিল, যাহা ভিন্ন বিদ্যাপতির জীবনমহিমা পূর্ণায়িত হইত না।

তবু বিদ্যাপতি এইখানেই সমাপ্ত নন। দারিদ্র্যের যমমূর্তি দেখিলেও জীবনে প্রভূত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছেন সৎ বা অসৎ পথে (তাঁহার স্বীকারোক্তি

অনুযায়ী অসৎ পথেও বটে—যদি সে স্বীকারোক্তি বিনয়বশে অথবা আত্মকলঙ্ক-জ্ঞাপন না হয়), কিন্তু একেবারে শেষ জীবনে সেই ঐশ্বর্য তাঁহার নিকট অভিশাপস্বরূপ হইয়াছিল। ধনসম্পদ অযোগ্য পরিজনে ছড়াইয়া ভোগ করিতেছে—এই যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে; স্মৃতি-শাস্ত্রের তিনি অধ্যাপক এবং বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থকার, তবু শুদ্ধা ভক্তির জন্য কাঁদিয়াছেন; রসশাস্ত্রের অধ্যাপক ও কাব্যালঙ্কারের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তবু পণ্ডিত-গণের 'অনুভবহীন রস-অনুগমন' লইয়া আর্তচিত্ত হইয়াছেন। ইহার উপর বিদ্যাপতির আত্মসম্মানী স্বভাবের আরো নিদর্শন ঐতিহাসিক দিয়াছেন। অমন বিখ্যাত বংশের সন্তান হইলেও বিদ্যাপতি নিজ রচনায় বংশগৌরব খ্যাপন করেন নাই। ইহার কারণ, বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষেরা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য পুরুষ ছিলেন না, তাঁহাদের আত্মীয়াদির তুলনায়। আত্মাভিমানী বিদ্যাপতি নিজ পূর্বপুরুষের সম্বন্ধে অহেতুক গুণজ্ঞাপনকে অপমানজনক মনে করিতেন।

বিদ্যাপতির এই দ্বিতীয় স্বভাব—গভীরতর স্বভাব —ইহার জন্যই তাঁহার ব্যক্তিজীবন অপরিচয়ের অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের নিকট আকর্ষণীয়। জনসাধারণও বিদ্যাপতির ব্যক্তিজীবনে আকৃষ্ট—লছিমা দেবীর সঙ্গে তাঁহার পরকীয়া প্রেমের কল্পনায় প্রাকৃতচিত্ত রসবিহ্বল। আমাদের নিকট নিশ্চয় ঐ কারণে তাহার ব্যক্তিমন লোভনীয় নয়—অন্য কারণও আছে—বিদ্যাপতির রচনায় কিছু স্থানে ব্যক্তিস্বভাবের যে উন্মোচন দেখিয়াছি, তাহা সেই যুগে কবিদের মধ্যে সহজে প্রাপ্তব্য নয়। বিদ্যাপতির ব্যক্তিস্বভাবের সেই আলোচনায় অতঃপর অবতরণ করিব। বিদ্যাপতির প্রার্থনা ও আত্মকথন-মূলক পদগুলি এ ব্যাপারে আমাদের অবলম্বন। কবির ধর্মবিশ্বাসের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনাও তারপর স্বাভাবিকভাবে আসিবে।

প্রার্থনা-পদে বিদ্যাপতির মনের রূপ

মিত্র-মজুমদার সংস্করণ বিদ্যাপতি-পদাবলীর দ্বিতীয় পদটিতে 'গ্যাসদীন সুরতানের' নামোল্লেখ আছে, ভণিতায়। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ১৪১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বিদ্যাপতির জন্ম হইলে পদটি বিদ্যাপতির ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। পদটি এইরূপ :—

"কেশ আলুথালু, কুসুমদাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অধর দশনে খণ্ডিত। দেখিতেছি নয়ন যেন রক্তিম কমলদলের ন্যায়, (তাহাতে) মধুলোভে ভ্রমর বসিয়া আছে (রাত্রি জাগরণজনিত রক্তিম চোখের নীচে কালো দাগ)। কলাবতি, আজ ছলনা করিও না, লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমাকে বল, কোন্ নাগরের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছ? সুন্দরি! পীন পয়োধরে মনোহর নখরেখা হাত দিয়া ঢাকিতেছ কেন? মেরুশিখরে নব শশধর (নখরেখা) উদিত হইলে চুরি গোপন থাকে না। বিদ্যাপতি বলেন, ব্যক্ত চুরি কতক্ষণ অপ্রকাশিত থাকিবে?" (২)

এই পদ রাজনামাঙ্কিত এবং সংস্করণের দ্বিতীয় পদ। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি, বিদ্যাপতির একেবারে প্রথম জীবনের যে পদগুলি পাওয়া গিয়াছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। এখন আর একটি পদ উদ্ধৃত করিব :—

"শৈশব সময়ে মায়ের নিকট দুধ পান করিয়াছ; তারপর কাঁচা কোমল শরীরকে কত দধি দুধ ঘি খাওয়াইয়াছ। চুরি করিয়া চন্দন চিবাইয়া নিজের (স্ত্রীর) সহিত ও পরের (স্ত্রীর) সহিত মিলন (সমাজ) কিরূপ বুঝিলে (?)। তুমি নির্লজ্জ, তাই ভ্রমরের মত ফুল ছুঁইয়াই ছাড়িতে লজ্জা হয় নাই। বয়স ছাড়িয়া কোথায় গেল?.... কাঞ্চন কর্পূর তাম্বুল খুঁজিতে জীবনের দশা খোয়াইলে। কোমল কামিনীর দুই শ্রীফলের ছায়ায় নিজেকে শোয়াইলে।......আজ কেশ কিরূপ সাদা হইয়া গিয়াছে; বন যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি মলিন, কানে শুনি না, দেহের আঁটসাট ভাব শুকাইয়া গিয়াছে। কামানো সাপের মত নির্বিষ হইয়াছি। মুখভরা দাঁত পড়িয়া যাওয়ায় খো খো করিয়া কথা বলি। জায়গায় বসিয়া ভুবন ভ্রমণ করি, সব দাপট শেষ। যাহার জন্য ঘর দুয়ার করিলাম, বুঝিলাম সব অসার। আঁখি পাখী দুইটি সবই বিকার জানিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। চোখের ভুরুও কাশফুলের মত সাদা হইল।.....মনকে যদি একদিকে বাঁধিয়া নিরোধ করিতে যাই তো উৎকাশি ওঠে। বিদ্যাপতি বলেন, মালতি! শোন না, মনে আর দ্বিধা করিও না, হরিহরের পদপঙ্কজ সেবা কর, তাহা হইলে আর অবসাদ থাকিবে না।" (৮০৭)

ভগ্ন দেহ ও শ্রান্ত মনের ভয়াবহ চিত্র। নিশ্চয় বিদ্যাপতির অতি বৃদ্ধ বয়সের রচনা। পর পর উদ্ধৃত পদ দুইটির সাহায্যে বিদ্যাপতির দুই মনকে বুঝিবার সুবিধা হইবে। প্রথম পদটিতে উপভুক্ত নায়িকার ইন্দ্রিয়পীড়িত চিত্র। দ্বিতীয়টিতে বিধ্বস্ত দেহমনের শ্মশানসঙ্গীত। দুই পদেরই কবি বিদ্যাপতি।

আত্মকথনমূলক পদ বিদ্যাপতির আরো আছে। আমাদের পরিচিত মাধবের নিকট প্রার্থনার পদ তিনটিতে (৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫) একই কথা। পদ তিনটি এখনি উদ্ধৃত করিব না; অপেক্ষাকৃত অপরিচিত আত্মকথন-পদের আরো কিছু উদ্ধৃত করা যাক। যথা—

"ক্ষেত করিলাম, বঞ্চক লুটিয়া লইল। ঠাকুর সেবা ভুলিলাম। বাণিজ্য করিলাম লাভ পাইলাম না, অল্প যাহা ছিল তাহাও কমিয়া গেল। মাধব-ধন লইয়া বাণিজ্য করিলে অনেক সুদ ও অনেক লাভ পাওয়া যায়। আমি মুক্তা, মঞ্জিষ্ঠা, ও স্বর্ণ লইয়া বাণিজ্য করিলাম, কিন্তু মন্মথ চোরকে পুষিলাম।.....এই সংসার হাট, সকলেই এখানে বণিক। যে যেমন বাণিজ্য করে সে সেরূপ লাভ পায়, কিন্তু সুপুরুষ ও মূর্খ সকলেই মারা যায়। বিদ্যাপতি কহেন শুন মহাজন, (কেবল) রামভক্তিতে লাভ আছে।"—(৬০৮)

*

"জীবনের শেষ দশায় পৌঁছিয়াছি, চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমার সম্বন্ধে যাহারা পুত্র কলত্র সহোদর আত্মীয় হইত, তাহারা অন্তকালে প্রতারণা করিল। হে নাথ! হে হর গোস্বামী! আমাকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিও না। যখন আমার কৃতকর্মের হিসাব লেখা হইবে, তখন আমার পাপসমূহ ক্ষমা করিও।.....পরের ধন ও রমণীর প্রতি মন গেল। মদনরূপ হাঙর ছল করিয়া আমার দেহকে গ্রাস করিল। আমি ভাল-মন্দ কিছুই বিচার করিলাম না, মোহে কাল কাটাইলাম। কর্তব্য না করিয়া অকর্তব্য করিলাম। এখন মনে অনুতাপ হইতেছে। এখন কি করিব? শিয়রে মরণ উপস্থিত, এখন আর সময় নাই। বিদ্যাপতি বলেন, মহেশ্বর! শুন, তুমি ছাড়া ত্রিলোকে আর দেব নাই। চন্দলদেবীর পতি বৈদ্যনাথই আমার গতি, তিনি আমাকে চরণে শরণ দান করুন।"—(৬০৯)

এ জাতীয় আরো দুইটি পদ আছে—৯১৪ ও ৯১৫। ৯১৪ পদে কবি শিবসিংহের স্বপ্ন দেখিতেছেন, শিবসিংহের মৃত্যুর ৩২ বৎসর পরে। কবির কানে তখন মৃত্যুর পদধ্বনি। ৯১৫ পদেও প্রায় অনুরূপ কথা, কবি নিজ কন্যাকে বলিতেছেন, তোর মাকে স্নান করিয়া আসিতে বল, সংসার-বিলাস বৃথা বলিয়া বুঝুক, সংসারে নানা ত্রাস।

বিদ্যাপতির ব্যক্তি-চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াসে আমরা প্রার্থনা ও আত্মকথনমূলক পদের আলোচনা শুরু করিয়াছিলাম। সে বিষয়ের পদ কিছু কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। সেগুলি হইতে কয়েকটি স্বীকারোক্তি পাওয়া যাইতেছে। অনুতাপ প্রকাশের সময়, সকলে লক্ষ্য করিবেন, কবি তিনটি জিনিস স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন,—এক, নিজের কাঞ্চনাসক্তি, দুই, কামাসক্তি, তিন, শেষজীবনের নিঃসঙ্গত্ব। ইহা ছাড়াও আছে কর্মফল ও যমদ্বার সম্বন্ধে আতঙ্ক। স্বীকারোক্তিগুলিকে গতানুগতিক অনুতাপ-কথন মনে করার কারণ নাই। বিদ্যাপতির যে জীবনরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে কামিনী ও কাঞ্চনের প্রতি তাঁহার আসক্তি অস্বাভাবিক নয়। আলোচনার সূচনায় উপভুক্ত নায়িকার একটি চিত্র দিয়াছি। সে নায়িকা বিদ্যাপতির বাস্তব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হইতে পারে। কবির ভোগবৈরাগ্যের রূপও পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি।

বাস্তবিক কাম এবং কাঞ্চনের প্রতি দুর্বলতা কবি বহুভাবে স্বীকার করিয়াছেন। কবির অর্থাসক্তি বিষয়ে স্বীকারোক্তি :—"আমি মুক্তা, মঞ্জিষ্ঠা স্বর্ণ লইয়া বাণিজ্য করিলাম" (৬০৮)। "পরের ধন…প্রতি মন গেল" (৬০৯)। "পাপের দ্বারা যত ধন সঞ্চয় করিলাম" (৭৬৪)।

পর-রমণীর প্রতি কবির লালসার স্বীকারোক্তি আরো বেশি এবং অকুণ্ঠ—এই সঙ্গে সাধারণ ইন্দ্রিয়ালুতার পরিচয়ও আছে,—"নিজের ও পরের স্ত্রীর সহিত মিলন…তুমি নির্লজ্জ তাই ভ্রমরের মত ফুল ছুঁইয়াই ছাড়িতে লজ্জা হয় না…কোমল কামিনার দুই শ্রীফলের ছায়ায় নিজেকে শোয়াইলে" (৬০৭)। —"মন্মথ চোরকে পুষিলাম" (৬০৮)।—"পরের…রমণীর প্রতি মন গেল… মদনরূপ হাঙর ছল করিয়া দেহকে গ্রাস করিল" (৬০৯)।—"নিধুবনে রমণী সঙ্গে রসরঙ্গে মাতিলাম" (৭৬৩)।—"যুবতী আমার মতিময়ে মিলিত" (অর্থাৎ যুবতী চিন্তায় মতি আচ্ছন্ন) (৭৬৪)।

কবি নিজের চরিত্রগত দুর্বলতা যেমন গোপন করেন নাই, তেমনি পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার মুক্ত হতাশা। গৃহ-সংসার তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, তাঁহার কষ্টার্জিত ধন লুঠিয়া ভোগ করিয়াছে অথচ জীবনের শেষ প্রহরে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য কেহ উপস্থিত হয় নাই,—এই ধরনের অনেক উক্তি প্রার্থনাজাতীয় পদ হইতে মিলিতেছে। যথা—

"আমার সম্বন্ধে যাহারা পুত্র কলত্র সহোদর আত্মীয় হইত, তাহারা অন্তকালে প্রতারণা করিল" (৬০৯)।—"উত্তপ্ত বালুকারাশি যেমন জলবিন্দু শুষিয়া লয়, সুত, মিত্র ও রমণিগণ আমাকে সেইরূপ গ্রাস করিল" (৭৬৩)।—"পাপের দ্বারা যত ধন সঞ্চয় করিলাম, তাহা পরিজনেরা মিলিয়া খাইতেছে, মরণের সময় কেহ কোন খবর লয় না" (৭৬৪)।

যমদ্বার এবং অ-কর্মফলের রূপ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রায় প্রতি প্রার্থনা পদের মধ্যে আছেই, উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই।

প্রার্থনাপদের স্বীকারোক্তিগুলি আমাদের বিস্মিত ও পীড়িত করে। প্রেমরসের কবি শেষ পর্যন্ত জীবনের এই রূপ দেখিলেন! ভয় হয়। বার্ধক্য যে কিরূপ বীভৎস তাহা পূর্বোদ্ধৃত ৬০৭ পদ হইতে বোঝা যায়। এই গলিত বার্ধক্যের চিত্র আঁকিয়া কবি ঈশ্বরভক্তি জাগাইতে চাহিয়াছেন, এইরূপ মনে হইতে পারে। পদটি পড়িয়া সে ধারণা থাকে কিনা সন্দেহ। যৌবননাশের কান্নাই ছত্রে ছত্রে,—আর বার্ধক্যের পঙ্গুতার প্রতি সুতীব্র বিদ্বেষ। তুলনায় ঈষৎ দীর্ঘ এই পদে যেভাবে জরার চিত্র আঁকা হইয়াছে, সে চিত্র দর্শনের পর মানুষ ভালবাসায় নয়, ভয়ে ঈশ্বর-শরণ লইতে বাধ্য, যদি সেখানে কিছু ক্ষতিপূরণ মেলে!

অন্যান্য পদগুলি এতখানি তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী না হইলেও নৈরাশ্য-মথিত। সেখানেও অভিজ্ঞতার দারুণ কাব্য। বিদ্যাপতির এই সকল পদ পড়িয়া মনে হয় না ব্যক্তিজীবন কবিকে মহৎ কোনো আনন্দ দিয়াছে। জীবনে সুখ ও দুঃখ দুইই থাকে। একটি সফল বৃহৎ জীবন, জীবনপ্রান্তে যখন হিসাব মিলাইতে বসে, তখন সর্বজড়িত প্রাপ্তির কথাটাই বড় হয়। জীবনে জ্বালা থাকিতে পারে, কিন্তু জ্বালাও আনন্দময়—যখন তাহা মহৎ অভীপ্সার জন্য আত্মদাহ। বিদ্যাপতির পদের ঐ ক্লান্ত কাতরোক্তি—তাহাই কি কবিজীবনের শেষ কথা, অন্ততঃ বিদ্যাপতির মত জীবনবাদী কবির? জীবন-সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পৃথিবীকে মধুময় দেখিয়াছেন—ধূলিবিন্দু পর্যন্ত। বিদ্যাপতির হাহাকার কেন?

এইখানে কবির পরাজয়। বিদ্যাপতি এখানে আর কবি নন, ভক্ত। আবার এমনও বলা যায়, এখানে বিদ্যাপতির কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের পার্থক্য উদ্‌ঘাটিত। রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী ছিলেন সর্বাত্মকভাবে। তাই

'যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'—একথা কাব্যে এবং জীবনে উভয়তঃ অকুণ্ঠে বলিতে পারেন। বিদ্যাপতি ব্যক্তিজীবনে সত্যই কতখানি 'আনন্দিত' পুরুষ ছিলেন জানি না, কিন্তু প্রার্থনা পদে অন্ততঃ তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের ব্যর্থতার কথাই মুখ্য। শৈব কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেদান্তের আনন্দমন্ত্রকে এক্ষেত্রে আহ্বান করিতে অসমর্থ।

অথচ পূর্বে আমরা বিদ্যাপতি-বিষয়ক অন্য প্রবন্ধে তাঁহাকে সুখ-দুঃখাতীত আনন্দের কবি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। ভাবমিলনমূলক পদগুলি সেই গভীর আনন্দানুভূতির আশ্রয়। সেই আশ্চর্য পদগুলি গভীর আত্মচেতনা—যাহা জীবনের অস্তিত্ব-ক্ষণকে অর্থপূর্ণ করিয়া তোলে—ভিন্ন রচনা করা সম্ভব নয়। এবং ঐ আত্মচেতনার উৎস নিতান্ত দীন ভক্তের হৃদয়ে থাকাও সম্ভব নয়, যে-ভক্ত কেবল রাধাকৃষ্ণের মিলনকুঞ্জ সাজাইবার অধিকারেই খুসী;—তাহার জন্য প্রয়োজন রাধাকৃষ্ণের প্রাণলোক হইতে স্বয়ং আনন্দ-বারি আহরণের অধিকারী, অমৃতহারী পুরুষের। বিদ্যাপতি তাঁহার প্রেরণার মুহূর্তে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হইবার সৌভাগ্যবান কবিপুরুষ ছিলেন।

একথা যদি সত্য হয়, তবে প্রার্থনা ও আত্মকথনমূলক পদগুলিতে কবি অমন অসুখী হন কিভাবে? বিদ্যাপতির স্বভাব-প্রকাশ কোথায় বেশি, প্রার্থনার বিষণ্ণবাণী, না ভাবসম্মিলনের উল্লাসধ্বনিতে? এ বিষয়ে তথ্যের অভাবে যথার্থ উত্তরদানে আমরা অসমর্থ কিন্তু উভয়ত্রই তিনি উদ্‌ঘাটিত একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

কবিজীবনে দুই মনোভাবই সমভাবে সত্য—প্রাপ্তির হর্ষ এবং ব্যর্থতার গ্লানি। কোনো একটির জন্য অপরটিকে আবৃত রাখিতে বিদ্যাপতি চান নাই।

আবার বিদ্যাপতি বৈরাগ্য-বিশ্বাসী হিন্দু ভক্ত ছিলেন। মরজীবনের ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা হিন্দু ভক্তের নিকট নিত্য ক্ষোভের বস্তু। জীবন-শেষে সেই ক্ষোভবোধে ধরা দিয়া কবি নিজের ধর্মবোধের আনুগত্যই করিয়াছেন। তিনি বাস্তবে বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী না হইতে পারেন—চিন্তায় অন্ততঃ মহাপ্রস্থানের সন্ন্যাসকে মানিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির আত্মপরিচয় লইতে গিয়া প্রার্থনাপদের কাব্যরূপের বিচার

হয় নাই। আমরা শুধু কবির মনঃপ্রকৃতির হিসাব লইতে ব্যস্ত ছিলাম। সকলেরই জানা আছে, বিদ্যাপতির প্রার্থনার কয়েকটি পদ পদসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ। মাধব-বিষয়ক 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়', 'যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ', 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম'—এই তিনটি পদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। পদগুলি প্রাণ-ব্যাকুলতায়, নিঃশেষ আত্মনিবেদনে অসাধারণ ভক্তিকাব্য। শিব-বিষয়ক কয়েকটি প্রার্থনার পদও অনুরূপ গৌরবের দাবি করিতে পারে। কিছু পূর্বে অসন্তুষ্ট আত্মক্ষুব্ধ যে বিদ্যাপতির কথা বলিয়াছি, সে-বিদ্যাপতি পদগুলির ক্ষতি তো করেনই নাই, বরং ঐ আত্মক্ষত মনোবৃত্তি প্রার্থনার পদগুলিতে আত্মসমর্পণে অপূর্ব নিবিড়তা দিয়াছে। তপ্ত দেহ লইয়া ঈশ্বর-সায়রে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার বর্ণনাগুলি পাঠকের বুক হইতে আধ্যাত্মিক অশান্তির দীর্ঘশ্বাস টানিয়া আনে। আর আছে বিদ্যাপতির বিশাল-প্রাণতা—বিস্তৃত অভিজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ আত্মবিস্তার। অর্জনে বিশাল বলিয়া বর্জনে গম্ভীর এই কবির জীবন। তাঁহার ব্যাপক জীবনবোধের প্রকাশও এই প্রার্থনার পদে মেলে, যেখানে বর্জনের গৌরবে তিনি মহীয়ান। প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি ভক্ত হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ভক্তি সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের মুহ্যমান দীনতাবুদ্ধির সমরূপ নয়—তাহাতে আছে আত্মদর্শনের মহিমা। অসীম শূন্যতাবোধে সে কাব্য গৌরবান্বিত ; জীবনকে নিঃশেষে পান করিবার পরেও রসশূন্য তৃষার্ত জিহ্বার আর্তনাদ সেখানে শোনা যায়। বিদ্যাপতি সবলে, প্রমত্ত বাসনায় জীবনের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছিলেন, এক-সময় চমকিয়া দেখিলেন—আলিঙ্গনে ধরা আছে সুঠাম দেহের পরিবর্তে শীর্ণ গহ্বরময় কঙ্কাল ;—সে কঙ্কালকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নৈরাশ্যে, ভয়ে, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রার্থনার পদে সেই ক্রন্দনমোচন ; দেহশ্মশানে দেহজীবন-প্রেমীর বিলাপসঙ্গীত।

আর আছে বিদ্যাপতির শিশুসত্তা। 'মন চল নিজ নিকেতনে'। কোমল প্রস্থান-গানে সমস্ত মন ভরিয়া ওঠে। পথ হারাইয়া বিদ্যাপতি শিশুর মত কাঁদিয়াছেন। ঐশ্বর্য মিথ্যা, পাণ্ডিত্য মিথ্যা, সম্মান মিথ্যা—অন্ধকারে অবোধ আতঙ্কে দুই হাত বাড়াইয়া বিদ্যাপতি চিরাশ্রয় ধরিতে চাহিয়াছেন। ভোলানাথ মহাদেবের নিকট বিদ্যাপতি উপস্থিত। তাঁহার শিব-প্রার্থনামূলক পদগুলি তাই প্রার্থনা-পদাবলীতে অসামান্য। পূর্বে আমি শিব-প্রার্থনার একটি

বিশিষ্ট পদ—৬০৯ সংখ্যক পদটি উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন আরো কিছু করিব :—

"হে হর, আমার প্রতি মমতা যেন বিস্মৃত হইও না। আমি পরম অধম ও পতিত নর। তোমার মত অধমের উদ্ধারকর্তা আর নাই। আমার মত পতিত জগতে আর নাই। ......সুকবি বিদ্যাপতি পবিত্র চিত্তে শঙ্করের বিপরীত (স্বভাবের) কথা বলিতেছেন। হে শূলপাণি, মস্তক নোয়াইলাম, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ চরণ দয়া করিয়া দাও।—(৭৬৮)*

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবন নাথে। হে হর
হম নিরদীস অনাথে॥
করম ধরম তপ হীনে।
পড়লহু পাপ অধীনে॥
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করুআরে॥
সাগর সম দুখ ভারে।
অবহু করিঅ প্রতিকারে॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিঅ তরানে॥—(৭৬৯)

(হে হর, তুমি ত্রিভুবন নাথ। আমি নিরুদ্দেশ অনাথ। আমি তপস্যা ও ধর্মকর্মহীন, পাপের অধীনে পড়িলাম। নৌকা স্রোতের মাঝে ভাসিল, হে ভৈরব তুমি হাল ধর। সাগর সমান দুঃখের ভারের এখন প্রতিকার কর। বিদ্যাপতি এই কথা বলেন—সঙ্কট ত্রাণ কর।)

*হর জনি বিসরব মো মমিতা,
হম নর অধম পরম পতিতা।
তুঅ সন অধম উধার না দোসর
হম সন জগ নহি পতিতা॥.....
ভণ বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি
শঙ্কর বিপরীত বাণী।
অশরণ শরণ চরণ শির নাওল
দয়া করু দিঅ শূলপাণি॥

—৭৬৮

"হে শিব-শঙ্কর, তোমার শরণাগতির ভাল ফল হইল। এখানে এইরূপ সঙ্গতি, পরলোকে কি গতি হইবে? মনোরথ মনেই রহিল। তুমি প্রসন্ন হইলে অমূল্য ধন পাইব, এই আশায় জন্ম বহিলাম। যম-সঙ্কটে যেন উপেক্ষা করিও না, বড় প্রয়াসে তোমার সেবা করিলাম। শ্রবণ নয়ন গেলে, তনু অবসন্ন হইলে যদি তুমি প্রসন্ন হও, তখন অশ্ব-গজ-মণি ধনে কি করিব? এই শোকে মন ব্যাকুল। ইন্দ্র, চন্দ্র, গণেশ, কমলাসন হরি—সকল দেবতাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। বাণ-মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল, ইহা জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আমার মন পূর্ণ কর, যমের ভয় ছাড়ুক; আমার দুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ। তোমার প্রসাদে সব হয়।" (৭৭০)

*

কখন হরব দুখ মোর
হে ভোলানাথ।
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমাএব
সুখ স্বপনহু নহি ভেল
হে ভোলানাথ।
আছত চানন অবর গঙ্গাজল
বেলপাত তোহি দেব
হে ভোলানাথ।
যদি ভবসাগর থাহ কতহু নহি
ভৈরব ধরু কর আএ
হে ভোলানাথ।
ভণ বিদ্যাপতি মোর ভোলানাথ গতি
দেহু অভয় বর মোহি
হে ভোলানাথ। (৭৭১)

("হে ভোলানাথ! আমার দুঃখ কখন হরণ করিবে? দুঃখে জন্ম হইল, দুঃখেই কাল কাটাইব, স্বপ্নেও সুখ হইল না। চন্দন, গঙ্গাজল ও অক্ষত বেলপত্র তোমাকে দিব। এই ভবসাগরে কোথাও ঠাঁই নাই। হে ভৈরব, আসিয়া আমার কর ধারণ কর। বিদ্যাপতি বলেন, আমার গতি ভোলানাথ। আমাকে অভয় বর দাও।")

*

তোহেঁ প্রভু সুরসরি ধার রে
পতিতক করিয় উধার রে।
দূরসোঁ দেখল গাঙ্গ রে।
পাপ ন রহয়ে আঙ্গ রে॥
সুরসরি সেবল জানি রে
এহন পরশমণি পাবি রে।

ভণহি বিদ্যাপতি ভাণ রে
সুপুরুষ গুণক নিধান রে। (৭৭৫)

("প্রভু তুমি সুরধুনীর ধারা। পতিতকে উদ্ধার কর। দূর হইতে গঙ্গাকে দেখিলে শরীরে পাপ থাকে না। (তোমাকে) সুরসরিৎ জানিয়া সেবা করিলাম, এইরূপ স্পর্শমণি পাইব বলিয়া।")

সুন্দর পদগুলি। আন্তরিক ভক্তিব্যাকুলতায় স্পন্দিত। আত্মনিবেদনের সুরে সুরে ঝঙ্কৃত। ভক্তি যেখানে বাহুল্যনাশ করিয়া শুধু হৃদয়বিগলনে চরিতার্থ হয়, সেই ভক্তি এখানে। ৭৭১ পদে বলা হইল—'হে ভোলানাথ!' সেই সম্বোধনে কীভাবে না অনুযোগ, আবদার, আক্ষেপ, আবেগের মিশ্রণ—এক কথায় মূঢ় ভালবাসা এবং গূঢ় অভিমানের রসায়ন। ৭৭৫ পদের অপূর্ব শিবসঙ্গীতটির সুরুতে আছে—"প্রভু তুমি সুরধুনীর ধারা",—এখানে গঙ্গাধরের পতিতপাবনী গঙ্গারূপ—পিতার মাতৃরূপ। আরো দুইটি সুন্দর পদ আছে ৭৭৯, ৭৯৭—যে পদের কথাগুলি গৌরী বা কবি যে-কেউ বলিতে পারেন। যদি কবির প্রার্থনা হয় সেগুলি, তবে ৭৭৯ পদে শিবের সঙ্গে হরির তুলনাত্মক অংশটি মনোযোগযোগ্য,—"তুমি শিব, অর্ক ও ধুতুরা পাইলে, হরি চাঁপা ফুল পাইলেন।" শিবের অসহায় প্রবঞ্চিত রূপ লইয়া শৈবের এই অপূর্ব যন্ত্রণা। অমৃত-বিতরণের দেবসভায় বঞ্চিত শিব সম্বন্ধে শিব-ভক্তের মনোভাবের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ এখানে। সেইরূপ ৭৯৭ পদটিও যদি গৌরীর প্রার্থনা না হইয়া কবির প্রার্থনা হয়, তবে সেখানে পাই শ্মশানচারী উদাসীন শিবের প্রতি স্নেহানুকম্পাময় সাধারণী অনুভূতির সারসংক্ষেপ। পদ দুইটির আলোচনা শিবলীলাত্মক পদ প্রসঙ্গে পরে আরো করা হইবে।

তাহা হইলে প্রার্থনার পদের দুইভাগ—শিবের নিকট প্রার্থনা এবং মাধবের নিকট প্রার্থনা। মহামায়া বা গঙ্গাদি বিষয়ক পদের শেষেও প্রার্থনার সুর আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর পদের ভণিতাতেও কোথাও কোথাও প্রার্থনার ভঙ্গি দেখা যায়।

বিদ্যাপতির ধর্মবোধ—পদাবলীর সাক্ষ্যে

প্রার্থনার পদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিদ্যাপতির জীবনের একটি সমস্যার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—কবির ধর্মমত কি ছিল? আরো ঠিক ভাবে—তিনি কি বৈষ্ণব ছিলেন, না শৈব ছিলেন? কিংবা আপোষমূলক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্চোপাসক হিন্দু ছিলেন? বিদ্যাপতির জীবনালোচনায় প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ—কাব্যালোচনাতেও—কারণ নৈষ্ঠিক সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ভাবিলে বিদ্যাপতির কাব্যকে যে দৃষ্টিতে দেখা আবশ্যক, বিদ্যাপতি সম্প্রদায়গতভাবে বৈষ্ণব না হইলে সে দায় হইতে আমরা মুক্ত থাকি। মূলতঃ প্রার্থনা-পদ অবলম্বন করিয়া এ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিব, কিছু কিছু অন্য যুক্তিও আসিয়া পড়িবে।

আমাদের সিদ্ধান্ত প্রথমে জানাইয়া রাখা ভাল—বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন। সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত ভাবে।

যাঁহারা বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব মনে করিতে চান, তাঁহাদের যুক্তি উপস্থাপিত করা যাক। কবি যে কুলধর্মে শৈব ছিলেন একথা তাঁহারা স্বীকার করেন; তিনি কিছু শিবমূলক পদও লিখিতে পারেন যাহা অবশ্য নিতান্ত সাধারণ স্তরের কাঁদুনি—কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কারণ (১) বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক পদাবলীর রচয়িতা, যে পদাবলী শ্রীচৈতন্যের দ্বারা আস্বাদিত, যাহাতে প্রেমভক্তির উচ্চাঙ্গের রূপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং যাহার উপর বিদ্যাপতির কবি-মহিমার একান্ত নির্ভরতা; (২) কবি স্বহস্তে ভাগবতের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন; (৩) তাঁহার উৎকৃষ্ট মাধব-প্রার্থনার পদ আছে।

যুক্তির সব কয়টি সমমূল্য নয়। কবি স্বহস্তে ভাগবতের অনুলিপি করিয়াছেন, এই তথ্যের গুরুত্ব এখনি অগ্রাহ্য করা যায়। অনুলিপি যে স্বয়ং বিদ্যাপতির একথা কেহই জোর করিয়া বলিতেছেন না। যদি জোর করিয়া বলেন—এবং অনুলিপিটি স্বয়ং বিদ্যাপতির হয়ও—তাহাতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, একদা বিদ্যাপতি ভাগবতের একটি লিপি

প্রস্তুত করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন তাহা কি আমরা জানি? অনুলিপির মধ্যে কি এ ব্যাপারে কবি নিজ অভিপ্রায়ের কথা কিছু বলিয়াছেন? বিদ্যাপতি পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সারাজীবনে বহু শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থের অনুলিপি করিতে হইতে পারে। ভাগবত হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মকাব্য। যদি সে কাব্যের লিপি বিদ্যাপতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সর্বাধিক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়, বিদ্যাপতি বৈষ্ণবতাবিরোধী ছিলেন না। বিদ্যাপতিকে কি কেহ বৈষ্ণবদ্বেষী বলেন? তাছাড়া বিদ্যাপতি সারাজীবনে রাশি রাশি বৈষ্ণবপদ লিখিয়াছেন—সে ক্ষেত্রে বৈষ্ণবভাবনার আধারস্বরূপ এই অপূর্ব শাস্ত্র-কাব্যটি মাত্র নকল করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি? না, বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত ভাগবত পুথি হইতে তাঁহার হস্তাক্ষরের অতিরিক্ত স্পষ্ট কিছু পাই না।

বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা, সুতরাং তিনি বৈষ্ণব—এই যুক্তির গুরুত্ব সর্বাধিক আমরা তাহা স্বীকার করি। বাস্তবিক যথেষ্ট বৈষ্ণবভাবনা না থাকিলে কাহারো পক্ষে বৈষ্ণবপদে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না এবং বিদ্যাপতির কিছু বৈষ্ণবপদের ভাবগূঢ়তা ও ভক্তি-মহিমা সন্দেহাতীত।

বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদের ভক্তি-মহিমা মানিয়া লইয়াও প্রশ্ন করা চলে, এই সকল পদ লিখিবার জন্য কি একান্তই বৈষ্ণব হওয়ার প্রয়োজন—একজন ভক্ত হিন্দু কি স্বাভাবিক বৈষ্ণবতার আবেগ-সহায়ে ঐসকল পদ লিখিতে পারেন না? আমরা মনে করি পারেন। শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করিয়াছিলেন, ইহাতেও বেশি কিছু প্রমাণ হয় না;—মহাপ্রভু তখন তাঁহার বিশাল ক্ষুধায় জাতির হৃদয়ে টান দিয়াছেন—আত্মভাব অন্যে উদ্‌ঘাটিত দেখিবার জন্য তিনি অধীর—নিতান্ত লৌকিক ইন্দ্রিয়কাব্যেও অতীন্দ্রিয় প্রেমমহিমার অপূর্ব প্রেরণা দেখিতেছেন—সমস্ত বিশ্বই তাঁহার নিকট একটি মাত্র অর্থে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—সে ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির মত কবির কৃষ্ণমূলক পদ পাইয়া তিনি উচ্ছ্বসিত হইবেন ইহাতে নূতন কোনো কথা নাই।

নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব না হইয়াও (সাধারণ হিন্দুমাত্রই একাংশে বৈষ্ণব) বিদ্যাপতির পক্ষে পদাবলী রচনা অসম্ভব হয় নাই তাহার আরো প্রমাণ আছে। প্রথম কথা, বিদ্যাপতির প্রেম-পদাবলীর সবটুকু অংশ রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক নয়, যদিও সাধারণভাবে তেমনি ভাবিতে আমরা উৎসুক। ডক্টর

বিমানবিহারী মজুমদার জানাইয়াছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ নাই এবং বহু পদ আছে যাহা কুটনী, সাধারণী ইত্যাদি ইতর নায়িকা লইয়া রচিত। ডঃ মজুমদার বিদ্যাপতির বৈষ্ণবতায় বিশ্বাসী কিন্তু অতিশয় নিরপেক্ষও বটেন।

যে অংশে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যেও আবার বহুক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের আচরণে ঈশ্বরত্বের অভাব। ঐসব ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ প্রাকৃত, এমন কি, ইতরজাতীয় নায়ক-নায়িকারই তুল্য। এমন ভয়াবহ অংশও মেলে যেখানে অতিরিক্ত বিচ্ছেদ চাপাইলে বেহাত হইতে পারি, এমন ইঙ্গিত পর্যন্ত রাধা দিয়াছেন। রাধার গঞ্জনার ভাষায় ঐসব কালে আধ্যাত্মিকতা খুঁজিতে হইলে আবিষ্কারক হওয়া চাই।

যেখানে 'ইতরতা' নাই সেখানেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমকথা হইতে অপৃথক। রাধাকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসের নায়ক-নায়িকারূপে গ্রহণ করিয়া পদরচনার রীতি আমাদের দেশে চলিত ছিল একথা পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন (যথা ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত) এবং এমনকি একদা অসতীব্রজ্যায় সাধারণী নায়িকার রূপাঙ্কনে রাধাকে ব্যবহার করা হইত।

যেখানে উচ্চতর ভাবানুভূতি আছে, সেখানেও কবির বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বন না মানিলেও চলে। বিদ্যাপতি হিন্দুরূপে বৈষ্ণবতাকে মানিতেন, তাছাড়া তিনি প্রেমের কাব্য লিখিতেছিলেন। যে কোনো প্রেম,—লৌকিক প্রেমও,—এক সময় শিখরশায়ী, যদি সেই প্রেম বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। দেহ-প্রেমের কবি হইলেও প্রেমের সাধারণ সত্য বিদ্যাপতি মানিবেন না এমন নয়। বিদ্যাপতি মহৎ কবি ছিলেন; এবং তিনি রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। লৌকিক প্রেম আত্মত্যাগে এক সময় বিদ্যাপতির কাব্যে নিশ্চয় মহনীয় হইত। ঐ প্রেম আবার রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই দেব-নামের সঙ্গে যুক্ত, এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমে কাহিনীগতভাবে মিলনের মতই বিরহের প্রাধান্য আছে,—সে কারণে পরিণতিতে রাধাকৃষ্ণমূলক প্রেমকাব্যের সমুন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা হয়—গীতিকাব্যে মনের ভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং কবির বুকের ভাষা বৈষ্ণবতাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ

পাইয়াছে। এই কথার উত্তরে বলা চলে, বিদ্যাপতির গীতিকাব্য কেবল রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই লেখা হয় নাই, শিব-লীলাত্মক পদও আছে; এবং যে-কথা পূর্বে বলিয়াছি—রাধাকৃষ্ণ ছিলেন শৃঙ্গাররসের দেবদেবী, যিনি কবিতা লিখিতে চান (প্রেমই কবিতার সাধারণ বিষয়) তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বন করিতে হয়। আর কবি যদি একবার রাধামাধবকে অবলম্বন করিয়া প্রেমকথা নিবেদন করেন, তখন নিজের কথা বলিতে, অর্থাৎ আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে, মাধবাশ্রয় স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া বৈষ্ণবতাকে আমাদের পরিচিত সাম্প্রদায়িকতাতে পরিণত করা পরবর্তী কীর্তি। আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব না হইয়াও, শিবোপাসক থাকিয়াও, মাধবের নিকট প্রাণ-ব্যাকুলতা জানাই-বার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বিদ্যাপতির কালে বলবৎ ছিল না। বিদ্যাপতির কাছে ব্যক্তিদেবতা শিব হইলেও শিব ও বিষ্ণু অভেদ ছিলেন।

বিদ্যাপতির বৈষ্ণবধর্মাবলম্বনের পক্ষে তৃতীয় যুক্তির আলোচনায় আসা যায়—তিনি মাধবের নিকট প্রার্থনার তিনটি উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছেন। —"তাছাড়া আমাদিগকে বাহিরের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেই বা হইবে কেন? বিদ্যাপতির ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫ সংখ্যক প্রার্থনার পদ কয়টিই কি তাঁহার শেষ জীবনের অনুতাপ ও বৈষ্ণবীয় ভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক নহে।... এই তিনটি পদের আন্তরিকতায় কি কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন?"—বিদ্যাপতির ধর্মধারণা সম্বন্ধে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মত।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের নিরপেক্ষতায় আমাদের দৃঢ় আস্থা আছে। সে কারণে তাঁহার সিদ্ধান্তের মূল্য যথেষ্ট, ও তাহা আলোচনাযোগ্য। নচেৎ মতের ক্ষেত্রে যাঁহারা গোঁড়া বৈষ্ণব, যাঁহারা আতিশয্যবশে বিদ্যাপতির শিববিষয়ক পদকে তৃতীয় শ্রেণীর বলিতে অকুণ্ঠিত (বিদ্যাপতির শিববিষয়ক পদের উৎকর্ষ-বিচার পরে আমরা বিস্তৃতভাবে করিব), তাঁহাদের মতকে গুরুত্ব দিতেছি না। কিন্তু ডঃ মজুমদারের মত শ্রদ্ধাযোগ্য।

ডঃ মজুমদার নিরপেক্ষ বলিয়া বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব করিতে আপোষ-বিরোধী নন। যদি বিদ্যাপতির বৈষ্ণবতা বলিতে তিনি বৈষ্ণবভাব বুঝিয়া থাকেন, সম্প্রদায়গত বৈষ্ণবতা না বুঝেন, তবে তাঁহার মতের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। বিদ্যাপতি ধর্মে শৈব থাকিয়াও বৈষ্ণব ভাবাস্বাদনে পারঙ্গম ছিলেন—এ বিশ্বাস আমারও। এবং বিদ্যাপতির বিপুল সংখ্যক বৈষ্ণব-

পদ তাঁহার বৈষ্ণব ভাব-প্রীতির প্রমাণ। কিন্তু মনে হয় ডঃ মজুমদার ইঙ্গিতে বিদ্যাপতির ধর্ম-বিষয়ে আরো কিছু দাবি করিয়াছেন,—বিদ্যাপতিকে তিনি 'ধর্মনিষ্ঠ' বৈষ্ণব বলিতে চান। তবে তিনি যথার্থ পণ্ডিতের সাধুতা-বশতঃ পূর্বোদ্ধৃত অংশের পরে বলিয়াছেন,—"অবশ্য মাধবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিবের নিকটও প্রার্থনা জানাইয়াছেন (৭৬৯ ও ৭৭০); কেননা হরি ও হরের মধ্যে তিনি বিশেষ পার্থক্য দেখেন নাই। ৭৭৬ পদে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—'এক শরীর লেল দুই বাস। ক্ষণে বৈকুণ্ঠ ক্ষণই কৈলাস॥' আর বার্ধক্যের অসহায়তার মধ্যে গাহিয়াছেন—'হরিহর পয়-পঙ্কজ সেবহ তে ন রহ অবসাদা' (৬০৭)।"

আমরা বিনীতভাবে জানাইতে চাই ডঃ মজুমদারের 'অবশ্য'টি ডঃ মজুমদারের রচনানুযায়ী যেরূপ সঙ্কুচিতদেহ মনে হয়, আসলে সেরূপ নয়—আকারে যথেষ্টই বৃহৎ। বিদ্যাপতি "অবশ্য মাধমের সঙ্গে সঙ্গে শিবের নিকটও প্রার্থনা জানাইয়াছেন",—একথার চেয়ে বেশি সত্য এই উক্তি,—'বিদ্যাপতি অবশ্য শিবের সঙ্গে সঙ্গে মাধবের নিকটও প্রার্থনা জানাইয়াছেন'। এ উক্তি আমাদের।

উন্মুক্তভাবে আমার মত জানাইয়াছি। এরূপ বলিবার পক্ষে যুক্তি একে একে উপস্থাপিত করিব।

প্রথম কথা, শিব এবং মাধব এই দুই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার পদ থাকিলেও শিব-প্রার্থনার পদ সংখ্যায় অধিক। এবং শিব-প্রার্থনা পদে কবির আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতা (যাহা পূর্বেই উদ্ধৃতিযোগে দেখাইয়াছি) মাধব-বিষয়ক পদের তুলনায় অল্প নহে। যদি শিব-প্রার্থনার পদ সংখ্যায় মাধব-প্রার্থনা পদের তুলনায় বেশি হয়, এবং যদি তাহা নিবিড়তায় কোনো মতে ন্যূন না হয়, তবে প্রার্থনা-পদের সাক্ষ্যে বিদ্যাপতিকে কেবল বৈষ্ণব বলা যায় কিভাবে?

এইখানে একটি হাস্যকর কথা ওঠে। বিদ্যাপতির মাধব-বিষয়ক প্রার্থনা পদগুলি সাহিত্যাংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু কিভাবে উৎকৃষ্ট হইল? পরবর্তী বৈষ্ণবীয় পরিমার্জনা তাহার জন্য কতখানি দায়ী? বিদ্যাপতির অন্য প্রার্থনা-পদের তুলনায় যদি 'মাত্র বাংলাদেশে প্রচলিত' তিনটি পদ অধিক

পরিমার্জিত মনে হয়, তবে সে পরিমার্জন বাঙালীই করিয়াছে, বিদ্যাপতি নন। মৈথিলে ও বাংলায় ঐক্য থাকিলেও এ দুটি স্বতন্ত্র ভাষা—উভয় ভাষার উচ্চারণগত ও প্রকাশভঙ্গিগত পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং কোনো পদ বাঙালীর কানে সুখশ্রাব্য লাগিলেই তাহা কাব্যরূপে শ্রেষ্ঠ এমন সিদ্ধান্ত সমীচীন নয়। বিদ্যাপতি স্বভাষার উচ্চারণপদ্ধতি অনুযায়ী পদ লিখিয়াছেন। সেইসব পদকে গ্রহণের কালে বাঙালীরা স্বীয় কান ও প্রাণের উপযোগী করিয়া ধ্বনি ও শব্দরূপে পরিবর্তন আনিয়াছিল, ইহা পরিচিত সত্য। এ বিষয়ে আমাদের ভক্ত রসিক কীর্তনীয়াদের পটুত্ব সর্ববিদিত। সে কারণে বাংলা-দেশে প্রাপ্ত পদের কাব্যরূপ আমাদের ভাল লাগিলেও, অন্য পদের রূপ-অপকর্ষ বিষয়ে কটাক্ষ না করাই ভাল এবং তাহার দ্বারা অন্ততঃ বিদ্যাপতির শিব-প্রার্থনা পদের আন্তরিকতার হানি হয় না।

এখানে বিদ্যাপতির মাধব-বিষয়ক প্রার্থনা পদ কিরূপ পরিমার্জিত হইয়াছে, তার পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া চলে। কবির শিব-প্রার্থনার পদ পুঁথি হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং মিথিলার লোকমুখ হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। ভাষালালিত্যে উভয় শ্রেণীর পদের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ। লোক-সঙ্গীতের প্রার্থনা পদগুলি অনেক মসৃণ। সে মসৃণতা কালগতে ঘটিয়াছে। অনুরূপ জিনিস বাংলা দেশে বিদ্যাপতির মাধব-প্রার্থনার পদের ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাপতির মাধব-প্রার্থনাপদের রূপোৎকর্ষ বিদ্যাপতির বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক নয়।

বিদ্যাপতির ব্যক্তিমনের অন্য একটি প্রকাশ-উৎসকে—ভণিতাকে—দেখা যাক। ভণিতায় নাকি কবিচিত্তের প্রকাশ থাকে। সেখানে কবিরা খুবই সুপটু ও সতর্ক—সংক্ষিপ্ত গাঢ়বদ্ধ বচনে সেখানে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করেন। বিদ্যাপতির ভণিতায় আমরা কি দেখি—তাঁহার ধর্মধারণার কোন্ পরিচয়? বিদ্যাপতি কৃষ্ণ-বিষয়ক বিপুল সংখ্যক পদে যে সকল ভণিতা দিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি-কাতরতা মেলেনা তা নয়, কিন্তু কবির প্রত্যক্ষ আত্মনিবেদন অল্প ক্ষেত্রেই আছে, কি বাংলাদেশে প্রাপ্ত পদে, কি মিথিলায় প্রাপ্ত পদে। এমন কি সাধারণ ভক্তিবিহ্বলতাও ভণিতায় অল্প। ঐ সকল পদে প্রেমকলা-বিষয়ক নানা চটুল-চাটু-পটু উক্তি আছে, প্রেমরহস্যের গভীর কথাও মেলে, কিন্তু সেই সকল উক্তি হইতে কবির নিভৃত হৃদয়কে পাই না। আমাদের

বক্তব্যের প্রতিবাদ হইতে পারে। ভণিতায় যে, বিদ্যাপতির আত্মকথা পাই না, তাহা তো তাঁহার সপক্ষতা করে—কবিরূপে তাঁহার বস্তুনিষ্ঠা তাহার দ্বারা প্রমাণ হয়; এবং প্রেমসত্য সম্বন্ধে যে-সকল গভীর উক্তি বিদ্যাপতি ভণিতায় করিয়াছেন, প্রেমবাদী বিদ্যাপাতর পক্ষে তাহাই ভক্তিভাবনা বা আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন। কথাগুলিকে সত্য মানিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেমন গভীর উক্তিও সামান্য ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। শিবসিংহ নামাঙ্কিত পদের ভণিতার (যাহার সংখ্যা দুইশতাধিক) মূল কথা: লখিমাকান্ত শিবসিংহ এই রস বুঝেন; তিনি রসিক; তিনি শ্যামসুন্দরকায়; তিনি দীর্ঘজীবী হোন; বিদ্যাপতি যে এই রস জানেন; রূপনারায়ণ তার প্রমাণ; পৃথিবীতে রূপনারায়ণ নব মদন; রূপনারায়ণ ভগবানের একাদশ অবতার;—ইত্যাদি উন্মুক্ত অকুণ্ঠ স্তুতি—পৃষ্ঠপোষক রাজার। রাজনামাঙ্কিত নয় এমন অজস্র সংখ্যক পদের ভণিতায় কবি কর্তৃক প্রেমে উৎসাহ, বিরহে প্রবোধ, চাতুরীতে তিরস্কার, দুঃসাধ্যসাধনে সাহস-সঞ্চার, বেদনায় দার্শনিক সান্ত্বনা, প্রণয়-সমরে বুদ্ধিদান, রাধার কাছে কৃষ্ণের পক্ষে এবং কৃষ্ণের কাছে রাধার পক্ষে ওকালতি—এইসব বস্তুতে ভরিয়া আছে। বিশেষতঃ মান পর্যায়ের ভণিতায় কবির দারুণ তৎপরতা। সুতরাং অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদের ভণিতায় কবিকে বিশেষভাবে ভক্ত দেখা যায় না। অপর-পক্ষে শিবের নিকট প্রার্থনার পদের ভণিতায় তো নিশ্চয়, শিব-গৌরীর লীলা-মূলক যে সকল পদ কবি লিখিয়াছেন (রাম-সীতা-গঙ্গা-মহামায়া পদ সমেত) সেখানেও ভণিতায় কবির ভক্তিকাতর প্রার্থনা। ইহাতে প্রমাণ হয়, বিদ্যাপতি কৃষ্ণমূলক পদগুলিকে সাধারণভাবে প্রেমগীতিকা রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল পদের ভণিতায় যদি কোথাও ভাবদ্যোতক উক্তি থাকেও—সে গভীরতা লৌকিক প্রেম হইতেই আসিতে পারে। যে-কোনো প্রেমই প্রবলতায় গভীর ও পবিত্র। অন্যদিকে তুলনায় অল্পসংখ্যক শিববিষয়ক পদের অধিকাংশ ভণিতা বিদ্যাপতির ভক্তি-নিবেদনে পূর্ণ। বিদ্যাপতির শৈবত্বের ইহা এক প্রমাণ।

প্রয়োজনীয় ভণিতাগুলি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা ভাল। প্রথমে রাধাকৃষ্ণ-পদের সাধারণ ভক্তিভাবমূলক ভণিতা :—

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, ওরে গোপী, মুরারির আদর অধিক পুণ্যেই সম্ভব হয়"—৫১

"বিদ্যাপতি বলেন, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, হরিচরণ সেবা কর"—১৬৪

"বিদ্যাপতি বলেন, হে বরনারি, শুন, ধৈর্য ধর, মুরারি মিলিবে।"—১৭০

(এইরূপ ভণিতা অনেক পদে)

"বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিলেন, হে গুণবতী রমণী, শোন, তুমি খুব বোকা, হরির সঙ্গে কিছু ভয় নাই।"—৩৪২

"বিদ্যাপতি বলেন, সুচেতনী শোন, হরির সহিত কেমন করিয়া সমান হইবে? ছলনা ত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা কর, যাহাতে অন্তিমকালে তাঁহার নিকট স্থান পাও।"—৩৪৩

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে রমণী, ভগবান কানাইকে ভজনা কর।"—৩৪৪

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বিপদে অধিক ধৈর্য ধরিলে সব উপায় হয়; হরিকে মনের ভিতর রাখ, সব মনোরথ পূর্ণ হইবে।"—৩৬২

"বিদ্যাপতি কহিতেছেন, বরনারী শুন, মুরারি প্রেমের রসে বশীভূত।"—৪৬৮

"বিদ্যাপতি কহেন, সুন্দরী, বিরহ অবসান হইবে, কানাই জলনিধিময়, তোমাকে কামনাময় শীতল সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া শীতল করিবে।"—৭৩০

"বিদ্যাপতি শপথ করিয়া বলিতেছেন, আরো অপূর্ব এই যে, তোমার চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে (তোমারই) ভ্রম হইয়াছে,"—(অর্থাৎ তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজেই কৃষ্ণ এইরূপ ভ্রম। এইভাবের সুবিখ্যাত পদ—'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাই'।)—৭৪১

আমি যথাসম্ভব ভক্তিভাবমূলক ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। বিদ্যাপতি যে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানিতেন—যাহা সকল হিন্দুই মানেন—তাহা এখানে প্রমাণিত। এমন কি উদ্ধৃত ভণিতাগুলির সাক্ষ্যে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্ত ভাবিতে কোনো বাধা নাই। কিন্তু উহার দ্বারা কি তাঁহাকে বৈষ্ণব প্রমাণ করা যাইবে? লক্ষ্য করিবার বিষয়, ঐ সকল ভণিতায় বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষভাবে নিজ ভক্তি বা প্রার্থনার কথা বলেন নাই। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন

প্রত্যক্ষ আত্মনিবেদনমূলক ভণিতা অল্পই পাওয়া যায়। যাহা পাওয়া তাহা হইল এই :—

"বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়ব হরি বিনে দিন রাতিয়া।"—৭২০

"হরির চরণ ধ্যান করিয়া বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের বিলাপ গান করিতেছেন।"—৮৬৯

এবং মাধব-প্রার্থনামূলক কয়েকটি পদের ভণিতা—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভবতারণ ভার তোহারা॥"—৭৬৩

"সন্ধ্যাবেলায় কি কেহ সেবা মাগে? (হে হরি) তোমার চরণের প্রতি চাহিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।"—৭৬৪

"ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥"—৭৬৫

শিবমূলক পদগুলি বিদ্যাপতি-পদাবলীর এক-অষ্টমাংশ হইবে কিনা সন্দেহ। আমি এইবার সেখান হইতে ভণিতাগুলি উদ্ধৃত করিব। আমার বিশ্বাস পাঠকগণ নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রথমে শিবতত্ত্বমূলক ভণিতা :—

"বিদ্যাপতি বলেন, ও বৃদ্ধ নহে, জগতের কিষাণ।"—৫৯৯
(এই ভণিতা অন্যত্রও আছে)

"বিদ্যাপতি বলেন, ভবানী শোন, হর নির্ধন নহেন,—জগতের স্বামী।"—৫৯৪

"ভণই বিদ্যাপতি
শুন জগমাতা
ও নহি উমত
ত্রিভুবন দাতা॥"—৭৭৬

"বিদ্যাপতি বলেন, গৌরীমাতা, স্বামীর নিন্দা করিও না, তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর, ভুক্তি ও মুক্তিদাতা।"—৭৭৭

"বিদ্যাপতি বলেন, আমি গান করিয়া শুনাইলাম, হর সুন্দর বর, সব কাজ শীঘ্র কর।"—৭৭৯

"বিদ্যাপতি কহিতেছেন, গৌরী শুন, হর উন্মত্ত নহে, তুমিই বোকা মেয়ে।"—৭৮৯

"বিদ্যাপতি বলেন, বিপরীত কাজ, নিজে ভিখারী, সেবককে রাজ্য দান কর।"—৭৯২

"বিদ্যাপতি বলেন, সতি শুন, এই পাগল ত্রিভুবনের পতি।"—৭৮৭

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মেনকা শুন, শিবের মত দানী জগতে কে কবে আছে।"—৮৯৯

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, এই যোগী হইল ত্রিভুবনের দানী।"—৯০০

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, আপনার জ্ঞান দৃঢ় কর, ইনি তিন লোকের ঠাকুর, গৌরী দেবী জানেন।"—৯০২

"বিদ্যাপতি বলেন, মন্দাকিনী শুন, ইনি ত্রিভুবনের নাথ। ভালয় ভালয় গৌরীর বিবাহ দাও, তাহার কপালে এই বরই লেখা ছিল।"—৯০৮

"ইনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর"—বারবার এই কথা। বিদ্যাপতির মনোভাব বুঝিতে ভুল হইবে? এই ত্রিভুবনের ঈশ্বরের নিকট বিদ্যাপতি আপনাকে মেলিয়া ধরিয়াছেন। এইবার শিব-লীলাত্মক পদের ভণিতা উদ্ধার করা যাক:

"বিদ্যাপতি কহিতেছেন, শুন ত্রিলোচন, তোমার পদপঙ্কজে আমার প্রণাম। চন্দন দেবীর পতি বৈদ্যনাথ আমার গতি, নীলকণ্ঠ হর আমার দেবতা।"—৫৯৬

"বিদ্যাপতি বলেন, গৌরীবর আমার গতি।"—৭৭৮

"বিদ্যাপতি কহিতেছেন, উগনা হইতেই আমার কাজ (তাঁহাকেই আমার প্রয়োজন)। ত্রিভুবনের রাজ্য আমার হিতকর নহে।"—৭৮৭

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মহেশ্বর শুন, এই জানিয়া তোমার সেবা করিলাম, এখন যা হইবার তা হউক, ওখানে শরণ দিও।"—৭৯১

"বিদ্যাপতি বলেন, মহেশ্বর শুন, এই জানিয়া তোমার নিকট আসিলাম যে, তোমার নিকট বিঘ্ন নষ্ট হইবে। অন্তের কি ভয় করি?"—৭৯৪

"বিদ্যাপতি কহেন, উগনা শুন, দারিদ্র্য হরণ কর, আমি শরণ লইলাম।"—৮০৯

"বিদ্যাপতি কহেন, শঙ্কর শুন, অন্তকালে যেন আমাকে বিস্মৃত হইও না।"—৮১৩

"বিদ্যাপতি-জননী শিবকে বলিলেন, পুনরায় আপনার গৃহে আসিব।"—৮১১
('বিদ্যাপতি-জননী' কথাটি লক্ষ্য করিবার জিনিস)

শিব-প্রার্থনা পদের ভণিতাও উদ্ধৃত করা উচিত :—

"বিদ্যাপতি বলেন—মহেশ্বর! শুন, তুমি ছাড়া ত্রিলোকে আর দেব নাই। চন্দন দেবীর পতি বৈদ্যনাথই আমার গতি, তিনি আমাকে চরণে শরণ দান করুন।"—৩০৯

"বিদ্যাপতি বলেন—মহেশ! শুন, আপন সেবকের ক্লেশ দূর কর।"—৪৮০

"হে শূলপাণি, মস্তক নোয়াইলাম, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ চরণ দয়া করিয়া দাও।"
—৭৬৮

"বিদ্যাপতি এই কথা বলেন—সঙ্কট ত্রাণ কর।"—৭৬৯

"ইন্দ্র, চন্দ্র, গণেশ, কমলাসন হরি, সকল দেবতাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। বাপ মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল, ইহা জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, আমার মন পূর্ণ কর, যমের ভয় ছাড়ুক; আমার দুঃখ হরণ কর, তাহাতে তোমার সুখ। তোমার প্রসাদে সব হয়।"—৭৭০

"বিদ্যাপতি বলেন, আমার গতি ভোলানাথ, আমাকে অভয় বর দাও।"—৭৭১

"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ শুন, (আমাকে) নির্ধন জানিয়া ক্লেশ হরণ কর।"—৭৭৩

বিদ্যাপতি যে আত্যন্ত শৈব ছিলেন, তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ শিবপ্রার্থনা-মূলক পদে আছে। বিদ্যাপতি অন্ততঃ তুইবার অন্য সকল দেবতার তুলনায় শিবের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, গণেশ, এমনকি কমলাসন হরিকে পর্যন্ত বিদ্যাপতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। যদি বলা যায়, এই পদ কোন সময়ের রচনা জানা নাই, পরে পরিণত বয়সে বিদ্যাপতির মত পরিবর্তিত হইতে পারে, আমি পুনরায় ৬০৯ পদের ভণিতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি;—ঐ পদে বলা হইয়াছে,—'মহেশ্বর তুমি ছাড়া ত্রিলোকে আর দেব নাই।" এই পদ যে কবির নিতান্ত বার্ধক্যে রচিত, তাহার প্রমাণ পদেই আছে;—এই পদের শুরু হইয়াছে—"জীবনের শেষ দশায় পৌছিয়াছি" —কথাগুলি দিয়া। এই পদের সঙ্গে হরি-বিষয়ক ৭৬৪ পদের বক্তব্যগত প্রভূত মিল। সুতরাং ইহা দ্বারা অন্ততঃ প্রমাণ হয়, এই কালে বিদ্যাপতি হরি ও হর উভয়েরই ভক্ত ছিলেন এবং হরিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বলিতে বাধে নাই—'মহেশ্বর ত্রিলোকে তুমি অদ্বিতীয় দেবতা।'

বিদ্যাপতি যে শেষ পর্যন্ত শৈব, আশা করি যে সকল প্রমাণ দিলাম তাহাতে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। যদি ইহাও যথেষ্ট না হয়, যদি অন্য দেবতার তুলনায় শিবের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক উক্তির প্রমাণ গ্রহণযোগ্য মনে না হয়, আমি আরো প্রমাণ দিব—কিন্তু তার পূর্বে একটি রূঢ় প্রশ্ন করিব—বিদ্যাপতি কি কোথাও শিবের তুলনায় মাধবের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন? এক জায়গায় 'কত চতুরানন'-গ্রাসকারী মাধবের কথা আছে, তিনি 'আদি অনাদির নাথ'—এরূপ উক্তি মেলে, কিন্তু সেই সকল উক্তি শিবকে স্পর্শ করে না। বরং অন্যদিকে বিদ্যাপতির পদে বেশ কয়েকবার কৃষ্ণলাভের জন্য শিবের নিকট রাধার প্রার্থনার কথা আছে, এবং তাহা বিদ্যাপতির মনোভাবের পরিচয় দেয়।

শিব-প্রার্থনা ও মাধব-প্রার্থনা পদের তুলনামূলক বিচার-প্রসঙ্গে মাধবের

নিকট প্রার্থনা পদগুলি লইয়া একটু আলোচনা করা চলে। এইরূপ তিনটি পদ আছে—সুপরিচিত পদ। সাধারণতঃ বিদ্যাপতির প্রার্থনাপদ বলিতে এইগুলিকেই বুঝিয়া থাকি। কারণ এগুলি বৈষ্ণব প্রার্থনার পদ এবং বিদ্যাপতিকে বাংলা দেশে বৈষ্ণবেরাই প্রচার করিয়াছেন। এই পদগুলি, পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্যাপতির বৈষ্ণবত্বের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়। সেখানে শিব-প্রার্থনার পদের কথা আমাদের মনে থাকে না। বিপত্তির সূচনা সেখান হইতে।

এই পদগুলি বিষয়ে বলা চলে, এগুলি মাত্র বাংলা দেশেই লভ্য (?)। মিথিলা বিদ্যাপতির বৈষ্ণবতা স্বীকার করে না—মিথিলায় তিনি শৈব। মিথিলায় বিদ্যাপতির মাধব-প্রার্থনার পদ পাওয়া যায় নাই, এখনো পর্যন্ত (!)। যে বাংলাদেশ এই পদগুলি গ্রহণ করিয়াছে, সে বাংলাদেশ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বলিয়া, বিদ্যাপতির অন্য প্রার্থনাবিষয়ক পদ থাকিতেও কেবল মাধব-প্রার্থনার পদই লইয়াছে। ইহাতে একদিকে বৈষ্ণব বাংলার 'স্বধর্ম'-নিষ্ঠা, অন্যদিকে পরধর্ম-উদাসীনতা প্রমাণিত হইতেছে।

এক্ষেত্রে একটি অনুমানমূলক কটু সন্দেহ আমাদের মনে জাগিতেছে—মাধব-বিষয়ক প্রার্থনা-পদগুলিতে কিছু হস্তক্ষেপ নাই তো? সঙ্কলক বা কীর্তনীয়াগণ 'শঙ্কর' নামের স্থানে 'মাধব' নাম বসাইয়া দিয়াছিলেন কি? এইরূপ সন্দেহের কিছু কারণ আছে, পরে বলিব, কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি, বিদ্যাপতির পক্ষে ঈশ্বরের রূপ-বিকাশ মাধবের নিকট প্রার্থনা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

বাঙালী বৈষ্ণবগণ বিদ্যাপতিকে পূর্ণাংশে গ্রহণ করেন নাই, বিদ্যাপতির বৈষ্ণবাংশই লইয়াছেন। পণ্ডিতমণ্ডলী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, যাহা বৈষ্ণবীয় নয়, অথচ রাধা বা কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, এমন অনেক পদ বাঙালীরা রাধাকৃষ্ণ-পদরূপে চালাইয়াছেন। বাঙালী বৈষ্ণবের এই ভক্তির সাম্রাজ্যবিস্তার সত্যকার ভক্তির লক্ষণ, কোনো সন্দেহ নাই। এখন যদি এমন বলা যায়, বৈষ্ণবের এই অধিকারবিস্তার কেবল সাধারণ নায়ক-নায়িকামূলক পদগুলিকেই আক্রমণ করে নাই—আরো অগ্রসর হইয়াছিল—এমনকি শিববিষয়ক পদকেও স্পর্শ করিয়াছিল—তবে সে সন্দেহ কি খুব অসঙ্গত হইবে? হাঁ অসঙ্গত হইবে। তবু সন্দেহের প্রলোভন

মায়াত্মক প্রলোভন। তার নেশা ছাড়িতে পারিতেছি না। প্রার্থনার পদের মধ্যে 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' পদটি মাধব-বিষয়ক নিঃসন্দেহে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে ঐ পদের মাধবত্ব সূচিত। তিল তুলসী দিয়া দেহ সমর্পণ, 'জগন্নাথ' সম্বোধন, 'দীনবন্ধু'র পদপল্লব অবলম্বন করিয়া কর্মশৃঙ্খল মোচনের ও ভবসিন্ধু উত্তরণের বাসনা,—ভারতীয় হিন্দু যে এইরূপ প্রার্থনা মাধবের নিকটই করিয়া থাকে, সকলেরই জানা আছে। শব্দ-ব্যবহারে ও প্রার্থনা-ভঙ্গিতে এ পদ মাধব-কেন্দ্রিক।

"যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ" পদটির পক্ষেও হরি-বিষয়ক হইতে বাধা নাই। পদটিকে নির্দিষ্টভাবে মাধব-সম্বন্ধীয় বলিবার একমাত্র প্রমাণ সমস্ত পদের মধ্যে একবার 'এ হরি' এই সম্বোধনটুকু,—তাহা যদিও যে-কোনো মুহূর্তে 'শঙ্কর'-এর দ্বারা স্থানান্তরিত হইতে পারে, তবু 'এ হরি' এই সম্বোধন করা হইয়াছে, ইহা না দেখিবার কোনো কারণ নাই এবং পদটি অপরপক্ষে শঙ্করের নিকট প্রার্থনা হইতে পারে এমন কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণও পাইতেছি না।

আমাদের যাহা কিছু সন্দেহ 'তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম' পদটি লইয়া। ভারতীয় হিন্দু-ঐতিহ্যের শিবকেন্দ্রিক ভাবনাগুলি এই পদে পরিবেশিত আছে এবং পদটি মাধব-বিষয়ক হওয়ার একমাত্র চিহ্ন সূচনার 'মাধব' শব্দ উঠাইয়া (একবারই মাত্র শব্দটি আছে) 'শঙ্কর' শব্দ বসাইয়া দিলে ইহা অধিকভাবে শিবমূলক পদ হইয়া পড়ে। আমি বিশেষভাবে পদের চার ছত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই :—

> কত চতুরানন মরি মরি যাওত
> ন তুয়া আদি অবসানা
> তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
> সাগর-লহরী সমানা ॥,

পরিণতিতে বেদান্তবোধে বিশ্বাসবান কোনো কবির পক্ষে এই চার ছত্র যত স্বাভাবিক, দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব কবির পক্ষে নয়। আমি জানি, অনেকে বলিবেন, ভক্তির আবেগ কবির কাছে মাধব-মহিমাকে এত বড় করিয়া দেখাইয়াছে যে, তিনি তুলনায় চতুরাননকে তুচ্ছ করিতে উৎসাহিত। যে-কোনো দেবতার বন্দনায় এই জাতীয় আতিশয্য স্বাভাবিক বস্তু। সে কথা

সত্য, কিন্তু তদপেক্ষা কি ইহা বিদ্যাপতির সেই শ্রেণীর ঈশ্বরবিশ্বাস দেখাইয়া দেয় না, যাহা আরম্ভে রূপে বিশ্বাস করিলেও অন্তে এক-ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের এক-ব্রহ্ম-শক্তিতে আস্থা ঘোষণা করে? বিদ্যাপতি যে ঈশ্বরের ঐ এক-রূপে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার কাব্যে তার প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষে রূপ ও অরূপ যাঁহার চিন্তায় একত্রে উদিত হয়, সে দেবতার নাম শিব।

তথাপি বলিব, এটি মাধব-প্রার্থনার পদ। পদকল্পতরুতে এটি মাধব-নামাঙ্কিত। সে প্রমাণকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নাই। কেবল সবিনয়ে যোগ করিব, বিদ্যাপতির মাধব এবং বিদ্যাপতির শিব বাস্তবিক এক-স্বভাব—কেবল কথার কথায় এক নয়,—এবং সেই 'মাধব'-এর অনুগত বিদ্যাপতিকে পাইয়া সম্প্রদায়নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ অধিক লাভবান হইবে না।

সে মাধব স্বয়ং ঈশ্বর।

বিদ্যাপতির শিবও স্বয়ং ঈশ্বর। মাধব ও শিব ঈশ্বরের দুই নাম।

বিদ্যাপতি শৈব থাকিয়া মাধব নামেও ঈশ্বর-আরাধনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব ছিলেন না—এই নেতিভাবমূলক আলোচনা যথেষ্ট করিলাম। কবির ধর্মবোধের যথার্থ প্রকৃতি-বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। ধর্মমতে তিনি শৈব (ও শাক্ত), সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোনো কারণ নাই। যিনি স্বদেশে শৈব কবিরূপে গৃহীত, যাঁহার রচিত শিব ও শক্তির গান মন্দিরে মন্দিরে গাওয়া হয়, প্রদেশান্তরের সাম্প্রদায়িক ধারণানুযায়ী তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিতে পারি না। একটা দেশের ঐতিহ্য ও লোকশ্রুতিকে অস্বীকার করিব? তাছাড়া শেষ পর্যন্ত যে বিদ্যাপতি শৈব (এবং শাক্ত) ছিলেন তার বড় প্রমাণ ৮০ বৎসর বয়সে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করা—যে গ্রন্থটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পূর্ব ও উত্তর ভারতে গৃহীত। আশী বৎসর বয়সে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করার সময়ে কি বিদ্যাপতি অভিনয় করিতেছিলেন—ভিতরে পূর্ণ বৈষ্ণব হইয়া বাহিরে শক্তিশাস্ত্র রচনার আড়ম্বর করিতেছিলেন? বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব বলার পক্ষে প্রধান প্রমাণ তাঁহার বৈষ্ণব পদাবলী। বিপরীত পক্ষে এই প্রশ্ন কি করা যায় না—পদাবলী ছাড়া বৈষ্ণব-ভাবমূলক আর কোন্ রচনা কবির আছে?

শৈবসর্বস্বহার, গঙ্গাবাক্যাবলী—বিদ্যাপতির এইসব রচনাকে কিভাবে বিস্মৃত হইব ?* না, বিদ্যাপতি সম্পূর্ণভাবে শৈব—প্রথম ও শেষে।

এবং বিদ্যাপতির শৈবত্ব তাঁহার মাধব-প্রীতি ধারণের পক্ষে যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। কেবল বিদ্যাপতির শৈবত্ব কেন, সকল যথার্থ শিবভক্তই এই মানসিক উদারতার উত্তরাধিকারী। কারণ শৈব আদিতে রূপবাদী হইলেও অন্তে অদ্বৈতপন্থী। শাক্তও তাই। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে শিব ও শক্তি-ধর্মের এই মূল পার্থক্য। শৈব ধারণায় শিব ভগবানের নন, ব্রহ্মেরই নামান্তর। সেই শিবনাম আবার রূপের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তখন শিব, ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর মতই ভগবানের প্রকাশ। বিদ্যাপতি অধিকন্তু তাঁহার বৈষ্ণব ভাব-প্রীতির জন্য মাধবকেও ব্রহ্মের অন্য নাম ধরিয়াছেন।

এই মানসিক উদারতার, শৈব-উদারতার, অপূর্ব উদাহরণ আছে ভারতের প্রধান শৈব কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে। ঐ কাব্যে তিনি জগৎ-পিতার মহিমাজ্ঞাপন করিয়াছেন। অতি গম্ভীর ও মহনীয় শ্লোকরাজি সে মহিমার উচ্চারণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। পরম আরাধ্য শিব ধ্যান ভাঙিয়া পরম জননীকে গ্রহণ করিবার জন্য বিবাহযাত্রায় চলিয়াছেন ; ত্রিভুবন শিবের চরণতলে ভাঙিয়া পড়িয়াছে ; ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণকে কৃপা-কটাক্ষে ও সামান্য দুই এক বচনে মহাদেব কৃতার্থ করিতেছেন ; সে দৃশ্য দেখিয়া কবি ভাবভরে উচ্ছ্বসিত,—সকল দেবতার মাথার উপরে শিবের চূড়াচন্দ্র গরিমার হাসিতে জ্বলিতেছে,—এমন সময় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আসিলেন শিবের সাক্ষাতে। এই সময় যিনি আত্মসংবরণ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ শৈব। কালিদাস পারিয়াছেন। এই পরিবেশে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আপেক্ষিকভাবে ন্যূন করিলেও ভক্তের ভাবাতিশয্যের প্রশ্রয় যখন কবি সহজেই পাইতেন, তখন তিনি কি বলিলেন ? স্বচ্ছ প্রজ্ঞায় আলোকিত চার ছত্র :—

তমভ্যগচ্ছৎ প্রথমো বিধাতা শ্রীবৎসলক্ষ্মা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ।
জয়েতি বাচা মহিমানমস্য সংবর্দ্ধয়ন্তৌ হবিষেব বহ্নিম্॥

*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"বিদ্যাপতি সংস্কৃতে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্মৃতি অর্থাৎ হিঁদুয়ানী তো আছেই, তার উপর শিব আছেন, দুর্গা আছেন, গঙ্গা আছেন—কৃষ্ণ একেবারে নাই।" (কীর্তিলতার ভূমিকা)

একৈব মূর্তির্বিভেদে ত্রিধা সা সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্ ॥
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিদ্বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ ।

ঘৃতাহুতির দ্বারা যেমন হবির্ভুক অনলের মাহাত্ম্য বর্ধিত হয়, তদ্রূপ 'জয় হউক,'—এই কথার দ্বারা ত্রিজগজ্জয়ী ত্রিপুরারির মাহাত্ম্য সংবর্ধিত করিতে করিতে জগতের আদি বিধাতা ব্রহ্মা ও শ্রীবৎসচিহ্নশোভিত পুরাণপুরুষ সাক্ষাৎ বিষ্ণু আসিয়া শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

সেই একই মূর্তি,—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই ত্রিপ্রকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন মাত্র। ইঁহাদের প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি বিভাগ করা যায় না। কোনো সময় হয়ত হর বিষ্ণুর প্রথম, কখনো আবার বিষ্ণু হরের আদিভূত, কখনো বিধাতা (ব্রহ্মা) হরি ও হরের পূর্ববর্তী, কখনো বা হরি ও হর ব্রহ্মারও পূর্ববর্তীরূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন। (অনুবাদ—বসুমতী)

শিবকে নমস্কার এবং শিবভক্তকে নমস্কার। কালিদাসকে এবং বিদ্যাপতিকে। বিদ্যাপতির এই শৈব-ভাবনার প্রমাণ আছে অন্য দেবদেবীমূলক (রাম, সীতা, গঙ্গা ইত্যাদি) পদগুলিতে এবং হরিহরের অভেদমূলক পদে। রামভক্তিমূলক একটি পদ চমৎকারভাবে বিদ্যাপতির এই জাতীয় মনোভাব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। বিদ্যাপতির মন কিভাবে দেবতা হইতে দেবতান্তরে অক্লেশে যাইত এখানে তার দৃষ্টান্ত মেলে। ৬০৮ সংখ্যক পদে বাণিজ্যের রূপক দ্বারা জীবনের রূপ ফুটাইবার প্রয়াস,—সংসারে সবাই বণিক, বেচাকেনাই সংসারের ধর্ম; লোভের বস্তু লইয়া সকলে বাণিজ্য করে; কিন্তু আবার মন্মথ-চোরকে পুষিয়া রাখে; তাই সকলই খোয়ায়। কবির বক্তব্য—"মাধব-ধন লইয়া বাণিজ্য করিলে লাভ হইত।"

এই পদের ভণিতা এইরূপ :—"বিদ্যাপতি কহেন, শুন মহাজন, রাম-ভক্তিতে লাভ আছে।"

পদের মধ্যে মাধব-ধন লইয়া বাণিজ্য করিলে লাভ হয়, এরূপ কথিত। ভণিতায় বলা হইল রামভক্তিতে লাভ আছে। বিদ্যাপতির মনোভাব কি স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছে না? বিদ্যাপতির মন মাধব হইতে রাম, রাম হইতে শিব, শিব হইতে ব্রহ্মায় অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিত। রক্ষণশীল বৈষ্ণব হইলে কখনো মাধব হইতে রামে যাইতেন না—রাম, বিষ্ণুর অবতার হইলেও—না।

বিদ্যাপতির মনোধর্মের প্রকাশরূপে হরিহরের অভেদমূলক পদগুলির

উল্লেখ করা চলে। আত্মকথনের জন্ত মূল্যবান ৬০৭ পদের ভণিতায় হরিহরের পদপঙ্কজ-সেবার কামনা প্রকাশিত। ৭৬৭ পদে কবি নারায়ণ ও শূলপাণিকে অভিন্ন সত্ত্বায় দর্শন করিয়াছেন। যথা—

"হর ভাল, হরি ভাল, তোমার লীলা ভাল। ক্ষণে পীতবসন, ক্ষণে বাঘছাল কখনও পঞ্চানন, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও শঙ্কর, কখনও দেব মুরারি। ক্ষণে গোকুলেতে গাভী চরাও, ক্ষণে ডমরু বাজাইয়া ভিক্ষা মাগ। ক্ষণে গোবিন্দ হইয়া মহাদান লও, ক্ষণে ভস্ম মাখিয়া কাঁধে ঝোলা ঝুলাও। একই দেহ, দুই বাসস্থান লইয়াছ। ক্ষণে বৈকুণ্ঠ, ক্ষণে কৈলাস। বিদ্যাপতি এই অদ্ভুত কথা বলিতেছেন, যে-নারায়ণ, সেই শূলপাণি।"

এই পদে একজন 'তুমি' আছেন, যিনিই সব হইয়াছেন। সেই 'তুমি' বিদ্যাপতির ভগবান। সেই ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম বিদ্যাপতির নিকট—শিব।

সেই শিব-ভগবানের ফাগ খেলার এক পদ আছে বিদ্যাপতির। অভিনব কল্পনায় পদটি দৃষ্টিযোগ্য :—

"কত ঝুলি সিন্দূরে ভরিল। ভস্মে ঝুলি ভরিল। বৃষ, সিংহ, ময়ূর ও মূষিক চারিটি (বাহনের) সাজ দেওয়া হইল। ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজিল। ঈশ্বর ফাগ খেলিতেছেন। একদিন ভস্ম ও সিন্দূর দুইয়েরই খেলা (হইল)। সন্ধ্যায় গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সিন্দূরে ভরিয়া দিলেন। ঈশ্বর, নারায়ণকে ভস্মে ভরিয়া দিলেন। পীতবসন (ভস্মে) ডুবাইলেন। একে ত উলঙ্গ তাহাতে আবার উন্মত্ত, নরের ঈশ্বর ধুস্তুরা খায়, আবার উন্মত্ত হইয়া ফাগ খেলে ও খেলায়। নারায়ণ গরুড়-বাহন, মহাদেব বৃষে চড়েন। বিদ্যাপতি কহেন, কৌতুকে গাহিলেন, একসঙ্গে হরিহর দেশে দেশে ফিরিতে থাকুন।"—৫৯৯

আশ্চর্য কল্পনা। শ্মশানেশ্বর রঙের নেশায় মাতিয়া রাঙা ফাগ ছড়াইতেছেন। বিশ্ব-সংসারকে লাল করিয়া দিবেন। দিলেনও, অন্ততঃ নিজের শ্মশান-গৃহকে; বৃষ, সিংহ, ময়ূর ও মূষিক এই চারি বাহন এবং গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী শিবের শ্মশান-প্রাঙ্গণে বর্ণরক্তিম হইয়া উঠিলেন। এইখানেই শেষ নয়—চূড়ান্ত খেলা রঙের প্রভু নারায়ণের সঙ্গে। অপূর্ব খেলা। নারায়ণকে রাঙাইতে শিব ফাগ ফেলিয়া দিয়া ভস্ম মুঠিতে লইয়াছেন—ছাই ঢাকিয়া দিল সিন্দূরকে—শ্মশানের বর্ণে ছাইয়া গেল নারায়ণের কমলবর্ণ।

অসামান্ত শিব। পাগল ভোলানাথের খেলার পাগলামি। শিবের

ধ্যানস্তম্ভিত রূপের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের গোপন আহ্বান দেখিয়াছেন—বিদ্যাপতিও চকিতে যেন সেই শিবের দর্শন পাইলেন।

এ শিবও বোধহয় বিদ্যাপতির কাছে চরম সত্য নয়—শক্তিসহিত শিবই শেষ সত্য। বিদ্যাপাত যে শৈব তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ,—বিদ্যাপতি শাক্ত। শেষবারের মত কবির শক্তিবিষয়ক পদগুলিতে দৃষ্টিপাত করিতে বলি। দেখা যাইবে, মহামায়া ও দুর্গা সংক্রান্ত পদে শক্তিমাহাত্ম্য ঘোষণায় কবি দ্বিধাহীন। শঙ্করই হউন, মাধবই হউন—সকলেই পরমা শক্তির অধীনস্থ। সকলকে গ্রাস করিয়া মহামায়া বিরাজমান। কালী, ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী—প্রত্যেকে মহাশক্তির কলাবিকাশ। এই শক্তিকে মানিয়া বিদ্যাপতি একদিকে শাক্ত, অন্যদিকে, শৈব থাকিতেছেন। এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তি, আদ্যাশক্তি হয়, তবে ঐ শক্তির পুরুষ-প্রতিরূপ কে? নিশ্চয়ই শিব। শিব একরূপে, সাধারণভাবে, দেবতাবিশেষ। সেখানে তিনি অন্য দেবতার সমতুল হইতে পারেন, কিন্তু যেখানে তিনি প্রকৃতির পুরুষ, সেখানে তাঁহার অদ্বিতীয় মহিমা।

শক্তিমূলক পদগুলি স্তোত্রমূলক ও তত্ত্বাত্মক। আদি রহস্যের সামনে কবি বিমূঢ়। সন্তানের দাবি এবং ভক্তের মিনতিতে পদগুলি আন্দোলিত। কবি একটি পদে (৭৬৬) মহাশক্তির ভয়ঙ্করী কালিকামূর্তি দেখিয়াছেন। সেই অসুর-সংহারকারীর ভয়াবহ রূপ ছন্দে ফুটাইতে তিনি প্রয়াসী। ইহাকে ভয়ঙ্করের শব্দার্চনা বলা চলে। ঐ মৃত্যুভীষণার প্রতি কবির ভালবাসা তাঁহার শাক্ত স্বভাবের দ্যোতক। ভণিতায় বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি কবি তুয়া পদসেবক
পুত্র বিসরু জনি মাতা॥

অন্য দু'একটি পদে এই মহাশক্তি যে সর্বদেবতার শীর্ষে, তাহা ঘোষিত। যথা দুর্গাবিষয়ক ১০ সংখ্যক পদে—

জগতি-পালন জনন মারণ-
রূপ কার্য সহস্র কারণ
হরি বিরিঞ্চি মহেশ শেখর
চুম্ব্যমান পদে।

এবং একই কথা ১১ সংখ্যক পদে—"হরি হর ব্রহ্মা তোমার তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ান। একজনও তোমার আদি মর্ম জানেন না।"

এবং ৫৯২ পদে মহামায়া-বন্দনায়—"তেত্রিশ কোটি দেবতা মস্তক নত করে।"

এই দেবী-মূর্তি কিন্তু প্রচলিত ধারণার কালিকামূর্তি নহেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত মহাপ্রকৃতি। কালী, কমলা, বাণী, প্রচণ্ডা, গঙ্গা, ব্রহ্মাণী—সকলেই ইঁহার প্রকাশ। বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত পদে এই শক্তির রূপ উদ্‌ঘাটিত,—

"হে বর কেশশোভিনি দেবি! জ্ঞানগম্যা হও, প্রকাশিতা হও। তুমি একাই সহস্রকে মারণ কর, যুদ্ধস্থলে পুরনর্তকীর ন্যায় অবলীলাক্রমে নৃত্য করিতে থাক। তুমি কজ্জলরূপে কালী নামে পরিচিতা, উজ্জ্বলরূপে বাণী। সূর্যমণ্ডলে তোমাকে প্রচণ্ডা কহে, জলরূপে গঙ্গা বলে। ব্রহ্মার ঘরে তুমি ব্রহ্মাণী, হরের গৃহে গৌরী, নারায়ণের গৃহে কমলা। তোমার উৎপত্তি কে জানে?".

বিদ্যাপতি-পদাবলীর এইটি প্রথম পদ। রচনাকালে কবির বয়স আন্দাজ পঁচিশ মত। বিদ্যাপতি আরো প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মবোধকে এই মহাদেবীই চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া ছিলেন। বিদ্যাপতি শিবের সেবক এবং শক্তির সন্তান।

ভারতবর্ষের শিব

কালিদাস—বিদ্যাপতি—রবীন্দ্রনাথ

বিদ্যাপতি শিবের পদ লিখিয়াছেন। কবির স্বদেশ তাঁহার বৈষ্ণব পরিচয় স্বীকার করে না, তাঁহাকে শৈব বলিয়াই জানে এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার শিব-গান গাহিয়া থাকে। মিথিলার লোকগীতি হইতে বিদ্যাপতির শিব-সঙ্গীতের অনেকগুলি সংগৃহীত। বিদ্যাপতির প্রতি সুবিচার করিতে হইলে তাঁহার শিবসঙ্গীতের আলোচনা অপরিহার্য। ইতিপূর্বে আমরা বহু তথ্যপ্রয়োগে সিদ্ধান্ত করিয়াছি—তিনি শেষ পর্যন্ত শৈব ছিলেন। শিব-বিষয়ক পদের আলোচনায় আমরা তাই ন্যায়তঃ বাধ্য। শৈবের শিব-গান জানিব না—ইহা শিবাপরাধ।

কিন্তু কবি কোন্ শিবের কথা লিখিয়াছেন ?—ভারতবর্ষের শিব। তাঁহার কি এক মূর্তি ! ভারতের দর্শন, কাব্য উন্মত্ত হইয়াও সে উন্মাদকে ধরিতে অসমর্থ। যোগীর তিনি ধ্যেয়, কবির তিনি স্বপ্ন। শ্মশানেশ্বর কবির দেবতা ? রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠে বলিয়াছেন—কবি মাত্রই শৈব।

কবি মাত্রই শৈব—সৌন্দর্যবাদী কবির মহত্তম স্বীকারোক্তি। সুন্দর, শেষ কথা নয়—আরো এক কথা আছে—মঙ্গল। শ্যাম, শেষ কথা নয়—শিব। শিবের দুই রূপ—এক, শ্যাম-শিব অর্থাৎ সুন্দর শিব ; আর, শ্বেত-শিব, অর্থাৎ অদ্বৈত শিব।

ভারতবর্ষ এখানেই থামে নাই। শিবের মধ্যেই মৃত্যু এবং মৃত্যুর মধ্যে শিব। রুদ্র-রূপে শিব মৃত্যুকে অঙ্গে অঙ্গে নাচাইয়াছেন, এবং শ্মশানে গৃহস্থালী পাতিয়া উমানয়নে, চন্দ্রালোকে মধুস্বপ্ন দেখিয়াছেন।

শিব এখনো অসমাপ্ত। যাঁহার প্রতিদিনের অট্টহাসটুকুমাত্র শিখরে শিখরে শ্বেত তুষারে ধরিয়া নগাধিরাজ ধন্য, তিনি একটি 'নিরাকার' কালো পাথরে অঙ্গ ঢাকিয়া দরিদ্রের ভাঙা কুটীরে মাটির সিংহাসনে কিংবা পথপার্শ্বে অশ্বত্থমূলে সিন্দুরচর্চায় কালাতিপাত করেন। আবার যখন পাষাণ-দেহের তন্দ্রা ছাড়িয়া পেটের জ্বালায় পথে পথে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে

ঘুরিয়া বেড়ান—তখন নগরিয়া ছাওয়ালেরা চরিদিকে আসিয়া জুটে এবং ঝুলিতে টান দিয়া দাবি করে, নাচ দেখাও, সাপ খেলাও, জটা নাড়িয়া জল বাহির কর।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোককাব্য। শিবায়ন।

অর্থাৎ শিব একা কাহারো নহেন, তিনি শ্রুতি এবং স্মৃতির, তিনি ব্যাস এবং শঙ্করের, তিনি কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের। তিনি শিবায়ন কাব্যের এবং ভারতচন্দ্রের।

বিদ্যাপতির শিব কোথায় আছেন ?

আমি সকল শিবকে বাদ দিব, কবির শিবকে লইব,—ভারতবর্ষের দুই শ্রেষ্ঠ শৈব কবি কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথকে।

সেও বিশাল কাজ। হিন্দুযুগের প্রধানতম কবি কালিদাস এবং আধুনিক যুগের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাদের ঊর্ধ্বকল্পনার দেবশিখরকে আবিষ্কার কবিতে পারিব—একথা বলার স্পর্ধা আমার নাই। কয়েকটি খণ্ড চিত্র কেবল উপস্থিত করা যাক।

জগৎ-পিতা এবং জগন্মাতাকে কলিদাস সৃষ্টির অজ্ঞেয় অসহনীয় ভুবনে লইয়া যাইবেন, কুমারসম্ভব কাব্যের সাত সর্গে তাহারই প্রস্তুতি। সৌন্দর্য ও শুচিতা কোন্ গরিমার অক্ষরে, মহিমার পটে লেখা সম্ভব, কুমারসম্ভবের স্বেচ্ছা-খণ্ডিত কাব্যে কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। সে কাব্যের একদিকে আছে শিবের ধ্যান, অন্য দিকে উমার প্রস্তুতি। দেবদারুদ্রুমতলে মহাধ্যানে যতিরাজ শিব যখন স্তম্ভিত, তখন বসন্তের পুষ্পাভরণ অঙ্গে ভরিয়া দেবী পার্বতী আসিতেছেন। স্তনভারে ঈষৎ আনমিত, পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে নম্র, রক্ত-বসনা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির সামনে, পিছনে এবং মধ্যে ছিল মদন-বসন্তের লুকোচুরি ও মাতামাতি। ইহারই নাম উমার প্রস্তুতি। অন্যদিকে শিবও ধ্যানভঙ্গে প্রস্তুত—তাঁহার ধ্যান, তাঁহার কামসংহার রোষ, তাঁহার মৌন তিরস্কারের ভিতরেও একটি আহ্বান ছিল—তাঁহার উমাকে—যে উমাকে সতীরূপে হারাইয়া তিনি ধ্যানলীন—উমারূপে পাইবার জন্যই।

প্রত্যাখ্যাত উমা ফিরিয়া যাইবেন, কেহ বাধা দিবে না, ভবিষ্যতের একটি অসাধারণ ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থাকে লাভ করিবার জন্য। সেদিন ব্রহ্মচারীর মধ্যে শিবকে দেখিয়া উমার অবস্থা সম্বন্ধে কালিদাস বলিবেন—

উমা যেন পর্বতরুদ্ধগতি ব্যাকুলা নদী। অপমানিত উমার তপস্যাগমন সেই পরম পর্বতের সন্ধানে, পর্বতের মধ্যে আপনার গতি-সমাপ্তির কামনায়। তাহারই জন্য উমা তপস্যা করিয়াছেন, বিদ্যুন্ময় আঁখি আদিগন্ত মেলিয়াও বর্ষার নিশীথ-রাত্রি যার সবটুকু বোধ হয় দেখিয়া উঠিতে পারে নাই।

তারপর একদিন শিবের ব্রহ্মচারী বেশ খসিয়া পড়িবে। রবীন্দ্রনাথ কবির স্পর্ধায় শঙ্করের প্রবঞ্চনাটুকু ধরিয়া দিবেন—'জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান, চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান।' উমাকে 'বিচ্ছেদের দীপ্ত দুঃখদাহে' কাঁদানোই ছিল নিষ্ঠুরের প্রেমাভিপ্রায়। গৃহের পথে শিবের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। তারো পূর্বে ওষধিপ্রস্থে সৌন্দর্যের বাসর।

নন্দী-সন্ত্রস্ত, ক্ষীণ-বসন্ত, মদনভস্মে ধূসর তপস্যাভূমের সঙ্গে হিমালয়-নগর ওষধিপ্রস্থের কি বিপুল পার্থক্য! ওষধিপ্রস্থের রূপসজ্জায় কালিদাস ভাণ্ডার উজাড় করিয়াছেন;—বৃহৎ মণিশিলার প্রাচীরবেষ্টন, জ্যোতির্ময় ওষধির আলোকচ্ছটা, মন্দার-কুসুমের প্রগল্ভ উচ্ছ্বাস, চীনাংশুকের পতাকান্দোলন, কল্পপল্লবপতাকার কম্পন, মেঘমৃদঙ্গের ধ্বনি এবং কাঞ্চন-তোরণে উজ্জ্বল রাজবর্ত্ম—এই ওষধিপ্রস্থে যৌবন ভিন্ন বয়স নাই, রতিক্লান্তি ভিন্ন সুপ্তি নাই, স্ফুরিতাধরার মান ভিন্ন রোষ নাই। এই ওষধিপ্রস্থের রত্নপীঠে মঙ্গলস্নানশুদ্ধা ধৌতবসনপরিহিতা শারদ-ধরিত্রীর মত উমা-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা—তাঁহার সিঁথির উপরে আরোপিত নবীন দূর্বাঙ্কুরে শিব-কামনার শ্যামাঙ্কুর।

শিব যাত্রা শুরু করিলেন। ত্রিপুর-বিজয়কালে বাণদ্বারা আকাশমার্গে নিজ গমনের জন্য যে পথ নিজে চিহ্নিত করিয়াছিলেন, সেই স্বপথে শিবের যাত্রা আরম্ভ হয়। বৃষভবাহন শিবের অনুপম সজ্জা—পিছনে অনুগামী ত্রিভুবন। সপ্তমাতৃকারা অগ্রে চলিলেন। চলিলেন মহাকালী। সুনীল মেঘ-মালার পুরোভাগে হেমকান্ত বিদ্যুৎবৎ তাঁহাদের গমনগতি দেখাইল। অগ্রগামী প্রমথগণ মঙ্গলধ্বনি করিয়া চলিল এবং শিবের মাথায় সহস্ররশ্মিছত্র ধরিলেন স্বয়ং সূর্য। গঙ্গা ও যমুনা হংসমালার মত চামর দুলাইতে লাগিলেন। কৃপা-কটাক্ষের প্রার্থী হইয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নত মস্তকে দাঁড়াইলেন,

এমন কি আদি পিতা ব্রহ্মা ও পুরাণপুরুষ বিষ্ণু পর্যন্ত এই বিশ্বোৎসব হইতে দূরে রহিলেন না।

সপ্তর্ষিবৃন্দের জয়রব, গন্ধর্বগণের বীণাধ্বনি, ত্রিজগতের মঙ্গলগীতির ভিতর দিয়া, ঘণ্টাকিঙ্কিণীতে চতুর্দিক মাতাইয়া, শিব-বহনের গৌরবে বিশাল দেহ দোলাইতে দোলাইতে ওষধিপ্রস্থপথে সর্বাধিক আনন্দে চলিতেছিল বৃষভরাজ—তাহার শৃঙ্গমুখে বিদ্ধ নানাবর্ণ মেঘখণ্ডগুলি মালার আকারে দুলিতেছিল,—সেই যাত্রাপথে কবি কোথায় ছিলেন? প্রাচীন কবি কালিদাস সম্ভ্রমবশতঃ সেকথা বলেন নাই, নবীন রবীন্দ্রনাথ বর্ণরক্তিম প্রগল্ভতায় সেই কথাটি খুলিয়া বলিয়াছেন—

হেনকালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাক বিবাহের যাত্রাপথতলে
পুষ্পমাল্য মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

সেই পথে কবি বিদ্যাপতি কোথায় ছিলেন?

বিদ্যাপতি কালিদাস হইতে বহুদূর। প্রথমতঃ ক্ষমতার অভাবে,—রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এই দেড হাজার বৎসরে কালিদাসের সমস্তরের কবি ভারতবর্ষে পাওয়া গেল না;—দ্বিতীয়তঃ ভিন্নতর ভাবসংস্কারের প্রভাবে। বাস্তবিক বিদ্যাপতির পক্ষে কালিদাসের বর্ণাঢ্য গাম্ভীর্যকে অনুকরণ করা সম্ভব ছিল না, একথা না বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথের মত অতিমহৎ কবিও সে গম্ভীর মহিমার প্রতিফলনে অসমর্থ। তাহার কারণ আমরা জানি, মূল ভাবাদর্শে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথে মানস-ঐক্য থাকিলেও কাব্যরীতি ও রসরীতির পার্থক্য আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ে ক্লাসিকরীতির কবি কালিদাসের নিকট যে ভাবমহিমা সাধ্যায়ত্ত, প্রাণে ও গানে চঞ্চল লোকভাষার রোমান্টিক কবি যত প্রতিভাবানই হোন—সে গাম্ভীর্যসৃষ্টিতে অসমর্থ হইবেনই। রবীন্দ্রনাথের গৌরব এইখানে যে, তিনি কল্পনার ঊর্ধ্ব ও মুক্ত গতিতে—গহন গতিতেও বটে—বহু ক্ষেত্রে কালিদাসের অপেক্ষাকৃত স্থিরগতি ভাবনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অশরীরী সঙ্গীতোচ্ছ্বাস

এবং অতীন্দ্রিয় শিহরণ কালিদাসের কাব্যের সিন্ধুগর্জন ও হিমালয়-মৌনের ক্ষতিপূরণ—যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ কিনা বলিতে পারি না। এই দুই সমযোগ্য মহাকবি এইভাবেই পরস্পরের নিকটবর্তী—সে ক্ষেত্রে তুলনায় প্রতিভান্যূন বিদ্যাপতি নিশ্চয় পশ্চাৎবর্তী।

কিন্তু বিদ্যাপতির প্রতিভা-পরিমাণও অল্প নয়। নিজস্ব ক্ষেত্রে সে প্রতিভার সৃষ্টিগৌরব যে-কোনো কবির কাম্য,—নিজস্ব ভাবে যদি তিনি কালিদাসের শিব-বিষয়ক ভাব ও বক্তব্যের যথাযথ অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেও উপযোগী কাব্যসৃষ্টি হইতে পারিত। এই অনুকরণ বিদ্যাপতির পক্ষে দোষের হইত না—বিদ্যাপতিও ইহাকে দূষ্য মনে করেন না—সংস্কৃত কবিদের নিকট ঋণগ্রহণে বিদ্যাপতি অকুণ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাপতিকে বাধা দিতেছিল অন্য একটি বস্তু—শিব-ধারণায় তিনি দেশীয় ধর্মসংস্কারের অধীন ছিলেন। বিদ্যাপতি, তাঁহার পারিপার্শ্বিক শিবকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তত্ত্বদৃষ্টিবলে হয়ত সে লৌকিক ধারণাকে পরিহার করিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি আপন দেবতার প্রতি নিবিড় গ্রামীণ ভালবাসার বন্দীত্বই চহিয়াছেন। শৈব বিদ্যাপতি চাহিয়াছেন শিবকে জড়াইয়া ভালবাসিতে। 'দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরে' মৃত্তিকার বেদীতে যিনি আসীন, তাঁহার দিকে নিবিড় চোখে চাহিয়া, গদ্‌গদ প্রীতি ও গঞ্জনার ভাষায় কথা কহিয়া বিদ্যাপতির শৈবসত্তা পরিতৃপ্ত। শিবের বিশ্বব্যাপক মহিমা যদি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়, হউক, উত্তপ্ত নিকট-ভালবাসায় হৃদয় জুড়াইয়া যাক।

বিদ্যাপতি যে 'দেবদেব-মহাদেব'কে চিনিতেন না—তাহা সত্য নয়। সংস্কৃত স্তোত্রের অনুবাদ করিয়া তিনি শিবমহিমা সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় দেন নাই—তিনি আরো মহৎ কিছু করিয়াছেন—একটি অসাধারণ ব্যাপ্ত বিশেষণে শিবকে চিহ্নিত করিয়া আপন ভাববিশালতার পরিচয় রাখিয়াছেন। ভারতের লৌকিক ধারণায় শিব কৃষিদেবতা। নৃতাত্ত্বিকেরা শিবের সে পরিচয় স্বীকার করেন। কবি বিদ্যাপতিও। বারবার স্মরণ করাইয়া দেন—"শোন, হর জগতের কিষাণ।" শিব 'জগতের কিষাণ',—'শিব কালের রাখাল',—শিব-বিষয়ে এই দুই গরিমাময় বিশেষণ—একালের ও সেকালের।

কালিদাস হইতে বিদ্যাপতির দূরত্বের কারণ বুঝিলাম। বলা বাহুল্য

এই দূরত্ব বিদ্যাপতির শিববিষয়ক পদকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। এই দূরত্ব যদি রবীন্দ্রোচিত হইত, তবে কাব্যের ক্ষতির প্রশ্ন উঠিত না। রবীন্দ্রনাথ যেখানে শিবধারণায় কালিদাস হইতে সরিয়া গিয়াছেন, সেখানে অপর কোনো ধারণার অনুবর্তিতা করিবার জন্য নয়—নিজস্ব কল্পনার আস্বাদনে ও আহ্বানে। রবীন্দ্রনাথের শিব-ধারণা ভারতবর্ষে পূর্ণাঙ্গিক পরিকল্পনায় সর্বোত্তম। শিবের বৈদিক রুদ্রস্বরূপ হইতে কালিদাসের জগৎপিতা ও জগন্মাতারূপ পার্বতী-পরমেশ্বর ধারণা, এবং সেখান হইতে লোকসংস্কারের পাগল শিব, এবং সেখান হইতে নিজস্ব 'সুন্দর প্রেমিক' শিব, —রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে এই সমস্ত শিবেরই গান গাহিয়াছেন এবং স্বয়ং শিবরূপে (শৈব ও শিবে পার্থক্য নাই) শিবকে পান করিয়াছেন। কবির শিব-তপস্যার যজ্ঞাগ্নিতে সর্ব শিব আসিয়া শিখায় শিখায় আপন পিঙ্গল জটাজাল মেলিয়া দিয়াছিলেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথা থাক, আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে অংশবিশেষমাত্র ব্যবহার করিব; আমরা এই কথাই বলিতেছিলাম,—লোকধারণার অনুসরণে বিদ্যাপতির কালিদাস-ত্যাগ কাব্যের পক্ষে অবশ্যই ক্ষতির কারণ। এই ক্ষতি অতিক্রম করা কিন্তু বিদ্যাপতির সাধ্যাতীত ছিল। কারণ তিনি শৈব। ধর্মবিশ্বাস এমনই জিনিস, যাহা মানুষকে কিছু পরিমাণে রক্ষণশীল করেই। বড় শ্রদ্ধার জিনিসে মানুষ নূতন কিছু করার বা বলার প্রলোভন দমন করে। রবীন্দ্রনাথ যে শিব সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিতে পারিয়াছেন, তার কয়েকটি কারণের একটি কারণ হইল, (মূল কারণ অবশ্য প্রতিভার বিশালতা) রবীন্দ্রনাথ আচারী শৈব ছিলেন না,—শিব তাঁহার নিকট ভাবের রূপ, অজস্র রূপে তিনি শিবের সেই ভাবরূপের অর্চনা করিয়া গিয়াছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের যুগ, মুক্ত ব্যক্তি-কল্পনার যুগ, ট্রাডিসনের লঙ্ঘনই যে-যুগে কাব্যশক্তির প্রথম প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ শিববিষয়ক নবপুরাণ-সৃষ্টিতে তাই কার্যতঃ বাধ্য, যদি না করিতেন, তাঁহার কাব্য 'দশমহাবিদ্যা'র মত কাব্যপ্রদর্শনীতে পর্যবসিত হইত। বিদ্যাপতি অপরপক্ষে ঐতিহ্যের দ্বারা বহুলাংশে আবদ্ধ। এবং তিনি যে দুই ঐতিহ্য পাইয়াছিলেন—[illegible] এবং দেশীয়—ইহার মধ্যে তিনি দ্বিতীয়টিকেই বরণ করিয়া আপন কাব্যকে অপেক্ষাকৃত ভারমুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

এইখানে বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদের সঙ্গে শিবপদের তুলনা করা চলে। বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

বিদ্যাপতি মূলতঃ বৈষ্ণব কবি। বিদ্যাপতির নামে প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণবপদ সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাপতির শিব-বিষয়ক পদ কাব্যরূপে বৈষ্ণবপদের সমতুল, আমরা এরূপ দাবি করিবার কথা চিন্তাও করিতে পারি না। বিদ্যাপতির কবিপরিচয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বৈষ্ণবপদের উপর নির্ভরশীল।

অবশ্য একথাও সত্য নয়, বিদ্যাপতির শিব-পদগুলি তাঁহার মহিমা-হানিকর (যেমন খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মত)। কবির শিবপদের যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে, যথাযথ আলোচনার অভাবে যে সৌন্দর্য বিষয়ে আমরা উদাসীন। কিন্তু পদগুলির বিষয়ে বড় কথা—যে-কথা আমরা বলিতে চাহিতেছি—সেগুলি বিদ্যাপতির মনোরূপের প্রকাশক। তাঁহার ধর্মবিশ্বাস এবং জীবন-বিশ্বাস এই পদগুলিতে ধৃত। বৈষ্ণবপদে তিনি ব্যক্তিমানুষ ও কবিমানুষ—শিবমূলক পদে ততোধিক সামাজিক চরিত্র।

ঐতিহ্যবাদী কবি বিদ্যাপতির ঐতিহ্যনিষ্ঠা শিবমূলক পদের সীমাবদ্ধতার কারণ, বৈষ্ণবপদে সেরূপ নয়। শিবৈতিহ্য বিদ্যাপতিকে কয়েকটি লৌকিক ধারণায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল কিন্তু বৈষ্ণবপদে তাঁহার ঐতিহ্যপ্রীতি কেবল রূপ-রীতি অর্থাৎ অলঙ্কারগত। স্ত্রীপুরুষের প্রেম, শেষ পর্যন্ত কোনো বন্ধনেরই অন্তর্গত নয়। অপরপক্ষে ধর্মবোধের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনাচার অসম্ভব। তাই যাঁহারা বৈষ্ণবপদের মুক্ত আবেগ দেখাইয়া বিদ্যাপতির শিবভক্তির ন্যূনতা দেখাইতে চান, তাঁহাদের মত অযুক্তিসিদ্ধ ও অশ্রদ্ধেয়।

কথাটি ব্যাখ্যা করিয়া বলা দরকার। বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদ শিব-পদের তুলনায় উৎকৃষ্ট, একথা সর্বথাস্বীকৃত এবং আমাদেরও তাই মত। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি বৈষ্ণবপদে কবিমানুষ ও ব্যক্তিমানুষ এবং শিবপদে সামাজিক মানুষ। একথার অর্থ কিন্তু এই নয়—যেমন অনেকে প্রকারান্তরে বলিতে চান—তিনি বাহিরে, লোকজীবনে, শৈব থাকিলেও হৃদয়গহনে বৈষ্ণব ছিলেন। বিদ্যাপতি আধুনিক মানুষের মত বহুব্যক্তিত্ববাদী ছিলেন

না। ধর্মজীবনে বিভক্ত ব্যক্তিত্বের আস্বাদন তাঁহার কাম্য নয়। সামাজিক মানুষরূপে আচরিত শৈব ধর্মই তাঁহার ব্যক্তিধর্ম।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবপদ যদি অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে, তবে তাহা উৎকর্ষলাভের উপযুক্ত বিষয়বস্তুর জন্যই। বিদ্যাপতি তাহা জানিতেন বলিয়া রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে কাব্য-উপাদানরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। শিবলীলাত্মক পদে বিষয়গত সীমাবদ্ধতা আছে। শিবকাহিনীকে লইয়া অজস্র ক্ষুদ্র পদ রচনা করা শক্ত। কোনো ক্ষুদ্র পদকে কাব্যসিদ্ধি দিতে গেলে ঐ সামান্য আকারের মধ্যেই অতি তীব্র অনুভূতি-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। একমাত্র আদিরসের দ্বারাই অজস্র ক্ষেত্রে সেই অনুভূতির সঞ্চার সম্ভবপর। প্রেমজীবনে মুহূর্তের নিত্য সম্ভোগ। তাই প্রেমকে অবলম্বন করিয়া সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ রচিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি তাহা জানিতেন। এবং তাহা যে পারিতেন—রাধাকৃষ্ণপ্রেমাবলম্বী বিপুল সংখ্যক পদ তার প্রমাণ। কিন্তু শিব ও গৌরী একান্তই প্রেমের দেবতা নহেন। তাঁহারা ভারতীয় হিন্দু কল্পনায় জগৎপিতা ও জগন্মাতা। তাঁহাদের প্রেমজীবন আছে, কিন্তু তাহা জীবনের অংশমাত্র। ঐ প্রেমকথা যেখানে বর্ণিত—তাহা বিস্তৃত আখ্যান-কাব্যের অন্তর্গত। ধারাবাহিক বর্ণনা ভিন্ন সে প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কুমারসম্ভবে কালিদাস তাহাই করিতে সচেষ্ট। আবার শিব-গৌরীর প্রেম সংসারভবনের—পরকীয়া প্রেম নয়। ধর্মসঙ্গত সেই প্রেমের উদয়, উচ্ছ্বাস, সংঘাত, তপস্যা ও সিদ্ধি বিস্তারিত কাব্যকাহিনীর মধ্যে ধৃত। ঐ কাহিনীর আশ্রয়বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের বিষয়ে ছিন্ন অনুভূতি-মূলক পদ বেশি রচনা করা কঠিন। অবশ্যই তাঁহাদের জীবনের খণ্ডরূপ আছে—প্রেমজীবন, সংসারজীবন, জীবনের সঙ্কট ও সংঘাতের ক্ষণ—সে অংশকে কাব্যবস্তু বিদ্যাপতিও যথাসম্ভব করিয়াছেন—কিন্তু সেই সকল টুকরা পদে তিনি যদি বৈষ্ণবপদের অনুরূপ সাফল্য লাভ করিতে না পারেন—বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাহা পারেন নাই। বিদ্যাপতির পক্ষে শিবগৌরীর প্রেমজীবনের ততটুকু মাত্র গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, যে অংশ সংসার-নীতির অনুকূল। অর্থাৎ হরগৌরী লীলাবিষয়ে কালিদাসের কুমার-সম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত বিদ্যাপতির কাব্যপরিধি। কুমারসম্ভব কাব্য আরো অগ্রসর হইয়াছে (সম্ভবতঃ কোন দুঃসাহসী কালিদাসেতর কালিদাসের

দ্বারা)—বিবাহ অথচ বিহার নাই?—ভারতীয় কবির পক্ষে লেখনী সংবরণ করা অসম্ভব—কালিদাসের সাহস না থাকিলে অন্তের আছে। দেব-দম্পতিকে অষ্টম সর্গে মানবদেহের বিহ্বল বিস্মরণে ধরা দিতে হইল।

বিদ্যাপতিও কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গের কবি; কিন্তু হরপার্বতীহীন অষ্টম সর্গ—সেখানে স্থাপন করিয়াছেন ভারতীয় কাব্যকল্পনার ও ধ্যানধারণার প্রেমদেবতা ও প্রেমদেবীকে—কৃষ্ণ ও রাধাকে।

বিদ্যাপতি-কৃত শিব-লীলাত্মক পদের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আপেক্ষিকভাবে সত্য। নচেৎ বিদ্যাপতির এই জাতীয় পদগুলি কাব্যাংশে একেবারে হীন নয়। শিবকেন্দ্রিক পদে তিনি আমাদের জাতীয় মনোভাবের প্রতিভূ কবি। তিনি এখানে সত্যই জাতিহৃদয়ে অবগাহন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সর্বক্ষেত্রে এই জাতি-মনোভাবের আলোড়ন নাই। সে কাব্য অধিকতর সর্বজনীন, কেননা প্রেম সর্বজনীন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে অনাধ্যাত্মিক ভোগরূপ বিদ্যাপতি বারংবার মোচন করিয়াছেন—সে প্রেম আমাদের রসবোধকে যতই তৃপ্ত করুক—সাধারণী সংস্কার ও ধর্মচেতনাকে উদ্বেল করিতে অসমর্থ। অপরপক্ষে চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণব পদাবলী—কাব্যরূপে যেখানে ন্যূন—সেখানেও কিন্তু ভক্তি-ভাবের আশ্রয়ে সাধারণ ধর্মচেতনাকে নাড়া দিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ পদে মূলতঃ কাব্যের আস্বাদ, শিবকেন্দ্রিক পদে জাতির মর্মভাবনার স্পন্দন। বিদ্যাপতির শিব-পদ 'সর্বজনীন' নয়, কিন্তু 'জাতীয়'।

এইবার কবির শিবপদের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে। বিদ্যাপতির শিবপদ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের শিব-কাব্যের উল্লেখ করিয়াছি। মনে হইতে পারে, তাহা অহেতুক আড়ম্বর। বিদ্যাপতির কিছু শিবসঙ্গীতের বিশ্লেষণে এতখানি না করিলেও চলিত। না, সেকথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমার প্রয়োজন বিদ্যাপতির কবিস্বভাবের উন্মোচন। কবিস্বভাব তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতেই পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় না—গৌণ সৃষ্টিতেও কবির স্বভাব-মোচন থাকিতে পারে। বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস—যাহা শিবকেন্দ্রিক পদে ব্যক্ত, বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি একটি বিশেষ কারণে—আমি এই আলোচনার পরবর্তী অংশে যখন প্রেম ও

সৌন্দর্যের কবিরূপে বিদ্যাপতির বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনা করিব, তখন—তাঁহাকে ঐ কাব্যে ধর্মভাবনা-বিযুক্ত দেখাইব। সেখানে শুধুই প্রেম, শুধুই সৌন্দর্য। যদি বিদ্যাপতি সত্যই বৈষ্ণব ভাবাবেগে রাধাকৃষ্ণ-লীলামূলক পদ লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই পদগুলির লৌকিক ব্যাখ্যায় আমাদের অধিকার থাকিত না। আমি তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-পদকে ভক্তিপ্রাণতার নিদর্শন মনে করি না। আমার বিশ্বাস তাঁহার ভক্তি অন্যত্র অর্পিত ছিল, এবং কোথায় অর্পিত ছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে এতক্ষণ জানাইয়াছি। তিনি কখনো যে আধ্যাত্মিক ভাবে চালিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ-পদ লেখেন নাই, এমন নয়, এবং আমরা প্রয়োজনমত সেসব অংশের ভক্তিরূপ বর্ণনা করিব, কিন্তু আমাদের বক্তব্য, বিদ্যাপতির বিহ্বল ভক্তি শিব-শক্তির চরণেই অর্পিত ছিল, রাধাকৃষ্ণকে তিনি প্রেমকাব্যের নায়ক-নায়িকা করিতে চহিয়াছিলেন।

কিন্তু যে-কথা বলিতে শুরু করিয়াছিলাম—এই আলোচনায় কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির অত্যুত্তম সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছি এই কারণে যে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত কবি। তাঁহাদের শিবভাবনার রূপ বিদ্যাপতির শিবভাবনার রূপকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবে। তুলনাত্মক উল্লেখের দ্বারা আমাদের ঐতিহ্যের কোন্ অংশকে বিদ্যাপতি বরণ করিয়াছিলেন, তাহা বোঝা যাইবে। শিবপদে বিদ্যাপতিকে যখন ঐতিহ্যবাহী বলিয়াছি, তখন নিশ্চয় বলি নাই যে, তিনি সমগ্র ঐতিহ্যকে গ্রহণে ও প্রতি-ফলনে সমর্থ। ঐতিহ্যের একটা রূপ—গ্রাম্য রূপকেই মূলতঃ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই গ্রাম্যরূপের পরিবেশমাধুর্য কিংবা মহিমা-সঙ্কোচের রূপ কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের শিবকেন্দ্রিক রচনার সঙ্গে তুলনায় স্পষ্টতর হইতে পারে।

কালিদাসের মহনীয়তা হইতে যেখানে বিদ্যাপতি দূরবর্তী—সেখানে তিনি অভিমান করিয়া বলিতে পারেন—কালিদাসের শিবও দূরের শিব—বড় মহান কিন্তু বড় সুদূর। কালিদাসে শিব গৃহজীবনের দেবতা বটেন, আর্যা অরুন্ধতীকে দেখিয়া তাঁহার দারগ্রহণের আদর জন্মে, ভস্মীভূত কামকে তিনি পুনর্জীবিতও করেন—কিন্তু তিনি কি সত্যই ধূলা ভাঙিয়া আমাদের দরিদ্র ঘরে আসিয়া উঠিয়াছেন? কালিদাসের শিবগৃহ বড় সুন্দর শ্মশানে।

কালিদাসের নিজ যুগে প্রাচুর্যপুষ্ট জনজীবন জীবনের সৌন্দর্য দেখিতে সমর্থ ছিল কারণ গৃহজীবনে ছিল সমৃদ্ধির সন্ত্রান্ততা। তাই হিমালয়ের প্রতি-বাসিগণ শিবের বিচিত্র বিপরীত সজ্জাতেও প্রথমেই সৌন্দর্য দেখিতে পারিয়া-ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সমাজের দেহ-গেহ শুকাইয়া আসিয়াছে,—সে গৃহেও দেবতা প্রয়োজন, শিব সেই রিক্তগৃহের দেবতা হইয়াছেন,—তখন শিবের হতশ্রী চেহারা দেখিয়া (যে একই চেহারার সৌন্দর্যে কালিদাসের কাল মোহিত ছিল) । [illegible] প্রতিবেশিনীরা শিহরিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি এই মঙ্গলকাব্যের শিবের অর্চনাকারী।

হাঁ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের শিবকেই বিদ্যাপতির কাব্যে খুঁজিয়া পাইব। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী ভারতচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁহার তুলনা করা উচিত।* তাহা না করিয়া কালিদাসের কথা এতভাবে বলিতেছি কেন? বলিতেছি এইজন্য যে, ইহার দ্বারা কবিকল্পনার সর্বোচ্চ গাম্ভীর্যের রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে, যাহার পাশে রাখিয়া বিদ্যাপতির কাব্যের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে পারা যাইবে। তাছাড়া আমার আরো বিশ্বাস, কালিদাস তাঁহার ক্লাসিক গুরু-ভঙ্গির মধ্যেও শিবসম্পর্কিত সর্বাঙ্গীণ ধারণাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। আমি যে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে শিবকেন্দ্রিক কবিকল্পনার সর্বোত্তম আধার বলিয়াছি,—সে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা স্পষ্ট ও উচ্চারিত বলিয়া। এ যুগের কবি নিজের বাসনা-ঘোষণায় অনেক স্বাধীন, সে স্বাধীনতা পুরাতন কালি-দাসের ছিল না। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কাব্যের রূপগত স্বাধীনতাও পান নাই। রবীন্দ্রনাথ অক্লেশে একটির পর একটি খণ্ড কবিতায় আপন ধারণাকে—আপাত-বিপরীত ধারণাকেও—প্রকাশ করিতে পারেন। যত ধারণার বৈচিত্র্য, ততই কবির প্রশংসা। কেবল দেখিতে হয়, কোনো একটি কবিতার ক্ষেত্রে সেই কবিতার আভ্যন্তরীণ ঔচিত্য বজায় আছে কিনা। কিন্তু ক্লাসিক কালিদাসের 'ঔচিত্য' আরো ব্যাপক, দীর্ঘকাব্যে বিস্তৃত, এবং ট্রাডিশানে শাসিত। সুতরাং তিনি মুডের পরিবর্তন মাত্রে নূতন রূপ আঁকিতে বা নব-ভাবনা প্রকাশ করিতে পারেন না—কাব্যসমুদ্রে

---

*ভারতচন্দ্রের কাব্যে মঙ্গলকাব্যিক শিবভাবনার শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। এই শ্রেষ্ঠত্ব কাব্যরূপের। শিবায়নের রামকৃষ্ণ-রামেশ্বর কিংবা মঙ্গলকাব্যের মুকুন্দরাম আন্তরিকতায় ভারতচন্দ্রের নিশ্চয়ই নিম্নে নন—কিন্তু কাব্যসিদ্ধিতে ভারতচন্দ্র অগ্রসর।

দেশতরণী তাঁহাকে বাহিতে হইয়াছে। এইখানে প্রশ্ন হইবে, ঐ দেশতরণীর মধ্যে গ্রামীণ মানুষগুলির কি কোনো আশ্রয় নাই—তাহাদের কি কবি তাঁহার মহাকাল-মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিবেন না?

ইহার উত্তর, কালিদাসে সাধারণী ধারণা প্রত্যাখ্যাত নয়। ভারতবর্ষে প্রচলিত শিব-সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ধারণাকে কালিদাস তাঁহার কাব্যে পরিবেশন করিয়াছেন—কাব্য-রূপ ও রীতির ক্লাসিক 'স্থবিরত্ব' সত্ত্বেও। কিভাবে করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনার অবসর এখানে নয়—বিদ্যাপতির আলোচনায় লাগিবে আমি কেবল এরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। এই দুই দৃষ্টান্তে কালিদাস মহিমার আবরণের ভিতরেই আমাদের হৃদয়-নিকট গ্রামীণ শিবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে শিব বিবাহযাত্রা করিবেন। সপ্তমাতৃকারা বরসজ্জা এবং প্রসাধনাদি উপস্থিত করিলেন। তখন শিব, কালিদাস বলিতেছেন, মাতৃমণ্ডলীপ্রদত্ত প্রসাধনাদিকে স্পর্শ দ্বারা সম্মানিত করিয়া নিজ আভরণগুলিকেই নবশোভায় বরণীয় করিলেন। অর্থাৎ কালিদাস মঙ্গল-কবির মতই শিবকে স্ববাস-পরিহিত রাখিলেন। এমন নূতন কিছু সংযোগ করিলেন না, যাহাতে লোকধারণা বিপর্যস্ত হয়। শিবের পুরাতন পরিচিত মূর্তির প্রতি এখানে তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয়। কেবল নূতন আনিলেন—অপূর্ব ভাবের মহিমা—যে মহিমা লোককবির অনধিগম্য। বলিলেন, বিবাহ-গমনে শিব নিশ্চয় সুন্দর-প্রসাধিত; তখন ভস্ম তাঁহার অঙ্গরাগ, নরকপাল—অমল শিরোভূষণ, সুরঞ্জিত গজাজিন—ক্ষৌমবসন, লুপ্তরোষ, সুর্যান্তমিত তৃতীয় নয়ন—ললাট-তিলক। শিবের বহির্বেশকে অপরিবর্তিত রাখিয়া হৃদয়ভাবের পরিবর্তনেই কালিদাস শিবতনুতে নবশোভাসম্পাত করিতে সচেষ্ট রহিলেন। বলিলেন, শিবের অপ্রতিম প্রভাববলে দেহজড়িত বিষধর সর্প-রাজিও ফণারত্নশোভায় শিব-দেহকে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিল।

এখানেই কালিদাসের মাহাত্ম্য। লোককান্ত ঈশ্বর লোকগম্যরূপেই তাঁহার কাব্যে ত্রিলোকবন্দনীয়। আরো একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যায়—যেখানে বহিঃরূপ নয়, শিবের অন্তঃরূপের পরিচয়। ঐ অন্তঃরূপটি শিবসম্বন্ধীয় গ্রামীণ ধারণার অনুবর্তী।

কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গের শেষে উমা-তপস্যায় ধরা দিয়া শিব আসিয়াছেন।

—প্রেম-তাপসীর মূর্তিটি নিজের চোখে একবার দেখিয়া লওয়ার বাসনা। কিন্তু আসিয়াছেন স্বরূপে নয়, ছদ্মবেশে,—তাহাতে ঘটিবে অরক্ষিত অসচেতন সৌন্দর্যের দর্শন-সৌভাগ্য। স্বয়ং-আবির্ভাবে উমা-তপস্যাকে পুরস্কৃত করিবেন, এবং সহসা-আত্মপ্রকাশে উমার বিহ্বল বিস্ময়ে নিজে পুরস্কৃত হইবেন—ইহাও শিবের বাসনা। উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী তপস্যার পূর্ণ বিবরণ শুনিলেন—দেখিলেন অসামান্য প্রেমের শিখারূপিণীকে। এমন প্রেম-রূপ-প্রতিমা শিবের মত অযোগ্যকে বরণ করিবে—ছি! ব্রহ্মচারী শিবনিন্দা শুরু করিলেন। এই নিন্দাটি অপূর্ব—শিবচরিত্রের যোগ্য। উমাকে পীড়িত করিয়া তাঁহার রোষদর্শনের সুখ উপভোগ করিতে, বা উমাকণ্ঠে শিবপ্রেমের ঘোষণা শুনিবার জন্যই এই নিন্দা নয়—ইহাতে আরো কিছু আছে। এখানে সত্যই শিবের আত্মপরিচয়। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে কথাগুলি শিব ব্যাজভরে বলেন নাই—প্রত্যেকটি কথায় তিনি বিশ্বাস করেন। উমাকে শিব ভালবাসিয়াছেন ইতিমধ্যে—সে প্রেমকন্যাকে নিজ সংসারের দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে যেন বাসনা নাই। তাছাড়া এই নিন্দায় শিবের আত্মশোধনও আছে। ইতিপূর্বে আত্মসংযমের অগ্নিবর্ষণে উমাকে আঘাত করিয়াছেন—শিবের তৃতীয় নয়ন আপন অহঙ্কারে মদন ও পার্বতীকে একত্র দেখিয়াছে—অকরুণ লজ্জার মধ্যে উমাকে শিব ঠেলিয়া দিয়াছেন—অথচ শিবের সেই ধৈর্যলুপ্তিতে উমার কোন্ দোষ ছিল? উমা কি সত্যই মদন-রতি-বসন্তের মতই চিত্তবিকারের উপাদান—দেবচক্রান্তের অস্ত্রবিশেষ ছিলেন? শিব কেন কুমারী উমার প্রথম হৃদয়মোচনের মধ্যে সহজাত পবিত্র সুকোমল তপস্যাটি দেখিতে পাইলেন না?

আজ তাই ব্রহ্মচারীর বেশে শিব কেবল উমাকে গ্রহণ করিতে আসেন নাই, ক্ষমাও চাহিতে আসিয়াছেন। ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশ এই জন্য যে, স্বমূর্তিতে শিবকে দেখিলে উমা প্রেমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন—ত্রুটি স্বীকারের অবসর মিলিত না। ব্রহ্মচারীর শিব-নিন্দা—শিবের আত্মনিন্দা।

তা ছাড়াও ব্রহ্মচারীর উক্তিতে এক অসাধারণ সারল্য আছে—যাহা শিবোচিত। ঐ ভোলানাথ। ভোলানাথ সব ভুলিলেও নিজের অবস্থার রূপ ভোলেন নাই। তাহাতে অবশ্য তাঁহার দুঃখ নাই। অবস্থার জন্য লোকে নিন্দা করে করুক। আমি যা তাই। কিন্তু কেউ যেন আর এই

অনুমতিতে শিবসেবা করিতেন। ফুল তুলিয়া আসন-বেদী পরিষ্কার করিয়া, পূজা ও অভিষেকের জন্য বারি ও কুশাদি সংগ্রহ করিয়া মহাদেবের সেবা চলিত। কিন্তু সেবাকালে তাঁহার কুমারী হৃদয়ের বাসনার গোপন কথাটি কালিদাস জানান নাই। যখন জানাইয়াছেন—উমার সেই প্রথম বিকার ঘটিয়াছে অনেক পরে—তাম্ররুচি করে পদ্মবীজের মালা ধরিয়া অপরূপা কুমারীর যাত্রারূপটি চিরন্তন সৌন্দর্যাক্ষরে অমর করিবার পূর্বে নয়—যখন মদনশর মহাদেবের ধৈর্যকে পর্যন্ত লঙ্ঘনের স্পর্ধা করিয়াছিল। বিদ্যাপতির বিশ্বাস অন্য প্রকার। ত্রিলোকেশ্বরের পায়ে উমার পুষ্পাঞ্জলিকে তিনি সত্যই 'কুমারীর শিবপূজা' ভাবিয়াছেন :—

"অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন। ভবানী শম্ভু আরাধনে চলিলেন। আমি জাতি, যূথী ছিঁড়িলাম, আর বিল্বপত্র। মহাদেব ওঠ, প্রভাত হইয়াছে। যখন হর ত্রিনয়নে দেখিলেন, সেই অবসরে গৌরীকে মদন পীড়ন করিল। করতল কম্পিত হইল, কুসুম ছড়াইয়া পড়িল। শরীরে বিপুল পুলক হইল, বসন দিয়া তনু ঝাঁপিলেন। ভাল হর, ভাল গৌরী, উত্তম ব্যবহার। মদন-বিকারে জপতপ দূরে গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এই রস গান করি, হর-দর্শনে গৌরীকে মদন সন্তাপিত করিতেছে।"—(৭৮৪)

কালিদাসের সাবধানতা কবির নাই—এ নিতান্তই লোকমনের সেব্য কাব্য —কিন্তু সহজ কামনার মধুরতায় পূর্ণ।

আর একটি পদে উমাকে পূর্বরাগে তাপসী রাধার মত করিয়া দেখান হইয়াছে—অনেকটা চণ্ডীদাসীয় রাধাচিত্র। পদটিতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে মদনভস্মের পরে সংঘটিত ঘটনা বলা যাইত, কারণ এখানেও যোগীর আগমন—কিন্তু পদের বর্ণনাভঙ্গিতে মনে হয় উমা নিজ ঘরেই সখী সঙ্গে আছেন—তবে শিবভাবনায় জারিত-চিত্তে। পদ এইরূপ :—

"আজ অকস্মাৎ ভেকধারী আসিল। কুমারী আহারোপযোগী ভিক্ষা লইয়া চলিলেন। ভিক্ষা লয় না, প্রোথ বাড়ায়, মৃদু মৃদু হাসিয়া মুখ দেখে। এইখানে সখীর সঙ্গে ভালই ছিল। ঐ যোগী দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ওরে ভেকধারী, তোমার গুণপণা দূর কর, রাজকুমারীর প্রতি নজর দিলে কেন? কেহ বলে, কাহাকেও দেখিতে দিও না। কেহ বলে, ওঝা আনা চাই। কেহ বলে, এই যোগীকেই আনিয়া দাও, উঁহার অভয় পাইলে বরং ভবানী বাঁচিবে।—(৮০২)

এরপর আছে শিবের বিবাহ-যাত্রার ছবি। কেহ যেন কালিদাসের কথা এখানে ভাবিবেন না। বাংলা মঙ্গল-কাব্যের সঙ্গেই এই সব অংশ তুলনীয়। ৭৭৯ এবং ৭৮১ প্রভৃতি পদে তেমন কিছু বর্ণনা।

অতঃপর বিবাহ-বাসরে উপনীত অদ্ভুত উন্মত্ত বরকে দেখিয়া মাতা মেনকা এবং শুভার্থিনী প্রতিবেশিনীদের হতাশা ও আক্ষেপ। কন্যার দুর্দশা-ভাবনায় মাতা মেনকা মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিয়াছেন নানা পদে নানা ভাবে, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত—

"মাগো, হেমন্তগিরি এমন উন্মত্ত বর আনিয়াছে, দেখিয়া হাসি পায়। এমন উন্মত্ত বর, চড়িবার ঘোড়াও নাই, সেখানে নানা রকম ঘোড়া পাওয়া যায়। যিনি বৃষের পৃষ্ঠে বাঘছালের জিন করিয়াছেন, সর্প দিয়া তাহাকে আঁটিয়া বাঁধিয়াছেন, যিনি ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজাইতেছেন, যাঁহার অঙ্গে খটখট করিয়া শব্দ হয়, যিনি ভকর ভকর করিয়া ভাঙ গেলেন, যাঁহার গাল ছটর ছটর শব্দ করে, যাঁহার চন্দনের প্রতি অনুরাগ নাই, কপালে ভস্ম লাগান, ভূত পিশাচের অনেক দল সৃজন করিলেন।"—(৮০১)

অর্থাৎ অসৌন্দর্যের এক দীর্ঘতালিকা। এটি মামুলি কাঁদুনি হইত, যদি মেনকা কাঁদিয়া কর্তব্য শেষ করিতেন। কিন্তু জননীর বেদনা, স্থির কঠিন প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়া গতানুগতিকতা হইতে কাব্যকে কিয়দংশে উদ্ধার করিয়াছে,—

"আমি আজ এই অঙ্গনে থাকিব না, হে মা, যদি বুড়া জামাই হয়। এক শত্রু হইল বিধি-বিধাতা, দ্বিতীয় শত্রু ঝিয়ের পিতা। তৃতীয় শত্রু নারদ বামুণ—যে বুড়া জামাই আনিল। প্রথমে বাদ্য ডমরু ভাঙিব, দ্বিতীয় মুণ্ডমালা ছিঁড়িব, বলদ খেদাইয়া বরযাত্রী তাড়াইয়া দিব। ঝি লইয়া পলাইয়া যাইব। ধুতি লোটা পাঁজি পুথি এ সকল ছিনাইয়া লইব যদি নারদ বামুণ কিছু বলে, দাড়ি ধরিয়া টানিয়া দিব।—(৮৯৮)

মহান কাব্য নয়, কিন্তু ঘরের সত্য দুঃখের নিত্যকথা।

ভয়াবহ কন্যাভাগ্যের ক্রন্দনে মেনকা নিঃসঙ্গ ছিলেন না—সমভাবিনী প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া জুটিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের প্রতিবেশিনীগণ যেখানে অনুরূপ ক্ষেত্রে গঞ্জনাকে চটুল ছন্দে চঞ্চল করিয়াছেন, সেখানে আলোচ্য ক্ষেত্রে আছে আন্তরিক দুঃখ-নিবিড়তা। সুকুমারী গৌরীকে

সকলে বড় ভালবাসেন—ভয়ঙ্কর শিবের সান্নিধ্যে সেই সুকোমলাকে কল্পনা করিয়া তাঁহারা বেদনায় ক্লিষ্ট—

"সিন্দুর ও পিঠালি দিয়া মঙ্গল দ্রব্য সাজাইলাম···তুমি ছাই দ্বারা সাজিলে। হে দিগম্বর হর, তুমি ফিরিয়া যাও, আমার ঈশ্বরীর যোগ্য বর তুমি নও।···হিমগিরি-কন্যা কেমন করিয়া অগ্নি সহ্য করিবে? তোমার ললাটে নয়নানলরাশি জ্বলিতেছে, গৌরীর মুকুট ঝলসিয়া যাইবে, পট্টবাস জ্বলিয়া যাইবে। বড় সুখে শাশুড়ী যখন স্ত্রী আচার করিবেন, তখন সুরধুনীর স্রোতে ওষ্ঠ পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। সখীরা কেলি আলাপ করিবে, (তখন) সাপ ফোঁস ফোঁস করিবে।"—(১০০)

আর একটি চিত্রে আদরিণী পেলবতনু মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলের কণ্ঠ আর্দ্র :—

"গৌরী, কাহার উপর রাগ করিবে? বর হইল তপস্বী ভিখারী, হে মা, হিমগিরির উপর বাস করে, একটি ঘর নাই, আপন পরিবার (স্বজন) কেহ নাই। বালিকা কুমারী, রাজদুহিতা, ঋষির (হিমালয়ের) জীবনের আধার। সে গৌরী বিপদে পড়িলে কি করিয়া কাটাইবে? কে তাহার মুখ ধরিয়া আদর করিবে? যে ফুলেল তৈলে কেশ বানায়, আর অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করে—সেই গৌরী কেমন করিয়া ভস্মে লুণ্ঠিত হইবে—প্রতিদিন ভাঙ কুটিবে? —(১০৮)

প্রতিবেশিনীদের বেদনার পরিমাণ বোঝা যাইবে—যদি আমরা কুমার-সম্ভবের সপ্তম সর্গের উমাসজ্জার বিবরণ একবার স্মরণ করি। বিদ্যাপতি অতি সংক্ষেপে, বর্ণহীন ভাষায় পিতৃগৃহে ফুলেল তৈলে কেশার্চনা, বা অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপনের কথা মাত্র বলিয়াছেন, কেবল তাহার দ্বারা উমার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিবেশপার্থক্য বোঝা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। পার্থক্য বুঝিব শুধু যদি এক্ষেত্রে কালিদাসকে স্মরণ করি,—না, উমাসজ্জার সেই অমর সৌন্দর্যের উল্লেখ এক্ষেত্রে সত্যই বাহুল্য। কেবল দুইটি বর্ণনার স্মৃতিকে চেষ্টা করিয়াও এড়াইতে পারিতেছি না,—

"মঙ্গলস্নানের পর নির্মলকলেবরা পার্বতী যখন পতিসমীপে গমনের উপযোগী ধৌত বস্ত্রযুগল ধারণ করিলেন, তখন বর্ষাপগমে প্রফুল্ল কাশশোভিতা বসুধার ন্যায় দেখাইলেন।"

"অলঙ্কার পরিবার পর উমার অতি অনির্বচনীয় শোভা জন্মিল। উমা যেন কুসুমিতা লতা, নক্ষত্রোদ্ভাসিতা রজনী, বিহঙ্গশোভিতা তটিনী।"

আরো একটু কালিদাস-স্মরণ প্রয়োজন বিদ্যাপতির এবং বিদ্যাপতির সমভাবনাযুক্ত বাঙালী মঙ্গল-কবিদের আলোচ্য অংশের বেদনা-ভাবনা বুঝিবার জন্য। সাধারণ গৃহীর মনে উমা-মহেশ্বরের পরিণয় সম্বন্ধে চিন্তায় কালিদাসীয় চিন্তার অনুসরণ ও লঙ্ঘন দুইই আছে। বাঙালী পিতামাতা শিব-করে কন্যার্পণে সুখী নন। তাঁহারা গুপ্তযুগের হিন্দু কবির মত শিব-বিষয়ক মহনীয় কল্পনায় বঞ্চিত ছিলেন। শ্মশানবাসী বৃদ্ধ বরটি বাঙালী পিতামাতার কাছে তাঁহাদের গৌরী-কন্যার অনিবার্য দুঃখ-নিয়তি। বাস্তবজীবনে ঐ সর্বনাশের হাতে তাঁহাদের কন্যাদান করিতে হয়। এইখানে কালিদাসের অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দু-কল্পনার সঙ্গে লৌকিক ধারণার প্রভেদ। কিন্তু যখন তাঁহারা বিবাহপূর্ব গৌরীর সৌন্দর্য ও সম্পদের পরিবেষ্টনীর কথা ভাবেন, তখন কালিদাসকৃত বর্ণনাকে স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ রাজি। নিজের ঘরে সকলেই আদরের কন্যাকে সর্বাধিক সুখে রাখিতে সচেষ্ট। সেই সুখ-পরিবেশ—হয়ত অনেকাংশে কল্পনার সুখ—মণিসৌন্দর্যময় হিমালয়গৃহকে আত্মগৃহ ভাবিতে বাধা দেয় নাই। এই কারণে পরিণয়সজ্জিতা কন্যাকে দেখিয়া মাতার উদ্বেল হৃদয়ের যে রূপ কালিদাস আঁকিয়াছেন—সে মাতৃহৃদয় বিদ্যাপতির কাব্যেও পাই। আমি রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণকৃত কালিদাসের শ্লোকের ব্যাখ্যাত্মক অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—এই অংশ হইতে কন্যাজননীর আশা আকাঙ্ক্ষার অসাধারণ চিত্র মিলিবে—

"পতিপুত্রবতী রমণীদিগের দ্বারা সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য সুসম্পাদিত হওয়ার পর মাতা মেনা ধীরে ধীরে কন্যার সম্মুখে আসিলেন। আজ তাঁহার উমাশশীর বিবাহ। তাহার কপালে মাকে আজ স্বহস্তে তিলক পরাইয়া পরের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে। উমা মাতা মেনার সম্মুখে উপবিষ্ট, তাঁহার কর্ণের অবতংসরূপ অমল দন্তপত্র অমলতম কপোল-ফলকে আসিয়া ঝলিতেছে; মা মেনা তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলীর দ্বারা মনঃশিলাচূর্ণের সহিত ঈষদার্দ্র হরিতালদ্রব মিশাইয়া, একটি টিপ হইতে পারে এতটুকু তুলিয়া লইয়া, সেই সুন্দরী দুহিতার সুন্দর মুখখানি চিবুক ধরিয়া একটু উঁচু করিয়া ধরিয়াছেন ও কপালে শুভকর্মের তিলক পরাইবেন ভাবিতেছেন। হঠাৎ কিন্তু পরাইতে পারিতেছেন না; বামহস্তের অঙ্গুলীর দ্বারা সমুত্তোলিত কন্যার মুখের দিকে চাহিয়াই আছেন। সেই প্রথম

যখন কিশোরী উমার স্তন-কুট্মলের ঈষদুদ্‌গম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তদবধি মার মনে মনের মত পাত্রের হাতে উমাকে সমর্পণ করিবার যে বাসনা জাগিয়াছিল, এবং স্তনকুসুমের দিন দিন পরিবৃদ্ধির সহিত মার যে বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই অভিলাষ আজ পূর্ণ হইতেছে, উমা বিশ্ববরেণ্য বরে অর্পিত হইতেছেন, তাই মা যেন সেই পরিপূর্ণ অভিলাষেরই পূর্ণ অভিব্যক্তিরূপ এই বিবাহকালোচিত তিলক কোনমতে উমার কপালে পরাইয়া দিলেন। যত বড় যোগ্যপাত্রেই কন্যা অর্পিত হউক না কেন, পিতামাতার প্রাণ কিন্তু তখন অস্থির না হইয়া যায় না।"

মাতার মনোবাসনার রূপ যেখানে এই প্রকার, সেখানে মেনকা কিরূপ জামাতা পাইলেন? বিদ্যাপতি এবং বাঙালী মঙ্গল-কবিগণ শিব-চিত্রটি হইতে যথাসম্ভব সৌন্দর্যহরণ করিয়াছেন। জামাইকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত। বৃষভ তাঁহার বাহন, ভূতপ্রেত সঙ্গী, অঙ্গে বিভূতি এবং হস্তে ডমরু। ইহার উপর গঞ্জিকাসেবন এবং সাপের সঙ্গে হুড়াহুড়ি। স্ত্রীআচারের সময় সাপের ফোঁস-ফোঁসানি, এয়োতিদের ভীতি—এই সকল লৌকিক চিত্র বিদ্যাপতি যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। এর মধ্যে বিবাহদৃশ্য দুটিতে সৌন্দর্য আছে। একটিতে বিবাহকালে শিবের ভাবমগ্ন অবস্থা—মস্তক হইতে জটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিধি-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া শিব ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছেন (৯১১)। অন্য পদটিতে কবি সত্যই সকল ভয়ভীতি ঘুচাইয়া, মঙ্গলকাব্যের গ্রাম্য কোলাহল থামাইয়া, বিবাহস্থলীতে সৌন্দর্যসম্পাত করিতে পারিয়াছেন। সে চিত্র কালিদাসানুমোদিত। সেটি এইরূপ :—

"যখন শঙ্কর গৌরীকে হাতে ধরিয়া বিবাহমণ্ডপে আনিলেন, তখন যেন সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণ শশধর উদিত হইল। চতুর্দশ ভুবনের শোভন শিব। গৌরী রাজার কুমারী। মন্দাকিনী দেখিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন—যেন ইন্দ্র আসিলেন। হিমাচলের শরীর পুলকে পূর্ণ হইল, (কহিলেন) আমার জন্ম সফল। হরি ও ব্রহ্মা দুইজনে বসিলেন। আমি হরকে গৌরীদান করিলাম। নারদ তম্বুরায় মঙ্গলগান করিতেছেন—এবং আরো কত নারী।"—(৭৮২)

এমন প্রশান্ত মঙ্গলচিত্র যদি কবি আঁকিতে পারেন—যে চিত্রের উপর কালিদাসের বর্ণক্ষেপ সুস্পষ্ট—তখন কি আমরা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিতে পারি না—কি প্রয়োজন ছিল গ্রাম্য লঘুতায় শিবচরিত্রকে আচ্ছন্ন করায়? শৈব বিদ্যাপতি যেভাবে গ্রামস্বভাবের অনুবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে

মনে হয়—কবিচিত্তের উপর প্রতিবেশপ্রভাব কিরূপ প্রবল। সুপণ্ডিত হইয়াও বিদ্যাপতি শিবসম্পর্কিত ধারণায় লোকমনকে অগ্রাহ্য করিতে অপারগ। ইহাতে একদিকে তিনি মহিমার অবক্ষয়ের জন্য সমালোচনাভাগী হইতে পারেন, অন্যদিকে আমরা একই সঙ্গে তাঁহার ভালবাসার দেবতার সঙ্গে নৈকট্যের রূপটি দেখিয়াও মুগ্ধ হই।

(দুই) দ্বিতীয় অংশে পাগল শিবের জন্য উমার আত্মহারা [illegible] রূপই এখন আমাদের আলোচ্য। বিদ্যাপতির শিব-পদাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে।

ক্লাসিক কবি কালিদাসের মঙ্গলশুচি উন্নত মহিমার অনুসরণ সম্ভবপর নয় চতুর্দশ শতকের মৈথিলের মত অপরিণত এক ভাষার এক গীতিকবির পক্ষে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মহাকবি-প্রতিভাও কালিদাসের অনুসরণ করিতে গিয়া ভাষা ও বর্ণনার ধীর গাম্ভীর্যের পরিবর্তে যুগধর্মে কখনো সঙ্গীতোদ্বেল কখনো শিখাদীপ্তচ্ছটা। বিদ্যাপতি কালিদাসের নবরূপায়ণে সমর্থ ছিলেন না;—শিবের বিবাহযাত্রা, বিবাহদৃশ্য ইত্যাদি অংশে সে প্রমাণ পাইয়াছি।

কিন্তু বিদ্যাপতিরও একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে। সেখানে তিনি অন্য যে-কোনো কবির সমপ্রত্যয়ে কথা বলেন এবং তাঁহার কথা কাব্য হইয়া ওঠে। কালিদাস হইতে কেবল কাব্যরীতিতে নয়, ভাবরূপেও তিনি সেখানে দূরবর্তী; অথচ স্বেমহিম্নিঃ। হরগৌরী বিষয়ে এই বিদ্যাপতির ধারণা অবশ্য বিদ্যাপতির একেবারে নিজস্ব নয়,—তাহা লৌকিক গ্রাম্য,—এবং বিদ্যাপতি এখানে দেখাইয়াছেন, সর্বক্ষেত্রে না হউক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐ গ্রাম্য ধারণার দ্বারাই উৎকৃষ্ট অনুভূতির সৃষ্টি করা চলে।

আমাদের পূর্বভারতের গ্রাম্য ধারণায় শিব উন্মত্ত, শ্মশানবাসী, অনাচারী ও দরিদ্র। এই ধারণা শব্দগতভাবে হয়ত সংস্কৃত ক্লাসিক কবিদেরও ছিল। কিন্তু তাঁহারা দৈব মহিমার প্রভূত আরোপণে শিববিষয়ক ঐ সকল বিশেষণের চরিত্র বদলাইয়া দিয়াছেন। শিবের উদ্ভট ব্যবহারগুলি সেখানে বিচিত্র দেবতার অসাধারণ অলঙ্কার। পূর্বভারতের গ্রামাঞ্চলে ক্লাসিক শিব গ্রাম্য কৃষিদেবতাও বটেন। এবং বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে অল্পবয়সী গৌরীর

বিবাহকার্যের পিছনে আছে শোচনীয় সামাজিক ব্যবস্থার লোকস্মৃতি। সে ক্ষেত্রে শিব-সংসারের দুঃখবাস্তবতা আমাদের মর্মের সামগ্রী। এই অযোগ্য শিবের প্রতি প্রেমই বিদ্যাপতির আলোচ্য পদগুলির উপজীব্য। ত্রিলোকেশ্বর মহাযোগেশ্বর শিব,—যাঁহার নিকট ত্রিভুবন সম্ভ্রমে নত ;—সে শিবের জন্য পঞ্চতপের মহাগৌরব আমাদের গ্রামীণ উমার নহে,—মেয়েটির উপর অথর্ব বৃদ্ধটিকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের ঘরের গৌরীর পঞ্চতপ বিবাহোত্তর জীবনে শুরু হয়, কল্পনাতীত দারিদ্র্য ও দুর্দশার সঙ্গে সংগ্রামের সেই নিত্য তপ। তবু আত্মভোলা অঘটনবিলাসী শিবকে সুকুমারী অল্পবয়সী কন্যাটি ভালবাসিয়াছেন। এবং সেই পাগলের জন্য গৌরীর ভালবাসার অপূর্বতা বিদ্যাপতি যথার্থই ফুটাইতে পারিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার শিববিষয়ক কাব্যের সাফল্যরূপ।

শিবের রূপ-বর্ণনার প্রয়োজন নাই,—সে রূপে নতুনত্বের অভাব,—ভিখারী, উন্মত্ত, নগ্ন নীলকণ্ঠ। কবি ভাবভরে একটু বেশি জানাইয়াছেন,—শিব ভিখারী বটে কিন্তু নিজে রাজ্যদান করে। (আপনই ভিখারী ; সেবক দীয় রাজ হে—৭৯২)। এই শিব ভাবের শিব ;—বিদ্যাপতি-রচিত উমাদৃষ্ট ভাবপ্রেমমূর্তি উদ্ধৃত করিবার পূর্বে আমি যে রচনাংশটিকে এই শিব-বিষয়ে সর্বোত্তম মনে করি—তাহা উদ্ধৃত করিব। সবটুকুও উদ্ধৃত করিব না—আমি উমার অদ্ভুত স্বামীটিকে কেবল দেখিব। রচনা রবীন্দ্রনাথের, বিচিত্র প্রবন্ধের 'পাগল' প্রবন্ধ,—

"ভোলানাথ যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকলের দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমি ডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্তি এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুন্দর শান্ত ছবি!

"ভোলানাথ, আমি জানি তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাব কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ।...

"আমি জানি সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী. আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে

আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়—এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে; আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত,—আর, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।"

এই আনন্দের—ধূলার—দারিদ্র্যের—পাগলের ভালবাসায় কবি বন্দী। বিদ্যাপতির কবিতায় সে ভালবাসার রূপ বহুব্যক্ত। পাগল বর দেখিয়া সকলে দুঃখ করিতেছে, ঋষিপত্নীরা পর্যন্ত বলিতেছেন,—কন্যা কুমারী থাকাই ভাল,—এমন সুকুমারী পাত্রীর এই স্বামী!—তখন কুমারী সঙ্কোচ এড়াইয়া বলিল,—প্রেমের অসামান্য ভাষায়,—আমার চিন্তা ছাড়িয়া দাও, যেখানে যাইব সুখদুঃখ সবখানেই আছে, যাহা লেখা আছে মুছা যায় না, কিন্তু আমার চিত্ত ঈশ্বর শিবশঙ্কর নাথের চরণে লাগিয়াছে (৮৯৫)। কালিদাস ইহাকেই বলিয়াছেন ভাবৈকরসচিত্ত, ইহারই আবেশে ব্রহ্মচারীকৃত শিবনিন্দাকে অবহেলার গরিমায় কুমারী উমা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন।

দিগ্‌বসন, লজ্জাহীন, মৃত্যুভয়ঙ্করকে দেখিয়া গৌরীর মুখে 'আঁখি ছলছল'। তারই পরপর চিত্র,—

"বিকট জটা, বক্ষে অজগর, দিগ্‌বসন, লোকলজ্জা নাই। ওঁ মা, কোন্ পথে আসিতে আমার পাগলের দেখা পাওয়া যাইবে?"—(৫৯৫)

"আমার পাগলকে কেহ কোথাও যাইতে দেখিয়াছ? সে বৃষভে চড়ে, বিষ ও ভাঙ খায়, তাহার চোখ নিশ্চল, মুখে লালা চুয়াইতেছে। পাগল বিশ্বম্ভর পথে। কেহ হয়ত তাহাকে পথে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ঐ বাতুল আমা বিনা একাকী।"—(৫৯৮)

"আমার দিগম্বর কোথায় গেলেন? শিব কোথায় গেলেন? কি হইল? ...যে আমার উপনার উদ্দেশ দিবে, তাহাকে হাতের কঙ্কণ দিব।"—(৭৮৬)

"উন্মত্ত যতিকে কি উপায়ে মানাইব? অন্যদিন আমার পতি ভাল ছিল। - আজ কে তাঁহার উন্মত্ততা বাড়াইয়া দিল?...কোথায়ও ঠোকর লাগিয়া পড়িলে কী না বিপদ হইবে?—(৭৮৭)

আমার পাগল! আমি ছাড়া তাহার কেহ নাই।—জগজ্জননী স্বামীর মধ্যে স্নেহ করিবার, ঢাকিয়া রাখিবার একটি সন্তান পাইয়াছেন বটে! অসহায় অযোগ্যের জন্য মাতার পথে পথে বিচরণ, সন্ধান, ক্রন্দন, আমাদের মমতার অশ্রু টানিয়া আনে,—রূপের গভীরে অপরূপ প্রেমের আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া যাই। যৌবন-লাবণ্যের স্বপ্ন ছিঁড়িয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটি বৃদ্ধ বনস্পতিকে জড়াইয়া তাহাকে ঝঞ্চাঝাপট হইতে রক্ষা করিতে চাহিতেছে—বিদ্যাপতির মত মদনমুগ্ধ কবি যে এই প্রেমকে দেখিতে পারিয়াছেন ইহাই বিস্ময়কর। দেহসেবী কবির অধ্যাত্মপ্রেমসেবার এই চরম দৃষ্টান্ত।

উমার প্রেমের একদিকে আছে মাতার করুণা, অন্যদিকে বনিতার গৌরব। স্বামী কাহারো তুলনায় ন্যূন নহে। তাহারই বর্ণনা,—

"আমার ভোলা নির্ধন; আপনি ভিখারী, কিন্তু অন্ন দান করেন না। কৌপীন পরিলেও হরকে ঈশ্বর বলে।..... সকলে বলে হর জগতের কিষাণ।"—(৭৮৮)

কিন্তু মুখের গৌরবে কি হয়—ভিখারী ঈশ্বরে কাহারো আস্থা নাই। স্বামীর অপমানে অভিমানিনী নারী জাগিয়া ওঠে। বেদনার জ্বালায় সে যাহা বলে, সেই মুখের কথাই তাহার অন্তরের কথা নয়,—

"শিব, আমি বারবার তোমাকে বলি, মন দিয়া কৃষিকার্য কর। লজ্জারহিত হইয়া তুমি ভিক্ষা কর, তাহাতে গুণগৌরব দূরে যায়। নির্ধন বলিয়া লোকে উপহাস করে, আদর অনুকম্পা করে না। তুমি শিব, অর্ক ও ধুতুরা ফুল পাইলে, হরি চাঁপা ফুল পাইল। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বানাও, ত্রিশূল ভাঙিয়া, ফাল তৈয়ারী কর। হে হর, ধুরন্ধর বৃষকে লইয়া তাহাতে জুড়িয়া দাও। গঙ্গার ধারায় ক্ষেতের পাট কর।"—(৭৯১)

পদটিতে কত বিচিত্র মনোভাবের মিশ্রণ। প্রথমেই চোখে পড়ে কৃষক-জায়ার সচ্ছল সংসারের কামনা,—অলস স্বামীকে উত্তেজিত করিয়া কৃষি-কার্যে লাগাইবার প্রয়াস। শিব যে কৃষি দেবতা, এখানে তাহার প্রমাণ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উমার ভাগিদের মধ্যে কেবল

সম্পদাকাঙ্‌ক্ষা নাই,—বড় অভিমানেই উমা কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রতিবেশী-দের গঞ্জনা আর সহ্য হয় না। বহুশ্রুত গঞ্জনাগুলি স্বামীর দিকে ফিরাইয়া দিয়া জ্বালা জুড়াইতে চাহিয়াছেন। এমন কি শিবের নিতান্ত প্রিয় অস্ত্রকে ও বাহনকে পর্যন্ত তুচ্ছ উৎপাদনযন্ত্রে লাগাইতে উমার অনুরোধ—ত্রিশূল ভাঙিয়া ফাল কর, বৃষকে হালে জুড়িয়া দাও। পদটিকে সাধারণ সংসারচিত্র বলিতে পারিতাম,—কিন্তু একটি ঈর্ষার ব্যঞ্জনা ও আহত স্বামীপ্রেম পদে রসবর্ষণ করিয়াছে। উমা বলিতেছেন,—'তোমার বরাতে অর্ক ও ধুতুরা জুটিল,—হরি পাইলেন চাঁপা ফুল।' জগন্মাতা এখানে মানিনী গৃহিণী।

(তিন) শিবমূলক পদের শেষভাগে আছে হরগৌরীর সংসারদৃশ্য।

সংসারচিত্রে নূতন কিছু পাইব না,—আমাদের দরিদ্র গৃহস্থালীর রূপ, কৃষক-পরিবারের পরিচিত চিত্র, অভাব অনটনের অবাধ বিস্তার, শিবের ভিক্ষা, গৌরীর শূন্য ভাণ্ডারের বেদনা, অভাব লইয়া স্বামী-স্ত্রীর কলহ,—এই নিত্যদৃশ্য। ইহার মধ্যে লক্ষণীয়—এত দুঃখেও হাসিটি একেবারে মরে নাই। চূড়াচন্দ্র অন্ধকারেও জ্বলে—অন্ধকারেই জ্বলে। বিদ্যাপতি দুঃখ-তিমিরের মধ্যে সংগ্রামী হাসির চেহারা ফুটাইয়াছেন বলিয়া আমরা কবির কাছে কৃতজ্ঞ।

একটি পদে গণেশ ভিক্ষা করিবে কিনা, এই লইয়া স্বামীস্ত্রীর বিতর্ক। 'পেট-মোটা বাছাটিকে' বাছার মা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট। ছেলের বাবারা যে নিষ্ঠুর, সকল মায়ের মতই পার্বতীও জানাইয়াছেন—(১৩)। এই সঙ্গে আছে শিবের গৃহাঙ্গনের ছবি—সেখানে বাঘ-সিংহের হুড়াহুড়ি, ময়ূর, ইঁদুরের ছুটাছুটি (৯০৯)। মেয়ের স্বামী-ঘরের অবস্থা দেখিয়া মেনকার বেদনা—জামাই পরের কাছে ভাল, সব ঢালিয়া দেয়, অথচ নিজের ছেলেদের জন্য কিছু করে না (৯০৫)। এবং কার্তিকের বিবাহ লইয়া হর পার্বতীর মধ্যে কলহ। বাস্তবিক, ছেলে বড় হইয়াছে, অথচ তাহাকে পাত্রীস্থ করিতে পিতার খেয়াল নাই—ভারতীয় ঘরের চিরন্তন কোন্দল। শেষ পর্যন্ত কার্তিক হতাশ হইয়া বলিল—বিবাহে আমার কাজ নাই।—(৭৯৫)

খণ্ড খণ্ড সংসারচিত্রগুলিতে কাব্যরস আছে। সুখদুঃখের মালাগাঁথা

জীবন। সুখদুঃখের অতীত যাঁহারা, তাঁহারাও সংসার-[illegible] গলায় পরিয়াছেন, একথা ভাবিতেও সুখ। দেবতাকে কত কাছে আনা যায়, তাঁহাদের ঐশ্বর্য ঘুচাইয়া আমাদের আনন্দবেদনার সাথী করিয়া লওয়া যায়, ভারতবর্ষের মানুষ তাহা প্রমাণ করিয়াছে। দেবমহিমাবিরোধী, ভালবাসা-লুণ্ঠক সেই ভারতবাসী-মানুষের অন্যতম প্রতিনিধি-কবি বিদ্যাপতি।

কিন্তু দুঃখের চেয়ে হাসিতে আমরা আরো সহজে নিকট হই,—সেই সহাস্য হৃদয়-সন্নিহিতি সর্বশেষে বিদ্যাপতির পদ হইতে দেখাইয়া দেওয়া যায়। যেমন সংসারে শিবের জ্বালার ছবি,—

"ইঁদুর আমার ঝুলি কাটিয়া দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ঝুলি কাটিয়া ইঁদুর জটা কাটিয়া খায়। মাথায় বসিয়া গঙ্গার জল পান করে। বেটা কার্তিক এক ময়ূর পুষিয়াছে। সেটা দেখিয়া আমার সাপ ভয়ে কাঁদে। গৌরি, তুমি যে বড় মোটা এক সিংহ পুষিয়াছ, তাহাকে দেখিয়া আমার বৃষ ভয় পায়।"—(১৭৩)

সংসারে সুখ নাই। সকলেই শিবকে জ্বালাইতেছে। বিশেষভাবে স্ত্রীপুত্রের বাহনগুলি—সিংহ, ময়ূর। তাই বলিয়া ইঁদুরটিও? বুড়ার দুঃখে হাসিব না কাঁদিব?

বৃদ্ধ কিন্তু কাঁদিতে বড় চান না—রঙ্গরসে খুব আসক্তি, ছেলেমানুষি প্রচুর। এই বয়সেও ষাঁড়ের দৌড় করাইতে উৎসাহ। গৌরী ভাবিয়া মরেন। ভালমন্দ হইতে কতক্ষণ!—

"হে শিব, বৃদ্ধ বয়সেও স্বভাব ছাড়িলে না; বৃষকে দৌড় করাইয়া কি ফল? শিব, ভাগ্যে আঘাত লাগে নাই। কে জানে আজ কি হইত! বৃষ পলায়ন করিল, কে জানে কোথায় গেল? হাড়মালা কি হইল! ডমরু ভাঙিয়া গেল; ভস্ম ছড়াইয়া পড়িল, অপথে সম্পত্তি দূর হইল। হর, তোমার হঠ ব্যবহার, আমার বারণ মান না। সকল জগতের নিকট শুনি ঘরণীর কথা কেহ ঠেলে না।"

কত কষ্টে যে সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখিতে হয়!

সংসারের রহস্য এই, যে যাহা নিন্দা করে, সে তাহাকেই আবার ফিরিয়া চায়। ষাঁড় নাচাইলে শিবের দোষ,—অথচ গৌরী স্বয়ং শিবকে নাচাইতে চান। দেবীর রঙ্গপিপাসা জাগিল, শিবের নাচ দেখিবেন।

ভোলানাথের অন্ত সবে ভুল—পত্নীর নিকট সেয়ানা। প্রস্তাব এড়াইতে রীতিমত চালাকি শুরু করেন। গৃহিণীর নিকট নাচিতে লজ্জা নাকি? যা হউক কবি গৌরীর রসমধুর ইচ্ছা এবং মহাদেবের সরস কৌশলটি মনোরম করিয়া বলিয়াছেন,—

"গৌরী।—হে নাথ, আজ এক ব্রতে মহাসুখ লাগিবে। তুমি শিব নটবেশ ধর, ডমরু বাজাও।

শিব।—গৌরি, তুমি নাচিতে বলিতেছ, আমি কেমন করিয়া নাচিব? আমার চারিটি জিনিসের চিন্তা আছে, তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিবে? অমৃত চুয়াইয়া ভূমিতে ঝরিয়া পড়িবে, বাঘাম্বর (অমৃত পাইয়া) জাগিয়া উঠিবে। বাঘাম্বর বাঘ হইবে, বৃষকে খাইয়া ফেলিবে। শির হইতে সাপ সরসর করিয়া দশদিকে যাইবে—কার্তিক ময়ূর পুষিয়াছে, সে ধরিয়া (সাপ) খাইবে। জটা হইতে উছলিয়া গঙ্গা ভূমির উপর ছড়াইয়া পড়িবে। সহস্রমুখ ধারা হইবে, তাহাকে সামলান যাইবে না। মুণ্ডমালা ছিঁড়িয়া পড়িবে এবং শ্মশান জাগিবে। গৌরি তুমি পলাইয়া যাইবে—নাচ দেখিবে কে?"—(৭৯৬)

বাস্তবিক। এক নাচে এত কাণ্ড গৌরী কি কখনো জানিতেন? জানিলে কদাপি নাচিতে বলেন? শিবের চপল কৌতুক ও আনন্দজনক চালাকিতে দুঃখের সংসারের মাধুর্য অসামান্যভাবে ফুটিয়া উঠিল।

বিদ্যাপতির শিব-কাহিনী শেষ করিলাম। এই আলোচনায় আমি বিস্তৃত স্থান লইয়াছি। প্রত্যেকটি বক্তব্য প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে হইয়াছে, কারণ বিদ্যাপতির কবি-কাহিনীতে এই অংশটি এখনো পর্যন্ত অনালোচিত—কার্যতঃ অবহেলিত। বিদ্যাপতির ধর্মবোধ অনুধাবনের পক্ষে, আমার বিশ্বাস, শিব-লীলাত্মক পদের পূর্ণ অনুশীলন অপরিহার্য। সে কারণে, এবং শিবপদের মধ্যে কাব্যরস, বিশেষতঃ আমাদের গৃহজীবনরস যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশিত আছে বলিয়া, বিদ্যাপতির পদাবলীর এই নাতি-বিস্তারিত অথচ মনোযোগযোগ্য অংশটির আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। বিদ্যাপতির ধর্ম-সংস্কারের রূপ-প্রকাশক এই অংশের আলোচনার পরে আমরা তাঁহার কবিপরিচয়ের দিকে অগ্রসর হইব। বিদ্যাপতি যথার্থ

কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক এবং সাধারণ প্রেমমূলক পদে। শিবপদে তাঁহার মিশ্র পরিচয়। তাঁহাকে যখন আমি মধ্যযুগের কবি-সার্বভৌম বলি, সে প্রেমকাব্যের উপর নির্ভর করিয়াই। কিন্তু শিব-পদের কবিরূপেও তিনি নগণ্য-পরিচয় নহেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে শিবকেন্দ্রিক ধর্মচেতনার এমন আশ্রয় যখন। শিবমূলক পদে বিদ্যাপতির শক্তিস্ফুরণ হইয়াছে সংসার-চিত্রাঙ্কনে বা মহিমাস্তোত্র রচনায় নয়,—শিবের প্রতি ভালবাসার অপূর্ব উৎসারণে। প্রেমের কবি বিদ্যাপতির সেইখানেই জয়। প্রেম দেহজীবী—বিদ্যাপতি সে প্রেমের প্রধান কবি। ঐ প্রেম যখন দেহ-লক্ষ্মী, আত্মাবসিত, বিদ্যাপতি সেখানেও অধিকারী। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমপর্যায়ে বিদ্যাপতির এই দুই কবিপরিচয় পাইব। বিদ্যাপতি কিন্তু আরো একটি প্রেম দেখিয়াছেন—যে প্রেম শ্মশানবাসী, ধূলিগৌরী এবং মরণপ্রেয়সী। আবার রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন,—আরো উচ্চাঙ্গ রসরূপে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির প্রেমকেই প্রকাশ করিয়াছেন—এই প্রসঙ্গে ইহাই শেষ বক্তব্য—

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌ববম্‌ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান।
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ

তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর,
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥
('মরণ'—উৎসর্গ)

প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি

প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য এবং বিদ্যাপতির আদর্শ কবিগণ

প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কথাগুলি নিন্দার না প্রশংসার, যদি ঐ প্রেম হয় লৌকিক এবং সৌন্দর্য পার্থিব? লৌকিক প্রেম ও পার্থিব সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো কবির পক্ষেই অগৌরবের অধিকার নয়, বিদ্যাপতির পক্ষেও নয়। আমাদের কোনো গতানুগতিক ভ্রান্ত ধারণার দায়িত্ব কবিকে কেন বহন করিতে হইবে? মর্ত্য-প্রেম ও মর্ত্য-সৌন্দর্যের রূপকার রূপেই বিদ্যাপতির মর্যাদা। কখনো কখনো অবশ্য আকাশের আলো আসিয়া মর্ত্য-দেহের শিরচুম্বন করিয়াছে, কখনো বা দেহের রক্তমাংসের ভিতরে অপরিজ্ঞাত চেতনা নূতন জাগরণে শিহরিয়া উঠিয়াছেন, তখন নয়নবিন্দু স্তনচূড়ায় পড়িয়া জলিতে জলিতে শিব-শিরের চন্দ্রকান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—তখন বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু সে জীবনের বিরল ক্ষণেই বটে। তার পূর্বে বিদ্যাপতি দেহবাদী।

ভারতবর্ষে বিদ্যাপতি কোনো বিস্ময় নন। প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতার স্বাভাবিক সার্থক এক পরিণতি তাঁহার মধ্যে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রেমকাব্যের ঐতিহ্যের মহৎ উত্তরাধিকারী তিনি। রূপধারণায় এবং ভাব-পরিবেশনে তিনি অমৌলিক। তিনি প্রশস্ত কবিপথগামী। তিনি পুরাতন। সেই তাঁহার নিরাপদ বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির উত্তরাধিকার।

বিদ্যাপতিকে ভারতবর্ষের কাব্যধারার মধ্যেই স্থাপন করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় প্রেম-কবিতাধারার আধুনিকপূর্ব যুগের তিনি শেষ শ্রেষ্ঠ কবি।

বিদ্যাপতির পরস্ব গ্রহণ এবং নিজস্ব পরিবেশন আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত এবং হইবেও, কিন্তু তার পূর্বে বিদ্যাপতিকে,—বৈষ্ণব পদাবলীতে মহাজন কবিরূপে যাঁহার পরিচয়,—তাঁহাকে লৌকিক প্রেমের কবি কেন বলিতে চাই, তাহা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

কিন্তু সে প্রয়োজন কি ইতিপূর্বেই আমি মিটাই নাই? বিদ্যাপতির শিব-পদ বাদ দিয়া অন্যান্য যেসব মৈথিল পদ থাকে,—পূর্বেই [illegible],—

তার সবগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক নয়। এমন কি এক-তৃতীয়াংশে রাধাকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে, সেখানেও বহুক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ বলিতে যা বুঝি, তাহা নাই। রাধাকৃষ্ণ সেখানে লৌকিক নায়ক-নায়িকার নামান্তর মাত্র। এরূপ করিয়া বিদ্যাপতি নূতন কিছু করেন নাই; রাধাকৃষ্ণ-অবলম্বনে শৃঙ্গারকাব্য রচনার পদ্ধতি পুরাতন। তৃতীয়তঃ এবং যাহা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যুক্তি,—বিদ্যাপতির রচনায় রাধাকৃষ্ণ যেখানে অধ্যাত্মচরিত্র, সেখানেও অপার্থিব চরিত্র নন, মানবজীবনের উন্নত ও গভীর রূপের ভিতর হইতে- সেই রাধাকৃষ্ণের উদয় হইয়াছে। সেখানে মর্ত্যচরিত্রের প্রদীপ্ত উন্নয়ন।

বিদ্যাপতির 'বিশুদ্ধ' অধ্যাত্মভাবপূর্ণ কাব্য এত অল্প—নাই বলিলেও হয়—যে তার দ্বারা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক কবি প্রমাণ করা যায় না—আমরা যে-অর্থে বিদ্যাপতিকে আধ্যাত্মিক বলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আলোচনাকালে আমরা আবার ভোগলগ্নেই প্রেমের সুমহৎ রূপকেও দেখিয়া লইব। অন্য লৌকিক শৃঙ্গার-কবি হইতে এইখানে বিদ্যাপতির স্বাতন্ত্র্য।

সুতরাং দেখা যায়, একদিকে বিদ্যাপতি ভারতবর্ষের শৃঙ্গাররসমূলক কাব্যধারাকেই আত্মসাৎ করিয়াছেন, অন্যদিকে, ঐ ধারার মধ্যে এমন নূতন কিছু সংযোগ করিয়াছেন, যাহা সাধারণ কামকাব্যের পরিধি-বহির্ভূত ছিল। বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যে প্রেমের দেহ-মন-আত্মার ত্রিবিধ মহিমাই পাই। কিন্তু তিনি মূলতঃ দেহধর্মী কবি।

কয়েক ছত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র কবিতা লেখার রীতি ভারতবর্ষে অতি পুরাতন। এই রীতি যেমন সংস্কৃতের তেমনি প্রাকৃতের, বরং প্রকৃতেরই বেশি। ক্ষুদ্র কবিতাগুলির সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল প্রেম,—ছলাকলায় পরিপাটি প্রাণচঞ্চল প্রেম। লোকজীবনের ছন্দের গাঁথা সেই প্রেম। লোক-ব্যবহারের ভাষা হইতেছে প্রাকৃত। সুতরং চপল চটুল প্রেমের ছন্দটির প্রকাশের বাহন সহজেই হইয়াছে প্রাকৃত ভাষা। প্রেমকবিতার ব্যাপারে প্রাকৃত ভাষার সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হালের গাথা সপ্তশতী। ইন্দ্রিয়াত্মক প্রেমের প্রেরণা-উৎসরূপে হালের সাতশত শ্লোক-সংগ্রহের মূল্য সর্বত্র স্বীকৃত। এই গাথা সপ্তশতীর ধারাতেই পরবর্তীকালে অজস্র অনুরূপ শ্লোকনিবদ্ধ গীতিখণ্ড রচিত হইয়াছে—তার মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত সংস্কৃত অমরুশতক।

বিদ্যাপতির উপর হাল এবং অমরুর প্রভাব অত্যধিক।

হাল এবং অমরুর প্রভাবের কথা বলিয়া শেষ করিয়া দেওয়া উচিত নয়; ভারতবর্ষে উভয় কাব্যের আদর্শে এবং হয়ত আমাদের অজ্ঞাত অন্য কোনো খণ্ড শ্লোকাত্মক কাব্যের অনুসরণে অজস্র কবিতাগ্রন্থ রচিত, সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ সহজেই শৃঙ্গারশতক, চোরপঞ্চাশৎ, আর্যাসপ্তশতী, কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতির নাম করিয়া থাকেন।

এক কথায়, স্বল্পাক্ষরে প্রেমের রাগরঙ্গলীলা ব্যক্ত করার বাসনা ও সাধনা এদেশে পুরাতন। দীর্ঘায়ত সংস্কৃত কাব্যের ক্ষেত্রেও—সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক-নির্ভরতার জন্য—খণ্ড চিত্র প্রাধান্য পায়। সংস্কৃতে এক একটি শ্লোকে তাৎকালিক এক একটি ভাব বা রূপ-কে আবদ্ধ করিতে হয়। একটি শ্লোকের সেই স্থানীয় আবর্তসম্পূর্ণতা অন্য শ্লোকাবলীর সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গতির সৃষ্টি করিলেও ইতিমধ্যেই নিজ রূপকে পূর্ণব্যক্ত করিয়াছে নিজ আকারে। সেখানেও তাই খণ্ড কবিতার প্রাণধর্ম উপস্থিত আছে।

পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা এখন স্থগিত থাকিতে পারে। সেখানে সমগ্রতঃ একটি বৃহৎ বক্তব্য আছে—আছে জীবনের বিস্তৃততর উপস্থাপনা। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সেই জাতীয় কবিতাকেই লক্ষ্য করিব, যেখানে প্রেমের একটি বিশিষ্ট ভাবাবস্থা খণ্ডাকারে পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছে। সেরূপ বস্তু হাল-অমরুর এবং উক্ত ধারাবর্তী কবিগণের রচনাবলীতে যথেষ্ট মিলিবে।

বস্তুতঃ প্রেমের অসংখ্য ভিন্ন রূপের রচনায় এদেশীয় কবিগণের প্রতিভার বিশেষ বিকাশ। প্রেমের হাসি, উচ্ছ্বাস ও উল্লাস, চপলতা, কোপনতা ও গোপনতা, অভিমান ও অপমান, কৌতুক ও কুটিলতা, প্রশ্রয় ও প্রত্যাখ্যান, লাস্য, লাম্পট্য ও লালিত্য, ক্ষণবিদ্বেষ এবং তীব্র আশ্লেষ, আমন্ত্রণ, আরাধন ও রোধন, ত্যাগ, তপস্যা, তন্ময়তা ক্ষুধা, লোভ, তৃষ্ণা, নতি, অবনতি, উর্ধ্বোন্নতি,—এক কথায় সজীব জীবনের দাহ ও দীপ্তি। এক প্রদীপ যে এত অজস্রভাবে জ্বলিতে সমর্থ—সংস্কৃত-প্রাকৃতের এ জাতীয় কবিতা না থাকিলে কে বিশ্বাস করিত? ভারতীয় প্রতিভার এই আশ্চর্য বিশ্লেষণী সূক্ষ্মতা। একদিকে ধর্মে সে অদ্বৈতবাদী, আবার তাহার দেবতার সংখ্যা

তেত্রিশ কোটির একটিও কম নয়। প্রেমে সে নৈষ্ঠিক আদর্শবাদী কিন্তু তাহার ধর্মীয় প্রেমকাব্যে কাল্পনিক, তাত্ত্বিক ও বাস্তব নায়ক-নায়িকার হাব-ভাব-হেলায় কামশাস্ত্রীয় অজস্র অগণ্য প্রকাশ।

হাল-অমরুর পদচিহ্ন ধ্যান করিয়াই বিদ্যাপতি-পদাবলীর আবির্ভাব।

বিদ্যাপতির ধ্যেয় কবি, কাব্য ও শাস্ত্র আরও আছে। যেমন ধরা যাক কবিরূপে কালিদাস ও জয়দেব। ধর্মকাব্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত। এবং বাৎস্যায়নাদি নানা কোকশাস্ত্র। বিদ্যাপতির কবিতাকে মৌলিক বলিতে তাই আশঙ্কা হয়। যে কোনো মুহূর্তে অনুরূপ একটি পূর্বরচনা আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু একটি গৌরব তিনি পাইবেন—সংশ্লেষণী প্রতিভার। অসামান্য সংগ্রহনৈপুণ্যে ভারতীয় প্রেমকবিতার পূর্ণ বক্তব্য তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। সেখানেই তাঁহার মহিমার ভিত্তি। সেখানেই তিনি প্রেমের প্রতিনিধি-কবি। আদর্শবাদী ও ভোগরাগময়, উভয়শ্রেণীর প্রেমকেই তিনি আঁকিয়াছেন। তাঁহার পদে একদিকে আছে উমা-মহেশ্বরের ত্যাগদীপ্ত প্রেম, অভিসারিণী—বিহরিণী—প্রেমদ্বৈতভাবিনী রাধার আধ্যাত্মিক প্রেম,—আদর্শবাদী প্রেমের চরমরূপ যে দুই স্থানে মিলিতেছে, অন্যদিকে রহিয়াছে লৌকিক নায়ক-নায়িকার ও শৃঙ্গার-দেবতা রাধাকৃষ্ণের চপল, চটুল, বিদগ্ধ ও বিচিত্র প্রেম-মণিকার বর্ণোচ্ছলতা। ইহাই ভোগরাগময় প্রেম। দুই ধরনের প্রেমরূপই বিদ্যাপতির রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রেমের কবিরূপে বিদ্যাপতির সেই পূর্ণাঙ্গিক পরিচয়দান আমাদের প্রবন্ধের উপজীব্য।

কেবল বক্তব্যে নয়, রীতিতেও বিদ্যাপতি ভারতীয় প্রেমকাব্যধারার অনুসারক। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি খণ্ড কবিতার—অর্থাৎ শ্লোকসম্পূর্ণ গীতি-কবিতা-ধারার অনুসারক, সেকথা না বলিলেও চলে। বিদ্যাপতির অলঙ্কার-নির্ভর বর্ণনারীতিও ভারতবর্ষীয়। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবির মত বিদ্যাপতিরও আত্মপ্রকাশের সাধারণ ভাষা—অলঙ্কার। আমরা চমৎকৃত হইয়া লক্ষ্য করিব, অলঙ্কার-সাধনায় বিদ্যাপতি আলঙ্কারিক ভারতবর্ষেও শ্রেষ্ঠ কবিদের সম-পংক্তিভুক্ত। পরবর্তীকালে বিদ্যাপতির অলঙ্কার আমাদের বিশেষ আলোচনার বস্তু হইবে। বর্তমানে আমরা কবির ভাব-বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই।

কামশাস্ত্র, শৃঙ্গারশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও শাস্ত্রধর কবিগণের নিকট

বিদ্যাপতির বিপুল ঋণ। আমি আরো দুইজন উত্তমর্ণ কবির নাম করিয়াছি—কালিদাস ও জয়দেব। কালিদাসের নিকট পরবর্তী ভারতীয় কবিরা কোনো না কোনো উপায়ে ঋণী। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ—[illegible] প্রভাব এড়াইবার উপায় নাই। শিবপদের আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাসের কথা কিছু বলিয়াছি। পরবর্তী অংশে অলঙ্কারের আলোচনায় কালিদাসপ্রসঙ্গ আসিবে। রাগরক্ত কিংবা সাধনশুভ্র, উভয়বিধ প্রেমের ধারণার পশ্চাতে কালিদাসীয় চেতনা কোথাও না কোথাও থাকিয়া যায়, প্রকৃতিভাবনাতেও কালিদাস আসিয়া যান। সুতরাং কালিদাস সংস্কৃতভাবাশ্রিত পরবর্তী কবি-গণের কাছে অনতিক্রম্য পরিমণ্ডল। কালিদাস সাধারণ ঐতিহ্যে পরিণত, প্রাকৃতিক সৃষ্টির মতই অসঙ্কোচে ব্যবহার্য। বিদ্যাপতির উপরও কালিদাসের প্রভাব আছে—রীতিমত প্রভাবই আছে—তথাপি কালিদাস, বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ কবিদেবতা নন। হাল-অমরু-শৃঙ্গারশতকের নিকট বিদ্যাপতির নিকটতর অবস্থান।

জয়দেব কিন্তু বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ কবিদেবতার মধ্যে পড়েন। রসিক-জনের নিকট বিদ্যাপতির জয়দেব-সাধনা 'অভিনব জয়দেব' উপাধিতেই স্বীকৃত। কালিদাস যেমন সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের সাধারণ ঐশ্বর্য, হাল-অমরু যেমন লৌকিক প্রেমকবিতার নিত্য আদর্শ, জয়দেব তেমনি রাধাকৃষ্ণ-গীতিকার প্রধান উৎস। রাধাকৃষ্ণকে লইয়া খণ্ড কবিতা লেখার পদ্ধতি যত পুরাতনই হোক, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর জয়দেবই প্রথম পূর্ণ কাব্য লিখিলেন। সে কাব্যের ধ্বনি ও বর্ণমহিমা এমনই যে, ভারতের পূর্বপ্রান্তবাসী এই কবিকে শেষ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবির অবিসংবাদিত মহিমা দান করা হইল। তাঁহার কাব্যের বহুল অনুকরণ, পরবর্তীকালে জয়দেবীয় শব্দের পুনঃ-ব্যবহার, জয়দেবীয় সঙ্গীতের অনুসাধনা, জয়দেবের প্রভাবকে প্রমাণিত করিতেছে। মৈথিল-বাংলা-ব্রজবুলির সমগ্র পদকাব্য জয়দেবকে রসগঙ্গাধর কবিরূপে গ্রহণ করিয়াছে; জগন্নাথ মন্দিরে তাঁহারই গান শুনিয়া জগতের নাথ আরতি-নন্দিত হইয়াছেন। অতএব জয়দেব অসামান্য, 'কোমলকলাবতী যুবতীর ন্যায়' তাঁহার গান ভক্তজনের হৃদয়ে নিত্য অধিষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতি তেমন একজন ভক্ত—ভক্তকবি। 'অভিনব জয়দেব'—জয়দেব

হইতে প্রচুর লইয়াছেন। জয়দেবীয় রূপরীতি ও বক্তব্য বিদ্যাপতিতে বহুস্থলে অনুসৃত। সে ঋণ প্রমাণের প্রয়োজন নাই, এত স্পষ্ট। জয়দেবের শব্দগ্রহণ ও সঙ্গীতানুসরণেও বিদ্যাপতি অকুণ্ঠ। কুণ্ঠা রাখিয়াই বা লাভ কি, যেখানে জয়দেব সংস্কৃতের মত শব্দসিদ্ধ সাহিত্যেও শব্দাবতার কবি।

জয়দেবের প্রতিভামূলে বিদ্যাপতির কিন্তু ঐ শেষ অর্পণ—শব্দরূপ ও শব্দসঙ্গীতের ঋণের জন্য প্রণাম। ইহার অধিক নয়। বড় জোর রাধা-কৃষ্ণের জয়দেবীয় দেহোত্তাপের কিছু উত্তেজনাগ্রহণ। ঐ পর্যন্তই, নচেৎ জয়দেবের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অলঙ্কার-সৌন্দর্যের প্রাচুর্য নাই। বিদ্যাপতি যদি কিছু গ্রহণও করেন, তথাপি আলঙ্কারিক কবিরূপে তিনি জয়দেবের অনেক উচ্চে। জয়দেব দেহেই সমাপ্ত; দেহমুখী বিদ্যাপতি কিন্তু প্রেমমনস্তত্ত্বের কবিও বটেন। প্রেমের অসংখ্য সূক্ষ্ম মানসভঙ্গি বিদ্যাপতির পদে বহুরেখায় ব্যক্ত; জয়দেব সেখানে কয়েকটি গতানুগতিক মনোরূপের স্থূল অনুবর্তক। এবং সর্বোপরি, বিদ্যাপতি মন ছাড়িয়া আত্মায় স্নান করিয়াছেন,—তাঁহার প্রেমকাব্যে গভীর সমুদ্রের মৌন এবং অগ্নিশিখার ঊর্ধ্বহুতাশ বহুস্থলে পাইয়াছি,—সে ক্ষেত্রে জয়দেবের অগভীরতা নিতান্ত বেদনাদায়ক,—লুব্ধ মনে ও নয়নে তখনো একটি সুন্দর দেহের তিনি কবি-প্রহরী। জয়দেব স্বয়ং নিজ কাব্যের স্বরূপ যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তারপর বেশী কিছু বলার থাকে না। হরিস্মরণে উৎসাহী এবং বিলাসকলায় কৌতূহলী,—এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য একটি পথ্যপ্রদানমূলক পরিচিত ভণিতা আছে জয়দেবের কাব্যে। সেটি ছাড়াও আমি জয়দেবের অন্য দুইটি ভণিতা স্মরণ করাইব। একটিতে কবি কৃষ্ণভক্তের স্বভাব এইভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন,—

> "হরিচরণে শরণাগত জয়দেব কবির এই গান কোমলকলাবতী যুবতীর ন্যায় ভক্তগণের হৃদয়ে বাস করুক।"

জয়দেবের গানের রূপ সম্বন্ধে 'কোমল-কলাবতী যুবতী' বিশেষণ বড় সুন্দর। আর ভক্তহৃদয় সম্বন্ধে ইঙ্গিতটিও মনোহর—সেখানে কলাবতী কোমল যুবতীগণের নিত্য সুখাধিষ্ঠান। আমাকে ভুল বুঝিবেন না, কিন্তু একথা সত্য, জয়দেব বৈরাগ্যময় ভক্তির ধারণায় অসমর্থ ছিলেন।

দ্বিতীয় ভণিতাটি আরো মারাত্মক—সেখানে কবির নিজ মুখে তাঁহার বিরহ কাব্যের স্বরূপ এই—

"যদি মনকে আনন্দে মাতাইয়া নাচাইতে চান, তবে শ্রীজয়দেবভণিত হরিবিরহাকুল ব্রজযুবতীর এই সখীবচন বারবার পাঠ করুন।"

নিজ বিরহকাব্যের শক্তি সম্বন্ধে জয়দেবের দাবি—তাহাতে মন আনন্দে মাতিয়া নাচিয়া ওঠে। এই কথাগুলিকেই কি আমি সমালোচনার্থ প্রয়োগ করিতে পারি না?*

বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দ কাব্যের আর একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ বিদ্যাপতির দেহরূপাঙ্কনের পদ্ধতি এবং দেহচেতনার প্রকৃতি জয়দেব হইতে আহৃত এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে।

প্রথমেই বলা চলে, গীতগোবিন্দ কাব্যের ব্যাপ্তি অল্প। সেখানকার সমস্ত ভুবন হইল 'মন্মথমহাতীর্থ'-রূপ লতানিকুঞ্জভবন। বৈষ্ণবকাব্যে,—মিলনাত্মক প্রেম যাহার মূল বিষয়বস্তু—জীবনের অন্য পরিচয়ের অবসর অল্প, একথা সত্য। বৈষ্ণবকাব্যের পৃথিবী সত্যই রতিমন্দিরসমাপ্ত। তবু চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি—নিশ্চয় চৈতন্যজীবনের প্রেরণাতে—ঘর হইতে নিকুঞ্জের মধ্যবর্তী পথকে যথেষ্ট দীর্ঘ ও বিঘ্নসঙ্কুল করিয়াছেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের মিলনে যথেষ্ট বহির্গত বাধা। কিন্তু জয়দেবের যাহা কিছু বাধা—ভোগগত, ভোগের প্রয়োজনে সৃষ্ট,—ক্ষুব্ধ লুব্ধ হৃদয়ের উত্থান-পতনের মধ্যবর্তী ব্যবধান। সে বাধা—লম্পট নায়কের অন্য গেহে ও দেহে প্রস্থানের, ও তদনুযায়ী খণ্ডিতা নায়িকার রোষাভিমানের জন্য। এমন কি জয়দেব নির্হেতু মানে পর্যন্ত নিরুৎসাহ। নির্হেতু মান যখন মিলনের মধ্যে একটা নিঃশ্বাসময় আত্মসঙ্কোচ সৃষ্টি করে। হেতু নাই বলিয়া এই ব্যবধানটুকু বিশুদ্ধভাবে মানসিক,—ইহা দেহগত প্রেমের অন্যতম মুক্তিক্ষেত্র। জয়দেবে যাহা কিছু মেলে তাহা হইল বাসনার প্রতিহত বিপরীত গতি। তাই জয়দেবে অভিসার নাই,—আধ্যাত্মিক অভিসার বলিতেছি না,—প্রাকৃত-স্বভাব অভিসার-গমন পর্যন্ত নয়। প্রাকৃত অভিসারে

*আমি জানি এখনই আমার বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক প্রতিবাদ উঠিবে, বলা হইবে—বৈষ্ণব ভাবসাধনায় বিরহও মিলনলোকের অন্তর্ভুক্ত বস্তু। সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, এইরূপ তত্ত্ব মনে রীতিমত জাগাইয়া রাখা হইলে বৈষ্ণব বিরহ ভক্তিসর্বস্ব হইয়া পড়িবে।

গোপন-গমনের একটা রোমাঞ্চ পাওয়া যায়। জয়দেবে আছে শুধু মদনমনোহর বেশে রতিসুখসার গতি, কুঞ্জদ্বারে মেখলার জয়ডিণ্ডিম ধ্বনি এবং কটাক্ষ করিতে করিতে সুন্দর কুঞ্জভবনে কেলি-শয্যায় আরোহণ। এই অভিসার!

জয়দেবের কৃষ্ণচরিত্রও বিচিত্র। কৃষ্ণকে বিদগ্ধ লম্পট করিতে কবি বাধ্য,—কৃষ্ণের সাধারণ পরিচয় ঐরূপ বলিয়া নয়,—নিজ কাব্যের বিশিষ্ট প্রয়োজনেও বটে। রাধার বাসক-সজ্জিতা, খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতা রূপ কবিকে বর্ণনা করিতে হইবে। একমাত্র এই সময়গুলিতে রাধা ও কৃষ্ণ দেহবিচ্ছিন্ন থাকিবার অবসর পান। মিলনতরঙ্গের গতি বজায় রাখিতে ঐ প্রকার কয়েকটি প্রতিঘাত-শৈল বজায় রাখা নিতান্ত দরকার। কবি তাহা জানেন। জানার মূল্যও দিয়াছেন, স্বেচ্ছায় (?) কাব্য-সঙ্গতিকে সম্পূর্ণ ভুলিয়াছেন। কথাটি বুঝাইয়া বলা দরকার। গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গে রাসস্থলী হইতে রাধার প্রস্থানে কৃষ্ণের অসাধারণ ব্যাকুলতা বর্ণিত। চতুর্থ সর্গে ব্যাকুল কৃষ্ণের নিকট সখীকর্তৃক রাধার অনুরূপ বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনা। ইহাতে কৃষ্ণের ব্যাকুলতা আরো বাড়িয়া গেল। বিরহশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমের তখন এক উচ্চাঙ্গের অবস্থা। পঞ্চম সর্গে কৃষ্ণের অনুরোধে সখী আসিয়া রাধার নিকট কৃষ্ণের শোচনীয় অবস্থার বিশদ বর্ণনা দিল। কৃষ্ণের বিরহ-মথিত অবস্থার বর্ণনায় কবি যত্নের কোনো ত্রুটি করেন নাই। রাধা নিজেও অতি বিরহে ক্লিষ্টা। তাই অভিসারে যাইতে অসমর্থ হইয়া লতাগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাধার নিকট আসিবার জন্য কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানাইতে সখী প্রস্থান করিল। এবং পূর্ণিমা যামিনীতে অপরূপ সজ্জায় প্রেম-থরোথরো হৃদয়ে রাধা লতাগৃহে প্রতীক্ষা-রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এরূপ অবস্থায়—কৃষ্ণের উচ্চাঙ্গ বিরহ এবং রাধার একান্ত প্রতীক্ষার পটভূমিকায়—কৃষ্ণকে অন্য নায়িকার নিকট প্রেরণ দুঃসাহসিক কবির পক্ষেই সম্ভব। জয়দেব সেই দুঃসাহসী কবি। কাব্যিক ঔচিত্যের এরূপ উৎকট লঙ্ঘন অল্পই দেখা যায়,—আমাদের জানা এই এক ক্ষেত্র।

তাই একথা নির্মমভাবে সত্য—জয়দেবে আত্মা তো দূরের কথা হৃদয় পর্যন্ত নাই। শুধু দেহ আর দেহ। সজ্জিত, সুপুষ্ট, বাদসমর্থ দুই দেহ।

যাহা কিছু সংঘাত—দেহে দেহে। যাহা কিছু সমস্যা—দেহের। যাহা কিছু সমাধান—দেহেই। 'প্রাণ'-হীনতাই জয়দেবের বিরুদ্ধে বৃহত্তম অভিযোগ। তাঁহার কাব্যের বাচিক অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো বক্তব্য নাই, কারণ সংস্কৃত প্রেমকাব্য পড়িতে বসিয়া অনাবৃত শরীর ও শরীরের মত্ততায় সঙ্কোচবোধ করিলে কাব্য প্রথমেই রাখিয়া দিতে হয়। না, তাহার জন্ত নয়,—দেহের ভিতরের প্রাণ নামক বস্তুর একান্ত অভাবই আমাদের সর্বাপেক্ষা পীড়া দেয়। গীতগোবিন্দে তিন চরিত্র—রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। সখীর একমাত্র কাজ রাধাকৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিয়া, বুঝাইয়া, ভুলাইয়া কেলিকুঞ্জে ঠেলিয়া দেওয়া। রাধাকৃষ্ণের একমাত্র কাজ পরস্পরের রূপ চিন্তা করা ও মিলনের উত্তেজনাবর্ধক কিছু বিরহবোধ করা। আত্মার শুদ্ধিব্রতরূপ বিরহ জয়দেবে আহার্যহীন অবসর,—ক্ষুধাবৃদ্ধির সহায়ক।

আমি কঠিন কথা বলিতেছি মনে হইতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্বে জয়দেবীয় চরিত্রের যে বিশ্লেষণ করিয়াছি, তদনুযায়ী আমার বক্তব্য অযৌক্তিক ভাবে কঠিন মনে না হওয়াই উচিত। জয়দেবীয় কৃষ্ণের আর একটি স্বভাবরূপের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক;—দশম সর্গে খণ্ডিতা রাধাকে বচনে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার রোষহরণে কৃষ্ণ সচেষ্ট। কৃষ্ণ বলিতেছেন—

"হে ভীতিপ্রবণে, আমাকে অন্য নায়িকাসক্ত বলিয়া যে আশংকা করিতেছ, তাহা পরিহার কর। ঘন স্তন জঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার চিত্ত অধিকাব করিয়া আছ। সেখানে অন্যের অবস্থিতির অবকাশ কোথায়?

প্রশস্তি বটে! অনুচিত ও আপত্তিকর! রাধাকে নিছক শরীরিণী ছাড়া ভাবিতে জয়দেবের কৃষ্ণ অসমর্থ। স্তন-জঘনের বিপুলতায় রাধা কৃষ্ণ-চিত্ত হইতে অন্য নায়িকাকে হটাইয়া দিয়াছেন! কামার্ততার এমন অকুণ্ঠ ঘোষণা অল্পই মেলে—এবং রাধার এমন অপমান! জয়দেবের কৃষ্ণ কথাগুলির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ পরিতোষবচনে রাধাকে খুশী করিয়া (রাধা যে খুসী হইয়াছিলেন স্বতঃই স্পষ্ট) রাধার চরিত্রকে হীন করিয়াছেন অসঙ্গতভাবে। কবির এ অধিকার ছিল না। এখানে কাব্য যথার্থই অশ্লীল।

রূপরীতির বিচারে বিদ্যাপতি জয়দেবের যেরূপ অনুগামীই হোন, প্রেমধারণায় তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পার্থক্যের প্রকৃতি

দেখিলাম। বিদ্যাপতির প্রেমপ্রকৃতিকে কিন্তু কালিদাসীয় বলাও চলে না। এক কথায় বলিতে গেলে তাহা ভর্তৃহরিজাতীয়।

ভর্তৃহরি ত্রি-শতক,—শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক এবং নীতিশতকের রচয়িতারূপে খ্যাত। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ জানাইয়াছেন, ভর্তৃহরির জীবনকাহিনী রহস্যাবৃত। রাজা ভর্তৃহরি ঐ তিনটি শতক-কাব্যের রচয়িতা হইলে অবশ্যই তিনি রতি ও বিরতির দুই বিপরীত প্রান্তে দুলিয়াছেন। তিনি নাকি সাতবার সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে অস্থির হইয়াছেন,—কাহাকে লইবেন—সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার না অসংসার বৈরাগ্য? শৃঙ্গারশতক এবং বৈরাগ্যশতকের লেখক ভর্তৃহরির অবশ্যই একটি 'সিনিক' মন ছিল। কিংবা যদি সিনিক নাও বলি, কবি এমন একটি মনের অধিকারী ছিলেন যে মন নির্মোহ—কামনায় ধরা দিয়াও কামনার স্বরূপ বুঝিতে যে ভুল করে না। ভর্তৃহরি আবার বৈরাগ্যমহিমা বুঝিয়াও তৃষ্ণায় অধীর। প্রবৃত্তির দাস ভর্তৃহরি নিবৃত্তির জন্য বৃথা ক্রন্দন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার ক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ স্বীকারোক্তি জীবনের পরাজয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। নিজ জীবনের দ্বিধার চিত্র তিনি এইভাবে ফুটাইয়াছেন—

> সুন্দরী রমণী, নয়, পর্বতগুহা,
> যৌবনসম্ভোগ, নয়, অরণ্যবাস,
> গঙ্গার পবিত্র তীর কিংবা যুবতীর আলিঙ্গন।

ভর্তৃহরি যাতনার সঙ্গে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে, নারীর বিপরীত স্রোত বারবার বাধা না দিলে পুরুষের পক্ষে জীবনের সমুদ্রপথ দীর্ঘ হইত না। তিনি বিষণ্ণ সুখের সঙ্গে দেখিয়াছেন,—হাসিতে, আবেগে, লজ্জায়, নম্রতায়, কটাক্ষের ক্ষেপণে ও সংবরণে, প্রেমবচনে, ঈর্ষায়, কলহে এবং লীলাচাপল্যে কিভাবে রমণী পুরুষকে বাঁধিয়া রাখে। ভর্তৃহরির চরম সত্য দর্শনে তাই শোণিতের চিহ্ন এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন,—"আমি কোনো গোঁড়ামী না করিয়াই বলিতেছি, একথা সত্য, অতি সত্য যে, এই সপ্ত পৃথিবীতে যুবতী নারীর আলিঙ্গনের চেয়ে অধিকতর আনন্দদায়ক এবং দুঃখদায়ক আর কিছু নাই।"*

*ডাঃ সুশীলকুমার দে—Treatment of love in Sanskrit literature.

এই যাঁহার মন, তিনি যখন বৈরাগ্যবশতঃ লিখিবেন তখন নারীনিন্দার চরম করিবেন সহজেই বোঝা যায়। অপরদিকে শৃঙ্গারকাব্য রচনার কালে কামনার নিকট পরাজয়ের গ্লানিতে ভোগকেই পরমার্থ করিয়া তিনি আত্ম-ক্ষয়ের নেশায় মাতিবেন। সেই কালেই তাঁহার চতুর উদ্ধত সিনিক রসিকতা বাহির হইয়া আসে। ভয়াবহতম মোহমুদ্গরের রচয়িতা ভর্তৃহরি আপনাকে আপনি তখন ব্যঙ্গবিদ্ধ করেন। নারী সম্বন্ধে মোহমুদ্গরী ধারণা হইল—নারীর মুখে মধু বুকে গরল। ভর্তৃহরি বলিলেন, অতীব সত্য, তাইতো যুবতীর মুখপান করি এবং বুকে করি আঘাত।

বিদ্যাপতিকে ভর্তৃহরি-জাতীয় বলিয়াছেন। সম্পূর্ণ না বলাই উচিত। তিনি অমরু ও ভর্তৃহরির মধ্য অংশে আছেন। অমরু ভ্রূক্ষেপহীন উল্লাসে এই ভোগ-পৃথিবীকেই স্বর্গ মানিয়াছেন। ভয়াবহ তাঁহার ঔদ্ধত্য যখন বলেন,--"বিলুলিতা আলোল অলকাবলীশোভিত, চঞ্চল কুণ্ডলধারী, অল্প অল্প ঘর্মবিন্দুতে কিঞ্চিৎ তিবোহিত-নয়ন তন্বীর মুখ তোমাকে চিরদিন রক্ষা করুক,—হরি হর ব্রহ্মাদি দেবতার কি প্রয়োজন?" (অনুবাদ—বিমান-বিহারী)। বিদ্যাপতিও অমরুর বক্তব্য নিজ পদে পরিবেশন করিয়াছেন,—"সুন্দরী। তোর মুখ মঙ্গলদায়ক, বিপরীত রতিসময়ে যদি তুই আমাকে রক্ষা করিস, (তাহা হইলে) হরি-হর-বিধাতা আর কি করিবে?" (৬৯৭)। বিদ্যাপতির পদাবলী মন্মথ-প্রণামে পূর্ণ। সেখানে মুনিগণ রূপ দেখিয়া ধ্যান ভাঙিয়াছেন এবং জ্ঞান হারাইয়াছেন। সুরতসুখ যে পরম-পদ লাভের তুল্য, একথা বলিতেও বিদ্যাপতি দ্বিধা করেন নাই।

তবু বিদ্যাপতি অমরুর মত পার্থিব সুখকেই চরম ভাবিতে পারেন নাই। তিনি জীবনে সুখের শেষ দেখিয়াছেন। বৈরাগ্যভাবনার প্রশ্রয় তাঁহার মনে ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ভোগশ্রান্ত, কিছুপরিমাণে ভোগদ্বেষীও। তবে বিদ্যাপতির ভোগবৈরাগ্য (প্রার্থনা পদের সাক্ষ্য) পরিণত বয়সের—ভর্তৃহরির মত যৌবন-মধ্যাহ্নেই প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে আহত হন নাই। সেই কারণে, ভর্তৃহরি-মানসের সাধর্ম্য থাকিলেও বিদ্যাপতির ভোগকাব্যে তিক্ত চিত্তের নীতিহীন ক্ষুধার অভাব আছে।

. বিদ্যাপতির প্রেম-স্বভাবের সঙ্গে সর্বশেষে কালিদাসের প্রেমরূপের তুলনা

করিতে চাই। বিদ্যাপতি, প্রেম সম্বন্ধে কালিদাসীয় সমন্বয় ধারণায় বঞ্চিত। ভারতীয় কবিকুলের মধ্যে যথার্থ প্রেমসামঞ্জস্য কালিদাসই করিতে পারিয়াছেন। [illegible] কাব্যে 'ভোগলাবণ্য' ও 'ভোগবৈরাগ্য' একত্রে বন্ধনে বাঁধা। প্রেমের যৌবনরাগ এবং শান্ত তপস্যা এই উভয় বস্তুই কালিদাসের কাব্যে কিরূপে বর্তমান, রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যের' সুবিখ্যাত দুই প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন। সমঞ্জসী মনোভাব ছিল বলিয়া কালিদাস ইন্দ্রিয়প্রেমকে অস্বীকার তো করেন নাই, এমনকি সুস্থ জীবনসম্ভোগের পক্ষে প্রয়োজন-পরিমাণে স্বীকার করিয়াছেন,—যে পরিমাণকে ইদানীং আমরা দেহাতিশয্য বলিয়া নিন্দা পর্যন্ত করিতেছি। তারপরেই কালিদাস দেখাইলেন প্রেমের অগ্নিশুদ্ধি ও তপোসিদ্ধিকে। কালিদাসের বিশেষ মহিমা এইখানে, তিনি অতি স্বাভাবিকভাবে—জীবনের সহজ ছন্দ বজায় রাখিয়াই—সামঞ্জস্য আনিতে পারিয়াছেন। উমা-মহেশ্বর, দুষ্যন্ত-শকুন্তলা, দিলীপ-সুদক্ষিণা কিংবা অজ-ইন্দুমতী,—সকলের প্রেম জীবনাবলম্বী, সংসারাশ্রয়ী। কালিদাসের প্রেম-চিত্রণের পিছনে দার্শনিক মত থাকিতে পারে (আছে বলিয়া অনেকের ধারণা), কিন্তু তাঁহার প্রেম-স্বরূপের অনুধাবনে ঐ দর্শনের স্মরণ না করিলেও চলে। কালিদাসের উত্তপ্ত জীবনস্বাদ ও সায়াহ্ন-সাধনা কিন্তু ভবভূতিতে মেলে না। ভবভূতির গৌরব—তিনি প্রেমের অন্তর্নিবিষ্ট গহনরূপ, ভাবরূপকে আরো প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু ভবভূতির প্রেম অনেকাংশে তত্ত্বিক ও ভাবোচ্ছ্বাসময়,—সহজতাবঞ্চিত। এমনকি যদি একেবারে আধুনিক কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেও আসি,—রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় প্রেমের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের সাধক, এবং তাঁহার মনোভূমে এ ব্যাপারে কালিদাস সতত বিরাজমান; শিব-পার্বতীর প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁহার কাব্যে বিতরণ করিয়াছেন অজস্র ধারায়, যেভাবে নারীর মধ্যে উর্বশী-লক্ষ্মীর যুগপৎ অবস্থিতি দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রেমের পূর্ণরূপের কবি-দার্শনিকরূপে স্বীকার করিতে হয়; তবু সেই সঙ্গে একথা বলা ভাল, রবীন্দ্রনাথের প্রেমসমন্বয় অনেকাংশে তাত্ত্বিক,—আরো যথার্থভাবে,—কল্পনাভিত্তিক। লিরিক কবিরূপে এ বিষয়ে কল্পনানির্ভরতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রায় অবশ্যম্ভাবী, আখ্যানকাব্যের কবি কালিদাসের সুবিধা তাঁহার থাকার কথা নয়। লিরিক কবিদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে ভাব-প্রধান; প্রেম-

ধারণায় তিনি বিমূর্তভাবের দ্বারা অনেকাংশে আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে আখ্যানকে অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন চিত্রাঙ্গদা নাটকে,—সেখানেও তাঁহার কবিকল্পনা রক্তমাংসে প্রবেশ করিয়া নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে।

আমাদের আলোচ্য কবি বিদ্যাপতিও কালিদাসীয় সামঞ্জস্যে অনধিকারী। বিদ্যাপতি সামঞ্জস্যবিধানে যে ইচ্ছুক ছিলেন, তার প্রমাণ, একদিকে তাঁহার সৃষ্টিতে আছে ইন্দ্রিয়রাগময় রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ও লৌকিক প্রেমপদাবলী, অন্যদিকে আছে সংসারভবনাশ্রিত শিবপদাবলী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা বর্ণনার সময়েও বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণকে কেবল শৃঙ্গাররসের দেবদেবী রাখেন নাই, তাঁহাদের প্রেমের ইন্দ্রিয়বহ্নিতে আধ্যাত্মিক প্রেমশিখা জ্বালাইতে পারিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা-পদের আলোচনায় দেখিয়াছি, কিভাবে তিনি বাসনাশৃঙ্খল ছেদনে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য আনয়নে বিদ্যাপতি অসমর্থ। প্রেম-পদাবলীতে মুখ্যত: তিনি ইন্দ্রিয়ের রসদদার রহিয়া গিয়াছেন। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বিদ্যাপতি পরকীয়া প্রেমের কবি। মানুষ সামাজিক জীব বলিয়া প্রেমের সহজ সমন্বয় স্বকীয়ার প্রেমেই সম্ভব। পরকীয়া প্রেমে হয় সর্ববন্ধনোত্তর অপার্থিবতা, নয় নীতিদূষিত ইতরতা।

বিদ্যাপতির প্রেমদর্শনের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকজন সংস্কৃত কবির মনোরূপের সঙ্গে বিদ্যাপতির কবিমানসের তুলনার চেষ্টা করিয়াছি। ভারতীয় প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিদ্যাপতিতে কিরূপ অঙ্গীকৃত তাহা সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। অধিকন্তু বিদ্যাপতির সঙ্গে পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের তুলনা কোথাও কোথাও করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট এখন কাব্য-পৃথিবীর মানদণ্ড। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের সহজ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পাশে রাখিয়া কোনো জিনিস বুঝিতে তাই বড় সুবিধা।

এইবার প্রয়োজন বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যের প্রত্যক্ষ পরিচয়দান। এই রচনার মূল উদ্দেশ্যও বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন। আমরা যথাসাধ্য সে চেষ্টা করিব, তার পূর্বে আরো সামান্য কিছু বিষয়ের উল্লেখ করিব। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ছিলেন। রাজসভাশ্রয় তাঁহার কাব্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বিদ্যাপতির মনোভঙ্গি আলোচনা-

কালে এই রচনার প্রথম খণ্ডে তাহা যথেষ্ট বলিয়াছি। বিদ্যাপতি শিক্ষিত মানুষের কবিও বটেন। তিনি স্বয়ং বিশাল পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার কাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদের জন্য বিদগ্ধ রসিক মনের প্রয়োজন। তবে সংস্কৃত কবিগণ সাধারণতঃ যে উচ্চশিক্ষিত রসিক পরিমণ্ডলী পাইতেন, বিদ্যাপতি সর্বত্র সে পরিবেশ পান নাই। তাঁহাকে বহুসময় সংস্কৃত কাব্যরস লৌকিক ভঙ্গিতে চালিয়া সাজিতে হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের গ্রাম্য উপমা এবং লৌকিক বচনের সঞ্চয় তাঁহার অনুগ্রাহক সমাজের রুচি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ কবিকে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত—উভয়-শ্রেণীর পাঠক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিদ্যাপতির জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণের সময় সেকথা বলিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবনে কখন কোথায় কি কবিতা লিখিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই, কিন্তু এক পরিবেশের সুস্থিরতা যে পান নাই, ইহা সঙ্গতভাবে অনুমান করা চলে।

বিদ্যাপতির অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্রানুগত্য রাজসভানুগত্যের জন্য। অবশ্য সংস্কৃতকাব্য সাধারণভাবে ঐ দুই শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যাপতি সংস্কৃত কাব্যধারায় অবতীর্ণ বলিয়া অলঙ্কার ও কামশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিবেনই। এই কামশাস্ত্রেই নাগরকচরিত্রের বর্ণনা মিলিবে। বিদ্যাপতির কাব্যের নায়ক ও পাঠক উভয়েই নাগরক-স্বভাব। সেই কারণে এই নাগরক-চরিত্রের পুরাতন রূপ ও বিবর্তন না বুঝিলে বিদ্যাপতির নায়ক চরিত্রের রূপরীতি বোঝা শক্ত। বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যের পটভূমিকা প্রস্তুতের কাজে আমি সর্বশেষে এই নাগরকচরিত্রের উপস্থাপনা করিব। এ ব্যাপারে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের অনুসরণ করাই ভাল। ডাঃ সুশীলকুমার দে বাৎস্যায়নের উপর নির্ভর করিয়া যে নাগরকচরিত্র আঁকিয়াছেন এবং নাগরক চরিত্রের বিবর্তন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার মোটামুটি অনুবাদ করিয়া দিতেছি—

"কেবল রাজসভাই এই সাহিত্যের প্রেরণাস্থল নহে, পরবর্তী ক্লাসিক্যাল কাব্যের প্রেমপ্রকৃতির মুখ্য লক্ষণগুলিকে তাহার পারিপার্শ্বিক, উৎসভূমি এবং সমাদরকেন্দ্রের রূপ হইতেও বোঝা যায়। ইহার কেন্দ্রে আছে 'নাগরক'—নাগরিক জীবনের সুমার্জিত প্রতীক,—যাহার বৈদগ্ধ্য, রুচি ও প্রকৃতি বহুভাবে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে,—যাহারা কীথের সঙ্গত মন্তব্য অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ-উপনিষদের মুনি-ঋষি চরিত্রের মতই এই শ্রেণীর রচনার আত্মা-চরিত্র। সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত নাগরক-চিত্র ছাড়াও বাৎস্যায়নের নামে চলিত কামসূত্রের মধ্যে প্রাচীন নাগরকের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রেখাচিত্র পাইতেছি। নদী

-বা সরোবরের তীরে নির্মিত নাগরকের সুপরিকল্পিত ভবনখানি ঘিরিয়া থাকিত একটি মনোরম উদ্যান। সে উদ্যানে বিলাসের ও আরামের জন্য লতাকুঞ্জ, গ্রীষ্মাবাস এবং ছায়াবিতানতলে কোমল গদীর দোলনা। নাগরকের ঘন গন্ধাধিবাসিত শয়নকক্ষে একটি শয্যা,—কোমল, শুভ্র ও সৌরভময়,—উপাধানাদির দ্বারা বিলাসবহুলভাবে সজ্জিত। কক্ষে একটি আরাম-কেদারাও থাকিত, তাহার মাথার দিকে চৌকির মত জিনিস, যাহাতে সাজানো—মল্লক, সুগন্ধি, মাল্য, মুখশুদ্ধি, চিত্রপট এবং অঙ্কনের রঙের বাক্স। হস্তীদন্তের আলনা হইতে ঝোলানো একটি বীণা এবং পড়িবার কিছু বই। মাটিতে পিকদানি। চৌকির অল্প দূরে ঠেসান-দেওয়া গোলাকার আসন এবং পাশার সরঞ্জাম। নাগরকের প্রাভাতিক কর্মের মধ্যে স্নান ও বিস্তারিত প্রসাধন,—দেহে সুরভিদ্রব্যের প্রযোগ ও প্রলেপ, চোখে অঞ্জন, ঠোঁটে অলক্তক ইত্যাদি। নাগরক মুখের সৌগন্ধ্য বৃদ্ধির জন্য তাম্বুল ও মসলা চর্বণ করিত এবং দর্পণে বারংবার নিজেকে দেখিত। প্রাতরাশের পর কক্ষের বাহিরে খাঁচায় রাখা তোতার নিকট তোতা-বচন শুনিত, এবং নূতন বচন শিখাইত।....
অল্প দিবানিদ্রার পর পুনর্বার সাজসজ্জা করিয়া বন্ধুসঙ্গে গিয়া বসিত। সন্ধ্যায় হইত সঙ্গীত—সঙ্গিনীদের সঙ্গ-মাদকতায় ভরপুর। এই হইল নাগরকের দৈনন্দিনের প্রয়াস ও প্রমোদের জীবন। সময়মত ব্যসন-বৈচিত্র্যের ব্যবস্থাও ছিল। উৎসব, অভিনয়, নৃত্যগীত পানভোজনের আসর, ..,উপবনে ভ্রমণ, লতাকুঞ্জে বনভোজন, সরোবরে, হ্রদে বা নদীতে জলকেলি। এই সকল প্রমোদ ও পরিহাসে, বিলাসে ও ব্যবহার নারীবন্ধুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করিয়া থাকিত। বাৎস্যায়নের বিবরণ অনুসারে এই সময়কার সমাজজীবনে বিদগ্ধ কুটনীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

উপরকার চিত্রটিতে কিছু অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নাই। নাগরকচরিত্রের মধ্যে, এবং যে সমাজের মধ্যে তাহারা বাস করিত তার মধ্যে, বাবুয়ানা, মজাদারি, এবং কাঁপানো সমঝদারি ছিল, কিন্তু আসল বৈদগ্ধ্যও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে, ছিল পরিশীলিত ব্যক্তিত্বময় বৈদগ্ধ্য, চারুদত্তের মধ্যে অন্যত্র যাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। উত্তর কালে নাগরক নিছক পেশাদার নাগরে অবনত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীনতর সাহিত্যের নাগরক ধনী, শিক্ষিত, কলাবিৎ, কবি,—বচনে ও ব্যবহারে উৎকৃষ্ট,স্বাভাবিক, পার্থিব মানুষ। কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীতের আলোচনায় যেমন তাহার পারদর্শিতা, তেমনি তাহার সহজ প্রবেশ প্রেমতত্ত্বের গভীর ও সূক্ষ্ম সমস্যাসমূহের মধ্যে। তাহার মন্তব্যসমূহ কেবল কামকলা ও কামবিজ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যই দেখাইয়া দিত না, দেখাইত নারী-জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ।বস্তুত অভিজ্ঞতা,—মানব-চরিত্র, বিশেষতঃ নারী-প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান।

এই নাগরক ও তাহার জীবনরূপ-কে বিদ্যাপতির প্রেম-পদাবলীর মধ্যে অতঃপর বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত থাকিতে দেখিব, সর্বস্থানে। বিদ্যাপতিও স্বয়ং নগরজীবনকে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—অভিজ্ঞতা ও কল্পনামিশ্রিত সেই বর্ণনা 'কীর্তিলতা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সেইরূপে তাঁহারা একটি নগর দেখিতে পাইলেন, তাহার নাম জোনাপুর। তাহা লোচনবল্লভ এবং লক্ষ্মীর বিশ্রামস্থান।

তাঁহারা ঐ নগরী দেখিলেন, চারিদিকে জল তাহাকে প্রক্ষালণ করিতেছে, যেন সে চারু মেখলা পরিয়া আছে। পাষাণকুট্টিম অনেক স্থলে; ভিত্তির ভিতর দিয়া উপরে জল যাইবার পথ। পল্লবিত, কুসুমিত, ফলিত উপবনে চূত ও চম্পক অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মকরন্দ-পান-মুগ্ধ মধুকরের শব্দে মানস মোহিত।...সোপান, তোরণ, উৎক্ষিপ্ত জলরাশিসহ ফোয়ারা, ঝরোখা প্রভৃতি স্থানে স্থানে। কনককলসমণ্ডিত সহস্র সহস্র ধবলবর্ণ শিবমন্দির। স্থলপদ্মপত্রপ্রমাণনেত্রা, মত্তকুঞ্জরগামিনী কামিনীগণ চৌহাটার বর্ত্মে দলে দলে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে। কর্পূর, কুঙ্কুম, গন্ধ, চামর, নয়নকজ্জল ও বসন বণিকেরা অতি লাভে বিক্রয় করিতেছে। সর্বলোক সম্মান, দান, বিবাহ, উৎসব, গীত, নাটক, কাব্য, আতিথ্য, বিবেক, বিনয় ও কৌতুকে কাল কাটাইতেছে। দলে দলে লোকে পর্যটন করিতেছে, খেলিতেছে, হাসিতেছে, দেখিতেছে। মাতঙ্গতুঙ্গ ও তুরঙ্গ উদ্বৃত্ত বর্ত্ম না পাইয়া থামিতেছে।...

নাগরীরা সখীদের সঙ্গে সব দিকে রূপের পসরা সাজাইয়া পথ জুড়িয়া বসিয়া আছে। তাহারা রূপে যৌবনে গুণে অগ্রগণ্যা। কোনো না কোনো ছলে তাহাদের সম্ভাষণ না করিয়া, কিছু কাহিনী না কহিয়া কেহই ক্রয় বা বিক্রয় করিতেছে না। আপনার সুখ বিক্রয় করিয়া তাহারা দৃষ্টির দুঃখ লাভ করিতেছে। কামিনীরা সকলেই পদ্মনয়না। তরুণীরা ফিরিয়া কটাক্ষে চাহিতেছে। উহারা চোরী প্রেমের পিয়ারী, নিজ দোষে শঙ্কিতা।...এখানে মন্দিরে, দেহলীতে ধনীদের দেখিয়া মনে হয় সকলেই আনন্দপূর্ণ, তাহাদের মুখে মুখে চন্দ্র উদিত।...

রাজপুত্রেরা রাজবর্ত্মে ভ্রমণকালে দেখিলেন, অনেক গণিকা চারিদিকে। তাহাদের নয়নকজ্জলে চন্দ্রের কলঙ্করেখা। উহাদের লজ্জা কৃত্রিম, তারুণ্য কপট, উহারা ধনের নিমিত্ত প্রেম দেখায়, লোভে বিনয় দেখায়, সৌভাগ্যে কামনা দেখায়। স্বামী নাই অথচ সীমন্তে সিন্দূর। মদনতৃপ্তির ও লাভ-গৌরবের জন্ত গুণবান উপপতি চায়। চতুর অনঙ্গ এই গণিকামন্দিরে বাস করেন। তাহারা যখন পরম সুখে বেশবিন্যাস করে, অলকা-তিলকা, পত্রাবলী

রচনা করে, উত্তম বসন পরে, পাকাইয়া পাকাইয়া কেশসংস্কার করে, সখীদের দূতীয়ালীতে পাঠাইয়া দেয়, হাসি হাসি মুখে চায়, তখন সেইসব সেয়ানী, লাবণ্যময়ী, পাতলী, বৃদ্ধা, পতোহরী (যাহাদের পুত্রবধূ হইয়াছে), লজ্জাবতী, তরুণী, বন্ধ্যা, বিচক্ষণী, পরিহাসকারিণী সুন্দরীগণকে দেখিয়া তাহাদের জন্য মনে হয় বাকি তিনটি (ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ) উপেক্ষা করি। তাহাদের কেশে ফুল লাগিয়া আছে, যেন মান্যজনের লজ্জাবনত মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকাগুলির অধোগতি দেখিয়া অন্ধকার হাসিতেছে। তাহাদের নয়নাঞ্চলে ভ্রূলতাভঙ্গ সঞ্চার করিতেছে।...অতি সূক্ষ্ম সিন্দূররেখা পাপের নিন্দা করিতেছে।...

বিশ্বকর্মা এমন একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা বজ্রমণি দিয়া গাঁথা, যাহাকে স্বর্ণকলস দিয়া এত উঁচু করিয়াছেন, যেন সূর্যরথের সপ্তাশ্বের অষ্টাদশ ক্ষুর। উহাতে প্রমোদবন, পুষ্পবাটিকা, কৃত্রিম নদী, ক্রীড়াশৈল, ধারাগৃহ, যন্ত্রব্যজন, শৃঙ্গারসঙ্কেত, মাধবীমণ্ডপ, বিশ্রামচৌরা, চিত্রশালিকা, পালঙ্ক, দোলা, কুসুমশয্যা, মাণিক্যদীপ, চন্দ্রকান্তশিলা, চারি প্রকার সুগন্ধি পল্লব।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'কীর্তিলতা')

বিদ্যাপতি-পদাবলীতে প্রেমের লৌকিক রূপ

বিদ্যাপতির প্রেম-পদাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগ—লৌকিক প্রেম। এই প্রেমের মধ্যে পড়ে কুটনী, সাধারণী ও পরকীয়া নারীর প্রেম। রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক কিছু পদও এখানে আসে। রাধা-কৃষ্ণের কথায় বা কার্যে এক্ষেত্রে কুটনী ও সাধারণীর অনুরূপ ইতরতা। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে নাগরিক প্রেম। ইহাই বিদ্যাপতির কাব্যে কেন্দ্রস্থ বস্তু। বিদ্যাপতি নাগরিক প্রেমেরই কবি। কুটনী-সাধারণীর প্রেম বা রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম এই নাগরিক প্রেমের বহির্মণ্ডলে রহিয়াছে। তৃতীয় ভাগে পড়ে আধ্যাত্মিক প্রেম। বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক প্রেম নাগরিক প্রেমেরই রূপান্তর। নানা প্রসঙ্গে পূর্বে বারবার বলিয়াছি, বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিক প্রেম স্বতন্ত্র বস্তু নয়, ইন্দ্রিয়জ প্রেমেরই সমুন্নত রূপ। সুতরাং আমরা বিদ্যাপতির প্রেম বলিতে মূলতঃ কলারসরসিত, উজ্জ্বল মদনগীতিকে বুঝিব, যাহা বিদগ্ধ দুই নরনারীর দেহমনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নাগরিক প্রেমের কিয়দংশের আশ্রয় সাধারণ নায়ক-নায়িকা, মূল আশ্রয় শৃঙ্গারমূর্তি রাধা ও কৃষ্ণ। অধ্যাত্ম প্রেম সম্বন্ধে একটি কথা বলার আছে—ইহাকে সর্বত্র পৃথকভাবে, একটি পদের সমগ্র দেহে, আকারিত দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু সময় প্রেমের আধ্যাত্মিকতা দেহের লাবণ্যের মত কেবল ব্যঞ্জনায় ফুটিয়াছে। এই সব অংশে মিশ্র অধ্যাত্মচেতনা। তবে পূর্ণ অধ্যাত্ম-রসচ্ছুরিত পদও আছে,—এমন সব পদ আছে, যাহা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির ক্ষণেই লেখা সম্ভব। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পদ পূর্ণভাবে রাধাকৃষ্ণাবলম্বী (?)।

সাধারণী নায়িকা ও লৌকিক পরকীয়া নায়িকার প্রেম

প্রথমেই কুটনী-সাধারণী ও লৌকিক (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত) পরকীয়া নায়িকা-বিষয়ক পদগুলি লক্ষ্য করা যাক। এই জাতীয় পদ বিদ্যাপতির অনেকগুলি আছে। বলা চলে, এসব ক্ষেত্রে কবি প্রচলিত ধারানুসরণ করিয়াছিলেন; প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে প্রচুর বিক্ষিপ্ত শ্লোকে এইরূপ নর-

নারীর চিত্র মেলে। বিদ্যাপতি এক্ষেত্রে হাল-অমরু-ভর্তৃহরিকে অনুসরণ করিয়াছেন।

তবু একটি গৌরব হইতে বিদ্যাপতিকে বঞ্চিত করা শক্ত—ভাষান্তরের। বিদ্যাপতি পূর্ববর্তী কবিদের সংস্কৃত-প্রাকৃত রচনাকে অন্ততঃ ভাষান্তরিত করিয়াছেন। ঐ ভাষান্তরের ফলে, যেহেতু বিদ্যাপতির ভাষা জনগণের মুখের ভাষা, নূতনতর প্রাণশক্তি সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির মত শক্তিমান কবি পুরাতন বিষয় অবলম্বনে কবিতা লিখিবার সময় নূতন কোনো বক্তব্য যোগ করেন নাই, ইহাও সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিদ্যাপতি যখন পূর্ববর্তীদের কাব্যবিষয়কে অবলম্বন করিয়াছেন, তখন একদিকে ছিল পুরাতন বস্তুর সঙ্গে কাব্যরসিকের পরিচয়-সাধনের দায়িত্ব, অন্যদিকে পুরাতনকে নূতন বুদ্ধিতে দীপ্ত এবং অভিনব রসে উচ্ছল করিয়া তুলিবার প্রয়াস। বিদ্যাপতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সমাজবোধও এই শ্রেণীর পদ রচনায় তাঁহাকে অধিকন্তু প্রণোদিত করিয়াছিল।

বিদ্যাপতি কুটনীব আত্মপরিচয় দিয়াছেন। বর্ণনায় দেহজীবিনীর জীবনের কারুণ্য পবিস্ফুট। যৌবনকে যাহাদেব পণ্য করিতে হয়, যৌবন-নাশ তাহাদেব অন্নে টান দেয়। নিজের অপগত যৌবনের কৌতুক ও কারুণ্যময় বর্ণনা কুটনী কবিয়াছে। কৌতুক আছে দেহবিলাসিনীর দেহদুর্গতির বর্ণনায়, কারুণ্য ফুটিয়াছে সর্বস্বহারা নারীটির শূন্য ক্রন্দনে। পলায়িত যৌবনকে সাডম্বরে ধরিয়া রাখার চেষ্টার-রূপ :—

> "গাল তুবড়াইয়া গিয়াছে, চুল দিয়া ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করি। চক্ষু নিস্তেজ হইয়াছে, আজও উহাতে কাজল দিই। পাকাচুলে ফুল দিই। যত অধিক সাজি, লোকে উপহাস করে। স্তনদ্বয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে, শুক নিতম্ব কোথায় গেল? যৌবনের শেষ হইল, অঙ্গ শুকাইল, পিছনে ফিরিয়া দেখি উন্মত্ত অনঙ্গ গড়াইয়া পডিতেছে"।—(৬)

শেষ পংক্তিটি কঠিন বাস্তবদৃষ্টিতে অপূর্ব,—লোলচর্মময় পশ্চাদ্দেশের রূপ দেখিয়া কুটনীর (অর্থাৎ কবির) মনে হইল—যৌবন গড়াইয়া পড়িতেছে। কবি অতঃপর নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত বলিয়াছেন—'এক কোঁটাও রস নাই'।

কুটনী একেবারে সাধারণী বনিতা। পরকীয়া ও কুলটার কয়েকটি চিত্রও বিদ্যাপতির কাব্যে মেলে। নারী কখন ও কেন কুলধর্ম ত্যাগ করে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বলা কঠিন। অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের একটি হইল,

স্বামীর বিদেশবাস। ধর্মে ও দেহধর্মে বিবাদের ক্ষেত্রে সামাজিক মানুষরূপে আমরা ধর্মের পক্ষপাতী, কিন্তু যেসব স্থানে ধর্মের পরাজয়ের স্বাভাবিক কারণ আছে, সে সকল স্থানে আমরা ধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে একেবারে সহানুভূতিশূন্য হইতে পারি না। যেমন, যে-নারী দীর্ঘদিন প্রোষিতভর্তৃকা, সে সহৃদয়ের সমবেদনা পাইবেই। তবে অকারণ অধঃপতন যাহাদের, তাহাদের বিরুদ্ধে থাকে সামাজিকের অবিমিশ্র ঘৃণা। বিদ্যাপতির পদে দুই শ্রেণীর পতিতা নারীর চিত্রই মেলে। পরপুরুষে আসক্ত কুলবধূকে তাহার সখী যথেষ্ট নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে,—পরপুরুষের প্রেম গর্হিত, কুলের গৌরব রক্ষণীয়,—এইরূপ যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছে (১৫), কিন্তু রিরংসায় যে জ্বলিতেছে সে উপদেশ শুনিবে এরূপ আশা বৃথা। লোকভয়ে নায়িকা কিছু সংবৃত থাকে, নায়ককে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টাও করে (২৬৯), কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্বালারই জয়। লৌকিক সংস্কার ও সঙ্কোচে বাঁধা তেমন একটি কামনাতুর প্রাণীর চিত্র আছে ২০৪ পদে। সেখানে নাগরিকা ইঙ্গিতে বলিয়াছে,—"অঙ্গনের চন্দন গাছের সৌরভে পঞ্চাশ ভ্রমর আসে।" পদের মধ্যে আছে তাহার দেহযন্ত্রণার বিবৃতি,—নাগরিকা অভিসারে বাহির হইতে অপারগ, পাশে সখী এবং বাহিরের দরজায় ভাসুর শায়িত। তদুপরি পায়ে আছে নূপুর, 'লহ লহ' পা ফেলিতেও বাজে ঝমঝম। নায়িকা প্রাণ ধরিয়া নূপুর ভাঙিতে পারিবে না, কারণ বাপ মায়ের দান (২০৪)।

দেখা যায়, এই নায়িকা সম্বন্ধে কবি নির্মম—কামনায় সীমা-লঙ্ঘনের শক্তি পর্যন্ত তাহাকে দেন নাই। স্মরাতুরা নায়িকার অন্য এক বর্ণনায় কবি তাহার চাপা সুখের আবেশ ফুটাইতে পারিয়াছেন। নায়িকা বাল্যসখীকে বলিতেছে,—অঙ্গনে পাকুড় গাছ আছে, পটুয়া আসিল, তাহাকে কাঁচুলি বুনিয়া দিতে বলিলে পটুয়া মূল্য চাহিল। নাগরিকা বলিল, রাত্রে (রাত্রেই, নিশ্চয় অন্য সময়ে নয়!) খাইবার জন্য লাড্ডু দিব। সেই কাঁচুলি পরিয়া হাটে গেল, চোর কাঁচুলি (অন্য জিনিস ছাড়িয়া) পরীক্ষা করিতে লাগিল (২০৫)। বক্তব্য ইঙ্গিতে কথিত, ইঙ্গিত দুর্বোধ্য নয়।

স্বামীর দীর্ঘ বিদেশবাসকে নারীর পদস্খলনের স্বভাবিক কারণ বলিয়া কবি স্বীকার করেন। সহানুভূতিও বোধ করেন। 'প্রোষিতভর্তৃকা ও পথিক' শ্রেণীর বেশ কয়েকটি পদ তাঁহার আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতি এই

সকল পদে অনুগত কবি। প্রোষিতভর্তৃকার অপরিতৃপ্ত জীবন, কামপীড়ন, এবং পথিকের সাহায্যে জ্বালানিবারণের চেষ্টা প্রচুর সংস্কৃত-প্রাকৃত শ্লোকের উপজীব্য। হাল অমরু-শৃঙ্গারতিলকের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। তাহাদের সঙ্গে বিদ্যাপতির আলোচ্য পদগুলির ঐক্য প্রায় আক্ষরিক। তথাপি প্রচেষ্টা হিসাবে ইহা প্রশংসনীয়—বাস্তবতাসৃষ্টির এই প্রয়াস। এখানে রাজসভাশ্রিত কবিরূপে তিনি কামকাব্য রচনা করিতেছেন একথা সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে স্বীকার এবং জীবনের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-তাগিদকে মূল্যদানের একটা মনোভাব কি কবির মধ্যে লক্ষ্য করি না?

পদগুলি হইতে চমৎকার নাটকীয় চিত্রক্রম পাওয়া যায়।

প্রোষিতভর্তৃকা,—এখন যৌবনপ্রাপ্তা নায়িকা। একদিকে কামের তাগিদ, অন্যদিকে সমাজনিন্দার ভয়ে সে উদ্‌ভ্রান্ত। এই দ্বন্দ্বে ইতিমধ্যেই কামনার জয় হইয়াছে, 'আঁধারের সিঁদ' সুরু হইয়াছে, তবু ভয় যাইতে চায় না। লোভে ভয়ে দোলায়িত মনশ্চাঞ্চল্যের চিত্র:—

"আমার উচিত বয়স, মন্মথ চোরের মত অর্গল ঠেলিয়া আকর্ষণ করিতেছে; পতি বার বছর পরে ফিরিবে বলিয়া গিয়াছে; তার মধ্যে চার বছর অতীত।…শাশুড়ী ননদ নাই, অথচ সমাজ আছে। তাহাকে অন্য পাঁচ সাত বাড়ী যাইবার কথা বলিয়া দিলাম।… আঁধারের সিঁদ সত্য লুকাইব। প্রতিবেশিনী না হইলে প্রতিকূল দিবে" (৫৮৬)

সাধারণভাবে প্রোষিতভর্তৃকার হৃদয়ে চাঞ্চল্যসৃষ্টি অনেক পথিকই করে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষভাবে করিয়াছে একজন পথিক:—

নিজের ঘরে বিস্রস্ত বসনে বসিয়াছিলাম। ঘরে অন্য কেহ নাই। এমন সময়ে অতিথি আসিল। এদিকে দেবতা বর্ষণ করিতে লাগিল। কে জানে দুষ্ট প্রতিবেশিনী কি বলিবে— বলিবার সুযোগ পাইয়াছে! ঘর অন্ধকার; অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে, দিনও রাত্রির মত বোধ হইতেছে, কি বা বলিব, কে আমাকে বিশ্বাস করিবে।" (৫৮৭)

নিজ সতীত্বের নাম রক্ষায় নায়িকার বাহ্য উৎকণ্ঠার চমৎকার চিত্র। নায়িকার নিজের পক্ষে ওকালতিতে কিন্তু প্রত্যয়ের অভাব আছে,—তাহার স্বভাবগত দুর্বলতা ইঙ্গিতে ফুটাইতে কবি নায়িকার কথায় প্রত্যয়ের অভাব আনিয়াছেন। 'কে আমাকে বিশ্বাস করিবে'—এই জিজ্ঞাসা—'কেহ বিশ্বাস করিবেনা'—এই প্রত্যাশিত আশঙ্কায় সমাপ্ত। সত্যই কি নায়িকা বিশ্বাস করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল?

প্রোষিতভর্তৃকা আভ্যন্তর তাড়না সত্ত্বেও প্রথমাবধি নষ্টচরিত্র নয়। সখী পরগমনে প্রলুব্ধ করিলে তাহার মর্যাদাদীপ্ত একদা-প্রত্যাখ্যান চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। সে দূতীকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছে,—"প্রিয় প্রবাসে, তোমার নিকট আশা, সেইজন্য কি অন্য কথা বলিতেছ? যে রক্ষক, সেই দাহক হইলে অপরে কি বলিবে? সজনি,...প্রথমে তুমি (আমার) হস্ত আনিয়া প্রিয়তমের হস্তে অর্পণ করিলে। এখন কুলভ্রষ্টা হইয়া যদি প্রেম বাড়াই, জীবনে কি কাজ? এক তিলের জন্য রঙ্গসুখ আনন্দ পাইব, জীবন ভরিয়া লজ্জা রহিবে।" (৪৬)

উদ্ধৃত অংশে কুলকামিনীটি একটি মারাত্মক সত্যকে স্বীকার করিয়াছে, —স্বীকার করিয়াছে যে, অন্যাসক্তা হইলে সে 'রঙ্গ ও সুখ' পাইবে। তবে পাপের শ্বাসে সে সুখ অচিরকালে শুকাইয়া যাইবে একথাও সে জানে। এই দ্বিতীয় ভীতির জন্য সে তাহার সখীকেই শুধু গঞ্জনা দেয় নাই, আশ্রয়-প্রার্থী পথিককেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,—

আমি একাকিনী, প্রিয়তম গ্রামে নাই, সেইজন্য স্থান দিতে আমার দ্বিধা হইতেছে; যদি কেহ পড়শী কাছে থাকিত, স্থান দেওয়াইতাম। যাও যাও পথিক, পথের মধ্যে যাও, বাস করিবার নগর খুঁজিয়া অন্যত্র যাও। দূর-প্রান্তর, সন্ধ্যার সময় সমাগত, তোমাকে পর-দেশবাসী অভ্যাগত দেখিতেছি।"—(৫৮৪)

যে সন্ধ্যায় নায়িকা পথিককে এইভাবে বিমুখ করিয়াছিল, সে সন্ধ্যাটি ছিল মেঘবর্ষী, বজ্রধ্বনিত, ভয়ঙ্কর;—নায়িকা জানে পথিক বাহির হইলে তাহার জীবনান্তের নিশ্চিত সম্ভাবনা, তবু সে স্থিরচিত্ত। কিন্তু কি জানি কেন, কবির বিশ্বাস অন্যরূপ। কবি পূর্বোদ্ধৃত পদের ভণিতায় বলিয়াছেন, —"নাগরীর রীতি ছলযুক্ত কথায় প্রীতি উৎপাদন করে।" আমরা কবির সমালোচনা করিয়া বলিব, পদের মধ্যে নায়িকার কথায় ছলনার আভাস নাই।

ছলনা অন্যত্র মেলে। সেরূপ কয়েকটি পদ আছে। যেমন, পরকীয়া ও পথিকের সংলাপগত রসবিনিময় যে পদের বিষয়বস্তু:—

পথিক। সুন্দরি, তুমি সুবুদ্ধি ও চতুরা, পিপাসায় মরি, জলপান করাও।

পরকীয়া। তুমি কে, কাহার কুল জানি না, পরিচয় বিনা আসন ও পানীয় দিব না।

পথিক। আমি পথিকজন, রাজার কুমার, স্ত্রীবিয়োগে সংসারে ভ্রমণ করিতেছি।

পরকীয়া। এস, বস, জলপান কর, তুমি যাহা খুঁজিবে, আনিয়া দিব। আমার শ্বশুর ও ভাসুর বিদেশে, স্বামী তাহাদের উদ্দেশে গিয়াছেন। ঘরে শাশুড়ি অন্ধ। আমার বালক পুত্র, কথা বোঝে না।" (৫৯০)

বর্ণনার নাটকীয়তা লক্ষ্য করিবার মতো। নাগরিকাটি কিরূপ অধৈর্য! পথিককে দেখিয়াই কি করিবে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দু' একটি সংযত প্রশ্নোত্তরেরও বুঝি প্রয়োজন আছে। যখনি সে পথিকের পরিচয় শুনিল (সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের কি প্রয়োজন, যেখানে আবার লোভনীয় পরিচয়—ওগো মা রাজার দুলাল!),—তখনই সব সংযম হারাইয়া জলপান করাইবে তো জানাইল, উপরন্তু আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্যও ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিল,—শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী বিদেশে, শাশুড়ী অন্ধ, পুত্র অতি শিশু, ইত্যাদি! কামাতুরার গোটা চিত্রটি এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত।

পরকীয়াদের মধ্যে সৌভাগ্যবতীরা শাশুড়ী-ননদীহীনা হয়। যাহাদের ও বালাই আছে, তাহাদের চলিতে হয় সাবধানে; ননদিনীকে বুঝাইতে হয় যে, পথিককে ডাক দিবার মূল কারণ বিদেশবাসী স্বামীর সংবাদ-সংগ্রহের ইচ্ছা, যদিও অতখানি উৎসাহ ননদিনীর অপছন্দ (৫৮২)। এমন পদ আছে, যেখানে শাশুড়ীর পাশে শুইয়াও নায়িকা নায়ককে সন্তর্পণে সঙ্গ দিতেছে (৭০০)।* কিন্তু কবি সাধারণভাবে ননদিনীকে সরাইয়া, শাশুড়ীকে রাতকানা ও বধির করিয়া, স্বামীকে বিদেশে পাঠাইয়া, নিকটে কোনো প্রতিবেশীকে না রাখিয়া, পরকীয়াকে সুযোগ দিতে ভালবাসেন। সেখানে নাগরিকা পথিককে পরিষ্কার ইঙ্গিত করে। ক্লান্ত পথিকের বিপজ্জনক নিদ্রাকর্ষণের বিরুদ্ধে তাহার কী স্বার্থহীন উপদেশবর্ষণ!—"পথিক জাগিয়া থাক, নিদ্রায় যেন বিভোর হইও না, রাত্রি আঁধার, গ্রামে বড় চোর, কোটাল

---

* "শাশুড়ি কোলে আগলাইয়া ঘুমায়, তাহাতে রতি-শঠ চুপিচুপি পৃষ্ঠে থাকে। কত প্রকার সঙ্কেত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চাহে, আজিকার চাতুরী থাকে কি যায়। হে অবোধ-নাথ, আর্তি করিও না, এখন কথা কহা যায় না। পৃষ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া কত সুখ পাইবে? জলের তৃষ্ণা কি দুধে মেটে? আমার মুখ ফিরাইয়া কত চুম্বন করিল নিঃশব্দে, ব্যস্ত কুচে হাত দিল" ইত্যাদি (৭০০)। বিদ্যাপতির এই পদ পদকল্পতরু ও কীর্তনানন্দ হইতে সংকলিত। সুতরাং বাংলাদেশের বৈষ্ণব-আধ্যাত্মিকতাও বিদ্যাপতির প্রেমের 'নাগর'-স্বভাবকে মুছিতে পারে নাই।

ভ্রমেও পাহারা দেয় না, কেহ কাহারও বিচার করে না, রাজা অপরাধীর শাস্তি করে না (৫০৩)।

এতেও যদি পথিকের জ্ঞানোদয় না হয়, তবে শেষ উপায় থাকে, খোলাখুলি আমন্ত্রণ। তেমন আমন্ত্রণমূলক দুইটি পদের উল্লেখ সর্বশেষে এই প্রসঙ্গে করা চলে। পদ দুইটিতে লালসাতুর নারীর প্রলোভনছলনার চিত্র। প্রথম পদে নষ্ট নারীটির ইঙ্গিতের ভাষা তাহার দেহপিপাসার বিপুল পরিমাণকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে,—

"সন্ধ্যায় কমলদল মুদিত, ভ্রমর ও পাখীরা প্রত্যাবৃত্ত। হে পথিক, নিজের মন স্থির কর, (অন্য) গ্রাম বড় দূর, মধ্যে প্রকাণ্ড প্রান্তর; আমার ননদ গোঁসা করিয়া আছে, স্বামী বিদেশে, শাশুড়ী কাছের জিনিস ভালো করিয়া দেখিতে পার না। সমাজ নিঠুর—এত উদাসীন যে আমার খোঁজ লয় না। এর চেয়ে আর বেশী কি বলিব? চারু চন্দন, চম্পক, ঘন চামর, অগুরু কুঙ্কুমের গন্ধে গৃহ সুবাসিত। পরিমল লোভে পথিক নিত্য ঘোরা-ফেরা করে, তাহাদের সঙ্গে ঔদাসীন্যপূর্ণ কথা বলি না।" (১৮)

ইঙ্গিতের এই ভাষার চেয়ে স্পষ্ট ভাষা সম্ভব? আমন্ত্রণের উপন্যাস বিদ্যাপতি অনেক পূর্বে লিখিয়া গিয়াছেন। ভ্রষ্টা নারীর প্রতি কবির সহানুভূতির অভাব নাই,—"বিদ্যাপতি বলেন, হে পথিক, কথা শোন, মনে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ।"

তবু এখনো ইঙ্গিত, একটা আবরণ অন্ততঃ আছে, একটা কাব্যিক এবং সৌন্দর্যরসসিক্ত পরিবেশের ব্যঞ্জনা। কিন্তু নায়িকা একসময় সে দুর্বলতাও দূর করিবে, সব ছিঁড়িয়া মুক্ত কামনায় ডাক দিবে,—

"এইখানের ছায়া বড় শীতল...আমি একলা আছি, প্রিয় দেশান্তরে, দুর্জনের এখানে নামও শোনা যায় না। পথিক, এখনো তোমার চক্ষুলজ্জা দেখিতেছি। এখানে বিক্রির জিনিস কিছু দুর্মূল্য নয়।...ঘরে শাশুড়ী নাই, পরিজন যা আছে সব পর, ননদিনী স্বভাবে সরলা। এত অধিক সুযোগ থাকিতে যদি বিমুখ হও, তবে আমার আয়ত্তের বাহিরে। (৫৮৯)

লৌকিক প্রেমে দূতী-প্রয়াস

সাধারণ প্রেমের দুই রূপ দেখিলাম—সাধারণী-কুটনী এবং প্রোষিত-ভর্তৃকা-পরকীয়ার প্রেম। এরপর আসে দূতীর কথা।

নিষিদ্ধ প্রেমে দূতীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজদৃষ্টির অন্তরালবর্তী প্রেমে

বঞ্চনা ও ব্যর্থতার বড় সম্ভাবনা। অবৈধ অন্ধকার প্রেম চালাইতে হইলে এমন সহায়তার প্রয়োজন, যাহা অন্ধকার পথে হাত ধরিবে এবং বেদনা-নিশায় আশাদীপ জ্বালিবে। পরকীয়া প্রেম হৃদয়তাড়িত ও দূতীচালিত।

দূতী বা সখীর প্রয়াসের রূপ অজস্র, সব পর্যায়েই তার বিস্তৃত পরিচয় আছে। তবে সে প্রয়াসকে মূল দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রবর্তনা ও নিবারণ। দূতী আগাইয়া দিবে এবং দূতী টানিয়া রাখিবে। প্রেরণ ও সংবরণ দুইয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু একই—মিলনকে সম্ভব এবং মিলনসুখকে চরম করা। অভিসার ও মিলন পর্যায়ে দেখা যায়, দূতী কিভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যস্থতা করিতেছে, কিভাবে কখনো কুঞ্জপথে, কখনো বা শয্যাপীঠে নায়িকাকে ঠেলিয়া দিতেছে। ইহাকে বলিব দূতী-চেষ্টার প্রবর্তনারূপ।

দূতী নায়িকাকে (কচিৎ নায়ককে) নিবারণও করিয়াছে। নিবারণের একটা কারণ সমাজভীতি। দূতী 'সমাজসচেতন', নায়িকার শুভাশুভের প্রতি তাহার সতর্কদৃষ্টি—ফলে, বহুসময় রজনীশেষে অনিচ্ছুক নায়ককে তাড়াইয়া আচ্ছন্ন নায়িকাকে টানিয়া আনিতে হয়। পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে দূতী নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সজ্ঞান: তাই নিজের বিরুদ্ধে সমাজ-ভ্রূকুটিকে সে ভয়ও করে। তা ছাড়া আরো একটি ব্যাপারে বিদ্যাপতি দূতীকে নিবৃত্তিমার্গীয়া দেখাইয়াছেন—বালিকার উপর বিদগ্ধ পৌরুষের বাড়াবাড়ি অত্যাচারের ক্ষেত্রে। মুগ্ধামন্থন যখন সীমাতিরেকী, তখন দূতী প্রতিবাদী।

দূতীর সর্বাপেক্ষা মহৎ ভূমিকা বিরহ পর্যায়ে। দূতী সেখানে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিরহিণীকে শান্তি দিতে। অবৈধ প্রেমের নিমিত্ত আমি,—এ গ্লানি দূতীর মনে জাগিয়া আছে। এই কামপুরোহিত যখন বিসর্জনরাত্রে শান্তিবারি ঢালিয়াও শান্তি আনিতে অসমর্থ হয়, তখন নায়িকার প্রিয়শূন্য মন্দিরের হাহাকার নিজের উপর তুলিয়া লইয়া সে নিরুপায়ভাবে ঘরে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে থাকে।

দূতী-চেষ্টার নানাপ্রকার রূপের দু'একটি লক্ষ্য করা চলে। অনেকগুলি পদে দূতী নায়িকাকে কামের পাঠপ্রদান করিয়াছে। নায়ক-সমাগমে কি আচরণ বিধেয়, সেই উপদেশ। ঈষৎ প্রলোভনের ও সামান্য প্রত্যাখ্যানের বয়নে কিভাবে নায়ককে কামফাঁসে বাঁধিতে হয়, তারই সুচারু নির্দেশ।

নায়িকাকে আপাত-নিবারণের যে উপদেশ দিয়াছে, তার উদ্দেশ্য,

বাঁধের ছলনায় বল্লাকে মাতাল করা। কোন্ কোন্ বিপরীত আচরণ করিলে নায়ক পাগল হইয়া উঠিবে, সেই প্রার্থিত পাগলামি সহিতে কিরূপ সুখ—নায়িকাকে দূতী সমস্তই খুলিয়া বলিয়াছে। এই জাতীয় উপদেশ শৃঙ্গারশাস্ত্রে কুটনী মাতা তাহার কন্যাকে দিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পদ রচনায় বিদ্যাপতির মৌলিকতা সীমাবদ্ধ। এগুলি শৃঙ্গারশাস্ত্র হইতে প্রায় হুবহু অনূদিত। নিছক বাংলা দেশে প্রাপ্ত পদেও সখীমুখে রাধিকা এই ধরনের উপদেশ পাইয়াছেন।

ইহাতে প্রমাণ হয়, লৌকিক নায়ক নায়িকাই বিদ্যাপতির পদে রাধাকৃষ্ণ নাম লইয়াছে। যা হউক, কামশাস্ত্রের সাধারণ বর্ণনাকে গ্রহণ-বর্জন করিয়া, উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপন করিয়া, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের অতিরিক্ত সংযোগের সাহায্যে বিদ্যাপতি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা একজাতীয় কাব্যচেষ্টার সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই ধরনের অনেকগুলি পদের মধ্যে নমুনারূপে মাত্র একটিকে গ্রহণ করিতেছি,—

"কুন্দ যেমন ভ্রমরকে মিলনের জন্য আহ্বান করে, তেমনি তুমি নয়নে অনঙ্গকে জাগাইবে। অঙ্গের ভঙ্গিদ্বারা আশা দিয়া অনুরাগ বাড়াইবে। সুন্দরি, কিছু উপদেশ লও······কিছু নাগরীপণা বলিতে চাই। কণ্ঠে কোকিলের কূজনতুল্য স্বর করিবে,······মুখে মধুর হাসি আনিবে, কিছুক্ষণের জন্য লজ্জা ত্যাগ করিবে। গাঢ় আলিঙ্গনের সময় এমন ভাণ করিবে যেন তুমি কাতর হইয়াছ। রাগ করিবে, আবার প্রবোধ মানিবে—কিছুক্ষণের জন্য মান ত্যাগ করিবে। মুকুলিত লোচনে নায়ককে দেখিয়া লইয়া নিজ অঙ্গেও ঘাম হইয়াছে দেখাইবে। প্রিয়কে নখাঘাত করিয়া মণিবন্ধ ছাড়াইয়া লইবে।···মন্মথের যে যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই যুদ্ধের কথাবার্তা বলিয়া যে আবার (যুদ্ধে) প্রবৃত্ত করাইতে পারে, যে ভাব শেষ হইয়াছে, তাহাকে যে ফিরাইয়া আনিতে পারে, সেই কলাবতী নারী।"(৮২)

প্রণয় যে কলা, তাহা যে শিক্ষা করিতে হয়, যে শিক্ষা দেয়, সে যে কেবল দেহতত্ত্বে নয়, মনস্তত্ত্বেও পরিপক্ব, বিদ্যাপতি মনস্তত্ত্বশাস্ত্রের বাহিরে কাব্যেই তাহা জানাইয়াছেন। এই ধরনের যে কয়টি পদ আছে, সেগুলিতে প্রায় একই প্রকারের দেহমনোমিশ্র ইন্দ্রিয়রাগ। আমাদের বিশেষ বিস্মিত করিয়াছে বিদ্যাপতির একটি মন্তব্য। মন্তব্যটি একালের দেহ-দেববাদীদের অত্যন্ত খুশী করিবে, এবং সেকালের বৈষ্ণব মানুষকে খুসী করিয়াছিল, যাহারা অমরু কবির মতই 'দেহেরি সীমায় চেতনার শেষ' ভাবিতে

উৎসাহিত ছিল। অপরিসীম সাহসের সঙ্গে বিদ্যাপতি দূতীর মুখে বলাইয়াছেন, (নিশ্চয় অমরু ছাড়াও এরূপ মন্তব্যে তাঁহার আরো পূর্বসূরী আছেন)—

পরম পদ লাভ সম যোদে চির হৃদয় রম
নাগরী সুরতসুখ অমিয় মেলা। (১১১)

"পরম পদ লাভতুল্য আনন্দিত হৃদয়ে চিরকাল রমণ কর। হে নাগরি, সুরত-সুখ অমৃত-তুল্য।"

এই পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, বা এটি সহজিয়া পদ নয়, সুতরাং এই মিলনসুখকে আধ্যাত্মিক ভাবিবার কোনো কারণ নাই। বিদ্যাপতি লৌকিক দেহমিলন সম্বন্ধেই উপরিউক্ত মন্তব্য করাইয়াছেন। কবি নিজ মনোভাব গোপন করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি প্ররোচনা ও নিবারণ, দূতী-চেষ্টা এই দুই জাতীয়। দুইয়েরই উদ্দেশ্য এক—নায়ক-নায়িকার মিলন। কয়েকটি পদে দূতীর নিবারণ-চেষ্টার রূপ দেখিয়া আমাদের সংশয় হয়, বাধাদানের দ্বারা উচ্ছ্বসিত করাই কি সর্বক্ষেত্রে দূতীর উদ্দেশ্য ছিল? নায়কের অসাধু স্বভাবের কথা বলিয়া যেখানে দূতী নায়িকাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, আমরা সে সকল অংশের কথা বলিতেছি না, কারণ তেমন ক্ষেত্রে নায়ক সাধুস্বভাব হইলেই সব ঠিক হইয়া যায়। আমাদের বক্তব্য, দুই একটি ক্ষেত্রে দূতী সত্যই পরকীয়া প্রেমের বিপক্ষে, সংসারধর্মের পক্ষে, প্রচার করিয়াছে। কামবর্ধনের উপদেশদাত্রী এবং সংসারধর্মের পক্ষপাতী—উভয় দূতী কি একই দূতী? আমরা ঠিক উত্তর জানি না। তবে, সংসারধর্মের সপক্ষতা করার সময় দূতী আর প্রচলিত দূতী থাকে না, সখী হইয়া পড়ে, কারণ দূতী-ব্যবসায়ে লোকধর্মই পণ্যপদার্থ। যা হউক, লোকধর্মের পক্ষে দূতীর বক্তব্য এই ধরনের :—

(ক) বিদ্যুতের রেখার মত সুন্দর দেহ গগনমণ্ডলেই শোভা পায় (অর্থাৎ নিম্নগামী যেন না হয়)। (২৫০)

(খ) সুরতসুখ নিমেষের জন্য, কিন্তু লোকাপবাদ বা উপহাস সারাজীবন থাকে (ঐ)।

(গ) স্থির বক্তব্যকে ত্যাগ করিয়া যে অস্থিরের প্রতি মন দেয়, তাহার তুলনা দেওয়া যায় সেই লোকের সঙ্গে যে ঘর ছাড়িয়া সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে। (২৫৯)

এই জাতীয় উপদেশ বিক্ষিপ্তভাবে অন্যত্র মিলিলেও দূতী মূলতঃ পরকীয়াপন্থী কোনো সন্দেহ নাই। কামবর্ধনের উপদেশ শেষ করার পর দূতী বলিয়াছিল,—'আমি আর কি রসরঙ্গ শিখাইব, অনঙ্গ নিজেই গুরু হইয়া বলিবে' (২৭০)। অতি যথার্থ কথা ; তবু অনঙ্গের অন্যতম দেহধারী অনুচরী যেহেতু দূতী, সে বিবিধ প্রকারে অনঙ্গপ্রকরণ অভ্যাস করাইবেই। প্রথমতঃ সে "চোরী প্রেমের" হাজার গুণগান করে, তারপর কামবর্ধন উপদেশ দেয়, তারপর সংবাদ-বিনিময় করে, নায়কের অবস্থার কথা বলে নায়িকাকে এবং নায়িকার কথা নায়ককে ; উভয়পক্ষের রূপগুণের বর্ণনায় মুক্তকণ্ঠ হয় ; প্রেমোৎকণ্ঠায় একপক্ষ কিরূপ বিপর্যস্ত তাহার মর্মান্তিক চিত্র আঁকে অন্য পক্ষের কাছে ; যদি একপক্ষের দোষ থাকে, অন্যপক্ষের নিকট দোষ গোপন করিয়া অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে ; তাহাতেও সুবিধা না হইলে অবাধ্য নায়ক বা নায়িকাকে কটূক্তিতে বিদ্ধ করিয়া চৈতন্যোদয়ে সচেষ্ট হয়, অর্থাৎ কিছু করিতে বাকি রাখে না। এইরূপ দূতী-চেষ্টার এক পবিত্র মহৎ রূপ বিদ্যাপতির ত্যাগশুদ্ধ পদগুলিতে মেলে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-পদাবলীতে তাহার পরাকাষ্ঠা। বর্তমানে সে উন্নত প্রেম আমাদের আলোচ্য নয় বলিয়া, এখানে মিলনের প্রবোচনামূলক সামান্য কিছু সখী-উক্তি চয়ন করিতেছি—

(১) "হে সখি, অন্য ভাবনা ত্যাগ কর, যে বনকেই হস্তী স্থির কর। যদি মদন-মদ-জলে উন্মত্ত হয়, প্রিয়তম অঙ্কুশ লাগাইয়া ধরিবে।" (২৫২)

(২) "ভ্রমর সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। মালতি। তোমা বিনা বিশ্রাম লাভ করে না। রসবতী মালতীকে বারবার দেখিয়া, জীবন উপেক্ষা করিয়া, রসপান করিতে চায়। সে মধুজীবী, তুই মধুবাশি ! মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিস, মনে লজ্জা হয় না ? (২৫৩)

(৩) "যখন প্রথম যৌবন আসিল, তখন গুণগ্রাহক আসিলেও পরে কাটাইলে। যৌবন একবার চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসেনা, কেবল পশ্চাত্তাপ থাকে। সুন্দরি ! মন দিয়া শোন ! তোমার মত আমিও দিন দশেক যুবতী ছিলাম বলিয়া আমার মনে হয়। যৌবন ও রূপ ততদিনই শোভা পায়, মদন যতদিন তার অধিকারী থাকে।" (২৬০)

(৪) তৃণ এবং তুলা—তাহা হইতেও লঘু হইয়া তুমি আপনাকে ভারী মনে করিতেছ। ...সজনি, এমনি তোর জ্ঞান। যৌবনরত্ন তোর নিজের অধীন, কেন দান করিল না ? যাবৎ যৌবন নিজের অধীন, তাবৎ পর বশীভূত। যৌবন গেলে বিপদ হইলে কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না। এই পৃথিবীতে অর্ধজীবন অনিশ্চিত, যৌবন অল্পকাল স্থায়ী। ইহাতে

যাহারা বিলাস না করে, তাহাদের হৃদয়ে শেল থাকে। ধনি, তোর ধন তোরই থাকিবে, অপরে নির্ধন হইবে।"(—২৩২)

অর্থাৎ যৌবন। জীবনের পরম ধন। "ধন-যৌবন-পুত্র-পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে"—একথা এখনো বহুদূর। এই যৌবন-প্রদর্শনীতে আধ্যাত্মিক শালগ্রাম অন্বেষণ না করাই ভাল। এখন 'যুবজন হৃদয়-বিদারণ মনসিজ'-রূপ যৌবনশর, এখন 'রূপযৌবন উপঢৌকন' লইয়া, 'বাহারে চীনাংশুকে' অঙ্গ ঢাকিয়া কন্যার আগমন। এখন স্তনশঙ্খ ওষ্ঠে লইয়া বিজয়ী মদনকুমারের জয়নির্ঘোষ। তার মানে—জয় জয় যৌবন। দূতী এই যৌবনের সেবাদাসী।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে দূতী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে, আমারও একদিন যৌবন ছিল। বিদ্যাপতি এই কথাটিকে ভুলিতে পারেন নাই। দূতীরও যে যৌবন ছিল, অন্ততঃ দুইটি পদে তাহা প্রমাণসহ জানাইয়াছেন। দূতী-প্রসঙ্গে সেই দুই পদই সর্বশেষে আলোচ্য।

চৈতন্যোত্তরকালে দূতী খোলস ছাড়িয়া সখী হইয়াছে। গোপিগণই রাধার সখী। কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকারূপিণী সখিগণ তখন স্বভাবে 'অকথ্যকথন'—কারণ তাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গে স্বয়ং মিলনাভিলাষী নন, রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে মিলন-সংঘটন করাইতে পারিলে তাঁহাদের কোটিগুণ অধিক সুখ। বিদ্যাপতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের পূর্ববর্তী, তাঁহার রাধাকৃষ্ণও অনেকাংশে লৌকিক নায়ক-নায়িকা। যে-সকল পদে আবার রাধা-কৃষ্ণের নাম পর্যন্ত নাই, সেখানে তিনি কি পরিমাণে নিরঙ্কুশ, না বলিলেও চলে। ৮৩ ও ৮৪ সংখ্যক পদ রাধাকৃষ্ণ চিহ্নিত নয়। ঐ দুই পদে বহুবল্লভ নায়কের নিকট দূতীয়ালী করিতে গিয়া দূতী যদি নিজের স্বার্থরক্ষায় কিছু বেশী মন দেয়, আমরা যেন চমকিত না হই। দূতীর আচরণে মানবিক অনৌচিত্য। দূতীরও রক্তমাংসের শরীর।

৮৩ সংখ্যক পদে, প্রেরিত দূতী নায়ক-সম্ভোগ করাতে নায়িকার অন্য এক সখী আসিয়া নায়িকার কাছে দূতীর বিরুদ্ধে গরলবর্ষণ করিতেছে (ঈর্ষায়?),—

"তুমি বিড়ালকে দুধ রক্ষার ভার দিয়াছ; দুধ পড়িয়া গেল;...সে সারারাত সুখে খাইয়া কাটাইল। এখনো তুমি সাবধান হও।...মাছ কাপড়ে বাঁধিয়া তেলে ছাড়িয়াছ,

বিড়াল তাহা সুখে রাত্র দিন দুই বেলা খাইল। বদ্ধ ঘরে অন্য সকলকে ছাড়িয়া ইঁদুরকে রক্ষক রাখিয়াছ···রেশমী শাড়ী রাখিয়াছ, মূষিক উহা টুকরা টুকরা করিয়া···।" ইত্যাদি।

৮৪ পদের বিষয়বস্তু হইল বিশ্বাসঘাতিনী ভোগক্ষত দূতীর নিকট নায়িকার ক্ষুব্ধ প্রশ্ন, তদুত্তরে বচনকৌশলে দূতীর আত্মসমর্থনের চেষ্টা, ননদিনীর নিকট যে ধরনের চেষ্টায় স্বয়ং রাধিকা অভ্যস্ত :—

"দূতি। সত্য করিয়া বলো, আমি নিজের কাজে তোমাকে সাজাইয়া পাঠাইলাম। মুখের তাম্বূল দিয়া অধর সুরঞ্জিত করিয়া পাঠাইলাম, তাহা কেন ধূসর হইল?

—তোমার গুণ বলিতে রসনা চালাইতে হইল, তাই মুখ মলিন হইয়া গেল।

আমি নিজের হাতে তোমার সিঁথি সাজাইলাম, তাহা এমন বিশ্রী হইল কিরূপে?

—তোমার জন্য (নায়কের) পায়ে পড়িতে হইল, তাই কেশ আলুথালু হইল।

বিনাশ্রমে তোমার বুক ধকধক করিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ?

—তোমার কথা তাহাকে বলিয়া, তাহার কথা তোমাকে বলিতে তাড়াতাড়ি আসিতে হইয়াছে।

নিজের বসন দিয়া, তাহার বসন লইয়া আসিলে—এ তোমার কেমন ব্যবহার?

—গিয়াছিলাম কিনা তাহা তোমাকে দেখাইবার জন্য তাহার বস্ত্র আনিয়াছি।" (৮৪)

দূতীর স্বভাব-পরিচয় এখানে শেষ করিলে কিন্তু খুবই অন্যায় হইবে। বিশ্বাসনাশের পরিবর্তে বিশ্বাসসঞ্চারেই দূতীর মুখ্য প্রয়াস। লৌকিক দূতীর হৃদয়বত্তার একটি চিত্র এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে তাই তুলিতেছি ;—নায়ক কর্তৃক নায়িকার প্রত্যাখ্যান দেখিয়া দূতীর কাতরোক্তি—কথাগুলি বড় করুণ,—

"পরের নারীকে কত কঠিন দুস্তর উত্তীর্ণ করাইয়া আনিলাম। তোমার পক্ষে সেখানে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সে সুকুমারী এখন কোথায় ফিরিয়া যাইবে?"— (৪৫৭)

রাধা-কৃষ্ণের পার্থিব প্রেম

লৌকিক প্রেমের শেষ রূপ দেখাইতে রাধাকৃষ্ণমূলক কিছু পদ গ্রহণ করিব। আমাদের আলোচনার পক্ষে এই অংশের গুরুত্ব আছে। বহুবার বলিয়াছি, বিদ্যাপতির নিকট রাধাকৃষ্ণ লৌকিক নায়ক-নায়িকার নামান্তর ছিল এবং তিনি শৃঙ্গাররসের পরিস্ফুটনের জন্য রাধাকৃষ্ণকে চরিত্ররূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমাদের এই বক্তব্যের প্রমাণরূপে যদি সুসভ্য নাগরিক প্রেমের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্ররূপে রাধা ও কৃষ্ণকে উপস্থাপিত

করি, তাহা হইলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ইহাতে কিছুই প্রমাণ হইল না। কেননা রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে নাগরিক প্রেমকলার বিকাশ কবি নিশ্চয় দেখাইবেন, যেখানে তিনি রাধাকৃষ্ণকে দেবদেবী ভাবিতেছেন, সেখানেও। রাধাকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক ভাবেও প্রেমের দেবদেবী, তাঁহাদের প্রেমস্বরূপ বুঝাইতে হইলে প্রেম-বৈদগ্ধ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশকে তাঁহাদের জীবনলগ্ন দেখাইতে হয়। এবং ঐ বৈদগ্ধ্যের ধারণা মানবপ্রেম হইতেই কবি পাইয়া থাকেন। তাই রাধাকৃষ্ণের উপর আরোপিত নাগরিক প্রেমকে আপাততঃ মানবিক মনে হইলেও তাহাকে যে কোনো মুহূর্তে আধ্যাত্মিক বলা চলিবে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরাও কৃষ্ণ রাধাকে বহুলাংশে বিদগ্ধ নায়ক-নায়িকা করিয়াছেন। তাই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কলানিপুণ নাগরিক প্রেম-প্রকৃতি দেখাইয়া রাধাকৃষ্ণকে লৌকিক মানবমানবীর নামান্তর প্রমাণ করা শক্ত হয়।

কিন্তু যদি ইতর প্রেমেও রাধা-কৃষ্ণ মানুষের সহযাত্রী হন? সেক্ষেত্রে মনে হয়, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের 'মানবীয়ত্বে' আমরা বিশ্বাস করিব। আর যাই হোক, ঐশ্বরিক প্রেমে ইতরতা নাই। বিদ্যাপতির পূর্বেই কৃষ্ণ ও রাধা কাব্যের দেবদেবী রূপে গৃহীত হইয়াছেন। অন্ততঃ তাঁহারা (যথা জয়দেবের কাব্যে) রসপ্রকৃষ্ট প্রেমের প্রতীক-চরিত্র।

রাধা সম্বন্ধে জয়দেবীয় মনোভাব—তিনি 'কোমল-কলাবতী-যুবতী।' চৈতন্যোত্তর কালে রাধা 'মহাভাবময়ী'। এই দুই বিশেষণে বিরোধ নাই—কলাবতী যুবতীই বৈষ্ণবকাব্যে মহাভাবময়ী। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণমূলক লৌকিক পদের দৃষ্টান্তরূপে প্রথমেই এহেন রাধাচরিত্রকে দেখা উচিত।

রাধা রূপে অসামান্যা—সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ রূপের অহঙ্কার কত কটু হইতে পারে বিদ্যাপতির পদে তাহার উদাহরণ আছে। আমি কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। নিজের রূপ-যৌবন লইয়া রাধার অসঙ্কুচিত অসংযত গর্ব, যাহাতে আত্মবিস্মরণের লেশমাত্র নাই,—

"মন্মথ আমার মুখকে রাহুভীত চন্দ্র মনে করিয়া সুধা রাখিয়া গিয়াছে, স্বভাবতঃই (আমার বড) রমণীর বঙ্কিম স্নেহ, আননে বঙ্কিম শশিরেখা, আমার ভ্রূভঙ্গিমা কি দেখিতেছ? মন্মথ নিজের ধনু দান করিয়া গেল। কন্দর্প আমার কুচকুম্ভ নির্মাণ করিল।"—(৫২)

এই মদগর্বিতা যুবতীর কৃষ্ণ-বিষয়ক ধারণা,—

".কাথায় আমার মত সুন্দরী, আর কোথায় গোয়ালা ।.. দীপের শিখা পবন সহে না ; মতি ছুঁইলেই মলিন হয় ।"—(৫৫)

"দাম পাঠাইয়াও ঘোল পায় না, খাবে ঘি চায় । থাকিবার জায়গা পায় না, খাইতে চায় । যে বসিতে বিচালী পায় না, সে শয্যার বিচার করে । ছেঁড়া মাদুর যার শয্যা, সে পালঙ্ক চায় "—(৭৬)

এই প্রগল্‌ভা নারী, যাহার নাম রাধা, 'মূর্খ কানাইকে' অবশ্য গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রে প্রেম ও মিলন কোনো সৌন্দর্যসঞ্চার করিতে পারে নাই । সখীসঙ্গে রাধা কুঞ্জগমন করিয়াছে, নিজের তখনকার সজ্জিত ও প্রসাধিত রূপ সম্বন্ধে রাধার দাবি,—

"(আমাকে) দেখিবা সকলের মনে কাম উপজিত হইল, মুনিরও চিত্ত স্থির রহিল না ।" (৮৮৯)

ভয়াবহ দাবি । দিব্য আনন্দের সহিত রাধিকা মুনিজনের ধ্যান ভাঙাইতেছে এবং অন্যের কামোদ্রেক করিতেছে ।

এই স্বাধীনা, কামশাস্ত্রের নায়িকা হইতে পারে, বৈষ্ণবকাব্যের আধ্যাত্মিক নায়িকা কদাপি নয় ।

এহেন রূপবতীর প্রেম-বিষয়ে ধারণা কিরূপ ? কিছু উদ্ধৃত করি :—

"অমূল্য রত্ন বেচিতে গিয়াছিলাম, বণিক (কানাই) চিহ্ন (রতিচিহ্ন) করিবা মূল্য কমাইল । হে সখি, সুলভ হইলাম । মূর্খ কাঁচ ও স্বর্ণ লইয়া গাঁথে ।"—(৩০১)

"সকল সংসারের সার সুরতরস আমার দোকানে আছে । দেখিও কানাই, যেন ছুঁইও না ।.. আমার সেবা দূর হইতে গ্রহণ কর, প্রথম বিক্রয় ধারে দিব না ।"—(৩৪১)

"হে মাধব, একই নগরে বাস কর, যেন বাটপাড়ি করিও না । কানাই আমার অঞ্চল ছাড়িয়া দাও, নূতন সাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে ।"—(৩৩২)

"সংসারের সার রসের প্রথম পসরা ; তোমায় দিয়াই কি প্রথম বউনি হইবে ? রবে (হে ভদ্রলোক, আপনি), জোর করিয়া আমার আঁচল ফিরাইয়া দিবে না, বা ফেলিয়া দিও না, রস (বক্ষস্থল) উদ্‌ঘাটিত হইবা যাইবে । হে হরি, হে হরি, আমার আর্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া পথের মধ্যে জোর করিও না । মদনের হাটে উচিত কাজই হয়,—যাহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার কি করিয়া বিক্রয় হইবে ? কাঞ্চনে গড়া সুন্দর পয়োধর আমাদের জীবনের আধার স্বরূপ । উহা রত্নের মতন, ছুঁইলে আর অধিক মূল্য থাকে না । উহা মূর্খ গেঁয়ো লোক কিনিতে পারে না ।"—(৩৪৩)

কী কুশ্রী, এমনকি সাধারণ প্রেম কবিতার পক্ষেও—আধ্যাত্মিক প্রেম তো দূরের কথা। রূপক ও অলঙ্কারগুলি নিরতিশয় অসুন্দর—দাম, দোকান, বউনি, বিক্রয়। এই জাতীয় পদ আরো আছে, উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই,—কিন্তু রাধাকৃষ্ণের নামোচ্চারণেই সর্বক্ষেত্রে বিদ্যাপতির চিত্তে ভাবাবেশ হইত না বুঝা যায়। পদগুলিতে রাধার মনোভাব ও আচরণে উচ্চভাবের লেশমাত্র নাই। এই রূপাভিমানী যুবতী নিজের দেহগর্বে অস্থির হইয়া কেবলই শরীরের পণ্যকে যাচাইয়া ও নাচাইয়া ফিরিয়াছে। মিলনের পূর্বেও সে মুগ্ধা মোটেই নয়, রীতিমত আত্মসচেতন এবং রসিকের নিকট নারীর অনাঘ্রাত যৌবনের মূল্য সে বেশ বোঝে। সে জানে, চঞ্চল পুরুষকে প্রথমাস্বাদনের লোভ-মূল্যেই কিছু সময়ের জন্য বাঁধিয়া রাখা যায়। একজন কুমারীর এই মানসিক পরিপকতা কিভাবে সম্ভব? যদি সম্ভবও হয়—অকাল-পকতায় অনেকের স্বাভাবিক অধিকার—সে নারী রাধা হয় কিরূপে?*

কৃষ্ণ সম্বন্ধে রাধার ধারণাও অনুরূপ। কৃষ্ণ যে অরসিক, গ্রাম্য, রাধার

---

* সবচেয়ে বিচিত্র কিন্তু পদগুলির ভণিতা। এতখানি স্থূল ভাবাত্মক পদের ভণিতা রীতিমত ভক্তিরসাত্মক। বিদ্যাপতি রাধাকে লৌকিক নায়িকার ইন্দ্রিয়সর্বস্বতা অন্যত্রও দিয়াছেন—রাজ-নামাঙ্কিত পদে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে—কিন্তু সেসকল ক্ষেত্রে কবির ভণিতা এমন ভক্তিরসপূর্ণ ছিল না, সেখানে ছিল চতুর মন্তব্যের মঙ্গলাসংযোগ। রাজনামাঙ্কিত পদের সঙ্গে এই রাজ-অনামাঙ্কিত পদ কয়টির বিষয়বস্তুতে পার্থক্য নাই, কিন্তু ভণিতায় আছে। এখানে ভণিতায় কৃষ্ণপদে সর্বসমর্পণে কবির আন্তরিক আহ্বান। তবে কি বুঝিব, বিদ্যাপতি যখন রাজার জন্য পদ লিখিতেছেন না, তখন কাব্যের প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়সেবী, কিন্তু ভণিতার মনোনিবেদনে ভক্তস্বভাব? আমরা সিদ্ধান্ত করিতে অপরাগ। কেবল তিনটি ভণিতা পুনর্বার উদ্ধৃত করিতেছি,—"বিদ্যাপতি বলেন, হে নারী, হরির সাথে আবার ধার নগদের কথা কি?" (৩৪১);—"বিদ্যাপতি গাহিয়া বলেন, হে গুণবতী রমণি। শোন তুমি খুব বোকা, হরির সঙ্গে কিছু ভয় নাই" (৩৪২); —"বিদ্যাপতি বলেন, সুচেতনি শুন। হরির সহিত কেমন করিয়া সমান হইবে? ছলনা ত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা কর, যাহাতে অন্তিমকালে তাঁহার নিকট স্থান পাও" (৩৪২)। শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে হয়, রাধাকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সাধারণ ধর্মীয় আবেগ থাকিলেও বিদ্যাপতি জীবনের এই পর্যায়ে বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন না, এবং সেইজন্যই রাধার বক্তব্যে নিরতিশয় কটুতা আনিবার পরেই ভণিতায় পরোক্ষে অন্যায়স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। যথার্থ উন্নত ভক্তি সর্বাত্মক, তাহা যখন বর্তমান থাকে, তখন পদের বক্তব্য ও ভণিতার বক্তব্যে এমন পূর্ণ পার্থক্যসৃষ্টি হয় না।

মত নাগরী-উক্তার অনুপযুক্ত, একথা রাধা খুলিয়া বলিয়াছে বারবার। একদা বোধহয় রাধার রূপে কৃষ্ণ কিছু বেশী মুগ্ধ হইয়াছিল, অবিলম্বে রাধা তীক্ষ্ণ বচন শুনাইল,—"কানু, তুমি ভ্রূর শোভা কি দেখিতেছ, অনঙ্গ নিজে আমাকে (ভ্রূ-রূপ) ধনু সমর্পণ করিয়াছে। কামকাঞ্চন দিয়া কুচকুম্ভ নির্মাণ করিয়াছে, আলিঙ্গন দিতে গেলে ভাঙিয়া যাইবে ভয় হয়।……মন্মথ, রাহুর ভয়ে চাঁদ হইতে সুধা আনিয়া অধরে রাখিয়াছে; নিজের জীবনের মত যত্ন করিয়া রাখিলে সুধা তোমার নিকট থাকিবে। তুমি যেন (অধরসুধা) পান করিয়া ফেলিও না, চুরির দায়ে পড়িবে।"—(৩৪০)

হা কৃষ্ণ! এই নারী মুগ্ধা! কতখানি মুগ্ধতাহীন, কৃষ্ণবিষয়ে তাহার বয়ান শুনিলে বোঝা যায়:—

"আজ আমি গেঁয়ো লোকের সঙ্গে পড়িলাম। কীট কোথায় কুসুম-মকরন্দ পান করে?…বামনের মুখে কখনও পান শোভা পায় না। তাহার সঙ্গে কি করিয়া রসাল প্রেম হইতে পারে? বানরের গলায় কি মতির মালা শোভা পায়।"—(৭৮)

"সখি, বুঝিলাম কানাই মূর্খ, পিতলের তাড় কোন্ কাজে শোভা পায়, উপরে চকমকই সার।…পশুর মত সে জন্ম কাটাইল, সে রতিরঙ্গ কি বুঝিবে? আজ মূঢ় গোপের সঙ্গে মধুযামিনী আমার পক্ষে নিষ্ফল গেল।"—(১৭৭)

"যে নাগর হয়, তাহাকে দেখিলেই জানা যায়, যাহার জ্ঞান চৌষট্টি কলায়।…কেহ বলে মাধব, কেহ বলে কানাই, আমি অনুমান করিলাম, সম্পূর্ণ পাষাণ।… কোথায় আমি ধনী, কোথায় গোয়ালা!…দীপের জ্যোতি পবন সহে না, কাঁচ স্পর্শ করিলে মুক্তা মলিন হয়।"—(৪২০)

রাধা বলিতে কিছু বাকি রাখে নাই। মূর্খ, গেঁয়ো, কীট, বনের পশু—গালাগালির চোস্ত ভাষা। কেহ বলিতে পারেন, রাধা বড় দুঃখে কিংবা দারুণ কৌতুকে কথাগুলি বলিয়াছে। রঙ্গ বা রোষ যদি এই ভাষা টানিয়া আনে, সেক্ষেত্রে রাধার পারিবারিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও অনিচ্ছা হয়। এই অস্বাভাবিক ইতরতাপূর্ণ গালিগালাজে মানিনীর কোপনতার মাধুর্য বা বিলাসিনীর গঞ্জনার চাতুর্য কিছুই নাই। নায়কের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে কথাগুলি বলা হইলে তবু কিছু রক্ষা, নচেৎ যদি রাধার গঞ্জনার মধ্যে যথোপযুক্ত মিলন-সুখ দানে কৃষ্ণের অসামর্থ্যবিষয়ে ইঙ্গিত থাকে, তবে সর্বনাশ!—মনস্তিজ্ঞতা বা অবৈদগ্ধ্যের চেয়ে মারাত্মক দোষ কৃষ্ণের আর কিছু হইতে পারে না।

অথচ সেই অভিযোগই আছে,—কৃষ্ণ কলারসজ্ঞানহীন ; সে পাষাণ-হৃদয় ; সুন্দর দীপজ্যোতির নিকট কৃষ্ণ অসহন পবন-স্বরূপ ; মুক্তার নিকট মলিনকারী কাঁচের সমতুল।

৪২০ পদের এই সকল নিন্দাত্মক কথা যদিও দূতীর মুখ দিয়া কৃষ্ণের নিকট বলিয়া পাঠানো হইয়াছে, নিন্দার তাড়নায় কৃষ্ণকে টানিয়া আনিবার জন্য—তবু নিন্দার কথাগুলি তো মুছিতেছে না। বিশেষতঃ ঐ 'কলারস-জ্ঞানহীন' কথাটা! বৈষ্ণব সাহিত্যে কলারসজ্ঞানই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, ইহারই জোরে বহুরঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও চাটুপটুতায় রাধাবক্ষে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের অনুমতি অর্জন করেন। কৃষ্ণ লম্পট হইলেও রসিক, সে কারণে, শত জ্বালাতেও রসিকার নিকট অত্যাগসহন। সেই কলাজ্ঞান হইতে কৃষ্ণকে বঞ্চিত করা!—আমাদের ধারণা, এই সর্বাপেক্ষা কঠিন গালটি রাধা দিয়াছে কৃষ্ণকে চরম আঘাত করিতে। সম্ভবতঃ রাধার বিশ্বাস, এই আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে কৃষ্ণ নিজের কলাজ্ঞান প্রমাণ করিতে কলাবতীর নিকট অবিলম্বে ছুটিয়া আসিবে।

তাছাড়া ঐ পদে আরো একটি ভয়াবহ অবৈষ্ণব নিবেদন আছে। রাধা আবৃত—সম্পূর্ণ আবৃতও নয়—ভাষায় জানাইল,—"পরধনে সকলে লোভ করে। যদি আয়ত্ত হয়, সকলে প্রেম করে। নাগরীজনের বিলাস অনেক।" রাধার নির্দেশ—সখী যেন এই কথাগুলি কৃষ্ণ-সমীপে নিবেদন করে।

যে-রাধা এই কথা বলিতে পারে—সে কি সাধারণ নাগরীর এক চুল বেশী? বৈষ্ণব-ধারণায় রাধার মনে অন্য নায়কের ছায়াপাত কল্পনাতীত। কিন্তু বিদ্যাপতি বহুসময় রাধাকে নিছক নাগরী ভাবিয়াছেন, তদনুযায়ী কখনো কখনো মানসিক একনিষ্ঠতার শুদ্ধ ভাবাকাশ হইতে স্খলিত করিয়াছেন। একটি মাত্র পদের সাক্ষ্যে এ সকল বলিতেছি না, পূর্বোক্ত ৩৪৩ পদটি আবার লক্ষ্য করুন। এই পদে কৃষ্ণ অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া বক্ষ উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করিলে রাধার বক্তব্য,—সংসারের সার রূপের প্রথম পসরা; দ্বিতীয় বিক্রয়কালে অব্যবহৃত প্রথম বস্তুর দাম পাওয়া যায় না; সুতরাং 'কাঞ্চনে গড়া যে সুন্দর পয়োধর নাগরের জীবনের আধার স্বরূপ', কৃষ্ণ যেন তাহাতে হস্তক্ষেপ না করে।

এখানে বেশ বোঝা যাইতেছে, কৃষ্ণকে দিয়া বউনি করিতে রাধার অনিচ্ছা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এখানেই শেষ নয়—১২৯ পদে মানাবিষ্ট কৃষ্ণকে রাধা মিনতি পাঠাইতেছে,—দুর্জনের কথায় মাধব যেন বিশ্বাস না করেন, কারণ বিচার করিলেই দুর্জনের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়।

রাধার বিষয়ে দুর্জনেরা কী অভিযোগ করিয়াছিল? জানি না অভিযোগ কী, অধ্যাত্মকাব্যের পক্ষে অচিন্তনীয় কোনো অভিযোগ না হইলেই মঙ্গল। আশা করা যায়, দুর্জনবাক্যে রাধার প্রেমের বহুমুখিতা লইয়া কোনো আপত্তি ছিল না।

বৈষ্ণব অধ্যাত্মকাব্য লিখিতে গেলে রাধার হৃদয়ে কোনো অধার্মিক ভাবনা কবি দিতে পারেন না। তেমনি, রাধার রূপ-সৌন্দর্যকেও কলঙ্কিত লোকদৃষ্টির সামনে আনার অধিকার কবির নাই। অথচ বিদ্যাপতি তাহাই করিয়াছেন। ১০২ পদে অভিসারিণী রাধিকাকে দূতী বলিতেছে,— "তরুণি! তোমার জন্য আসিলাম, দুষ্ট লোকের নয়ন তোমার বদনচন্দ্রের রসপান করিবার জন্য চকোরের ন্যায় ঘুরিতেছে।"

দৃষ্টান্তগুলি বিদ্যাপতির মনোভাবের পরিচায়ক। ঈশ্বরের অপূর্ব প্রেয়সী রাধার বিষয়ে সূক্ষ্ম ভাবসংস্কারের অধিকারী ছিলেন না তিনি। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধারণা এ ব্যাপারে অসাধারণ ভাব-গরিমায় ভূষিত। সেখানেও পরকীয়া প্রেম, কিন্তু চরমকে আস্বাদনের জন্যই বৈষ্ণবের পরকীয়া— লাম্পট্যের বিস্তারের জন্য নয়। পরকীয়ার প্রেমের তীব্রতা ও গাঢ়তা স্বকীয়ার নাই। পরকীয়া, পরকীয়া হইলেও নিষ্ঠায় অনন্যা, 'নব'-পাতিব্রত্যে সে শ্রেষ্ঠ স্বকীয়াকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে আমি চরম দৃষ্টান্ত দিয়াছি,—রাধা কর্তৃক অন্য নায়কের ভাবনা। যদি মৌখিক হয়, তবুও মারাত্মক চিন্তা।

বৈষ্ণব প্রেম-মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণকারক রাধার এই অপর নায়ক-চিন্তা একদিকে আছে; অন্যদিকে যদি দেখা যায় রাধা অন্য নায়কের বদলে নিজ পতির প্রতি প্রীতিপরায়ণ, এবং পতিও তাঁহাকে ভালবাসেন, তাহা হইলেও একই ক্ষতি হয়। রাধা যেমন একাধিকবার পরকীয়া হইতে পারে না, তেমনি স্বকীয়া হইবার অধিকারেও বঞ্চিত। অথচ বিদ্যাপতির পদে রাধার

পতি-প্রীতি এবং পতির রাধা-প্রীতির কথা আছে। ৪৬৯ পদে দেখা যায়, রাধা পতির প্রেম পাইয়াছিল, মাধবকে ভজনা করার পরে পতিপ্রেম হারাইল। রাধা, পতির প্রেম-ভাজনা ছিলেন, এ সংবাদ সত্য হইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব কবি তাহা লইয়া উচ্চবাচ্য করেন নাই পরবর্তী কালে। ৩৫৮ পদে যেকথা পাইতেছি, তাহাও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-ধারণা হইতে পৃথক। ঐ পদে রাধার মনঃক্ষোভের কারণ হইল,—'পতি বিদেশে আর কানাই একই বাড়ীতে বাস করে', এবং 'জীবন অল্প ও যৌবন অনিত্য'—এই দুই কারণ সত্ত্বেও কৃষ্ণ ধরা দিতেছে না। এই পদে রাধার পতিকে বিদেশে পাঠাইয়া কবি রাধাকে নিতান্তই লৌকিকা করিয়াছেন। রাধা আমাদের পূর্বদৃষ্ট 'প্রোষিত-ভর্তৃকা ও পথিক' অংশে চিত্রিত ভ্রষ্টা প্রোষিতভর্তৃকার সমতুল হইয়া উঠিয়াছে। উত্তরকালের বৈষ্ণব কবি রাধার পতিকে বিদেশে পাঠাইতে পারেন না।*

* এইখানে ৪৭২ পদটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ৪৭২ পদের নেপাল-পাঠে একটি সংবাদ পাইতেছি,—কৃষ্ণ মথুরা হইতে রাধার নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যে খুব অল্প ক্ষেত্রেই এই তথ্য পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির ৪৭২ পদের নেপাল পাঠের বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তী বৈষ্ণব মনোভাবের সুগভীর পার্থক্য বর্তমান। বৈষ্ণবের কাছে মাথুর বিরহ পুনর্মিলনের সম্ভাবনাশূন্য চূড়ান্ত বিরহ। সাময়িক বিরহের ক্ষেত্রে কিংবা মিলনকালে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি দেহপিপাসা ও পিপাসা নিবারণের চিত্র উল্লাসভরে আঁকিয়াছেন,—মাথুরের বর্ণনায় তাঁহারা আবার দেহোত্তর। এইরূপ হইবার দুইটি কারণ, প্রথমতঃ কৃষ্ণের মথুরা-প্রস্থানের পর প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনা একেবারে নাই বলিয়া দেহমিলনের ভাবনা বৈষ্ণব কবি বাদ দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ আর কোনোদিন ফিরিবেন না, এই নিষ্ঠুর সত্যের বেদনা এমনই প্রচণ্ড যে, তখন প্রাণযন্ত্রণা দেহকে গ্রাস করিয়া শতশিখায় জ্বলিয়াছে, সেখানে দেহকামনা নিঃশেষে দগ্ধ।

যে কোনো কারণেই হোক, বিদ্যাপতি কৃষ্ণের মথুরা-গমন বিষয়ক সাধারণ ধারণাকে মান্য করেন নাই, অন্ততঃ একটি পদে। তিনি অতি লঘুভাবে জানাইয়াছেন, কৃষ্ণ মথুরা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং রাধিকার সঙ্গে সহজ়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনকে রাধিকাও এমন ঔদাস্যের সহিত গ্রহণ করিলেন যে, বিস্মিত হইতে হয়। কৃষ্ণের মথুরা-গমন রাধার নিকট যেন কোনো অতিরিক্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাই নয়। বিচ্ছেদ রাধাকে কোনো মহৎ উপলব্ধি দেয় নাই। রাধা তখনও নিজের দেহসৌন্দর্য ও কলা-নৈপুণ্যের গর্বে অধীর। কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলে তাঁহার সম্বন্ধে নানা সংবাদ বণিকদের নিকট হইতে রাধা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সুন্দর সংবাদ পান নাই। মথুরাতেও কৃষ্ণ

বিদ্যাপতির লৌকিক ও 'ইতর' প্রেম-কবিতার আলোচনা এইখানেই শেষ করিলাম। দেখিলাম, বিদ্যাপতি স্থূল প্রেমের প্রলোভনে কিভাবে ধরা দিতে পারেন; দেখা গেল বিদ্যাপতির রুচির ব্যাপকতা। এই আলোচনায় লৌকিক প্রেমকে আমি চার অংশে ভাগ করিয়াছি: (১) কুটনী-সাধারণী (২) প্রোষিতভর্তৃকা-পরকীয়া (৩) দূতী-চেষ্টা (৪) রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ইতর পদ। এই পর্যায়ে প্রেমের ভাবরূপ স্থূল হইলেও পদগুলি রসমূল্যে সর্বত্র হীন নয়, উদ্ধৃত অংশের সাহায্যে বিচারপূর্বক জানাইয়াছি। এখন আমরা প্রেমকবিরূপে বিদ্যাপতির সর্বোত্তম পরিচয় যেখানে নিহিত, সেই নাগরিক প্রেমের আলোচনায় নামিব। বলা বাহুল্য, সে আলোচনা ব্যাপক হইবে।

লীলারত ছিলেন। কৃষ্ণ ফিরিলে পর রাধা শীতল কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন,—'বাহিরের মত তোমার ভিতরও কালো।' দেখা যাইতেছে, বিদ্যাপতি তাঁহার কাব্যজীবনের এক অধ্যায়ে, মাথুর বিরহের পদেও, ভাবশুদ্ধ প্রেম দেখিতে পান নাই। কবিকে সমর্থন করার একমাত্র উপায়—কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় এবং মথুরা হইতে বৃন্দাবনে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন—এই সংবাদে বিশ্বাস করা। আমরা সেরূপ বিশ্বাস করিব কি?

নাগরিক প্রেমঃ বয়ঃসন্ধি

আলোচনার সুবিধার জন্য বিদ্যাপতির প্রেমপদাবলীকে তিন অংশে ভাগ করিয়াছিলাম—লৌকিক প্রেম, নাগরিক প্রেম এবং আধ্যাত্মিক প্রেম। লৌকিক প্রেমের আলোচনা শেষ করিয়াছি। এখন আলোচ্য নাগরিক প্রেম।

প্রথমেই কিন্তু অসুবিধা বোধ করিতেছি—পূর্বকৃত শ্রেণীভাগ যথেষ্ট নিখুঁত নয়। লৌকিক প্রেমের আলোচনায় যেসকল রচনাংশ তুলিয়াছি, তাহার মধ্যে কি নাগরিক প্রেমের লক্ষণ নাই? অবশ্যই আছে, দূতীচেষ্টা, প্রোষিতভর্তৃকার পথিক-প্রলোভন, এ সকলই নাগরিক প্রেম-পরিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। শৃঙ্গারগ্রন্থে সেরূপ নিদর্শন যথেষ্ট মেলে। সুতরাং প্রেমের নাগরিকতার কিছু অংশ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অন্যদিকে, বর্তমানে আলোচ্য নাগরিক প্রেম যে-কোনো মুহূর্তে উচ্চভাবমিশ্র হইতে পারে, হইয়াছেও—সেইসকল স্থানে নাগরিক প্রেমোদ্ভূত আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকার করিতে হয়। আমাদের প্রতিপাদ্যও তাই—বিদ্যাপতির কাব্যে লৌকিক প্রেমই উন্নয়নের মহিমায় আধ্যাত্মিক প্রেম। অতএব তৃতীয় শ্রেণীর উপজীব্য বস্তুকে—আধ্যাত্মিক প্রেমকে—আমরা নাগরিক প্রেমেরই পরিণতির এক অধ্যায়ে লাভ করিব। পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীভাগকে এই কারণে পূর্ণাঙ্গিক বলিতে দ্বিধা করিতেছি,—ইহার দ্বারা মোটামুটি কাজ চলিয়া যায় এই পর্যন্ত।

নাগরিক প্রেমের আলোচনার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, বর্তমান পর্যায়ে সাধারণ নায়িকা ও রাধার মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করিব না। এখানে কলাবতী নাগরিকার এক নাম রাধা। বিদ্যাপতি তাঁহার রাধাকে এখানে মূলতঃ প্রকৃষ্টা নায়িকাই ভাবিয়াছেন।

নাগরিক প্রেমের প্রথমে আসে বয়ঃসন্ধির কথা। শৃঙ্গার-শাস্ত্রকার এবং বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকার—দুই পক্ষই বয়ঃসন্ধিকে মূল্য দিয়াছেন। শৃঙ্গার-শাস্ত্রকারদের মূল্যদানের কারণ বুঝি—দেহের বিকাশ তাঁহাদের সস্পৃহ-অবলোকনের চমৎকার বিষয়—কিন্তু বৈষ্ণব তাত্ত্বিক রাধার বয়ঃসন্ধিকে

স্বীকার করেন কিরূপে, যেখানে, "শ্রীরাধার অঙ্গে ভাব হাব হেলা রতি ইত্যাদি নিত্যসিদ্ধরূপে" বর্তমান? বৈষ্ণব তাত্ত্বিকের উত্তর,—সেগুলি নিত্যসিদ্ধ বটে কিন্তু "বাল্যাচ্ছাদিত্বের গুণে বোঝা যায় না"—অর্থাৎ রাধাকে যখন মানব-রূপ দেওয়া হইয়াছে, তখন মানবদেহানুযায়ী ক্রমবিকাশও দিতে হয়। এইখানে আমরা যেন ভুল না করি, বৈষ্ণব রসিক ও দার্শনিকের নিকট ক্রমবিকাশ ততটুকুই গ্রাহ্য, যতটুকু প্রেমসম্ভোগের ও রূপার্চনার পক্ষে প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ তাঁহারা মুগ্ধ চোখে বয়ঃসন্ধির দেহমুকুলকে বাড়িয়া পূর্ণ প্রেমফলে রূপান্তরিত হইতে পর্যন্ত দেখিবেন—মুগ্ধা ক্রমে প্রগল্ভ-যৌবনা প্রৌঢ় রতিনায়িকা হইবে—কিন্তু রাধা সত্যই কোনদিন বয়সে প্রৌঢ়া হইবেন না—যৌবনই রাধার শেষ বয়স।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীতে বয়ঃসন্ধি-বিষয়ক পদ পাইবার কারণ বলিলাম। সেখানে কিন্তু কাব্যোৎকর্ষ অল্প। বৈষ্ণবতত্ত্বে বয়ঃসন্ধি থাকিলেও তাহা তত্ত্বগ্রন্থেই নিবদ্ধ, ভক্ত বৈষ্ণবকবির মনের কাছে বাস্তব সত্য নয়। ভক্ত কবি রাধাকে পূর্ণযৌবনা ভাবিতে সাধারণতঃ অভ্যস্ত। অপরপক্ষে বিদ্যাপতির কাছে বয়ঃসন্ধি দৃষ্টবাস্তব, তাঁহাব অভিজ্ঞতার মনোরম সংগ্রহ। তিনি এই ক্ষেত্রে লৌকিক শৃঙ্গারশাস্ত্রকারদের অভিজ্ঞতার সমর্থনও পাইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর যথার্থ সূচনা তাই বয়ঃসন্ধিতে। উচ্চাঙ্গের পদও যথেষ্ট মেলে।

বয়ঃসন্ধির লক্ষণ-নির্দেশে লৌকিক শৃঙ্গারশাস্ত্রের সাহায্য লইবার ইচ্ছা নাই। আমি বরং উজ্জ্বলনীলমণি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব। উজ্জ্বনীলমণি ভক্তির রসশাস্ত্র হইলেও ইহাতে অসাধারণ সংগ্রহ-নৈপুণ্য এবং উপস্থাপনার অপূর্ব কৌশল। রূপ গোস্বামী জানাইয়াছেন, মধুর রসে বয়স চারি প্রকার— বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্ত বয়স ও পূর্ণ বয়স। ইহার মধ্যে বয়ঃসন্ধির অবস্থা, —'বাল্য ও যৌবন এতদুভয়ের সন্ধি অর্থাৎ প্রথম কৈশোরকে বয়ঃসন্ধি কহে।' এই বয়ঃসন্ধির রূপ উজ্জ্বলনীলমণিকার কৃষ্ণের মারফৎ ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরাধাকে দূর হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন,—

"দেখ দেখ নবযৌবন-ভূপাল শ্রীরাধার তনুরাজ্য অধিকার করাতে গুণশালী নিতম্ব স্বীয় উন্নতি জানিয়া উল্লাসপূর্বক কিঙ্কিণীবাদ্য করিতে আরম্ভ করিল, বক্ষ যৌবনরাজকে উপহার দিবার নিমিত্ত দুইটি সৎফল সঞ্চয় করিতে লাগিল এবং মধ্যদেশ আপনার ধ্বংস সম্ভাবনা

আশঙ্কা করিয়া ত্রিবলীর সাহায্য অবলম্বন করিল,—অতএব হে সখে, নবযৌবনরাজের কি অদ্ভুত প্রভাব।"

বয়ঃসন্ধির এই বর্ণনা বিশুদ্ধ দেহগত। অথচ দেহবিকাশ অপেক্ষা মনোবিকাশই অধিকতর আকর্ষণীয়। তাছাড়া বয়ঃসন্ধি বলিতে রূপগোস্বামী একেবারে নির্দিষ্ট যে বয়সটি বলিয়াছেন—প্রথম কৈশোর—সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধির রূপ আঁকিতে আর একটু বিস্তৃত বয়সের পটভূমিকা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং উজ্জ্বলনীলমণি হইতে বয়ঃসন্ধির পার্শ্ববর্তী আরো দুই একটি অবস্থার উল্লেখের দ্বারা বয়ঃসন্ধির অবস্থা বোঝান যায়। যথা—অবিবাহিত পিতৃগৃহস্থিত ক্রীড়াউৎসুক কন্যকার চিত্র—

"যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, এমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াগণ পরিহাসপূর্বক বলিলেন, সখি! তোমার ধূলিকেলিতেই অতিশয় শ্রদ্ধা দেখিতেছি,—এ পর্যন্ত বক্ষঃস্থল অসম্বিত আছে, অতএব তুমি অতি বালা, এই কারণেই তোমার পিতা জামাতার অন্বেষণ করিতেছেন না। ফলতঃ তুমি বৃন্দাবনাভ্যন্তরে শিখিপিচ্ছমৌলীর মুরলীকূজন শ্রবণ করিয়া চপল নেত্রে উৎকম্পান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছ।"

বয়ঃসন্ধি পরিমণ্ডলের এই এক প্রান্ত-চিত্র। অন্য প্রান্তে আছে, ধরা যাক, মুগ্ধার 'নব বয়াঃ' অবস্থা। সেখানে বিশাখার রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট ভাষায় বলিবেন—"আহা বিশাখার শৈশব-শিশির বিরাম হওয়াতে যৌবন-মধুর প্রবেশ হইল।"

শ্রীরাধার অনুরূপ অবস্থার বর্ণনায় অলঙ্কার-সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়,—

"তুমি বাল্যরূপী অন্ধকার! শ্রীরাধার দেহরূপ দ্বীপ হইতে তারুণ্য-তপনের বিজয়ারম্ভ অগ্রে প্রকাশ পাইতেছে; অতএব শীঘ্র প্রস্থান কর। ঐ দেখ কৃষ্ণবর্ণ গগনমণ্ডলে ভাস্করের প্রকাশ; নক্ষত্রের ঈষৎ চাঞ্চল্য, বক্ষঃস্থলরূপী উদয়াচলের শোভোন্নতি এবং বদনপদ্মের প্রফুল্লতা আরম্ভ হইল, অতএব তোমার আর এখানে থাকা উপযুক্ত নয়।"

বয়ঃসন্ধির অবস্থা সাহিত্যের সাধারণ সামগ্রী। নানাভাবে এই অবস্থার রূপ সাহিত্যে আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলাসাহিত্য হইতে বয়ঃসন্ধি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যত্র স্মরণ করিয়াছি। এখানেও আর একবার করিতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র বয়ঃসন্ধির এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অবস্থাকে চিত্রিত করিতে ভালবাসিতেন। বাংলাসাহিত্যে রূপবর্ণনায় বঙ্কিমের সমুচ্চ স্থান। এ বিষয়ে

তাঁহার বিশেষ আসক্তিও ছিল। প্রৌঢ় প্রখর সৌন্দর্যের কথা তিনি যেমন বলিয়াছেন, তেমনি বলিয়াছেন নির্মল স্বচ্ছ সৌন্দর্যের কথা। বঙ্কিমকৃত যৌবন-সৌন্দর্যের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া প্রসঙ্গতঃ নারীরূপের অনাবিল মাধুর্যের প্রকৃতি স্মরণ করিতে পারি। আমাদের মনে পড়ে কুন্দের নীল নির্মল চক্ষু কিংবা ভ্রমরের প্রভাতকোমল শ্যামচ্ছবি মুখকান্তি। মৃণালিনীতে বঙ্কিম মনোরমার রূপবর্ণনার মধ্যে বিচিত্র ভাবনা আনিয়াছিলেন—সে কখনো সরলা বালিকা, কখনো পূর্ণযৌবনা তরুণী। কিন্তু ইহার কোনটিই বয়ঃসন্ধির রূপ নয়—বঙ্কিম বয়ঃসন্ধির কথা সত্যই কিছু বলিয়াছেন দলনীর 'ফোটে ফোটে ফোটে না' রূপের চিত্রণে, এবং একবার তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন বয়ঃসন্ধির প্রতি তাঁহার পক্ষপাতের কথা। রজনী উপন্যাসের সেই অংশ উদ্ধৃত করা চলে। অমরনাথ লবঙ্গের বর্ণনা করিতেছেন—

"লবঙ্গ-কালিকা ফোট-ফোট হইয়াছিল, চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল। উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া ধরিয়াছিল—দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য কখনো দেখি নাই—এ সৌন্দর্য যুবতীর অদৃষ্টে কখনো ঘটে নাই। বস্তুতঃ অতীত-শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনার সৌন্দর্য এবং অস্ফুটবাক শিশুর সৌন্দর্য ইহাই মনোহর, যৌবনের সৌন্দর্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন-ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনির ঘটা,—বেণীর দোলনী, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি, —যুবতীর রূপের বিকাশ এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্যকে দেখি, তাহাও বিকৃতি। যে সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।"

অমরনাথের, কার্যত বঙ্কিমচন্দ্রের, বক্তব্য মনোযোগের সঙ্গে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে উদ্ধৃত অংশে বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের সন্দেহ হয়, এই রচনার সময় বয়ঃসন্ধি বিষয়ে আলঙ্কারিকদের বর্ণনা তাঁহার সচেতন সংস্কারে ছিল কি না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক অবস্থা অপেক্ষা তাহার রূপের মনোহারিতা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্যই বিশেষ মনোযোগের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, যৌবনের রূপে আছে ভঙ্গি এবং তাহা ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য, রূপবিকারগ্রস্ত মনের আস্বাদনবস্তু। যথার্থ সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়বিকার না থাকাই উচিত। যেখানে নাই সেখানেই শুদ্ধ সৌন্দর্যের দর্শন সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য সংস্কৃত ও সংস্কৃত ভাবানুপ্রাণিত কবিদের নিকট

গ্রহণীয় ছিল না। বিদ্যাপতির নিকটও নয়। তাঁহারা বাসনা-সম্পর্কহীন সৌন্দর্যের মূল্যস্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন। এমন কি শকুন্তলার 'প্রাকৃতিক' সৌন্দর্যও, যাহা দুষ্মন্তের নিকট অপার্থিব মনে হইয়াছিল, যাহার বর্ণনায় নিসর্গ-প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না—সে সৌন্দর্যও দুষ্মন্তের লুব্ধ নয়নের দ্বারা চুম্বিত। শকুন্তলাকে দেখিয়া মনে হইতে পারে—সে অনাঘ্রাত পুষ্প, অচ্ছিন্ন কিশলয়, অনাস্বাদিত মধু—কিন্তু এই পবিত্র সৌন্দর্যের বাঞ্ছিত পরিণতি হইল আঘ্রাণে, ছেদনে এবং আস্বাদনে, কোন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতিও এই মনোভাব হইতে মুক্ত নহেন। সুতরাং 'অতীব-শৈশব' অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনার সৌন্দর্য তিনি বঙ্কিম-ইঙ্গিত ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য শুদ্ধ মনে দর্শনে অসমর্থ। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি পদে রূপাকাঙ্ক্ষী, সহাস্য, উৎফুল্ল, আনন্দচকিত মনের রূপ ফুটিয়াছে। উদ্ভিন্ন দেহকে পরমাগ্রহে খুঁটিয়া খুঁটিয়া কবি দেখিয়াছেন। এ সকল কথা সত্য। তথাপি পদগুলি লোলুপতায় মলিন নয়। কারণ বিদ্যাপতি ইন্দ্রিয়রাগের কবি হইলেও তাঁহার সেই নিরপেক্ষ সৌন্দর্যদৃষ্টি ছিল যাহা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ চোখে রূপনিরীক্ষণে সমর্থ। শিল্পীর অবিচলিত রসক্ষুধায় বৈষ্ণবকাব্যে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়।*

এবং বিদ্যাপতি অদ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির পদে, সম্ভবতঃ অধুনাপূর্ব সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে। এ বিষয়ে বিদ্যাপতির সমতুল কবির সন্ধান পাই নাই। অন্যান্য কবির তুলনায় বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে—তিনি দৈহিক পরিবর্তনের কতক অবস্থাকে যথার্থ রসচিত্রে রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছেন। বয়ঃসন্ধির পদে তিনি দেহের সঙ্গে মনকেও মিশাইতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ শ্লোকাবলীতে বয়ঃসন্ধির কোনো কোনো পদে দেহ-মন উভয়ের উন্মেষচিত্র ফুটিয়াছে এবং কোনো কবি হয়ত দু'একটি শ্লোকে বিদ্যাপতি অপেক্ষা ন্যূন নহেন, কিন্তু বিদ্যাপতির পক্ষে বলিব, তিনি বয়ঃসন্ধির কবিরূপে এক পদের কবি নন। এই বিষয়ক বেশ কিছু পদ তাঁহার কবিনামকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি, আলঙ্কারিক প্রেরণা সত্ত্বেও বয়ঃসন্ধির পদে

* এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়, বাল্যবিবাহের দেশেই স্বাধিকারে বয়ঃসন্ধির দেহদর্শন করা সম্ভবপর।

বিদ্যাপতির নিজস্ব দর্শন ও চিত্রণের সমূহ গৌরব। এই কথাগুলি আমরা পূর্বে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধে বিশদভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।* এখানে পদগুলির প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। বয়ঃসন্ধির রূপ-দর্শনের পিছনে আছে বিদ্যাপতির অভিনব-পিপাসা। এখানে তিনি স্বাধীন দৃষ্টিবিস্তারের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি, আমাদের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। সৌন্দর্যের মধ্যে আবার দৃশ্য-সৌন্দর্যের প্রতি কবির পক্ষপাত। পদগুলিতে তাই ভাবরস অপেক্ষা চিত্ররসের প্রাধান্য। দৃশ্যরূপ ফুটাইবার এত বেশী অবসর কবিকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল যে, এক্ষেত্রে কয়েকটি অপরিহার্য ক্রটির সম্মুখীন না হইয়া পারেন নাই। যেমন গতানুগতিকতা ও আত্ম-অনুকরণ। কবি কতবার নূতন দেখিতে পারেন—যদি একই রূপকে বারবার দেখিতে ও আঁকিতে হয়? ফলে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এক কথাই বহুবার বলিতে হইয়াছে। তার সঙ্গে যুক্ত আছে রীতিগত আলঙ্কারিকতা। আলঙ্কারিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলে একদিকে প্রচলিতকে স্বীকার করার সুবিধা পাওয়া যায়, অন্যদিকে এমন একটি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্যভাণ্ডার হাতে আসে, যেখান হইতে দুহাতে ছড়াইলেও নূতন করিয়া ছড়াইবার রত্ন থাকিয়া যায়। কবিমানসের অলসতার এমন সাহায্যকারী বস্তু আর নাই।

বিদ্যাপতি কিন্তু সত্যই সবক্ষেত্রে ঐ মানস-অলসতাকে পছন্দ করেন নাই। অন্ততঃ আলঙ্কারিকতাকে স্বীকার করিলেও সেখান হইতে মুক্তির যথাসম্ভব চেষ্টাও করিয়াছেন—সেখানেই তাঁহার কবিস্বভাবের মোচনভূমি। এই প্রচেষ্টায় তিনি একদিকে আলঙ্কারিক পদ্ধতিতেই নূতন রসসৌন্দর্যময় অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যদিকে বাস্তব জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সেখান হইতে যে সকল উপাদান আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, সেগুলির বিরুদ্ধে অবৈদগ্ধ্যের ও অমার্জনের কলঙ্ক যুক্ত থাকিলেও সেগুলিকে কাব্যবদ্ধ করিয়াছেন সাহসিকতার সঙ্গে। তাছাড়া তিনি রূপবর্ণনায় নূতনত্ব সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় প্রায়ই ঐ রূপের নূতন পটভূমি সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। নবপটে স্থাপিত পুরাতন রূপ অভিনব রসে জলজল করিয়া উঠিয়াছে।

বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের মধ্যে কবিমানসের বিশেষ মুক্তিচেষ্টা আছে বলিয়াছি

---

* 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থে বিদ্যাপতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তার কারণ, বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে কোনো স্পষ্টরূপের বাঁধনে কবি ধরা পড়েন না। বাল্যের রূপ স্পষ্ট, এবং স্পষ্ট যৌবনের রূপ। বাল্য বা যৌবনের স্পষ্ট রূপকে নানাভঙ্গিতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বর্ণনা করা হয়। ঐ দুই রূপের মধ্যে যেখানে রহস্তের দর্শন অভিপ্রেত—সে রূপ যদি শৈশবের হয়—তবে হয়ত তাহা ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ত্যক্ত স্বর্গের এখনো-অবশিষ্ট অপার্থিব আলোক, কিংবা যদি যৌবনের রূপ হয়—তবে হয়ত তাহা মানবীদেহকে কল্পনার দ্বারা অর্ধাংশে গ্রাস করাইবার রবীন্দ্রনাথীয় ভাবপ্রীতি। দুইটি ক্ষেত্রেই রূপের মধ্যে কবি-মনের কল্পনা-বিস্তার। কিন্তু এমন একটি বিশেষ বয়স আছে, যেখানে ঐ বয়সটি নিজস্ব স্বরূপে অনির্দিষ্ট-রূপ। সেই বয়সটি বয়স নয়—বয়ঃসন্ধি। সেই সন্ধিলগ্ন সম্বন্ধে শেষকথা বলিবার ক্লান্তিমুক্ত কবি সেখানে পাইয়াছেন অসীম আনন্দ-শিহরণ, যেমন সীমাহীন শিহরণ ঐ বয়ঃসন্ধির মেয়েটির দেহে ও মনে।

তাছাড়া মুগ্ধা-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধেও সত্য—সৌন্দর্যের সুপীন রূপের সমঝদার নাগরিক কবির রসে-মরা মনে সুখ আনিতে উদ্ভিন্ন-মানা বয়ঃসন্ধিনী কিংবা ব্যাকুলা মুগ্ধার প্রয়োজন আছে, কারণ সেখানে আছে কেলিবিলাসের পরিচিত ছন্দোবদ্ধ অঙ্গবিক্ষেপের পরিবর্তে নব-নবোন্মেষের মানসিক সামর্থ্য। বয়ঃসন্ধির নায়িকা যথেচ্ছ করিতে পারে—কি করিবে জানি না—কবিও এই অভাবনীয়ার উত্তাপে নিজেকে সঞ্জীবিত করিতে চান।

বয়ঃসন্ধির সময় বেশী নয়—পরবর্তী আলঙ্কারিকের মতে (রূপ গোস্বামী) বাল্য ও যৌবনের সন্ধি অর্থাৎ প্রথম কৈশোর। সময় এইটুকু, কিন্তু দেহমনের এমন ঝড়ো যুগ আর নাই। এই ঝটিকান্তে পূর্ব পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং নূতন পৃথিবীর নাগরিকত্ব। সেই সন্ধি-ঝড়ের মধ্যে মাথা ও চোখ ঠিক রাখিয়া দেখাই মুস্কিল—মূর্তিটি যেন রহস্যের সিন্ধুতরঙ্গে ভাসিতেছে—যৌবনের পরিচ্ছন্ন দিবালোকে সৌন্দর্যলক্ষ্মীরূপে উঠিয়া আসিবার জন্য। কবি অনেক চেষ্টায় যাহা দেখিয়াছেন—দেখিবার সময় নিশ্চয় তাঁহার মাথা ও চোখ ঘুরিতেছিল—সে দেখার ভিতর হইতে নির্দিষ্ট কিছু আবিষ্কার করা একমাত্র সমালোচকের পক্ষে সম্ভব। দুনিরীক্ষ্যকে নিরীক্ষণ করার সাধু চেষ্টায় ঐ বয়ঃসন্ধিকালের চারিটি অবস্থা আমাদের গোচর :—এক, এখনো

শৈশবের প্রাধান্য; দুই, প্রাধান্য কাহারো নয়, শৈশব-যৌবনের তুল্যমূল্য সংগ্রাম; তিন, সংগ্রামে যৌবনের জয়ের সূচনা; চার, যৌবন বিজয়ী, তবে শৈশবের সঙ্গে যে তাহার একদা সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই স্মৃতিটুকু আছে।

প্রথম অবস্থা

আমারই ভুল, প্রথম অবস্থা অর্থাৎ শৈশবের প্রাধান্য বিদ্যাপতি আঁকিবেন কোন্ দুঃখে? যতই হোক কবির লক্ষ্য—যৌবন। মূল লক্ষ্যকে তিনি ভুলিতে পারেন না, বয়ঃসন্ধির কবি হওয়া সত্ত্বেও। তাই শৈশবের প্রাধান্য-যুক্ত কোনো গোটা পদ মিলিতেছে না। শৈশবকে দেখিতে হইবে পদের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন ছত্রের মধ্যে।

দ্বিতীয় অবস্থা

শৈশবকে শ্রেষ্ঠ সম্মান যাহা কবি দিতে পারেন—শৈশব-যৌবনের সংগ্রামে শৈশবকে অপরাজিত রাখা। ইহাই বয়ঃসন্ধির দ্বিতীয় অবস্থা। সমশক্তি সংগ্রামের এমন কয়েকটি পদ আছে যেখানে কবি উভয়ের মধ্যে 'জেঠ কনেঠ' স্থির করিতে অসমর্থ। ভণিতায় কবি সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। তেমন পদ হইল ৬১০, ৬১২, ৬১৩, ৬১৬। ভণিতার বক্তব্য সত্ত্বেও শেষের দুইটি পদ তৃতীয় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।

৬১০ পদে *শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"বালিকার শরীরে শৈশবের ও যৌবনের

---

* খণে খণে নয়নে কোন অনুসরঈ।
খণে খণে বসন ধূলি তনু ভরঈ॥
খণে খণে দশন ছটাছুট হাস।
খণে খণে অধর আগে করু বাস॥
চউঁকি চলএ খণে খণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।
খণে আঁচর দএ খণে হোয় ভোর॥ (পরের পৃষ্ঠায়)

সন্ধি হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ঠিক করিতে পারি না।" কৃষ্ণের অনভিজ্ঞতার কটাক্ষ করিয়া কবি যাহা বলিলেন, তাহাতেও কিন্তু কোনো স্পষ্ট সমাধান নাই—"বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সুন্দর কানাই, তারুণ্য ও শৈশবের চিহ্ন তুমি জান না।" কবি নিশ্চয় কৃষ্ণের চেয়ে বেশী জানেন, তথাপি শৈশব ও যৌবনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ প্রভেদ করিতে তিনিও সচেতন নন।

পদটিতে বিদ্যাপতির প্রতিভার অঙ্কন আছে। বয়ঃসন্ধির অনির্দেশ্য জগৎ, অনিয়ত চরিত্র এবং অনির্দিষ্ট আচরণকে কবি বিহ্বল সুখাবেগে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অতি সার্থক রূপায়ণ।

৬১২ * পদের শেষের দিকে শৈশবের তুলনায় যৌবনের ঈষৎ প্রাধান্য,—কিন্তু তাহা এমন অনতিলক্ষ্য যে, উভয়কে সমশক্তিক বলাই সঙ্গত। কবিও তাহাই বলিতে চান; কারণ শৈশব ও যৌবনের দলবলে দ্বন্দ্ব পড়িলে রাধা ঠিক করিতে পারিতেছেন না কোন পক্ষে যোগ দিবেন? কেশ বাঁধা ও বিস্তার কথা, অঙ্গ আবৃত ও অনাবৃত করা, স্থির নয়নের কিঞ্চিৎ অস্থিরতা ইত্যাদিতে উভয়ের শক্তিসমতার কথা। এই সমতার কথা কবি সুকৌশলে এক স্থানে জানাইয়াছেন,—'চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভাণ।' অর্থ,—চরণ চঞ্চল, চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কথাটি হইল 'চঞ্চল'—সে কথা যখন

বালা শৈশবে তারুণ ভেট।
লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান॥ (৬১০)

* শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ উদয়-থল লালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
ধৈরয ধরহ মিলায়ব আন॥ (৬১২)

চিত্তের সঙ্গে যুক্ত, তখন যৌবনের লক্ষণ—যৌবনের মনশ্চাঞ্চল্য। যৌবনে কিন্তু আবার চরণ চঞ্চল নয়; যৌবনের চঞ্চল মনটি ধরা থাকে যে সমৃদ্ধ দেহে, তাহাকে বহন করে গতচাঞ্চল্য সুখমন্থর চরণ। তাই চরণকে চঞ্চল বলার অর্থ শৈশবের অস্তিত্বকে স্বীকার করা। কবি এই দ্বন্দ্বে তাঁহার নিরপেক্ষতা আরো বজায় রাখিয়াছেন—কন্দর্পকে জাগাইলেও, জানাইয়াছেন, —কন্দর্প প্রথম জাগরণের আচ্ছন্ন চেতনায় নিমীলিত-নয়ন,—'জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান।'

তৃতীয় অবস্থা

এই অবস্থারই—যেখানে দ্বন্দ্বে যৌবনের প্রাধান্য—পদসংখ্যা অধিক। তাহাই স্বাভাবিক। কারণ নায়িকার গতি স্বতঃই যৌবনমুখী—শৈশবের পিছুটান থাকিলেও যৌবনই অপেক্ষিত পরিণতি। কবি যদি-বা শৈশবের সঙ্গে যৌবনের তুল্যশক্তি-সংঘাতে আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন (নিশ্চয় করেন, কিন্তু সাময়িক কালের জন্য), সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় শৈশবের পরাজয় অনিবার্য। যৌবন-রূপকে দেখিবার জন্য আমাদের কবিও উদ্‌গ্রীব। শৈশব-সরল দেহক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্‌গম দর্শনে কবির এক বিশেষ আনন্দ। অঙ্কুর যৌবনের। অতএব বয়ঃসন্ধিতেও যৌবনের আপেক্ষিক জয়। এই শ্রেণীর কয়েকটি পদে কবি উভয়ের সমশক্তির বাচিক সমর্থন করিলেও নিজের অজান্তে (?) যৌবনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছেন। বাকি পদ-গুলিতে স্পষ্টই যৌবনের জয়লাভ।

৬১৩ * পদটিকে কবির অনবধান মনের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা যায়। জানি না এখানে সচেতন অনবধানতা কি না। পদের শেষের দিকে বলা

*কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ-চপল-গতি লোচন লেল॥
অব সবক্ষণ রহ আঁচর হাত।
লাজে সখিগণে ন পুছএ বাত॥

(পরের পৃষ্ঠায়)

হইয়াছে,—শৈশব যৌবনের বিবাদে কেহই 'জয় বা পরাজয় মানিতে চাহিল না।' ভণিতায় কবি তাহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—'বলিহারি কৌতুক, শৈশব যে দেহকে ছাড়িতে চায় না।' অথচ তার পূর্বের বর্ণনায় সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তুই দেখিতে পাই। সেখানে শৈশবের সংগ্রামের কথা একেবারে উহ্য। যৌবন-সূচনায় লক্ষণ বর্ণনাই পদের উপজীব্য। তবে এখন যৌবনের আভ্যুদয়িক, তাই যৌবন-লক্ষণ অপরিণত। ঐ অপরিণতিটুকুকে মাত্র শৈশব-চিহ্ন বলা যায়। উরজাঙ্কুরের কিছু উৎপত্তি, চরণের চপলতা-হ্রাস, লোচনের কটাক্ষ-চাঞ্চল্য, উচ্চস্থান বাছিয়া কামের সুন্দর ঘটরোপণ, নায়িকার কুরঙ্গীবৎ রসকথায় চিত্তস্থাপন—পদের বর্ণনীয় বস্তু এইগুলিই, এবং এগুলি যে নবযৌবনের চিহ্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরিণত যৌবন যৌবনের মধ্যেই পড়ে। শৈশবের কথা ভুলিয়া যৌবনোন্মেষের একমুখী বিবৃতি কবি দিয়া গিয়াছেন, অথচ পদের মধ্যে দূতীর উক্তিতে ("হে মাধব, বয়ঃসন্ধির কথা কি বলিব, দেখিলে মনসিজেরও মন বাঁধা পড়ে,") এবং কবির ভণিতায় (অল্প পূর্বে উদ্ধৃত) রাধিকার অবস্থাকে বয়ঃসন্ধির অবস্থা বলিয়া স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। কবি নিশ্চয় অসতর্ক ছিলেন।

৬১৪ *পদের স্বরূপ-নির্দেশ আছে প্রথম ছত্রে "শৈশব-যৌবন দুইজন মিলিত হইল।"

কি কবহ মাধব বয়সক সন্ধি।
হেরইত মনসিজ মন রহ বন্ধি॥
তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোএল ঘট উচল কএ ঠাম।
শুনইত রসকথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনএ সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবন উপজল বাদ।
কেও ন মানএ জয়-অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সে তনু ছোড় নহি পারি॥ (৬১৩)

* শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল॥

(পরের পৃষ্ঠায়)

শেষে সখীর উক্তিতে ঐ কথার সমর্থন—"মাধব, অপরূপ বালা দেখিলাম, শৈশব যৌবন দুই এক হইল।"

কবির বক্তব্য :

বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানি।
দুহু এক জোগ ইহ কে কহ সয়ানি॥

অনুবাদে ইহার দুইটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে—(১) বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তুই অজ্ঞানী, দুইয়ের একযোগ, (ইহাকে কিশোরী বলে)। (২) কোন্ বুদ্ধিমতী বলে যে, দুই একসঙ্গে হয়?

বিদ্যাপতির ভণিতার তাৎপর্য স্পষ্ট নয়। যদি তিনি প্রথম অর্থ অনুযায়ী পদে চিত্রিত অবস্থাকে কিশোরী-অবস্থা অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি বলিতে চান, আমরা এক্ষেত্রে তার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। কিন্তু যদি বলেন,—দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী,—দুই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, একটির প্রাধান্য ঘটিবেই, তাহা হইলে এই পদের পরিপ্রেক্ষিতে কবির প্রশংসা করিব। কারণ, 'শৈশব যৌবন মিলিয়াছে,'—সখীর এই উক্তি সত্ত্বেও এই পদের যৌবনেরই জয়। বক্ষের প্রাথমিক অপরিপুষ্টির ('পহিল বদরীসম') উল্লেখ ছাড়া শৈশব-নিদর্শন আর নাই। বাকি সবই যৌবনের কথা। যথা—নয়ন শ্রবণের পথ লইল (কটাক্ষের শুরু), বচনে চাতুরী এবং মৃদুমন্দ হাস্য, মুকুর লইয়া নির্জনে শৃঙ্গার, সখীকে সুরতবিহার সম্বন্ধে প্রশ্ন, একান্তে বারবার

বচনক চাতুরী লহলহ হাস।
ধরণীএ চাঁদ কএল পরগাস॥
মুকুর লই অব করই শিঙ্গার।
সখী পুছই কইসে সুরত-বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখল অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেআনি।
দুহু এক যোগ ইহ কে কহ সয়ানি॥ (৬৬)

নিজের পয়োধর দর্শন ও মুগ্ধ হাস্য, নারঙ্গ লেবুর ন্যায় উদ্দালীং বক্ষগঠন এবং অনঙ্গ কর্তৃক অঙ্গাধিকার।

৬১৬ * পদে বালিকা-স্বভাবের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচয়। যদিও গুরুজন-সঙ্গে অরুচি, উদ্‌ঘাটিত অঙ্গ-সম্বন্ধে সচেতন সংকোচ, বালিকাগণের মধ্যে তরুণীর আগমন হইলে তাহার সঙ্গে পরিহাসে রুচি, কেলি-রহস্য-কথার সময় ভিন্নদিকে তাকাইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা—এ সকলই যুবতীলক্ষণ, তথাপি রাধা-বিষয়ে সখী যে বলিয়াছিল, 'কেহ বালিকা বলে, কেহ তরুণী বলে,' সেই আংশিক বালিকা-প্রকৃতিকে বিদ্যাপতি একেবারে মুছিয়া ফেলেন নাই। কেলিরহস্য গোপনে শ্রবণ-চেষ্টার সময় কেহ ধরিয়া ফেলিয়া ঠাট্টা করিলে রাধা হাসি-কান্না-মাখা গালিগালাজ ও তর্জনাদি করে—সে কান্নাহাসিটুকুতে শৈশবের চলস্পর্শ আছে। ঐ শূন্য মেঘের স্বরে রোষ-গর্জন যুবতীচরিত্রে থাকে না।

২২৭ পদে যৌবনের জয় ঘোষিত, তবে শৈশবের সঙ্গে সংঘর্ষ যে রীতিমত তীব্র হইয়াছিল, তাহার বাচিক পরিচয় আছে। কবি কয়েকবার বলিয়াছেন, যৌবন শৈশবকে তাড়াইয়া দিয়াছে ("শৈশব বেচারাকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল, যৌবনকে নিকটে নিল"; "যৌবন শৈশবকে তাড়াইল, বলিল, আমাকে স্থান ছাড়িয়া দে, এতদিন তোকে রসভোগ করাইল, এখনো তোর বিরাম নাই?")—তবু ঐ বারবার শৈশবকে তাড়ান হইয়াছে, ইহা বলাতে শৈশবের শক্তি প্রমাণিত। শৈশবের সঙ্গে সংগ্রামরত যৌবন স্বীকার

* খণ ভরি নহি রহ গুরুজন-মাঝে।
বেকত অঙ্গ ন ঝপাবয় লাজে॥
বালা জন সঙ্গে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহিঁ করঈ॥
মাধব তুঅ লাগি ভেটল রমণী।
কে কহ বালা কে কহ তরুণী॥
কেলিক রভস যব শুনে আনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে॥
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখি হসি দএ গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা-চরিত রসিক-জন জানে॥ (৬১৬)
(সংস্করণ হইতে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ)

করিয়াছে যে, শৈশব এতদিন রাধা-দেহের রসোপভোগ করিয়াছে, এবং কৃষ্ণ অভিযোগ জানাইয়াছে— তবু এখনো তোর বিরাম নাই!—ইহাই দ্বারাই শৈশবের শক্তি স্বীকৃত হইতেছে।

পদটিতে শৈশব-যৌবনের সংগ্রামের মৌখিক পরিচয়ই প্রধান—দেহ ও মনোগত রূপান্তরের কথা অল্প বলিয়া [মাত্র—"পূর্বে যাহারা অবয়ব স্থির ও বিকারশূন্য ছিল (শৈশব লক্ষণ), সে এখনও যাহাকে তাহকে দেখিয়া দেহ আবৃত করে"] ইহা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয়।

৬১১* পদের ছন্দের দোলনে ও রসের আবেগে বাল্য ও যৌবনের দুই প্রান্তে কিশোরীদের দোলানো হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট—("খেলত না খেলত সহচরী মাঝ" ইত্যাদি)। সেই দিক দিয়া ইহাকে যথার্থ বয়ঃসন্ধির পদ বলিতে হয়। তবে বয়ঃসন্ধির যে-অংশে ইহাকে স্থাপন করিয়াছি, তদনুযায়ী না বলিলেও চলে, যৌবনের আধিপত্যই শেষ পর্যন্ত বলবৎ।

যৌবনের অভ্যুদয়কে যে রোধ করা যাইতেছে না, ভণিতায় কবির সমর্থন হইতে বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয় কথার পিঠে কবি বলিয়াছেন, 'বিকাশোন্মুখ অঙ্গকে রোধ করা যায় না।' সুতরাং কবি স্পষ্টই যৌবন-বিকাশের পক্ষে—বয়ঃসন্ধির পদেও।

কবির যৌবন-পক্ষপাত রূপাঙ্কনের প্রকৃতি হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। মনোহর

---

* খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী-মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলি রাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণই বিদ্যাপতি দোতীক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধয়ণে॥ (৬১১)

মুখরুচি, সুরঙ্গ অধর, ভ্রূর ধনু এবং তাহাতে কাজলের গুণ—এ সকলই স্ফুট-যৌবনতা। এবং প্রথম-যৌবনের বিভোর রূপ একটি সুপরিচিত আলঙ্কারিক চিত্রে রসমূর্তি ধরিয়াছে—"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার, মধু মাতল কিএ উড়ই না পার।" বারো ছত্রের পদের দশ ছত্রই যৌবনপক্ষীয়, তথাপি প্রথম দুই ছত্র,—অপূর্ব দুই ছত্রের—সাক্ষ্যে ইহাকে বয়ঃসন্ধির পদ বলিতে হইতেছে।—সে খেলে এবং খেলে না—তার লোক দেখে লজ্জা; সে দেখে এবং দেখে না—যদি সহচরীরা থাকে। একদিকে আছে বাল্যের উচ্ছল সঞ্চরণের পুরাতন অভ্যাস, অন্যদিকে সেই শৈশবচাঞ্চল্যকে যৌবনের নবৈশ্বর্যের গোপন-গরিমায় শাসিত করার ব্যাকুলতা—দুইটি চরণকে তাহা অপরূপ চিত্র ও ভাবরসে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

চতুর্থ অবস্থা

এই স্তরে শৈশবের সম্পূর্ণ পরাজয়। পূর্ব পর্যায়েও শৈশবের পরাজয়ের কথা ছিল, কিন্তু নতি স্বীকারের পূর্বে তাহার সংগ্রামের কথাও বলা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় শৈশব যেন সমর-যোগ্যতার গৌরব হইতেও বঞ্চিত। একদিন দেহে শৈশব ছিল, যেন অবাঞ্ছিত অস্তিত্বে—এই কথাটুকু জানাইয়া কবি নববিকশিত যৌবনশোভায় যথাসাধ্য বিমুগ্ধ। তবে শৈশবের কথা উচ্চারিত বলিয়া এগুলি বয়ঃসন্ধি-পরিমণ্ডলের পদ।

১৭ পদের প্রথম চরণেই কবির মুক্তির নিশ্বাস—"দম্পতির পক্ষে ভাল হইল যে শৈশব গেল।"

এরপর দেহ-মনোগত রূপ :—চরণের চপলতা লোচনে, উভয়ের নয়নে নয়নে দূতীয়ালী; নায়িকার ভূষণরূপা লজ্জার আবির্ভাব; অনুক্ষণ অঞ্চলে হাত, সখীসঙ্গে কথা কহিতে আনত মুখ;—কবি এখানেই থামেন নাই, নায়িকার নবাগত যৌবনের মারাত্মক বেধ-শক্তি একটি অলঙ্কারে ধরিয়া নায়ককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"হে কানাই শুন শুন, আমি নিশ্চয় করিয়া জানিয়াছি যে, এখন নাগরের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। (নায়িকার) ভ্রূ হইয়াছে ধনু, আর কাজলের রেখা ধনুকের গুণ, সে এমন করিয়া বাণ

মারে যে, কেবল (তীরের) পুচ্ছটি অবশিষ্ট থাকে (আর বাকিটা মর্মস্থলে গিয়া বেঁধে)।"

বলাবাহুল্য এমন নয়নক্ষেপে পারদর্শিনী কেউ কিশোরী হইতে পারে না।

১৮ পদটিকে বয়ঃসন্ধির পদ বলিবার পক্ষে যুক্তি ইহার প্রথম কয়েক চরণের পূর্বঘটিত শৈশব-যৌবনের সংঘর্ষের উল্লেখ,—

"আজও দেখিতেছ, কালও দেখিতেছ, আজ-কালের মধ্যে কত প্রভেদ (অর্থাৎ সামান্ত সময়ের মধ্যে শৈশবকে তাড়াইয়া যৌবনের আবির্ভাব)। বেচারা শৈশব সীমা ছাড়িল না, তাহাকে বিতাড়িত করিয়া যৌবন আপনার অধিকার স্থাপন করিল।"

অতঃপর শুদ্ধ যৌবনের রূপ। এই সহসাগত যৌবন-সৌন্দর্য বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব আছে। যথা—

"যৌবনশোভা দিনদিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। অনুরাগে রক্তিম আননের ন্যায় তোমার তরুণ পয়োধর। .....লজ্জায় এত ব্যাকুল যে, সম্মুখের দিকে তাকায় না, কিন্তু নয়ন-তরঙ্গের দ্বারা প্রাণ আকুল হয়।" (ঐ)

ভাবরসসিক্ত শেষ তুলনাটি অনবদ্য। ওখানে লজ্জাকুণ্ঠিত নয়নের রূপাঙ্কন। তাকাইবার জন্য প্রাণ অস্থির, কিন্তু মন বাধা দিতেছে। বাসনার সঙ্গে লজ্জার সংঘাতের কালে চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত নয়নকে নায়িকা নিবারণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু নয়ন ক্ষণে ক্ষণে নিজের ভিতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, যেমন তটবদ্ধ অবস্থায় সরোবর হিল্লোলিত হইতে থাকে। রাধার নয়নও সেইরূপ ভূমিতে নিবদ্ধাবস্থায় সচকিত বাসনায় থরথর করিতেছে। ইহারই কবিকথা—"নয়ন-তরঙ্গ"। 'একটি কথার দ্বিধা-থরথর চূড়ে' যদি একালের কবি 'সাতটি অমরাবতীকে ভর' করাইতে পারেন, তাহা হইলে রাধার থরথর 'নয়ন-তরঙ্গে' কৃষ্ণকে শুধুমাত্র আকুল রাখিয়া মধ্যযুগীয় বিদ্যাপতি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

অনুরাগ-রক্তিম মুখের সঙ্গে নবোদ্গত রক্তিম কুচের তুলনাগত ইন্দ্রিয়-সৌন্দর্য আর নাই বিশ্লেষণ করিলাম।

১৯ পদটিকে বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সঙ্গত কারণ নাই—ইতিমধ্যেই নায়িকা তাহার কুচযুগকুম্ভে নায়কের অঙ্কুশরূপ নখাঘাত লাভ করিয়াছে। একখানি অগ্রবর্তিনীর বিষয়ে শৈশবের অপরিণতির

প্রসঙ্গ উত্থাপন করা ভাল দেখায় না। কিন্তু কবি তাহা করিয়াছেন। বলিতেছেন—"হে শৈশব! আর চোখের সামনে আসিও না; (যৌবনরূপ) রাজার ভয়ে পালাও।"

শৈশবের এইরূপ অকারণ অসম্মানের কারণ, মনে হয়, গর্বের উত্তেজনা। নায়িকা কেবল যৌবনরূঢ়া নয়, তাহার রাজকীয় যৌবন এরই ভিতরে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর। এই সমারোহের মধ্যে বিজয়িনীর দু'একটা পূর্বকীর্তির ঘোষণা দেওয়া দরকার। বেচারা শৈশব সেই জয়কীর্তির বিজিত শিকার। শৈশব পূর্বে অন্যায়ভাবে পররাজ্য গ্রাস করিয়া ছিল।

যৌবন-গরবিনীর মদমত্ত গতিকে কবি বাস্তবিক ফুটাইতে পারিয়াছেন—

'মাধব! দেখ, বালা সাজসজ্জা করিয়া যৌবনরূপ গজরাজে চড়িয়া চলিয়াছে। মদনরূপ মাহুত উহার প্রসাধন করিল। সে লীলাভরে নাগরকে দেখিতে চাহিতেছে।"

এত অল্প কথায় যৌবনের অহঙ্কৃত অথচ উৎফুল্ল রূপের প্রকাশ অল্পই দেখিয়াছি।

২২৬ পদে নায়িকার ভ্রূভঙ্গ ও নয়ন-কটাক্ষ দেখিয়াও কবি পদের প্রথমে বলিয়াছেন—"তথাপি শৈশব তাহার সীমা ছাড়ে নাই।" পদের শেষে বলা হইয়াছে—"এত দিন শৈশব তাহার সঙ্গে লাগিয়াছিল, এখন মদন সমস্ত পাঠ পড়াইল।"

শেষ বক্তব্যই এই পদে সত্য। শৈশব যে অধিকার ছাড়ে নাই, এইরূপ কোনো লক্ষণ নায়িকার আচরণে ও প্রকৃতিতে ব্যক্ত নয়। হাসিয়া বুকে কাপড় দেওয়া, কাঞ্চনবর্ণ কুচাঙ্কুর গোপন করার চেষ্টা, 'যৌবন-স্পর্শে' সুমুখীর বিপরীত আচরণ, সখীর প্রশ্নে লজ্জা ও সুধাবর্ষণকারী অর্ধোক্তি—এ সকলই যৌবনকৃত্য, ইহাতে শৈশব নাই।

৬১৭ পদকে বয়ঃসন্ধির পদ বলার একমাত্র কারণ এখানে দেহের ক্রমবিকাশের কথা আছে। দেহ বলিতে এই পদে একটি দেহাঙ্গকে—বক্ষকে—বুঝিতে হইবে। বক্ষকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র দেহের ক্রম-বৃদ্ধির ইঙ্গিত। পয়োধর প্রথমে বদরী ফলের ন্যায়, তারপর লেবুর ন্যায়, তারপর বীজপুরের (?) ন্যায়, তারপর বেলের ন্যায়। বেলই শেষ অবস্থা। নায়িকা এই অবস্থায় উপনীত।

নায়িকা এখন পূর্ণ সৌন্দর্যময়ী, তাহা বোঝা যায় কবির কথায়। তিনি নায়িকার স্নানকালে নায়ককে আহ্বান করিয়াছেন। চাঁচর কেশের চামর নায়িকার বক্ষের স্বর্ণ-শম্ভুকে স্নানকালে অর্চনা করে। এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্যোপভোগের জন্যই কেবল নায়ককে কবি আহ্বান করেন নাই, তাঁহার মুক্তকণ্ঠে সর্বজনীন আহ্বান—"স্নানকালে সিক্ত বসনাবৃত সেই যৌবনবতীর বক্ষশ্রী যে পুরুষ দেখিবে, তাহার পরম ভাগ্য।"

বয়ঃসন্ধি পদগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিলাম। বিদ্যাপতি-পদাবলীতে বয়ঃসন্ধির বিশেষ মর্যাদা আছে বলিয়া আমাদের এই চেষ্টা। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-পদাবলীতে বয়ঃসন্ধির শ্রেষ্ঠ কবি ইহাতে দ্বিমত নাই। যে প্রখর ও প্রৌঢ় দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পদগুলিতে আছে, তাহাতে পদগুলি বিদ্যাপতির পরিণত বয়সের রচনা মনে হয়। যৌবনে সচরাচর এই আত্মস্থ রসদৃষ্টি আসে না। যৌবনের আকর্ষণ যৌবনের উন্মাদ সৌন্দর্যের প্রতি, বয়ঃসন্ধি সে দৃষ্টিতে অস্ফুট অনুত্তেজক অবস্থা। বিদ্যাপতির এই পর্যায়ের কবিত্ব-শক্তিকে যে-কোনো সময়ে অনুরূপ সংস্কৃত শ্লোকাবলীর পাশে রাখিয়া তুলনাবিচারে উপস্থাপিত করা যায়। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে বয়ঃসন্ধি ও তরুণী বিষয়ক বেশ কিছু প্রকীর্ণ শ্লোক বা শ্লোকাংশ চয়ন করিয়াছেন। সেই অংশগুলি এবং অনুরূপ অন্যান্য শ্লোকের পাশে রাখিলেও দেখা যাইবে বিদ্যাপতি এ বিষয়ে কতবড় কবি ছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে বর্ণনা শুধু দেহবিকাশের, মনের কথা সামান্যই—বিদ্যাপতির পদে আছে দেহ ও মনের 'আমি আগে আমি আগে'-রূপ অপূর্ব কোলাহল।

বিদ্যাপতির আরো কৃতিত্বের কথা, তিনি শরীর ও মনের ক্রমবিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে পারিয়াছেন। বয়ঃসন্ধি বিষয়ক প্রকীর্ণ শ্লোকের উপজীব্য যেখানে মূলতঃ দেহ, সেখানে বিদ্যাপতি তাহারই মধ্যে মনের সঞ্চার করিয়া গভীরতা আনিলেন, কিন্তু ঐ মনকে আধুনিক পদ্ধতিতে অতি-প্রাধান্য দিয়া দেহকে রক্তহীন করিয়া ফেলিলেন না। ইদানীংকালে

বয়ঃসন্ধির অবস্থা সাহিত্যের খুব প্রিয় বিষয়বস্তু। গল্পে উপন্যাসে বয়ঃসন্ধিকালীন মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও ভয়াবহ তত্ত্বের মুখোমুখি হইয়া আমরা প্রশ্ন করিতে বাধ্য হই—ইহা কি রসসাহিত্য না যৌন-মনোবিজ্ঞান? পুরাতন কবিদের বিরুদ্ধে একালের অভিযোগের জালে একালের সাহিত্যিকগণ জড়াইয়া পড়িতেছেন। পূর্ববর্তীরা যদি অলঙ্কারশাস্ত্র ঘাঁটিয়া কাব্য রচনা করিয়া থাকেন, একালে অনুরূপভাবে মনোবিজ্ঞানের ব্যাধিকাহিনীকে সাহিত্যে চালিয়া দেওয়া হইতেছে। বিদ্যাপতি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, তিনি বয়ঃসন্ধিপদে প্রকীর্ণ শ্লোকের কিংবা আলঙ্কারিক লক্ষণের দেহফাঁদে ধরা পড়েন নাই, তেমনি অপরদিকে অতিমনস্তত্ত্বের অশরীরী ভাব লইয়া ব্যস্ত হন নাই। তিনি উভয়ের সামঞ্জস্য আনিতে পারিয়াছেন। এবং তাঁহার সঙ্গতিবুদ্ধির সেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এমনকি, মন অপেক্ষা এই পর্যায়ে দেহের ঈষৎ প্রাধান্য যে ঘটিয়াছে, তাহাও তাঁহার সঙ্গতিবোধের নিদর্শন দিতেছে। বয়ঃসন্ধি নারীর ক্ষেত্রে দেহ ও মনে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে তাহাতে মন না দেহ, কিসের পরিবর্তন বেশী, সে লইয়া বৈজ্ঞানিক তর্কালোচনা চলিতে পারে; কিন্তু পদ লিখিতেছেন মধ্যযুগীয় কবি, যিনি একালের অর্থে মন্ময় কবি নন। তাঁহাকে মূলতঃ দৃষ্ট-বস্তু অবলম্বন করিয়াই দেহের ও মনের ছবি আঁকিতে হয়, অন্ততঃ বিদ্যাপতির মত তন্ময় গীতিকবির পক্ষে। সেক্ষেত্রে বাহিরের পরিবর্তনের রেখা বাহিয়াই অন্তর-সন্ধান। কবি এমন কিছু মনের সংবাদ বলিতে পারেন না, যাহা বাহিরের দেহগত পরিবর্তনের দ্বারা সমর্থিত নয়। বিদ্যাপতি বয়ঃসন্ধি পদে সেইজন্য দেহের ঈষৎ প্রাধান্য বজায় রাখিয়া কাব্যিক সঙ্গতি অদ্ভুতভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

বয়ঃসন্ধি বিষয়ে আলোচনা আর দীর্ঘ করিব না। বিদ্যাপতির প্রেম-মনস্তত্ত্বের আলোচনার সূচনা এই পর্যায় হইতে। বয়ঃসন্ধির চতুর্থ অবস্থায় শৈশবজয়ী একটি সৌন্দর্যপূর দেহ দেখিয়াছি। দেহের মধ্যে একটি মনও বাড়িয়া উঠিয়াছে গ্রহণের সুন্দর ক্ষুধায়। সেই দেহমনের লীলাবিলাসই আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয়।

অভিসারের বহুমুখী রূপ

॥ এক

অভিসারের সূচনা : মন্মথ-প্রণাম

খোলস ছাড়িয়া তরুণ সর্পটি বাহির হইয়াছে। সে কৌতুকে—কৌতূহলে—ক্ষুধায়—দংশন করিতে চায়। বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রথম প্রেম। প্রথম প্রেমের আলোচনা কিন্তু বর্তমানে একটি পরিচ্ছেদ পিছাইয়া দিব। পূর্বরাগ হইতে মিলন হইয়া বিরহ, এবং বিরহের পরিণতি ভাবগভীর মিলন বা ভাবসম্মিলন পর্যন্ত প্রেমের বিকাশকে একত্রে বিচার করিতে চাই। এই অখণ্ড প্রেমলোকের মধ্যে বহির্গত কোনো কিছুকে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই ভাল। অভিসারে প্রেমের যতবড় শক্তি-প্রমাণই থাক না কেন, তাহাতে বহির্জীবনের প্রবেশ আছে। মুক্ত পৃথিবীর আলো ও উল্লাস অভিসারিণীর দেহে কম্পিত। প্রথমে তাই অভিসারের আলোচনা সারিয়া লইতেছি।

অভিসারের সূচনায় একটি প্রণাম আছে :—

প্রণমি মনমথ করহি পাএত।
মনক পদে দেহ জাএত॥
ভূমি কমলিনী গগন সূর।
পেম পন্থা কতএ দূর॥*

মনমথকে প্রণাম। তিনি করায়ত্ত হইলে মনের পশ্চাতে দেহ যায়। ভূমিতে পদ্ম—আকাশে সূর্য—প্রেমের পথ দূর কোথায়!

* তুলনীয়—রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয়! কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ?॥
১১-৪ কুমার-রতিবিলাপ।

সার্থক বর্ণনা, মন্মথের। অভিসারের মন্ত্রের মতো চাবি হয়। মন্মথকে আয়ত্ত করিলে মনের পশ্চাতে যায় দেহ—দুর্লভ মিলনও সুলভ হয়—নচেৎ আকাশের সূর্যে ও ভূমির পদ্মে মিলন হয় কিরূপে ?

এই মন্ত্র সহায় করিয়া রাধিকা বাহির হইবেন। বিপদের বাধায় এবং মন্মথের আকর্ষণে রাধা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিবেন। তখন রাধা শিবকে স্মরণ করিবেন, নিষ্ঠুর প্রিয়তমের নিন্দা করিবেন, কুজনের বিরুদ্ধে বেদনা-ক্ষোভ ঢালিয়া দিবেন, প্রার্থনা করিবেন অপ্রাণীর নিকট, মেঘদূতের যক্ষের মত, সব কিছু করিবেন, কিন্তু থামিবেন না, যত প্রতিবন্ধকতাই ঘটুক। যে-নায়িকা শ্রাবণের সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়াছে, শশীকে গ্রাস করিয়া রাখিবার জন্য রাহুকে বুঝাইয়াছে, রাত্রিকে অন্ধকার করিতে মেঘকে কোটি রত্নের প্রলোভন দেখাইয়াছে—(৩১৬),—তাহার যাত্রা থামিবার নয়। থামিবে কিভাবে ? মন্মথায়ত্ত মন বহুপূর্বেই অগ্রসর—মাত্র দেহটি পিছাইয়া আছে। রাধার বড় বিপর্যস্ত মনের অবস্থা। নিজেই কৃষ্ণকে ইঙ্গিত করিতেছেন, খুব গাঢ় ইঙ্গিত,—

কামিনী কোরে পরসায়ল হাথ।
পুনপুন কেশ উতায়য়ে মাথ ॥ (৮৭)

কামিনী নিজের কোলে হস্ত স্পর্শ করিল, এবং বারংবার মাথার কেশ নামাইল। (তাহাতে জানা গেল, অন্ধকার নিশীথে কানাই যেন নিজেই অভিসার করেন।)

আর কৃষ্ণ যদি ইঙ্গিতে সাড়া দিয়া অভিসার না করেন ? রাধা দূতীকে পুনশ্চ ইঙ্গিতে জানাইলেন, সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই অভিসার করিবেন। সখীদের মাঝে (সখীরা এখানে সহায়িকা নয়) রাধা প্রসাধনরতা ছিলেন। সেই কালেই ইঙ্গিত করিতে হইল। তার মূল কথা :—অমাবস্যার ত্রয়োদশী তিথিতে অন্ধকার রাত্রে কেতকী ও চাঁপাফুল ফুটিবে, তখন রাধা অভিসার করিবেন। তেরটি তিলকের দ্বারা ত্রয়োদশ তিথির, মৃগমদ-কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ দ্বারা কৃষ্ণ নিশির এবং কবরীতে কেতকী ও চাঁপা গাঁথিয়া এই ফুলগুলির প্রস্ফুটন-কালের সঙ্কেত। (৮৮)

চমৎকার সঙ্কেত—সঙ্কেতের জন্য সঙ্কেত। রাধার ছলনার সৌন্দর্য-বিকাশে কবির আনন্দ। সকলেরই।

এখানেই শেষ নয়—কৃষ্ণের নিকট রাধা সঙ্কাক্ষরে একটি বার্তা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লিখিবার পরিবেশটি মনোরম, পত্র রচনার পদ্ধতি আকর্ষণীয়।—

কুসুমিত কানন কুঞ্জ বসী।
নয়নক কাজর ঘোর মসী॥
নখত লিখলি নলিনীদল পাত।
লীখি পাঠাওল আখর সাত॥ (৩২৩)

কুসুমিত কাননকুঞ্জে রাধা উপবিষ্টা, নলিনীদল তাঁহার লিখনপত্র, নয়নের কাজল হইল মসী এবং তীক্ষাগ্র নখর হইল লেখনী।*

বিদ্যাপতির অভিসারের সৌন্দর্য-মাদকতা আরো বুঝাইতে হইবে? সংস্কৃতকাব্যের রস-ঘনত্ব এবং লোককাব্যের প্রাণ-তারল্য, উভয়ই বিদ্যাপতির অভিসার-কাব্যে সম্মিলিত।

*পত্ররচনার কথা অন্যত্রও আছে—

আনহ কেতকীকের পাত।
মৃগমদ মসী নখ কাপ॥
সবহি লিখবি মোর নাম।
বিনতি দেবি সম ঠাম॥
সখি হে গইএ জনাবহ নাথ।
কর লিখন দএ হাথ॥
নাম লইত পিয় তোর।
স্বর গদগদ করু মোর॥
আন্তর জনু হো তোহার।
তেঁ দূর কর উর হার॥
অব ভেল নব গিরি সিন্ধু।
অবহু ন সুমঝ সুবন্ধু॥ (৫২৯)

"কেতকী পত্র আন, মৃগমদ মসী, (ও) নখ লেখনী (হউক)। সব আমার নামে লিখিবি। সকল ঠাঁই আমার মিনতি দিবি। সখি, প্রিয়া নাথকে জানাইবি, হাতে করিয়া লিখন তাহার হাতে দিবি। (আমার পক্ষ হইতে লেখ—) প্রিয়তম, তোর নাম লইতে আমার স্বর গদগদ হয়। তোমা হইতে অন্তর (ব্যবধান) না হয়, সেইজন্য বক্ষের হার দূর করিতাম। এখন নব গিরি সিন্ধু (ব্যবধান) হইল, সুবন্ধু এখনও বুঝিলে না?"

উদ্ধৃতির শেষ চার ছত্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির বিখ্যাত "চীর চন্দন উরে হার ন দেলা" অংশের ঐক্য লক্ষণীয়।

দুই ॥

তিন শ্রেণীর অভিসার : অমরু-জাতীয়—জয়দেবীয়—গোবিন্দদাসীয় : —সৌন্দর্যাভিসার—

পদসাহিত্যে বিদ্যাপতির অভিসারের বিশেষ মর্যাদা আছে, তাঁহার নিজ কাব্যধারাতেও ইহার উল্লেখযোগ্য মূল্য।

প্রথমেই চোখে পড়ে অভিসারপদের বৈচিত্র্যের রূপ। অভিসার কবিকে অসীম মুক্তি দিয়াছিল। অভিসার মানে পথ, আর পথের বিস্ময়ের কে ইয়ত্তা করে? অভিসারে যে-গৃহ হইতে যাত্রা শুরু করা হয় এবং পৌঁছান হয় যে-কুঞ্জে, সেই দুই স্থির আশ্রয়ও সচল পথের অন্তর্ভুক্ত; কারণ যাত্রার সূচনা-বিন্দুতে অবস্থিত গৃহটি অভিসারিণীর প্রাণাবেগে কম্পিত এবং পরিণতির কুঞ্জভবন স্পন্দিত অভিযাত্রিণী অগ্নিময়ীকে গ্রহণ করিয়া। বিদ্যাপতি তাঁহার অভিসারপদে গৃহ, পথ এবং কুঞ্জকে সম্মিলিত করিতে পারিয়াছেন। সবশ্রেণীর অভিসারই তাঁহার কাব্যে আছে।

ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে, ধরা যাক, অভিসার আছে তিন শ্রেণীর,—অমরু-জাতীয়, জয়দেবীয় এবং গোবিন্দদাসীয়। সত্যকার অভিসার বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা মেলে অমরু-জাতীয় অভিসার পদে। এ কথার অর্থ নয়, অমরু অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি। মোটেই নয়, কিন্তু অমরু যে ইন্দ্রিয়-রসাত্মক কামকাব্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি তাহাতে সন্দেহ কোথায়? যথার্থ অভিসারিণী কামপীড়িতা, গোপন অবৈধ প্রেমের সঞ্চারিণী নায়িকা। প্রাচীন হালের সংগ্রহে, অমরুর রচনায়, কিংবা শৃঙ্গারমূলক সংস্কৃত শ্লোকাবলীতে, অভিসারিণী সর্বত্র দেহময়ী, সাহসিকা ও নিশাচরী। অভিসারিকার রূপাঙ্কনে কালিদাসও অমরু-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। কালিদাসের রচনা বলিয়া সেখানে সৌন্দর্যরূপ আরো কর্ষিত, এই পার্থক্য। কুমারসম্ভব কাব্যে অভি-সারিণীর যাত্রাসহায়ক দীপ্তোজ্জ্বল ওষধির বর্ণনা হউক, কিংবা মেঘদূতের

আলোকরুদ্ধ রাজপথে বিদ্যুৎরেখায় সহসা-উদ্ভাসিত অভিসারিণীর রূপ হউক—কালিদাস সুন্দরতর, তবু অমরু-জাতীয়।

না, কালিদাস একেবারে অমরু-জাতীয় একথা ঠিক নয়। সাধারণ অভিসারে তীব্র অবৈধ কামনার সঞ্চরণ। কালিদাস অভিসারিণীর নিকট হইতে রূপসৌন্দর্য আহরণের প্রচেষ্টায় সেই নিষিদ্ধ উত্তেজনার অনেকখানি হরণ করিয়াছেন। অমরু-জাতীয় অভিসার পদ বলিতে কি বুঝি, আচার্য গোপীকের একটি পদ হইতে তাহা উপস্থাপিত করা চলে,—"গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার গৃহের কাছে আসিয়া কোকিলাদির নাদের দ্বারা সঙ্কেত করিতে-ছেন, এদিকে সেই সঙ্কেত শুনিয়া রাধাও দ্বারমোচন করিয়া বাহিরে আসিতেছে, রাধার চঞ্চল শঙ্খবলয় এবং মেখলাধ্বনি শুনিয়াই কৃষ্ণ রাধার বহির্গমনের কথা বুঝিতে পারিলেন। এদিকে শব্দ পাইয়া বৃদ্ধা (জটিলা কুটিলা) কে কে করিয়া বার বার চীৎকার করিতেছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; এইরূপ অবস্থাতেই কৃষ্ণের সেই রাত্রি রাধাগৃহের প্রাঙ্গণের কোণে যে কেলিবিটপ, তাহারই ক্রোড়ে গত হইল।"*

এই হইল যথার্থ পরকীয়া প্রেম-অভিসার, যদিও অভিসারের পূর্ণ বর্ণনা এখানে নাই। এই জাতীয় অভিসার বিদ্যাপতির মধ্যে আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলিয়াছি—জয়দেবীয় অভিসার। যথার্থ অভিসার জয়দেবে সম্ভব নয়, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। জয়দেবের কল্পনাজগতে পরকীয়া প্রেম ছিল,—সমস্ত দেহদাহ লইয়াই ছিল,—কিন্তু ছিল না পরকীয়া প্রেমের বিঘ্ন-প্রতিস্পর্ধী চিত্তশক্তি। সেখানে যাত্রা আছে, যাহা প্রতিরোধ-হীন কুঞ্জগমন। অর্থাৎ অভিসারের ছন্দে দেহ-সঞ্চরণ। জয়দেব কী অসাধারণ সুন্দর—তাঁহার রতিসুখসার লীলাগতি বর্ণনায়! লাবণ্য-হিল্লোলিত গতির কথা মনে হইলেই মনে পড়ে জয়দেব। রাধার মদনমনোহর বেশ, গুরুদেহের জন্য বিলম্বিত গতি; বনমালীর ধীরসমীরে যমুনাতীরে কুঞ্জভবনে প্রতীক্ষা এবং শয্যা রচনা করিয়া সচকিতনয়নে পথপানে চাহিয়া নাগরীর আগমন-প্রত্যাশা;—সমস্তটিই বর্ণোজ্জ্বলতায় ও ইন্দ্রিয়াবেগে উদ্‌ভ্রান্তকর।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে গোবিন্দদাসীয় অভিসার, অধ্যাত্মকাব্যের শ্রেষ্ঠ

* শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ঐ মুক্তানুবাদ—১৩০-৩১। তুঃ মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার অভিসার।

অভিসার। কিন্তু অধ্যাত্মকাব্যের অভিসার বলিয়া তাহা প্রাকৃতকাব্যের অনেক লক্ষণ হারাইয়াছে। নূতন গুণগৌরব অর্জনও করিয়াছে। নূতন গুণের ক্ষেত্রেই গোবিন্দদাসীয় অভিসারের মাহাত্ম্য। নূতন গুণ বলিতে অধ্যাত্মগুণ বুঝিতে হইবে। বিদ্যাপতির মধ্যে এই গোবিন্দদাসীয় অধ্যাত্ম-গুণান্বিত অভিসারের পদও কিছু আছে। বৈষ্ণব অভিসারে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, বিদ্যাপতির অনেক উপরে তাঁহার স্থান। কিন্তু একথা বলা যায়, অধ্যাত্ম অভিসার পদেও বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের পূর্বসূরী। তাছাড়া অভিসারকে লৌকিকভাবে ধরিলে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস অপেক্ষা পূর্ণতর কবি। এই বিষয়ে কিছু বিস্তৃত বিচার প্রয়োজন, অভিসার আলোচনার শেষাংশে তাহা বলিব।

বিদ্যাপতির কাব্যে অভিসারের বহুমুখী বৈচিত্র্যের কথা বলিলাম। এখন বৈচিত্র্যের কিছু প্রত্যক্ষ সন্ধান নেওয়া যাক।

সৌন্দর্যময়ী অভিসারিণীতে আবার প্রত্যাবর্তন করিতে চাই। কারণ সৌন্দর্যে প্রথম মনোহরণ। বলিয়াছি, এই জাতীয় অভিসার জয়দেবীয়। কালিদাসীয় নয় কেন? অপরূপা নারীর গতিছন্দ কালিদাসে যেরূপ—সংস্কৃতে আর কোন্ কবির ক্ষেত্রে সেরূপ? হয়ত কালিদাসের গতিময়ী নারী সব ক্ষেত্রে নামতঃ অভিসারিণী নয়—সুন্দর সংসার-পথেই যাত্রিনী—কিন্তু অনেক সময়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি, কালিদাস বা তাঁহার পরবর্তী কবি অভিসারের পূর্বাপর পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অভিসারিণীর গতিরূপকে উপভোগ করিয়া থাকেন। জয়দেবে রাধাও নামে অভিসারিণী—কিন্তু কোনো সময় কি মনে হয়, সমাজ এই রাধার পথান্ধকারে নূতন অন্ধকার যোজনা করিয়াছে? তাই বিদ্যাপতির অভিসারিণীর রূপাস্বাদনে আমরা সহজেই কালিদাসকে স্মরণ করিতে পারি, যে-কালিদাস কুমারসম্ভবে সঞ্চারিণী পল্লবিনী উমার শিব-যাত্রা আঁকিয়াছেন, কিংবা অম্লান রূপের অক্ষরে আঁকিয়াছেন ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-গমন। আমি ঐ সকল বর্ণনার প্রলোভনে পড়িতে চাই না, কিন্তু বাসন্তী-উমার আপাতমন্থর ভাবকম্পিত গতির মধ্যে

সৌন্দর্যের শক্তি-পরিমাণ যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, কিংবা সৌন্দর্যের অন্তর্গত প্রখর ব্যক্তিত্বের রূপটি যেভাবে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-গতিতে উন্মুক্ত হইয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ অন্যত্র মেলে কিনা সন্দেহ। এই দুই ক্ষেত্রেই নারীর সৌন্দর্যরূপ ফুটাইতে তাহার গতিরূপকে কালিদাস আঁকিয়াছেন। কালিদাস যেখানে সত্যই অভিসারিণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, সেখানেও তিনি নারী-সৌন্দর্যকে এক বিশেষ অবস্থাতে স্থাপন করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন।

বিদ্যাপতিও অভিসারের বহু পদে এই নারীরূপের অর্চনাকারী। অভিসারের প্রয়োজন তাঁহার নিকট সৌন্দর্যের প্রয়োজনও বটে। অভিসারপদে রূপসৃষ্টির ক্ষমতা পূর্বোল্লিখিত মদন-প্রণাম, মনোহরণ ইঙ্গিত কৌশল, আমন্ত্রণলিপি রচনা ও মনোরম কুঞ্জ-পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা স্পষ্টীকৃত। এখানে রাধার সৌন্দর্যময়ী রূপটি পুনশ্চ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

অভিসারিণী নারীর পক্ষে প্রসাধনের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। সে প্রসাধনের মূল কথা, উপযোগিতা। অভিসারিণীকে আত্মগোপন করিয়া পথ চলিতে হইবে; সাজ সজ্জা ও প্রসাধন আত্মগোপনের সহায়ক হওয়া চাই। পথের অবস্থা, প্রকৃতির রূপ, কোন্ ঋতু—এই সব হিসাব লইতে হয়। হিসাব করিয়া, প্রকৃতির রূপে রূপ মিশাইয়া, প্রিয়তমের অর্জনে একটি নারী বাহির হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি তাঁহার পদাবলীতে আত্মগোপন-সহায়ক প্রসাধনের প্রচুর চিত্র আঁকিয়াছেন।

প্রসাধন আত্মগোপনে সাহায্য করে—এই শেষ কথা নয়। যদি হইত, তাহা হইলে দুর্গম পথযাত্রায় সাজসজ্জাকে বাহুল্য বিবেচনায় বর্জন করা হইত। তামসী পথে যাত্রার জন্য রাধার নীলাম্বরী পরিধান বা অঙ্গে মৃগমদ লেপন প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু অভিসারকালে নূপুরের কি প্রয়োজন? নূপুর নিজ গৃহে খুলিয়া আসিলেই হয়! এই কথায় কবি শিহরিয়া উঠিবেন। সে কী! অভিসারিণী যে নাগর-গমন করিতেছে! যখন সে কুঞ্জভবনে পৌঁছিবে, তখনকার আত্মনিবেদনে এই প্রসাধন হইবে বিমোহন উদ্দীপন। অভিসারিণী তাই সবকিছু প্রসাধন অটুট অথচ আবৃত রাখিয়া অভিসার-কুঞ্জে যাইতে চায়। নূপুরের ধ্বনিতে লক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা, সেজন্য গোবিন্দদাসের রাধা চলে 'চীরহি মঞ্জীর ঝাঁপি' (উৎস, অমরুশতক), তাই

বলিয়া বিপজ্জনক মঞ্জীরকে বর্জন?—কদাপি নয়। যে নূপুর দুর্জনের দুষ্ট কর্ণকে টানিয়া আনিয়া বিপদ বাধায়, সেই নূপুরই অন্যত্র পরম সম্পদ—মিলনকালে নায়কের কানে অমরাবতীর রিণিকিঝিনি সঙ্গীত।

প্রসাধনের এত মূল্য। তবু এক সময় বিচিত্রস্বভাব কবিদের নিকট (বিচিত্রস্বভাব বলিয়াই তাঁহারা কবি) প্রসাধন মূল্যহীন হইয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রেও কবিরা ঐ সৌন্দর্যের কথাটাই টানিয়া আনেন। প্রসাধন সৌন্দর্য বাড়াইয়াছিল—সহসা উদাসীন হইয়া কবিরা বলেন—কে সেকথা বলে? প্রসাধন রাধা-নাগরীর সৌন্দর্য বাড়াইতে পারে কখনো? কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। কবি নিজের মনের কথা সখীর মুখে বসাইয়াছেন—অলকে মৃগমদ চন্দন ও মুখে তিলক করিও না। সুন্দর পূর্ণিমার চন্দ্র তিলকের দ্বারা ম্লান হইবে। স্বভাবতঃই (তুমি) রাধা অত্যন্ত সুন্দরী, অধিক সাজসজ্জা কি করিবে?" (৯৭)। প্রসাধনের অপ্রয়োজনীয়তা সখী আরো নানা দৃষ্টান্তে প্রমাণ করিতে ব্যস্ত থাকে। আসল কথা আছে একটি ছত্রে,—"যদি উভয়ের মনে অনুরাগ থাকে তবে অঙ্গরাগে কি লাভ?" (৯৬)

আসল বস্তু অনুরাগ—অঙ্গরাগ নয়। সেকথা আমরা খুব জানি। অঙ্গরাগকে কবি প্রথমতঃ প্রত্যাখান করেন অনুরাগের মাহাত্ম্য দেখাইতে। রাধার স্বাভাবিক দেহসৌন্দর্য—প্রসাধন যাহার পক্ষে মালিন্যজনক—অঙ্গরাগ-বর্জনের দ্বিতীয় কারণ। এক্ষেত্রে রাধার নিজস্ব তনুলাবণ্যের গৌরবজ্ঞাপনই কবির অভিপ্রায়। অলঙ্কারের অধ্যাপক বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধার সৌন্দর্য-উদ্‌ঘাটনে অলঙ্কারের পর অলঙ্কারের ঢেউ তুলিয়াও এক সময় বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—অসম্ভব—রাধারূপ অপরূপ—বর্ণনার অতীত। সর্ব অলঙ্কারজয়ী সে রূপ। অলঙ্কারশাস্ত্র মন্থন করিয়াও বিদ্যাপতি রাধা-বক্ষের 'কৌস্তভ' হইতে পারে এমন রত্নোদ্ধারে সমর্থ হন নাই।

তবু কবি রূপের দাস। রূপের কথাই তাঁহাকে বলিতে হয় শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায়। অভিসার-আলোচনার প্রথমাংশে আমরা রূপময়ী রাধিকাকেই দেখিতেছিলাম। অভিসারিণীর আরো দু'একটি 'রূপ'-চিত্র দেখিয়া প্রসঙ্গ শেষ করা চলে। যেমন বিদ্যাপতি কর্তৃক কয়েক ছত্রে অঙ্কিত একটি কালিদাসীয় চিত্র—

"রমণীকে মেঘরুচি বসন পরাইলাম। বাম হস্তে শ্বেত কমল, দক্ষিণ হস্তে পান শোভা পাইতেছে, সুন্দরী গজগমনে চলিল।" (৩২৫)

কবি এখানেই থামেন নাই—প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম করিয়া জগতে অতুলনীয় এই নারীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ইঁহার পক্ষে জ্যোৎস্নাভিসারই শ্রেয়। সাধারণতঃ আমরা জানি কৃষ্ণনিশীথে আত্মগোপন করিতে পারিলে অভিসারের সুবিধা হয়। রাধার ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত। কেন, বিদ্যাপতি লীলায়িত কল্পনায় তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"আজ পূর্ণিমা তিথি জানিয়া আমি আসিলাম, তোমার অভিসারের উপযুক্ত। তোমার দেহের জ্যোতি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইবে। কে পার্থক্য বুঝিতে পারিবে? সুন্দরি··· তোমার তুল্য রমণী জগতে কে? তুমি যেন অন্ধকারকে হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মানিও না। তোমার মুখ তিমিরারি।" (৩৩৫)

এমনই পূর্ণিমারজনীতে রসভারমন্থর গজগমনা রাধা যাত্রা শুরু করেন। কবির চোখে আবেশ-ধীর গতিরূপ যেমন সত্য, তেমনি সত্য রাধার আবেগ-অধীর ভাসমান গতি। বিদ্যাপতি এক রূপসিদ্ধ অলঙ্কারে রাধার অসামান্য গতি-চিত্রটি ফুটাইয়াছেন—

"(রাধা) শ্বেতবস্ত্রে তনু আচ্ছাদিত করিয়া, হস্ত ধরিয়া পবনের গতির সঙ্গে গতি করিয়া লইল। যেমন চন্দ্র পবনে চলিয়া যায়, সেইরূপ রাধা কুঞ্জে উদিত হইল।"—(৬৩৭)

উৎপ্রেক্ষাটি অপূর্ব। রাধা কিভাবে কুঞ্জে উঠিলেন?—পূর্ণিমার রাত্রে আকাশে চাঁদের ভাসিয়া চলা গ্রীষ্মদেশের পরমতম সৌন্দর্য। চাঁদের উপর লঘু মেঘখণ্ড তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া চলে। তাহার দ্বারাই চাঁদের গতিবোধ হয়। আকাশের এই চিত্র একদিকে—পূর্ণিমার নীল আকাশ, তাহাতে উদ্ভাসিত পূর্ণোজ্জ্বল চন্দ্র, ইতস্ততঃ ভাসমান শুভ্র খণ্ডমেঘ এবং চতুর্দিকে রসালোকবিহ্বল নিসর্গপ্রকৃতি; অন্যদিকে মর্ত্যেও সেই একই দৃশ্য—লঘুগতি ভাসমান চন্দ্রবৎ রাধা, রাধার চন্দ্র-দেহের উপর খণ্ড মেঘতুল্য আন্দোলিত শুক্লাম্বর এবং রাধার অভিসার-যাত্রার আমোদে উৎফুল্ল পারিপার্শ্বিক। কবি অদ্ভুত শক্তিতে এই দুই চিত্রকে মিলাইয়াছেন। অভিসারে রাধার অনুরাগ ও আবেগ, কোমল মুগ্ধ ভালোবাসা ও গরবী আনন্দের বিহ্বলতা কবি এই পদের প্রারম্ভে ফুটাইয়াছেন—

সহচরী বাত ধয়ল ধনী শ্রবণে।
হৃদয় হুলাস কহত নহি বচনে॥
সহচরী সমুঝল মরমক বাত।
সাজাওল জইসে কিছু লখই ন জাত॥ (ঐ)

"সহচরীর কথা ধনী কানে শুনিল, মনের আনন্দ মুখে বলিল না। সহচরী হৃদয়ের কথা বুঝিল; এমন করিয়া সাজাইল যাহাতে কিছুই লক্ষ্য করা যায় না।"

॥ তিন

অভিসারের নানাপ্রকার মানসিক পর্যায়

লৌকিক অভিসার

সুন্দরীকে দেখিলাম। অভিসারের পদের বৈচিত্র্যের কথা বলিয়াছি। রূপের আলোচনায় এতক্ষণ বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যের হিসাব লইতেছিলাম, এখন বৈচিত্র্যের কিছু অন্তর্বিধ পরিচয় লওয়া দরকার। অভিসারিণী নারীর মনোবৈচিত্র্যের পরিচয় সুরু করা যায় এইবার।

বিদ্যাপতির পদে অভিসারিকার মানসিক অবস্থার অনেকগুলি স্তর দেখা যায়। খুবই স্বাভাবিক। প্রেম-জীবনের সকল অবস্থাতেই (বিরহ ভিন্ন) অভিসার করা সম্ভব। বিদ্যাপতি তাই নানা অবস্থার অভিসারিণীকে দেখিয়াছেন। অভিসারিকার স্বভাবের পার্থক্যও আছে। নিতান্ত লৌকিকা হইতে আধ্যাত্মিক নায়িকা পর্যন্ত। বিদ্যাপতিতে লৌকিকা, আধ্যাত্মিকা, সকলেই অভিসার করিয়াছে। লৌকিক নায়িকা কিভাবে আধ্যাত্মিক নায়িকাতে উন্নীত হয়, অভিসার পর্যায়ে তাহা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

অভিসার পর্যায়, আমাদের বিবেচনায়, তাই বিদ্যাপতির কাব্যের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক রূপ নির্ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রেমের অন্য পর্যায়ে সে সুযোগ অল্প, কারণ, সেইসব ক্ষেত্রে বাহির হইতে দেখিলে

প্রেমের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক রূপের মধ্যে পার্থক্য করা শক্ত। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলনে সাধারণ নায়ক-নায়িকা ও রাধাকৃষ্ণ একই মানস পরিস্থিতি ও দেহাবর্তনে আবদ্ধ। প্রেম যেখানে দেহ-মনোমিশ্র, সেখানে তার অধ্যাত্ম-প্রকৃতি পরিস্ফুট করা কঠিন কাজ। তাই রাধার অধ্যাত্মস্বভাব উদ্‌ঘাটিত করিতে বৈষ্ণব কবির পক্ষে বিরহ পর্যায় অপরিহার্য। বিরহে শুদ্ধকামনা। আবার বিরহ সম্বন্ধে একথাও তো বলা যায়, লৌকিক প্রেম একনিষ্ঠ হইলে কিছু পরিমাণে দেহভাবনাশূন্য বিচ্ছেদানুভূতি লাভ করিতে পারে। যেমন মেঘদূতের বিরহিণী। এই সব অসুবিধার জন্যই পরবর্তী বৈষ্ণব কবি, যেমন গোবিন্দদাস, রাধার তপস্যার কথা বলিতে অভিসার পর্যায়কে লইয়াছেন, যে কঠিন অভিসারযাত্রাকে প্রেম-সংগ্রামের রূপকে রূপান্তরিত করা সম্ভব। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবি (যাঁহারা সর্বাবস্থায় চণ্ডীদাসের মত অধ্যাত্ম ভাবস্ফুরণে সমর্থ ছিলেন না)—অভিসারের দুঃসাহসী যাত্রার মধ্যে রাধার প্রেমমহিমা দেখিতে চাহিয়াছেন।

বিদ্যাপতি গৌড়ীয় ভাবনার মধ্যে অবস্থিত নন। কিন্তু তিনি জীবনের সত্যকে স্বীকার করার মত বড় কবি। অভিসারের প্রাণশক্তি কোথায় আছে তিনি জানিতেন। সে শক্তি আছে, প্রথমতঃ, লালসাতুরা নারীর কামাগ্নিতে, দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাত্ম প্রবর্তনার প্রেম-গতিতে। বিদ্যাপতির কাব্যে দুই অবস্থার কথাই মেলে।

অভিসারিণীর মানসিক অবস্থার অনেক স্তর পাওয়া যায় বিদ্যাপতিতে। একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় সে নারী ভীত বালিকা মাত্র, প্রেম-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও বহির্গমনে আশঙ্কিত। রাধা অভিসারে নিতান্ত অনিচ্ছুক—কৃষ্ণকে দূতী ইহা বুঝাইয়াছেন। অনিচ্ছার কারণ—এক, রাধা বালিকা ও বিলাসিনী; দুই, তাহার প্রথম প্রেম, সে স্বভাবে ভীরু, মিলনসুখে এমন আসক্তি জন্মে নাই যে, দুর্গম পথ অতিবাহন করে। পথের রূপ—তাহা দূরবর্তী, কণ্টকময়, অতিশয় ভয়ঙ্কর ও গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ। (৮৫)

দেখা যাইতেছে, এখানে রাধা ভীরু বালিকা,– অধ্যাত্মসাধিকা তো দূরের কথা, সে যৌবনমত্তা, বিয়ভুজঙ্গকারিণী, লালসাতুরা নায়িকা পর্যন্ত নয়।

প্রেমরতির ব্যাপারে রাধার এইরূপ অনভিজ্ঞতার ও উৎসাহহীনতার কথা কয়েকটি পদে আছে।

বলাবাহুল্য রাধা এই অবস্থায় থাকিতে পারেন না। অভিসার তিনি করিবেনই, কিন্তু 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' চরিত্র আসিতে অনেক বিলম্ব ঘটিবে। মধ্যবর্তী অবস্থায় সমাজ ও গুপ্তপ্রেম দুই দিক রাখিয়া চলিতে রাধা সচেষ্ট থাকিবেন। তাঁহার প্রেম তখন আপোষমুখী। তথাপি প্রবৃত্তির পীড়ন বহুক্ষেত্রে অসহ্য ; বাধাপ্রাপ্ত নারীর আর্তনাদ, সুযোগমত তাহার পথাবতরণ, দ্রুত ক্ষুধিত গতি—এই সকল চিত্র বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যাইতেছে। এইকালে রাধিকা ও সাধারণ নায়িকার মধ্যে পার্থক্য করা শক্ত। আমরা দু'একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

৯১ পদে অভিসারকুঞ্জ হইতে সময়মত প্রত্যাগমনে রাধা ব্যগ্র। লৌকিক নায়িকার রীতিতে রাধা অভিসারে গিয়াছেন, লৌকিক নায়িকার মতই দুই দিক রাখিয়া চলিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে সক্রিয়। ৩১৭ পদে রাধা বলিতেছেন,—"গমন না করিলে প্রেম যায় এবং গমন করিলে কুল যায়।" ৪৪৮ পদেও একই কথা,—"গমন করিলে গৌরব যায়, অ-গমনে জীবন সংশয়।" এই ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুতীব্র পরিচয় মেলে ৯৯ পদে। দ্বিধার কারণ নৈসর্গিক এবং মানসিক। অন্ধকারে নায়িকা নিশ্চিন্তে (?) অভিসার করিতেছিল। এমন সময় "চণ্ডালের ন্যায় চাঁদ" উঠিল। ফলে নায়িকা যাইতেও পারে না, ফিরিতেও পারে না। উভয় ক্ষেত্রেই লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা। না ফিরিতে পারিলে কলঙ্কের ভয়,—কলঙ্ককে তুচ্ছ করার চিত্তবল এখনও অনর্জিত। অন্যদিকে সঙ্কেতকুঞ্জে যাইতে না পারার দুঃখ কল্পনাতীত, কারণ—(১) "পঞ্চশর যুবতীকে আধমরা করিয়াছে", (২) "তাঁহার নিকট মনে হয় ঘর শূন্য"; (৩) "সুপুরুষকে আশা দেওয়া ছিল"; এবং (৪) "না যাইতে পারিলে পরম প্রেম পরাভব প্রাপ্ত হয়।"

এই পদটিতে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই। মনে হইতে পারে. এই ধরনের পদ কেবল সাধারণ নায়ক-নায়িকাকে লইয়া লেখা হইত। কিন্তু তাহা যে নয়, তার প্রমাণ,—সামান্য পূর্বে উল্লিখিত ৯১, ৩১৭, ৪৪৮ পদগুলির মানসিক দ্বিধা রাধারই।

প্রেম-কৃচ্ছ্র পালনে রাধার মানসিক ক্লান্তির কারণ হয়ত পথ ও প্রকৃতির ভয়াবহতা, বিদ্যাপতি যাহা জোরালো ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"রজনি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিশ পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোষ বরিষ ঘন
সংশয় পড় অভিসার।......
চরণ বেড়ল ফণী হিত মানলি ধনী
নেপুর না করএ রোরে।" (ঐ)

"রাত্রি কজ্জল উদ্গিরণ করিতেছে। ভীম সর্প। দুর্বার কুলিশ বর্ষিত হইতেছে। গর্জনে মন ত্রস্ত। কুপিত মেঘ বর্ষণ করে। অভিসারে সংশয় পড়িল।......চরণে বেষ্টন করিল সর্প, তাহাকে ধনী মঙ্গল করিয়া মানিল, নূপুরের ধ্বনি হয় না।"

রাধার নিগূঢ় মনোভাবের রূপ কবি সংক্ষিপ্তভাবে চমৎকার ফুটাইয়াছেন আর এক পদে। ৩১৯ পদের প্রথম দিকে আছে সুন্দরীর অভিসার-প্রস্তুতির মনোরম বর্ণনা। সুন্দরীর অপূর্ব সজ্জা, মৃগমদপঙ্কে অঙ্গরাগ, সূর্যাস্তকামনায় পশ্চিম দিকে বারবার দৃষ্টিপাত, উপরে তুলিয়া নূপুর-বন্ধন এবং দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণবর্ণ সাড়ী পরিধান। এই অবস্থায় রাধা অকারণ হাসিতেছেন। কবি বলিলেন—"তোমার মনোভাব যেন সঘন অন্ধকার।" মনোভাব সম্বন্ধে 'সঘন অন্ধকার' বিশেষণ তাৎপর্যময়। বিশেষণটি আরো সুন্দর এইজন্য যে, বাহিরে তখন আসন্ন সন্ধ্যার ক্রমান্ধকার নিসর্গপ্রকৃতি এবং রাধার দেহে কৃষ্ণনীল মৃগমদ ও ঘনকৃষ্ণ বসন। রাধার পারিপার্শ্বিক ও প্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া গহন অনির্দেশ্য মনের রূপ নির্দেশ করিতে 'সঘন অন্ধকার' কথা দুটি ব্যবহৃত।

এইসব ক্ষেত্রে সাধারণ অভিসারিণী নায়িকা ও অভিসারিণী রাধিকার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কৃষ্ণপ্রেমের সার্থকতা বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পরবর্তীকালে মহাভাবময়ী রাধিকাকে গঠন করা হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম, বিদ্যাপতির রাধার মনে কৃষ্ণপ্রেমের সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয়ের আভাস আছে। এই সংশয় লৌকিক নায়িকার। রাধার চরিত্রাঙ্কনে প্রেম-বিষয়ে লৌকিক নায়িকার আত্মসঙ্কোচকে কিছু পরিমাণে রাধার উপর অর্পণ না করিয়া বিদ্যাপতি পারেন নাই।

পূর্বে সাধারণভাবে বিদ্যাপতির কাব্যে নায়িকা ও রাধিকার সমরূপতা বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। অভিসার পর্যায়ে সে বিষয়ে আরো

কিছু প্রমাণ যোজনা করা চলে। রাধা সম্বন্ধে দূতীর একটি অধার্মিক ভাবনা, '—তরুণি! তোমার জন্য আসিলাম, দুষ্ট লোকের নয়ন তোমার (রাধিকার) বদনচন্দ্রের রসপান করিবার জন্ত চকোরের ন্যায় ঘুরিতেছে।' (১০২)। এখানে কবি কলঙ্কিত লোকদৃষ্টির সামনে রাধারূপকে আনিতে দ্বিধাগ্রস্ত নন। ৩২০ পদেও সেই কথা। সেখানেও আছে, রাধিকার জন্ত পিশুনজনের লোচন চকোরের ন্তায় ধাবিত।

এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান স্বীকারোক্তি একটি পদের ভণিতায় মিলিতেছে। ৩৩২ সংখ্যক পদটি বিখ্যাত, বিদ্যাপতির অভিসারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ,—"মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।" এই পদে কৃষ্ণের নিকট দূতী রাধার অনুরাগোন্মত্ত অনন্তসাধারণ পথযাত্রা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"সে নিজের স্বামীকে ছাড়িয়া, বিষম নদী সাঁতরাইয়া ও শ্রেষ্ঠ কুলের কলঙ্ক অঙ্গীকার করিয়া, তোমার অনুরাগে মত্ত হইয়া কিছুই গণনা করিল না।" দূতীর কথা সমর্থন করিয়া বিদ্যাপতি বলিলেন—"কাম ও প্রেম দুইই একত্রিত হইলে কখন কি না করাইতে পারে?"

বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই—বিদ্যাপতি কাম এবং প্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং রাধার মধ্যে উভয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন।

কাম ও প্রেম একত্র হইলে কোন্ গতিবেগ দান করে বিদ্যাপতি বহু পদে বহু বার তাহা বলিয়াছেন। একদিকে তিনি আঁকিয়াছেন বাধাপ্রাপ্ত নারীর যাতনা, অন্যদিকে পথবর্তী নারীর বাসনাতাড়িত গতি। যাতনার চিত্র এইরূপ :—

"গৃহে গুরুজন, পুরে পুরজন জাগিয়া আছে, কাহারও নয়নে নিদ্রা লাগে নাই। কোন্ প্রযুক্তি অনুসারে আমার যাওয়া হইতে পারে? অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাহস করিয়া প্রেমভাণ্ডার রক্ষা করিতেছি। এখনো নিষ্ঠুর ভাগ্যের উদয় হইল না।...বিধাতা প্রেমসংঘটন করিল কিন্তু ..(উড়িয়া মিলিবার জন্ত) পাখা দিল না।"—(৩১৩)

"চরণের নূপুর ঘন বাজে। রাত্রিও চাঁদে উজ্জ্বল। বৈরিণী ননদিনী নিদ্রায় আকুল হয় না। এখন সবই আমার আয়ত্তের বাহিরে। দূতি! কানুকে বুঝাইয়া বলিও, আজ রাত্রিতে যদি যাওয়া না ঘটে, সে যেন মনে রাগ না করে...প্রেমে সকল দিক সামলান যায় না, বলপূর্বক নারীকে বিনাশ করে।"—(৩১৪)

"প্রথম নবযৌবন, প্রবল মদন, চৈত্র মাসের ছোট রাত্রি। ঘরে গুরুজন জাগিয়া আছে।
...কমলপত্রে জলের ন্যায় চিত্ত স্থির থাকে না—কখনো গৃহে কখনো গৃহের বাহিরে।...পঞ্চবাণ সর্বদাই পীড়া দিতেছে...গুরুজন নিদ্রিত কি না তাহা নিরূপণ জন্ত অশ্রুপূর্ণ বদন বস্ত্রে ঢাকিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটায়।"—(৩১৫)

জালবদ্ধ পশুর মত রাধার এই কাতরোক্তি। কবি কথাটিকে মোলায়েম করিয়া বলিয়াছেন,—'যেন জালে বাঁধা হরিণী।' এই নারী যখন কোনো-ক্রমে মুক্ত হয়, তখন তাহার বাসনামত্ত পথচলার রূপ কিরূপ হয়, কবি তাহাও জানাইতে ভুলেন নাই। বলিয়াছেন,—"পথে পথিকের আশঙ্কা, পদে পদে পঙ্ক ধরে, নবীনা যুবতী কি করিবে? দ্রুত চলিতে চায়, পুনরায় খসিয়া খসিয়া পড়ে। যেন জালে বাঁধা হরিণী"—(৩১৫)। একটি অলঙ্কার পূর্ণশক্তিতে রাধার বেগ ও আবেগরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে,—"সুন্দরী পবনের ন্যায় শীঘ্র চলিল, যেন অনুরাগ পশ্চাৎ হইতে ঠেলিল, কাম হাত ধরিয়া টানিল।" (৯২)

॥ চার ॥

অভিসারে দূতীর ভূমিকা

বিদ্যাপতির পদে এই ক্ষুধা-শিহরিত গতি মহামান্বিত হইয়া এক সময় প্রেমাভিসারে পরিণত হইয়াছে। সে রূপ আমরা পরে লক্ষ্য করিব, তার পূর্বে কায়-গতির পটভূমিকা পূর্ণভাবে দেখিয়া লওয়া ভাল। এইখানে বিশেষভাবে দূতীর কথা আসে। অভিসারে দূতীর সবিশেষ প্রাধান্য। দূতী নায়িকাকে জাগাইয়া, জালিয়া, অভিসারে ঠেলিয়া দেয়। পরকীয়া প্রেমে দূতীর ভূমিকা আলোচনায় পূর্বে যেকথা বলিয়াছি—পরকীয়া প্রেম প্রবৃত্তিতাড়িত, দূতীচালিত—এখানে তদপেক্ষা বেশী কিছু বলার নাই।

অভিসার-পর্যায়ে দূতী-ভূমিকার মূল্য বিষয়েও সেখানে মন্তব্য করিয়াছি। বাস্তবিক অভিসারে দূতী কি না করে! এক এক সময় মনে হয়, অভিসারের মূল দায়িত্ব যেন তাহারই, দুইটি অবুঝ উদ্ধত প্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে দূতী যেন নিজের আনন্দে প্রেমের খেলায় নিয়োগ করিতেছে। তাহারা দূতীর হাতের জীবন্ত পুতুল। দূতীর যখন এমন দায়, তখন তাহাকেই সবকিছু করিতে হয় —নায়িকার নিকট গুপ্ত প্রেমের মহিমাজ্ঞাপন. নায়কের রূপগুণের প্রশংসা, প্রেমের ব্যাপারে সাহসের মূল্য, প্রতিশ্রুতি-রক্ষণে অনুরোধ, নায়কের চলচ্চিত্ত প্রকৃতির কথা জানাইয়া ভয় দেখানো, বার্তা বিনিময়, নায়িকার উপর ভর্জন, নায়ককে গালি, উভয়ের দুঃখে পর্যায়ক্রমে সমবেদনা—দূতীচেষ্টার মধ্যে কি নাই! দূতী প্রেমের পথপ্রদর্শক ও প্রেমতত্ত্বের বস্তু-দার্শনিক।

আমরা এইখানে প্রশ্ন করিতে পারি—প্রেমব্যাপারে দূতীর স্বার্থ কি? সে কেন এত করে? একটা স্বার্থ আছে—অর্থের, ইতর প্রেমে তার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ভদ্র কবিরা সে ইতর উল্লেখে স্বস্তিবোধ করেন না। দ্বিতীয় স্বার্থ—বিদ্যাপতি দু'একবার তেমন অন্যায় দূতী-উদ্যমের উল্লেখ করিয়াছেন—নায়িকাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দূতী নায়ক-সম্ভোগ করিয়াছে। এই অশালীনতাকে আমরা ঘৃণা করিতেছি। আমরা দূতীর অন্য দুই স্বার্থকেই মূল্যবান বোধ করি। প্রথম প্রীতির, দ্বিতীয় সৌন্দর্যের। দূতী রাধা ও কৃষ্ণকে ভালবাসে। তাঁহাদের মিলনে তাহার হৃদয়ে সুখ। ইহাই প্রীতির স্বার্থ। আর দূতী ভালবাসে সুন্দরকে, শিল্পকে। রাধার মত নারী এবং কৃষ্ণের মত পুরুষ কোথায় মিলিবে? ইঁহাদের মিলনে বিশ্বশিল্পের পূর্ণতা। দূতী সুন্দরে সুন্দর মিলাইয়া অপূর্ব রচনার আনন্দ ভোগ করে।

দুঃখের বিষয় দূতীর সুন্দর সৃষ্টিতে সব সময় সৌন্দর্য বজায় থাকে না। থাকা সম্ভব নয়, কারণ সৃষ্টির পিছনে থাকে অনেক নিরানন্দ ক্লেশ, নিয়মবদ্ধ দৈনন্দিনতা। বহুক্ষেত্রে তাহাই উগ্র হইয়া সৃষ্টিসুষমাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। দূতী-প্রয়াসেও তাই দেখি। তবে সেখানে প্রাণের ও প্রয়োজনের তাগিদ যথেষ্টই শক্তিশালী। তাহার কিছু পরিচয় দিব।

যেমন ধার বাক, অজস্র সাহসের প্রশস্তিবাক্যের একটি :—

"হে সুন্দরী! চল চল, আজ মঙ্গল (কাজ) কর, ইতস্ততঃ করিলে কাজ হয় না।

গুরুজন পরিজনের আশঙ্কা দূর কর, সাহস ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, আশাও পূর্ণ হয় না. বিনা জপে কেহ সিদ্ধি পায় না, না গেলে ঘরে নিধি আসে না।"—(৩০৬)

যেমন, চোরী প্রেমের মহিমাখ্যাপন। বড় লাগসই উপমা দিয়া দূতী কথা বুঝাইতেছে—

"নদীর কূলে চুপচাপ বসিয়া (স্নানের) ইচ্ছা করা বড়ই লজ্জার কথা, না নামিলে কার্যসিদ্ধি হয় না। অভিলাষ করিয়া যে (প্রেমের) স্রোত বহাইয়া দিতে পারে, দুর্লভ প্রেম সেই লাভ করে। সখি! শীঘ্র অভিসার কর, গুপ্ত প্রেম সংসারের সার।"—(৮৬)

এবং ধরা যাক দূতী-প্ররোচনার আরো একটি পদ—১০০ সংখ্যক পদটি। সেখানে প্ররোচনার ভাষা ও ভঙ্গি কিরূপ মাদকতাময়! প্রত্যেকটি বচন তীব্র তেজ-সম্পন্ন।—(১) শীঘ্র অভিসার কর, শৃঙ্গাররস সংসারের সার, (২) ওধারে প্রিয় আশায় বসিয়া আছে, এধারে নিজের গলায় কামফাঁস, (৩) সাহস করিলে অসাধ্য সাধন হয়, এবং (৪) হাসিয়া আলিঙ্গন দাও ও হৃদয় ভরিয়া যুবতীজনের সুখগ্রহণ কর।

আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি, দূতীর চেষ্টায় কিরূপ ফল ফলিয়াছিল, রাধা কিভাবে দূতীর বক্তব্যের প্রাণশক্তিকে স্বীকার করিয়া ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন। এই রাধা অতঃপর একদিন কুঞ্জে পৌঁছিবেন, অভিসারের প্রান্তে তাঁহার কৃষ্ণমিলন ঘটিবে। সেই মিলনকালেই দূতীর সুখ চূড়ান্তে পৌঁছায়। কুঞ্জের বাহিরে অপেক্ষমানা দূতীর সুতৃপ্ত মনোভাব আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু সর্বত্রই ভাগ্যে সুখ জোটে না—অনেক সময় নায়িকা নায়ককে কুঞ্জে পায় না—যে নায়িকা 'যমুনাতরঙ্গ সাঁতার দিয়া', 'শত সহস্র সর্পকে পার হইয়া', 'নিশাচরদের এড়াইয়া' আসিয়াছে (৩৬৩)। এইখানে রাধার অন্তর্জ্বালা ও ব্যাকুল কান্নার সঙ্গে দূতীর বেদনাশ্রু আসিয়া মেশে। এইখানে দূতীর হৃদয়বিকাশ।

রাধিকা কুঞ্জে প্রিয়-দর্শন পান নাই—দূতী কৃষ্ণের নিকট সংক্ষেপে, বিরল বাণীতে, অবস্থাটি ফুটাইয়াছেন। বর্ণনার সংক্ষিপ্তিই অভিপ্রেত ফলসৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে—

বর্ষার বিষম বারিধারা পড়িল,
মেঘ যেন রুষ্ট হইয়াছে,
তরুণ অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা যায় না,
(নায়িকা) সাপের মাথায় পা দিয়াছিল। (৩৬১)

এবং আরো একটি পদে একই প্রকার সমবেদনার সৌন্দর্য—

"তুমি যদি না আসিতে পারিবে তবে ধনীকে কথা দিয়াছিলে কেন? মালতীর মালাই বা রাখিয়া গিয়াছিলে কেন?......

"বালা তোমার দর্শন পাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তরুতলে ভিজিল।" (৩৬৫)

॥ পাঁচ ॥

অভিসারে ঋতুবৈচিত্র্য : বর্ষাভিসারের অভিসারের আধ্যাত্মিক রূপ

দূতী-প্রয়াসের বহুল বৈচিত্র্যের মতই বিদ্যাপতির অভিসারপদে পটভূমিকার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। অভিসারপদে দৃশ্যসৌন্দর্যসৃষ্টি যেখানে অভিপ্রেত, তেমন অংশ আগেই অনেক দেখিয়াছি। জ্যোৎস্নাভিসারে রূপসৃষ্টির বিশেষ অবসর। অবশ্য এখানে বলা দরকার, যথার্থ অভিসার একটি সময়েই সম্ভব—তিমির রাত্রে। তিমিরাভিসারই মুখ্য অভিসার, কোনো সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব কবিরা—বিদ্যাপতিও—প্রেমের পরিবেশগত বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য অন্যবিধ অভিসারের কথা বলিয়াছেন। প্রেমের একটা ক্রীড়ানন্দিত রূপ আছে। নানা পটভূমিতে, আলোক ও ছায়ায়, সেই ক্রীড়ারূপ ফুটিয়া ওঠে। প্রেমের যথার্থ 'স্পোর্টস' যদি কোথাও থাকে, সে অভিসারে। তাই কবিরা অভিসারের প্রচলিত তিমিরাবৃত পারিপার্শ্বিক ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছেন।

শুক্লাভিসার তাহার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। শুক্লনিশীথে অভিসার করাইয়া রাধার সিতলাবণ্য প্রদর্শনের বড় সুবিধা। কেননা তখন জ্যোৎস্নার অমলকান্তি এবং রাধার বিমল আভা একেবারে মিশিয়া যায়। এহেন শুক্লরজনী

দিবসেরই অনুরূপ—'দিবসের মত রাত্রি'—এবং উজ্জ্বল দিন-রাত্রিতে জ্যোতির্ময়ী রাধাকে অভিসার করাইয়া কবি আনন্দিত।

দিবাভিসারে কথা যখন কবি বলেন, তখন কিন্তু বর্ষার মেঘে দিনের আলোক ঢাকিয়া দেন, তখন দিনে ও রাত্রে প্রভেদ থাকে না। তখন সূর্য মেঘাচ্ছন্ন, বর্ষণে পথ জনশূন্য—অর্থাৎ অমারজনীর দিন-সংস্করণ (৩০৭)। দূতী সুযোগ দেখিয়া রাধাকে অভিসারে উৎসাহিত করিয়াছে। আর সে অতি মদনময় উদ্দীপনা—"হে সখি, বচন শ্রবণ কর, রাত্রিতে কি অনুরাগের সমাধান হয়? অন্ধকূপের ন্যায় রাত্রির বিলাস, যেন চোরের মত মন ভয়ে ভয়ে থাকে" (৩৩৪)। যৌন-মনস্তত্ত্ব ইহাকেই 'অবলোকন কাম' বলে, এবং ইহার চরিতার্থতার জন্য দূতীর উৎসাহপূর্ণ চেষ্টা সমাদরে গৃহীত হইবে বোঝা যায়। কিন্তু গৃহীত হইলেই যে দূতী সুখী হইবে এমন কি কথা? দূতীর অজ্ঞাতে যদি নায়িকা দিবাভিসার করে? সেই 'অন্যায় কর্মে' দূতী ধিক্কার দিয়াছে—সে ধিক্কারে ঈর্ষার ব্যঞ্জনাটি খুবই আকর্ষণীয়। সেখানে দিবাভিসারকে 'আসুরিক কর্ম', 'দিন দুপুরে হাতী চুরি' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে এবং গঞ্জনা দিয়া বলা হইয়াছে—'দিবসকালে কে নিজের প্রিয়তমের কাছে যায়? মদনের রঙ্গে তোমার অত্যন্ত অনুরাগ"—(৩৩৩)। দূতীর মুখে এখানে একেবারে বিপরীত কথা।

পরিবেশ-পার্থক্যের এই রূপগুলি স্বাদ-পার্থক্য সৃষ্টির জন্য কল্পিত, তাহা দেখিলাম। তিমিরাভিসার যে আসল অভিসার তার একটি প্রমাণ দেওয়া যায়—জ্যোৎস্নাভিসারে পারদর্শিনী রাধা জ্যোৎস্না দেখিয়া আনন্দিত—জ্যোৎস্নার রঙে রঙ মিশাইয়া বাহির হইতে পারিবেন এই জন্য নয়—পূর্ণিমা মানে পরদিন হইতে কৃষ্ণপক্ষের সূচনা, যে কৃষ্ণপক্ষ অভিসারের অনুকূল সময় (১০৩)।

সুতরাং আসে তিমিরাভিসার, আসে বর্ষাভিসার। বিদ্যাপতির কাব্যে এই দুই অভিসারের প্রাধান্য। সকল কবির কাব্যেই। অভিসারিণীর পক্ষে রাত্রির অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ষারাত্রে তেমন অন্ধকার অতি সুলভ। বর্ষার বজ্রবিদ্যুৎঝলসিত রাত্রে পথ জনশূন্য বলিয়া অন্যের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই সকল কারণে বর্ষাভিসারের প্রতি কবির পক্ষপাত। কিন্তু বর্ষাভিসারের পদগুলি পড়িবার পর একটি প্রশ্ন থাকিয়া

যায়, অন্ধকার রাত্রিটিকে অতখানি ভয়ঙ্কর করিয়া তোলায় কি সত্যই প্রয়োজন ছিল? কালিদাস নবমেঘকে নিষেধ করিয়াছেন, সে যেন অভিসারিণীকে ভয় না দেখায়। অপরপক্ষে বৈষ্ণব কবিরা বর্ষারাত্রিকে ভয়াবহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বৈষ্ণবকাব্য যে অধ্যাত্মকাব্য, তার একটি প্রমাণ এখানে মেলে। কবিকে দুঃখজয়ী প্রেমের মহিমা দেখাইতে হইবে। দুঃখ নানামুখী। হৃদয়ে বাহিরে সর্বত্র। হৃদয়ের দুঃখের কথা—প্রেমিকের অদর্শন কিংবা প্রবঞ্চনাজনিত দুঃখের কথা—বৈষ্ণব কবি যথেষ্ট বলেন। বাহিরের দুঃখের কথা—সমাজের নিন্দাদির কথাও প্রচুর পরিমাণে পাই। এইবার, এখনো প্রয়োজন পার্থিব বিপদের কথা বলার—ঐ বিপদ-দুঃখের দ্বারা রাধার প্রেম তপস্তা হইয়া উঠিবে। বৈষ্ণবকাব্যে উমা-তপস্তার মত দীর্ঘস্থায়ী কঠোর তপ দেখাইবার সুযোগ নাই। অথচ কৃচ্ছ্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ না হইলে প্রেমের মহিমা বিশ্বাস-যোগ্য হয় না। বর্ষার ভয়ঙ্কর রাত্রি বৈষ্ণব কবিকে পঙ্ক-কণ্টকে-সর্পে-বিদ্যুতে-বজ্রে সেই প্রেম-পরীক্ষার সুযোগ দিয়াছে।

অভিসারের পদে তাই যথেষ্ট বর্ষাবর্ণনা। হৃদয়-নাচানো মনোহরণ বর্ষা নয়, প্রাণ-কাঁপানো কৃষ্ণ-বরণ বর্ষা। এহেন বর্ষার কবি বিদ্যাপতির প্রকৃতি-দৃষ্টির আলোচনা এখন করিব না, পরে সে প্রসঙ্গ আসিবে, বর্তমানে এইটুকুই বক্তব্য—ঐ বর্ষা রাধার এক বিশেষ মূর্তির পটভূমিরূপেই আসিয়াছে। পটভূমিতে এবং চরিত্রে সঙ্গতি থাকিলেই যথেষ্ট। আমরা বিদ্যাপতির পক্ষে বলিব, তিনি অভিসারিণী নারীর চতুর্দিকে বর্ষার যে আবরণী দিয়াছেন, কাব্যসঙ্গতি ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া তাহা রীতিমত প্রশংসাযোগ্য।

বর্ষা-রাত্রে অভিসারিণী পথে নামিয়াছেন। একবার দুইবার নয়—অজস্রবার। কৃষ্ণাকাশে, দুর্গম পথে বারবার দুলিয়াছে একটি স্বর্ণ দেহরেখা। এই স্বর্ণ-সুন্দরী যখন অভিসার-কুঞ্জে পৌঁছিবেন—পৌঁছিবেনই আমরা জানি—তখন তিনি এক নূতন গৌরবে উজ্জ্বলা—বিদ্যাপতির কাব্যেই। সেই উজ্জ্বল গরিমা আধ্যাত্মিকতার। সামান্যা অভিসারিণীকে কবি অসামান্যা প্রেম-সন্ধানীতে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। রাধার সাধারণ রূপ আগেই দেখিয়াছি, এখন শেষবারের মত অসাধারণ রূপ দেখিয়া লইব।

পথে বাহির হওয়ার আগে রাধা চন্দ্রপ্রদীপটি নিভাইয়া দিয়াছেন। 'অন্ধকার পান করিয়া যখন চন্দ্রোদয়' হইল রাধার পথে, তখন রাধা অনুপম গঞ্জনায় লজ্জিত করিলেন সেই অন্যায়কারীকে। ধিক্কার দিয়া বলিলেন—"জগতের নাগরীরা যখন মুখশোভায় তোমাকে জয় করিল, তখন তুমি হারিয়া আকাশে পলায়ন করিলে। সেখানে রাহু তোমাকে গ্রাস করিল। তোমাকে আর গালি কি দিব, বিধাতা মাসে একদিন তোমাকে সকল শক্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় দিনে আর তুমি পূর্ণ থাকিতে পার না।" (৩১৮)

সুতরাং চন্দ্র ডুবিয়া গেল। এমন গঞ্জনায় যে লজ্জা না পায় সে অন্ততঃ চন্দ্র নয়। গগন ভুবন ভরিয়া আঁধার নামিল। সে রাত্রি বড় দুস্তর, বড় অন্ধকার। চন্দ্র থাকিলেও অসুবিধা, গেলেও তাই। রাত্রির অন্ধকার সহায়ক মনে হইয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল সেই অন্ধকার সুযোগ বুঝিয়া আক্রমণাত্মক—'কাজরে সাজলি রাতি',—কজ্জলে সজ্জিত রাত্রি। অন্ধকারের যুদ্ধঘোষণা। কবি বলিতেছেন, অন্ধকার বাহিরে এবং ভিতরে ;—'অন্তর ভর রজনী, দূর অভিসার।' অভিসারের স্থান দূরে, অন্তর ভরিয়া রজনীর অন্ধকার। রাধা পথে নামিয়াও ভরসা পাইলেন না, অভিসারকুঞ্জে হয়তো একটি স্নেহদীপ জ্বলিতেছে, কিন্তু এত দূরে যে, পথে তার ক্ষীণ আলোক-শিখাও আসিতেছে না। তবু রাধা যাইবেনই, যদিও অন্ধকার শত্রু, নৈরাশ্য শত্রু, বর্ষারাত্রি শত্রু, প্রহরীগণ শত্রু, তবুও একটি পরম মিত্র আছে—চরম মিত্র—অনুরাগ। 'ওজন করিয়া দেখিলাম প্রাণের অপেক্ষা স্নেহ অধিক'—রাধা বলিলেন। রাধা তাঁহার প্রিয়তমের গুণগৌরবে বিশ্বাস করিয়া আছেন—তাঁহার গুণগৌরব এইরূপ যে যুগ বহিয়া গেলেও একরূপ থাকে।' নিজ-প্রাণের অগ্নি এবং প্রেমিকের ভালবাসার ইন্ধন—জলন্ত রাধাকে পথে দেখিয়া মুগ্ধকণ্ঠে সখী বলে—

জয় অনুরাগিণী ও অনুরাগী।
দূষণ লাগত ভূষণ লাগি॥—(৩২০)

এবং—

"পথ যদিও অন্ধকার, কামদেব হৃদয়ে উজ্জ্বল।" (৬৩৬)

দূতী যে এই কথা বলিতে পারিয়াছে তার কারণ, রাধার মনঃশক্তি সে দেখিয়াছে। তিমির-উদ্গারী ভয়ঙ্করী রাত্রিতে পথে নামিতে কোমলপ্রাণা

নায়িকা স্বাভাবিক আতঙ্কে একবার শিহরিত হইয়াছিল, তারপরে সর্বশক্তি প্রয়োগে সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছিল, 'যা হয় হউক, আমি কথা রাখিব, মনকে আজ সাহস দিলাম।' এই সাহসের দারুণ পরিণতিকে নায়িকা অস্বীকার করে না, বলে—দেখিতে পাইতেছি, আমার সর্বনাশ লেখা আছে চতুর্দিকে। এবং সে সর্বনাশ আসিতেও বিলম্ব করে না। দূতী দেখে, তিমিরে রুদ্ধদৃষ্টি নায়িকা ভূমিস্পর্শ করিয়া পথ খুঁজিতেছে, পথ হারাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া একই স্থানে আসিতেছে, তাহা দেখিয়া দূতীর মনে সংশয় জাগিয়াছে—সত্যই কি প্রেম এত মূল্যের উপযুক্ত? বেদনায়, জ্বালায় মথিত কণ্ঠে বলে—

সুমুখি পুছওঁ তোহি স্বরূপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর।

সুমুখি, তোকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, প্রেমের সীমা কত দূর?

রাধিকার যন্ত্রণা দেখিয়া প্রেমের সীমা সম্বন্ধে দূতীর মনে এই যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, ইহা লৌকিক, অপরদিকে আছে আধ্যাত্মিক প্রেম, যাহা যন্ত্রণামুগ্ধ। সেই শ্রেষ্ঠাকে পাই, পাই কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অভিসার পদকে। তিমিরেই রাধাজ্যোতির উজ্জ্বলতর উচ্ছ্বাস। কিন্তু যে-শুক্লাভিসারকে রূপামোদগতি বলিয়া লঘু করিয়াছি, সেইখান হইতেও তাপসীকে উদ্ধার করা চলে, কারণ রাধার চরিত্র এখন পূর্ণ পরিণত। প্রথমে শুক্লাভিসারের সেইরূপ একটি পদ গ্রহণ করিব। তারপরেই তুলিব বর্ষাভিসারের পদ পরপর।

কয়েকটি পদে (পদ কৃষ্ণ-নামাঙ্কিত নয়) দূতী নায়িকাকে সাহস অবলম্বন করিতে আহ্বান করিয়াছে। অপরিসীম মহিমায় ভর করিয়া সেই সাহস আসিয়াছে। আত্মবিস্মৃত প্রেমের চূড়ান্ত ঘোষণা। ভাষা কেবল প্রয়োজনমত উদাত্ত নয়, সন্দেহ তাহাতেই, অর্থাৎ এ প্রেম প্রথমাবধি অপ্রাকৃত নয়। কিন্তু হইলে কি হয়, নায়িকার কঠিন প্রতিজ্ঞায় আছে বজ্রশক্তি—সে দ্বার ভাঙিবেই—

সখি হে আজ যাওব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর না মানব
বচন চুকব নহী॥ (৯৫)

সখি, আজ যাইবই। গৃহের গুরুজনের ভয় মানিব না। বাক্যচ্যুত হইব না।

যাইবার পথে বাধা যথেষ্ট। রজনী শুক্লা, সহজে লক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা। নায়িকা একবার শুক্লাভিসারের উপযোগী সাজসজ্জার কথা বলিল বটে—দেহে চন্দন লেপিব, গজমোতি পরিব, নয়ন অঞ্জনশূন্য করিব, শ্বেতবসন পরিব—কিন্তু তাহাতে কাজ হোক বা না হোক, আজ অভিসারে কোনো বাধাই সে মানিবে না,—

জইও সগর গগন উগত
সহসে সহসে চন্দা॥
ন হম কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে। (ঐ)

আকাশে সহস্র সহস্র চন্দ্র সকল উদিত হউক, আমি কাহারও দৃষ্টি-নিবারণ করিব না, আমি নিজেকে অন্তরাল করিব না।

ইহার চেয়ে সাহসের ভাষা অল্পই শোনা গিয়াছে।

এই সাহসের উৎস কোথায়? সখী অব্যর্থ উত্তর দিয়াছে। উত্তর দিবার পূর্বে সখী রাধার সাহসের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য যাত্রাপথের রূপ বর্ণনা করিল—

নিশি নিশিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম
জলধর বিজুরী উজোর।
তরুণ তিমির নিশি তইঅও চললি জাসি
বড় সখী সাহস তোর॥…(২০৯)

রাত্রিতে নিশাচর ও ভীষণ সর্প ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মেঘে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। রাত্রি গভীর অন্ধকার, তবুও তুই চলিয়া যাইতেছিস? সখি! তোর বড় সাহস দেখিতেছি।

এই সাহসাগ্নি কোন্ ইন্ধনে জ্বলিতেছে, অল্প পরেই সখী সে উত্তর নিজেই দিয়াছে—

তোর অছ পচসর তো তোহি নাহি ডর
মোর হৃদয় বড় কাঁপ।

তোর পঞ্চশর আছে, সেই হেতু তোর ভয় নাই। কিন্তু আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

সখীর এই হৃদয়কম্পনই—যে সখী দুর্গম পথের অগ্রদীপ—রাধাপ্রেমের বন্দনা গাহিয়াছে।

বর্ষাভয়ঙ্কর রাত্রির বর্ণনা প্রচুর পদে আছে। তার মধ্যে একটিতে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার সাহায্যে অন্ধকারের দারুণ সৌন্দর্যকে নিরীক্ষণ করা হইয়াছে। পদটি পাঠ করিয়া আমাদের সমস্যা হয়—কাহাকে দেখিব—অন্ধকারকে না রাধিকাকে? কবির নিকট এই মুহূর্তে দুইই যেন দর্শনীয়। মেঘস্তম্ভিত, বিদ্যুৎহীন, দুরন্ত সর্প ও নিশ্চল নিশাচরের দ্বারা শঙ্কাকীর্ণ রজনীতে সেই অভিসার। তবু কেন অভিসার, যদি এত ভয়ঙ্করই পথ? কবি উপযুক্তভাবে কারণ দেখাইয়াছেন, বলিয়াছেন, রাধিকার মন মদনের রোষে বিহ্বল। একটি কাতরা বালিকাকে কঠিন রোষের প্রহারে জর্জর করিয়া ঐ নিশ্চল নিষেধান্ধকারের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কবি তাহা দেখিয়া শঙ্কিত। পদটি উদ্ধৃত করিতে পারি—

"রাত্রি কাজল বমন করিতেছে। এমন সময়ে বাহির হওয়াও শাস্তি। বিদ্যুৎ যেন তাহার বন্ধু অন্ধকারকে ত্যাগ করিয়াছে। অভিসারের আশায় সংশয় পড়িল। আমি বিশ্বাস দিয়া ভাল করি নাই। কানাইয়ের বাস নিকটে হইলেও যেন শত যোজন মনে হইতেছে। মেঘ ও সাপ দুইজনেই সঙ্গী হইল। নিশ্চল নিশাচর রসভঙ্গ করিতেছে। মন মন্মথের রোষে ডুবিয়া গেল। প্রাণ দিলেও ভরসা হয় না।" (৩২৬)

এই অবস্থায় রাধা কিছু আত্মগৌরব দাবি করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর রাধা কি করিতেন জানি না, বিদ্যাপতির রাধা নিজের পক্ষে গৌরবের দাবি না তুলিয়া পারেন নাই। রাধা যে মানবীই, তাহা এখানে প্রমাণিত। সর্পসঙ্কুল ঘনবর্ষিত রজনীতে দুরন্ত নদী পার হইয়া রাধা আসিয়াছেন, তাঁহার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনাটি কি যথার্থ—"বন ছলি একলি হরিণী। ব্যাধ কুসুমশরে পাউলী রজনী॥"—বনে হরিণী একাকিনী ছিল, ব্যাধরূপ কুসুমশর তাহাকে রাত্রিতে পাইল (অর্থাৎ বিদ্ধ করিল) (১০৫)। কুসুমশর-বিদ্ধ এই রাধিকার কাণ্ড দেখিয়া বিপর্যস্ত চিত্তে কবি একটি অসাধারণ মন্তব্য করিয়াছেন। মন্তব্যের পটভূমি পূর্বে জানানো উচিত—সে এক রাত্রি—রাত্রিতে গোপনচারিণীর ছবি—"ঘোর যামিনী, আকাশে মেঘ গর্জন করিতেছে, রত্নের লোভেও চোর ঘরের বাহির হয় না; নিজের দেহও নিজে দেখিতে পাই না, এমন সময় নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

…দুঃসহ যমুনানদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম।"—(১২৮)।—এই পটভূমিকার পরেই বিদ্যাপতির অসাধারণ মন্তব্যটি—"নারীর স্বভাব হইতেছে আপনার অভিলাষ উক্তিদ্বারা জানায়।"

সে কি? এতদিন আমরা জানিতাম ইহার বিপরীতটাই সত্য—বুক ফাটিলেও নারীর মুখ ফোটে না। সেকথা নারীচরিত্র সম্বন্ধে শেষ কথা নয়, বিদ্যাপতি এই পদে রাধার আচরণ ও উক্তির দ্বারা তাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন। নিজ যাত্রাকাহিনী বলিবার পর রাধা কৃষ্ণকে সোজা বলিয়াছেন—"(হে মাধব), অনুমতি দাও, পঞ্চবাণ যুদ্ধ করুক। নগরে তোমার তুল্য নাগর নাই।" রাধা নিজের ত্যাগের পরিমাণ জানেন, নিজের দাবির পরিমাণ জানাইতে তাই অকুণ্ঠ।

এখনও নয়, আরো একটি পদ আছে, সেখানে স্বমুখে নায়িকা নিজ আগমন-কথা কহিয়াছে নায়কের নিকট, কিন্তু তেমন করুণ গৌরব-দাবি অল্পই দেখা যায়। সত্যই করুণ পদ। নায়িকা (পদে রাধার নাম নাই) দীর্ঘ পথ অতিবাহনের পর কুঞ্জে আসিয়া প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন। যে অনেক আশায় অনেক সহিয়াছে, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেলে তাহার পায়ের তলায় মাটি থাকে না। প্রাণপণ চেষ্টায় কুটামাত্র অবলম্বন করিয়াও সে বাঁচিতে চায়। তখন অপমানিতা প্রত্যাখ্যাতার কণ্ঠে বাজিয়া ওঠে—আক্ষেপ, দুর্বল গঞ্জনা ও কাতর অনুগ্রহভিক্ষা। নায়িকা সবকিছুই করিয়াছে। তাহার বক্তব্যের সবচেয়ে মর্মান্তিক অংশ—যেখানে সে নিজ কৃচ্ছ্র ও কষ্টকে প্রিয়লাভের মূলধন করিতে চাহিয়াছে; তিমিরের মধ্যে সর্পদংশনকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছি, এই কথা বলিয়া সে কৃপা-ভিখারিণী। প্রত্যাখ্যানকারী হৃদয়হীন নায়কের গুণের প্রশংসা, যা নায়িকা যথেষ্ট করিয়াছে—তাহাও অনুরূপ বেদনাকরুণ। পদটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—

"হে সুন্দর! বর্ষারজনীতে আমি তোমার মন্দিরে চলিয়া আসিলাম। মাটিতে কত সাপ দেহকে দংশন করিল, চরণতলে ঘোর অন্ধকার। নিজের সখীর মুখে তোমার প্রেমের কথা শুনিয়া শুনিয়া আমি অবলা আর পঞ্চশরের প্রহার সহ্য করিতে পারিলাম না। হে নাগর! আমার মনে এই অনুতাপ যে, সাহস করিয়াও সিদ্ধি পাই না—এমনই আমার পাপ। তোমার মত গুণ-নিকেতন প্রভুও আমাকে অবজ্ঞা করিল! আমি সকল নাগরীকে শিখাইব যেন অভিসার না করে। গুণবান কত নাগরই আছে কিন্তু গুণ বুঝিতে সকলে

পারে না। তোমার মতন জগতে আর কেহ নাই, তাই আমি তোমার সহিত প্রেম করিলাম। কেলি-কৌতুক দূরে থাউক, তোমার সহিত দেখা হওয়াও সন্দেহ। রাত্রি চতুর্থ প্রহর হইল, এখন আমি নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যাই। আমার সহচরীরা সকলে এই কথা জানিলে আমার কঠিন শাস্তি হইবে। বিধাতা অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর; আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে; আমি মরিব।"—১০৮

অভিসার ও বিরহ মিশাইয়া এই পদ নির্মিত।

॥ ছয়

অভিসারের দুই শ্রেষ্ঠ কবি : বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

অভিসার পর্যায় আলোচনার শেষ প্রসঙ্গ—বৈষ্ণবপদসাহিত্যে অভিসারের কবিরূপে বিদ্যাপতির স্থান কিরূপ? এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত জানাইয়াছি—অভিসারে গোবিন্দদাসই প্রধান নিঃসন্দেহে। তারপরেই বিদ্যাপতি। 'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'—কিন্তু অভিসারে অদ্বিতীয়—বিদ্যাপতিরও ঊর্ধ্বে।

কথাটি কিন্তু এইখানেই শেষ করা যায় না। পূর্বে আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়াছি : তথাপি বিদ্যাপতি, অভিসার পর্যায়েও, গোবিন্দদাস অপেক্ষা পূর্ণতর কবি। এ কথার অর্থ কি?

অভিসার-কল্পনায় বিদ্যাপতি, আমরা একটু মনোনিবেশ করিলেই দেখিব, অনেক বেশী পরিমাণে বৈচিত্র্যের সুযোগ লইয়াছেন। পরিবেশচিত্রণে এবং চরিত্রাঙ্কনে বিদ্যাপতির বৈচিত্র্য গোবিন্দদাসে মিলে না। গোবিন্দদাসও নানাপ্রকার অভিসারের কথা জানাইয়াছেন—দিবাভিসার, হিমাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, শুক্লাভিসার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অভিসারের পার্থক্য গোবিন্দদাসে যেরূপ নিখুঁত ও শিষ্ট, বিদ্যাপতিতে সেরূপ নয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের ঐ বৈচিত্র্যের পিছনে আছে অলঙ্কারের কলাপাঠ—বিদ্যাপতি সেখানে জীবনানুসারী। সেইখানেই বিদ্যাপতির জয়। তবে কি বিদ্যাপতি অভিসার-কল্পনায় মৌলিক? মোটেই নয়। তাঁহাকে বিশুদ্ধভাবে বাস্তবচারীও

বলা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে পূর্বাগত সংস্কৃত কাব্য-ঐতিহ্যের অনুসারক। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, সংস্কৃত-ঐতিহ্য তাহার অলঙ্কারাসক্তি সত্ত্বেও বাস্তব অভিসারিণীকে মনে রাখিয়াছিল। সংস্কৃত কবির নিকট অভিসারিণী দৃষ্ট বস্তু—নানাবর্ণে আঁকা হইলেও অভিসারিণী জীবনবর্ণে বঞ্চিত নয়। বিদ্যাপতির অভিজ্ঞতালোকেও বাস্তব অভিসারিণীর স্থান ছিল—এবং সেইজন্যই—ইহাকে আঁকিবার সময় তিনি প্রচুর স্বাধীন পটভূমিকা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। গোবিন্দদাসে পরিবেশ বাঁধাধরা—চরিত্রগুলি চরিত্রে অপরিবর্তন—বিদ্যাপতি সেখানে নিতান্ত লৌকিকা হইতে অপূর্ব আধ্যাত্মিকায় সানন্দে যাতায়াত করিয়াছেন। গোবিন্দদাসে যেখানে রাধার মনস্তত্ত্বের রূপ মোটামুটি একই কাঠামোয় ধরা আছে, সেখানে বিদ্যাপতির নায়িকার মধ্যে কিরূপ বিচিত্র মনোরূপের প্রকাশ, তাহা আমরা যথেষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিদ্যাপতি যাত্রা করিয়াছিলেন লৌকিক পরকীয়া নায়িকা হইতে; তাঁহার আদর্শ ছিল সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যের অভিসারিণীর বর্ণোজ্জ্বল রূপ—তিনি সেখানেও না থামিয়া স্বকীয় ভাবপ্রেরণায় আধ্যাত্মিক অভিসারিকাকে পর্যন্ত দর্শন করিলেন। পরিধির এই ব্যাপকতায় বিদ্যাপতির অভিসার বরণীয়।

এবং আরো একটি ব্যাপারে বিদ্যাপতির অভিসারপদ স্মরণযোগ্য। বিদ্যাপতি যথার্থ অভিসারের পদই লিখিয়াছেন, অভিসারের বেনামীতে অন্য কিছু নয়। বিদ্যাপতিকে আমরা মূলতঃ লৌকিক প্রেমের কবিরূপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রেমের সাধারণীরূপের প্রতি এই আসক্তি তাঁহার অভিসার পদকে শেষ পর্যন্ত অভিসারই রাখিয়াছে। অর্থাৎ অভিসারের মধ্যে তিনি কোনো উচ্চতর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য প্রায়ই খোঁজেন নাই, যেমন খুঁজিয়াছেন পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা। উত্তরকালে বৈষ্ণব অভিসারপদ এক অভিনব পরম গৌরব—মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম কাম্য পরিণতি—আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু একই সঙ্গে অভিসার বলিতে যাহা বোঝায় —পরকীয়া প্রেম, গোপন সঞ্চরণ, অজানা শিহরণ এবং নিষিদ্ধ উল্লাস—এই সকল অঙ্গাঙ্গি বস্তু অনেকখানি হারাইয়াছে। তখনও অভিসারিকার পথে বিপদের আয়োজন যথেষ্ট, কিন্তু সে সমস্ত কিছু অভিসারিণীর প্রেমচরিত্রের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্যই সংগৃহীত। এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া গোবিন্দদাসের

শ্রেষ্ঠ পদগুলির উল্লেখ করাই ভাল। গোবিন্দদাসের অভিসারপদে কখনো দেখি প্রকাশ্যে সখীসঙ্গে 'মঙ্গল হুলাহুলি গতি', কখনো বা বজ্রজয়ী দুর্বার প্রাণাবেগ। সে যেন এক তীর্থযাত্রা, সকল কাঁটা ধন্য করিয়া পুণ্যপ্রয়াণ। সে অভিসারের গৌরব এইখানে— তাহার মধ্যে মানবাত্মার নিত্য-অভিসারের ছন্দ বাজিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণায় 'শিশুতীর্থ' কবিতা লেখেন, কিংবা যুগ হতে যুগান্তর পানে, রাত্রি-অন্ধকারে, মানবযাত্রীর যাত্রাকাহিনী শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে স্মরণ করেন, গোবিন্দদাসের অভিসারপদের অন্যতমপ্রেরণাও তাহাই। অর্থাৎ এককথায় 'চরৈবেতি' মন্ত্রের সিদ্ধি-প্রতিমার রূপাঙ্কন। তাই গোবিন্দদাসের অভিসার যেন প্রতীক অভিসার, তাহা উৎকৃষ্ট ধর্মগীতি—তাহা অভ্যাস-যোগের শাস্ত্রকাব্য, বিঘ্নলঙ্ঘনের যুদ্ধকাব্য এবং লক্ষ্যলাভের বিজয়কাব্য।

বিদ্যাপতির অভিসার কাব্যের এই মর্যাদা নাই। তাঁহার অভিসারে নিত্য সঙ্গীতের সুরে উৎসারিত উদাত্ততার অভাব আছে। কিন্তু যদি এখনই প্রশ্ন করি—গোবিন্দদাসের অভিসার কি ব্যক্তির জন্য ব্যক্তির যাত্রা, তাহা কি 'বিশেষ' বেদনায় উদ্বেজিত; একান্ত সুখে উচ্ছ্বসিত? আমরা বলিতে বাধ্য, গোবিন্দদাসের অভিসারে সেই ব্যক্তিগত ভাবের আপেক্ষিক অভাব আছে। গোবিন্দদাস এক্ষেত্রে সাধারণ সত্যের বড় কবি; বিদ্যাপতির অভিসার ব্যক্তি-চিহ্নিত।

এবং বিদ্যাপতিতে কবিকল্পনার মৌলিকতাও অনেক বেশী। গোবিন্দদাস, অলঙ্কারানুসরণ করিয়া, এবং রীতিবদ্ধ বিভিন্নতাকে মানিয়া, নানাপ্রকার অভিসারের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার অসামান্য সাঙ্গীতিক প্রতিভা গভীরতম সুরে নিবিড়তম আবেগকে স্পন্দিত ও প্রমত্ত করিয়াছে; কিন্তু বিদ্যাপতির উন্মুক্ত কল্পনা নানা ভাব ও পরিবেশাশ্রয়ে যেভাবে অভিসারিণীকে দেখিয়াছে, গোবিন্দদাস সেই ব্যাপকতার সন্ধানী হন নাই।

গোবিন্দদাসের রচনায় বিদ্যাপতির পদের পরিবর্তনের ও উন্নয়নের রূপ দুইটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দিতে চাই। ধরা যাক বিদ্যাপতির ৯৪ সংখ্যক * পদটি—

---

*কহ কহ সুন্দরী না কর বেআজে।
পুরুখ সুকৃত কেদহ পাওল
মদন মহানিধি কাজে॥

(পর পৃষ্ঠায়)

"হে সুন্দরী ছলনা করিও না, বল পূর্ব সুফলের জন্ত কি কেহ মদনের মহাসিদ্ধি লাভ করিল? কস্তুরী তিলক অগুরু প্রভৃতি মাখিয়া, নীল বসন পরিধান করিয়া, গুরুজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চিম দিকে দেখিতেছে—কখন রাত্রি হইবে? আঁখিপদ্ম মুদিত করিয়া বিনা কারণে গৃহে যাতায়াত করিতেছে (আঁধারে যাওয়া অভ্যাস করিতেছে), অত্যন্ত পুলকিত দেহে অকারণে হাসিয়া শয্যা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে সানন্দে।"

গোবিন্দদাসের সুবিখ্যাত 'কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল' পদের সঙ্গে এই পদের বাচ্যার্থের কি কোনো বিশেষ পার্থক্য আছে? গোবিন্দদাসের পদ (যাহা অনেকের অনুমান কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের একটি শ্লোকের মুক্তানুবাদ) তপোকাব্য রূপে সর্বত্র সানন্দে স্বীকৃত। বিদ্যাপতির এই পদটিও বক্তব্যে কি যে-কোনো সময় গোবিন্দদাসের উক্ত অভিসারপদের সমতুল হইতে পারে না? ইহা নিশ্চয় স্বীকার্য যে, কাব্যাংশে গোবিন্দদাসের পদ উৎকৃষ্টতর। সূক্ষ্ম ভাষামার্জনা ও ভাবানুশীলনের অভাব আছে বিদ্যাপতির মধ্যে। কিন্তু ভাববস্তুতে গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতি এক্ষেত্রে সমতুল। পার্থক্য কাব্যরূপের। সে ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস অনেক উচ্চে।

গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠতম অভিসার পদের সঙ্গে যদি বিদ্যাপতির একটি পদের তুলনা করি, সেখানেও দেখিব গোবিন্দদাসের যাহা কিছু উৎকর্ষ সে কাব্যরূপে, নচেৎ বক্তব্যবস্তু অপৃথক। বিদ্যাপতির পদ এই,—

মৃগমদ তিলক অগর অনুলেপিত
সামর বসন সমারি।
হেরহ পছিম দিশ কখন হোয়ত নিশ
গুরুজন নয়ন নিহারি॥
বিনু কারণ গৃহ করহ গতাগত।
মুনি নয়ন অরবিন্দা।
অতি পুলকিত তনু বিহসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা॥
চেতন হাথ লাখ নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভাণে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
সকল কলারস জানে॥ (১৪)

ঘন ঘন গরজয়ে ঘন মেহ বরিখয়ে
দশদিশ নাহি পরকাশা।
পথ বিপথহু চিহ্নয়ে না পারিয়ে
কোন পুরএ নিজ আশা॥
মাধব, আজু আয়লু বড় বন্ধে।
সুখ লাগি আয়লু বড় দুখ পায়লু
পাপ মনমথ সন্ধে॥
কণ্টক পন্থয়ে ফুজ হাম তোরলু
জলধর বরিখয়ে মাথে।
যত দুখ পাযলু হৃদয় হাম জানলু
কাহাকে কহব দুখবাতে॥
লাভকি লোভে দুতর তরি আয়লু
জীউ রহল পুন ভাগি।
হেরইতে ও মুখ বিসরল সব দুঃখ
এ নেহ কাহ জানি লাগি॥—১০৬

আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠতম অভিসার পদ "মাধব কি কহব দৈব বিপাক"* বিদ্যাপতির উদ্ধৃত পদের ছায়ায় রচিত। এই দুইটি পদ পাশাপাশি পড়িলেই উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হইবে।—

*মাধব, কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চার আয়লু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন্ পুর॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।

তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণ- হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥

বলাবাহুল্য গোবিন্দদাসের পদ অনেক বেশী কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত। চেতনাকে উজ্জীবিত করার মত শক্তি সেখানে আছে। তুলনায় বিদ্যাপতির পদের উন্মাদনা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বক্তব্যে উভয়ের অদ্ভুত ঐক্য। উভয় স্থানেই নিজ মুখে রাধার আগমন-কথা বর্ণনা। বর্ষাবর্ষণ, অন্ধকার, পঙ্ক, কণ্টক, দিশাহীন পথ ইত্যাদি জিনিস দুই স্থানেই আছে। সর্বাপেক্ষা ঐক্য, দুই রাধাই নিজ প্রেমের মহিমাকথা নিজেই বলিয়াছেন।

অনৈক্যও সেইখানেই সবচেয়ে বেশী। বক্তব্য একই, অথচ বলিবার ভঙ্গি কিরূপ ভিন্ন। মনোভঙ্গির পার্থক্য বুঝিবার সুযোগ এখানেই। গোবিন্দ-দাসের রাধা প্রথমে যেভাবে লক্ষ মুখেও নিজের পথ-আগমন-কথা বলিবার অসামর্থ্য জানাইয়াছেন—পরে তাহা সত্ত্বেও যেরূপ বিস্তৃতভাবে বিপদ-বরণের ইতিহাস বলিয়াছেন—তাহাতে রাধার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতা ও হিসাবী গর্ববোধের অভিযোগ আসিতে পারে। কিন্তু কী শোচনীয় মিথ্যা অভিযোগ! পদটি পড়িবামাত্র আমরা বুঝি, রাধার যতকিছু আত্মগৌরবজ্ঞাপন সে সকলই অপূর্ব অসাধারণ এক আত্মবিস্মৃতির সৃষ্টি। প্রেমাবেগে রাধা নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। নিজের কথা যে নিজমুখে বলা যায় না—তাহাতে যে অহঙ্কার প্রকাশ পায়—সে জ্ঞান পর্যন্ত নাই। 'তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল, ছোড়লুঁ গৃহসুখ আশ'—মুরলী শুনিয়া রাধা গৃহ-সুখের আশা তো বটেই, আরো অনেক কিছুই ছাড়িয়াছেন—গৃহের সঙ্গে গৃহপুষ্ট ব্যবহারনীতি পর্যন্ত। লোকব্যবহারে আত্মপ্রশংসা নিষিদ্ধ, কিন্তু রাধা সেই বিহ্বলতা অর্জন করিয়াছেন যাহা আত্মচেতনা ভুলাইয়া দেয়, যাহা লাভ করিলে আত্মোদ্‌ঘাটন ও আত্মপ্রশংসা একই বস্তুর রূপভেদ হইয়া যায়। রাধা অসঙ্কোচে, দ্বিধাহীন উল্লাসে নিজের কথা বলিয়াছেন; বাহির হইতে মনে হইতে পারে, সে বক্তব্যে নিজ গরিমাজ্ঞাপন করা হইয়াছে, আসলে কিন্তু তাহা আত্মদর্শন, স্ফূর্ত চিত্তের অকুণ্ঠ উন্মোচন।

অনুরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির রাধা কিন্তু সত্যই আত্মগৌরবের দাবিদার। প্রেমিকের নিকট স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত রাধার বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন আছে এই কথাটি —এই আমার ত্যাগ, অতএব এই আমার প্রাপ্য। প্রেমিকের চরিত্রবিষয়ে অবিশ্বাসও আছে—আমার এত কষ্ট বুঝি বৃথা গেল ;—রাধা বলেন—'সুখের জন্য আসিলাম, (আসিতে) বড় দুঃখ পাইলাম,...যত দুঃখ পাইলাম তাহা মনেই জানি, দুঃখের কথা কাহাকে বলিব ?...পুণ্যবলে প্রাণ বাঁচিয়া গেল। ...এরকম প্রেম যেন কাহারও না হয়।" এই ক্ষোভপূর্ণ ভাষণে আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ নাই, যাহা গোবিন্দদাসের পদে পাইয়াছি। বিদ্যাপতির রাধা আত্মসচেতন, সতর্ক, ও লাভালাভ বিষয়ে বাস্তববোধসম্পন্ন।

আবার বিদ্যাপতির রাধা এ সকলের ঊর্ধ্বেও বটেন—সেখানে গোবিন্দদাসের রাধার পার্শ্ববর্তিনী। পদের মধ্যে বিদ্যাপতির রাধা অন্ধ তামসী নিশীথের কথা বলিয়াছেন। সেই নিশীথ-প্রান্তে রাধিকার প্রাণের চন্দ্ররেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—রাধা মুগ্ধ কণ্ঠে পদের একেবারে শেষে বলিয়া উঠিয়াছেন—"মাধব তোমার মুখ দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলাম।" রাধার কথা আমাদেরও সব ভুলাইয়া দিল—রাধার আত্মঘোষণার রূঢ়তা, হিসাবী-বুদ্ধির তিক্ততা ;—আমরা দেখিলাম অপূর্ব কৃষ্ণের সম্মুখে এক বিহ্বলা মুগ্ধনয়না রাধারাণীকে। একই পদের মধ্যে লৌকিক নায়িকা সহসা আধ্যাত্মিক প্রেমিকায় উন্নীত। বিদ্যাপতির অভিসারপদের সমস্ত চরিত্রই এই একটি পদে উদ্‌ঘাটিত।

পূর্বরাগ হইতে মিলন

মিলনের নানা স্তর

নায়িকা বয়ঃসন্ধি পার হইয়াছে! এখন সে যৌবন-গজরাজে আসীন। গজগামিনীকে কবি যুদ্ধে নামাইবেন। আমরা যদি সেই যুদ্ধকাণ্ড দেখিতে চাই, যেন মনের জোর রাখি। যুদ্ধে নীতিসংকোচ পরিহার্য। সাধারণ সময়ে ন্যায় অন্যায়ের বিবেচনা থাকে না, প্রণয়-সময়েও থাকে না শ্লীলতা-অশ্লীলতার বাধ্যবাধকতা।

অনবদ্য ভঙ্গীতে কালিদাস কুমারসম্ভবে নবযৌবনের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন—"যৌবন নরনারীর, বিশেষতঃ রমণীর অঙ্গলতিকার অযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার। যৌবন প্রত্যক্ষতঃ কোনোরূপ মদ্যবস্তু না হইলেও হৃদয়ের ঘোর মত্ততাজনক। যৌবন, পুষ্পবাণের বাণরূপী কোনো পুষ্প না হইলেও কিন্তু তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণ।" (বসুমতী সং)

যৌবনধন্যা রাধাকে প্রেমলোকে স্থাপন করিয়া বিদ্যাপতি কিভাবে দেখিয়াছেন, বর্তমানে তাহাই আমাদের আলোচ্য। সেই প্রেমভুবনে বহিঃ-সংসারকে প্রবেশ করিতে দিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। তাই ইতিমধ্যেই অভিসারের আলোচনা সারিয়া লইয়াছি। অভিসারে নায়কনায়িকা বিরোধী পৃথিবীর উপর দিয়া চলাফেরা করে। আমরা সেই বিক্ষেপকর পৃথিবীকে আর চাই না। এখন 'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে।'

প্রেমের এই পৃথিবীর নাম কুঞ্জপৃথিবী। কুঞ্জভবন বলিলে ইহাকে ছোট করা হয়—ইহা কুঞ্জভুবন। এখানকার কয়েকপদ জমির মধ্যে নিখিল বিশ্ব ধরিয়া যায়। এ যে কতবড় পৃথিবী—এখনো পর্যন্ত মানুষ তাহার পরিধি পাইল না। বিশ্বভুবন ভ্রমণ করিয়াও এই ভুবনে মানুষ দিশাহারা। এখানে বিজ্ঞান নাই, আছে সাহিত্য, ঘটনা নাই, আছে অঘটন। এখানে নায়িকার পদপ্রান্তে পতিত নায়ক, নায়িকাকে দেখে সুদূর নীহারিকারূপে।

নায়কের বক্ষলগ্ন নায়িকা উভয়ের মধ্যে নদীগিরির ব্যবধান অনুভব করে। আকাশের চাঁদ, স্বর্গের পারিজাত এখানকার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। নক্ষত্রের সব আলো টানিয়া নয়নের একটি মণি নির্মিত হয়, এবং ললাটের সামান্য সিন্দূরবিন্দুটিতে শত সূর্য জ্বলিতে থাকে। এই ভুবনের নাম, পুনশ্চ বলিতেছি, প্রেমভুবন। ইহা আয়তনে অল্প, ব্যাপ্তিতে অসীম।

বিদ্যাপতি এই ভুবনের রাজকবি, বৈষ্ণব পদাবলীতে।

তাই বিদ্যাপতি-বিষয়ে একটি কথা বিস্ময়কর কিন্তু অতীব সত্য—অধিকাংশ পদের হিসাব ধরিলে তাঁহার বিরহ অপেক্ষা মিলন-পদ উচ্চস্তরের। বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রেষ্ঠাংশে আছে বিরহপদ এবং সেই শ্রেষ্ঠ বিরহপদের মধ্যেও অতিশ্রেষ্ঠ পদ বিদ্যাপতির রচিত। সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত মন্তব্য সত্য হয় কিভাবে? বিদ্যাপতির পদে ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটি ঘটিবার কারণ, তাঁহার নায়ক নায়িকারা এতই দেহপীড়াগ্রস্ত যে, বিরহকালে তাহাদের দেহের কাঁদুনী অসহ্য লাগে। অন্যপক্ষে মিলনেই তাহাদের সুখ সমাপ্ত, সুতরাং মিলনে চূড়ান্ত অনুভূতি। ফলে সেখানে কাব্যও উজ্জ্বলতর।

তবে বিদ্যাপতির একটি বড় প্রেম আছে। সেখানে মিলনাপেক্ষা বিরহের মাহাত্ম্য স্বীকার্য। বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতি-পদে সেই বড় প্রেম ও বড় বিরহের প্রাধান্য। মিথিলাদিতে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদের চরিত্রমুক্তি ঘটিয়াছে অভিসারজাতীয় রচনায়, যেখানে বিঘ্নস্পর্ধী পথযাত্রা দেহে-মনে শক্তি ও স্বাস্থ্য আনিয়াছিল।

ভিন্ন প্রসঙ্গে সরিয়া যাইতেছি, মিলনের কবি বিদ্যাপতির আলোচনাই আমাদের বর্তমান উপজীব্য। সম্ভোগের অজস্র রূপ বিদ্যাপতির কাব্যে পাইব। মিলনের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনায় বিদ্যাপতি নিশ্চয় কামশাস্ত্র বা রসশাস্ত্রের নানা নির্দেশ ও লক্ষণের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতির পদ হইতে নায়িকা-লক্ষণ, নায়ক-লক্ষণ, মিলনের পূর্বনির্দিষ্ট বিভিন্ন স্তর, আবিষ্কার করিতে পারিবেন। আমরা কিন্তু বর্তমান আলোচনায় যথাসম্ভব সেই সব টেকনিক্যাল শব্দ প্রত্যাহার করিব। আমাদের বিশ্বাস সেরূপ করিলে বিদ্যাপতির কাব্যকে আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্য করা যাইবে। আমাদের সকলেরই সাধারণভাবে 'পণ্ডিতি' শব্দের প্রতি বিতৃষ্ণা আছে।

প্রথম প্রেম—পূর্বরাগ—সূচনাতেই অপূর্ব রহস্য। পূর্বরাগের মত রহস্যময় আর কিছু নাই। এই রহস্য মিলনে নাই, বিরহে নাই। কেবল প্রাপ্তির কামনা বা অপ্রাপ্তির দাহ নয়—যাহা চাহিতেছি তাহার রূপ কেমন? যাহাকে চাহিতেছি, সে কি চাহিবে?—নানা দ্বিধায়—সন্দেহে—আনন্দে—বেদনায় পূর্বরাগ রোমাঞ্চিত। পূর্বরাগ তাই সকল প্রেম-কবির বিশেষ সমাদরের বস্তু।

যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবি বলিয়াছি, সেই বিদ্যাপতির কঠিন সমালোচনা কিন্তু প্রথমেই করিতে বাধ্য হইতেছি—বিদ্যাপতিতে কার্যতঃ পূর্বরাগ নাই। অন্ততঃ রাধার পূর্বরাগের পদ প্রায় মেলে না। এইখানে কবির পরাজয়। ইহার জন্ম সামাজিক পরিবেশ দায়ী। বিদ্যাপতির কালে সমাজ বালিকার পূর্বরাগকে প্রশ্রয় দিত না। সমাজে ছিল বাল্যবিবাহের প্রচলন। জ্ঞানোদয় ও দেহোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বালিকার ভোগজীবন সুরু হইত। সেক্ষেত্রে রূপ দেখিয়া পুরুষের বরং মুগ্ধতা সম্ভব। তাই বিদ্যাপতিতে কৃষ্ণের পূর্বরাগ আছে, নাই রাধার।

রাধার পূর্বরাগ একেবারে মেলে না তাহা নয়—তবে পরিমাণে বড় অল্প। একটি দৃষ্টান্ত তুলিতে পারি, যেখানে রাধা উৎকৃষ্ট ভাষায় তাঁহার উপর কৃষ্ণের নয়নাক্রমণের কথা বলিয়াছেন—

যমুনার তীরে তীরে সঙ্কীর্ণ পথ, মুখ ফিরাইয়া ভাল করিয়া সঙ্গ হইল না, অর্থাৎ দেখা গেল না। তরুণ কানাইয়ের সঙ্গে যখন তরুতলে দেখা হইল, তখন সে যেন নয়ন-তরঙ্গে আমাকে স্নান করাইয়া গেল। কে বিশ্বাস করিবে যে, এই জনাকীর্ণ নগরীর মাঝে দেখিতে দেখিতে আমার হৃদয় হরণ করিল।”—৩৩

ঐভাবে রাধা বহুবার কৃষ্ণের নয়ন-তরঙ্গে স্নাত হইয়াছেন, কিন্তু সেকথা বলিয়াছেন অল্পবারই। রাধার পক্ষে সেকথা বহুভাবে বলাও সম্ভবপর নয়, কারণ রাধা নারী, হৃদয়ের ভাষায় নারীর অধিকার। যদিবা সে রূপের ভাষা আয়ত্ত করিতে চায়, কবি সহযোগিতা করেন না, পুরুষের রূপবর্ণনা বেশীক্ষণ তাঁহার বা তাঁহার পাঠকের ভাল লাগার কথা নয়।

অথচ নারী-হৃদয়ে প্রথম প্রণয়োন্মেষ কী ভাবে না কাব্যের সামগ্রী হইতে পারে। শুধু রূপের কথা কেন বলিতে হইবে—পূর্বরাগে রাগ-বার্তা

নিবেদন কি চলে না? তাহা যে চলে, শুধু চলে নয়, আশ্চর্যভাবেই চলে, কালিদাস প্রমাণ করিয়াছেন। কালিদাসে প্রথম প্রেম বা পূর্বরাগ অনবদ্য, ভারতীয় সাহিত্যে অতুলনীয়। নানা চরিত্রের অবলম্বনে নানা পরিবেশে কালিদাস পূর্বরাগের রূপাঙ্কন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কালিদাসের কৃতিত্ব যে-কোনো প্রশংসার যোগ্য। আমাদের লোভ হইতেছে কালিদাসের প্রথম প্রেমের চিত্রগুলি একে একে বিশ্লেষণ করি। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক বোধে বর্তমানে সে প্রসঙ্গ যদি ত্যাগও করি, একথা বলা উচিত, কাব্যে পূর্বরাগের চিত্রণ যথার্থ প্রতিভাসাপেক্ষ। প্রেমের অন্যান্য অবস্থা আঁকা তত কঠিন নয়, সূচনা যেরূপ কঠিন। পূর্বরাগোত্তর অংশের দেহ-মন-মন্থন বহুভাবে ব্যক্ত করা চলে, কিন্তু নায়ক-নায়িকার প্রেমোন্মেষের আদি ক্ষণটির দ্বিধা-থরোথরো রূপই সত্যই স্রষ্টার প্রতিভাস্বাক্ষর দাবি করে। সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রথম পংক্তির অপরিসীম মূল্য, কারণ তাহা প্রথম সূর্যের মত দিন-সূচনা করে। প্রথম সূর্যরেখাকে অনেক অন্ধকারের নিষেধ এবং কুয়াশার দ্বিধা অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রেমের জগতেও তাই। কালিদাস অসামান্য এইখানে—তিনি প্রথম প্রেমকে সৃষ্টি-উদ্ভাস দিতে পারিয়াছেন।

এবং কত ভিন্ন ধরনের চরিত্রের মধ্যে প্রেমাবির্ভাবের রূপ কালিদাস দেখিয়াছেন। সেখানে আছেন জগতের পিতা-মাতা শিব-পার্বতী, পৃথিবীপতি ও স্বর্গগণিকা পুরূরবা-উর্বশী, তপোবনলালিতা অপ্সরাদুহিতা শকুন্তলা ও ধীরোদাত্ত মহারাজ দুষ্মন্ত, বিধাতার অপূর্বসৃষ্টি ইন্দুমতী এবং রঘুনন্দন শিশু-সিংহ অজ, ললিত নৃপতি অগ্নিমিত্র এবং দুর্ভাগ্যগ্রস্ত সুকুমারী মালবিকা। ইঁহারা চরিত্রে পৃথক, কিন্তু সকলেই কবি প্রণয়রাগের উষালোকের ভিতরে প্রবেশ করাইয়াছেন।

ইঁহাদের বহুবিচিত্র প্রণয়রূপ উপস্থাপিত করিলে বিদ্যাপতিকে বুঝিবার যথেষ্ট সুবিধা হয়। বোঝা যায় বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সীমাবদ্ধতা কোথায়। তথাপি কালিদাস স্থগিত থাক বর্তমানে। আমরা পরে বিদ্যাপতির সৌন্দর্যদৃষ্টি এবং রূপাঙ্কন-প্রতিভার আলোচনাকালে কালিদাসকে স্মরণ করিব। এখন প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাপতির মিলনমূলক পদগুলির বিশ্লেষণে অবতরণ করাই ভাল।

মিলনমূলক পদ সংখ্যায় এত বেশী এবং সেগুলির দ্বারা শৃঙ্গারভাবনা

ও লীলাচেষ্টার এতবেশী রূপ প্রকাশিত হইয়াছে—সবগুলিকে আয়ত্ত করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনা করা কঠিন। আমি কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি স্থূল ভাগ করিয়া লইতেছি।

(১) নায়িকার প্রথম মিলন-ভীতি

এ জাতীয় পদ বেশ কিছু সংখ্যায় আছে। ভারতীয় শৃঙ্গারকাব্যের অন্যতম প্রিয় বিষয়বস্তু নবোঢ়া-মিলন। বিদ্যাপতিও অজ্ঞাতযৌবনার দেহ-থরথর প্রেমকে সংযত লোলুপতার সঙ্গে উপভোগ করিয়াছেন। নবোঢ়া-মিলন-পদের একদিকে আছে ক্ষুধার্ত্ত নায়ক, অন্যদিকে ভীত বালিকা। উভয়ের মধ্যস্থতায় আছে যথারীতি পরিপক্বা দূতী। দূতী "যৌবন-নগরীতে রূপের ব্যবসা" করিতে উপদেশ দেয়, কারণ "হরি রসের বণিক" (৫৫); সে নায়ককে বহুপ্রকারে মুগ্ধা-সম্ভোগে উত্তেজিত করে, বলে,—"নূতন রস সংসারের সার";—উৎসাহ দেয় নানা ইরিটেটিং ভঙ্গিতে,—"কুচ স্পর্শ করিলে যখন সে উহুঁ উহুঁ করিবে, তখন তুমি কত সুখ পাইবে। মাধব, প্রথম-সমাগমের আনন্দ অনুভব কর। নায়িকা না না করিবে, এই বড় রঙ্গ" (২৭৭); এবং, কাতর বালিকা কাঁদিয়া পরিত্রাণ পাউক, এরূপ দূতীর ইচ্ছা নয়। চমৎকার ভাষায় সে নিজের হৃদয়হীনতার সমর্থন করে—"কেহ কি কোথাও দেখিয়াছে যে, মধুকরের ভারে মঞ্জরী ভাঙিয়া পড়ে?" (২৭৬)।

কিন্তু সর্ব্বত্রই এইরূপ নিষ্ঠুরা নয়। নায়কের কাণ্ড দেখিয়া সে মাঝে মাঝে সন্ত্রস্ত হইয়াছে, উপদেশ দিয়াছে ধীরে প্রেম করিতে; রাধা সদ্য শৈশবোত্তীর্ণা—"কোমল কামিনীতে পঞ্চশর নূতন অতিথি—ভুলিও না" (২৯০)। কৃষ্ণ কিন্তু ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চতুর। দূতীর পূর্ব্বের উক্তি দূতীকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"যাহা অতিশয় কোমল, তাহাও মধুকরের ভরে ঢলিয়া পড়ে না, শুধু একটু কাঁপে।" (ঐ)

এহেন নায়ককে দেখিয়া শৃঙ্গার-অনভিজ্ঞা বালিকার অবস্থা অনুমেয়। কবি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই শঙ্কাতুরাকে আঁকিয়াছেন –আমরা কিছু কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করিতে পারি।

নায়কের হাত হইতে মুগ্ধা বালিকা নানাভাবে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। অনুনয়ে, প্রার্থনায়, উপদেশে, বিলাপে, অভিযোগে, নায়িকার অব্যাহতি-কামনা ফুটিয়াছে। উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"প্রথম পসারে সব কিছু লুঠিতে নাই, তাহাতে অপযশ হয়" (৫১)। নানা অলঙ্কারে নিজের অবস্থা বুঝাইয়াছে—"যেন হস্তীর পদতলে মৃণাল পড়িল" (২৮০);—"বাঁধিয়া কূপে ফেলিয়াছে" (২৮২);—"রোগী যেমন ঔষধ পান করে" (৬০২);—"প্রকাণ্ড হস্তীর কোলে নলিনীকে আনিয়া দিল" (৬০০);—"আমি নন্দিনী, সে বজ্রের সার" (৬৮০)। এবং অনুনয় করিয়া বলিয়াছে,—"তুমি চানুর-মর্দন, আমি শিরীষ ফুলের মত পদ্মিনী নারী" (৬৮৫);—"এখন অব্যাহতি দাও, রস অল্প, অল্প জলে তোমার তৃষ্ণা পূর্ণ হইবে না" (৬৮৪);—"যদি রমণী বাঁচিয়া থাকে তবে রমণে সুখ, পুষ্পকে রক্ষা করিয়া ভ্রমর মধুপান করে' (২৮৩)।

কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। তখন থাকে আক্রান্ত নায়িকার যন্ত্রণা-কাতরতার চিত্র। নায়িকা অনিচ্ছুক, শয়নে আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা। তাহার যে নায়কের প্রতি আকর্ষণ একেবারে নাই, ৫৯ পদের দুইটি অলঙ্কারে তাহা উদ্‌ঘাটিত—

(ক) পয়োধরকে দুইটি বাহুর দ্বারা চাপিয়া প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে ;

(খ) মুখ বস্ত্রে ঢাকিয়া গোপন করিয়া রাখে—মেঘের নীচে চন্দ্র প্রকাশ পায় না।

প্রথম উপমায় ভীতিব্যাকুলতা, দ্বিতীয় উপমায় অনুরাগহীন অস্বীকৃতি।

২৭৪ পদে সংক্ষিপ্তভাবে কামাকুল নায়কের মুগ্ধা-সম্ভোগের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত। নায়িকা একেবারে অনিচ্ছুক। তাহার ক্লিষ্ট শঙ্কিত নয়নের অশ্রু পাঠক-হৃদয়ে নিতান্ত করুণাসঞ্চার করে। ভণিতায় কবির অভিজ্ঞ বচন—"আগুনে পুড়িলে আবার (জ্বালা নিবারণের জন্য) আগুনেরই প্রয়োজন হয়,"—পাঠকের অনুমোদন পাইবে না। চিত্রটি এইরূপ—

"ওগো সখি, ওগো সখি, আমাকে লইয়া যাইও না, আমি নিতান্ত বালিকা, নাথ কামাকুল। একেবারে সব সখী বাহিরে চলিয়া গেল। প্রভু বজ্র-কপাট লাগাইয়া দিল। সেই অবসরে প্রভু জাগিল। বস্ত্র সংবরণ করিতে জীবনান্ত হইল। না না করিতে করিতে নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, ভ্রমর পদ্মকলি টানাটানি করিতে লাগিল। যেমন পদ্মের উপর জল টলটল করে, সেইরূপ ধনীর অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।"

চিত্রটি বাস্তব রসাশ্রিত, চাক্ষুষ করাইবার শক্তিসম্পন্ন। ২৮৪ পদেও অনুরূপ শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা—"বালার মুখে চোখে জল বহিতেছে, কুরঙ্গিণী কেশরীর কোলে কাঁপিতেছে"। রস-অনভিজ্ঞা ও অ-বশীভূতা নায়িকার কিছু ভিন্ন ধরনের চিত্র—"নায়ক যখন চুম্বন করিতে চায়, তখন সে মুখ নীচু করে, মনে হয় যেন রোগী ঔষধ পান করিতেছে,......কুচযুগ স্পর্শ করিলে গা মোড়া দেয়, যেন তরুণ সর্প মন্ত্র মানে না" (৬৭৭)। এবং,—"আমাকে স্পর্শ করিলে স্ত্রীবধ পাপ লাগিবে।......আমি জানি না এই রস মিষ্ট কি তিক্ত। রসের প্রসঙ্গে কাঁপিয়া উঠি, যেমন তীর লাগিলে হরিণী লাফাইয়া ওঠে" (৬৮১)। ভীতি, বিরাগ, বিতৃষ্ণার সঙ্গে বালিকার লজ্জাও আছে,—"শয্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়, মুখ নীচু করিয়া থাকে, মাটিতে পা রাখিয়া আঙুল দিয়া লেখে এবং প্রস্থানপর সখীর আঁচল ধরিয়া থাকে" (২৭২)।

অনভিজ্ঞা নায়িকার মিলনশঙ্কার কিছু-কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম। বিদ্যাপতিতে এইরূপ বর্ণনা প্রচুর। এই সকল পদে নায়িকার মনোভাবের গতি একমুখী অস্বীকারের দিকে। এই অস্বীকারের রূপ দেখিয়া দূতী একবার নায়ককে অযথা পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছে। দূতী নায়ককে বলিতেছে—"যখন সে অনুভবের দ্বারা সম্ভোগ বুঝিবে, তখন তাহার উপর ক্রোধ করিলে শোভা পাইবে" (৫৮)। দেখা যাইতেছে সম্ভোগের আসল সুখ কেবল দেহে নয়—অনুভবে, দেহে তো বটেই। দেহবদ্ধ মিলনেও মানসিক সহযোগিতার প্রয়োজন কবি মনস্তত্ত্ব-বোধের সঙ্গে জানাইয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, চরম সুখের তুঙ্গ শিখর দেহ-মনের মিশ্র সানুদেশের উপর উত্থিত।

আলোচ্য শ্রেণীর পদের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের শেষ একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা যায়—কলিকাদহনের এই সকল সবল প্রয়াসে বিদ্যাপতির

কাবাচন্তের সমর্থন কতদূর ছিল? যথেষ্টই ছিল বলা চলে। কারণ মুগ্ধার জ্ঞানোদয়-চেষ্টা—যত হৃদয়হীন বলাধিক্যের সঙ্গে করা হোক না কেন—কবি পদশেষে ভণিতায় বারবার জানাইয়াছেন—অনভিজ্ঞার চেতনা এমন করিয়াই আনিতে হয়, এবং একবার যদি যাতনার মধ্যে রসলাভ ঘটে, তখন মুগ্ধা অনতিবিলম্বে প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিবে। বিদ্যাপতি প্রগল্‌ভার ছবি যথেষ্ট আঁকিয়াছেন—সেখানে অজ্ঞাতযৌবনার প্রথম পীড়নজ্বালার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ রহিয়াছে অপরিতৃপ্ত উন্মত্ত কামনার দেহি দেহি আনন্দ-চীৎকারে।

তথাপি, অনভিজ্ঞার অসুখী আর্তনাদে যদি কবির লোলুপ অথচ আপাত-নির্বিকার দর্শনসুখ চরিতার্থ হয়, বলিতে হইবে, তাঁহার কবি-স্বভাবের একটা বড় পরাজয় এখানে ঘটিয়াছে। কোনো পরবর্তী আনন্দ বর্তমান দুঃখকে মুছিতে পারে না, যদি একই সঙ্গে দুঃখান্তে আনন্দোদয়কে দেখান না হয়। আলোচ্য শ্রেণীর অধিকাংশ পদে এক পক্ষে আছে অনিচ্ছুকের বিদ্রোহ ও যন্ত্রণা, অন্য পক্ষে রহিয়াছে কামার্তের তোষণ-পটুত্ব ও বলপ্রয়োগ। একটি ক্ষুদ্র পদে ইহার বেশী দেখানও সম্ভব নয়। এবং বিদ্যাপতির পক্ষাবলম্বন-কারীরা বলিতে পারেন, সকল পদের সমবায়েই কবির গুণাগুণ বিচার্য হওয়া উচিত—এক পদে হয়ত দহন, অন্য পদে আলোক।

বর্তমানে আমরা কিন্তু এক একটি বৈষ্ণব পদকে স্ব-সম্পূর্ণ ভাবিয়া থাকি। সেইজন্য এই সকল পদ—যেখানে কার্যতঃ নাবালিকার উপর বলপ্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানে, নায়িকাপক্ষে সম্মতিশূন্যতার ক্ষেত্রে, আমাদের মন বিদ্রোহ করেই, পরবর্তীকালে সুফল ফলিবে—কবিপ্রদত্ত এই সান্ত্বনা বা ধৈর্যধারণের উপদেশ, কোনো কিছুই আমাদের মানসিক বিরূপতা দূর করিতে পারে না।

তবে এ-ব্যাপারে আর একটু সহানুভূতি বিদ্যাপতি বর্তমান কালের কাছে দাবি করিতে পারেন। তাঁহার পারিপার্শ্বিকের কথা বিবেচ্য। ইন্দ্রিয়বিলাসী রাজসভা তখন অভিজ্ঞা সম্ভোগে অভ্যস্ত—সেখানে অভিজ্ঞতাহীন মুগ্ধার বড় সমাদর। বিদ্যাপতি এই রাজসভার কবি। তাছাড়া তিনি শৃঙ্গারশাস্ত্রের ছবি-চিত্রকরও বটেন, যে-কামশাস্ত্রে নারীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে খুবই যত্নের সঙ্গে নিরীক্ষণ করা হইয়াছে—অজ্ঞাতযৌবনার বোধোদয় যাহার একটি প্রধান অংশ। সাধারণ সামাজিক পরিবেশও একই জায়গায় উপস্থিত করে—স্মৃতিশাসিত সমাজে বাল্যবিবাহের প্রসার—নাবালিকার অনতিস্ফুট

দেহ সে-সমাজে বয়স্ক ও বলিষ্ঠ পুরুষের কর্ষণক্ষেত্র। বিদ্যাপতি এই পরিবেশের কবি। শৃঙ্গাররসের কবিরূপে কলিকাদহনের কাব্য তাঁহাকে লিখিতে হয়, নাবালিকার আর্তনাদে শুনিতে হয় প্রেমের ঊষারাগিণী। সামাজিক অবস্থার দাস-কবি বিদ্যাপতির মুক্তিও ছিল এইখানে—অতি বড় অত্যাচারের মধ্যে সৌন্দর্যদর্শনে। সৌন্দর্যরসিকের মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা আছে, সে নিষ্ঠুরতা তাহার নির্বিকারত্বে। বিদ্যাপতি সামাজিক মানুষ হিসাবে নাবালিকা-পীড়ন দেখিয়াছেন—কবি-রূপে পীড়ন-মথিত আনন্দসঙ্গীতে তাঁহার মন ভরিয়া গিয়াছে।

আরো একটি কথা বিদ্যাপতির পক্ষে বলা যায়। যদিও ভণিতায় মুগ্ধা-মথনের সমর্থন কবি করিয়াছেন—সে যেন সত্যকার সমর্থন-মানসে নয়—বাস্তবতার নিকট আত্মসমর্পণকারী কবিও অব্যাহতি চাহিয়াছেন এবং সেই অব্যাহতি কামনা পরবর্তী সুদিনের শুভ কল্পনায় মুক্তিস্বপ্ন দেখিয়াছে। ভণিতায় কবির সান্ত্বনাপ্রদান বহুলাংশে তাঁহার আত্মপ্রবঞ্চনার শান্তিপ্রলেপ।

(২) নায়িকার অনুরাগের সূচনা

এই অংশে নায়িকার বিমিশ্র মনোভাব। নায়িকার দেহচেতনার জাগরণ, কামস্বপ্ন, মিলন-ভীতির মধ্যে লালসা, লজ্জা ও সুখের উদয়—এই ধরনের [illegible] মন।

প্রথমে ধরা যাক অমরুশতকের একটি বিখ্যাত শ্লোকের বিদ্যাপতি-কৃত ভাবানুবাদের পদটি। পদটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

অবনত আনন কএ হাম রহলিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ-চকোর॥
ততহুঁ সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।

মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি ॥
মাধব বোলল মধুর বাণী
সে শুনি মুদু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাঁচ বাণ॥
তন-পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহুবলয়া ভাগু॥ ইত্যাদি

নায়িকার আত্মসংবরণের শেষ চেষ্টা। 'মনের' সঙ্গে 'প্রাণের' সংঘাতের তীব্র অনুভূতিময় দৃশ্য। প্রাণের প্লাবন মনের বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিল। নতশক্তি মন তাহা দেখিতেছে। কিন্তু এই পরাজয়ের অপেক্ষা সুখময় বস্তু আর কি আছে? সেই আত্মহারা সুখোল্লাস পদটিতে।

পদটিতে যে-প্রাণের বিজয়, সে প্রাণ রক্তমাংসময়। সুখ-তীব্র শারীর-চেতনা পদটির আদ্যন্ত, বিশেষভাবে শেষ কয়েক ছত্রে। দেহচাঞ্চল্যের চরম রূপক-দৃষ্টান্ত কাঁচলী ছিঁড়িয়া যাওয়া বা বলয় ভাঙিয়া যাওয়া। এই পদ শিবসিংহের রাজত্বকালে লিখিত, অর্থাৎ বিদ্যাপতির পরিণত যৌবনকালে।

সদ্যোক্ত পদে যেমন দেহচেতনার জাগরণ, তেমনি নারীর কামস্বপ্নের উৎকৃষ্ট রূপায়ণ আর একটি পদে পাইতেছি। ৭৫৩ পদে আছে উজ্জ্বল যৌবনের রক্তিম সুখকল্পনা। কবি-ভাষাতেও প্রয়োজনানুরূপ ভঙ্গির রঙ্গলীলা। সমস্ত পদটিই দেহ-ভারে কম্পিত; তাহারি মধ্যে প্রথম কয়েক ছত্র বিশেষভাবে একটি লীলায়িত দেহলতার সুরঙ্গিম আবির্ভাবে চমকিত। ছত্রগুলি সকলের পরিচিত—

অজনে আওব যব রসিয়া
পালটি চলব হাম ঈষত হসিয়া।
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে
যাওব হাম যতন বহু করবে॥

আঁচলে টান পড়ায় লঘু রোষে উৎফুল্ল নাগরীর পিছন ফিরিয়া দীর্ঘ আঁখিতে কটাক্ষ করাটি যেন একেবারে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

অতঃপর কয়েকটি পদের সাক্ষ্যে মিলনকালে জ্বালা ও সুখের একত্র অবস্থান দেখিব। বুভুক্ষুর নিকট হইতে বালিকা-নায়িকার অব্যাহতি কামনার যথেষ্ট পরিচয় পূর্বে লইয়াছি। সেই সকল পূর্বালোচিত পদে নায়িকার মনে প্রেমের বাষ্পও ছিল না। আলোচ্য অংশে নায়িকা একেবারে বাসনাহীন নয়। একটি পদে নায়িকা স্বয়ং মদন-পীড়িতা। তবু নায়কের বর্বরতায় নিতান্ত ব্যথিতা। এই ধরনের নায়ককে সাবধান করিয়া একদিন দূতী বলিয়াছে—'ক্ষুধার্ত হইলেই কি দুই হাতে খায়?' ক্লিষ্ট নায়িকার পরিত্রাণ-কামনা একটি অলঙ্কারে সার্থক ফুটিয়াছে—"রাত্রি যেন সমুদ্রের মত, তাহার আর শেষ হয় না। আমার উপকারের জন্ত কখন সূর্য উদিত হইবে? আমি আর সে প্রিয়ের কাছে যাইব না, বরং কাম আমার জীবন বধ করিয়া ফেলুক, সেও ভাল।" (৪৯১)

নায়িকা সত্যই আহত বুঝিতে পারা যায়। সে নিজের কামকে অস্বীকার করে নাই—ঐ কাম এমন প্রবল যে জীবনবধেও সমর্থ। তবু, দেহের অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়াছে।

বিদ্যাপতি অবশ্য ভণিতায় মদন-যজ্ঞের আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—"আগুনের যেখানে কাজ, সেখানে আগুন না জ্বালিলে কি চলে?"

আশঙ্কা ও গূঢ় আশার মিশ্রণমূলক পদগুলি লক্ষ্য করা যাক। ৬০ পদে নায়িকা অস্বীকার করিলেও পূর্বালোচিত পদের মত সে প্রত্যাখ্যান আপোষ-হীন নয়। কারণ মাধবকে দেখিয়া যখন "রাধা চকিতে চাহিয়া বদন অবনত করিল", তখন "নাগর হরির পুলক হইল, তনু কাঁপিয়া উঠিল, স্বেদ বহিয়া গেল।" মাধব যে দেহ-ধৈর্যহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার এক কারণ, রাধার সলজ্জ সভয় কটাক্ষের দর্শন-সুখ, অন্য কারণ, ঐ সভয় দৃষ্টি-মিনতিতে আত্মসমর্পণের গূঢ় আহ্বান অনুভব। তেমনি ২৮৭ পদটি "প্রথম প্রহরে প্রথম সঙ্গমের" পদ হইলেও গাঢ় অনুরাগ-কেলির বর্ণনা আছে সেখানে। রাধিকার যন্ত্রণার কথা বলা সত্ত্বেও সেখানে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ কবি জানাইয়াছেন,—"লুব্ধ মধুকরের কেলিতে উভয়ের মন আচ্ছন্ন।" অনুরূপ-ভাবে আরো কিছু পদে ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভীতির কথা আছে। ভীতির বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলে না না বলে, সিংহের ভয়ে হরিণী সিংহেরি বুকে কাঁপিতে থাকে।" আর প্রীতির পরিচয়—"নয়নক

অঞ্চল চঞ্চল ভান, জাগল মনমথ মুদিত নয়ান" (৬৭১)। এবং এই প্রকার প্রাথমিক সঙ্কোচ ও সঙ্কোচোত্তর আত্মসমর্পণের সূচনা অন্যত্রও মেলে। ৬৭৮ পদে নায়িকা প্রথমে স্পর্শে সরিয়া গিয়াছে, চকিত নয়নে চাহিয়া মাটিতে নখ দিয়া দাগ কাটিয়াছে, কিন্তু চতুর কানাই প্রয়োজন বুঝিয়া চরণস্পর্শ, করধারণ ও কুচগ্রহণ করাতে "গৌরাঙ্গী হাসিয়া তাকাইয়া বসনে মুখ লুকাইল—মনে হইল রত্ন যেন দান করিয়া আবার তাহা চুরি করিয়া লইল।"

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে—রাধার এই সমস্ত বিরূপতা বহিরঙ্গ ছলনা নয় কি—দূতীর নির্দেশ অনুযায়ী? রাধা কি এখানে লজ্জার অভিনয় করিতেছেন, যাহাতে কৃষ্ণের মতই পাঠকও প্রতারিত ও প্রলুব্ধ? এমন বিশ্বাসে কিন্তু সাহিত্য-সৌন্দর্যের ক্ষুণ্ণতা। আচরণের চতুরতায় কিছু সময়ের জন্য বুদ্ধির তৃপ্তি ঘটিতে পারে—তাহাতে রসানন্দপ্রাপ্তি ঘটে না—যাহা অনুভূতির অকপটতায় লভ্য। না, কবি যেখানে রাধাকে 'নিঠুরা মোহিনী' করিতে চাহিয়াছেন, সেখানে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। সেরূপ অংশ আমরা আলোচনাও করিব।

অপরপক্ষে লজ্জার মাধুর্য কবি চমৎকার আঁকিয়াছে। প্রথম-সমাগত নায়িকার লজ্জা-সঙ্কোচ-আশা-আশঙ্কা নিতান্ত অকৃত্রিম বলিয়াই ঐ প্রকার সৌন্দর্যসৃষ্টি সেখানে সম্ভবপর হইয়াছে। চিত্রটি এইরূপ.—

"সুন্দরী যখন প্রিয়তমের পাশে গমন করিল, তখন তাহার হৃদয় লজ্জায় ও ভয়ে আকুল। ধনী দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার অঙ্গ নড়ে না, সোনার প্রতিমার মত তাহার মুখে কথা নাই। প্রভু দুই হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল। তাহাতে ধনী যেন রাগ করিল। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। ভ্রমর তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছে দেখিয়া সে মুখ ঢাকিল। (তখন নায়ক) কমলমুখীকে বক্ষে ভরিয়া লইল।" (৫৭)

একটি নিখুঁত শৃঙ্গার-কাব্য। রসস্থির নিটোল চিত্র। কয়েকটি মাত্র কথার টানে সমস্ত ইতিহাসটি শিল্পরেখা পাইয়াছে। ইন্দ্রিয়গাঢ়তা—অসাধু উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্তে মধুর অন্তরঙ্গতায় রসাবেশ রচনা করিয়াছে। নায়ককে ভ্রমর বলার মধ্যে কবির পরিস্ফুট আদর—এবং নায়ক-কর্তৃক অনুরূপ আদরভরেই নায়িকাকে গ্রহণ। নায়িকা যখন নায়কের নিশ্চল তন্ময় দৃষ্টির

সামনে মুখ ঢাকিতেছে—তখন কবির ভাষা সংযমে অপূর্ব—'নায়ক কমলমুখীকে বক্ষে ভরিয়া লইল।'

'প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া'—জয়দেব বলিয়াছেন। সেই লজ্জার মনোহরণ রূপ দেখিলাম। লজ্জার নানা রূপ আছে। অন্ততঃ দুইটি রূপ—একটি নিষেধের, অন্যটি অনুরাগের। দ্বিতীয় প্রকার লজ্জা প্রেমের সকল অবস্থাতেই আছে, কারণ থাকিয়া সুখ বাড়ায়। বিদ্যাপতির পদে এতক্ষণ আমরা মূলতঃ নিষেধ-লজ্জাকেই দেখিতেছিলাম। এখন অনুরাগ-লজ্জার কিছু রূপ দেখা যাক।

৬১ পদে রাধা মিলনের সুখ কিছু বুঝিয়াছেন, অনুমতিও দিয়াছেন, কিন্তু চূড়ান্ত লজ্জাহীনতাকে উপভোগ করিতে এখনো অপারগ। বিলোকনকামী কৃষ্ণ মুক্ত দীপালোকে বিহার করিতে চান, রাধা সম্মত নন। বিহার গোপনে, ধীরে ধীরে এবং নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে হউক, এই তাঁহার ইচ্ছা। তবে যদি কানাই বেসামাল-রকম বেসরম হইয়া পড়েন, তাহা হইলে রাধা নিশ্চয় রাগিবেন, গালি দিবেন, কিন্তু সে গালি 'আস্তে আস্তে'। কবির দুষ্ট কৌতুক বুঝিতে পারিতেছি—গালাগালিটা আস্তে করার কারণ নিশ্চয় আশেপাশে পরিজনদের অবস্থিতি (পদে সেইরকম লেখা আছে বটে), কিন্তু কবি আরো জানেন—ইঙ্গিতে জানাইতে চান—কৃষ্ণের অশালীনতায় রাধার একটা গূঢ় পুলকের সমর্থন আছে, চাপা গঞ্জনায় সেটি রি রি করিয়া ওঠে।

৬৯২ পদেও লজ্জা ও সুখের গাঢ় মিশ্রণ। লজ্জার ঘনত্ব সুখানুভূতির প্রগাঢ়ত্বের সূচক—এবং এখানে যথেষ্ট শক্তির সঙ্গে লাজরস-বিহ্বল ইন্দ্রিয়োত্তেজনা উদ্‌ঘাটিত—

"হে সখি কি বলিব, যাহা সেই নাগররাজ করিল বলিতেও লজ্জা হয়। ...দেখিতেই আমার দেহ থরথর কাঁপিতে লাগিল, সেই লুব্ধমতি তাহাতে ঝম্পপ্রদান করিল। আলিঙ্গনের সময় চেতনা হরণ করিল, কিরূপে রসকেলি করিল কেমন করিয়া বলিব? জানিস যদি তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিস? তাহাকে দেখিয়া যে স্থির থাকিতে পারে সেই ধন্য।"

রসকেলি সম্বন্ধে সখীদের প্রশ্ন, ব্যগ্র ঔৎসুক্য, নিজ অবস্থা বুঝাইতে রাধার অসামর্থ্য, এবং নিজ অসামর্থ্যের পক্ষে, ও সখীদের অবিবেচনাপূর্ণ প্রশ্নের বিরুদ্ধে রাধার কোপমধুর গঞ্জনা—পদটিকে আশ্চর্য বাস্তবতা দিয়াছে।

'নায়িকার অনুরাগের জাগরণ' অংশের আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে আরো দুই একটি পদের উল্লেখ করিব। আমরা লজ্জার চিত্র দেখিয়াছি, লজ্জা ও সুখের বয়নও দেখিলাম। এখন ঐ লজ্জা বা সংকোচ যে শেষ পর্যন্ত কিরূপ সামর্থ্যহীন তাহারই পরিচয় লইব। প্রেমের জগতে সময়বিশেষে সংযমের কোন শক্তিই নাই। ২২৩ পদে আসঙ্গাতুর নায়িকার মানজনিত প্রত্যাহার ভিতরে কত দুর্বল, তারই ছবি। কোপ করিতে চায়, কিন্তু চোখের দিকে তাকাইয়া সব ভুলিয়া হাসিয়া ফেলে; না না না না করিয়া প্রিয়তমকে নখাঘাত করিতে জানে—করিতে চায়—মাত্র লজ্জা সেই পথে বাধা। ভ্রূভঙ্গ করিয়া অঙ্গ সরাইয়া লইতে পারে না, ক্ষণমাত্রে সুলভ হইয়া পড়ে। এই বাসনার্তের চির ক্ষুধার সামনে মানের বিরতি, ক্ষুধাবৃদ্ধির কারণে প্রযুক্ত হইলেও. যেন বড় অসহ্য। এই পদের সাক্ষ্যে দূতী কর্তৃক কামতত্ত্ব শিক্ষা—যাহা নিয়ন্ত্রিত মানের ব্যবহার শিখাইয়াছে—ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হয়। ২২৫ পদে রাধার কোপকটূক্তিটি তীব্রতায় রাধার জ্বালাময় ভালবাসাকে ফুটাইয়াছে—"মাগো আমি দুর্জনের সহিত যাইব না, যাহার রঙ কালো সে সরলচিত্ত হয় না। তাহার রূপ অবলোকন করিব না, চক্ষু থাকিতে কেমন করিয়া কূপে পতিত হইব"?

সঙ্কোচের শক্তিহীনতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে ৪৮০ পদে। সেখানে দেহ-বিবশতার চরম। যে বাঞ্ছিত, যাহার বিষয়ে হৃদয়ের সমর্থন আছে, রক্তের কলরোলকে সেখানে চুপ করাইবার উপায় কি? সকল প্রতিরোধ সেখানে রৌদ্রপাতে তুষারের আনন্দে গলিয়া যায়। তখনকার যে আত্ম-সমর্পণ—সে বিষয়ে সম্মতি-অসম্মতির প্রশ্নটাও অধিকন্তু—বিদ্যাপতি একটি মোক্ষম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন অবস্থাটি সম্বন্ধে—'অনায়ত্ত'। এই পদে অচেতন জৈবসংস্কার এবং সচেতন প্রেমব্যাকুলতা মনস্তাত্ত্বিক ও কাব্যিক সামর্থ্যে সম্মিলিত—

"যখন শয্যাপার্শ্বে যাই,—মুখের দিকে চাহিয়া হাসে। তখন এমন ভাব উৎপন্ন হয়,—জগৎ কুসুমশরে পূর্ণ। সখি, কেলিবিলাসের কি কহিব, প্রিয়তমের উল্লাসে আমি অনায়ত্ত হইলাম। নীবি খুলিয়া দেয়, হার কাড়িয়া লয়, মনের বিকারে সীমা লঙ্ঘন করে। প্রাণে স্নেহজাল বাড়ায়। সেই সঙ্গে অধরসুধা পান করে। হরষিত হইয়া হৃদয়ের বস্ত্র হরণ করে, স্পর্শে শরীর অবশ করে। তখন এইরূপ সাধ উপস্থিত হয়—সম্মতিও দিই না, বাধাও দিই না।"

(৩) পূর্ণ মিলন

পরিণত যৌবন এবং কামপূর নায়ক-নায়িকার মিলনের কথা বলিতে গেলে সহজেই গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের কেলিকোবিদ জয়দেব-কবির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে স্মরশরজর্জর কৃষ্ণকে, সসাধ্বস সানন্দা রাধাকে। শ্যামল মৃদুলকলেবর কৃষ্ণের উল্লাসহাস্য—লোললোচনা পরিরম্ভন-পুলকিত-মুকুলিত রাধার গুরুহর্ষের অব্যক্ত কূজন। দ্বাদশ সর্গের চরম মিলনের স্তরগুলি একে একে উপস্থিত হয়, প্রথমে কৃষ্ণের স্নিগ্ধ চাটুবচন—তারপর রাধাকে আকর্ষণ—তারপর শৃঙ্গার—তারপর রতিরণ—বিহার—বিপরীত বিহার—রতিক্লান্তি—বিগলিত বিমুক্ত দেহদর্শনে সুখবোধ—উপভুক্তা স্খলিতাঞ্চলা রাধার প্রৌঢ় প্রগল্‌ভতা—অলজ্জ ও আদরিণী ভাষায় কৃষ্ণকে স্বীয় দেহের বেশবিন্যাসে নির্দেশ—সুপ্রীত দামোদর কর্তৃক স্নিগ্ধ কামনায় রাধার তনুরচনা ও অর্চনা—এই সকলই—ভারতীয় শৃঙ্গারকাব্যের এই সমগ্র মিলনগীতি—জয়দেব তাঁহার শেষ সর্গে ধরাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতি জয়দেবের পথেই আছেন। কিন্তু পথান্তরও ঘটিয়াছে মাঝে মাঝে। জয়দেবের অবিমিশ্র কেলিকথায় বিদ্যাপতি কখনো কখনো নূতন সুরের যোজনা করিয়াছেন। আমরা সেই মিলন পর্যায়ের বিভিন্ন অংশ কিছু পর্যালোচনা করিব।

(ক) ক্ষুধার্ত নায়কের ও গতলজ্জা নায়িকার চিত্র

মুগ্ধা-মথনের নায়করূপে কৃষ্ণের যে মূর্তি দেখিয়াছি, এখানে তারই কিছু বিবৃত পরিচয়। এই নায়ক সিংহবৎ, ইহার নিকট হরিণীতুল্য নায়িকাকে আনার জন্য দূতী আক্ষেপ করিয়াছে। কবিও এই নায়ককে বিনীতভাবে অনুনয় করিয়াছেন—"সুকোমলাঙ্গী শিরীষ কুসুমকে মধুকরের

ন্তায় কৌশল উপভোগ করিবে" (১২৯)। কিন্তু সে উপদেশ শুনিবার পাত্র নন কৃষ্ণ, কারণ তাঁহার চোখে রাধার যে চিত্র লাগিয়া আছে, তাহা নিরতিশয় মাদকতাময়—"বসন আলুথালু, ভূষণ লুষ্ঠিত, কেশ খুলিয়া পড়িল, আহা উহু বলিয়া যাহা কিছু বলিল, তাহা কি ভুলিতে পারি?" (২৯৩)। অতএব শক্তিধর কৃষ্ণ রাধাকে গ্রহণ করিবেন। সেই মিলনক্ষুধা একটি উপমায় বড় ফুটিয়াছে—"তরুবর লতাকে যেমন করিয়া চাপিয়া ফেলে, হে সখি, আমাকে সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিল" (৪৭৭)। এবং শ্রান্তিতেও নায়িকার পরিত্রাণ নাই—"ঘুম পাইলে ঘুমকে ঠেকাই কি করিয়া?...কানাই সারা রজনীর কেলি চায়" (ঐ)। নায়কের স্বভাব জানে বলিয়া দূতী পূর্বে সাবধানী উক্তি করিয়াছিল—লোভ করিয়া মূলধন নষ্ট করিও না, যে মূলধন রাখে সেই বণিক" (২৯১)। কিন্তু কানাইয়ের মত বেপরোয়া বণিক আর কেহ নাই। দূতীর বর্ণনায় কৃষ্ণের হিংস্র বাসনার রূপ ফুটিয়া ওঠে,—"(স্তনদ্বয়) শ্রীফলের মত ছিল, এখন আবরণশূন্য নারঙ্গ ফলের ন্তায় করিয়াছে"। বিদ্যাপতি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দুই হস্তের ক্ষুধিত নখরে স্তনচর্ম ছিঁড়িয়া যেন ক্ষুদ্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে" (ঐ)।

এই একদিকের চিত্র—নায়কের। কৃষ্ণ প্রথমাবধি এই স্বভাবের। নায়িকা সাধারণতঃ গোড়ার দিকে মুগ্ধা বালা। মুগ্ধার ইতিমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন গতলজ্জা লালসাময়ী সে। সেই পরকীয়া নায়িকার প্রেমাক্রান্ত অবস্থা সখী একবার কয়েকটি তীব্র কথায় ফুটাইয়াছিল, (১) যাহা বৃদ্ধি পায়, তাহাকে লুকান যায় না—কুচ কি অঞ্চলে লুকাইয়া রাখা যায়, (২) তোমার মনে প্রেম হইল, তুমি দূরে সরিয়া গেলে, (৩) তোমার নয়নের কাজল মুখের কালি হইল, (৪) তোমার গুপ্তপ্রেম ক্ষতস্থানে লবণ প্রয়োগের ন্তায় যন্ত্রণাদায়ক (৭১)। এই নায়িকার অসংকোচ কামনার কয়েকটি চিত্র লইব।

এ নায়িকা এমনকি নায়কের রতি-অনভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলে—"বানরের গলায় মুক্তার হার" (৭০২); এবং নিজের অপরিতৃপ্তির ঘোষণায় কুণ্ঠিত হয় না। যদিও 'হে সখি, সেই রসিকরাজ যাহা যাহা করিল বলিতেও লজ্জা করে' বলিয়া বর্ণনা শুরু করে, কিন্তু রীতিমত আহ্লাদের সঙ্গে নায়কের অতিশয়িত আচরণের বিবৃতি দেয় (৬৯০)। দীপালোকে প্রমত্ত

বিহার নায়িকা পূর্ণভাবে উপভোগ করে, যদিও লজ্জার কথা বলিতে ছাড়ে না। যে নায়িকা আক্ষেপের সঙ্গে বলিয়াছে—"নারীর জীবন কঠিন তাই লজ্জায় মরিয়া গেল না"—তাহারই উদ্‌ভ্রান্ত রাত্রির অবসান কোথা দিয়া কিভাবে হইল—সে জানে না। লজ্জামূর্চ্ছিতা এবং রসমূর্চ্ছিতার মধ্যে পার্থক্য আছে, কবি জানেন। তিনি বেশ জানেন, কখন লজ্জার উচ্ছ্বাসে বিশ্বাস করিতে হয়, কখন হয় না (৬২)। তিনি তাই সখীর নিকট নায়িকাকে স্বমুখে স্বীকার করাইয়াছেন—প্রিয়-মিলনে লজ্জা রাখিতে তাহার অসামর্থ্য এবং বিবিধ নাগরীপনায় সোৎসাহ প্রবৃত্তির রূপ। নায়িকা মুক্ত-কণ্ঠেই স্বীকারোক্তি করিয়াছিল (৭৫)। এরূপ নায়িকা বহুসময় মিলনে পূর্ণ সুখ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়। "একে অর্ধ-রাত্রিতে সাক্ষাৎ, তার উপর লজ্জা বৈরী" (৭৪)।

দেহপীড়ায় নায়িকার এই অস্থিরতা ও ক্ষোভ মানসিকভাবে ঠিক মুগ্ধার বিপরীত ভূমিতে। প্রৌঢ়া প্রগল্‌ভার লজ্জা থাকে না। কিন্তু কাব্যও থাকে না যদি লজ্জাবরণটুকু সম্পূর্ণ অপসৃত করা যায়। এখানে লজ্জা আছে, তাহা বাধা দেয়, কিন্তু প্রাণ ক্ষুধিত। তবে অসন্তোষ সর্বত্র ঘটে না—পূর্ণানন্দের ক্ষণ আসে—৭৬ পদে তেমন অবসর। কৃষ্ণের সহসাক্রমণ এবং বিহ্বল নায়িকার উপর সুযোগ-গ্রহণের বর্ণনা নায়িকা নিজেই করিয়াছে—যেন আপাত গঞ্জনার ভাষায়—কিন্তু পরিতৃপ্ত অন্তরে। পদটিতে ইন্দ্রিয়া-বেশের সার্থক রূপায়ণ—

"সন্ধ্যাবেলা, যমুনার তীর, কদম্বের তরুতলে, কি বলিব, সহসা কালা আমাকে অহে করিয়া মদন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।...সে আমার বুকের কাপড় হরণ করিয়া, করে কুচ ধরিয়া, আমার মুখ দেখিয়া অধর পান করিল। বারবার বিহ্বল হইয়া কুচস্পর্শ করিল, যেন নির্ধন সোনার বাটি পাইল।"

অন্যত্রও রাধা পরমোল্লাসে নিজ দেহে কৃষ্ণের উপভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কারের পর অলঙ্কারে স্ব-দেহে কৃষ্ণদানকে অর্চনা করিয়াছেন। একটি অলঙ্কার খুবই স্নিগ্ধসুন্দর—বক্ষে নখচিহ্ন সম্বন্ধে—"নব শশিতুল্য অনুরাগের অঙ্কুর" (৭৭)। রাধা এই পদেই আত্মসংবরণের অসামর্থ্য ঘোষণা করিয়াছেন গৌরবের সঙ্গেই—"নূতন প্রেম সংসারের সার, যাহা বর্ধিত হইতেছে তাহা কেমন করিয়া গোপন করিবে?"

নায়ক নায়িকা উভয়ের অবস্থা দেখিলাম। এই প্রসঙ্গের শেষে উভয়ের উন্মত্ত মিলনের বর্ণনা উদ্ধৃত করা চলে—

"উভয়ে শয্যায় বস্ত্র সাবধান করে না, উভয়ে পিপাসিত, জলপান করিতেছে।" (৭৮)

প্রণয়রণে জয় পরাজয় নাই। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরেও ফলাফল অমীমাংসিত—

"মদন দুইজনকে জয়পত্র দিল।"

জয়দেব শুরুতে বলিয়াছেন—

"যে মন্মথ-কলাযুদ্ধে পুলক-রোমোদ্গম নিবিড় আলিঙ্গনের, নিমেষ—সাস্তিপ্রায় অবলোকনের, এবং নর্মকথা অধর সুধাপানের বিঘ্নস্বরূপ হইয়াও আনন্দবিশেষের হেতু হইয়াছিল, রাধাকৃষ্ণের সেই সুরতক্রীড়া আরম্ভ হইল।"

পরে বলিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাহুযুগলে সংযমিত, পয়োধরভারে পীড়িত, নখে ক্ষতযুক্ত, দংশনে দংশিত, শ্রোণীতটে আহত, হস্তদ্বারা কেশে আকর্ষিত, এবং অধর সুধাপানে সম্মোহিত হইয়াও আনন্দিত হইলেন। অহো কামের কি বামা গতি।"

(খ) অপরাজেয় লজ্জার ভূমিকা

লজ্জার দুই রূপ পূর্বে দেখিয়াছি—এক, প্রেম-অনভিজ্ঞা নায়িকা লজ্জাভরে বাধা দিতেছে; দুই, নায়িকার প্রেমানুভূতির সূচনা হইয়াছে, কিন্তু এখনো প্রগল্ভার অবস্থা নয়, লজ্জাবরণ তাহার নবসুখোদয়কে বাধায় দ্বিধায় রমণীয় করিয়াছে। পূর্ণ মিলনকালের অবস্থার মধ্যেও লজ্জা আছে, এই লজ্জা অপরূপ, নারীর স্বভাবসৌন্দর্যের উপাদান এবং উন্মুক্ত ক্ষুধারূপের উপর বর্ণ-মেঘের কমমধুর ছায়াপাত। এইরূপ লজ্জায় তিনটি চিত্র উপস্থিত করিতেছি। প্রথমটিতে আছে নায়িকার অরক্ষিত সৌন্দর্যের কামবিবশ চিত্র। চিত্রটির ইন্দ্রিয়সৌন্দর্য বিশেষ প্রকট হইয়াছে—ঐ অসংবৃত অবস্থায় নায়ক কর্তৃক নায়িকার লজ্জাহরণের প্রয়াস নায়িকা উল্লাসভরে বর্ণনা করায়—

"একাকিনী আমি হার গাঁথিতে ছিলাম, আমার বুকের কাপড় ত্রস্ত হইয়া খসিয়া পড়িল। তখন সহসা কান্ত আসিলেন, কুচ ঢাকিব কি নীবিবন্ধনও খুলিয়া গেল।... সমস্ত শরীর ভাবভরে অস্থির হইল; কত যত্ন করিয়া তাহাকে স্থির রাখি বল তো? ব্যস্ত হইয়া আমার কুচ চাপিয়া ধরিল। সকল শরীরে কত শোভা পাইল। তখনকার উল্লাস গোপন করিতে পারি না। মুদিত কমলে (নয়ন কমলে) হাসি ব্যক্ত হইল।"
(৪৮৪)

এই লজ্জা—অগ্নির আহুতি। অনুরূপ অবস্থায় অনুভূতির তীব্রতায় স্তম্ভিত লজ্জার চিত্রও আছে। যেমন—

"যখন হরি কাঁচুলী কাড়িয়া লইল, (তখন সুন্দরী) অঙ্গ ঢাকিবার অনেক প্রযুক্তি করিল। তখনকার কথা বলা যায় না। সুন্দরী ধনী লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। দীপ দূরে জ্বলিতেছে, হাত দিয়া নিবান যায় না। লজ্জায় মরে না, রমণীর কঠিন পরাণ।"
(৪৮৫)

উগ্র লজ্জায় স্তম্ভিত অবস্থা কাটিয়া পুলকানুভবের সূচনা—

"বস্ত্র হরণ করিতে লজ্জা দূরে গেল। প্রিয়তমের কলেবর বস্ত্র হইল। নতমুখে প্রদীপ দেখিতে লাগিলাম,—ভ্রমর মুদিত কমলের মধুপানে উন্মত্ত হইল। সে সকল কথা স্মরণ করিয়া মনে লজ্জা হয়, যত সব বিপরীত কাজ, সে তাহাই করিল। হৃদয়ের আকুলতায় আমার হৃদয় কম্পিত হয়,—তোকে তো বলিয়াছি,—আর কি বলিব?" (৪৮৬)

একটি সুন্দর প্রেমের কবিতা, দেহে-প্রেমের। অঙ্গের অনঙ্গ এই পদে গাঢ় সৌন্দর্যের কবিভাষা পাইয়াছে। 'প্রিয়তমের কলেবর বস্ত্র হইল'—নিবিড় মিলনকে কত সংক্ষেপে সৌন্দর্যে প্রকাশ করা যায়, তার দৃষ্টান্ত। মিলনকালের নানা অবস্থাকে বর্ণনার চেষ্টা মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়—সবটুকু বর্ণনা করা যায় না—সখীদের নিকটেও নয়—সেই মানসিক অবস্থাটি পদের শেষ পংক্তিতে অপূর্ব পুলকে উচ্চকিত—"তোকে তো বলিয়াছি—আর কি বলিব?"

(গ) প্রেমের পরিবেশ-সৌন্দর্য এবং ভোগবৈচিত্র্য

আমাদের আলোচ্য প্রেম পরকীয়া। এখানকার মুক্ত স্বাধীন মিলনে কবি বিবাহের রূপক দেখিয়াছেন; ২১৬ পদে স্বাধীন স্বেচ্ছামিলনকে বিবাহ-গৌরব দিয়াছেন। সুরভিপূর্ণ নিকুঞ্জ হইল বিবাহবেদী, মনের মিল গাঁটছড়া,

অধরমধু মধুপর্ক, মুক্তাহার উজ্জ্বল আলপনা, নয়ন বন্দনাকার, পীন পয়োধর পূর্ণ কলস, দুই করপত্র কলস ঢাকিবার পল্লব এবং কামদেব সম্প্রদানকর্তা।*

বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য কবি ভারতচন্দ্র বহুদিন পরে অনুরূপভাবে স্বাধিকারপ্রমত্ত মিলনকে বিবাহবন্ধনের ভাবরূপ দিয়া একদিকে ভাবহীন বিবাহকে তিরস্কৃত, অন্যদিকে নীতিহীন আবেগপূর্ণ মিলনকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—"কন্যাকর্তা হইল কন্যা, বরকর্তা বর, পুরোহিত ভট্টাচার্য হইল পঞ্চশর।"

ভোগেচ্ছার বিচিত্ররূপ বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন। ২৭৯ পদে তারই একটি মাদক রূপ পাইতেছি। নায়ক পঞ্চেন্দ্রিয়ে নায়িকার দেহারতি করে।

*এই পদটি "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে" পদের সঙ্গে তুলনীয়। বক্তব্য প্রায় এক। উভয় পদেই দেহপীঠে মিলন-বিবাহের উৎসবসজ্জা। গান্ধর্ব বিবাহে তাহাই হয়—মণ্ডপ সাজাইবার লোক মেলে না সেখানে, কিন্তু আনন্দসজ্জার কি অভাব থাকে? প্রেমস্ফুরিত হৃদয় বহিরঙ্গ সজ্জার অভাব পূরণ করিয়া লয় দেহস্ফুরণে। 'দেহের কোলাহলে' উৎসবের পূর্ণাঙ্গতা।

কিন্তু 'পিয়া যব আওব' পদের সঙ্গে এই পদের প্রধান পার্থক্য ভাববৈষম্যে। এ বৈষম্য ঘটিয়াছে প্রেমের কাল ও অবস্থান্তরের জন্য। বর্তমান পদটি মিলনলোকের অন্তর্গত; 'পিয়া যব আওব' পদটি মিলন-বিরহের দীর্ঘ ধারার প্রান্তবর্তী, সম্ভবতঃ বিরহ কালে ভাবমিলনের। প্রথম ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ দৈহিকতা। তবে এখানে একটি ভাবরূপক-এ মিলনকে আবৃত করার জন্য দেহমিলন শিল্পসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। মিলনের মাংসলতা তাহাতে ঘুচিয়াছে এবং ঐ রূপকের রসশক্তি মিলনকে ভাবগূঢ়তা দিয়াছে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় পদটি বিরহ-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। প্রিয়তম নাই, আসিবেন কবে ঠিক নাই,—আদৌ আসিবেন কিনা সন্দেহ। বিরহের অগ্নিশয্যাশায়িনী রাধিকা কল্পনায় মিলনশান্তি চাহিতেছেন। ভাবী মিলনকল্পনা স্বপ্নগাঢ় অনুভূতির রসে রাধিকাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কল্পনার সেই মিলনে দেহ সত্যই পূজাবেদী—বাস্তব মিলনকালে যাহা ছিল কামশয্যা। ভাবমিলনের সেই পদটি তাই আধ্যাত্মিক। একটি পবিত্র উৎসর্গের শুচিতা দেহের রেখায় রেখায়। এমন উন্নীত মানসিক অবস্থা যে, দেহের গোপনীয়তা পর্যন্ত যেন ঘুচিয়াছে। নারীদেহের লজ্জাকেন্দ্রগুলির উল্লেখ রাধিকা অবলীলাক্রমে করিয়া গিয়াছেন, অথচ অনুচিত শারীরিকতার চিহ্নমাত্র নাই। অনশ্বর, মন্ত্রশুচি, সাধনশুদ্ধ দেহটিকে রাধার তাপসী আত্মা উপস্থিত করিয়াছে কৃষ্ণ-পূজার অঙ্গনে। রাধার দেহাভিমান এমনই লুপ্ত যে, কৃষ্ণসঙ্গমে 'চাঁদক হাট'-তুল্য নারী-সমাবেশের ব্যবহারে কুণ্ঠামাত্র নাই। এই দেহাহুতি-যজ্ঞে সত্যই রাধা আয়ের স্বাহা।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের চারিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই আরতি সম্ভব হইয়াছে। মুগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে নায়ক সেই আনন্দারতির বর্ণনা করিতেছে—"স্পর্শে বুঝিলাম অঙ্গ শিরীষ ফুলের ন্যায়, সরসিজের ন্যায় মুখের সৌরভ, কোকিলস্বরের ন্যায় মধুর কণ্ঠস্বর, এবং অমৃতের ন্যায় পানে অধরসুধা।" কিন্তু হায়, অপরিতৃপ্ত একটি ইন্দ্রিয়—যাহাতে রূপের প্রদীপ জ্বলে—সেই নয়নদীপ। নায়িকা অন্ধকারে আসিয়াছে—কুণ্ঠিত আছে চক্ষু। রাধিকা গঞ্জনামধুর কটাক্ষে বলিয়াছেন বটে—'শীতল জল পাইয়াছ, পিপাসা হরণ কর, দেখিয়া কি করিবে?' কিন্তু কৃষ্ণের মত কবিও জানেন, প্রেমে দর্শনের কী মূল্য! কবি বলিতেছেন—'হে রমণীপ্রবর শ্রবণ কর, মুরারি নয়নের আতুর হইয়া রহিল।'

নায়ক-নায়িকাকে নানা পরিবেশে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রিয়ক্ষুধার রূপ পরিস্ফুট করাই কবির উদ্দেশ্য—পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে তেমন একটি সাফল্যযুক্ত উপস্থাপন।

মিলনের একটি শ্রেষ্ঠ পদকে এইবার আমরা লক্ষ্য করিতে পারি—শৃঙ্গারের উৎকৃষ্ট চিত্ররূপ। ঘনিষ্ঠ প্রেমলীলার কয়েকটি পরিস্থিতিকে সৌন্দর্যজীবন দেওয়া হইয়াছে। যথা, একটি 'পরিস্থিতি—

"হরি হার ধরিল, রাধা চমকিয়া উঠিল, অর্ধ হার মাধবের হস্তে, অর্ধ কণ্ঠে, ধনী কপট কোপে দৃষ্টি ফিরাইল।"

এর পরের অবস্থা—

"হরি চন্দ্রমুখ দেখিয়া হাসিতে লাগিল, (রাধার) মধুর হাসি গুপ্ত রহিল না, তখন সুমুখী মুখচুম্বন দিলেন।"

মুখচুম্বন করিতে দিলেন না—'মুখচুম্বন দিলেন।' রাধিকা এখনো সম্পূর্ণ বিবশা নন—আত্মসংবরণের শক্তি আছে—এই অবস্থায় তাঁহার স্বেচ্ছা-দানের কৃপাবর্ষণ কৃষ্ণকে ধন্য করিয়াছে। এরপর সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণ কর্তৃক সুযোগ গ্রহণ—

"করে কুচ ধারণ করিতে নারী আকুল হইল, তাহা দেখিয়া মুরারি অধর-মধু পান করিলেন।"

কবি এরপর, আকুল অতএব আত্মসংবরণে অসমর্থা, রাধার শিহরণ

তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা করিলেন না—অলঙ্কারের অপরূপ ব্যঞ্জনায় তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন—

"চামরের ন্যায় চিকুর হইতে কুসুমের ধারা ঝরিতে লাগিল, উহা যেন অন্ধকার পান করিয়া নব তারকারাজি বমন করিতে লাগিল।"

সংযমে ও ব্যঞ্জনায় মনোজ্জ্বল একখানি কাব্য।

(ঘ) নূতন অনুভূতির সঞ্চার

বিশুদ্ধ আসঙ্গলিপ্সা একসময় রুদ্ধদ্বার কক্ষে রুদ্ধশ্বাস হইয়া মরে। অথচ প্রেম অসীম। সেই অসীমতাকে নানা নূতন অনুভূতির সঞ্চারে বিস্তারিত করিতে হয়। প্রেমানন্দের মধ্যে অকারণ বেদনার উদয় এই নবানুভূতির ভিতরে সর্বোত্তম। বর্তমান পর্যায়ে আমরা সে মনের আলোচনা করিতেছি না। কিন্তু তাহা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নানা অনুভূতি সম্ভব এবং বিদ্যাপতি বহু-ভাবে সেইরূপ ভাবানুভূতিকে ফুটাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন বটে। প্রেমের মধ্যে 'স্নেহ' তেমন একটি অংশ। ২৮৬ পদে নায়িকার প্রতি স্নেহানুভূতি বোধ করিয়াছে নায়ক। ক্ষুধা অবশ্য পরিত্যক্ত নয়, কিন্তু তাহারই মধ্যে স্নেহ-সোহাগের অমৃতরস মনকে ভাবানন্দে নিষিক্ত করিয়া ফেলে। নবীন নাগরের চিত্তের ভিতরও এই স্নিগ্ধ সোহাগ-দর্শন বিদ্যাপতির মনস্তত্ত্ববোধের পরিচায়ক—"কোমলাঙ্গী কমলমুখীকে দেখিলাম, এক তিলের জন্য কত স্নেহ জাগিল। মনসিজ নূতন, গুরু লজ্জা, প্রেম ব্যক্ত, অথচ কত ছলনা। ক্ষণে পরিত্যাগ করে আবার ক্ষণে নিকটে আসে, মন ভরিয়া মিলে না, আবার উদাসও হয় না। চক্ষুর দৃষ্টি স্থির হয় না, হাত ধরিলে ধনী মুখ লুকায়।"

প্রেমিকার মধ্যে যেমন মাতা, তেমনি প্রেমিকের মধ্যে পিতা আছে। সে আশ্রয় দেয়, রক্ষা করে, নায়িকার লীলা-ছলনাকে উপভোগ করে কোমল কৌতুকে। নবীন নাগরের হৃদয়-মধ্যেও প্রেমস্নেহের উদয় দেখিয়াছেন বলিয়া বিদ্যাপতির কবিদৃষ্টি প্রশংসাযোগ্য।

স্নেহের মত অনুরাগও বিদ্যাপতিতে প্রেমের বিশেষ অনুভূতি। বিদ্যাপতি নিশ্চয় পরবর্তী রূপগোস্বামীর অভিপ্রায় অনুযায়ী সদা অনুভূয়মান প্রেম অর্থে 'অনুরাগ' শব্দটি ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু অনুরাগ শব্দটি উচ্চারণমাত্রে তাঁহার মনে প্রেমের যে প্রকৃতি উদিত হইত তাহাতে স্বতঃই যুক্ত ছিল প্রেমের নিত্য-নবাস্বাদের রূপ। ৪৭০ পদে রাধা বলিতেছেন—"মাধব, প্রেম যেন পুরাতন না হয়, নব অনুরাগ শেষ পর্যন্ত রাখিবে, যাহাতে আমার সম্মান শেষ পর্যন্ত নষ্ট না হয়।" নব অনুরাগ শেষ পর্যন্ত রাখার জন্য কৃষ্ণকে রাধার অনুরোধ—যেন প্রেম পুরাতন না হয়। যে কবি এইরূপ লিখিয়াছেন, মিলন বর্ণনায় তাঁহার কলমের ডগায় সহজেই আসিয়া যায়—'সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিএ তিলে তিলে নূতন হোয়।' অনুরাগে প্রেম পুরাতন না হওয়া এবং অনুরাগে প্রেম নূতন হওয়া, একই কথা।

'অনুরাগ' শব্দ ব্যবহৃত না হইলেও আর একটি পদে 'তিলে তিলে অনুভূয়মান প্রেমের' পরিচয় পাই। ৮৫৩ পদে শেষরাত্রির বিলাস বর্ণিত। দীর্ঘ রজনীর শেষেও কামনার অপরিতৃপ্তি। তখনো সুমুখীকে নিরীক্ষণ করিয়া মুখচুম্বন, এবং দৃঢ় আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিত দেহ। সেই আলিঙ্গনের ফল দেখিয়া বিস্মিত কবি বলিয়াছেন—'যেন দুইজনের স্নেহ পুনর্বার অঙ্কুরিত হইল।' বাস্তবিক প্রেম যে সদাস্ফুরিত, ইহা রজনীপ্রান্তের আলিঙ্গনেও পূর্বোক্ত প্রকার দেহ-বিপর্যয় দেখিয়া বুঝিয়াছি।

(ঙ) কামনার চরম এবং কবির সাহস

দেহের কাব্য লিখিতে গিয়া কবিরা যখন কোনো অবস্থাতেই কলম থামান নাই, সমালোচকও একবার আরম্ভ করিয়া থামিতে পারেন না। মিলনের নির্লজ্জতম অবস্থাটিকেও অকুণ্ঠে বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন। যে আচরণ পুরুষ করিয়াও সাহিত্যে বর্ণিত হইলে নিন্দার সীমা থাকে না, নারীকে সেই পুরুষায়িত ব্যবহারে নিযুক্ত দেখিলে—অবশ্যই ছি ছি! কানু,

সকলেই জানে, নীতি-নিয়ম মানে না। কিন্তু প্রকাশ্যে বেআইনী করিলে সমাজের শাস্তি আছে। বিপরীত বিহার বর্ণনাকারী বিদ্যাপতি বা ভারত-চন্দ্রের নিন্দা করিতে আমরা ধর্মতঃ বাধ্য।

তবে কাহারও লজ্জা কম এবং সাহস বেশী। যে ছুঁইলেই নুইয়া পড়ে, তাহার লজ্জাহীনতা যত কটু, অটল পাদপের ততখানি নয়। মিলনের মুক্ত বর্ণনায় বিদ্যাপতি ইতিমধ্যে আমাদের চোখের (বা মনের) পর্দা অনেকখানি ছিঁড়িয়াছেন, বোধ হয় সেই সুযোগে খোলা চোখে দেখা বা খোলা মনে কিছু বলা যায়।

বিপরীত বিহার বর্ণনায় বরং আমরা বিদ্যাপতির 'শিল্প' সংযমের প্রশংসা করিতেছি—যে প্রশংসা ভারতচন্দ্র পাইতে পারেন না। ভারতচন্দ্রের দেহ ঘুলাইয়াছে ঐ অবস্থায়—বিদ্যাপতি সৌন্দর্যদৃষ্টিতে অবিচল ছিলেন।

এইখানেই আশ্চর্য। লজ্জাশূন্যতার চূড়ান্ত অবস্থাতেও মানসিক লাম্পট্যকে কবি দূর করিলেন কিরূপে—কিরূপে মুগ্ধ রূপদৃষ্টিকে অব্যাহত রাখিলেন—আশ্চর্য বটে! এই অচঞ্চল রূপপ্রেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত আছে বিদ্যাপতির স্বভাবজ মনস্তত্ত্বজ্ঞান। বিপরীত বিহারের একটি পদ তো সমগ্র মিলনপদের শিখরস্বরূপ।

এখন কবির সৌন্দর্যসৃষ্টির কিছু দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাক।—

"আজিকার বিলাস সমস্ত বিপরীত হইল। জলধর (কৃষ্ণ) উল্টাইয়া পৃথিবীতলে পড়িল এবং তাহার উপর সুন্দর পর্বতযুগল (পয়োধর) উত্থিত হইল। আমি মরকত-নির্মিত দর্পণ (কৃষ্ণের দর্পণতুল্য বক্ষ) দেখিয়া উচ্চ-নীচ বুঝিতে না পারিয়া সেইখানে পতিত হইলাম।.' (৬১৬)

"চিকুর বিগলিত হইয়া মুখমণ্ডলে মিলিত। মেঘমালা (কেশ) চন্দ্রকে (মুখকে) বেষ্টন করিল। মণিময় কুণ্ডল কানে দুলিতে লাগিল। ঘামে তিলক মুছিয়া গেল।...কিনি কিনি করিয়া কিঙ্কিণী, কনকন করিয়া কঙ্কণ এবং কলরব করিয়া নূপুর বাজিতে লাগিল। মদন নিজ গর্বে পরাভব পাইল, জয় জয় ডিণ্ডিম বাজিল...যমুনায় গঙ্গার তরঙ্গ মিলিল।" (৬১৭)

"অলকের ভারে মুখ ঢাকে, যেন চন্দ্রমণ্ডলকে অন্ধকার ঢাকে। বিলোল হার লম্বিত হইয়া শোভিত—আনন্দিত মদন হিন্দোলা খেলিতেছে।...কিঙ্কিণীমালা মধুর বাজিতে লাগিল, যেন মদনরাজের জয়তূর্য।" (৬১৪)

."ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেণী কুচকলসের উপর লোটাইতে লাগিল, মনে হইল যেন কৃষ্ণসর্পিণী কনকের উপর শয়ন করিল।" (৪৯৬)

"কেশকুসুম দেহাবেগে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, যেন পূজা সমাপন করিয়া তিমির তারাফুল ত্যাগ করিতেছে।" (৪৯৫)

আমরা সহজেই লক্ষ্য করিব কবি কিভাবে অশালীন বাস্তবকে সৌন্দর্যের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। আলঙ্কারিকতা যদি কোথাও অতিমূল্যে গৃহীত হয়, সে এখানে—অলঙ্কারের আলোকাবরণে এতবড় দেহের দৌরাত্ম্যও যেন আবৃত। কবির কৃতিত্ব হইল, তিনি যে-সকল অলঙ্কার দিয়াছেন, সেগুলি প্রায়ই গতানুগতিক নয় এবং এমন শক্তিস্পৃষ্ট যে, পাঠকচিত্তে চেতনার তড়িত-সঞ্চারে অভাবনীয় সাফল্যলাভ করিতে পারিয়াছে। ইহার উপর আছে বিদ্যাপতির প্রখর মনস্তত্ত্বজ্ঞান, পদগুলিকে ইতরতা হইতে যাহা রক্ষা করিয়াছে। নায়িকা বলিতেছে—"আজ আমার সরম ভরম সব দূরে গেল।" তারপর বলিল—"প্রিয় ঐরূপে আপনার ভাব (পুরুষের ভাব) আমাতে অনুভব করিয়া কি যে সুখ পান বলিতে পারি না।" রাধিকার এই অবোধ (!) বিস্ময়টুকুর একটি উত্তর আছে—বিহারান্ত অবস্থার বর্ণনায় বলা হইতেছে—"সে (কৃষ্ণ) আবার বিবস্ত্রাকে বস্ত্র দিল, লজ্জায় তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইলাম। সেই রসিকবর আমাকে কোলে আগলাইয়া আঁচলে আমার শ্রমজল মুছাইল, তারপর মৃদু বীজন করিতে আমি নিদ্রিত হইলাম।"

উদ্ধৃত অংশে পুরুষের দুই মূর্তি—ক্ষুধার ও সুধার। ক্ষুধারূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত—সেই যেন তাহার স্বাভাবিক রূপ। কিন্তু তাহার স্বভাবের সুধারূপও আছে—মূর্চ্ছিতা তনুজীবিতার প্রতি স্নিগ্ধ স্নেহ ও সাদর সেবার মধ্যে সেই রূপের ছবি দেখিলাম।

কিন্তু এখনো শেষ নয়, বিপরীত বিহারের শ্রেষ্ঠ পদের—বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদও বটে—আলোচনা হয় নাই। এই পদটি বিদ্যাপতির সামর্থ্যের প্রমাণ। ইহাতে কবির প্রেমদর্শনের সঙ্গে জীবন-দর্শনেরও ছায়াপাত। কী প্রবলতায়, সাহসে, জীবনের তৃষ্ণারূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, এখানে তাহার নিদর্শন পাইতেছি। উদ্ধৃত করা যাক—

"সখি কি বলিব, বলার শেষ নাই। স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, নিকট কি দূর, বলিতে পারি না। বিদ্যুৎলতার তলে তিমির প্রবেশ করিল, উভয়ের মধ্যে সুরধুনী ধারা। তরল তিমির যেন শশী ও সূর্য গ্রাস করিল। চারিদিকে তারা যেন খসিয়া পড়িল। অম্বর খসিল, পর্বত উল্টাইয়া গেল। ধরণী ডগমগ দুলিতেছে। প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে, ভ্রমরীরা কলরব করিতেছে। প্রলয়পয়োধিজল যেন আচ্ছাদন করিল। কিন্তু ইহা যুগের অবসান নয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, কে বিপরীত কথা প্রত্যয় করিবে?" (৬৯৮)

পদটি বিপরীত বিহারের। মিলনকালীন বিভিন্ন দেহরূপ ও দৈহিক প্রক্রিয়াকে আলঙ্কারিক আতিশয্য দান করা হইয়াছে বুঝিতে কষ্ট হয় না। যদি বা হয়, সম্পাদক মহাশয়ের ব্যাখ্যার পরে দেহের কোন্ অংশের সঙ্গে কিসের তুলনা করা হইয়াছে অক্লেশে বুঝিতে পারি। যেমন, বিদ্যুৎলতার তলায় তিমির, মানে রাধার তলায় কৃষ্ণ। মধ্যে সুরধুনী ধারা, মানে কণ্ঠের মুক্তার হার। শশী ও সূর্যকে তরল তিমির গ্রাস করিল কথার অর্থ, নায়িকার উন্মুক্ত কেশপাশ চন্দনবিন্দু ও সিন্দুরবিন্দুকে ঢাকিয়া ফেলিল। তারা-খসার অর্থ, মাথা বা গলার ফুল খসা; অম্বরখসা হইল বসন খসা। যে পর্বত উল্টাইয়াছে তাহা কুচপর্বত। ডগমগ দোলায়িত ধরণী আর কিছু নয় অনুরূপ চঞ্চল নিতম্ব। প্রবল বায়ুবেগ, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের প্রতিরূপ। এমন কি প্রলয়পয়োধিজল বলিতে ঘন নির্গলিত স্বেদজলকেই বুঝিতে হইবে। পাঠকের ভয় নিবারণ করিয়া বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—বাহ্যতঃ প্রলয় প্রতীয়মান হইলেও ইহা আসল যুগাবসান নয়।

এই নির্গলিত অর্থ অনুধাবনের পর কবির বচনচাতুরীতে যতখানি খুশীবোধ করিয়াছি, অসন্তোষ ততোধিক—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার বিপুল প্রদর্শনী, কিংবা এ সেই পরিচিত আতিশয্যপূর্ণ ভারতীয় আলঙ্কারিক উদ্যম। কিন্তু সত্যই কি তাই? পদটির ভাবরূপে পুনর্বার দৃষ্টিক্ষেপ করা যাক।

শক্তিবাদী বিদ্যাপতি। বৈষ্ণব পদকর্তা হইয়াও তান্ত্রিক রসকল্পনার অধীন কবি। সুমোহন সুষমালোকের পরিবর্তে ভীমা প্রকৃতির তন্ত্রোক্ত অট্টরসোল্লাস বিদ্যাপতির এই পদকল্পনার পিছনে আছে। তন্ত্রের বিপরীত রতাতুরার চিত্র স্মরণ করিতে বলি। পুরুষ ও প্রকৃতির উন্মত্ত সঙ্গমে প্রলয়ের জন্ম, সেই সঙ্গমের কালান্তদাহের ছায়া এই পদে। বিদ্যাপতির শৈব-শক্তি সংস্কার প্রচলিত আলঙ্কারিক বন্ধনের মধ্যে প্রবল আর্তরবে ফাটিয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গমে সৃষ্টি-প্রলয়ের কথা যদি বিস্মৃতও হই, যদি উহাকে মানবজীবনের সীমায় সঙ্কুচিত করিয়া আনিতেও চাই—মিলনকালীন অনুভূতির একটি সার্থক রূপ-প্রতীক ঐ পদটি। এখানে বিপরীত বিহারের বর্ণনা করিতে গিয়া প্রলয়কালীন অবস্থাকে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেখানে শশীসূর্য মহাতিমিরে গ্রস্ত, তারকাপুঞ্জ বিচ্যুত, পর্বত বিপর্যস্ত, আকাশ বিধ্বস্ত, যেখানে ধরণী দোলায়িত এবং যেখানে গর্জনশীল বহমান প্রবল বায়ু ও উত্তাল প্রলয়পয়োধিজল—সেই যুগান্তচিত্র। বর্ণনায় দুইটি কেবল দুর্বল অংশ আছে—বিদ্যুৎ ও তিমির-মধ্যবর্তী সুরধুনীধারা এবং চঞ্চরীগণের কোলাহল। ঐ দুইটি অংশকে বাদ দিলে, অন্ততঃ ভাবার্থে কবি সংক্ষেপে প্রলয়চিত্র ফুটাইতে পারিয়াছেন।

এই প্রলয়-ভাবনার সঙ্গে প্রেমানুভূতির সম্পর্ক কি? অমন একটি ধ্বংসকারী অবস্থার সঙ্গে পরমানন্দ মিলনাবস্থার তুলনায় কি রসাভাস ঘটে নাই—মিলনের সুকুমার ভাবলোকের চিত্রণের পক্ষে কি তুলনাগুলি রূঢ় নয়?

ঠিক যদি বিপরীত কথা বলি, যদি বলি দেহী মানবের প্রাণলোকে কেলিউল্লাস যে দুর্বিষহ অনুভূতির সৃষ্টি করে তাহা প্রলয়ের অনুরূপ—মানস-প্রলয়! মর্মগ্রন্থি-ছেঁড়া সংজ্ঞাহারা স্মরগরলোল্লাস—তাহাতে বিষমূর্চ্ছিত বিস্ফারিত আতঙ্ক—যদি কবিচিত্তে প্রলয়ভাবনাকে উদ্রিক্ত করে—আমরা মুক্তকণ্ঠে কবির কল্পনাবলিষ্ঠতার প্রশংসা করিব। অন্য কোনো বৈষ্ণব কবির ইহাতে অধিকার নাই।

(চ) মিলনান্তে

রতির বিরতি আছে। কবি অন্ততঃ নিঃশ্বাস ফেলিতে চান। রাধা-কৃষ্ণের মিলন এক সময় শেষ হয় নৈসর্গিক নিয়মে, অর্থাৎ নিশান্তে। প্রভাতে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছিন্ন হইবার কাল। বিরহে যে-রাত্রি অনন্ত দীর্ঘ, মিলনে

তাহা ক্ষণমাত্র। কবি, রাধাকৃষ্ণের যুগ্মদেহের ভিতরে প্রকৃতির দীর্ঘনিঃশ্বাস বহাইয়া, তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

মিলনবর্ণনার দায় প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি, অল্পই বাকি আছে। যেমন ধরা যাক উপভুক্ত নায়িকার দেহবর্ণনা। আমরা তেমন একটি চিত্র পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানে আর করিব না। তবে নায়িকার বিবর্ণ রঙহীন চেহারা দেখিয়া দূতী যে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—মলিন হইয়া গৌরী শ্যামা হইয়াছে এবং তাহার সিন্দূর দূরে গিয়াছে—আমরা ভাবিতেছি, কবি এই বর্ণনার মধ্যে কি কোনো ব্যঞ্জনা আনিয়াছেন? কেননা অন্য একটি পদেও দেখি, প্রিয়-প্রদত্ত কমলের মালা পরিতে গিয়া রাধার হাতের মঙ্গলবলয় ভাঙিয়া গিয়াছে (৬৮)। কৃষ্ণপ্রেম রাধার বর্ণ হরণ করিয়া গৌরীকে শ্যামা করিল—সতীত্বের সিন্দূর মুছিয়া দিল, ভাঙিয়া দিল গার্হস্থ্য মঙ্গলবলয়।

উপভুক্ত নায়িকার রূপ-সৌন্দর্যের এক বর্ণনাকে আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি—"অরুণ লোচন (রাত্রি-জাগরণের) ঘুরাইতে লাগিল। যেন রক্তকমল হওয়ায় দুলিতে লাগিল। আকুল কেশপাশে বদন ঢাকিল, যেন চাঁদকে অন্ধকারপুঞ্জ ঢাকিয়া ফেলিল।" (৬৬)

এইখানে 'উপভুক্ত' শব্দটিতে বিশেষ আপত্তি করিতেছি। শব্দটি কী কুশ্রী! এই ব্যাপারে কেন জয়দেবের বর্ণনার সাহায্য লইব না, জয়দেব যেখানে একটি শব্দে একটি সম্পূর্ণ চিত্রকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারেন? রাধার মিলনোত্তর দেহ দেখিয়া জয়দেব বলেন—'স্ফুটলাঞ্ছনশ্রী'। মিলনকালে রাধাকে দেখিয়া জয়দেব বলিয়াছিলেন—রসজলধিমগ্নাধ্যানলগ্নামৃগাক্ষী। সেই সুভগশরীরা রাধা কখনো লজ্জিতহসিতা, কখনো বিগলিতলজ্জা। মিলনান্তে বিলুলিতকেশা, দষ্টাধরশ্রী, শ্রমশীকরে স্নাতা শ্রীমতী রাধিকার রসালসসুষমাতে জয়দেব-কবি আত্মহারা। অতএব সুন্দর করিয়াই অলস-নিমীলিতলোচনার আবেশরূপশ্রী বর্ণনা করা উচিত ছিল। কিন্তু বিদ্যাপতি, যে কারণেই হোক, জয়দেবীয় শব্দসৌন্দর্যের পূর্ণাধিকার গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন না। অনেক সময়ই তিনি তীক্ষ্ণবাস্তব বর্ণনায় অভিলাষী। তাঁহার নায়িকা একদিকে দর্পভরে নায়কের নিকট দাবি করে—সাজাইয়া আমার পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া দাও, কিংবা অন্যত্র, সংস্কৃতকাব্যের বনিতাদের মত

নির্জনে নিজের লুণ্ঠিত দেহের অবস্থা দেখিয়া উল্লসিত হয়। মিলনের পর রতিকৌতুক স্মরণে আনন্দ আছে। এবং দেহে রতিচিহ্ন দেখিয়া মধুর উত্তেজনা বোধ করে না, এমন ভারতীয় কাব্য-নায়িকা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বয়ঃসন্ধিতে—দেহে প্রথম মুকুলবিকাশের কালে—কিশোরী নিজের দেহস্ফুটন মুগ্ধ আবেশে লক্ষ্য করিত। সেই তাহার প্রথম আত্মরতি। এখনো আত্মরতিরই অন্য একটি পর্যায়—মিলনোত্তর বলিয়া সচেতন কামনায় অধীর।

লালসা-সুখেই বিদ্যাপতি কিন্তু তাঁহার সকল মিলনান্ত অবস্থার চিত্রণ শেষ করেন নাই। তাঁহার কাব্যে অন্ততঃ দুইটি প্রভাতের বর্ণনা পাইতেছি, যাহা ভাবাক্রান্ত ও বেদনানিঃশ্বসিত। প্রথম বর্ণনাটিতে স্পষ্টভাবেই প্রভাতচিত্র আঁকা হইয়াছে—

"হে হরি, হে হরি, কান দিয়া শোন, এখন বিলাসের সময় নয়। আকাশের তারারা ছিল, তাহারাও অপ্রকাশিত হইল, কোকিল ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে। চক্রবাক ও ময়ূর ডাকিয়া থামিয়া গিয়াছে। চন্দ্রের ওষ্ঠ ম্লান হইল। নগরের ধেনু মাঠের পথে বাহির হইল, মধু কুমুদিনীতেই রহিল।" (৪৮৩)

এই বর্ণনা নিছক চিত্রসৌন্দর্যের জন্য আকৃষ্ট করে না—প্রভাত-উদয়ের বর্ণনাটি ক্ষোভনিঃশ্বাসের সঙ্গে করা হইয়াছে, তাহাতে এমন একটি সমাচ্ছন্ন দুঃখের সুর ফুটিয়াছে, যে আমাদের মনকে স্পর্শ করেই।

দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে কিছু ইঙ্গিতের সাহায্য লওয়া হইয়াছে—

"রাত্রি শেষ হইল, পদ্ম ফুটিল, ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমরীকে খুঁজিতেছে। দীপ ও রাত্রির আকাশ ম্লান। যুক্তির দ্বারা জানিলাম প্রভাত হইল।" (৪৮২)

ইহার পর নায়িকার অনুরোধ, নায়ক যেন তাহাকে ত্যাগ করে।

নায়িকাকৃত প্রভাতের ইঙ্গিতময় বর্ণনাটি উপভোগ্য, কারণ নায়িকা রাত্রির অবসান বুঝিয়াছে 'যুক্তির দ্বারা' অর্থাৎ অনিচ্ছায়। মিলনের রাত্রি ক্ষীণায়ু; প্রভাতে কুঞ্জত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই জগতের নিয়ম। জগতের ইহাই নিয়ম যে, রাত্রে নায়ক সন্ধান করিবে নায়িকার, প্রভাতে ভ্রমর সন্ধান করিবে ভ্রমরীর। রাত্রির আকাশ (অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার প্রেমাকাশ) উজ্জ্বল থাকে দীপে ও নক্ষত্রে, প্রভাত উজ্জ্বল হয় সূর্যে। একের উদয়ে

অন্তের বিলয়। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে এই অনভিপ্রেত বাস্তবকে মানিয়া লইয়া নায়িকা নায়কের নিকট বিদায় চাহিয়াছে।

কিন্তু কত দুঃখের মূল্যে এই বিদায়প্রার্থনা কবি অন্যত্র একটি মাত্র উপমায় তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। নায়ক প্রভাতে নায়িকার অজ্ঞাতে কুঞ্জত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অরুণোদয়ের আরম্ভে শীতল পবন বহিতেছিল, ক্লান্ত-শরীরে নায়িকা নিদ্রাগত, এমন সময়ে তাহাকে না জাগাইয়া নায়কের প্রস্থান। এই অবস্থাতেও, সারারাত্রি মিলনলীলার পরেও, নায়িকার বক্তব্য—নায়ক চলিয়া যাইবে যদি জানিতাম, গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিতাম—যে আলিঙ্গনের রূপ—

"যেমন জোয়ার পাড়ের উপর পড়িয়া খেলা করে।" (৫০০)

সার্থক একটি অলঙ্কার। ঐ কঠিন তট, তার উপর উচ্ছ্বসিত জোয়ারের ভাঙিয়া পড়া, লুটাইয়া খেলা করা, জলের কল্লোলে প্রণয়ের গুঞ্জন, আলিঙ্গনের পেষণে তটের উপর প্রেমের চিহ্ন, এবং যখন জোয়ারের অবসান তখন তরঙ্গের বাহু উৎক্ষেপ করিতে করিতে প্রকৃতির বিধানে নিরুপায়ে দূরে সরিয়া যাওয়া—প্রেমের প্রাপ্তি ও অতৃপ্তির সমগ্র রূপটি একটিমাত্র উপমার আশ্রয়ে সার্থক।

মান

প্রেমের জটিল ও কুটিল রূপ

মিলনের একদিকের বর্ণনা শেষ করিলাম। মুগ্ধা হইতে প্রগল্‌ভা—নায়িকার ক্রমিক অগ্রগতি। এই মিলনলোকে এখন পর্যন্ত বিচ্ছেদের ছায়াপাত ঘটে নাই; আমরা অব্যাহত মিলন-ক্রমকেই দেখিয়াছি। ভোগের কত বিচিত্র রূপ, ভোগমুখী মনের কত বিভিন্ন অবস্থা সম্ভবপর, বিদ্যাপতি প্রভূত সামর্থ্যে অজস্র পদে তাহা দেখাইয়াছেন। সকল বৈষ্ণব কবির মধ্যে, এবং সম্ভবতঃ মধ্যযুগীয় লোকভাষার কবিগণের মধ্যে, প্রেম-কবিরূপে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব হয়ত প্রমাণিত হইয়াছে।

যদি এখনো প্রমাণিত না হয়, বিদ্যাপতিকে আরো দেখা উচিত, মিলনপদের আলোচনা এখনো অসমাপ্ত। এইবার আমরা মিলন-পর্যায়কে পূর্বের মত একরূপ না দেখিয়া বিভক্ত ও বিক্ষুব্ধ দেখিব। দ্বিধা, সন্দেহ, সংশয়, প্রেমের কুটিলতা ও বাম্যতার রূপ দেখিবার সময় আসিয়াছে। প্রেমের ক্ষুব্ধ জর্জর পর্যায়ের প্রচলিত বিভিন্ন নাম—খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা ইত্যাদি।

জয়দেবের কাব্যে মান

মান, খণ্ডিতার আলোচনায় প্রথমে স্মর্তব্য কবি জয়দেব। ঐ দুই পর্যায়ে জয়দেব সমস্ত ভারতের কবিগুরু। বিদ্যাপতি জয়দেবের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী, এইখানে। অনেক সময় জয়দেবের প্রায় অনুবাদ করিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করিবেন, জয়দেবের মানভঞ্জনের পদের পর সে বিষয়ে অভিনব বা উচ্চাঙ্গের কিছু রচনা করা বোধহয় সম্ভব নয়। ও ব্যাপারে ওই চূড়ান্ত সৃষ্টি।

আমার তাই দৃঢ় ধারণা, দশম সর্গই গীতগোবিন্দ কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ।

এখানে রাধার মানভঞ্জনে কৃষ্ণের বচনপটুত্ব উৎকর্ষের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধে রাধা বলিয়াছেন—'চটুল-চাটু-পটু'—কৃষ্ণবিষয়ে সেই বিশেষণকে জয়দেব নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য করিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের ঐ ভঙ্গি ও ভাষা শৃঙ্গার-রস-জীবনের অতি গাঢ়ত্বের দিনে মাত্র রচিত হইতে পারে—বোধহয় ক্ষয়ের দিনেও বটে। পুরুষের সমস্ত শক্তিকে বহির্জীবন হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া এই প্রণয়বচন-রচনে নিবেদন না করিলে এমন রতিরসান্বিত মদনমঙ্গলগীতি পাওয়া সম্ভব নয়। রুদ্ধদ্বার গৃহে নারীর মানভঞ্জন যখন দ্বারপ্রান্তবর্তী শত্রুভঞ্জন অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ—এ কাব্য সেই যুগের।

দশম সর্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি এই কারণে—অন্য সর্গগুলিতে হয় দেহ-পীড়ার কাতরোক্তি, নয়, দেহপীড়নের অর্ধোক্তি। জয়দেবে বিরহ অসত্য এবং মিলন অসহ্য। দশম সর্গ মিলনের প্রস্তাবনাগীতি; তাহাতে ভাবী-মিলনের পূর্বোত্তাপ এবং বর্তমান বেদনার সুখসেবন। কাব্যোৎকর্ষও তাই এখানে।

বৈষ্ণবকাব্যে নায়িকার মানের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মান দুইভাবে হয়—কারণে ও অকারণে। অকারণ মান উঁচুদরের ব্যাপার; প্রেমের নিজস্ব নিগূঢ় অভিমান কিংবা আধ্যাত্মিক বেদনাবোধ, এ সকলই নির্হেতু মানে মেলে। নায়কচরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিচারও এক জাতীয় অকারণ মান। বর্তমানে আমরা অকারণ মানে ব্যস্ত নই যখন রাধিকার পক্ষে মান করিবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। নায়কের অন্যায় অবহেলা, অন্য নারী-গমন যদি নায়িকার রোষের কারণ না হয়, আর কি হইবে? খণ্ডিতা নায়িকা তিক্ত বচনে কথা না কহিলে নায়িকা শেষপর্যন্ত জীবন্ত কিছু কিনা আমরা সন্দেহ করিতাম।

জয়দেব অসূয়াখিন্না খণ্ডিতার বর্ণনা উৎকৃষ্টভাবে করিয়াছেন। রাধিকা বাসকসজ্জিতা হইয়া কুঞ্জে কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষমাণা। তাঁহার বাসন্তী কুসুমতনু, মদনমনোহর বেশ। তিনি কোকিলকুজিতকুঞ্জকুটীরের মুগ্ধ বধূ। যখন কেতকীগন্ধবন্ধু মন্দ পবন বহিতেছিল, যখন পুষ্পে পুষ্পে উন্মীল মধুলুব্ধ ভ্রমর মাতিয়া ঘুরিতেছিল, তখন রাধিকা মূর্তিমান শৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের কামনা করিতেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই সে রাত্রে আসিলেন না। আসিলেন পরদিন প্রভাতে। কয়েকটি বিশেষণেই জয়দেব তাঁহাকে খুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীর অলক্তচ্ছুরিতস্মরণচ্ছায়হৃদয়ম্। তাঁহার প্রভাতকালীন শরীরের অবস্থা—রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্। রাধার ঘৃণাবোধ হইল। রাত্রিকে যে ব্যর্থ করিয়াছে, দিবসকেও সে মলিন করিতে চায়। তাঁহার যুগল ভ্রূ কুটিল কোণে বাঁকিয়া উঠিল ; মূর্চ্ছিতজনকে আঘাত করিতে পটু মহাপৌরুষ দ্বারে আসিয়াছে!—শ্রীমতীর গঞ্জনার ভাষায় ফুটিয়া উঠিল নীলগরলদ্যুতি : আহা কি অপূর্ব তোমার রূপ! "মদনযুদ্ধে অন্য রমণীর তীক্ষ্ণ নখরেখায় চিহ্নিত তোমার শ্যামলাঙ্গ—মরকত ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাহার রতিজয়পত্রের মত প্রতীয়মান।" ব্যঙ্গভরে, বেদনাভরেও বটে, কৃষ্ণের যন্ত্রণা রাধা নিজের দেহে তুলিয়া লইলেন—"সেই রমণীর দশন-দংশন-চিহ্ন তোমার অধরে থাকিয়াই আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। এখনও কি বলিবে তোমার এবং আমার দেহ অভিন্ন নয়?" পরিশেষে ঘৃণাভরে বলিলেন—"আমাদের চিরন্তন প্রণয় ভঙ্গ হইল বলিয়া আমি শোক করিতেছি না, আমার লজ্জা হইতেছে।" (অনুবাদ—হরেকৃষ্ণ)

শ্রীকৃষ্ণ এই পরিস্থিতিও সামলাইবেন, কারণ তিনি 'নাগর নারায়ণ'। অবশ্য সন্ধ্যা নাগাদ রাধা তনুদাহে অস্থির হইয়া নিজেই কিছু গলিয়াছিলেন, কিন্তু যদি নাও গলিতেন, তবু শ্রীকৃষ্ণের বাণীবন্যা হইতে অব্যাহতি ছিল না। এ জগতে ভাষার যদি কোনো শক্তি থাকে, এবং যদি শুধু ভাষায় হৃদয়জয় করা যায়—তবে সে ভাষা শ্রীকৃষ্ণের। বহুশ্রুত অপূর্ব সেই ভাষা কি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে?—কথা কও কথা কও!—

—যদি তুমি একটি কথাও কও, তোমার দন্তরুচিকৌমুদীতে আমার হৃদয়ের অতি ঘোর অন্ধকার দূর হইবে। তোমার বদনচন্দ্রের স্ফুরিত অধরসুধা পানের জন্য আমার লোচনচকোর পিপাসিত।

—"প্রিয়ে চারুশীলে! অকারণ মান ত্যাগ কর। যখন হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতে আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ হইতেছে। তোমার মুখকমলের মধুধারে সেই জ্বালা নির্বাপিত কর।"

কৃষ্ণ এখানেই থামিলেন না ; রাধার মান যদিও 'অকারণ', তবু কৃষ্ণ

স্বেচ্ছায় শাস্তি লইতে প্রস্তুত। এমন ভয়ঙ্কর-সুন্দর শাস্তির কথা ত্রিভুবনে কে ভাবিয়াছিল ?—

—"হে সুদতি! সত্যই যদি কোপ করিয়া থাক, তবে আমাকে তোমার খর নয়নের শর-প্রহার কর। আমাকে তোমার ভুজে বাঁধিয়া, দাঁতে কাটিয়া, যেভাবে, যাহাতে তোমার সুখ হয়, সেইভাবে শাস্তি দাও।"

এবং এখানেও না থামিয়া শ্রীকৃষ্ণ সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ অনুরাগমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

আর শেষ শরণরূপে রাধার পরমসুন্দর দুটি চরণপল্লব মাথায় মাগিয়া যাহা বলিলেন, রাগাত্মিক কাব্যের তাহাই শেষ কথা—

স্মর-গরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

বিদ্যাপতি এই জয়দেবের নিকট ঋণী। তিনি নিজেও স্রষ্টা। বিদ্যাপতি অন্তত: এক দিক দিয়া জয়দেবের অগ্রে থাকিবেন—সৃষ্টির পরিমাণবাহুল্যে। জয়দেব সুচারু সংহত, বিদ্যাপতি বিস্তৃত ও বিচিত্র। জয়দেবের পরিমার্জন সর্বত্র তাঁহার নাই, কিন্তু সর্বজড়িত প্রাণশক্তিতে তাহার পদগুলি পূর্ণ হইয়া আছে। কয়েকটি অংশে ভাগ করিয়া বিদ্যাপতির আলোচ্য বিষয়ক পদগুলি বিশ্লেষণ করিব।

মানে দূতীর ভূমিকা

প্রেমে দূতীর ভূমিকা বিষয়ে ইতিপূর্বে বহুবার বহুভাবে বলিয়াছি। পরকীয়া প্রেম অন্ধকার পথে একটিমাত্র হাত ধরে, যে হাত কোনো প্রাক্তন পরকীয়ার। প্রাক্তন পরকীয়াই ইদানীং দূতী হইয়া পুরাতন অভ্যাস বজায় রাখিতেছে। দূতীচরিত্র বিষয়ে আমাদের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই লৌকিক

দূতীকে মনে রাখিয়া, নচেৎ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব দূতীর স্বভাব স্বতন্ত্র। সে তখন প্রায়শঃ অভিন্নহৃদয়া সখী। রবীন্দ্রনাথ তো আরো অগ্রসর হইয়া বাস্তব দূতীটিকে বিদায় দিয়া হৃদয়ার্তিকে দূতীর স্থান দিলেন—

"বেদনাদূতী গাহিছে ওরে গান
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

বিদ্যাপতির প্রেম লৌকিক, সুতরাং দূতীও লৌকিক। সে দূতীর কথা ও কর্ম লোকভাবাশ্রিত। নিষিদ্ধ প্রেমের গুপ্ত উত্তেজনা তাহার কর্মপ্রেরণার মূলে। অন্ধকারেই তাহার যা-কিছু কর্মোদ্যম। নিশীথের সূচনায় সে সর্বাপেক্ষা সক্রিয়া—অভিসার-পথের দিশারূপিণী। মধ্যনিশীথে সে কুঞ্জদ্বারে প্রহরিণী। প্রভাত তাহার কাছে অবাঞ্ছিত—প্রভাতে তাহার আলোকভীত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সুখসুপ্ত আত্মবিস্মৃত নায়ক-নায়িকাকে প্রখর বাস্তবে জাগরিত করে। দূতী নহিলে পরকীয়া প্রেম চলে না; অপরাধী আনন্দের নারী-পুরোহিত সে। কালিদাস রাজকুমারী ইন্দুমতীর অগ্রবর্তিনী প্রতিহারী সুনন্দাকে যে অসামান্য সৌন্দর্যের গৌরব দিয়াছেন, আমাদের দুঃখ, সে গৌরবে এই দূতীর অধিকার নাই। মানস-বিহারিণী রাজহংসীকে পদ্ম-সন্নিহিত করে সমীরসমুত্থিত তরঙ্গমালা। স্বয়ংবরে সমবেত রাজমানসের উপর ভাসিতেছেন মরালী ইন্দুমতী। তাঁহাকে রাজগণের হৃদয়পদ্মের নিকটবর্তী করিতেছেন তরঙ্গতুল্যা সুনন্দা। কালিদাস সহচরীকে এই মর্যাদা দিয়াছেন। বিদ্যাপতিতে, বা অন্য শৃঙ্গারকবির পরকীয়া কাব্যে, দূতী অন্ধকারপথের আলেয়া; পথ দেখায় ও পথ ভোলায়।

বোধহয় দূতীর বিষয়ে সমালোচনা কঠিন হইল। আলেয়া কথাটি ঠিক নয়—আলেয়া অনিশ্চিত ভীষণ তিমিরের ছলনা, আলোর ছদ্মরূপ। দূতী সুনিশ্চিত সঙ্কেত—প্রেম-সর্বনাশের পথে অপরিহার্য প্রবর্তনা।

বুঝি এখনো ঠিক বলিতেছি না। প্রেম কি শুধুই সর্বনাশ—সর্বসিদ্ধি নয়? দূতী কি কৃষ্ণ-সর্প-রক্ষিত প্রেম-রত্নের জয়কামী নয়? দূতী সুন্দরের স্বপ্নদর্শিনী এবং স্বপ্নের সত্যসাধিকা। দূতীর একটি স্বপ্নচিত্র—

"রজনী শীতল, জ্যোৎস্নায় ঝকমক করিতেছে। এই অবসরে প্রিয়মিলনে যেমন সুখ, যাহার হয়, সেই জানে। অলি 'রভসি রভসি' 'বিলসি বিলসি' মধুর ফুলমধু পান করিতেছে। দীপের শিখা দেখিয়া মন স্থির থাকে না।" (৪৬৭)

দূতীর এই সুন্দর। এই সুন্দরকে নাশ করিতে পারে নায়ক ও নায়িকা উভয়েই। যখন নায়িকা করে, তখন ক্ষোভের সঙ্গে দূতী বলে—"সকলে আপনার প্রভুকে ভোজন করাইল, কেবল তোমার যজমান ক্ষুধিত" (ঐ)। কিন্তু সুকুমারী বনিতা অপেক্ষা দর্পিত পুরুষেরই সুন্দর-নাশের ক্ষমতা বেশী। দূতীর কণ্ঠ দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়ে—নায়িকার দেহ অমলিন, কজ্জল ও সিন্দুর-রেখা কৃপণের ধনের ন্যায় অখণ্ডিত, অধর অরুণের জ্যোতি ত্যাগ করে নাই, হার পাল্টাইয়া গাঁথা হয় নাই—নাথ মূর্খ, না নায়িকা মূঢ়! (৩৮৬)

সুতরাং দূতীর দায়িত্ব অত্যধিক। সমাজের চোখে হাতচাপা দিয়া, নায়ক-নায়িকাকে বুঝাইয়া, প্রয়োজনমত দোষ ঢাকিয়া, গুণ গাহিয়া, মিলাইয়া দিতে হয়। বিধাতার আত্মসৃষ্টি এই অতুলনীয়া নারী, মূর্তিমান শৃঙ্গার ঐ পুরুষোত্তম—ইহাদের মিলিত দেখিতে না পাইলে দূতীর সুখ কোথায়? মিলনের যাহা কিছু বাধা, দূতীর নিকট প্রতিস্পর্ধী তুল্য। সে মানকে সহ্য করিতে পারে না, কারণ মান হইলে সমস্ত আয়োজন সত্ত্বেও, উভয়ে উপস্থিত থাকিয়াও, নায়ক-নায়িকা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে। দূতী বলে, মান বিষতরুর ন্যায়। ঐ তরু পল্লব মেলিলেই ভাঙিয়া দিতে হইবে, (১৩২)। দূতী নিজে একদিন নায়িকাকে মান করিতে বলিয়াছিল, নিজেকে সুলভ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সে কিন্তু আঘাতে উত্তাল করিতে—সত্যই নিবারণ করিতে নয়। মান যেখানে পর-বোধ এবং আত্মনিগ্রহ, দূতী সেখানে মানের প্রধান প্রতিপক্ষ।

অতএব দূতী বুঝাইয়া বলে, প্রেমের, বিশেষতঃ পরকীয়া প্রেমের প্রকৃতি কি? বলিয়াছে,—(১) জীবনের চেয়ে যৌবনের রঙ্গ বেশী এবং তখনই যৌবন সার্থক যখন সুপুরুষের সঙ্গ; (২) সুপুরুষের প্রেম চন্দ্রকলার ন্যায় বর্ধনশীল; (৩) চোরী প্রেমের লক্ষ গুণ রঙ্গ, ও তাহাতে দোষ নাই; (৪) কৃষ্ণের মত রসিক ও রাধার মত রসবতী পৃথিবীতে নাই (৬৬৫)। যেখানে প্রেমের এমন প্রকৃতি, যেখানে "যৌবন তিলার্ধ বেশী রাখা যায় না"—সেখানে মানভঙ্গই নায়িকার একমাত্র কর্তব্য। মানভঙ্গের পক্ষে দূতী অজস্র কারণ দেখাইয়াছে। কারণগুলি খুবই সঙ্গত, অধিকাংশক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট। যেমন ধরা যাক, দূতীর একটি পরোপকার-তত্ত্ব আছে। পরোপকার নিখিল মানবীয় সদ্‌গুণ—দূতী মানিনীকে পরহিত-মাহাত্ম্য বুঝাইল—"সেই সম্পত্তিই আসল,

যাহা পরহিতে লাগে। নায়িকার মধু অনেক, প্রত্যাশীকে দিবে না কেন?" (৩৭৮)। কিংবা,—"যৌবন স্থির নয়, দেহ স্থির নয়, বল্লভের সহিত স্নেহও স্থির থাকে না। এই সংসারকে যেন স্থির ভাবিও না, একমাত্র পরোপকার স্থির থাকে।" দেহযৌবন বা সংসারের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে দূতীর থীসিসের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ—যখন কিছুই থাকিবে না তখন যথাসাধ্য পরোপকার কর। যথা—বিরহসিন্ধুতে ডুবন্ত কৃষ্ণকে কুচভেলা দান করিয়া রক্ষা কর (৬৬৪)। দানে পুণ্য হয়, তাই দূতীর উপদেশ—কাঞ্চনকলস-সমান কুচ-যুগল দান কর, যাহা দেখিলে মুনিরও জ্ঞান হয় (৪৩৯)। রবীন্দ্রনাথও কি বলেন নাই—'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল?'

অচিরে মানভঙ্গের জন্য নায়িকাকে অনুরোধের অন্য বিশেষ কারণ আছে। পুরুষজাতির—পুরুষজাতির অন্তর্ভুক্ত আমাদের নায়কের—চরিত্রগত অগভীরতা ও অধৈর্যের কথা জানে বলিয়াই দূতীর যাহা কিছু উৎকণ্ঠা। পুরুষচরিত্রে না আছে সৌরভ, না আছে গৌরব। সে বিষয়ে দূতীর বক্তব্য—

"পুরুষ ভ্রমরের মত ফুলে ফুলে মধু খায়, প্রেয়সী কি করিতে পারে? সামনাসামনি পড়িয়াও প্রভু ভয়-ডর কিছু রাখিল না। উহার বিচার সীমার বাহিরে গিয়াছে।" (১২৫)

"ভ্রমর একা, কুসুম অনেক। জাতকী, কেতকী, নবীনা পদ্মিনী সকলেরই ভ্রমরের প্রতি সমান অনুরাগ।" (৪৩৬)

"পূর্বের প্রেমের উপর বিশ্বাস রাখিয়া ভ্রমর ঘুরিয়া তোমার কাছে আসিল। সে বহু কুসুমের মধুপান করিয়াও পিপাসিত রহিয়াছে। তোমার কাছ হইতে উপবাসী ফিরিবে কি? মালতী! হৃদয় প্রকাশ কর। ভ্রমর কতদিন পরাভব স্বীকার করিবে? অধিক উপেক্ষা ভাল নয়। জীবন ও জগৎ (অনিত্য) দেখিয়া কে নিজের অভিমতে কাজ না করে? তোমার ধন ও জীবনে কি ফল হইবে যদি না সময় মত বিলাস কর?" (৪২১)

পুরুষজাতির অব্যবস্থিতচিত্ততার কথা দূতী যথেষ্ট খুলিয়া বলিয়াছে। সংসার-বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা প্রচুর। সে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়াছে যথাসাধ্য। নায়কের প্রেমের পক্ষে আদর্শগত কোনো উচ্চ ভাবকথা সে বলে নাই। নায়ক যে বহুগামী, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবে না—ইহাই তাহার বক্তব্যের মেরুদণ্ড। এক্ষেত্রে নারীর পক্ষে ব্যবহারে চতুর এবং আচরণে সহিষ্ণু হওয়াই একমাত্র পথ। নায়কের সত্য অপরাধেও শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

বিশেষতঃ দূতী আবার মানিনীর স্বভাব জানে। নায়িকার দেহকাঙ্ক্ষার

প্রাচুর্য বিষয়ে তাহার ধারণা স্পষ্ট। দূতী জানে, ক্ষুধার সামনে খাদ্য নাচানই মান খসাইবার উত্তম উপায়, যদি কাল অনুকূল হয়। বসন্ত তেমন কাল। দূতী বর্ণনা করিতেছে—নায়িকার মান আগুনের আকার ধারণ করিয়া মন-রূপ ভাণ্ডারে জ্বালা ধরাইতেছে (১২৩); এবং, এই অসহ্য বসন্তে "অনঙ্গেরও যেন অঙ্গ হইয়াছে" (ঐ)। দূতী এহেন পরিস্থিতিতে মানিনীকে একবার যেরূপ মোক্ষম ভাষায় সাবধান করিয়াছিল, তাহা শুনিবার পর মান আর ধরিয়া রাখা স্বার্থসঙ্গত হইবে কিনা, নায়িকাকে তাহা গভীরভাবে ভাবিতে হইয়াছিল। দূতী প্রথমে প্রাজ্ঞোক্তি করিল—"যত যত অগ্নি জ্বলিবে, সুবর্ণ তত অধিক নির্মল হইবে।" তার পরে করিল নায়কের পক্ষে ওকালতি—"বল্লভ আর্ত হইয়া যাহা বলিল, তাহাতে দোষ নাই, তোমাকে কত না অনায়ত্ত (অপরের বশীভূত নহে) দেখাইল, কত দিব্য করিল", ইত্যাদি। মোক্ষম কথা বলিল শেষকালে—"(নায়ক) অনঙ্গ নয় (তাহার দেহ ও দেহপিপাসা আছে), ভুজঙ্গম নয় যে বায়ুপান করিয়া জীবনধারণ করিবে।" (১৩৫)

প্রেমের দেহের দিকটি অকুণ্ঠিত প্রখর বাস্তবতায়, সংক্ষিপ্তবচনে, এখানে উদ্‌ঘাটিত। এরূপ অল্পই দেখা যায়।

মানিনী নায়িকার বক্তব্য

সমাজে পুরুষ-প্রাধান্যের রূপ

মানকালে নায়িকার কথায় স্বাভাবিকভাবে অস্বাভাবিক তিক্ততা। বিশেষতঃ যদি খণ্ডিতা নায়িকা হয়। নায়িকা ক্রোধাবেগে আত্মবিস্মৃত—এতবড় অপমানের পর আত্মবিস্মৃতি না ঘটিলে অস্বাভাবিক ঘটিত। বিদ্যাপতির পদে নায়ক-বিষয়ে তীব্রতম গালি বর্ষণ করিয়াছে নায়িকা।

চৈতন্যোত্তর কালের নায়ক কৃষ্ণও বহুবল্লভ। সেখানেও নায়িকামুখে যথেষ্ট নিন্দার আয়োজন। তবে সে নিন্দাগুলি অনেক সুমার্জিত সংযত—সুন্দর নিন্দারূপে আস্বাদনযোগ্য। অমন গঞ্জনার জন্য অপরাধ করিতে ইচ্ছা

হয়। তদুপরি তারিতনু রাধিকার ভিতরে বৈষ্ণব কবিরা, অন্ততঃ জ্ঞানদাস, আরো এক অপূর্ব, বোধহয় একমাত্র বাঙালীর বস্তু যোগ করিয়া দিয়াছিলেন —তাহা এ জাতির সেই চিরপ্রিয় অভিমান। স্ফুরিত অধরে, টলটলে চোখের জলে ও জলের তলায় অশুনের আভাসে যে জিনিসের সৃষ্টি হয়, তাহাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই অনির্বচনীয় অভিমানকে রাধায় অর্পণ করিয়া পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা মানের পদে অপরিসীম স্বাদুতা আনিয়াছেন।

বিদ্যাপতির মানিনী রাধা সে মাধুর্যে বঞ্চিত। নিতান্ত লৌকিকা তিনি —প্রবঞ্চিত, বিড়ম্বিত, বিক্ষুব্ধ। হৃদয়ের গরল, গঞ্জনার সূচীভাষামুখে প্রবেশ করিয়া দংশনে বিষাক্ত করিয়া গিয়াছে। রাধার মুখ্য আক্ষেপ, না জানিয়া কেন অগ্রসর হইলাম—'ঢাকা কূপে পতিত হইলাম।'

এরূপ নায়িকার মুখে নায়ক-চরিত্রের রূপ সহজেই অনুমেয়। অনেকগুলি পদে নায়িকা নিছক গালিগালাজের অনুশীলন করিয়াছে—কতখানি চড়া ভাষায় কথা বলা যায় তাহার সেই চেষ্টা। রাধার এই জাতীয় কৃষ্ণ-নিন্দার বিবরণ পূর্বে 'ইতর প্রেমের' আলোচনায় বিস্তৃতভাবে দিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই, তবে রাধা যে কৃষ্ণের নিন্দায় একস্থানে বলিয়াছেন,—"কাকের মুখে কি বেদ উচ্চারিত হয়?" (৩৫৪)—আমরা বিদ্যাপতির রাধার সমালোচনা করিয়া বলিতে পারি, সময়বিশেষে রাধা-কোকিলার মুখেও বেদ উচ্চারিত হয় না—বিশেষ যখন তিনি গালাগালির মুডে থাকেন।

সর্বত্রই রাধা কষায়িতকণ্ঠ নন, কিছু মার্জিত ব্যঙ্গ, সুস্নিগ্ধ পরিহাসও পাইতেছি, তবে পরিমাণে বড় অল্প; যেমন রাধা ৩৯৩ পদে নায়কের বাহিরে মধুর ভিতরে কঠিন বচনরীতি বিষয়ে দুঃখার্তভাবে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন, গতানুগতিক ভঙ্গিতেই অবশ্য—"তোমার হৃদয় বজ্রের মত কঠিন, কিন্তু বচনে অমিয়ের ধারা।...আমার মনে যাহা যাহা বাসনা ছিল সব ব্যর্থ হইল। চক্ষের নিমেষে কূপথে ঝাঁপ দিলাম। সমস্ত সম্ভ্রম মর্যাদা নষ্ট হইল।" একই কথা রাধিকা ৪০০ পদেও বলিতেছেন। কুসুমকোমলপ্রাণ, মধুর বাণীর অধিকারী সুপুরুষ জানিয়া যাঁহার নিকট রাধা আসিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবহার সব মোহ ঘুচাইয়াছে। সে নায়ক কেবল "নয়নতরঙ্গে অনঙ্গ জাগাইয়া অবলা মারিবার উপায় জানে"। রাধিকা সতর্ক

হইয়া বলিতেছেন—"কোন্ মুগ্ধা অগ্নিকে আলিঙ্গন করিবে ?" কিন্তু হায় ! আলিঙ্গনের জন্য অগ্নির মত এমন সুন্দর সর্বনাশ আর কি আছে !

নায়িকা মধুর ব্যঙ্গও করিতে পারে। মাধব হয়ত বৈরাগ্যের ভাণ করিয়াছেন, রাধা বলিতেছেন—"মাধব, যদি তুমি স্বভাবতঃ বৈরাগী, তবে আমার গ্রীবার প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে কেন ?" রাধা এখানে অজ্ঞাতে মাধবকে সম্মান দিয়াছেন—উগ্র কামকেন্দ্রগুলিকে বাদ দিয়া গ্রীবাভঙ্গি নিরীক্ষণ করার মত সৌন্দর্যবোধ তাহা হইলে মাধবের ছিল !

এই সকল গঞ্জনা-গালির পরিণতি সেই বেদনায়—যখন আর অপরাধী নায়ককে দোষী করার মত মনঃশক্তি বজায় থাকে না, যখন নিজ ভাগ্যের উপর দোষারোপকেই নায়িকা শেষাশ্রয় বলিয়া মানিয়া লয়—বিদ্যাপতির নায়িকাও সেখানে পৌঁছিয়াছেন। সেরূপ ক্ষেত্র অবশ্য বিদ্যাপতিতে অল্পই। ৩৮১ পদে নিজ ভাগ্যকে নায়িকা দুষিতেছে। তাহার বরাতে 'সুপুরুষের ব্রহ্মমুখে উচ্চারিত বেদতুল্য বাণী'ও ব্যর্থ। সময়ের দোষে জলও অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতেছে। কলিযুগ এমন যে, সাধুর মনও ভাঙিয়া যায়। এই সময়ে, কিংবা ইহা অপেক্ষাও বড় দুঃখের কালে, রাধার বুক ফাটিয়া যে কাতরোক্তি বাহির হইয়াছে, তাহার সহিত জ্ঞানদাসের (বা চণ্ডীদাসের) সুবিখ্যাত যন্ত্রণাধ্বনির ('সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু') ঐক্য আছে—

"আতপে তাপিত হইয়া শীতল জানিয়া মলয়গিরির ছায়া সেবন করিলাম। আমার এমন কর্ম, সেও দূরে গেল, দাবানল দগ্ধ করিল। কত দুঃখে আজ সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু সমুদয় জল লবণাক্ত হইল।" (৩১৭)*

উন্মুক্ত অসংযত আক্রমণ ছাড়াও—যে আক্রমণের ক্ষেত্রে নায়িকার বুকের জ্বালা ভাষায় পুড়িয়াছে—এমন পদ আছে যেখানে নায়িকার বক্তব্যে নায়কের স্বভাবের বিরুদ্ধে মারাত্মক আপত্তি আছে।

*আতপে তাপিত শীতল জানিকহু
সেওল মলয়গিরি ছাহে।
ঐসন করম মোর সেহও দূরে গেল
কএল দাবানল দাহে॥
কত দুখে আজ সমুদ্রতীর পাওল
সগরেও জলে ভেল ছার।—(৩১৭)

অনুরূপ কথা—৩৪৫ পদে।

কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সম্ভবপর চরম নিন্দা—তাঁহার কলারসজ্ঞানহীনতা লইয়া অভিযোগ—একবার রাধা উপস্থিত করিয়াছিলেন (৪২০ পদ), 'ইতর প্রেমের' আলোচনায় তাহা পূর্বে দেখিয়াছি। অন্যত্র নায়ক-স্বভাবের বর্ণনায় বিশ্বাসঘাতক পুরুষের স্বরূপ ফুটিয়াছে প্রখরভাবে। নায়িকার বচনে কটু, কঠোর সত্যভাষিতা—

"প্রিয়তমের রসরঙ্গ উচ্চস্তরের লোকের সঙ্গে, সে সুখের পায়রা, কেবল বহুর সঙ্গ খোঁজে। সখি, কি বলিব, বলা যায় না…প্রথম মোহে কত নূতন নূতন উচ্ছলতা; কিন্তু কিছুদিন পরে তা পান্‌সে, আস্বাদহীন মনে হয়। এখন আর তলাতেও একটু জল নাই। তাহা জানিয়া কার্যনাশ আর কে করিবে? তাহার কপটতা বুঝাইয়া দিতে গেলে ঝগড়া বাধিল। বড়লোকের হৃদয় বড়ই মন্দ হয়।" (৪০১)

পরিণামচিন্তাহীন প্রেমের পরিণতি এই দগ্ধ বাস্তবে। লুব্ধ ভ্রমরের গুঞ্জনে যে ভুলিয়াছে, সেই সরলা ও অনভিজ্ঞার জীবনের এই দারুণতম অভিজ্ঞতা, 'বড়র পিরীতি'র রূপের প্রকাশক পদটি—জীবনগৃহীত ও তথ্য-ভিত্তিক।

নায়ক-চরিত্রের আরো গভীরে নায়িকা দৃষ্টিপাত করিয়াছে। ১১৫ পদে কপট নায়কের বিরুদ্ধে নায়িকার গুরুতর অভিযোগ—"কামকেলিতে যশোলাভ করাই তোমার উদ্দেশ্য।" নায়িকা বলিতে চায়—নায়ক কেবল কামার্ত হইয়া অন্য নারী-গমন করে নাই,—আমি বহুবল্লভ, এই আত্মাভিমান চরিতার্থ করার জন্যই সে অন্য-নারীর সঙ্গ করে। প্রবৃত্তির কাছে পরাজয় দোষের হইলেও সহানুভূতি মিলিতে পারে, কিন্তু বহুরমণ করিয়াছি, এই আস্ফালন করিবার জন্য বহুগমন করার মত নিন্দনীয় বস্তু অল্পই আছে।

নায়ক কামুক তো নিশ্চয়। নায়িকা নায়কের কৈফিয়ত স্বীকার না করিয়া অবিশ্বাসে ও অশ্রদ্ধায় প্রশ্ন করিতেছে—"বসন্তকালের রাত্রি কামিনী ছাড়া তোমার কাটিল কি করিয়া?" (ঐ)।—এই পরিস্থিতিতে প্রত্যাগত নায়ককে নায়িকা একবার অতি তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছে, যেরূপ মর্মঘাতী বিদ্রূপের দৃষ্টান্ত অল্পই মেলে। নায়ক নিজের পৌরুষ প্রমাণ করিতে অন্য নারীর নিকট গমন করিতে পারে, কিন্তু সর্বত্র সে সমাদৃত হইবে, এমন কোন্ কথা?—

"কমলিনীকে ছাড়িয়া ভ্রমর সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কেতকীর নিকটে গেল। তাহার দেহ

কণ্টকে কবলিত হইল, মুখে ধূলি লাগিল। সখি, সে এখন রতিরঙ্গের আশায় বঞ্চিত হইয়াছে। পরিমলের লোভে যেখানে যাইয়া গিয়াছিল, সেখানে ঠাঁই পায় নাই, একটুও মধু চোখে দেখে নাই, কেবল লোকের উপহাস পাইয়াছে।" (৩৭৩)

আলোচ্য পদের নায়িকা খণ্ডিতা, কিন্তু পদটি পরিচিত খণ্ডিতার পদের মত নয়। নায়ককে চরম অপমান করা হইয়াছে— সে যে যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয়, তাহাকে যে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—এই কথাটি মুখের উপর জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় বহুবল্লভ হইবার সাধ সত্ত্বেও সে ক্ষমতায় বঞ্চিত নায়ক।

এ পর্যন্ত আলোচিত মানের পদ হইতে একটি জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সমাজে পুরুষের প্রাধান্য এবং কাব্যে পুরুষ-প্রাধান্যের অযৌক্তিক বিস্তার। পরকীয়া প্রেম লইয়া এই পর্যায়ে যাঁহারাই কিছু বলিয়াছেন—নায়ক, নায়িকা, দূতী, এমনকি কবি পর্যন্ত,—সকলের বক্তব্যের ভিতরই পুরুষের অত্যাচারের কথাটা নিরতিশয় উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। মানের পদে বড় বেশী সাবধানতা, সতর্কীকরণ—প্রেমের সুকুমার ভাবলোক-সৃষ্টির পরিবর্তে ছল-বলে-কৌশলে নারীকে আয়ত্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা। দূতী মান-পর্যায়ে প্রচুর লৌকিক উপদেশ দিয়াছে—তাহাতেও পদের ভাবহানি ঘটিয়াছে। নায়কের চঞ্চল স্বভাব স্মরণ করাইয়া, অধিক প্রত্যাখ্যানের বিপদ বিষয়ে সে সতর্ক করিয়াছে ক্ষণে ক্ষণে। এই হিসাবী যুক্তি গ্রহণ করিয়া মানভঙ্গ না করিলে নায়িকার বাস্তব বিপদ। মানভঙ্গ হইলেও বিপদ কম নয়—নায়িকার প্রেম সত্তারহিত এবং নিতান্ত শারীরিক—এই নিন্দার সম্মুখীন হইতে হয়। তাই পুরুষস্বভাব সম্বন্ধে দূতীকথন বহুলাংশে সত্য হইলেও কাব্যের ক্ষেত্রে পুরুষের এই রিরংসা ও লাম্পট্যের রূপ প্রেমের ভাবানুভূতির বিষম শত্রু—ঘৃণা ও বিরাগে তাহা আমাদের মনকে পূর্ণ করিয়া দেয়।

বিদ্যাপতির পদে সে-যুগের সমাজে নারীর তুলনায় পুরুষের অতি প্রাধান্যের রূপ দেখিলাম। ব্যাপারটা সামাজিক সত্য। এই সামাজিক সত্যকে কাব্যিক সত্য করিলে কিন্তু প্রেমকাব্যের গৌরবহানির সম্ভাবনা। বিদ্যাপতির পরবর্তী কালে সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও প্রেমের বিশুদ্ধ রূপের চিত্রণাভিলাষী বৈষ্ণবকবিগণ নারীর শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়াছেন প্রেমের ক্ষেত্রে।

পুরুষ যথেচ্ছ করিবার অধিকারী, এই কথাটি উগ্র হইয়া উঠিলে প্রেম দেহ-কামনার অতি নিম্ন স্তরে নামিয়া যায়। এরূপ স্থলে মানের উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হওয়া শক্ত। কারণ, পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতায় নারীর মানাধিকার অস্বীকৃত। রমণীর স্পর্শকাতর, রোষকুটিল, অশ্রুছলোছলো মানের উপর পুরুষজাতির অতি-অধিকারের মুদ্গর ছাড়িলে মান তো চূর্ণ হয়ই, মানিনীও হয়। হিসাব করিয়া মান আসে না এবং বিবেচনার পরও মান যায় না। অন্যের অর্থাৎ নায়কের প্রেমে আস্থা হইতে মানের উৎপত্তি। প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে নায়ক অবিশ্বাসী, সেখানে ঐ বিশ্বাসের কথা আসে কেমন করিয়া? তাহার উত্তর, নায়িকার অবিশ্বাস বৃহত্তর বিশ্বাসের অধীন। বিশ্বাস একেবারে ঘুচিলে কেহ মান করিতে পারিত না। খাঁটি পাষাণের বিরুদ্ধে মান সম্ভব নয়।

কাব্যের উপর সমাজের প্রভাব মান-পর্যায় হইতে বোঝা যায়। বিদ্যাপতির পদে এমনকি প্রেমের নায়ক পর্যন্ত পুরুষ-হিসাবে বিশেষাধিকার দাবি করিয়াছে। একটি অন্যথা সুন্দর পদ (১২১), যেখানে চমৎকার ভাষায় নায়ক মানিনী নায়িকার মানভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেও নায়কের আত্মগ্লানির কথা আছে—স্বকৃত কোনো দুষ্কৃতির জন্য নয়—নায়িকাকে বাড়াবাড়ি-রকম তোষণের জন্য। নায়ক পদশেষে বলিয়াছে—"আপনার কাজের জন্য আপনি উপযাচক হইয়া বলিতে অত্যন্ত লজ্জা ও আদরহানি হয়।" এই লজ্জার উৎস ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ হইলে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বহু সময় ইহা পুরুষের ক্ষমতার দম্ভ। অন্য নারীতে আসক্ত নায়কের আত্ম-সমর্থনের ভঙ্গি (যাহা ১৩১ পদে প্রকাশিত) নিতান্ত কদর্য। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ বা কুণ্ঠার পরিবর্তে সেখানে নিজের পদস্খলনকে পুরুষের ন্যায্যাধিকার রূপে জাহির করার অহঙ্কৃত আতিশয্য। এখানে প্রেম নাই, যাহা আছে, যে উত্তেজনা, তাহার দেহেই জন্ম, দেহেই বিলয়।

পুরুষবীরটি বুঝাইতেছে—

"বন্যার জল বাহির হইয়া গেলে জলাশয়ের জল নিজের স্থানেই থাকে, তেমনি হে সুমুখি। তুমি বৃথা পুরুষকে দোষ দিতেছ (অর্থাৎ অন্য নারী সম্বন্ধে আমার মোহ কাটিয়াছে, তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছি)। ভ্রমর দশদিকে মধুপান করিয়া বেড়ায়।...জাতকী কেতকী মালতী প্রভৃতি (ফুল) রমণীর মত, তাহারা কি বিহার করিয়া বেড়ায়? মধু লইয়া কে

মধুপের সঙ্গে ঘোরে? তাহারা স্থাবর, এই তাহাদের গৌরব।...অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া আমাকে ভুলাইয়াছিল, কিন্তু তুমি তো বুঝিতে পারিতেছ যে, তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি।" (১৩১)

পুরুষাধিকারের সনদবিশেষ! নারীকে অভূতপূর্ব গৌরব দেওয়া হইয়াছে—তাহারা মধুময় অচঞ্চল পুষ্প—পুরুষ-ভ্রমর প্রয়োজনমত তাহাদের রসভাণ্ড হইতে মধুপান করিয়া যাইবে।

কবির একটি উক্তি এইখানে বিশেষ দুঃখজনক মনে হইয়াছে। ৩৭১ পদে খণ্ডিতা রাধার দুঃখ বর্ণনার পরে ভণিতায় কবি একটি অত্যন্ত অনুচিত, প্রেমের সম্মানহানিকর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার গঞ্জনার প্রতিবাদে বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—"এরূপ বলাও নিষিদ্ধ; যখন বড়লোক অন্যায় করে তখন চুপচাপ সহ্য করাই উচিত।"

বিদ্যাপতি কি এখানে রাধা-কৃষ্ণের অপূর্ব সমরাগ প্রেমের অসম্মান করিতেছেন না—ঐ 'বড়' 'ছোট'র একটা ছোট কথা তুলিয়া? আমাদের মনে হয় কবি আসলে এখানে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, ক্ষমতার দর্পে যাহারা অন্যের মর্যাদানাশ করে—সেই পুরুষদের বিরুদ্ধে। লম্পট অভিজাত পুরুষ-চরিত্র সম্বন্ধে কবির কটাক্ষই এখানে আছে। তাহাই স্বাভাবিক।

মানে নায়কের তৎপরতা

মান-পর্যায়ে নায়ক বাস্তবিক দুর্ভাগা। তাহার আবশ্যিক লাম্পট্য। চরিত্রহীন সে সত্যই না হইতে পারে, কিন্তু কবিদের প্রয়োজনে তাহাকে পরনারী-গমন করিতে হয়। নচেৎ মান হয় কিভাবে? এই পর্যায়ে নায়ক কিভাবে কবি-প্রয়োজনের পুত্তল, তাহা পূর্বে একবার জয়দেব প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি।

জয়দেব যেমন কৃষ্ণকে অস্থানে অকারণে ভিন্নকুঞ্জে পাঠাইয়া অন্যায়ে বাধ্য করিয়াছেন, তেমনি আবার অন্যায়-রঞ্জনের অপরূপ ভাষা তিনিই কৃষ্ণকে শিখাইয়াছেন। অতঃপর সেই ভাষা ভারতবর্ষীয় বিদগ্ধ নাগরিক ব্যক্তিরা কৃষ্ণের নিকট শিখিয়া লইবেন। কী না মনোহারী সে ভাষা,

যাহাতে অন্যায়ও সুন্দর হয়! পৃথিবীতে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র; জয়দেব দেখাইলেন, সুন্দর ভাষারও অবশ্যম্ভাবী জয়। বিদ্যাপতি, জয়দেবকে নিতান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। বিদ্যাপতির এই পর্যায়ের নায়ক-বচনে শ্রীজয়দেব অনুবাদে, ভাবানুবাদে, ভাবাবহে—সর্বতোভাবে উপস্থিত।

সুন্দর কথার মোহে নায়ক আত্মবিস্মৃত হইয়াছে অনেক সময়। নিজ রূপের প্রশংসা করিয়াছে নিজমুখে, যদিও অসজ্ঞানে। যেমন, নায়কের বড় ইচ্ছা—"আমার লোচন-ভ্রমর তোমার (নায়িকার) মুখপঙ্কজে বিলাস করিবার আশা করিতেছে" (১২২)। অবশ্য নিছক আত্মপ্রশংসায় নায়ক নিজ লোচনকে ভ্রমর নাও বলিতে পারে, নায়িকার মুখরূপ পঙ্কজে বিলাস করিতে হইবে, সেহেতু অগত্যা নায়ককে নিজের মুখকে ভ্রমর বলিতে হইল! এখানে বেচারা নায়কের উপর কাব্যালঙ্কারের অত্যাচার।

নায়কের সুচারু তোষণের আরো দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়—"বদনকমল হাসিয়া লুকাইলে, দেখিয়া আমার মন অস্থির হইল। চন্দ্র উদিত হইয়াও অমৃতমোচন করে না, আমার নয়নচকোর কি পান করিয়া বাঁচিবে?" (৩৮২)

বচনচতুরতা তারপর আরো অগ্রসর হয়—নায়িকার নয়ন নায়কের দিকে সঞ্চরণ করে না কেন, সে বিষয়ে নায়কের মধুমাখা অভিযোগ—"তোমার নয়ন অরুণ ও কমলের কান্তি চুরি করিয়াছে, তাই কি মনে লজ্জিত হইয়া রহিয়াছ?" (ঐ)

মন ভুলাইবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন বচন। ইহারই আমোদ-চমৎকার রূপ দেখি, যখন নায়ক যোগী সাজিয়া ভিক্ষা মাগিয়া নায়িকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। যোগী অপূর্ব কণ্ঠে বলে—"তোমার মানরত্ন আমাকে দাও।" (৬৫৯)

যোগীকে গৃহস্থের প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। রাধিকা এই একটি ক্ষেত্রে, যোগীকে ভিক্ষাদানের বাধ্যবাধকতাযুক্ত গার্হস্থ্যনীতিতে, খাঁটি কুলবধূ।

যে-সব তোষণ-বচন উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে জয়দেব নিশ্চয় আছেন, তবে ভাবমণ্ডলে। প্রত্যক্ষে জয়দেবকে পাই, এমন পদও বেশ মেলে। জয়দেবকে অনুসরণের ব্যাপারে নিজের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ করিতে বিদ্যাপতি লজ্জিত নন। ১২১ পদে জয়দেবীয় ভঙ্গিতে নায়ক মানভঙ্গের চেষ্টা করিতেছে। তাহার বক্তব্যে একদিকে আছে মানিনীর গূঢ় প্রশংসা, অন্যদিকে নিজের ব্যাকুলতার প্রকাশ—

বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিয় রস পীবে।
অধর মধুরী ফুল পিয়া মধুকর তুল
বিনু মধু কতখন জীবে॥

নায়িকার অসামান্য রূপ—নায়ক স্তুতি করিয়া জানাইল। সে রূপস্বাদ হইতে বঞ্চনার আহা-উহু যাতনা ফুটিয়া উঠিল হতভাগ্য নায়কের কণ্ঠে—নায়কের সেই চতুর মুগ্ধতা—

"শরতের চন্দ্রতুল্য বদন বস্ত্র দ্বারা কেন ঢাকিতেছ? অল্প হাস্য-সুধারস বর্ষণ করিলে নয়নের পিপাসা মিটিবে।...স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছ। সুন্দরি! আমার পাণিস্পর্শে রস-অনুভব বাসনায় বাধা দিও না।" (১৬৩)

কবি বিদ্যাপতি নায়কের বর্ণনাছাঁদ অনুকরণ করিয়া বলেন—

"বরযুবতী শোন, সমস্ত বিভবের সার দয়া, গ্রীষ্মকালে প্রাণাবাম ছায়াযুক্ত স্থান কাহার না ভাল লাগে?" (ঐ)

নায়িকা বশীভূত হইবেই। রূপের প্রশংসায় সকলেই মজে, বিশেষতঃ যদি কেহ কৃষ্ণের মত সাহসের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে নিজের কাম-রূপ-দৃষ্টি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে পারে। আমরা বুঝিতে পারি, কৃষ্ণ-ইঙ্গিত পাণিস্পর্শের পূর্বেই ইতিমধ্যে কৃষ্ণের দৃষ্টিস্পর্শে রাধাদেহ রোমাঞ্চিত হইতে শুরু করিয়াছে।

জয়দেব আরো আছেন। প্রায় হুবহু অনুবাদের পদটিই ধরা যাক। বিনীত বশম্বদ নায়ক মাথা পাতিয়া শাস্তি লইতে প্রস্তুত—"আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা হয় দাও। ভুজপাশে বাঁধিয়া জঘন দ্বারা তাড়ন কর, বুকের উপর পয়োধর-রূপ পাথর চাপাইয়া দাও, হৃদয়ের কারাগারে দিবারাত্র বাঁধিয়া রাখ" (৬৪৭)। বিদ্যাপতির কিছু সংযোজন আছে। পূর্বে সর্পযুক্ত ঘটে হাত পুরিয়া দোষ পরীক্ষা করা হইত। রীতিমত কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—"তোমার স্তন স্বর্ণঘট, হার ভুজঙ্গিনীস্বরূপ। আমি উহার উপর হাত রাখিতেছি। যদি তোমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিয়া থাকি, তবে যেন ঐ হার-নাগিনী আমাকে কাটে।" (ঐ)

যদি কাটেও (কিবা মধুর দংশন!), দুঃখ নাই, কারণ তাহার পূর্বেই ঘটাকাশে হস্তপ্রসারণের দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাপতির মান-অংশে পুরুষের বক্তব্যের রূপ এই প্রকার। এখানে নায়ক যথেষ্ট বিনীত, কুণ্ঠিত, ও তোষণপটু। নায়কের বর্বর বলের আস্ফালনও আছে, তেমন পুরুষ-গর্জনের পরিচয় আমরা লইয়াছি, যেখানে নায়ক পুরুষ-রূপে বিশেষাধিকারের পাণ্ডা। সেখানে তাহার পুরুষের লাম্পট্যের অধিকার দাবি; নারীর আবার মান কি?—ফুলে ফুলে মধুপান করাই তো ভ্রমরের ধর্ম। অর্থাৎ এখানেও—প্রেমের জগতেও—ধনতন্ত্রের শোষণ, একদল মধু উৎপাদন করিবে, অন্যদল করিবে বিনাশ্রমে উপভোগ।

পুরুষের স্বার্থপরতার পূর্ণতর চিত্র কালিদাসে পাইতেছি। বিদ্যাপতিতে দেখি নায়ক নায়িকাকে বঞ্চনা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঞ্চনা করিয়া গিয়াছে—এই সংবাদমাত্র পাই। বঞ্চনাকালের চিত্র—পুরুষের তখনকার মনের চিত্র—পাই না। পাওয়া সম্ভবও নয়, কারণ পদের উপজীব্য বঞ্চনা-উত্তর নায়িকার মান এবং প্রত্যাবৃত্ত নায়ক-কর্তৃক মানভঙ্গের চেষ্টা। নায়িকার মান-বেদনার গভীরতা হইতে নায়কের অন্যায়ের পরিমাণ অনুমান করিতে হয়। আমি নায়িকার ক্রোধের সঙ্গত কারণ দেখাইবার জন্য কালিদাসকৃত পুরুষস্বভাবের দৃষ্টান্ত তুলিতেছি। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ধীরললিত রাজা অগ্নিমিত্রের ইতিমধ্যে দুই পত্নীলাভ ঘটিয়াছে। প্রথমা ধারিণী—ধরণীর মত ধৈর্যময়ী। দ্বিতীয়া ইরাবতী। ইরাবতী রাজবংশীয়া নন, তিনি ছিলেন পাটরাণী ধারিণীর পরিচারিকা—অগ্নিমিত্রের উদার প্রতিভা ও মহানুভবতা ইরাবতীর রূপ ও নৃত্যগীতকলায় পারদর্শিতার যথাযোগ্য সমাদর করিয়াছে—তাহাকে উন্নীত করিয়াছে রাজশয্যায়। অগ্নিমিত্রের জীবনে অতঃপর তৃতীয়ার আবির্ভাব। তিনি হইলেন লুপ্তপরিচয় রাজকুমারী মালবিকা। অগ্নিমিত্র অবিলম্বে মুগ্ধ; দুষ্কুলাহৃত ইরাবতী-রত্নকে ভূমিতে ফেলিয়া অগ্নিমিত্র প্রমোদবনে মালবিকার তোষণে নিযুক্ত। রাজা যখন মালবিকার পদাঘাতের মাধুরী বর্ণনায় একান্ত অধীর, তখন উভয়ের মধ্যে সহসা ইরাবতীর আবির্ভাব। ইরাবতী গরল উদ্গিরণ করিল—"হায়রে! পুরুষজাতি বিশ্বাসের অযোগ্য। মুগ্ধা হরিণী যেমন প্রবঞ্চক-ব্যাধের মনোমোহন সঙ্গীতে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার হাতে ধরা দেয় ও শেষে মারা পড়ে, আমারও ঠিক সেই দশা হইয়াছে।" জালায় অধীর এবং বেদনায় করুণ কথাগুলি।

ইরাবতী কথাগুলি বলিয়া সক্রোধে প্রস্থানপর হইলেন। তারপর কি ঘটিল—আমি কালিদাসের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজা। (পিছু ছুটিতে ছুটিতে) চটো না, চটো না রাণি! (ইরাবতী রশনা-জড়িত চরণে যাইতেছেনই)

রাজা। সুন্দরী, প্রণয়ী ব্যক্তির প্রতি এত ঔদাসীন্য শোভা পায় না।

ইরা। শঠ, তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য।

রাজা। প্রিয়ে, আমাকে তুমি শঠ বলিয়া যত অবজ্ঞাই কর না কেন, করিতে পার, কেন না আমি তোমার অনুগৃহীত, না হইলে আমি যে শঠ তাহা তুমি জানিলে কি প্রকারে? কিন্তু অয়ি কোপনে! তোমার নিতম্বের মেখলা ঐ পায়ে পড়িয়া বারবার কত অনুনয় বিনয় করিতেছে, উহার উপরও তোমার ক্রোধের উপশম হইল না?

ইরা। এই হতাশও তোমার অনুসরণ করুক। (মেখলা লইয়া রাজাকে তাড়া করিলেন।)

রাজা। সখে, চাহিয়া দেখ, ঐ অশ্রুবর্ষিণী চণ্ডমুখী ইরাবতী, স্বীয় নিতম্ব হইতে উপেক্ষা বশতঃ স্খলিত কাঞ্চন-মেখলা-গুণের দ্বারা আমাকে আহত করিতে কেমন রোষরক্ত মূর্তিতে উদ্যত হইয়াছেন! ঠিক যেন জলদাবলী বিদ্যুৎগুণের দ্বারা বিন্ধ্যপর্বতকে আঘাত করিতে উদ্যত।

ইরা। কি? আমাকে কেন বারবার বাধা দিয়া অপরাধিনী করিতেছ?

রাজা। (রশনাযুক্ত ইরাবতীর হস্ত ধারণপূর্বক) অয়ি কুঞ্চিতকেশি! আমিই অপরাধী, আমাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়া দণ্ড না দেওয়ায় তুমি যে আমার অনুরাগ বাড়াইয়া তুলিতেছ। অথচ তোমার দাসানুদাস আমি, আমার উপর আবার ক্রোধও করিতেছ, এ কিরূপ? তবে বুঝি আমায় এ যাত্রার ক্ষমা করিলে? (বলিয়াই পায়ে পড়িলেন)

ইরা। লম্পট! এ তো মালবিকার চরণ নয় যে, মনের মতন করিয়া দোহদ পূরণ করিবে? (বলিয়াই দাসীর সহিত চলিয়া গেলেন)

বিদূষক। এখন ওঠ, যা'হোক খুব প্রসন্ন করিয়াছ বটে!

রাজা। (উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া) কি? প্রিয়া চলিয়াই গেল? কিছুতেই রাগ পড়িল না?

বিদূষক। বয়স্য! ইরাবতী কিন্তু এই অবিনয়ের জন্য ঘোর অপরাধিনী হইল। তা চল, অঙ্গারক-রাশির মত আবার ঘুরিয়া আসিবার পূর্বে আমরাও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাই।

রাজা! মদনের কি আশ্চর্য বৈপরীত্য! আমি এখন মালবিকা-গত-হৃদয়, সুতরাং ইরাবতী যে আমার এত অনুনয় বিনয়, এত পায়ে পড়া, কিছুই না মানিয়া চলিয়া গেল, —আমার অপমান করিল, এটাকে আমি আমার সেবা বলিয়া মনে করিতেছি। আমার পক্ষে ইরাবতীকৃত এই অপমান পরম অনুকূল। কেন না এই সূত্র ধরিয়াই আমি সেই

কুপিত-হৃদয়া প্রেমবতী ইরাবতীকে অনায়াসে লঙ্ঘন করিতে পারিব। এই প্রণিপাত-লঙ্ঘন আমার পক্ষে মাহেন্দ্র সুযোগ।

বিদ্যাপতির নায়কের চরিত্র বহুলাংশে এই প্রকার।

মানের প্রখরতম অবস্থা

মানের নানাপ্রকার অবস্থার কথা অলঙ্কারশাস্ত্রে মেলে। অবস্থাভেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা সেখানে আছে। সেই সকল আলঙ্কারিক মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ লইয়া বর্তমান আলোচনায় বড় বেশী ব্যস্ত হই নাই। প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাকে সাধারণ ভাষাতেই বুঝিতে চাহিয়াছি। আমরা জানি, লঘু মান হইতে গুরু মান পর্যন্ত নানা মানাবস্থা সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসাবে নায়িকার গুরু মানের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। ঐ দুর্জয় মানকালে নায়িকার হৃদয়কে বজ্রসার বলিয়া দূতীর ধারণা হয়—"মাধব শুন, রাধা স্বাধীন হইল। কতপ্রকার যত্নপূর্বক বোঝাইলাম, তবু ধনী উত্তর দিল না। তোমার নাম যদি শুনে, দুই হস্তে কর্ণরোধ করে। যে তোমার প্রীতি নূতন নূতন করিয়া মানিত * সে এখন কোনো কথা শুনে না। তোমার কেশ (প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ); কুসুম (উপহারস্বরূপ), তৃণ (অপরাধ স্বীকার—দন্তে তৃণ), তাম্বুল (অনুরাগের উপহার), রাইয়ের সম্মুখে রাখিলাম, কমলমুখী কোপে ফিরিয়া চাহিল না, বিরাগে মুখ ফিরাইয়া বসিল। মনে হয় তাহার হৃদয় বজ্রসার" (৬৫০)। এবং কৃষ্ণও জানেন, মানভঙ্গের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, —দেহি পদপল্লবমুদারম্—তাহাও স্থানবিশেষে ব্যর্থ হইতে পারে। অন্ততঃ ৬৪৯ পদে দেখি, মাথায় শ্রীচরণ ধরিলেই মানভঙ্গ হইবে এমন বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণের নাই। আসলে মান তো বিনয়ে বা অনুনয়ে ভাঙে না, ভাঙে তখনই, যখন ভিতরে মানিনী ভাঙিয়া পড়ে। কিন্তু গুরু মানের এমন একটি অবস্থা আছে,

*একটি উল্লেখযোগ্য ছত্র—"তোহর পিরীতি যে নব নব মানয়"। অর্থাৎ তোমার প্রীতি যে রাধা নব নব মানিত। এখানে 'পিরীতি' আছে, যাহাকে 'নব নব' মানা যায়। অবশ্যই আমাদের স্মরণ হইবে—"সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিঅ তিলে তিলে নূতন হোয়।"

যখন নায়ক সত্যই মান ভাঙাইবার কৌশলগুলি অনুশীলন করিতে ভয় পায়। বর্তমান পদে তেমন একটি অবস্থা—

"প্রাণবল্লভ কত কত অনুনয় করিলেন, কিন্তু মানিনী কামিনী ফিরিয়াও চাহিল না। কানাই কত কত বিলাপ করিতে লাগিল, সে সব শুনিয়া মান শত গুণ বাড়িয়া গেল। নাগর তাহা দেখিয়া ভীত হইল। তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। হৃদয় চমকিত হইল। চরণ স্পর্শ করিতেও সাহস হইল না। যুক্তকরে দাঁড়াইয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।" (৩২৯)

মানবিরহিণী নায়িকার দেহসৌন্দর্য

নায়কের ব্যবহার দেখিয়া আমাদের কিছু শ্রদ্ধা আসিয়াছে—সে যুক্তকরে মানিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। মনে হয়, তাহার যথার্থ প্রেম কিছু আছে। কিন্তু কয়েকটি পদে নায়ক যেভাবে মানিনীর সৌন্দর্য লুব্ধভাবে নয়নাস্বাদ করিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রেমানুরাগ, না রূপানুরাগ, পুনশ্চ সেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে যে দুই দৃষ্টান্ত তুলিব, তাহাতে মানিনীর রোষারুণ রূপ দূতীর বর্ণনায় পরিস্ফুট। ৩১৫ পদে দূতী মানিনী নায়িকাকে গঞ্জনায় বিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। সেই কপট গঞ্জনা আসলে নায়িকার যৌবনোচ্ছল দেহেরই বন্দনা। দূতী বলিতেছে, নায়িকা যেখানে স্বয়ং অপরাধিনী, অন্যের উপর রাগ করে কিভাবে? নায়িকার অপরাধ দারুণ—কনকাচলকে দুইভাগে ভাগ করিয়া কাম তাহার বুকের উপর বসাইয়া দিয়াছে, এবং তাহাকে স্বীকার করিয়া নায়িকা কামের অন্যায়ের সাহায্যকারিণী হইয়াছে। সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ নায়িকার কটিদেশ ক্ষীণ, গতি হংসাপেক্ষা হীন। এততেও যদি নায়িকার চৈতন্য না হয়, এবং মান করিতে থাকে, তাহা হইলে মান-ম্লানতায় তাহার চন্দ্রমুখ কলঙ্ক-লাঞ্ছিত হইয়া যাইবে। অন্যথা নায়িকা অকলঙ্ক চন্দ্রমুখী। অতএব নায়িকার কর্তব্য, হাসিয়া আলিঙ্গন ও অধরমধু দান করা; যাহাতে অজান্তে নীবি-বন্ধন স্খলিত হয়। দূতী দ্ব্যর্থহীন ঋজু ভাষাতে জানাইয়াছে—দেহধনে যদি যুবরাজ নায়ক খুশী হয়, তখন তাহাকে বসনে ঢাকিবার প্রয়োজন কি?

৪১১ পদে অভিমানিনী গুরু-রুষ্টা নায়িকাকে ভুলাইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া

দূতী ফিরিয়াছে এবং নায়িকার তাৎকালিক রূপ ও আচরণ নায়কের নিকট ফলাইয়া বলিতেছে। নায়িকার বিরূপতার রূপ ফোটান অপেক্ষা সৌন্দর্যের অপরূপতা পরিস্ফুট করাই তাহার উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে আমরা দূতী মারফৎ একটি শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক রূপসৌন্দর্যের কাব্যাংশ পাইতেছি। চিত্রটি এইরূপ—

"মাধব বল, রমণীকে কেন রাগাইলে ?...তাহার গৌর কলেবর ও মুখচন্দ্র রোষে অরুণরুচি হইল। কাম যেন রূপ দেখিবার ছলে কনকলতায় নব রক্তোৎপল দিল। নয়নের অশ্রুধারা ছিন্ন হারের ন্যায় কুচপর্বতের উপর আছড়াইয়া পড়িল। মদন কনককলসে অমৃত পূর্ণ করিয়াছে, অধিক কি উথলিয়া পড়িল ?" (৫১১)

মান-বিরহে নায়ক-নায়িকার বিপর্যস্ত দশা

মান নায়িকাই করে। নায়ক যে করিতে পারে না এমন নয়, মাঝে মাঝে করেও, কিন্তু বেশী করে না। কারণ প্রথমতঃ বেশী অন্যায় পুরুষের, দ্বিতীয়তঃ পুরুষমানুষের অভিমান মানায় না। ও বস্তুতে মেয়েদের একচ্ছত্র অধিকার।

মানাবস্থায় পুরুষের অবস্থা বড় শোচনীয়, বিশেষতঃ নায়িকা যেখানে অমন সুন্দরী ! নায়ক সেই সৌন্দর্যের উপভোগে বঞ্চিত। সুতরাং নিদারুণ বিরহ। নায়কের বড় যন্ত্রণা। বিদ্যাপতি সেই যন্ত্রণার অনেক ছবি আঁকিয়াছেন।

নায়িকার তুলনায় নায়কের যন্ত্রণা বেশী হওয়ার কারণ, নায়িকা কিছু পরিমাণে নিজ রোষে আশ্বস্ত। নায়ককৃত অন্যায়ের চিন্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ। তাই প্রথমাবস্থায় সে নায়ক-প্রত্যাখ্যানের মানসিক শক্তিতে সমৃদ্ধা। অপরপক্ষে অমন সুন্দরী নায়িকা, রোষসৌন্দর্যে যে অধিকতর আকর্ষণীয়া, —নায়কের হাহাকার তাই ফাটিয়া পড়ে। দূতী বা কবি নায়কের অবস্থা আরো শোচনীয় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এইজন্য যে, ঐরূপ বর্ণনায় নায়িকার করুণা পাওয়ার সম্ভাবনা।

এই ধরনের অবস্থার বর্ণনার সঙ্গে বিরহ-বর্ণনার সাধারণ ঐক্য আছে।

বলা যায় বিরহের দশা নায়কের উপর চাপানো হইয়াছে। মান আবার বিপ্রলম্ভের অন্তর্ভুক্ত। দু'একটি চিত্র উদ্ধৃত করা যাক—

"শুন শুন গুণবতী রাধা! মাধবকে বধ করিয়া কি সাধ সাধন করিবে? চাঁদ (কৃষ্ণপক্ষে) দিন দিন ক্ষীণ হয়, সে আবার পালটিয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষে চাঁদের কলেবর বর্ধিত হয়, কিন্তু এ যেন কৃষ্ণপক্ষের পর আবার কৃষ্ণপক্ষই ফিরিয়া আসিতেছে; কৃশতা আরো বাড়িতেছে। আরো বলি, অঙ্গুরী বলয় হইয়াছে।" (৬৫১)

এ চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের অনুগত, যত্রতত্র মিলিবে। বিদ্যাপতিতে আর একটি কালিদাসীয় মানবিরহ-চিত্র পাই, যেখানে নায়িকার পরিবর্তে নায়কের মান, এবং তদনুযায়ী নায়িকা বিরহিণী। বিপরীত-মানের সেই পদে দূতীর গঞ্জনায় মাধব লজ্জিত, মান করার জন্য। নায়িকার অবস্থা-চিত্র ছিল এইরূপ—

"মুখমণ্ডল করতলে লগ্ন, নয়নে বহমান নীর; আভরণ, কুন্তল, বস্ত্র সম্বন্ধে চেতনাহীন। তোমার পথ চাহিয়া তাহার চিত্ত স্থির নহে। পূর্ব প্রেম স্মরণ করিয়া শরীর দগ্ধ। হে মাধব, কেমন করিয়া মান সাধিবে? বিরহিণী যুবতী দর্শন মাগিতেছে। জলের মধ্যে থাকে কমল, গগনে সূর্য; কুমুদ ও চন্দ্রে অনেক ব্যবধান; মেঘ গগনে গর্জন করে, ময়ূর পর্বত শিখরে,—প্রেম যে কতদূর যায় তা কয়জনে জানে।" (৪৪৩)*

তবে নায়িকার নয়, এক্ষেত্রে নায়কের যন্ত্রণাকর অবস্থা দেখানই কবির অভিপ্রেত। সে ব্যাপারে তিনি স্থানে স্থানে কাব্যসাফল্য লাভ করিয়াছেন। যে নায়ক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"হৃদয়ের সদৃশ জন যতক্ষণ না দেখে ততক্ষণ সব অন্ধকার" (৩৮৮), সেই নায়ক যখন মধুযামিনীতে নায়িকার সঙ্গবঞ্চিত হয়, তখন তাহার আকুলতার চেহারা এইরূপ—"নীরস রজনী যেন তিনযুগের ন্যায়; চক্ষের আড়াল হইলে মনে হয় দেশান্তর; সরোবর শুষ্ক হইয়া কমল ম্রিয়মাণ; নগর উজাড় হইয়া প্রান্তর" (১৩০)। বর্ণনার ভাষায় এখনো উপরিচর চাতুর্য। সত্যকার উৎকৃষ্ট কবিভাষা পাইতেছি, মিলনোৎকণ্ঠিত দর্শনাভিলাষী কৃষ্ণের অবস্থা-বর্ণনায়—"সমস্ত অবয়ব যেন নয়নে শোভা পায়" (৪১৫)। মানের ব্যাপ্তিকাল সম্বন্ধে দূতীর বর্ণনা—

*নায়কের প্রত্যক্ষ মান-চিত্রও মেলে। সে রীতিমত পুরুষালি ব্যাপার। প্রত্যাখ্যাতা রাধিকা ক্ষুণ্ণ করিয়া বলিতেছেন—"হরি শয্যার নিকটে আমার মুখ দেখিল না; রোষে চরণ দিয়া প্রদীপ নির্বাপণ করিল।" (৮৬৩)

"দণ্ড হইতে দিবস হয়, দিবস হইতে মাস হয়, মাস হইতে বর্ষের নিকট উপস্থিত।" (ঐ)

বলাবাহুল্য মানের এই অবস্থা বিরহাবস্থার অংশ, এবং কবিরা সংযত-মাত্রায় বিরহের বর্ণনাই এইকালে করিয়া গিয়াছেন।

মানভঙ্গ : মানভঙ্গের কারণ

মান চিরদিন থাকে না, এক সময় ভাঙে। মানকে স্থূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়, এক, অনিবার্য মান—যে মান নায়কের অন্যায়ের কিংবা হৃদয়ের নিগূঢ় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার সৃষ্টি ; দুই, সোহাগিনী মান, যে মান আদরের কাঙাল। যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক মান মূলে ক্ষয়িষ্ণু, প্রেমজগতে আত্মহত্যালিপ্সু।

কবিরা মানভঙ্গের নানাপ্রকার পরিস্থিতি দেখাইয়াছেন। নায়কের আদর, অনুনয়, তোষণ, কোন্ সুমধুর পর্যায়ে উঠিতে পারে, আমরা দেখিয়াছি। তা সত্ত্বেও হয়ত মানভঙ্গ হয় নাই। প্রিয়তমার চরণ মাথায় ধরিয়াও তাহাকে প্রসন্ন করা যায় না—এটি নারীর পক্ষে বৃহৎ অর্জন এবং পুরুষের পক্ষে দারুণ সংবাদ।

বিরহে মৃত্যুর কথা শুনিলেও মানে মৃত্যুর কথা কিন্তু শুনি নাই। তাহা হইলেও ঐ প্রকার প্রখর মান ভাঙে কি প্রকারে? একটি মাত্র উত্তরই আছে—নিজের ভারে। আগুন বেশী জ্বলিলে ঝড় উঠে এবং বৃষ্টি নামে। নায়িকা বেশী জ্বলিয়া বেশী কাঁদিয়াছে মানের পদেও।

সুতরাং দেহপ্রাণের তাগিদই মানভঙ্গের মূল কারণ। বিদ্যাপতির এই জাতীয় পদ কিছু আছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পদগুলি উল্লেখযোগ্য। নিজের শরীরের বিদ্রোহে মনের (ও মানের) দুর্গ ভাঙিয়া পড়িল, কবি বিদ্যাপতি গূঢ় পুলকে সেই যুদ্ধ-বিবরণ জানাইয়াছেন। এই জাতীয় দেহমনের সংঘাতকাহিনী অমরুশতকে শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি এই অংশে অমরু-প্রভাবিত।

নায়িকার অবস্থা দেখা যাক। সে অনুতাপে অধীর, সারারাত্রি মান করিয়া নষ্ট করিয়াছে—"সখি! আমার নির্বুদ্ধিতার কথা কি বলিব? সারারাত্রি মান করিয়া কাটাইলাম। যখন মন প্রসন্ন হইল নিষ্ঠুর অরুণ আকাশে উঠিয়াছে।...অধিক চাতুরতা দেখাইতে যাইয়া বোকামিই দেখাইলাম। লাভের লোভে মূলেই হানি ঘটিল" (৩৮৩)। দেখা গেল, শরীর-মনের তাগিদে নায়িকার মানভঙ্গ হয়—রাধা দূরে থাকিয়া অন্তমনা হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু পিপাসিত নয়ন নিষেধ মানে না—"তাহার হাস্তসুধারস দেখিয়া কতবার নীবিবন্ধ করিব?"—"চিত্ত স্বায়ত্ত থাকিলেই মান করা সম্ভব। হৃদয় দুরু দুরু করে, চাপিয়া থাকি, সমুদয় শরীর শোভা ধারণ করে, হৃদয়ের উল্লাস গোপন করিতে পারি না। মুখ মুদিত করিলেও হাসি ব্যক্ত হয়" (৪২৮)। মনের উপর শরীরের জয়পতাকা উড়িয়াছে এই পদে। ইহাতে কি নায়িকা খুসী হইয়াছে? কখনো, আবার কখনো নয়। যখন দেহের জ্বালা বেশী তখন তৃষ্ণা-উপশমে তৃপ্ত হয়; কিন্তু পরেই পুরাতন কথা আবার মনে পড়ে, মনে পড়ে নায়কের আচরণের নিষ্ঠুরতা, নিজের অসহায়তা—নারীজীবনের বঞ্চনা। তখন নায়িকা মানভঙ্গে আত্মগ্লানি অনুভব করে—"যে ভাব ছিল তাহা রহিল না, যে কথা বলা যায় তাহা ফিরিয়া আসে না। রোষ বিস্তার করিয়া হাসি বাড়াইলাম। রুষ্ট হইলে বড় প্রয়াসে মান ভাঙে। মাগো, কেমন করিয়া সে হরি ফিরিবে? নারীর স্বভাবে আমি মান করিলাম, পুরুষ বিচক্ষণ কে না জানে?" (৪২৮)। দুর্নিবার প্রেমে বিদ্ধ নায়িকা তীব্র যাতনায় আত্মদংশন করে। বাহিরে সে অবশ্য নায়ককে শ্লেষ করিয়াছে, সে শ্লেষ নিজেকেই বিদ্ধ করিতেছে বেশী—"সকলেই প্রেমের প্রশংসা করে, যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হয়" (৬৬১)। প্রবঞ্চিতা নারীর দীন কণ্ঠ—"যেন কেহ যুবতী হইয়া না জন্ম-গ্রহণ করে। যুবতী হইলে যেন রসবতী না হয়। রস বুঝিয়া যেন কুলবতী না হয়।" (৪৪৭)

এখানে কি শেষ? সত্যই কি নায়িকা কুলবতী থাকিতে চায়? কখনই নয়। কবির উক্তিমত এই পদে সে দন্দসমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছে, যত তরঙ্গ-তাড়িত হোক না কেন, তরঙ্গ-লঙ্ঘনের দুঃসাহস ও জীবনোল্লাস হইতে অব্যাহতি সে চাহে না। তাই একদিকে বিধাতার নিকট তাহার প্রার্থনা,

'স্বামী যেন নাগর, রসাধার হয়"—ঠিক তারপরেই বিপর্যস্ত প্রাণ অজ্ঞাতে কামনা করে—"প্রিয় (স্বামী নয় কিন্তু) যেন পরবশ না হয়।" নিষিদ্ধ প্রেমের এমন মাদকতা—নায়িকা প্রিয়ের পারবশ্য পর্যন্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত। তবে তাহার প্রার্থনা,—"প্রিয় যদি পরবশ হয়, তাহা হইলেও সে যেন বিচার রাখে।" প্রিয়কে এতখানি স্বাধীনতা দিবার পিছনে আছে নায়িকার নিজ রূপগুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস—"(বিচার থাকিলে) নায়ক বুঝিবে, কোন্ নারী তাহার হারস্বরূপ হইবে।" অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সেই পরকীয়া প্রেম এবং বহুদার নাগরকেই চাই।

নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো বহুক্ষেত্রে প্রকাশিত। দূতী-প্রেরণের সময় ভাবের ঘরে চুরির রূপ ফুটিয়াছে। মান করিয়া ভিতরে নায়িকা দুর্বল, এখন মান ভাঙিবার জন্য ব্যস্ত। একবার ডাকিলেই হয়। কিন্তু যে ডাকিবে, সে তো প্রত্যাখ্যাত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। অতএব নিজেকে ডাকাইবার জন্য তাহাকে ডাকাইতে হয়, সখীর মারফৎ। অথচ "গর্বিত হরির" নিকট এতখানি নামিতে বড় লজ্জা। চাতুরী অবলম্বনের উপদেশ দিয়া সখীকে পাঠাইতেছে। সখী যেন এরূপ কৌশলে নায়িকার অবস্থা নায়কের গোচর করে, যাহাতে সে একদিকে নায়িকার প্রাণসংশয় অবস্থা বুঝিতে পারে, অন্যদিকে, যেন ধারণা করিয়া না বসে, নায়িকা মান খোয়াইয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। কারণ লজ্জা বড় ধন, তাহাতে প্রাণ যায় যাক। তবু প্রাণ যায় চায় কে? (৬৫২)

নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরির এই উপভোগ্য চিত্র। ৪২৪ পদেও সেই চিত্র পাইতেছি। কৃষ্ণের নিকট রাধা দূতী পাঠাইতেছেন, কিন্তু বেশী দৈন্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা। রাধার মনোভাব বিচিত্র। যে দূতী পাঠায় সে কিরূপে বলিয়া পাঠায়—"মান ও প্রাণ দুইয়ের মধ্যে যে প্রাণ রাখে তাহার মরণ ভাল?" রাধা অবশ্য মান ও প্রাণের মধ্যে মান রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আত্মিক মরণ নয়, তাঁহার মরণ দৈহিক। রাধার মনোগত অভিপ্রায়, কৃষ্ণ সত্বর আসুক, মানভঙ্গ করিয়া দৈহিক মৃত্যুটা নিবারণ করুক (৪২৪)। রমণীর মনোরূপ।

নায়িকার কাণ্ড দেখিয়া ও কথা শুনিয়া দূতী হাসিয়াছে, দুঃখে। দূতী সবই জানে। নায়িকা তাহাকে বেশী কি জানাইবে? মধুযামিনীতে

নায়িকার অসহ অবস্থা দেখিয়া দূতীর প্রশ্ন ছিল—মান রাখার এই বিড়ম্বনা কেন? (৪১৪)। একবার দূতী এই অবস্থায় নায়ক-প্রত্যাখ্যানের আসল রূপ অব্যর্থ ভাষায় ফুটাইয়াছে—"সম্ভোগ-লালসায় প্রেমলুব্ধ হইয়া নাথ আলিঙ্গন চাহিতেছে। যদি তাহার আশা খণ্ডন কর, তাহা হইলে যেন প্রবল বায়ু বহিবার সময়ে অগ্নিতে কাষ্ঠ দিয়া শয়ন করা হইবে।" উপমার ভাষায় প্রাকৃতিক শক্তি দেখিয়া আমরা চমকিত। আমরা চমৎকৃত—দূতীর প্রেম-মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সূক্ষ্মতায়। নায়িকার মানাগ্নি কিভাবে উভয়পক্ষকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে, দূতী প্রথমে তাহার বর্ণনা করিয়াছে। যেমন যন্ত্রণা কৃষ্ণের, তেমনি রাধারও—"সুখে কুসুমশয্যায় শয়ন করিস না, নয়নে অশ্রুমোচন করিস। যেখানে নারী অসহিষ্ণু, সেখানে পুরুষ-ভূষণ কি করিবে? রাই, বলপূর্বক স্নেহ ভাঙিস না, কানাইয়ের শরীর দিন দিন দুর্বল হইতেছে, তোরও প্রাণসংশয়" (৪৩২)। প্রেমকৃত্যের আদর্শরূপের বিষয়ে আরো কিছু উপদেশের পর দূতী প্রেমানন্দের একটি লক্ষণ বড় সুন্দর ভাবে বলিয়াছে—"সে-ই কলাবতী নারী, যে প্রথম প্রেমকে ধরিয়া রাখে, ম্লান হইতে দেয় না।" (ঐ)

প্রেমচর্যার পক্ষে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রথম প্রেমের বিস্ময়-মিশ্রিত অপূর্ব উত্তেজনা বেশী দিন বজায় থাকে না, মন ক্লান্ত হইয়া যায়; দেহের ক্ষুধার সঙ্গে দেহের গ্লানি মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—সেই শ্রান্তির মন্দকামনার চেয়ে মারাত্মক অবস্থা প্রেমজগতে আর নাই। তাই প্রেম একটা আর্ট—তাহাতে কলারসের এত প্রয়োজন। আবরণ-উন্মোচনের আলো-আঁধারীতে চির গোধূলিকে যাহারা বজায় রাখিতে পারে, তাহাদের জন্ত চিরদিনের মঙ্গলপরিণয় গোধূলিলগ্ন। প্রৌঢ় কামনার মধ্যেও প্রথম প্রেমের কল্পনা-অবকাশ রক্ষা করিতে পারিলেই মাত্র প্রেম তারুণ্যে দীর্ঘজীবী হয়।

মানান্তে মিলন

মানভঙ্গের বহুপ্রকার কারণ পর্যবেক্ষণ করিলাম। এখন একটি বহির্গত কারণ দেখা যাক। কৃষ্ণ একবার ফুলধনু লইয়া খেলা করিয়া মানিনীদের

মান দূর করিলেন। এখানে শুধু রাধাই মানিনী নন, গোপীমাত্রেই মানিনী। এই সমবায় মানকে ভাঙ্গিতে পারে একমাত্র কন্দর্প, কৃষ্ণ কন্দর্পের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

১২৬ পদের প্রথম দিকে সুন্দর এক খোলা-মেলার আবহাওয়া—"যমুনার তীরে খেলা বসিল। রাধা কন্দুকক্রীড়া মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ হাত দিয়া চটাচট কন্দুক মারিয়া ধীরে ধীরে কি করিয়া কামের বাণ চালনা করিতে হয় শিখাইতে লাগিলেন।"

আমরা কবির অনবধানতায় বিস্মিত। মানিনীরা এমন করিয়া আনন্দের সঙ্গে খেলা দেখিতে লাগিল কিভাবে? সে যাই হোক, বৃন্দাবনে সবই সম্ভব—সেখানে নায়কের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে, খেলিতে খেলিতে মান করা সম্ভব—ইতিমধ্যে প্রত্যাশিত অঘটনটি ঘটিয়া গেল। পদে একটি সুন্দর রূপকের আভাস আছে। কৃষ্ণ কামবাণ চালনা শিখাইতে লাগিলেন, এই কথার পরেই আছে—"নিজ নিজ পতি ত্যাগ করিয়া যুবতীরা কেন ধাইতেছে, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতেছি না। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই কানু কানু বলেন। মনে হয় মান খোয়াইয়া খুঁজিতেছেন।"

উদ্ধৃত কথাগুলি কার—কবির, কৃষ্ণের, না রাধার? পদ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় না, গোপীদের ছুটাছুটি করিতে এই তিনজনের মধ্যে কে দেখিলেন? কবি ঐ কথাগুলি বলিতে পারেন, কারণ কবিমাত্রেই দ্রষ্টা, তিনি গোপীদের ঐ অবস্থার দ্রষ্টাও হইতে পারেন। যদিও কথাগুলি কৃষ্ণ বলেন, তাহা হইলে কৃষ্ণের ছদ্মকৌতুকের মাধুর্য অনুভব করি। যিনি কামবাণ চালাইতেছেন, চালনের ফল যিনি সম্পূর্ণ জানেন, অভিপ্রেত পরিণতি দেখার পর তাঁহার মনের খুসী চমৎকারভাবে ঐ কপট প্রশ্নের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়, যদি কথাগুলি বলেন রাধা। কামবাণ চালনের পরে গোপীদের প্রাণান্ত ছুটাছুটির রূপ রাধা দর্শন করিলে রাধার আত্মদর্শনের সুযোগ ঘটিয়া যায়। কৃষ্ণ-বাণে বিদ্ধ হইয়া যেভাবে এতদিন তিনি ঘর-বাহির করিয়াছেন—পরম বিস্ময়ে আজ সেই আত্ম-রূপ দেখিয়া লইলেন অপরের মধ্যে। প্রেমের পাগলমূর্তি দেখার তুল্য যন্ত্রণার সৌভাগ্য প্রেমিকার কাছে আর কি থাকিতে পারে?

কন্দর্পই মানান্তের মূল কারণ—কবি রূপকের দ্বারা এই পদে জানাইয়াছেন।

সেই কথাই এতক্ষণ বুঝাইতে চাহিয়াছি। বলিয়াছি, দেহ-প্রাণের তাগিদে মানভঙ্গ হয়। এই পদে স্বয়ং নায়িকা তাহা স্বীকার করিয়াছে।

৬৫৮ পদে মানাবস্থায় নায়িকা ভিতরে ভিতরে কতখানি অস্থির, তার চিত্র পাওয়া যায়। মান বিশুদ্ধ মানসিক প্রতিরোধ। তাহাতে দেহ-প্রাণের কোনো সমর্থন নাই। কোনো ছলে যদি দেহদুর্গে আক্রমণ করা যায়, তখন ঐ মানরূপ মানস-পতাকা ধূলায় লুটাইবে, স্বয়ং নায়িকা উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে তাহা বুঝাইয়া বলিয়াছে। এই কামচঞ্চল পদে প্রেম দেহাধীন।

ঐ পদে আছে—নায়ক, নায়িকা সাজিয়া আসিয়াছিল। নায়িকা বড় আদরে সেই নাগরীকে গ্রহণ করিয়াছে। নায়ক যথেষ্ট নারী সাজিয়াছিল, নায়িকাও তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল নারী বলিয়া, কারণ সে উক্ত নব-নাগরীর বক্ষের কুচ, বামপদের অগ্রক্ষেপ, চাঁচর বেণী লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। তথাপি আগত নারীটির মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহাতে নায়িকার মত নারী-উত্তমাও তাহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ না করিয়া পারে নাই। নবাগতাকে দেখিয়াই নায়িকার মনে হইল, কন্দর্প ফুলধনু হস্তে নাচিতেছে। সুতরাং অবিলম্বে নায়িকা সেই অন্য নারীকে সচকিতে আদর করিল, কোলে লইল, নাসা স্পর্শ (!) করিল, ইত্যাদি। বলাবাহুল্য বাহ্যরূপের পরিবর্তনে দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা যায়, কিন্তু স্পর্শের ভাষার অর্থান্তর হয় না। নায়িকা বলিতেছে—"তনুর সরস স্পর্শ যখন হইল মানগর্ব দূরে গেল।"

কিন্তু নারী সাজিয়া দৃষ্টিকে প্রতারিত করা কি সত্যই সম্ভব? কিছুটা সম্ভব নিশ্চয়, কারণ দৃষ্টি বহিরঙ্গ। তথাপি বহিঃদৃষ্টিপাতেও নায়িকা নূতন নারীটির প্রতি যে প্রবলোচ্ছ্বসিত আকর্ষণ বোধ করিয়াছে, তাহা যতখানি না এই নূতন নারীর রূপসৌন্দর্যের জন্য (নূতন নারীর রূপের কথা বলিয়া ব্যঞ্জনায় নায়কের রূপোৎকর্ষের কথা বোঝান হইয়াছে, শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপের মধ্যেও একটা কোমল লাবণ্য আছে যাহা নারীজনোচিত), ততোধিক তাহার ভিতরকার পুরুষ-ব্যক্তিত্বের চৌম্বকের জন্য। নারী হইয়াও নায়িকার নব-নারীর প্রতি আকর্ষণ এত যে, পরিচয়ের প্রথমক্ষণেই আলিঙ্গনের জন্য অধীর। অর্থাৎ নারীরূপের আচ্ছাদনতল হইতে পুরুষ-দেহের প্রবল আহ্বান নায়িকাকে অজ্ঞাতে মথিত করিয়া একটি ব্যস্ত আলিঙ্গনে উন্মুখ করিয়াছে।

মানান্ত হইয়াছে। এইবার মিলন। এই মিলন কিন্তু সাধারণ মিলনের

মত সহজেই উত্তাল নহে। নায়কের সত্য অথবা কল্পিত অন্যায়ের জন্য নায়িকার ব্যথাপূর্ণ রোষাবিষ্ট আত্মসঙ্কোচনই মান। অনেক চেষ্টায় তোষণে সে মান দূর করিতে হইয়াছে। তথাপি বিষাদের স্মৃতি যাইতে চায় না সহজে; বর্ষণক্লান্ত দিবসের সূর্যপ্রকাশ প্রথমেই বৃক্ষপর্ণের বারিচিহ্ন যেমন মুছিতে পারে না, সম্পূর্ণ বাষ্পাভাস দূর করার জন্য যেমন দীর্ঘদীপ্ত সূর্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি মানান্তে মিলনেও, প্রবৃত্তিবেগে স্বয়ং উন্মত্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত, নায়িকার হৃদয় অশ্রুপূর থাকিবেই। এক্ষেত্রে প্রণয়পক্ক নায়কের আচরণ সতর্ক ও সাবধান। ঠিক কিরূপ, ৬৬০ পদে তাহার পরিচয়। এই পদে মিলনের স্তরগুলি সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে চিত্রিত। ইহাতে কবির মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের সুন্দর পরিচয়। তবে সংস্কৃত আলঙ্কারিক মনস্তত্ত্বের প্রভাবও আছে। পদটিকে অংশে অংশে বিশ্লেষণ করা যাক :—

(১) মানের পর মিলন। কৃষ্ণবিষয়ে বর্ণনা,—"কানাই অমৃত-সরোবরে ডুবিয়া গেল।"

মান ছিল নায়িকার। যাহা কিছু মানসিক প্রতিরোধ তাহারই। কৃষ্ণ সেখানে যাচক। তাই বাধা-অপসারণ ও অনুমতিমাত্রে কৃষ্ণের পক্ষে মিলনানন্দে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব, নায়িকার পক্ষে নয়।

(২) "কানাই যখন আলিঙ্গন চাহে, সুবদনীর তনু প্রেমভরে যেন স্তম্ভিত।"

"প্রেমভরে স্তম্ভিত" কথাগুলি অর্থপূর্ণ। ইহা নিশ্চয় প্রেমজড়ত্ব নয়। ঐ স্তম্ভিত ভাব অনুভূতির তীব্রতার দ্যোতক। অতি তীব্র স্পন্দনকে দেখা যায় না, অতি দ্রুত গতিকেও নয়। যে চরম অনুভূতির স্রোত বহিতেছে রাধাদেহে, তাহা ঐ চরমতার কারণে আদিক্ষণে রাধাকে ভাবাস্বাদনে অক্ষম করিয়াছে। ভাব-স্পন্দন কিছু স্তিমিত হইলে তবে আস্বাদন সম্ভব। তাই দীর্ঘ মান-বিরহের পরে প্রথম আলিঙ্গনে রাধাদেহ সম্বন্ধে ঐ 'স্তম্ভিত' বিশেষণটি খুব উপযোগী।

(৩) "নায়কের মধুর কথায় সুন্দরী গদগদ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। কানাই কোলে আগুলাইল। সঙ্কীর্ণ রস নির্বাহ করিল।"

প্রথম আলিঙ্গনক্ষণে প্রেম-স্তম্ভিত রাধা যে আবেগ-শিখরে ছিলেন, সেখান হইতে তিনি ধীরে ধীরে নামিতেছেন। সেই অবতরণের সঙ্কেত

"দীর্ঘনিঃশ্বাস"। এখানে বাস্তববোধের সূচনা হইল। ঐ যে দীর্ঘনিঃশ্বাস, উহার দুটি অর্থ, এক, সমুচ্চ অনুভূতির স্বর্গলোক হইতে নিম্নাবতরণ ঘটিলে একটা স্বাভাবিক দীর্ঘশ্বাস থাকে। দুই, বাস্তব পৃথিবীতে যখনি প্রত্যাবর্তন, তখনি পূর্বস্মৃতির জাগরণ—কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক—মান, মানের কারণ, ইত্যাদি কথা মনে ভাসিয়া আসিল। সেই পূর্বতন দুঃখজীবনের স্মৃতি দীর্ঘশ্বাসকে টানিয়া আনিল।

(৪) "কানাই অল্প অল্প বদন চুম্বন করিলেন ; তাহাতে হৃদয় সরস ও বিরস (যুগপৎ হর্ষ ও ক্রোধ) হইল এবং চক্ষু অশ্রুভারযুক্ত হইল।"

বাস্তবলোকে পদার্পণের সূচনাটি রাধার অশ্রুতে টলটল। কৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বন একদিকে তাঁহার দেহমনে হর্ষসঞ্চার করিতেছে, অন্যদিকে কৃষ্ণের এখনকার পিরীতির পূর্বপট হইতে বিশ্বাসহানির কৃষ্ণচ্ছায়াটি যাইয়াও যাইতেছে না। সেই পুরাতন বেদনা, অভিমানের নয়নজলের মধ্যে কাঁপিতেছে। মানান্তে ঐ অভিমানটুকু করুণমধুর।

(৫) "(কৃষ্ণ) সাহস করিয়া পয়োধরে হস্তার্পণ করিল, তখনো মনে কাম হইল না। যখন নীবিবন্ধ ছিঁড়িল, তখন হরির সুখজনক অল্প কন্দর্পের উদ্রেক হইল। তখন নাথের কিছু সুখ। বিদ্যাপতি বলেন, সুখ কি দুঃখ !"

পুরাতনী নর্মবিলাসিনীকে কৃষ্ণ জাগাইতে চাহিতেছেন। তাঁহার সুখ চাই, উন্মত্ত মদনসুখ। পয়োধরে হস্তার্পণ হইতে নীবি অপসারণ পর্যন্ত তাঁহার সেই বিষয়ক বিস্তৃত চেষ্টা। এই পদে কৃষ্ণ কিন্তু পূর্ণ সুখ পান নাই। বলা হইয়াছে—"হরির সুখজনক অল্প কন্দর্পের উদ্রেক", এবং "নাথের কিছু সুখ।" এমনকি এই অল্প সুখের কথাটিতেও কবির সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। তিনি জিজ্ঞাসার অস্পষ্টতায় ব্যাপারটিকে অমীমাংসিত রাখিয়াছেন—"সুখ কি দুঃখ !" মন্তব্যটি কৃষ্ণাপেক্ষা রাধা-বিষয়ে আরো প্রযোজ্য।

কৃষ্ণ পূর্ণসুখ পাইলেন না নায়িকার আত্মসঙ্কোচের জন্য। এই আত্ম-সঙ্কোচ নিতান্ত স্বাভাবিক। এই পদে ভোগরাগে নায়িকাকে উন্মত্ত করিয়া ফেলিলে প্রেমের সকল সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। তখন মান যেন ক্ষুধিতের ক্ষুধাকে অসহনীয় করিয়া পরবর্তী তৃপ্তি-বৃদ্ধির জন্য রচিত কৃত্রিম বাধা-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তাহা না ঘটাইয়া নায়িকার প্রেমকে কবি সম্মান করিয়াছেন। মানের বিষাদস্মৃতি যে কাম-মধ্যাহ্নের উপর সজল মেঘসঞ্চার

করিয়া আছে, তাহার জন্ত কবির কাব্যবোধের সমূহ প্রশংসা করিতে হয়।

আলোচনা এখানেই শেষ করিতে পারি না। আনন্দময় আলিঙ্গনাকুল মিলনচ্ছন্দকে মানাবসানে দেখিয়া লইব— ।

"রাধামাধবের মিলন অপূর্ব। মানিনীর দুর্জয় মান ভঙ্গ হইল। মাধব রাধার মুখ চুম্বন করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া নয়ন সজল হইল। সখীরা আনন্দে নিমগ্ন হইল। দুইজনের মনের মধ্যে মনসিজ প্রবেশ করিল। উভয়েই উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া আকুল হইলেন। দুইজনকে দর্শন করিয়া বিদ্যাপতির হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।" (৬৬২)

বিদ্যাপতির মান-পদের বৈশিষ্ট্য : চৈতন্যোত্তর মান-পদাবলীর সঙ্গে তুলনা

মানের আলোচনা শেষ করিলাম। মানের অজস্র বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছি। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বেশি কিছু পদের শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণও করিয়াছি। বিদ্যাপতির বাস্তবতাবোধ এবং লোকচরিত্রজ্ঞান এই অংশে যথেষ্ট প্রমাণিত। তীক্ষ্ণাগ্র শব্দযোজনার রীতিতেও ঐ অভিজ্ঞতার প্রখরতা। কবির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রকাশের অন্যতম অনুকূল ক্ষেত্র এই মান পর্যায়। এখানে কেবল ভাষাকে মাজিয়া উজ্জ্বল সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের চেষ্টাই নাই, বিদ্যাপতির অধ্যয়নশীলতার পরিচয়ও আছে। সমাজদর্শন-মূলক প্রজ্ঞাগর্ভ বচন, যাহা অনেক সময় সংস্কৃত সুভাষিতাবলীতে ধৃত—সেগুলিকেও কবি নিজের বস্তু-দর্শনের সঙ্গে মিশাইয়া নিপুণভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। বহুক্ষেত্রে তিনি সফল, তবে শাণিত কথা বলার লোভ বিপত্তিও ঘটায়—অনেক সময় প্রসঙ্গচ্যুত প্রগল্‌ভতার সাধা দোষেও ধরা দিয়াছেন।

বর্তমানে প্রৌঢ়োক্তিগুলির তালিকা দিবার বাসনা আমার নাই; কিন্তু কথাগুলি যে রীতিমত তীক্ষ্ণ ও তপ্ত, তাহা আশা করি আলোচিত ও পূর্বে উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। রাধা কৃষ্ণ-বচন বিষয়ে বলিয়াছেন—"মধুমাখা পাথরের মত তোমার কথা", কিংবা—"তুমি মধুমাখা

শর প্রহার কর”—আমরা বলিতে পারি, বিদ্যাপতির শব্দে, তিনি সত্যই কৃষ্ণের বচন ও আচরণকে মধুমাখা পাথর কিংবা মধুমাখা শরের রূপ দান করিতে পারিয়াছেন। এই অংশে তাহার অতিশয়িত কটুতা কাব্যিক ঔচিত্য-পথেই আসিয়াছে, কারণ, প্রবঞ্চিত রাধার দুঃখ বাস্তবিক মর্মান্তিক। “সেই কানাই, সেই আমি, সেই মদন”—এই অবস্থাতেও যদি কৃষ্ণ “কৃপণের মত নিজধন ভোগ না করিয়া পরধনলুব্ধ” হয়, তাহা হইলে রাধার কথায় ধার আসিতে পারে। কৃষ্ণকে কৃপণ বলার মধ্যে কবির দৃষ্টিগভীরতার পরিচয় আছে। কৃষ্ণ পরধন-লোভে অকৃপণ, আসলে কিন্তু কৃপণ, কারণ নিজধন ভোগে বীতরাগ। সুজনের প্রেমের স্বভাব এবং সাধারণ প্রেমের স্বভাব সম্বন্ধেও সুন্দর উক্তি আছে মান অংশে। বলা হইয়াছে—“সুজনের প্রেম হেমতুল্য, দগ্ধ করিলে মূল্য দ্বিগুণ হয়। প্রেম এমন অদ্ভুত যে, ভাঙিলেও ভাঙে না, যেমন মৃণালের সূতা আকর্ষণে বাড়িয়া যায়।” ইহার বিপরীত রূপ,—“সকল মাতঙ্গে মুক্তা নাই, সকল কণ্ঠে কোকিলার স্বর নাই, সকল সময় বসন্ত নয়, সকল পুরুষ সমান গুণবান নয়” —(৬৬৩)। কবি কিন্তু সব সময় সংযত থাকিতে পারেন নাই—চড়া কথার লোভে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। যেমন একবার নায়িকা প্রখর উপমার ভাষায় নিজ জ্বালা উদ্‌ঘাটন করার পরে, কবি ভণিতায় সোৎসাহে রাধিকাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—“কুকুরের লেজ সোজা হয় না” (৬৫৪)।

বিদ্যাপতি মান-পদে যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখাইলেও এই পর্যায়ে আমরা চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুরাগী। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যে উন্নততর প্রেমের রসলোক হইতে মান-বিচ্ছুরণ করিয়াছেন, বিদ্যাপতির প্রবঞ্চিতা নারীর রুক্ষ ক্রন্দনে প্রায়ই সে মধুভুবন অদৃশ্য। প্রেমে সন্দেহ থাকিলে মান আস্বাদনীয় হয় না। বিদ্যাপতির লৌকিক প্রেম অনেক সময় সত্যই পাঠক-হৃদয়ে নায়কের প্রেমের গভীরতা বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। মানিনীর মানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেখানে দুশ্চিন্তা থাকে, সেখানে তাহার প্রেমরাগের বর্ণদ্যুতির অপরূপতা দর্শন করা সম্ভব নয়।

অবশ্য বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির কিছু পদে মানের স্নিগ্ধ কোমল রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখানে আছে নির্হেতু মান, প্রেমের বিচিত্র কুটিলতা, অহেরিব গতি। যেমন ৬৩৭ পদে রত্নমন্দিরে পালঙ্কে সুখে

উপবিষ্ট রাধা ও মাধবের দারুণ কলহ উপস্থিত হইল "রসের কথায় কথায়।" তাহাতে রুষ্ট নায়ক গমনোদ্যোগী। তখন নায়িকা নাগরের বসন ধরিয়া মিনতি করিয়া, কটাক্ষে পঞ্চশর হানিয়া ও পয়োধর দেখাইয়া বিবিধ উপায়ে নাগরকে আকুল করিয়া তুলিল। তারপর যখনি বুঝিল নাগর আয়ত্তে, তখন সুরু হইল নায়িকার মান। এই জাতীয় মানের ইয়ত্তা করা অসম্ভব, তাহা বুঝি। বাংলাদেশের রাধিকা নায়কের ব্যবহারে অনুতাপ করিয়া বলে বটে—"ঢাকা রূপ দেখিতে পাই নাই, পড়িয়া গেলাম, নিজের শূল নিজে চাঁছিলাম" (৬৪২), কিন্তু ঐ পদেই ভণিতায় কবি সত্যই ভাবভরে উচ্চকথা বলিয়া ফেলেন—"জগতে কে না জানে প্রেমের জন্য জীবনকে উপেক্ষা করা হয়।" বাংলাদেশের রাধা, মাধবের স্বভাব বুঝিয়াও মন ফিরাইতে অসামর্থ্যের জন্য অনুতাপ করিয়া বলে—"হরিণী যেমন ব্যাধের স্বরূপ জানে তবু তার গীত শুনিতে ধায়" (৬৪০), এবং প্রবলভাবে মন হইতে কৃষ্ণকে দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তথাপি আমরা জানি বাঙালিনীর পক্ষে তাহা সত্যই কঠিন হইবে।

অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রাপ্ত মানের পদে কিছু বেশী কোমল লাবণ্য আছে। তাহার জন্য বিদ্যাপতি ঠাকুর অপেক্ষা কীর্তনীয়া ঠাকুরেরাই বেশী দায়ী। এ বিষয়ে আমাদের শেষ বক্তব্য, দেহপ্রেমের অন্যতম অধ্যায় রূপেই বিদ্যাপতির মান-বিষয়ক পদকে দেখিতে হইবে। এই মান জীবনের জটিল বিক্ষুব্ধ ও অবিচারী প্রান্তর হইতে আসিয়াছে। পরবর্তী বৈষ্ণবকাব্যের প্রেম-কল্পিত ভাবময়ীকে সেখানে প্রত্যাশা না করাই ভাল।

'সৃষ্টির আগুন-জ্বলা' বিরহ

॥ এক ॥

যৌবনের বিরহগান

'কালিদাস সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি এরূপ একটা মত জনসমাজে প্রচলিত আছে'—'প্রাচীন সাহিত্য' পুস্তকে কালিদাস-বিষয়ক সুবিখ্যাত আলোচনার এইরূপ সূত্রপাত করিয়া রবীন্দ্রনাথ অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি এবং অতুলনীয় রচনা-নৈপুণ্যবলে দেখাইয়াছেন, কালিদাস সম্বন্ধে ঐ প্রকার একমুখী ধারণা কিরূপ ভ্রান্ত। কালিদাসের ভোগোন্মত্ততার মধ্যে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে—রবীন্দ্রনাথের ইহাই প্রমাণীকৃত প্রতিপাদ্য।

বিদ্যাপতি-বিষয়ে সাধারণ ধারণা বাংলাদেশে কিন্তু ভিন্ন। বাংলাদেশে তিনি মহাজন কবিরূপে গৃহীত। ভক্তির মহিমা ও প্রেমের বিশুদ্ধ গৌরব তাঁহার পদাবলী হইতে পাওয়া যায়—সাধারণের এই বিশ্বাস। আমরা এতাবধি দীর্ঘ আলোচনায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, নানা সাক্ষ্য-প্রমাণে, বিদ্যাপতি মূলতঃ আধ্যাত্মিক কবি নন, লৌকিক প্রেমের কবিরূপেই তাঁহার মাহাত্ম্য। এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঐ লৌকিক প্রেম বিদ্যাপতির কাব্যে কিরূপ কাব্যোৎকর্ষে ভূষিত।

সুতরাং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে হয়ত এই ধারণা হইয়াছে, আমরা বিদ্যাপতিকে নিতান্তই ইহমুখী কবি মনে করি। সম্ভোগের কবিরূপে পরিচিত (কেবল জনসমাজে নয়, বিদগ্ধ মহলেও) কালিদাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উন্নততর ভাবাদর্শ দর্শন ও উপস্থাপন করিলেন, আর আমরা, যিনি আধ্যাত্মিক কবিরূপে গৃহীত, তাঁহাকে দাঁড় করাইলাম দেহ-গীতিকারের ভূমিকায়! আমাদের অন্যায় সুগভীর। অথচ শেষপর্যন্ত আমাদের বক্তব্য—বিদ্যাপতি দেহে সমাপ্ত নন। তিনি আধ্যাত্মিক কবি।

বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিক কবি, একাংশে। কোন্ অংশে, কিভাবে, তাহা এখন আলোচনা করিয়া লওয়া চলে। তার পূর্বে বিদ্যাপতির প্রেমদৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-বক্তব্যের সারসংক্ষেপ দেওয়া উচিত।

আমাদের বক্তব্য ছিল—(১) বিদ্যাপতি তীব্র ইন্দ্রিয়রাগের কবি, (২) তথাপি ভোগ সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিতৃষ্ণা গভীর হইয়া উঠিয়াছিল, অন্ততঃ শেষজীবনে, এবং তিনি প্রেমের কল্যাণময় গার্হস্থ্যরূপকেও মানিতেন। আমরা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছি, একদিকে ছিল বিদ্যাপতির পদের ইন্দ্রিয়বিলাস, নাগরিক ক্ষুধার তৃপ্তি-খাদ্য সরবরাহ—যেখানে এমনকি রাধাকৃষ্ণ পর্যন্ত রূপজীবী—অন্যদিকে আছে বিদ্যাপতির শিবপার্বতীর মঙ্গলসুন্দর প্রেমাদর্শ, এবং রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের উন্নত উদাত্ত রূপ। এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল—বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিকতাবর্জিত নন, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিকতা লৌকিক প্রেমের উন্নয়নের সৃষ্টি।

বিদ্যাপতির বিরহ-পদ আলোচনা করিতে গিয়া এই সকল বক্তব্য পুনঃ-পর্যালোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে। কারণ বিদ্যাপতিকে আধ্যাত্মিক বলিবার পক্ষে প্রধানতম উপাদান তাঁহার উৎকৃষ্ট বিরহ পদগুলি। সমগ্র বৈষ্ণব-পদাবলীতে বিদ্যাপতির তুল্য মাথুর-বিরহের কবি নাই। পদ-গুলির ভাবের গভীরতা, উত্তালতা, এবং সুরের উদাত্ততা যেকোনো প্রশংসার দাবি করিতে পারে। সেগুলি যেকোনো শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম প্রেমোৎকণ্ঠার প্রকাশক কাব্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা সহজেই প্রশ্ন করিব, ইন্দ্রিয়মুগ্ধ কবি এগুলি লিখিলেন কিভাবে?

বহির্গত প্রভাবের কথা প্রথমেই মনে আসে। একদা বলা হইত, কোনো এক শুভ দিবসে গঙ্গাতীরে রূপমুগ্ধ মৈথিল বিদ্যাপতি এবং ভাবমগ্ন বাঙালী চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিদ্যাপতির যখন চণ্ডীদাস-সায়রে অবগাহন সারিয়া মিথিলায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তিনি ভিন্ন মানুষ, তাঁহার বীণার সুর চড়িয়া উঠিয়া স্বর্গের গান গাহিতেছে। বর্তমানে অবশ্য এই সুন্দর রূপকথাটিকে আমাদের বিশ্বাস গিয়াছে।

ইদানীং এ ব্যাপারে, বিদ্যাপতির জীবনের একটি তথ্যে বড় বেশী বিশ্বাস করা হইতেছে, তাঁহার স্বহস্তলিখিত ভাগবতের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি লিখিত হইয়াছিল কবির আনুমানিক ৪৮ বৎসর বয়সে। পরম শৈব বিদ্যাপতি যখন স্বহস্তে ভাগবতের পুঁথি নকল করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি ভিতরে ভিতরে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং যদি একবার বৈষ্ণব হওয়া যায়, তখন অধ্যাত্ম ভাবোচ্ছ্বাস স্বাভাবিক বস্তু হইয়া পড়ে। বলাবাহুল্য

এই যুক্তিকে আমরা বহুমান দিতে পারি নাই, এবং কেন দিতে পারি নাই তাহাও পূর্বে সবিস্তারে জানাইয়াছি।

তথাপি বিদ্যাপতির বিরহ-পদের আধ্যাত্মিকতা স্বতোজ্জ্বল ;—যত উজ্জ্বল, তত গভীর। এই আধ্যাত্মিকতার উৎস কোথায় ?

নিশ্চয় যুগপ্রভাবের মূল্য আছে এ ব্যাপারে। ঐতিহাসিকগণ জানাইয়াছেন, বিদ্যাপতির পারিপার্শ্বিকে বৈষ্ণবধর্মের সমাদর ছিল না। বিদ্যাপতির নিজ পরিবার, পৃষ্ঠপোষক রাজ-পরিবার—সকলেই ঘোরতর শৈব। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় নগণ্য।

প্রশ্ন এই, অধ্যাত্ম পদ লিখিবার পক্ষে বৈষ্ণব হওয়ার এত কি প্রয়োজন ? বিদ্যাপতি আচার-ধর্মকে মান্য করিতে পারেন, স্বয়ং তিনি স্মৃতিশাস্ত্রকারও বটেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শিবকে কোন্ রূপে দেখিয়াছেন—তাঁহার কালীকে ? ঐ শিবের নিকট কি তিনি অনাথ সন্তানের মতই উপস্থিত হন নাই, অশ্রু ও মিনতি সম্বল করিয়া ? বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে অধ্যাত্মভাবের পরিপন্থীরূপে তাঁহার শৈব ধর্মকে চিন্তা করিব কেন ? বৈষ্ণব না হইয়াও ভক্ত হওয়া যায়।

এবং যখন ভক্ত হওয়া যায়, তখন যদি বৈষ্ণব-বিষয় কাব্যের উপাদান হয়, তাহার মধ্যে ভক্তি-নিবেদনে কুণ্ঠা থাকে না। বিদ্যাপতি কাব্যের বিষয়ের প্রয়োজনে শৃঙ্গাররসের দেবী ও দেবতা রাধাকৃষ্ণকে লইয়াছিলেন, যখন কাম পুড়িয়া প্রেম হইল, তখনো রাধাকৃষ্ণ তাঁহার কাব্যোপজীব্য রহিয়াছেন।

তাছাড়া যুগের বাতাসে তখন ভক্তি ভাসিতেছে। পরবর্তী শ্রীচৈতন্যকে বাদও দিলেও বিদ্যাপতির সন্নিহিত কালে সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারতে যথেষ্ট সংখ্যায় ভক্তি-ধর্মের ও সমন্বয়মার্গের আচার্য পুরুষ জন্মিয়াছেন। কালপরিবেশ হইতে তাঁহারা প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রেম-নিঃশ্বাসে আকাশ সুরভিত হইয়া উঠিয়াছে। এই যুগের কবিরূপে বিদ্যাপতি সাধারণী ভাবাত্মকতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন না।

বিদ্যাপতির মধ্যে প্রথমাবধি একটি দ্বিতীয় সত্তাও ছিল। তাঁহার হঠাৎ-উজ্জ্বল ভক্তিতে আমার বিশ্বাস নাই। জীবনের ভোগরূপকে তিনি

কখনই—উন্মত্ত যৌবনেও—চরম রূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পূর্বে আমি তাঁহাকে ভর্তৃহরি-জাতীয় কবি বলিয়াছি। দেহক্ষুধার কাছে পরাজয় অথচ জীবনের ক্ষুধা-রূপের প্রতি বিদ্বেষ ভর্তৃহরির মনোভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। ভর্তৃহরির মত চরম পন্থায় না হইলেও বিদ্যাপতির একই জাতীয় মন ছিল। ভর্তৃহরি যেমন বৈরাগ্যশতক এবং শৃঙ্গারশতক পাশাপাশি লিখিয়া তাঁহার মনোরূপ নির্ধারণ সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে সেরূপ সুযোগ অবশ্য নাই। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে তাঁহার রাজসভার জীবন, অর্থ-সম্পদে ও লালসায় আত্মাহুতি, এবং শেষজীবনের প্রার্থনা-পদে তাঁহার আকুল নৈরাশ্যের রূপ দেখিয়া। কিন্তু প্রার্থনা তো শেষ জীবনের (?), তাহার দ্বারা প্রথম জীবনে তাঁহার ভোগ-বৈরাগ্য বিষয়ে নিঃসংশয় হই কিভাবে? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, বিদ্যাপতি প্রথমাবধি তাত্ত্বিক, হিন্দু অধ্যাত্মশাস্ত্রে পারদর্শী; সেক্ষেত্রে জীবনের নশ্বরতা-বিষয়ক হিন্দু ধারণায় তিনি বঞ্চিত নন। তাছাড়া তাঁহাকে জীবনে বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। জীবনের প্রতিঘাতে অনেক সময় মানুষের অহং কমে এবং ভক্তি বাড়ে। বিদ্যাপতি যেভাবে প্রার্থনা-পদে ভোগক্লান্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহসা-উদ্ভূত কোন ধারণা না হওয়াই সম্ভব। এবং কীর্তিলতায় তিনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে যে সকল পরিহাস-তীক্ষ্ণ অনেকাংশে সিনিক উক্তি দ্বারা ("বেশ্যার স্তন সন্ন্যাসীর বুকে মর্দিত" ইত্যাদি) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার পরিণত দৃষ্টিকে প্রমাণিত করে। অথচ কীর্তিলতা লিখিবার কালে তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ।

অতএব বিদ্যাপতি অকালপরিণত। এই অকালপরিণতির দৃষ্টান্ত বিরহ-পর্যায় হইতেই দেখান চলে। বিদ্যাপতির ভণিতায় রাজনামাঙ্কিত পদের সংখ্যা দুই শতের অধিক। তার মধ্যে অধিকাংশই তরুণ বয়সের রচনা। শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদই সংখ্যায় বেশী—২০১। এবং শিবসিংহের রাজত্বকাল ১৪১৪ পর্যন্ত ধরিলে বিদ্যাপতির আনুমানিক বয়স তখন ৩৪। সুতরাং শিবসিংহ নামচিহ্নিত পদগুলিকে তাঁহার পূর্ণ যৌবনের পদ বলা যায়। এই সকল তথ্য নির্ভরযোগ্য গবেষণার দ্বারা ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার উপস্থিত করিয়াছেন।

শিবসিংহ পর্যন্ত বিরহ পদগুলির দু'একটি বিশ্লেষণ করা যাক। বলা-বাহুল্য সাধারণভাবে এই আমলের লেখা পদে বর্ণবিলাস ও দেহলীলার প্রাধান্য—এখনকার বিরহপদ বঞ্চিত দেহের ক্রন্দনবিশেষ। কিন্তু তাহারই মধ্যে, দেহপীড়াই কখনো কখনো আত্মার ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে দৃষ্টান্তগুলি আকর্ষণীয়। যেমন ধরা যাক কৃষ্ণের দু'একটি বিরহচিত্র—

"(যেমন) তরুবর লাখ, অথচ লতা কোটি সংখ্যক, তেমনি কত যুবতীই যে আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সকল ফুলের মধু মধুর নহে, ফুলের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে; ভ্রমর যে ফুলের গন্ধ ভুলিতে পারে না, নিদ্রান্তেও যাহার স্মরণ করে, যাহাতে বারবার উড়িয়া আসে, সেই ফুলই সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুন্দরি! এখনও কথা শুন। সকলকে ত্যাগ করিয়া হরি তোমাকেই ইচ্ছা করেন। তোমারই প্রশংসা করেন। হরি তোমারই চিন্তা করেন, তোমার কথাই বলেন, শয্যাতেও তোমাকেই চান। স্বপ্নের মধ্যে হরি তোমারই নাম লইয়া বারবার ওঠেন, আলিঙ্গন দেন, পিছন ফিরিয়া তাকান, কিন্তু তোমার বিহনে তাঁহার শূন্য ক্রোড়। তাঁহার অবস্থা কহা যায় না, নয়নে নীর বহিতে থাকে; যেখানে 'রাই' 'রাই' শব্দ শোনেন, সেখানেই কান দেন।" —(৪২)

পদটিতে স্পষ্ট দুই ভাগ—প্রথমাংশে দূতী একটি ব্যবহারিক তথ্য জ্ঞাপন করিয়াছে, তরুবর লক্ষ কিন্তু লতা কোটিসংখ্যক, অর্থাৎ নাগরের তুলনায় যুবতী অনেক বেশী। সুতরাং যুবতী-লতা রাধা যেন কৃষ্ণকে পরিহার না করেন।

দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত বিরহগ্রস্ত কৃষ্ণের অবস্থা অতি উচ্চাঙ্গের—অশ্রুপূর্ণ নয়ন, অনুক্ষণ রাধার চিন্তা, রাধার গুণগান, একমাত্র রাধাকে কামনা, স্বপ্নে রাধাকে প্রার্থনা, রাধার নাম লইয়া ওঠা, 'রাই' শব্দ শোনামাত্র উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা—বক্তব্যের দিক দিয়া এই পদের শেষাংশের সহিত আধ্যাত্মিক বিরহের কোনো পার্থক্য আছে কি?

কৃষ্ণ-বিরহের অন্য একটি রূপ দেখা যায়:—

"আশাতে গৃহে রাত্রি যাপন করে। সুখে শয্যায় শয়ন-করে না, যখন যাহা যেখানে দেখে তাহাতেই তোর কথা মনে হয়। মালতি! তোর জীবন সফল, তোর বিরহে ভুবন ভ্রমণ করিয়া ভ্রমর বিহ্বল। জাতী কেতকী কত আছে, সকলেরই রস সমান, স্বপ্নেও তাহাদের দেখে না, মধু কি করিয়া পান করিবে? বন উপবন কুঞ্জ কুটীর সব স্থানেই তোকে নিরূপণ করে। তোর বিরহে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রেমের বরূপ।" (৪৩)

না, এখনও নয়, কেবল বিরহ-পীড়িত হওয়া নয়, আধ্যাত্মিক হইতে গেলে বিরহোন্মাদের প্রয়োজন। শিবসিংহের আমলেও বিদ্যাপতি কৃষ্ণকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্ত বচনে, অধ্যাত্মভাবদ্যোতক বিরলবর্ণে কবি শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-পাগল রূপ ফুটাইয়াছেন—

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু খেনে হাস।
কি কহয়ে গদগদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপ-নারায়ণ সাখি॥ (৪৪)

ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্মবিরহের অবস্থা আমাদের জানা নাই। আবার এ চিত্র কৃষ্ণের, যিনি বিরহসৃষ্টি করিতে যত পটু, বিরহ-শিকার হইতে তত নন।

অতঃপর দেখা যাক রাধার অবস্থা। রাধা দুঃখসহকারে বলিতেছেন—

"চিন্তায় চিন্তায় আমার আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।···আজ পবিত্র (আশারূপ) দীপকে নিভাইয়াছি। সখি! আর কত বৃথা আশা দাও, সেই বন্ধুর প্রেম টুটিয়া গিয়াছে—তুমি জানো, দ্বিতীয়তঃ কানাই জানে, আর তৃতীয়তঃ আমার প্রাণই জানে।" (১৪৬)

অকৃত্রিম বেদনা। তবে এ বেদনা সাধারণ প্রেমিকারও হইতে পারে। আর একটি চিত্র উপস্থিত করিতেছি। তার প্রথম দুই ছত্রে ধনযৌবনের নশ্বরত্ব বিষয়ে চিন্তা—

ধন যউবন রস রঙ্গে।
দিন দশ দেখিঅ তরল তরঙ্গে॥ (১৫৩)

তারপর তৃতীকণ্ঠে রাধার যে রূপচিত্র ফুটিল, সে চিত্র নিত্য বিরহিণীর—

সতকিছু হেরএ আশা।
সুমরি সমাগম সু-পহুক পাশা॥

নয়ন তেজএ জলধারা।
ন চেতএ চীর ন পহিরএ হারা। (ঐ)

এখানে আমরা না থামিতে পারি। সদ্য মথুরাপ্রস্থিত কৃষ্ণের জন্ত দয়িতাকণ্ঠে হাহাকার বিদ্যাপতি ফুটাইয়াছেন 'তরুণ যৌবনেই',—

হৃদয় বড় দারুণ রে।
পিয়া বিনু বিহরি ন যায়ে॥ (১৫৮)

রাধা বলিতেছেন—"কাল সন্ধ্যার সময় প্রিয়তম বলিল, মথুরায় যাইব। আমি অভাগিনী জানিলাম না।...হৃদয় অত্যন্ত কঠিন, এখনও প্রিয়-বিরহে বাহির হয় নাই। সখি, রাত্রিতে আমার বল্লভ এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, কোন্ সময় ত্যাগ করিয়া গেল জানিলাম না। চক্রবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল।" রাধার ক্রন্দন পুনশ্চ অপূর্ব বিদারণে উচ্ছ্বসিত হয়—

শূন শেজ হিয় সালয় রে
পিয়া বিনু মরব মোয়ে আজি
বিনতি করঞো সহি লোলিনি রে
মোহি দেহে অগিহর সাজি॥ (১৫৮)

"আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। প্রিয়-বিরহে আজ আমি মরিব। সখি মিনতি করিতেছি, আমার দেহ অগ্নিতে সাজাইয়া দাও।"

অতঃপর আমরা শিবসিংহ-আমলে রচিত রাধা-বিরহের সুবিখ্যাত পদটির উল্লেখ করিতে পারি, যেখানে কাব্যালঙ্কার বেদনা-বহনের কিরূপ সহায়ক হইতে পারে তারই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আছে। পদটির প্রথম চার ছত্র—

সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কি সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন তন বিনু যৌবন
কি যৌবন পিয় দূরে॥ (১৬৩)

উচ্চকণ্ঠে কথা বলার মধ্যে আত্মঘোষণা থাকে। সন্দেহ করা যায় তাহা বেদনার তরঙ্গভঙ্গ, গভীরের মূর্চ্ছিত রূপ নহে। সেই গভীর ভাব-দ্যোতক চিত্রও পাই, সামান্যতম ভাষারেখায় অঙ্কিত বিরহিণীমূর্তি, ভাব-সৌন্দর্যে অতি উচ্চাঙ্গের—

নমিত অলকে বেঢ়লা
মুখ-কমল শোভে।
রাহুক বাহু পরশলা
শশীমণ্ডল লোভে॥
মদন শরে মুরছলী
চির চেতন বালা।
দেখিল সে ধনী হে
বাসি মালতী মালা॥
কলস কুচ লোটাইলী
ঘন সামরি বেণী॥
কনক পরথ সুতলী
জনি কারি নাগিনী॥—(১৬৮)

"নমিত অলকে বেষ্টিত মুখমণ্ডল শোভা পাইতেছে, শশিমণ্ডলের লোভে রাহুর বাহু স্পর্শ করিল। চিরচেতন বালা মদনের শরে মূর্চ্ছিত হইল। সেই ধনীকে দেখিলাম যেন বাসি মালতী-মালার মত পড়িয়া আছে। ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেণী কুচকলসে লুটাইতেছে, যেন স্বর্ণগিরির উপর কৃষ্ণসর্পিণী শয়ান।"

এখনো বিরহিণী নারীর দেহসৌন্দর্য হইতে রূপতৃষ্ণা নিবারণের বাসনা কবির মধ্যে সক্রিয়—এখনো দুঃখ সুন্দর, সুতরাং যথেষ্ট আধ্যাত্মিক নয় মনে হইতে পারে, সেক্ষেত্রে ১৬২ পদে রাধার বক্তব্য হয়ত আমাদের সন্দেহ হরণ করিবে; সেখানে নায়িকা দুঃখভরে বলিতেছে (পদে রাধার নাম নাই),—(১) "স্বপ্নেও যদি তাঁহার সঙ্গে মিলন হইত! কিন্তু সে উপায় নাই কারণ নয়নের নিদ্রা গিয়াছে; (২) তিনি যেন তীর্থ দেখিয়া আমার নামে জলের অঞ্জলি দেন।" যথার্থ পবিত্র দুঃখ এখানে।

এবং ইহারও পরে বিদ্যাপতির 'তরুণ যৌবনের' পদে অধ্যাত্মবিরহের সন্ধান-প্রয়াসে আমরা শেষ দুইটি পদের উল্লেখ করিব—১৬১ ও ১৮৩।

"সজনি! শত পঞ্চাশ (বর্ষ) সে বাঁচিয়া থাকুক, সহস্র রমণীর সঙ্গে রজনী যাপন করুক, আমার তাঁহারই আশা।" (১৬১)

"আমার যত অবিনয় হইল, সকল ক্ষমা করিবে, চিত্তে আমার নাম স্মরণ করিবে। আমার মত অভাগিনী যেন আর কেহ না হয়, তাহার মত প্রভু কামনা করিলে (যেন) মিলে। মাধব আমার সখী সেবা নিবেদন করিল। সহস্র যুবতীর সঙ্গে সুখে রঙ্গে বিলাস করিবে, আমাকে জল অঞ্জলি দিবে। ...যদি শরীর থাকে, কি না ভোগ করে? রমণী শত সংখ্যা মিলিবে।" (১৮৩)

উদ্ধৃত ১৬১ পদ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকেও, ১৮৩ পদের বক্তব্যে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। বিদ্যাপতির রাধিকা এখানে অসাধারণ প্রার্থনা করিয়াছেন। ত্যাগগম্ভীর প্রেমের প্রগাঢ় রূপ। কৃষ্ণ অন্য রমণীতে সুখলাভ করুন, রাধার তাহাতেই সুখ। বাংলাদেশের রাধার মতই বিদ্যাপতির রাধা কথা বলিয়াছেন। বক্তব্যের বিষয়ের দিক দিয়া চণ্ডীদাসের রাধার সঙ্গে বিদ্যাপতির রাধার পার্থক্য সামান্য।

অবশ্য রাধার মধ্যে নিশ্চয় অভিমান আছে, অভিমানভরেই কৃষ্ণ অন্য রমণীতে সুখলাভ করুক, রাধা এইরূপ বলিয়াছেন। রাধার আত্মপ্রবঞ্চনাও আছে,—বিদ্যাপতির রাধা সত্যই চণ্ডীদাসের রাধার মত অপূর্ব ক্ষমায় ও সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য ভালবাসায় বলিতে পারেন নাই,—"তোমার সুখেতে সুখ যে মানি, এ সব দুখ কিছু না গণি",—তবু বিদ্যাপতির রাধা বেদনাভিমান-ভরেও ঐ কথাগুলি যে উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন, তাহার মহিমায় নায়ক পর্যন্ত বিস্মিত। এ পদের শেষে কবি জানাইয়াছেন,—"প্রেয়সীর সংবাদ শুনিয়া হরি বিস্মিত হইলেন।"

সুতরাং বিদ্যাপতি তরুণ যৌবনেও ভাবগম্ভীর বিরহপদ লিখিতে পারেন, উদ্ধৃত পদগুলি হইতে মনে হয় তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। আরো প্রমাণিত হইয়াছে, পদগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বার্থরহিত কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছার প্রকাশক নয়। যেখানে ত্যাগের কথা বলা আছে, তারই মধ্যে দেহভাবনাও বর্তমান। ১৬৮ পদে মদনশরে মূর্চ্ছিতা বালিকার দেহসৌন্দর্য কবি কিরূপ লুব্ধ নয়নে পান করিয়াছেন দেখিয়াছি। "সরসিজ বিনু সর" (১৬৩) ইত্যাদি পদে ব্যাকুলতা যে বহুলাংশে উন্নীত দেহযাতনা তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ১৬১ পদেও যেখানে রাধিকা কৃষ্ণকে অন্য রমণীভোগের স্বাধীনতা দিবার অভিমান করিতেছেন, সেখানেও রাধিকার মূল বলিবার কথা, হে মাধব, আমার যৌবন থাকিতে আমাকে গ্রহণ কর। বিদ্যাপতি এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রিয় অলঙ্কারগুলি পরপর যোজনা করিয়া গিয়াছেন,—"সময় অতীত হইলে (যদি) মেঘ বর্ষণ করে, সে জলধারার কি ফল হইবে? শীত সমাপ্ত হইলে যদি বসন পাই, তাহাতে কি কিছু উপকার হয়? রজনী গেলে প্রদীপ রচনা করিলে, দিবসান্তে ভোজন করিলে (কি ফল হইবে)? যুবতীর যৌবন গেলে প্রীতিতে কান্ত

কি ফল পাইবে? ধন থাকিতে যে ভোগ করে না তাহার মনে পশ্চাত্তাপ হয়। যৌবন জীবন বড় পর, গেলে ফিরিয়া আসে না।"

অর্থাৎ বিদ্যাপতির পদে মিশ্র চৈতন্য—ভোগমুখী ও ভোগোত্তর—কবির যৌবনমধ্যাহ্নেও। বিদ্যাপতিকে অগ্নিময় ক্ষুধাময় জানিয়াছি—তাঁহাকে যদি তারুণ্যলগ্নেও ভাবময়, আত্মময় জানিতে পারি—তবে রীতিমত বিস্মিত হইতে হয়। বিদ্যাপতি বাস্তবিক আমাদের বিস্মিত করিয়াছেন অল্প বয়সে আলোচ্য ধরনের পদগুলি লিখিয়া। এই সকল পদ আছে বলিয়াই আমরা বিদ্যাপতির মধ্যে প্রথমাবধি দ্বিতীয় একটি স্বরূপ অনুমানে সাহসী। এমন হইতে পারে, বয়সের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যাপতির মধ্যে অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ব্যাকুলতার জন্য সহসালব্ধ কোনো নূতন ভাবপ্রেরণার কথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। কবির শ্রেষ্ঠ বিরহ পদগুলি যদি রাজনামাঙ্কিত না হয় (আমরা ইতিমধ্যে দেখিয়াছি অনেকগুলি উত্তম বিরহপদ রাজ-নামাঙ্কিত), তাহার কারণ এই নয় যে, বিদ্যাপতি যৌবনকালে অধ্যাত্ম বিরহের রূপধারণায় অসমর্থ ছিলেন। পরবর্তীকালের বিরহ-পদগুলি (রাজনামাঙ্কিত* না হইলেই যে পরবর্তীকালে রচিত হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই) উৎকৃষ্টতর হওয়ার অন্যান্য কারণ আছে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে কাব্যশক্তির উন্নতি হইতে পারে—সাধারণতঃ উত্তীর্ণ-যৌবন অথচ অনতিপ্রৌঢ় কালই সর্বোত্তম সৃষ্টি-যুগ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে (বিশেষতঃ ভারতীয় মানুষের মনে) ধর্মভাব বৃদ্ধি পায়, এবং—বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ বিরহপদগুলির অধিকাংশ কেবল বাংলা-দেশে প্রাপ্ত পদ—সেগুলির আধ্যাত্মিকতা বঙ্গদেশীয় ভক্তগণের পরিমার্জনার ফল হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ এক কথায় বিদ্যাপতির আনুমানিক অধিক বয়সে রচিত পদের আধ্যাত্মিকতা আসলে কাব্যের উৎকর্ষ—আইডিয়ার ভিন্নত্ব নয়।

বিদ্যাপতির বিরহপদ বিষয়ে আরো একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, যৌবনে রচিত পদগুলিতে যেমন কখনো কখনো উচ্চভাব মেলে, দেহের তৃষ্ণার মধ্যে বিদেহ ব্যাকুলতার সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি বেশী বয়সে রচিত বলিয়া অনুমিত অধ্যাত্ম-বিরহপদের মধ্যেও দেহভাবনার অবস্থিতি

*রাজনামাঙ্কিত বলিতে শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদ পর্যন্ত ধরিয়াছি।

আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। ইহাতে প্রমাণ হয়, বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিকতা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাহা লৌকিক প্রেমেরই উন্নততর বিকাশ। এই বিষয়টি আমরা পরে আরো বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। এখন শেষবারের মত রাজনামাঙ্কিত একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, পদটির ভাবের সমুন্নতি—

সখিগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বিনি অবলম্বনে উঠই ন পারই
অতএ নিবেদলুঁ তোয়॥

মাধব কত পরবোধব তোয়।
দেহ-দীপতি গেল, হার ভার ভেল
জনম গমাওল রোয়॥

অঙ্গুরী বলয়া ভেল, কামে পিন্ধায়ল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখিগণ সাহসে ছোই ন পারই
তন্তুক দোসর দেহা॥

নবমী দশা গেলি দেখি আয়লুঁ চলি
কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতখন গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পএ জানে॥ (১৮৫)

"সখীদের কাঁধে দেহ রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হয়; বিনা অবলম্বনে উঠিতে পারে না,—তাই তোমাকে নিবেদন করিলাম। মাধব তোমাকে কত প্রবোধ দিব (কত বুঝাইব)? তাহার দেহদীপ্তি গেল, হার ভার হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে জন্ম যাইতেছে। দারুণ তোমার নবীন প্রেম, অঙ্গুরী বলয় হইল, কাম তাহাকে পরাইল। সখীরা সাহস করিয়া ছুঁইতে পারে না, সূতার ভার দেহ। কাল রাত্রিশেষে দেখিয়া আসিলাম, নবমী দশা হইয়াছে। আজ এতক্ষণ সমস্ত দিন গেল, ভালমন্দ বিধাতাই জানে।"

॥ দুই ॥

সংস্কৃত কাব্যে বিরহের রূপ

বিদ্যাপতির ঋণ

বহু কবির বহু বেদনা বিদ্যাপতির পদে সঞ্চিত। বেদনাময় বিদ্যাপতি টান দিয়াছেন আরো অনেক বেদনাতুর বিদ্যাপতিকে তাঁহার কাব্যসঙ্গীতে। ফলে মধ্যযুগীয় মৈথিল বিদ্যাপতি মিলিত শোকাশ্রুধারায় পরিণত।

ধরা যাক কালিদাস। বিদ্যাপতি পদে পদে—তাঁহার পদের ঘটে ঘটে—কালিদাস-বারিকে বহন করিয়াছেন। একক প্রভাবরূপে কালিদাসের প্রভাবকেই সর্বাধিক মনে হয়। কিংবা ভবভূতি—তিনিও নিশ্চয় আছেন কোনো না কোনো পরিমাণে। কিংবা জয়দেব—অবশ্যই। ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র? যথেষ্টভাবে। হাল-অমরু কি বাদ যাইবে? কখনো নয়, বিদ্যাপতি হালের পৌত্র এবং অমরুর সন্তান। এবং বিদ্যাপতি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমর্থ প্রতিভা—যে-কোনো গভীর ভাবধারণে পারঙ্গম কবি।

কালিদাস এবং কালিদাস। এবং কালিদাস। কাব্যিক বিরহের সকল উপচার কালিদাসের কাব্যে সংগৃহীত আছে। মেঘদূতের রোমান্টিক উন্মত্ততা, বিক্রমোর্বশীর যথার্থ উন্মত্ততা, রতিবিলাপের দেহের ক্রন্দন এবং অজ-বিলাপে দেহীর ক্রন্দন—কালিদাস শোকবস্তু সঞ্চয়ে সুদক্ষ ছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য, কালিদাস সর্বত্র করুণরসকে বিশুদ্ধ করুণ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। সেখানে সম্ভোগের আশ্রয়ে করুণের অবস্থান। অথবা, যেমন প্রচলিত কথাই আছে, বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, তাই করুণের আমন্ত্রণ। কালিদাস যে সর্বত্র করুণরসকে উচ্ছ্রায়ের করিতে পারেন নাই, তার কারণ, একদিকে ছিল তাঁহার অদম্য সৌন্দর্যস্পৃহা, যে-কোনো অবস্থায় তিনি সৌন্দর্য দেখিবেনই, অতিবড় দুঃখের মধ্যেও, অন্যদিকে ছিল তাঁহার নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ-ক্রন্দনে মাংসলতা—বঞ্চিত পুরুষের 'কোথা কোথা' চীৎকার। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কালিদাসের বিরহ-বিলাপ মূলতঃ পুরুষের,—মেঘদূতের যক্ষ, বিক্রমোর্বশীর পুরূরবা, রঘুবংশের অজ—বিখ্যাত বিলাপকারিগণ সকলেই পুরুষ। ইহার সঙ্গে

অভিজ্ঞান শকুন্তলের দুষ্মন্তও যুক্ত হইতে পারেন। এক্ষেত্রে একজন মাত্র নারীকে দেখা যায়, যে উন্মুক্তভাবে পুরুষের মত আর্তনাদ করিয়াছে, সে হইতেছে রতি। নারী হইলেও রতির কাম-ক্রন্দন কেন সম্ভব তাহা না বলিলেও চলে, কিন্তু কালিদাস যে অন্যত্র কাম-ক্রন্দনকারীদের পুরুষ করিয়াছেন, তাহার পিছনে আছে তাঁহার সঙ্গতিবুদ্ধি—ক্রন্দনের ঐ ভাষা ও ভঙ্গি নারীর পক্ষে কটু ও কুশ্রী—নারীচরিত্রের সৌকুমার্যের পক্ষে একান্ত বিরোধী। সেই জন্য কালিদাসে নারীর বেদনাহত মূর্তি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত রেখাঙ্কিত। কোনো একজন মালবিকা কিংবা শকুন্তলা পূর্বরাগ অধ্যায়ে যে ছটফট করিয়াছে—সে নিতান্ত দেহের জ্বালায়,—কিন্তু সত্যই যখন শকুন্তলা প্রিয়-বিরহিত, তখনকার ছবি কালিদাস নিত্যকালের জন্য আঁকিয়া গিয়াছেন অভূতপূর্ব সংযমে। আর এক চিত্র—দুর্বাসার সম্মুখে শকুন্তলা—রবীন্দ্রনাথ এইভাবে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন—

বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা।
(প্রেমের অভিষেক)—রবীন্দ্রনাথ

অন্যটি মারীচের আশ্রমে শকুন্তলা, কালিদাসের নিজস্ব বর্ণনা উদ্ধৃত করা ছাড়া উপায় নাই, যেহেতু ভাষান্তর অসম্ভব—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥

প্রত্যাখ্যাত উমার রূপও অনুরূপক্ষেত্রে গাঢ়বর্ণ, দীপ্ত ও সংক্ষিপ্তরেখ। কুমারসম্ভব কাব্য মূলতঃ বিরহবেদনার কাব্য নয়, উমা-মহেশ্বরকে অর্ধনারীশ্বর ভাবিতেই কালিদাস অভ্যস্ত, তথাপি সেখানেও বিরহ-পর্যায় আছে—উমার তপস্যা সেই বিরহেরই অপর রূপ। অন্য নারী, পার্থিব নারী, প্রিয়কে পাইয়া হারায়, এবং হারাইয়া কাঁদে, উমা সেখানে নিত্যপ্রকৃতি, শিবের চির-গেহিনী, তাই তপস্যারূপা হইতে শিবকে পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত উমার বিরহ —এবং তাই, বিবাহপূর্ব উমা-তপস্যাও বিরহব্রতের অন্তর্ভুক্ত।

কালিদাসের বিরহের এই সকল মিশ্ররূপে শ্রেষ্ঠ—যেখানে তিনি নারীর বিরহ আঁকিয়াছেন স্বল্পভাবে, কিংবা পুরুষের বিরহকে বিশুদ্ধ হাহাকারে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া গভীর বেদনায় স্থাপন করিয়াছেন। যথা, শকুন্তলা-বিরহিত দুষ্মন্ত। কেবল শকুন্তলাকে হারানোর শোক নয়, দুষ্মন্তের মনে নিজের অন্যায় কর্মের আত্মগ্লানি, অগ্নিবেষ্টিত রাজসভার মধ্যে শান্ত সুন্দর তপোবনের স্মৃতি, পুত্রহীন, উত্তরাধিকারীহীন দুর্বহ জীবনের নৈরাশ্য, সকল জিনিস একত্রে মিশ্রিত হইয়াছিল। এই হইল যথার্থ পুরুষের, রাজপুরুষের বিরহ, কর্তব্যের জালে বেষ্টিত, অথচ ভিতরে অশান্ত অধীর। যে-পুরূরবা উর্বশীকে লইয়া বিহারের জন্য রাজকার্য ছাড়িয়া গন্ধমাদন পর্বতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে একেবারে ক্ষেপিয়া যাওয়া সম্ভব। দুষ্মন্ত অপর-দিকে বিরহের কালে বিশ্ববিস্তার করুণা বোধ করিয়াছেন, শোক তাঁহার হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া সর্বমানবের প্রতি অপূর্ব সমবেদনায় সিক্ত করিয়া তুলিয়াছে; এমনকি শকুন্তলার বিচ্ছেদবেদনা কিছুকালের জন্য দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপাতভাবে ভুলিয়াছেন, যদিও তাঁহার ভিতরের শীর্ণতা কিভাবে দেহকে দগ্ধ করিয়া ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছিল, তাহা ধরা পড়িয়াছিল শকুন্তলার প্রেমের দৃষ্টিতে।

বিদ্যাপতির বিরহ-পদের আলোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ব-পটের উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে। আমরা অবশ্য এখানে রামায়ণ-মহাভারতের শোক-রূপের আলোচনা না করিলেও পারি। সেই দুই যথার্থ মহাকাব্যের ভাবমহিমাকে ক্ষুদ্রপদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। রামায়ণে—সীতাহরণে রামের উন্মত্ততা, সংহারমূর্তি, অরণ্যের বৃক্ষ-পত্রে-লতায় জলে-স্থলে সীতার দর্শন ও সন্ধান, তারপর সীতাবিসর্জন—তারপর সীতার পাতালপ্রস্থান—তারো পরে লক্ষ্মণ-বর্জন; কিংবা মহাভারতের স্ত্রীপর্বে বিধবা ভারতের হাহাকার, যদুবংশ-ধ্বংসে অপহৃতা যদুনারীদের বীভৎস-করুণ উল্লাস কিংবা মহাপ্রস্থান-পথের মহাশ্মশানরাগিণী, এই সকল সুমহৎ ব্যাপারের পর্যালোচনার প্রয়োজন নাই—আমাদের প্রয়োজন কালিদাসে, ভবভূতিতে কিংবা আরো পরের কবিগণে। বিরহ সত্যকার গভীর হইয়াছে ভবভূতিতে, কালিদাসের অপেক্ষাও। ভবভূতি অনেকাংশে অমার্জিত, অসংযত, কিন্তু গভীর ও গম্ভীর। তিনি সৌন্দর্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। তাঁহার সর্বত্র

অনুভূতিতে, বহুক্ষেত্রে অসংবৃত অনুভূতিতে। অনেক স্থলে রূপমূল্য তাহাতে ক্ষীণ। আমরা বৃহত্তর সৌন্দর্যবোধের কথা তুলিয়া বলিব, যদি আপাততঃ রূপের ক্ষুণ্ণতা ভবভূতি ঘটানও, তাহা সত্ত্বেও যদি তিনি প্রবল বেদনায় আমাদের উদ্বেল করিতে পারেন, তবে তাঁহার কাব্য তারি মধ্যে বৃহত্তর সৌন্দর্য-সামঞ্জস্যকে অধিকার করিয়াছে। ভবভূতির ক্ষেত্রে অনুভূতির অনির্বচনীয়তার রূপ এমন যে, সেখানে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া বুঝিতে পারেন না—সুখ না দুঃখ—তাঁহার হৃদয়ে কোন্ অনুভব জাগিয়াছে? এই যদি হয় মিলনের রূপ—বিরহে তো অবস্থা কল্পনাতীত। উত্তরচরিতে সেই কল্পনাতীত বেদনার রূপই দেখিয়াছি—ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছায়। ভবভূতি, আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব, ঈশ্বরাবতার রামচন্দ্র ও তাঁহার পরমাশক্তি সীতাকে এই প্রকার শুদ্ধ অনুভূতির জগতে স্থাপন করিয়া ভাবসামঞ্জস্য উৎকৃষ্টভাবে বজায় রাখিয়াছেন।

সংস্কৃত কাব্যে লৌকিক বিরহ এবং তাহার নানা রূপভেদের আলোচনা আর না করাই ভাল—মহাশ্বেতার তপস্বিনী মূর্তি কিংবা দময়ন্তীর অধীর যন্ত্রণাচ্ছবির আলোচনা স্থগিত থাক—বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়—হাল-অমরুর বিচ্ছেদের কণ্ঠ-পেষণ, জয়দেবের বুভুক্ষা-সুন্দর আর্তনাদ, কিংবা ভাগবতের ভাব-অতল দুঃখ।

বিদ্যাপতির উপর এই পর্যায়ে পূর্বতন কবিদের প্রভাবের কথা গুছাইয়া আনা যাক। প্রথমতঃ আছে কালিদাসের প্রভাব। কৃষ্ণের বিরহের মধ্যে অজবিলাপ এবং রাধার বিরহে রতিবিলাপ বর্তমান। মেঘদূতের কালিদাস-সৃষ্ট বিরহী যক্ষ এবং যক্ষ-কল্পিত বিরহিণী যক্ষপ্রিয়াকেও কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ের ভিতরে পাইব। বিরহক্ষীণা রাধার মূর্তিতে বিরহিণী যক্ষিণী বারবার প্রবেশ করিয়াছে। সে প্রবেশ এত স্পষ্ট যে, বিশেষভাবে বলিয়া দিতে হয় না। বিরহিণী শকুন্তলা ও তাপসী উমার রূপাভাস নানা সময় খুঁজিয়া পাইব রাধার মধ্যে। এবং বিরহের উন্মত্ততা বিষয়ে তাঁহার আকর্ষণের স্পষ্ট প্রমাণ আছে তাঁহার রচিত পুরূরবা-উর্বশী বিষয়ক পদটিতে। বিরহকালে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়বস্তুর দর্শন-বিষয়ক কালিদাসীয় মনঃপ্রকৃতি বিদ্যাপতির মধ্যেও মেলে। পুরূরবা-উর্বশীকে লইয়া রচিত বিদ্যাপতির পদটি উচ্চাঙ্গের না হইলেও উদ্ধৃতিযোগ্য, কবির কালিদাসপ্রীতির প্রমাণরূপে—

"সত্য কথা বলিতেছি, শুকপক্ষীর কুটিল মুখ বেদনার দুঃখ বোঝে না; চক্রবাক বিরহ-বেদনে দগ্ধ, কাতরতা সহ্য করে, অপর কে সত্য কহিবে? হায় হায় আমার উর্বশী কি হইল? তাহাকে খুঁজিতে দৌড়িতেছি, সকলের পায়ে পড়িতেছি, কতবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি। গিরি, নদী, তরুবর, কোকিল, ভ্রমরবর, হরিণ, হস্তী, চন্দ্র, সকলের পায়ে পড়িতেছি, সকলে নির্দয় হইল, কেহ তাহার নাম করে না। মধুর নূপুরের ধ্বনি শুনিয়া তরঙ্গিণীতীরে ভ্রমণ করি, আমার কপালে কলহংসনাদ হইল। নয়নে অশ্রুত্যাগ করি। হায় হায় কেমন করিয়া সে প্রসন্ন হইয়া মিলিবে।" (১৯১)

বিদ্যাপতি কালিদাসকে লইয়াছেন, আবার ত্যাগও করিয়াছেন। তেমনি জয়দেবকে, তেমনি অমরুকে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত বিরহিণী রূপকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যাপতির মধ্যে পাইব, আবার সাধারণতঃ যে রূপ নাই, তাহাও পাইব। বিদ্যাপতির মধ্যে বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মে নায়ক-নায়িকার জন্য তাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি সংস্কৃত সাহিত্যের মতই সুচারু—সজল নলিনীদল, শীতল চন্দনপঙ্ক, স্নিগ্ধ কুঞ্জনিবাসের পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত। অপর পক্ষে বিদ্যাপতির পদে দেহদাহ কোথাও কোথাও এমন আত্মদাহের স্তরে উঠিয়াছে যে, সদামূর্চ্ছিত পুরূরবার চিত্রও যাহার যোগ্য প্রেরণা-উৎস বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বিরহের সেই দিব্য-রূপকে বিদ্যাপতি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? তাহা কি উমা-তপস্যা হইতে কিংবা উত্তরচরিতের সীতা বা রাম-চরিত্র হইত? সংস্কৃত সাহিত্যে শুদ্ধ ও উচ্চ প্রেম—ব্যাকুলতার শ্রেষ্ঠ দুই রূপ—ঐ দুই স্থান হইতে মিলিবে। এবং বিদ্যাপতি ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন না তাহা নয়। তথাপি বিদ্যাপতির বিরহ-পদের অতিশয়িত ভাবানুভূতির যথার্থ উৎস যেন খুঁজিয়া পাইলাম না। একথা সত্য, কালিদাস-ভবভূতি-জয়দেবের কাব্য, কিংবা অমরু ইত্যাদির খণ্ড শ্লোকে ধৃত ভাব বা চিত্রকে বিদ্যাপতি যখন লোকভাষায় নিবেদন করিয়াছেন, তখন ভাষার ধর্মে তাহাতে আবেগবাহুল্য আসিয়াছে। সংস্কৃত সংশ্লেষণী ভাষা; বিশ্লেষণধর্মী দেশীয় ভাষায় সংস্কৃতের ভাববস্তুকে নিবেদন করিলে তাহার রূপ বদলাইয়া যায়—শুধুমাত্র উপযুক্তভাবে ভাষান্তর করিলেই তাহা ঘটে। এবং তাহার ফলে যে আবেগাতিশয্যের সৃষ্টি হয়, অন্যত্র তাহা ক্ষতি করিলেও বিরহপদের পক্ষে গুণের কারণ। কারণ বিরহপদে ভাব-বিহ্বলতাই অপেক্ষিত।

সুতরাং বিদ্যাপতি, যিনি সংস্কৃত হইতে অজস্র বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন,

তিনি ভাষাগুণে অধিকতর গতিময় অনুভূতি বিনা একেবারেই সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। অধিকন্তু আমাদের মনে হয়, বিদ্যাপতি বিরহপর্যায়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রভাবে আসিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে প্রথমেই আমাদের মনে পড়িবে ভাগবতের কথা। ভাগবতে বর্ণিত ব্রজগোপীদের প্রেমার্তির রূপ তিনি পরিবেশন করেন নাই, এমন মনে করার কারণ নাই। কেবল ভাগবতে কেন, অন্যত্রও (ঠিক কোথায় আমাদের জানা নাই) তিনি নিশ্চয় ভক্তিশাস্ত্রাদির মধ্যে অধ্যাত্মবিরহের রূপ দেখিয়াছেন ও নিজ কাব্যে সেই ভক্তিরস ঢালিয়া দিয়াছেন। এ ব্যাপারে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃতের কথা আমাদের মনে আসে। শোনা যায় শ্রীচৈতন্যই প্রথম দাক্ষিণাত্য হইতে কৃষ্ণকর্ণামৃত আনয়ন করেন। কিন্তু ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সদুক্তিকর্ণামৃতের মধ্যে কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত আছে দেখাইয়া বলিতে চাহিয়াছেন, বাংলাদেশে সম্ভবতঃ গ্রন্থটি অপরিচিত ছিল না। সেক্ষেত্রে বিদ্যাপতি গ্রন্থটিকে জানিতে পারেন ও ব্যবহার করিতে পারেন। তাহা যদি সত্য নাও হয়, ভাব-বিরহের নানা রূপ বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রে যেভাবে অঙ্কিত আছে বিদ্যাপতির তাহা না জানিবার কথা নয়, এবং সে সকল স্থান হইতে সঞ্চয়ন করিয়া নিজ কাব্যে যুক্ত করিয়া দেওয়া অবশ্যই সম্ভব।

ইহারও বড় কথা, সেই যুগের চেতনা-ভূমে ভক্তির বিস্তার। কবীর-দাদূ-সুরদাস-তুলসীদাস-মীরাবাঈ, বিদ্যাপতির অব্যবহিত পরে উত্তর-ভারতের মনাকাশকে ভাবচ্ছুরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই যুগপ্রভাব, যাহা বিশেষভাবে কোনো ব্যক্তির সৃষ্ট নয়, অথচ যাহা অনতিক্রম্য, বিদ্যাপতিকেও আক্রমণ করিয়া তাঁহার ভোগোন্মত্ত কবিজীবনে শুদ্ধ প্রেমচৈতন্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

কিন্তু আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা—বিরহপর্যায়কে যথার্থ কাব্যগুণ দিতে হইলে অধ্যাত্ম ভাবসঞ্চারের প্রয়োজন আছে। বিরহ প্রেমিক-প্রেমিকার, তাই শৃঙ্গাররসের মূলাশ্রয়কে আমরা ভুলিতেছি না, কিন্তু বারবার যদি প্রেমিক-প্রেমিকার দেহক্ষুধার কথাটা প্রবল হইয়া ওঠে, তাহা হইলে বিরহপর্যায়কে ক্ষুধাকাব্য বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু এমনকি লৌকিক বিরহও, এক স্তরে, দেহধর্মকে বিস্মৃত হইয়া আত্মার তৃষ্ণায়

অধীর হয়। সেক্ষেত্রে বিরহকে যদি সত্যই কাব্য করিতে হয়, যদি সম্ভোগের উৎকণ্ঠা-পরিচ্ছিন্ন মূল্যদান করিতে হয়—অধ্যাত্ম ভাবারোপ তখন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বিরহের করুণ রসকে যথার্থ কাব্য-পদবাচ্য করিতে গেলে নিতান্ত প্রয়োজন অহৈতুক প্রেম, ত্যাগশুদ্ধ ভালবাসা। অধ্যাত্ম প্রেম সেই অহেতুক ভালবাসার চূড়ান্ত রূপ। বিদ্যাপতি কাব্যের প্রয়োজনেও বিরহ পর্যায়ে আধ্যাত্মিকতা আনিয়াছেন।

॥ তিন ॥

বিরহপদের মূল তিন ভাগ

বিরহপদগুলি এখন বিচার করা চলে। পদগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যাক। (১) বিচ্ছেদে দেহ ও মনোবিকার, এক কথায় দেহের ক্রন্দন; (২) সংস্কৃত সাহিত্যাশ্রিত বিরহিণী (কচিৎ বিরহীর) চিত্র, মূলতঃ আলঙ্কারিক বা কবিপ্রসিদ্ধিগত বর্ণনা; (৩) উদাত্ত উন্নত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিরহ। বিভাগগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এক ভাগের পদ অন্যত্র যাইতে পারে। আমরা কাজ-চলা গোছের একটা মোটামুটি ভাগ করিয়া লইলাম।

(১) বিচ্ছেদে দেহ ও মনোবিকার

বিরহ দুইপ্রকার—সাময়িক ও সামগ্রিক। প্রথম মিলনের পর ও কৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে-কোনো বিচ্ছেদই সাময়িক বিরহের মধ্যে পড়ে। মাথুরের বিরহই সামগ্রিক। বিদ্যাপতি হয়তো মাথুর-বিরহের সামগ্রিকতায় বিশ্বাস করেন নাই, কারণ কৃষ্ণের মথুরা হইতে বৃন্দাবন প্রত্যাগমন-মূলক পদ তাঁহার আছে। সে ধরনের পদ মাত্র কয়েকটি (যথা ৪৭২, ৮৪৯)। সাধারণ ধারণায় কৃষ্ণ কোনোদিন বৃন্দাবনে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করেন নাই। বিদ্যাপতিও সাধারণভাবে এই প্রচলিত ধারণার বাহিরে নন।

সাময়িক অথবা সামগ্রিক—উভয় ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ যন্ত্রণা আছে—দেহের যন্ত্রণা। মিলন দেহে সুখ দিলে, বিচ্ছেদ দেহের অসুখের সৃষ্টি করিবেই। তাই সর্বপ্রকার বিরহের ভিতর দেহক্রন্দন একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। মান-পর্যায়ে এই বিচ্ছেদকষ্টের রূপ দেখিয়াছি। মানে ছিল স্বেচ্ছা-বিচ্ছেদ, অর্থাৎ আত্মনিগ্রহ। সে কারণে কষ্ট অগভীর। সত্যকার বিচ্ছেদে বেদনার খাত গভীরতর হইয়া প্রাণ-নিঙ্ড়ানো অশ্রুধারাকে বহন করে।

বর্তমান অংশে বিচ্ছেদে দেহ ও মনোবিকার আমাদের আলোচ্য। এ ক্ষেত্রে মূলতঃ শরীরার্তিরব। কামমোহিত ক্রৌঞ্চীর ক্রৌঞ্চবিরহে জৈব ক্রন্দনের মতই এখানে তনুজীবনের কাতরোক্তি।

বিদ্যাপতির বহু বিরহপদে আমরা গতানুগতিক দেহের কাঁদুনি পাইয়াছি। সেই সকল পদের মুখ্য বক্তব্য—নায়ক বড় নিষ্ঠুর, আমি একলা আছি, শরীর জ্বলিতেছে, সে আসে না কেন? এই শ্রেণীর পদকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বে একবার বলিয়াছি, বিরহ অপেক্ষা বিদ্যাপতির সাধারণ মিলনপদ উচ্চাঙ্গের, কারণ কেবল খাই খাই চেঁচানির চেয়ে ভোজনপর্ব মোটামুটি শান্তিদায়ক। বলাবাহুল্য বিদ্যাপতির সকল বিরহপদ এইরূপ স্থূল কামনায় পর্যবসিত নয়; আধ্যাত্মিক বিরহপদ বাদ দিলেও অনেক পিপাসাপদ কামনার বলিষ্ঠতায় ঐশ্বর্যশালী। সেখানকার দেহপিপাসা জীবন-পিপাসার অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে সেই মুক্ত তৃষ্ণার প্রকৃতি দেখা যাক।

১৪৭ পদে রাধা অলঙ্কারের সাহায্যে নিজের পরকীয়া প্রেমের সূচনা ও পরিণতির রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রেম তরুবর আপনি বাড়িল, কিছু কারণ ছিল না, শাখা পল্লব কুসুমে ব্যাপ্ত হইল, সৌরভ দশ দিকে গেল।' অর্থাৎ রাধা তাঁহার পরকীয়া প্রেমকে 'অকারণ', 'স্বতঃস্ফূর্ত' ভাবিতেছেন। সাধারণ কুলবতী নারীর পক্ষে প্রেম 'অকারণ' না হওয়াই ভাল। যাহার তেমন অকারণ প্রেম, সে স্বভাবে কুলটা। আমরা রাধাকে দিব্য-পরকীয়া ভাবিয়া স্বস্তি পাইতে চাই। যা হউক, যখন এইরূপ অকারণ প্রেমতরু বাড়িল এবং পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইল, তখন "ফুলের ধর্মে প্রথমেই অলি আসিল, কে ফিরাইয়া দিবে?" ফিরাইয়া দিবার কিছু বিপদ আছে। ফিরাইয়া দিবার জন্য এই পদে রাধাকে "চোরের মায়ের মত মনে মনে

শোক" ও "মুখ চাকিয়া রোদন" করিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় "দেহ, গৃহ, ভাল লাগে না, বাহিরে যেন অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে।"

বিদ্যাপতি কিছু অস্পষ্ট রাখেন নাই। পরকীয়া প্রেমের স্বরূপ, পরকীয়া নারীর মনোভাব তিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন প্রত্যক্ষে। এমন প্রেমে বিচ্ছেদ অসহন। বিদ্যাপতি নায়ক-নায়িকার অবস্থা খোলাখুলি বলিতেছেন—

> "দুইজনেই বিরহদহনে সন্তপ্ত হইল, দুইজনেই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিল।.. চতুরে চতুরে গুপ্ত প্রণয়, পরকে বলাও যায় না। যেমন পুরন্দরের অন্তরে নবচন্দ্র, তেমনি চন্দন যন্ত্রণাদায়ক হয়।...দেহে যেন অগ্নিদাহ উপস্থিত।...দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে তেমনি বিকার ব্যক্ত হইল। কবিকণ্ঠহার বলেন, পুনরায় দর্শনের আশা কাম পুরাইবেন।"—(৪১)

দেহ-মনোবিকার কবি অলজ্জভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, দর্পণ যেমন প্রতিফলিত করে, তেমনি বিকারগ্রস্ত দেহ অন্তরকে ব্যক্ত করিতেছে। কবির বিশ্বাস, উভয়ের এহেন ক্ষুধার শান্তি করিবে কাম। একটি উপমার ব্যঞ্জনা এখানে অতি মারাত্মক, যথা—'পুরন্দরের অন্তরে নবচন্দ্র, তেমনি চন্দন যন্ত্রণাদায়ক'। সম্পাদক মহাশয় ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন —"ইন্দ্র গুরুপত্নী-হরণ করায় সহস্রাক্ষ অথবা সহস্র নবচন্দ্রের রেখার তুল্য রেখায় অঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরে চন্দ্র শীতল না হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল।" ইন্দ্রের গুরুপত্নীগমনের কুশ্রী কথাটা ওঠে কেন? লোচন-চিহ্নগুলি ইন্দ্রের গোপন পাপের লজ্জাচিহ্ন। সেই পাপের লজ্জায় গোপন প্রেমকে কি কবি লাঞ্ছিত করিতে চাহিতেছেন—এখানেও?

শরীরের পীড়ন আর এক স্থানে কবি অনবদ্যভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। উপমার ভাষা কখনো কখনো কাব্যের পক্ষে অনন্য ভাষা। বর্ষার আবির্ভাবে বঞ্চিতা নারী কাতর কণ্ঠে বলিতেছে—"হে সখি, হে সখি, তোকে কি কহিব, নাথ ভাল করিয়া (সম্পূর্ণভাবে) আমাকে ভুলিল। কুসুমের মধু নিজ তনুতে ভ্রমণ করে" (৫০৯)। শেষ পংক্তির বক্তব্য কী প্রবলভাবে সত্য। রস বা সৌন্দর্যের পক্ষে অব্যবহারের মত অবমাননা আর নাই। মধু, আস্বাদনের জন্য—অপরের। সেই মধু যদি কুসুমের নিজ তনুতে সঞ্চারিত হয়—অর্থাৎ নিজ দেহেই আবদ্ধ থাকে—তবে তেমন যন্ত্রণাকর জিনিস কুসুমের পক্ষে অল্পই হয়। কতকগুলি ঐশ্বর্য আছে, ক্ষয়ে যার উল্লাস। সেগুলিকে যতক্ষণ পরিহার না করা যায়—ততক্ষণ অস্থির অধীর দেহমন। কুসুমের মধু কুসুমের

নিকট তেমন বস্তু। নারীর যৌবনমধুও নারীর নিকট তেমনি। আত্মজনের গূঢ় উল্লাসকামনা অলঙ্কারটিতে ফুটিয়াছে।

আলোচ্য অংশে প্রেমের রূপ এই প্রকার। এখানে নায়িকা বিনিদ্র-রজনী যাপন করে, নিদ্রা কামনা করে নায়ককে ভুলিবার জন্য, কিন্তু নিদ্রার ভাগ্য পায় না; বিরক্ত হয় সখীগণের ভ্রান্ত প্রতিষেধ-ব্যবস্থায় ("অবুঝ সখীরা আধি বুঝে না, এক ব্যাধিতে অন্য ঔষধ দেয়", (২২৪), পূর্ব আদরের স্মৃতিতে মথিতচিত্ত হইয়া ওঠে—"কেলির রাত্রিতে কত আদর দেখাইয়াছিল সে সব স্মরণ করিয়া প্রাণ মাতিয়া ওঠে, এখন আমার নাথও নাই, ঘরও নাই, বাহিরে যদি যাই অরসিকে আমার দেহ দেখিবে (৪৫৫)"। নায়িকার সবচেয়ে দুঃখ, নায়ক নিকটে আছে, তবু আসিতেছে না। এই মনোভাবটি বেশ কয়েকটি পদে প্রকাশ পাইয়াছে। 'জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষায় শুকায়ে মরি'—ইহারই যন্ত্রনারূপ কবি সামর্থ্যের সঙ্গে খুলিয়া ধরিয়াছেন—

"যে বিদেশে বাস করে, সে বরং ভাল, পথিকজনের নিকটও তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যায়। প্রিয়তম নিকটে বাস করিয়াও জিজ্ঞাসা করে না।" (১৫২)

"কেহ সুখে নিদ্রা যায়, কেহ দুঃখে জাগিয়া থাকে। আপন আপন ভিন্ন ভিন্ন ভাগ্য। একই নগরে বহুবিধ ব্যবহার। মঞ্জরী ভাঙিয়া ভ্রমর মধুপান করে, তাহা দেখিয়া পথিকের (প্রবাসীর) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। কান্ত কান্তার মনোরথ পূর্ণ করে, বিরহিণী ব্যাকুল হইয়া ঝুরিতেছে।" (১৬৬)

"আমার পতি বিদেশে, আর কানাই একই বাড়ীতে বাস করে। আশায় মুগ্ধ হইয়া মদনকে প্রার্থনা করি, সে যেন যুবতীর প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ না এড়ায়।" (৩৫৮)

"একই নগরে বাস করিয়া প্রভু পরবশ হইল, কেমন করিয়া আমার মন (সাধ) পূর্ণ হইবে"—বলিয়া রাধিকা ৪১৮ পদে কাঁদিয়া উঠিয়াছেন। ঐ পদে রাধার করুণ মনোভাব আরো ফুটিয়াছে বিদেশে গমনোদ্যত মাধবের নিকট আদর কাড়িবার চেষ্টায়—"প্রভুসঙ্গে কামিনী অত্যন্ত সোহাগিনী, যেমন চন্দ্রের নিকট তারা", এবং ব্যাকুল মিনতিতে—"হীরা মণি মাণিক্য একটিও চাহিব না, প্রভু তোমাকেই চাহিব।"

অতঃপর রাধার জন্য শেষ উপায়রূপে বাকি থাকে একদিকে অধিকতর কাতর নিবেদন কিংবা অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তিতে নায়ককে আয়ত্ত করার সঙ্কল্প। লৌকিক নায়িকা অপ্রাকৃত যোগশক্তির দ্বারা তাহার প্রেমিককে

বাঁধিয়া রাখিতে চায়—বলে—"যোগের দ্বারা কারাগারে দিব, অধীন করিয়া রাখিব (৮৭২)। এই কাম-মন্ত্রের শক্তি কতখানি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চণ্ডালিকা নাটকে দেখাইয়াছেন। মন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য শক্তির রূপ বিদ্যাপতিও সংক্ষেপে জানাইয়াছেন—"আমার যোগের এমন তেজ যে শয্যা ছাড়িবে না। রাত্রিতে আরশীতে কাজর পাড়িয়া রাখিব। তাহা দিয়া আঁখি রঞ্জিত করিব। নয়নে নয়নে আনন্দের ঢেউ তুলিব, প্রেম আনিব, আমাকে গলার হার করিবে, হৃদয়মধ্যে রাখিবে।" (ঐ)

রাধার শক্তি কিন্তু প্রেমেরই শক্তি—বহিরঙ্গ যোগশক্তি নয়। তিনি প্রেম বা কামশক্তি দিয়া নায়ককে বাঁধিবার চেষ্টা করেন—

"আমি যদি জানিতাম, তাঁহা হইতে মদনব্যাধি উৎপন্ন হইবে, (তাহা হইলে) বাহুপাশে বাঁধিতাম, অভিমত সাধন করিয়া হাসিতাম। সম্মুখে ফিরিয়া হাসিয়া দেখিতাম—সখি, দেহের যাতনা দূর করিতাম। কন্দর্পের শর সহ্য করিতাম না। আমি অভেদ রহিতাম। প্রসন্ন হইয়া রতিসজ্জা করিতাম, লজ্জা নিবারণ করিয়া কথা কহিতাম, আলিঙ্গন করিয়া গান করিতাম।...অযশকে সুযশ বলিয়া গণনা করিতাম, উপহাস গণিতাম না, মনেও হরিকে পরিহার করিতাম না, মনকে উদাস করিতাম না।" (১৮৭)

উদ্ধৃত অংশে উন্মুক্ত কামনার প্রখর প্রকাশ অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে একই বক্তব্য—

"যাইবার সময় আসিল (তবুও আমার) নিদ্রাভঙ্গ হইল না।...আমার সমান এমন ভাগ্যহীনা রমণী (আর কে আছে?), হস্ত হইতে স্পর্শমণি চলিয়া গেল। যদি আমি জানিতাম প্রভু এমন নিঠুর (তাহা হইলে) কুচকাঞ্চনগিরির সন্ধিস্থলে কৌশলে তাহার করতল বাহুলতা (দিয়া) দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম।"

শরীরের ডোর এক সময় ছিন্ন হয়, তখন থাকে প্রার্থনা আর নিবেদন। আর মিলনের স্বপ্নকামনা। কখনো রাধা বলেন—"মনে হয় যেখানে হরিকে পাই উড়িয়া যাই, তাহাকে প্রেমস্পর্শমণি বুঝিয়া বক্ষে রাখি" (৫২১); কখনো কাতর সরল প্রত্যক্ষ প্রশ্ন তুলিয়া ধরেন—

গগন গরজি ঘন ঘোর
হে সখি, কখন আওত পহু মোর॥
উপজাহি পাঁচবাণ
হে সখি অব ন বাঁচত মোর প্রাণ॥

করব কওন পরকার
হে সখি যৌবন ভেল জীব কাল।

"গগনে ঘনঘোর গর্জন করিতেছে, হে সখি আমার প্রাণনাথ কখন আসিবেন? কন্দর্প উদয় হইলেন, হে সখি, এখন আমার প্রাণ বাঁচিবে না। কি উপায় করিব? হে সখি, যৌবন আমার জীবনের কালস্বরূপ হইল।" (৩৫৮)

এরপর শুধু কামনার কান্না আর 'দাও দাও' প্রার্থনা—তুমি জলধর—জল দাও—

"তুমি শুধু জলধর নও, জলধরের রাজা; আমি চাতক, আমার মাত্র একবিন্দু জলের প্রয়োজন। তোমার আশায় আছি, পান করাও। সময়ে তুমি বর্ষণ কর নাই, এখন আমার অসময় (চরম দশা), হে জলদ, জল দিয়া জীবন রক্ষা কর। তুমি সহস্র দিয়াছ, এখন লাখ সহ্য করিতেছি। যখনই নিজনিধি দেহের নিকট হইতে দূরে গেল, সেইক্ষণেই বহু পিপাসিত রহিলাম। তুমি যাহা দাও, তনু তাহাই পান করে।" (৪৫৯)

অর্থাৎ 'দয়া করহে, দয়া করহে, দয়া করে লও তুলি।'

দয়া মেলে না। ক্ষোভে, নৈরাশ্যে, আত্মগ্লানিতে ও হৃদয়বেদনায় রাধা ভাঙিয়া পড়েন। লৌকিক নায়িকার একই দশা। আলোচনার বর্তমান অংশে লৌকিকার সঙ্গে রাধিকার কোনই পার্থক্য নাই। বিদেশে অপর নারীতে অনুরক্ত নায়ককে নায়িকা পথিক-মারফৎ বলিয়া পাঠায়—"যৌবন বলপূর্বক চলিয়া যায়······অতীত বসন্ত আর আসিবে না; তাঁহার আসিতে অনেক দেরী, কিন্তু জীবন তো দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়" (৫০৪)। নায়িকার এরূপ আক্ষেপের কারণ হয়ত, যেমন একটি পদে, তাহার যৌবনোদয় (৮৯২)। সদ্যযৌবনা নায়িকা অধীর হইয়া বলে—"ফল এখন তরুণ হইল, অঞ্চলের তলে ঢাকা পড়ে না। হে সজনি, প্রভু কাঁচা ছাঁচ দেখিয়া গেল, কাজেই তাহার মন কুজ্‌ঝটিকাবৃত"। একই গৃহবাসী অথচ উদাসীন নায়ক লইয়া নায়িকার সীমাহীন দুঃখ—

"প্রিয়তম (আমাকে) ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া হৃদয়ের অন্তর করিত না, (সে) কে জানে কোন দিকে গেল। ···একই গৃহে বাস করিয়া প্রিয়তম আমাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে না,—আমার পক্ষে সমুদ্র পার। আমার এই দুই তরুণ যৌবন, সে এখন মূর্খে স্পর্শ করিবে।··· তাহার জন্ত লক্ষ হার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ হার গাঁথিলাম, সে এখন মূর্খে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। হে পথিক ভাই, যে দেশে নাথ বাস করেন সংবাদ লইয়াও যাইও। আমার সুখ দুঃখ সেই প্রিয়তমকে কহিও; (বলিও) সুন্দরী অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে।" (১৫৯)

লৌকিকার আর্তিমূলক এই পদ রাধার্তির পদের সঙ্গে ভাবে অভিন্ন। সাধারণ নায়িকাও বিরহে অগ্নিপ্রবেশ করিতে চাহিয়াছে। পদে যদিও বিষয়গত কিছু ত্রুটি আছে (একবার বলা হইয়াছে, প্রিয়তম একই গৃহে বাস করে, পরে বলা হইল, সে বিদেশে), কিন্তু ভাষার ভঙ্গিসৌন্দর্য লক্ষণীয়, —দুই পয়োধরকে বলা হইয়াছে—"দুই তরুণ যৌবন।"

এরপর আমাদের কর্তব্য—রাধার দুঃখময় জীবনের নৈরাশ্যবাণীকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা। এই অংশে সহজেই বুঝিতে পারা যায় কাব্যে গতির অভাব হইবে, কারণ দুঃখকথার মধ্যে একঘেয়েমি আছে। বিদ্যাপতি বহু ভাবে, ভঙ্গিতে ও পরিবেশে রাধার বেদনা-কাহিনী পরিবেশনের চেষ্টা করিলেও বর্ণনার ক্লান্তি সম্পূর্ণ দূর করিতে পারেন নাই। তবে বর্ণনার কিছু সৌন্দর্য এখানে পাওয়া যায়।

সখী কৃষ্ণের নিকট যথারীতি রাধার দুর্গত অবস্থা নিবেদন করিয়াছে। সখী সমব্যথী, রাধাকৃষ্ণের মিলন তাহার পরম কাম্য। সুতরাং সে নানা কথা কহিবে। সেগুলির বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সখীর মূল কথা —প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বামীর নিকট হইতে রাধাকে আনিয়াছি; সে স্বামীর নিকট সুখেই ছিল, হায়, এখন তুমি প্রত্যাখ্যান করিতেছ। সে দুই কুলই হারাইল। পুরুষের নিষ্ঠুর স্বভাবের বিরুদ্ধে দূতীর তিরস্কার আছে। সখী-বচনের দু'এক ছত্র তুলিতেছি—

"তোমার রূপে তাহার লোভ জন্মিল, দেহের কথা সে ভুলিয়া গেল, (চিত্তের) স্থিরতা হারাইল"। (১৪৪)

"কেবল দেহ ও নেহ রহিল"।—(১৮৬)

"কিন্তু সহস্র সুবর্ণ দিলেও কি সেই রস ও সেই বয়স পাইবে?"—(৫৫২)

রাধারও একই দুঃখ। "কুলকামিনী হইয়া কুলটা হইলাম, ভবিষ্যৎ গণনা করিলাম না" (৪৭০)। রাধা তাই দোষের মূল কারণ নিজ রূপের নিন্দা করিয়াছেন; বিধাতার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন—"যাহাকে তুমি চতুর কর নাই, তাহাকে রূপ দিলে কেন? এই রূপই আমার বৈরী হইল। কেবল লোকের কুদৃষ্টিই সার" (৫১১)। অর্থাৎ 'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী'। কেবল রূপের নয়, রাধা প্রেমেরও নিন্দা করেন—"কে বলে প্রেম অমৃতের ধারাস্বরূপ? অনুভবে বুঝিলাম উহা ভীষণ অঙ্গারতুল্য।

মতন ভয়ানক মারক দেখিতেছি" (৩৬৬)। রাধা নায়ককে গঞ্জনা দেন তাঁহার লাম্পট্যের এবং অব্যবস্থিতচিত্ততার

"সজনি, একই নগরে বাস করিয়া মাধব পরনারীর বশীভূত হইল, আমি এরূপ কলাবতী রমণী, (আমার) গুণগৌরব দূর হইল"। (৪৬১)

"প্রথমে একেবারে গলার মালা করিলে, বলিলে, তুমিই আমার জীবনের আধার। যেমন করিয়া ছলনাকারী হাতের হেম উড়াইয়া লয়, তেমনি করিয়া তুমি সহজা প্রেম নষ্ট করিলে।" (৫১২)

"কুন্দ কুসুমে পূর্ণ শয্যা সুশোভিত, চন্দ্রকিরণে রাত্রি উজ্জ্বল। এক তিলের জন্য সুপ্রভুর সমাগম পাইলাম, মাস, বর্ষ শান্তি হইল।......এক ভ্রমর ভ্রমণ করিয়া বহু কুসুম রমণ করে, কোথায় কেহ বাধা দেয় না, বহুবল্লভের সঙ্গে স্নেহ বাড়াইলাম, আমারই কেবল অপরাধ বাড়িল।" (৫১৭ খ)

"কাননে কোটি কুসুমের পরিমল, ভ্রমর উপভোগ করিতে জানে। সহস্র গোপীর মুখমধু কানাই পান করে।..... গোবিন্দ গোপ মূর্খ, তাহার অন্তরও কালো, মধুকরের মতন তাহার ব্যবহার"। (৫৬০)

কৃষ্ণ মধুকরস্বভাব, সকল কুসুমেই আসক্তি। তথাপি রাধার প্রতি কৃষ্ণের একটু বিশেষ টান ছিল। সেই আকর্ষণের কারণ সম্বন্ধে রাধার কোনো মোহ নাই। রাধা জানেন তাঁহার নবযৌবনের অতিরিক্ত সৌন্দর্যই তাহার মূলে—

"যৌবন রতন দু'চারি দিন ছিল, তখন মুরারি আদর করিল। এখন কুসুমে রস নাই, গন্ধও নাই, যে সরোবরে জল নাই ; কে তাহাকে পুছে ?"—(৪৫৫)

"সে প্রথমে বলিল 'তুমিই প্রাণ', শেষে পথের পরিচয়টাও রাখে না। যতদিন যৌবন ততদিন তাহার আগ্রহ।...সে (ভ্রমর) বসিয়া কত মনোযোগ দেয়, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মধুপান করে। উড়িবার সময় ভর দেয় না (জানিতেও দেয় না)। সম্ভাষণও করে না। অগ্রে যে কুসুম আছে, তাহাতেই অভিলাষ।" (৪৬৮)

রাধিকা জানেন, প্রেম নিত্য নয়, যতদিন যৌবন ততদিনই প্রেম। রাধা নিজের অভিজ্ঞতা খুলিয়া বলিতে দ্বিধা করেন না—"যখন নব অনুরাগ জন্মিল, তখন তুমি মনে করিতে, সম্মুখে প্রাণ ধরি (উৎসর্গ করি)। এখন দিনে দিনে প্রেম পুরাতন হইল, উপভুক্ত কুসুমের সৌরভ অন্যরকম মনে হয়" (১৬৫)। কখনো রাধিকা নিজের বিপরীত ভাগ্যকে গঞ্জনা দেন, তাঁহার বরাতে গুণ-সাগর গুণহীন হইয়া যাইতেছে। কখনো বা ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—"আমি

কি সাঁঝের একেশ্বরী তারা অথবা ভাদ্র-চতুর্থীর চাঁদ? এ দুইয়ের মধ্যে আমার মুখ কোন্‌টি যে, প্রভু হাসিয়া দেখে না?" (১৫১)। পরম বেদনার সঙ্গে বলেন, আজ "(আশারূপ) পবিত্র দীপকে নিভাইয়াছি"। দীপহীন অন্ধকারের ভিতর হইতে করুণ কণ্ঠে দয়িতের গুণের বন্দনা করেন—তুমি মহৎ, তাই তোমার শরণ লইয়াছি। তুমি সাগরের মত গভীর, ভুবনে ভুবনে তোমার যশ (১৪৯), তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ ভুলিয়া যাইও না, তোমার বচন অমূল্য, তোমার হৃদয় অগাধ (৬৬৬), তুমি সুপুরুষ, সুনাগর, গুণশ্রেষ্ঠ (৪৭১)। পরিশেষে রাধা আক্ষেপের সঙ্গে ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন —"আমার সহিত ভাল করিয়া কথা বলিতেছ না, আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলে, মন ব্যাকুল হইল। যখন পরের মঙ্গলে তুমি উদাসীন, যুগ কি পাল্টাইয়া গেল?" (৪৭১)

ইহাতেও কিছু হয় না। অতএব আত্মপ্রবঞ্চনাই শেষ শরণ। বিদেশে নায়কের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে আড়ম্বরে উপদেশ দিতে বসেন তিনি—"যখন দক্ষিণ পবন ধীরে বহিবে, মঞ্জরী হইতে মকরন্দ ঝরিবে, তখনই মনকে দমন করিবে, চক্ষুকে নিবারণ করিবে।...মধুকর যদি রব করে, যদি পিক পঞ্চম গায়, তখনি...কান বন্ধ করিয়া থাকিবে। পরস্ত্রীকে তিক্ত মানিবে, ধৈর্য দ্বারা কন্দর্পকে জয় করিবে।"—(১৫৭)

আর প্রিয়তমের বিদায়পথের সৌন্দর্যস্বপ্নে হৃদয় ভরিয়া সান্ত্বনা পাইতে চান—

যে পথে গেল মোর প্রাণ বল্লভ
সে পথ বলিহারি যাও।
চাঁপা নাগেশ্বর কি ফুল ফুটল
কোকিল ঘন করে রাও॥
একূলে গঙ্গা ওকূলে যমুনা
মাঝে চন্দন কোক।
যে কানুর গুণে হিয়া জরজর
সে কানু সে দিল শোক॥—১৮৯
(পদটি বিদ্যাপতির॥)

বিদ্যাপতির এই স্বপ্ন-নয়নে কোনো বাঙালী কবি অবশ্যই কল্পনার নীড় বাঁধিয়াছেন।

বিরহের দেহপিপাসা-মূলক এই পদগুলির বাস্তবিকতার প্রশংসা করিয়াছি। ইহার বাসনার সত্যতা জীবনসত্যের প্রকাশক। কিন্তু পদগুলি বিষয়ে একটি আপত্তি উঠিতে পারে,—এই বাসনারূপ প্রকাশিত হইয়াছে মূলতঃ রাধাকণ্ঠে। নারীর বাসনার পরিমাণ পুরুষের অপেক্ষা কম না বেশী সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু একথা অবশ্য-স্বীকার্য প্রকাশের ক্ষেত্রে নারী অনেক বেশী সংবৃত, লজ্জার একটা আবরণ তাহার কামনাকে মধুর ও রহস্যময় করিয়া তোলে। রাধার ক্ষেত্রে বর্তমানে সেই লজ্জাবরণের অভাব কি দেখিয়াছি? অন্ততঃ একথা সত্য, দেহকামনার প্রকাশ যাঁহার মুখে বেশী জানাইত, সেই কৃষ্ণ এই অংশে নিতান্ত নীরব। কৃষ্ণ নির্বাক থাকার জন্য আপেক্ষিকভাবে রাধাকে অসংকুচিতা দেখাইয়াছে।

এ ব্যাপারে কবির অসুবিধা আমাদের বোঝা উচিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহ মূলতঃ রাধার,—কৃষ্ণের নয়। অর্থাৎ নারীর, পুরুষের নয়। যেখানে পুরুষের বিরহ, যেমন কালিদাসে (পূর্বেই বলিয়াছি কালিদাসের বিরহ মূলতঃ পুরুষের,—মেঘদূতে যক্ষের, রঘুবংশে অজের, বিক্রমোর্বশীতে পুরুরবার, অভিজ্ঞান শকুন্তলে দুষ্মন্তের), সেখানে পুরুষের কান্নায় ইন্দ্রিয়ভাবনার মিশ্রণ অস্বাভাবিক হয় না। কিন্তু নারীর বিরহে অতিরিক্ত বাসনার প্রবেশ ঈষৎ অসঙ্গত ঠেকে। বিদ্যাপতি মিলন-বঞ্চনাকে বিরহ-দুঃখের মূল কারণরূপে ভাবিয়াছেন এবং যেহেতু বৈষ্ণব পদাবলীতে নারীর বিরহ মুখ্য, সে কারণে উপায়ান্তরহীন হইয়া ঐ বিরহের দেহপীড়াকে নারীর উপর চাপাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই পুরুষ কৃষ্ণকে বিরহী করিতে পারেন না। কারণ কৃষ্ণ, বৈষ্ণব ঐতিহ্যে, বহুবল্লভ নায়ক, তিনি যথেচ্ছ বহুগামী। সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে নিদারুণ বিরহী করিলে আন্তরিকতার দোষ ঘটিত। কালিদাসেও নায়ক বহুবল্লভ, কিন্তু কবি, প্রেমের যে অবস্থানটি আমাদের লক্ষ্যগোচর করিয়াছেন, সেই পরিবেশে নায়ক নবপ্রেমে অধীর, অর্থাৎ সেইকালে নিষ্ঠাবান-প্রেমিক। সুতরাং তাহার বিরহ বিশ্বাসযোগ্য হয়। অপরপক্ষে বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের প্রয়োজনে, বৈষ্ণবকাব্যের প্রয়োজনেও বটে, কৃষ্ণকে যখন তখন অবিশ্বাসী হইয়া রাধার যাতনা বাড়াইয়া তাঁহার প্রেমের উৎকর্ষ ঘটাইতে হইবে। তাই নায়ক কৃষ্ণ কখনো অপরিতৃপ্ত থাকেন না, মানপর্যায়ে মানিনী রাধিকার বিরুদ্ধে ইহার পুরুষাধিকারের হুঙ্কার শুনিয়াছি।

বিরহী কৃষ্ণের তথাপি যে দুই একটি চিত্র কবি না আঁকিয়া পারেন নাই,

বিচিত্র এই, সেই পদগুলিতে শরীর-ভাবনার চিহ্নমাত্র নাই। সেখানে সত্যই অধ্যাত্ম বিরহ। সেই বিরহের স্বরূপ আমরা পরে আলোচনা করিব।

(২) বিরহিণীর রূপচিত্র : আলঙ্কারিক বর্ণনা

এই অংশে বিরহিণী নায়িকার সুন্দর কিছু চিত্র পাইব। বর্ণনার ভাষা ও ভঙ্গি বিশেষভাবে আলঙ্কারিক। সংস্কৃত কাব্যের ভাব ও চিত্র-প্রেরণা এইখানে সর্বাধিক কার্যকরী। চিত্রগুলি দেখিয়া বারবার কালিদাসকে স্মরণ হইবে। সংস্কৃত ঐতিহ্যাশ্রয়ে চিত্ররচনার ও অলঙ্কারযোজনার ক্ষমতা বিদ্যাপতি এখানে যথেষ্ট দেখাইয়াছেন।

প্রথমে বিরহক্ষীণার কয়েকটি চিত্র নির্বাচন করিতেছি,—

"করতললীন মুখচন্দ্র শোভা পাইতেছে, অভিনব অরবিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে। অহর্নিশ অশ্রুধারা ঝরিতেছে, যেন খঞ্জন মুক্তাহার গিলিয়া উদ্‌গিরণ করিতেছে।"—১৭০

"তাহার অঙ্গে মলিন বসন ও করতলে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহিতেছে। বক্ষে কৃষ্ণ বেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে কৃষ্ণ সর্পিণী রহিয়াছে। কোনো সখী নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা দেখে, কেহ নলিনীদল বাতাস করে। কেহ বলে হরি আসিল; তখনই তোমার নাম স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে।"—২৬৫

"যামিনী জাগিতে এক একটি প্রহর এক এক যুগ মনে হয়। সন্ধ্যায় শশী উদিত হইলে ধরণীতলে মূর্ছিত হইয়া পড়ে।"—৫৩১*

"ত্রিবলী যেন গঙ্গা হইল, যেন বৃদ্ধি পাইয়া উপচিয়া পড়িল। আশাসমূহ দ্রুত পলায়ন করিল—সোনার পাহাড় (বক্ষস্থল) যেন পুড়াইয়া গেল। মাধব, সুন্দরীর নয়নজল যেন পীন পয়োধরে নির্ঝর রচনা করিল।"—৫৪১

*পহর পহর যুগ যামিনী
যামিনী জগইতে রে।
মুরছি পরএ মহীমাঝ
সাঁঝ শশী উগইতে রে॥

"নব কিশলয় শয়ন ভুতলি
নব বুঝ দিবস রাতি।
চাঁদ সুরুজ বিশেখ ন জানএ
চাননে মানএ শাতি॥
বিরহ অনল মনে অনুভব
পরকে কহএ ন জাই।
দিবসে দিবসে খিনি বাঢী
চাঁদ অবথাএ জাই॥" (৫৫০)
(চাননে—চন্দনে; শাতি—শান্তি)

কয়েকটি মলিন বিষাদান্ত চিত্র দেখিলাম। বিরহের এই প্রকার অনেক ছবি বিদ্যাপতির পদে আছে। বিদ্যাপতির বিরহিণী বালা সংস্কৃত কাব্যের রীতিতে নাথের আগমনসময় নখে গণনা করিয়া নখ ক্ষয় করিয়া ফেলে, এবং সে মলয় পবনকে অগ্নি এবং হৃদয়ের হারকে সর্প বলিয়া বোধ করে (১৪৫); সে প্রশ্ন করে,—চন্দন, অগুরু, মৃগমদ, কুঙ্কুম ও চন্দ্রকে শীতল কে বলে? (১৬৪)। দিবসে চন্দ্রলেখার মত মলিন বলিয়া সে প্রতীয়মান হয় (১৭৭); চন্দনের সে নিন্দা করে, ভূষণ পরিহার করে, অগ্নি মনে করে চন্দ্রকে (১৮৪); হিমসম চন্দন প্রলেপ দিলেও তাহার আধি ভাল হয় না, কারণ ব্যাধি হইল ভিতরে, ঔষধ দেওয়া হইল উপরে (৫১৪); বড় বেদনায় শিবপূজা করিতে থাকে,—"দুই অঞ্জলি ভরিয়া দুই শিব পূজা করিতেছি। কহিতেছি, হে কামদহন শিব, আমার প্রাণ রক্ষা কর।" (৫৪৫)

প্রেমের জগতে অলঙ্কার যে অলঙ্কার থাকে না, বাস্তবে রূপান্তরিত হয়, এখানে তারই প্রমাণ। রাধা পরম দুঃখে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকে কোণাকুণি হাত চাপিয়া আছেন, তাঁহার দুই করতলে দুই কুচ আবৃত। কবিকল্পনার দুই কুচ-শম্ভু রাধার নিজের কাছেও যেন দুই শিবে পরিণত। সেই শিবদ্বয়ের কাছে রাধাকর্তৃক কামদহনের জন্য প্রার্থনা। এইরূপ আলঙ্কারিক বাস্তবতা অন্যত্রও আছে—রাধা তাঁহার প্রিয়তমের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কারণ তিনি রাধার কুচশম্ভু স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কামাবেগে কুচস্পর্শ করিয়া নায়কের চাটু প্রতিজ্ঞাকে রাধা দুঃখের দিনে আলঙ্কারিক কবিদের সহায়তায় শিবস্পর্শযুক্ত প্রতিজ্ঞা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। সুন্দর অতিশয়োক্তি অন্ত এক পদে পাইয়াছি,—রাধা এত ক্ষীণ যে, সখীরা আঁচল

দিয়া ঢাকিয়া রাখে, পাছে আপনার নিঃশ্বাসে উড়িয়া যায় (৫৪৯)। বিরহ-ক্ষীণা রাধার আরো একটি সুন্দর কথাচিত্র পাইতেছি, সেটি উদ্ধৃতিযোগ্য—

"নয়নের নীরে নদী বহিতেছে, তাহার তীরে পড়িয়া আছে। সকল সময় অমজ্ঞান। এক জিজ্ঞাসা করিলে অন্ত কহে! মাধব, রাধা দিনে দিনে (কৃষ্ণপক্ষের) চতুর্দশীর চন্দ্র অপেক্ষাও ক্ষীণ হইল। কোনো সখী উপেক্ষা করিয়া আছে, কেহ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছে। কেহ নিঃশ্বাস আশা করিতেছে, আমি তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিলাম।" (৫৪২)

বিরহে মৃত্যুচ্ছায়া। রাধার ক্ষীণ দেহাঙ্গ, জীবনদীপের নিশ্চিত ক্রম-নির্বাণ; তাঁহার ক্ষীয়মাণ প্রাণলক্ষণ-সন্ধানে সখীদের ব্যাকুলতা, সকলই বৃথা বুঝিয়া আপাত উপেক্ষায় কোনো সখীর মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকা এবং শেষ চেষ্টারূপে একজনের কৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আসা; চিত্রটি বাস্তব, কল্পনায় ও সত্যে।

যে-সকল চিত্রের উল্লেখ করিলাম, সেগুলি রচনাংশে সুন্দর, বলিতে লোভ হয়, সৌন্দর্যসৃষ্টিই ছিল কবির অভিপ্রায়, বেদনাকে এক্ষেত্রে উপাদানরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু চরিত্রগুলির নিবিড় দুঃখমূর্তি সে অনুদার মন্তব্য নিবারণ করিবে। এখানে দুঃখ-গভীরতাই চিত্র দ্বারা উন্মোচিত। এই সকল চিত্রাঙ্কিত দুঃখ-রূপকেই উন্নততর রূপে পাইব আধ্যাত্মিক বিরহে। উল্লিখিত পদগুলিকেও অংশবিশেষে আধ্যাত্মিক বলা যায় না এমন নয়। অর্থাৎ এখানে সেই ধরনের আধ্যাত্মিকতা, যাহাকে মানবিক প্রেম অনুভূতিক্ষণে অধিকার করে। এই পদগুলিকে আধ্যাত্মিক বিরহাংশে আলোচনা না করিবার কারণ সংস্কৃত কাব্যচিত্রের সঙ্গে এগুলির বিষয়-ঐক্য। সেইজন্যই এই পদগুলিকে পৃথক করিয়াছি।

কিন্তু এমন অনেক বিরহচিত্র মেলে যেখানে সত্যই কিন্তু রূপাকাঙ্ক্ষাতেই কবি আবদ্ধ, দুঃখকে সুন্দর করিয়া দেখার সজ্ঞান চেষ্টা সেখানে আছে। কবি এই অবস্থায় আলঙ্কারিকতার আবর্তে পড়িয়াছেন। তাহাকে অতিক্রমও করিয়াছেন। 'কুসুম নিজের মধু নিজেই পান করিল' (২৬৬),—বঞ্চিতা নারী সম্বন্ধে এই অলঙ্কার দুঃখপ্রকাশের নিকটতম ভাষা। কবি যেখানে চন্দ্র-হরিণ, কমল-পঙ্ক প্রভৃতি অবিচ্ছেদ্য আসক্তির আলঙ্কারিক দৃষ্টান্ত দেন (১৬৯), সেখানে গতানুগতিকতা স্পর্শ করিলেও এবং অশ্রু-গলিত কজ্জলে রাধাবক্ষ রঞ্জিত দেখিয়া

মৃগমদে স্বর্ণশম্ভু পূজার কথা কবির মনে পড়ায় (৫৪১) সেই সুন্দর এক-ঘেয়েমিতে আমরা ঈষৎ হতাশ বোধ করিলেও অন্য বহুক্ষেত্রে কবির রূপ-দক্ষতায় চমৎকৃত হইতে বাধ্য হই। অবশ্য আমরা জানি, যেখানে নায়িকা মুখশোভা চাঁদকে, হরিণকে লোচনলীলা, চামরীকে কেশপাশ, দাড়িম্বকে দন্তশোভা, বান্ধুলীকে অধররুচি, সৌদামিনীকে দেহরুচি, অনঙ্গকে ভ্রূভঙ্গধনু এবং কোকিলকে কণ্ঠস্বর ফিরাইয়া দিয়া কেবল মলিন দেহ ও অগাধ প্রীতি লইয়া বাঁচিয়া আছে (১৮৬), সেখানে বিদ্যাপতি কালিদাসের সমর্থ অনুকারী-মাত্র, এবং এই একটি (বা সামান্য একাধিক) বিচ্ছিন্ন পদে প্রকৃতি ও প্রাণীকে রূপ-প্রত্যর্পণের দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া ইহাকে প্রকৃতি, জীব ও মানবের মধ্যে একই প্রাণানুভূতিমূলক কালিদাসীয় দর্শনের নব-উপস্থাপনা বলা শক্ত হইবে, তথাপি কাব্যের এই অংশেও বিদ্যাপতির সৌন্দর্যদৃষ্টি নিজস্বতাশূন্য নয়। সেই নিজস্বতা রূপচিত্রের মধ্যে অনুভূতির তীব্রতা সঞ্চারিত করার মধ্যে আসিয়াছে, বিদ্যাপতি আপনার একান্ত দৃষ্টিও যুক্ত করিয়াছেন অনেক সময়। এখনো মনোহারী গতানুগতিকতার দৃষ্টান্ত শেষ হয় নাই। রাধারূপের মহিমা বুঝাইতে কবি অলঙ্কারের মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন—"পূর্ণিমার চন্দ্র যাহার মুখমণ্ডল সেবা করে, নব অরবিন্দ যাহার নয়নের নির্মঞ্ছন মাত্র, অধরের তুলনায় বান্ধুলী ফুলের স্তবকও নির্মাল্য,······মদনের ধনু যাহার ভ্রূযুগলের (অনুচর), কোকিলের পঞ্চম গান যাহার সুমধুর কণ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী" (১৪৫)—এখানে পাইতেছি আনন্দ-দায়ক অতিশয়োক্তির দৃষ্টান্ত। কিন্তু যখন ৫৬৭ পদে দুঃখের এই আলঙ্কারিক বর্ণনা দেখি—"যাহার লাগিয়া চন্দন বিষ হইতেও তীব্র হইল, যাহার জন্য চন্দ্র অগ্নি হইল, যাহার লাগিয়া দক্ষিণ পবন শর হইল, যাহার লাগিয়া মদন বৈরী হইল, সেই কানাই কতদিন পরে তোর অতিথি, হাসিয়া দেখিস না? প্রেম সুধা জানিয়া হৃদয়ের হার বলপূর্বক যেন ঠেলিস না। রোদন করিয়া অশ্রুতে চক্ষু আতুর হইল। রজনীর যাম যুগের (তুল্য) গেল। মুক্ত চিকুর (ও) বস্ত্র সংবরণ করিতিস না, দেহে হার ভার হইয়াছিল" (৫৬৭) ইত্যাদি—তখন বুঝিতে পারি ক্লেশতীব্রতা বুঝাইতে নিরলঙ্কার ভাষার মত অলঙ্কৃত ভাষাও সমভাবে উপযোগী। আলঙ্কারিক বিরহ-চিত্রের আলোচনা আর বিস্তারিত করিব না, দুঃখকে কোন্ রূপের রসে ধুইয়া অবিনাশিতা দেওয়া যায় তার তিনটি দৃষ্টান্ত তুলিব। আলঙ্কারিক চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য পরে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। সহজেই বোঝা যায়, এই চিত্রগুলিতে

বিদ্যাপতি ঐতিহ্য-প্রভাবিত, তথাপি দর্শনে ও অঙ্কনে তাঁহার প্রতিভা কিরূপ দ্যুতিময়।—

"নয়নের অশ্রুতে তটিনী নির্মিত, কমলমুখী তাহাতে স্নান করিতেছে। মাধব, তোমার রাই যদি একবার তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া পান করে, বাঁচিবে। মুক্তকবরী উলটাইয়া বক্ষে পড়িতেছে, যেন স্বর্ণগিরিতে চামর ধরিয়াছে। তোমার গুণ গণনা করিতে তাহার নিদ্রা আসে না, মুখ নীচু করিয়া সে কত কাঁদে।"—(১৪৭)

"মাধব, রাইকে দেখিয়া আসিলাম। তাহার বিরহ-বিপত্তি তাহাকে কথা বলিতে দিতেছে না, সে শুধু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মরকত-নির্মিত হর্ম্যতলে সে বিরহক্ষীণ দেহে শুইয়াছিল, মদন যেন নিকষ পাষাণে কনক রেখা কষিয়াছে। তাহার বদনমণ্ডল ভূতলে লুটাইতেছে, তাহাতে তাহার অধিক শোভা, আমার বোধ হইল যেন রাহুর ভয়ে শশী মাটিতে পড়িয়াছে।"—(১৪৪)

"কিশলয়ের মতন করে মুখ রাখিয়া গগনমণ্ডল দেখিতেছে, যেন কোনো বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষা করিয়া কমল অরুণে শয়ন করিল। তোমার উজ্জ্বল নয়ন নবমেঘের মত বারিবর্ষণ করিতেছে, যেন চন্দ্রকরে কবলিত হইয়া চকোর অমৃত উদ্গিরণ করিতেছে। কমলবদনি! বল কোন পুরুষের জন্য শিবকে আরাধনা করিতেছ, ও ক্ষীণ হইতেছ? তোমার উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি, যেন মদনদেবের শ্রেষ্ঠ মায়ায় কনকগিরির উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল। তাহাতে আবার বিরহে মলিনা রমণীর বেণী পালটিয়া পড়িয়াছে, যেন কাল-নাগিনী নিঃশ্বাস সমীরণ পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।" (২৪৬)

আলঙ্কারিক বিরহের আলোচনায় আরো একটি আলোচ্য বিষয় আছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি পদে শিবের উল্লেখ পাইয়াছি—সে পদগুলিতে রাধা শিবের নিকট প্রার্থনাদি করিয়াছেন। বিরহাবস্থায় শিবের নিকট আবেদন-নিবেদন রাধা অনেকবারই করিয়াছেন। রাধার মিনতির পিছনে কিছু গতানুগতিক অলঙ্কার-প্রেরণা বর্তমান। এই সকল অংশে রাধা শিবকে কামের প্রতিষেধক ধরিয়াছেন। পৌরাণিক এবং কালিদাসীয় কাহিনী মদনভস্মকারীরূপে শিবের রূপকে জনসমাজে উপস্থিত করিয়াছে। সুতরাং যখন কেহ কামপীড়িত হয়—মদনারি শিবকে স্মরণ করিলে হয়ত কাম শায়েস্তা হইতে পারে, এইরূপ ধারণা জাগে। সর্পভীতির সময় গরুড়-স্মরণের মতো এই মনোভাব। মীনকেতনের ভয়ে শিবস্মরণ আছে ১৭৭ পদে—"মীনকেতনের ভয়ে শিব শিব বলিয়া

ধরণীতে লুণ্ঠিত হয়।" কিংবা ৭৪০ পদে—"রাধার শক্তি গিয়াছে, সে ধরণী ধরিয়া ওঠে, প্রতি রজনী জাগিয়া কাটায়, জগৎ তাহার (কামের) অগ্নিতে ভরিয়া গেল ভাবিয়া চমকিয়া ওঠে এবং শিব শিব বলে।"

কামের শত্রু যেমন শিব, তেমনি শিবের শত্রুও কাম—সাধারণ নিয়মে। কাম-পরিত্রাণের জন্য শিবের স্মরণ, তেমনি যখন রাধা নিষ্ঠুরভাবে কামাক্রান্ত, তখন রাধার আশঙ্কা, কামের এই শত্রুতার পিছনে আছে—রাধার প্রতি কামের কোনো বিশেষ বিদ্বেষ নয়—শিবের উপর কামের প্রতিশোধ-গ্রহণ। রাধার দোষের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া শিব মনে হয়। অন্ততঃ রাধার তাই বিশ্বাস, নচেৎ তাঁহার উপর কামের অমন ভয়াবহ ক্রোধের কারণ কি? রাধার মনে এইপ্রকার ধারণা সম্ভবতঃ জয়দেব প্রথম প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, আর বিদ্যাপতি বিনীতভাবে জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন। দুইটি পদে সেই একই কথা ঃ—

"মদন আমার শরীরকে কত দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু আমি একটি রমণী, শিব তো নহি। আমার শিরে জটা নাই, বেণীবিন্যাস মাত্র, তাহাতে যে মালতীর মালা জড়ানো আছে, উহা গঙ্গা নহে। আমার কপালে চন্দ্র নাই, উহা মোতির গুচ্ছ। আমার ভালে নয়ন নাই, উহা সিন্দূরবিন্দু, আমার কণ্ঠে মৃগমদলেপন রহিয়াছে উহাতো বিষ নহে। আমার বক্ষে তো সর্পরাজ নাই, উহা মণির হার। আমার পরিধানে বাঘছাল নাই, নীল পট্টশাড়ী মাত্র। এখানে আমার হস্তে নরকপাল নাই, উহা কেলিকমল। অঙ্গে ভস্মও নাই, ইহা চন্দনানুলেপন মাত্র। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, এইরূপ ভঙ্গি সুন্দর।" (১০৫)

"মদন, আমাকে তুই কত বেদনা দিতেছিস, আমি মহাদেব নই, যুবতী নারী। বিভূতি-ভূষণ নই, আছে চন্দনের রেণু, বাঘছাল নাই, আছে নেতের বসন। চিকুরের বেণী আছে, জটাভার নাই, আমার সুরসরি নাই, আছে কুসুমের শ্রেণী। আমার চন্দনের বিন্দু আছে, চাঁদ নাই। আমার কপালে পাবক নাই, আছে সিন্দূরের ফোঁটা। আমার কালকূট নাই, আছে চারু মৃগমদ। আমার ফণীন্দ্র নাই, আছে মুক্তার হার। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কামদেব শ্রবণ কর, একটি মাত্র দোষ (আছে),—আমার নাম বামা (মহাদেবের অপর নাম বামদেব)।" (২৪৫)

পদ দুইটির বিষয়বস্তু অন্যায় রকমে এক। জয়দেবের "হৃদিবিসলতাহারো" শ্লোকটির উপর বিদ্যাপতির আকর্ষণ বোঝা যায়। আকর্ষণের কারণ বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে শিবপ্রসঙ্গ আনয়নের সুযোগ পাইয়াছেন, জয়দেবের সমর্থনে। তাছাড়া অলঙ্কার-ভঙ্গিতেও চাতুর্যপ্রদর্শনের চমৎকার

সুযোগ। বিদ্যাপতি মদনের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ পরিতৃপ্তভাবে উপভোগ করিয়াছেন। মদন যদি শিবভ্রমে রাধাকে আক্রমণ করিয়া থাকেন, তবে সেইরূপ ভ্রম-সৃষ্টির জন্য দায়ী ভারতীয় কবিগণ। তাঁহারা অবিরত নারীর বিভিন্ন অঙ্গের প্রসাধনবস্তুর সঙ্গে শিবদেহের বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করিয়াছেন, যাহারা ফলে উপমেয় ও উপমানে পার্থক্য বিলুপ্তপ্রায়। ব্যাপারটা রাধার পক্ষে শোচনীয় হইয়াছে। রাধার বিভিন্ন অঙ্গের উপমান শিবের বিভিন্ন অঙ্গ। কিন্তু কবিগণের কৃপায় বহু ব্যবহারে ইতিমধ্যে উপমানগুলি এমন বাস্তব হইয়া পড়িয়াছে যে, সেগুলি উপমানই, বাস্তবিক উপমেয় নয়, তাহা বুঝাইতে উপমেয় রাধার প্রাণান্ত। দেখিয়া কবি কী খুশী!—৭০৫ পদের ভণিতাতে বিদ্যাপতি তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"এইরূপ ভঙ্গি সুন্দর।"

কেবল তাহাই নয়, কবিদের চরম কৃতিত্ব, তাঁহারা উপক্রত নায়িকার মনেও অলঙ্কার-বস্তুর বাস্তবতা-বিষয়ে ধারণাসৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে রাধা নিজেকে 'শিব নই' প্রমাণ করিতে ব্যগ্র, সেই রাধা অন্যত্র কবির সঙ্গে সায় দিয়া নিজের কুচযুগলকে শিব বলিয়া স্বীকার করেন। পাঠক ভুল বুঝিবেন না, আত্মরূপের গর্বে রাধা ঐরূপ করেন নাই, কবিদের মুখে বারবার নিজের সুন্দর দুইটি সমুচ্চ সৃষ্টি-বিষয়ে 'শিব শিব' শুনিতে শুনিতে রাধার কেমন ধারণা হইয়া গিয়াছিল—ঐগুলি শিবই, এবং যখন ধারণা একবার হইয়াছে, তখন বিপদের সময়ে সেই শিবের নিকটে প্রার্থনায় বাধা কি? বিশেষতঃ বিপদে মানুষ বুদ্ধিহারা হয়ই। তেমন একটি শিবারাধনা,—যার উল্লেখ পূর্বেও করিয়াছি,—৫৪৬ পদে আছে,—"দুই অঞ্জলি ভরিয়া দুই শিব পূজা করিতেছে (বক্ষের উপর দুই হস্ত যুক্ত)। —হে কামদহন শিব! আমার প্রাণ রক্ষা কর।" অবশ্য রাধা সত্যই নিজেকে শিবের সহিত পৃথক করিয়া মদনাক্রমণ হইতে পরিত্রাণ চান কিনা সন্দেহ থাকিয়া যায়। ২৪৫ পদে 'আমি মহাদেব নই', ইহা নানা তথ্যে সম্পূর্ণ প্রমাণ করা সত্ত্বেও রাধিকা নিজের উপর মদনাক্রমণের ছিদ্রপথটি দেখাইয়া দিয়াছেন পদের শেষে। রাধা বলিয়াছেন,—আমার একটি মাত্র দোষ, মহাদেবের এক নাম যেমন বামদেব, আমার নামও তেমনি বামা'।—তবে?

এখনো পর্যন্ত রাধার শিব-স্মরণে কবির অলঙ্কারপ্রীতির প্রাধান্য। কিন্তু বিদ্যাপতি অলঙ্কারসৃষ্টি করিবার জন্যই শিবকে আনেন নাই—শিবের প্রতি তাঁহার নিত্য আসক্তি, তিনি শৈব। বারবার রাধার প্রার্থনায় দেবতারূপে

শিবস্মরণের মধ্যে তাঁহার সেই শৈব মনোভাব কাজ করিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের মতামত বিস্তৃতভাবে পূর্বে জানাইয়াছি। বিদ্যাপতি সত্যই ভাবিয়াছেন, রাধার আরাধনার দেবতা শিব, যদিও হৃদয়দেবতা কৃষ্ণ। বেদনা-নিশিতে আরাধনার দেবতাকে রাধা বারবার স্মরণ না করিয়া পারেন নাই—"হরি আসিল না। শিব শিব, জীবনও যায় না। আশায় জড়াইয়া রাখিয়াছে" (৫২১)। রাধা অতিবড় দুঃখে উদাসীন আত্মসুখমগ্ন শিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন—"জন্মে জন্মে আমি হরগৌরীর আরাধনা করিলাম। কিন্তু শিব শক্তিকে লইয়া বিভোর থাকিলেন" (৭১৫)। শিবের করুণালাভের জন্য নিজ দেহাঙ্গ দিয়া রাধা শিবপূজা করিতে থাকেন—"(রাধা) কররূপ কমল এবং কুচ-শ্রীফল দিয়া ও আপনার দেহদ্বারা শিবপূজা করে" (১৭৭)।

দেহের অর্ঘ্যে দেবতার অর্চনার ভাবটি বিদ্যাপতির প্রিয় ভাব। গভীর আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির সময়ে এই ভাব বিদ্যাপতির কবিচিত্তকে কিরূপ অধিকার করিয়া থাকিবে, পরে দেখিব। অলঙ্কার নয়, সুন্দরের প্রসাধন নয়, রাধা তখন শিবের পূজাপুষ্প হইয়া উঠিবেন।

(৩) উদাত্ত আধ্যাত্মিক বিরহ

ভণহি বিদ্যাপতি রূপ।
হে সখি, মানুষ-জনম অনুপ॥ (৫৩৩)
বিদ্যাপতি স্বরূপ কহিতেছেন, হে সখি, মনুষ্যজন্ম অনুপম।

মনুষ্যজন্ম অনুপম, কারণ মনুষ্যজন্মেই অনুপম প্রেম। প্রেম মিলনকামী। বিদ্যাপতির পদে মিলনলীলার অসাধারণ রাগরক্তরূপ দেখিয়া বলিয়াছি, কেবল বৈষ্ণব পদাবলীতে নয়, সমগ্র মধ্যযুগের ভারতবর্ষের লোকভাষায় বিদ্যাপতি দেহময় প্রেমের কবিসত্তম। এইবার বিদ্যাপতির স্তুতিগীতে আরো একটি ছত্র যোজনা করিব—পদাবলীতে তিনি বিরহেরও প্রধান কবি। মিলনে ও বিরহে—পদাবলীতে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। যাঁহাকে মিলনে সর্বোত্তম কবি বলিয়াছি, বিরহে তাঁহাকে মুখ্য কবিরূপে না পাওয়াই সম্ভব। খুবই সম্ভব—বিরহের বেদনা খণ্ডিত হইবে মিলনের সুখাভিলাষে। বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে

অন্যথা ঘটিল কিরূপে ? কিরূপে তিনি একই কালে মিলন ও বিরহের কবিশ্রেষ্ঠ হইলেন ?

আমরা বলিব, অন্যথা কিছু হয় নাই। বিরহে উৎকর্ষ না দেখাইতে পারিলে মিলনের উচ্চাঙ্গ কাব্য রচনা করা বিদ্যাপতির পক্ষে হয়ত সম্ভবই হইত না। মিলন তো বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে কেবল দেহসুখ নয়—বৃহত্তর জীবন-পিপাসার অন্তর্গত বস্তু—সেই জীবনের আনন্দরূপকে গভীরভাবে যিনি বোধ করিয়াছেন, জীবনের যাতনা-রূপের দর্শনও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—মনুষ্যজন্ম অনুপম। অনুপম এইজন্য যে, এই মনুষ্য-জন্ম একদিকে জীবনবেদীতে উৎসর্গবাদ্যের আনন্দকোলাহলে মুখরিত, অন্যদিকে হননের মৃত্যুযাতনায় অধীরার্ত।

আমরা এখন বিরহরূপকেই দেখিব। বিরহ কি সহজ। সে যে অগ্নি। বিরহাগ্নির উত্তাপে আঁধার গলিয়া সূর্যোদয় হয়। বিরহ বাহিরে শীতল, বর্ণহীন, কৃষ্ণকায় ;—ভিতরে তাহার প্রচণ্ড বেগ ঠেলিয়া উঠিতেছে—তাহা অগ্নিময়, সুবর্ণদ্যুতি, রাধাকায়।

পদাবলী অশ্রুর মন্দাকিনী, বেদনার বেদধ্বনি, আনন্দদগ্ধ হৃদয়ের শিখা-কাব্য। বিদ্যাপতিকে আমি এহেন কাব্যের প্রধান কবি করিতে চাহিতেছি! এ সম্মান মহাসম্মান। চণ্ডীদাস নন কেন—কেন নন জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস ? জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অন্যক্ষেত্রে যত বড় কবিই হোন, বিরহে ম্লানশক্তি। তাঁহাদের সীমাবদ্ধতার কারণ আলোচনা করিয়াছি অন্যত্র।* কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যকে অস্বীকার করি কিরূপে ? সত্যই কে করে ? শুদ্ধতম বেদনায়, অতিসত্ত্ব অনুভূতিতে, গভীরের গানে গানে চণ্ডীদাস বাজিয়াছেন। সেখানে তাঁহার পাশে থাকিবার যোগ্যতা অন্য কোনো বৈষ্ণব কবির ছিল না। চণ্ডীদাস সূর্যহারা অশ্রুসায়রের শ্বেতকমল, সদামূর্ছিত। বিরহচেতনাই তাহার একমাত্র চেতনা।

বিদ্যাপতিকে যখন বিরহের শ্রেষ্ঠ কবি বলিতেছি, চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়া হিসাব করিয়াছি। বাদ দিবার কারণ—বিরহ বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি, চণ্ডীদাস ঠিক সেই বিরহের কবি নন। আমাদের নিকট বিরহের চরম রূপ মাথুরে ; চণ্ডীদাসে মাথুর-বিরহের পদ প্রায় নাই। গভীরতম বিরহবোধের জন্য মাথুর পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন চণ্ডীদাসের ছিল না। অথচ চরম বিরহ-

* মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—১ম খণ্ড

বোধের জন্য, কৃষ্ণ গোপীদের একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন—এই সংবাদের প্রয়োজন আছে আমাদের নিকট। আমরা কিছু নির্দিষ্ট তথ্য চাই, চাই বিরহাক্রান্ত হইবার গুরুতর কারণ। কৃষ্ণের মথুরা-প্রস্থানে সেই দুঃখকারণ মিলিয়াছে; তাই আমাদের মনে বিরহ-ব্যাপারে মাথুরের অগ্রাধিকার। আমাদের লৌকিক কাব্যবোধের পক্ষে উজ্জ্বল বর্ণ, গাঢ় রেখা, উদ্দীপ্ত বর্ণনা, উন্মত্ত হাহাকারের প্রয়োজন আছে। সেখানে সিতবর্ণ বর্ণ নয়, বিস্পষ্ট উক্তি উক্তি নয়। আমরা কাব্যে চাই রূপ—বেদনাও রূপময় হইয়া উঠুক—অশ্রু হোক অশ্রুপ্রতিমা। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই কারুণ্যের শ্রেষ্ঠ রূপকবি।

কী অজস্র সে রূপ, ইতিমধ্যে যথেষ্ট দেখিয়াছি। শ্রেষ্ঠ রূপ দেখিতে বাকি আছে। দেখিব, প্রেমের বেদনায় রাধা কিরূপ অশেষ! অথচ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে রাধা বলেন, উৎকৃষ্ট উপমার ভাষায়—"এক তিল মাত্র প্রাণ রহিয়াছে, যেমন তৈলশূন্য প্রদীপ (ক্ষণকাল) জ্বলে" (১৬০)। জ্বলিবার সেই 'ক্ষণ'-কালটি কিন্তু অনন্ত। বিদ্যাপতি একটি ক্ষণের ভিতরে ধরিয়াছেন নিত্যের বিভা। এই ক্ষণ-জীবনে রাধা নাম-জপ করেন তন্ময়চিত্তে, অশ্রুসায়রে ভাসেন ও ডোবেন, সুন্দর ক্ষমাকণ্ঠে মাধবের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন, অবহেলা সহিয়াও আত্মদানের মন্ত্র পাঠ করেন, এবং প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন মৃত্যুর, যে মরণ শ্যাম-সমান। বিরহে, রাধার নিকটে—শ্যামরে, তুঁহু মম মরণ-সমান।

এই বিরহিণী অগ্নি, এই মৃত্যুতাপসী রাধাকে বিদ্যাপতির কবি-চেতনায় কে তুলিয়া স্থাপন করিল? অথবা বিদ্যাপতিই এই রূপের আদি দ্রষ্টা? বিদ্যাপতি আদি দ্রষ্টা—এই সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। এতবড় ভারতবর্ষ—বিদ্যাপতির বহু পূর্ব যুগ হইতে যে ভারতবর্ষ জীবিত ও ভাবরসে সঞ্জীবিত, সে ভারতবর্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক কবি ভাব-বিরহের মূর্তি প্রথম রচনা করিলেন, এরূপ চিন্তা করার কথাও চিন্তা করা যায় না। ঐ বিরহ-মূর্তির বহিঃরূপকে তো সংস্কৃত সাহিত্যেই পাইয়াছি—বিচ্ছেদে মূর্ছাদির বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্য পরিপূর্ণ। যদি বিরহের অন্তর্গহন রূপকেও ধরি, বিদ্যাপতি যে-রূপ আঁকিতে গিয়া রাধা বা কৃষ্ণকে দিয়া স্থাবর-জঙ্গমে প্রিয়-দর্শন করাইয়াছেন—সে বস্তুও কিন্তু কালিদাসীয়। বিরহের কালে ঐকান্তিক কৃষ্ণ-ধ্যানে রাধার কৃষ্ণভাবপ্রাপ্তি ভারতের শৈব ও বৈদান্তিক চেতনার নিকট নববস্তু নহে।

এই সকল ভাব ও বক্তব্যকে বিদ্যাপতি আত্মসাৎ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি

বিষয়ে আমাদের প্রথমাবধি দাবিও তাই : তাঁহার প্রতিভায় ছিল বিপুল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক্ষুধা। বিরহের যত কিছু ভাব তিনি লৌকিক কাব্য কিংবা অধ্যাত্ম-শাস্ত্র হইতে পাইয়াছেন—গ্রহণ করিয়া, সংযুক্ত করিয়াছেন তাঁহার পদ-তরঙ্গিণীতে। বিদ্যাপতির বিরহপদের উৎসরূপে এই সঙ্গে বিশেষভাবে ভক্তিশাস্ত্রগুলির, অন্ততঃ ভাগবতের নাম করা উচিত। বিদ্যাপতির রাধার কৃষ্ণভাবপ্রাপ্তির উৎস ভাগবতে বিরহকালে গোপীদের অনুরূপ অবস্থা—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।* আমাদের বিশ্বাস, এ ব্যাপারে কবির শৈব ও বৈদান্তিক ভাবনাই অধিক সক্রিয় ছিল। ভাগবতে রাসস্থলীতে গোপিগণের কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণাত্মিকা ভাবপ্রাপ্তির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দশম স্কন্ধের সমগ্র ত্রিংশ অধ্যায়ে "কৃষ্ণপ্রিয়া অবলাগণ" কিভাবে "আমিই কৃষ্ণ, আমিই কৃষ্ণ"—এই ভাবে বিহ্বল হইয়া প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে কৃষ্ণদর্শন এবং আত্মবিস্মরণে কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। ৩৯ অধ্যায়েও অক্রূরসহ কৃষ্ণের মথুরা-গমনের সংবাদে শ্রেষ্ঠা ব্রজগোপীদের কৃষ্ণানুধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবাবস্থার কথা মেলে। কিন্তু বিদ্যাপতি বিরহিণী রাধার কৃষ্ণভাবপ্রাপ্তির চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া ভাগবতের এই সকল বর্ণনার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন, এরূপ মনে করিতে ইচ্ছা নাই। অনেক পরবর্তীকালে রচিত ভাগবত ঐ প্রকার অধ্যাত্মভাবাবস্থার রূপ-বিষয়ে অবশ্যই পূর্বতন ধর্মশাস্ত্রের নিকট ঋণী। বিদ্যাপতির মনোলোকে কালিদাস-ভবভূতি-আশ্রিত প্রেমতন্ময়তার যে কাব্য-স্মৃতি, কিংবা অদ্বৈতজ্ঞানমূলক শাস্ত্রসংস্কার ছিল, তাহা রাধাকৃষ্ণের অভেদভাব অনুভবের পক্ষে যথেষ্ট। তাহা হইলে কি বিদ্যাপতির অধ্যাত্ম বিরহপদের পিছনে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করিতেছি? মোটেই নয়। আমাদের বিশ্বাস, বিদ্যাপতি ভক্তিগ্রন্থাদি হইতে সেই অতিরিক্ত পবিত্র ব্যাকুলতাকে লাভ করিয়াছিলেন যাহাকে ভক্ত বৈষ্ণব অহৈতুকী প্রীতি নাম দিয়াছে, যে প্রেমকে লাভ করিলে প্রেমিক-প্রেমিকা আপনাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া প্রেমকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলে। সেই রাগাত্মিকা প্রেমের স্বর্ণদ্যুতি, ভক্তিশাস্ত্রে যাহার উপস্থাপন, এবং শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের মত দেবদেহে যাহার স্বতঃস্ফূরণ, বিদ্যাপতি তেমন ভাবসমাধি, দিব্যোন্মাদের ধারণাকে পাইয়াছেন ভক্তিগ্রন্থাদি হইতে।

---

* ৭৪১ পদের পাদটীকা, বিদ্যাপতি পদাবলী।

কিন্তু একটি সিদ্ধান্ত এখনো আমরা অস্বীকার করিতেছি, যে সিদ্ধান্তবশে বলা হয়—বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ ভক্তির ধারণা পরিণত জীবনে সহসা পাইয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি—প্রথমাবধি বিদ্যাপতির মধ্যে বিরহের অধ্যাত্মরূপ বিষয়ে ধারণা যথেষ্ট ছিল। সেই ধারণাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর পরিণত হইয়া বিদ্যাপতির বিরহপদকে অধিকতর আধ্যাত্মিক করিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে উত্তরোত্তর প্রবেশ উক্ত ভাবকে পরিশীলিত, গভীরতর করিতে পারে। এইসঙ্গে ইহাও স্পষ্টভাবে জানাইব, বিদ্যাপতির বহু শ্রেষ্ঠ বিরহপদ একেবারে দেহভাবশূন্য নয়। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস, বিদ্যাপতির অধ্যাত্ম বিরহ মানবিক প্রেমেরই পরিণত রূপ। প্রেম—যে কোনো প্রেম—প্রকৃষ্ট ও প্রগাঢ় হইলে এক স্থানে দেহকে অতিক্রম করে। কিন্তু দিগন্তে পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া সেই অধ্যাত্ম-আকাশের বিস্তার। আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা চলে, যখন বিরহের বর্ণনা করা হইতেছে, তখন স্বভাবতঃই দেহমিলনপূর্ণ প্রেম ঐ বিরহের পূর্বপটে আছে। তা যদি সত্য হয়, যদি মিলনছেদ করিয়া বিরহ আসে, সেক্ষেত্রে বিরহকে একেবারে দেহচেতনাবিহীন করা যায় কিভাবে? দেহমন্থন করিয়া প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশ; যদি একেবারে প্রেমকে বিদেহী করিয়া ফেলা হয়, সঙ্গতিবোধে আঘাত লাগে না কি—অধ্যাত্মকাব্যেও? এ বিষয়ে চণ্ডীদাসের অতীন্দ্রিয় বিরহের উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রতিবাদরূপে, কিন্তু চণ্ডীদাস যে মিলনকালেও দেহকে কার্যতঃ বিস্মৃত। যেমন উত্তররামচরিতের ভবভূতি। বিদ্যাপতি মিলনে চূড়ান্ত দেহধর্ম দেখাইয়াছেন, সেক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অশরীরী প্রেমের কথা বলা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্ররূপে অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত শ্রীমদ্‌ভাগবতেও অনুকূল সাক্ষ্য পাই। কংসবধের পর ব্রজপুরে অক্রুর প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার নিকট বিরহগ্রস্তা গোপিগণ যে বিলাপ করিয়াছিলেন, (দশম স্কন্ধ—৪৭ অধ্যায়) তাহাতে গোপীদের "বাক্য কায় ও মনের" প্রভু গোবিন্দের জন্য "বাক্য কায় ও মনের" ক্রন্দনই লিপিবদ্ধ আছে।

বিদ্যাপতির অধ্যাত্ম বিরহপদের পটভূমিকা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। এখন পদের বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমে ধরা যাক কৃষ্ণের বিরহাবস্থার চিত্রগুলি। পদগুলি কিছু বিস্মিত করে।

বিস্মিত করে এইজন্য যে, পদগুলি নিতান্ত আধ্যাত্মিক। পুরুষের বিরহে এতখানি ভাবাচ্ছন্নতা আশাতীত। পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি পর্যায়ে কৃষ্ণের আচরণ বিশেষ শ্রদ্ধাযোগ্য হয় নাই। কৃষ্ণের নিকট রাধা কাম্য বস্তু, আরো যথার্থভাবে—কাম-বস্তু। তেমন উপাদেয় ভোগ্যবস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করিয়াছেন বটে, সে কিন্তু পণ্যনাশের কান্না। কৃষ্ণের গৌরব—সুন্দর পুরুষ-শরীরের, চাটু বচনের এবং উন্মাদক বংশীবাদনের, তারপরে আয়ত্ত প্রেমিকাকে প্রবঞ্চনা করায়। বিরহাংশে এমন কৃষ্ণকে যদি ভাববিহ্বল, এমনকি উন্মাদপ্রায় দেখি, চমকিত হওয়া আশ্চর্য নয়।

কবি কাব্যের প্রয়োজনে কৃষ্ণকে এমন চরিত্রমহিমা দিয়াছেন। প্রথম কথা, চরম মাথুর-বিরহে মথুরাপ্রস্থান ভিন্ন কৃষ্ণের কোনো ভূমিকা নাই। মথুরার রাজ্যপাটে বসিয়াও উদাসীন, বৃন্দাবন-স্মৃতিচারী কৃষ্ণের কথা বিদ্যাপতি কোথাও কোথাও বলিয়াছেন (পদ ৭৪৮), এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয়ে সমর্থন তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু মাথুর-বিরহের ক্ষেত্রে 'একেবারে ফিরিব না' এই ধারণার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-পদকারদের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ফিরিবার সম্ভাবনা রাখিয়া গেলে, পদকারগণ রাধা-ক্রন্দনে মর্মান্তিকতা ঐ পরিমাণে আনিতে পারিতেন না। সুতরাং বিরহী কৃষ্ণের স্থান একমাত্র সাময়িক বিরহের ক্ষেত্রে। সেই সাময়িক বিরহের এক অংশ, ধরা যাক, পূর্বরাগ অধ্যায়—তখন কৃষ্ণ রূপমুগ্ধ ও ইন্দ্রিয়লুব্ধ। অন্য অংশ, ধরা যাক, অভিসার—তখন কৃষ্ণ পতিতপতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্। কৃষ্ণের বিরহের সেই অংশের নাম যখন মান, তখন তিনি স্বকৃত অন্যায়ের দূরীকরণে তোষণরত, কিংবা কখনো কখনো আরো জঘন্য—নিজ অন্যায়ের আস্ফালনে উদ্ধত। তাহা হইলে কৃষ্ণকে গভীর কোথায় পাইব ? কোথায় তিনি প্রেমের দেবতা, রাধার পরম প্রভু ? রসোদ্গারে কখনো কখনো তেমন কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় বিরহে—সাময়িক বিরহে। কবিরা যথাসম্ভব তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিষয়ক অবিচারের অপনোদন করিতে চান। সর্বত্র যিনি দেহীরূপে প্রতিভাত, যিনি ইচ্ছা করিলে বিরহবোধ নাও করিতে পারেন, তাঁহাকে যখন সত্যই বিরহী দেখান হইল, বিদ্যাপতি-কবি তাঁহার মধ্যে শুদ্ধ সত্তার ধারাবর্ষণ করিয়া দিলেন। মহাসত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ দিব্যোন্মাদ হইয়া উঠিলেন বিরহপর্যায়ে। রাজা শিবসিংহের নামাঙ্কিত তেমন উচ্চ কৃষ্ণ-বিরহের দুইটি পদের (৪৩, ৪৪)

আলোচনা আগে করিয়াছি। এখন আরো কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা চলে।—

"কামিনি!......তুমি অতি নিষ্ঠুর, সে অনুরাগী, সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটায়। হে রাধে! ...তোমারই চিন্তা, তোমারই নাম, তোমার কথা সে সকল স্থানে বলে। তোমার (প্রতি) স্নেহের কথা আর কি বলিব; (তোমার কথা) স্মরণ করিয়া তাহার নয়নে অশ্রু বহে। নিত্যই সে আসে, নিত্যই সে যায়। (অপরে) দেখিলে বা হাসিলে সে লজ্জা পায় না। কুসুম পরিধান করে না, কেশ বাঁধে না, সকলকেই তোমার সম্বন্ধেই কথা শোনায়।" (২৫৬)

"...তাহার প্রাণসংশয় হইয়াছে। ...সে অপরের সহিত কথা বলিতেও বিহ্বল হইল। স্থাবর জঙ্গম মনে অনুমান করিতে সব বিষয়েই তোমার ভাব হয়। আর কি বলিয়া যে তোমাকে বুঝাইব, উন্মত্ত (মাধব) যেন আমাকেও পাগল করিয়াছে।" (২৫৭)

"শয্যায় সজল নলিনীদল বিছাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু স্পর্শ করিবামাত্র উহা শুকাইয়া যায়। চন্দনে উপকার হয় না, চাঁদে বিপরীত ঘটে। এখন কি উপায় করিব? সজনি! তুমি নিশ্চয় করিয়া জান যে, তোমা বিনা কানাইয়ের তনু দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, বিরহে তাহার মুখ মলিন হইতেছে। বৈদ্য কারণ বুঝিয়া নিরাশ হইয়া ত্যাগ করিল। অন্য কোনো উপায় নাই, এই ব্যাধির একমাত্র ঔষধ তোমার অধরের অমিয়ধারা।" (৫১২)

"তোহরি বিরহ-বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন
ক্ষণে নাম ধরু তোর॥
রামা হে, তু বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ নেহ॥
তোহরি কহিনী কহইত জাগর
সুতই দেখয় তোয়।
এ ঘর বাহির ধৈরয না ধর
পথ নিরখয়ে রোয়॥
কত পরবোধি, ন মানে রহসি
ন করে ভোজন পান।
কাঠ-মুরতি ঐসন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ (৬৫০)

কৃষ্ণ যথার্থই বিরহী—উন্নততম অর্থে। তাঁহার দেহের মনের অস্থিরতা, ঘর বাহির করা, রাধার নাম স্মরণ, চরিত কথন, স্থাবর জঙ্গমে রাধামূর্তি দর্শন, অবিরল অশ্রু, ক্ষীণ দেহ, হাসিকান্না মেশানো গদগদ উন্মাদ-ভাষ, স্তম্ভ, মূর্ছা, ও মৃত্যুর পূর্বদশা—এগুলিকে আধ্যাত্মিক ভাবাবস্থা না বলিলে কাহাকে বলিব? অবশ্য কথা উঠিতে পারে জয়দেবেও তো রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণের অবস্থা বক্তব্যের দিক দিয়া প্রায় অনুরূপ, তাহার আন্তরিকতায় পূর্ব সন্দেহ করিয়াছি কেন? সন্দেহ কেন করিয়াছি, তাহা সন্দেহ প্রকাশকালে জানাইয়াছি—জয়দেবের কৃষ্ণের অতি-ইন্দ্রিয়ালুতা তাঁহার বেদনায় বিশ্বাস করিতে দেয় নাই। বিদ্যাপতির আলোচ্যে বিরহ-চিত্রগুলির বিষয়েও আপত্তি করা চলে—কৃষ্ণের অবস্থা-চিত্রগুলি সবই দূতী উপস্থিত করিয়াছে, এবং দূতী বা সখীর উদ্দেশ্য অনেক সময় সাজাইয়া মিথ্যা বলিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদন করা। এ-ক্ষেত্রে দূতীর কৃষ্ণাবস্থা-চিত্রণে কি কিছু অতিরঞ্জন আছে? অতিরঞ্জন আছে কিনা নিঃসংশয়ে কিভাবে বলিব? এবং কৃষ্ণের বিরহবস্থার যাতনা যে বহুলাংশে মদন-যাতনা, তাহাও দুইটি পদে (২৫৮ ও ২৬১) প্রকাশিত। কবি দূতী-বচনে অন্যত্রও তাহা অধিকতর সুচারুভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—"সে নাগর-শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহার তুল্য, যেন এক বৃন্তের দুই ফুল।" দূতীকে সমর্থন করিয়া কবি বলিয়াছেন— "মন্মথ এক শরে যেন দুইটি জীবন বধ করিতেছে" (২৫৯)। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণের ক্লেশচিত্র দূতী-রচিত নয়, জোর করিয়া সত্যই বলা শক্ত। কিন্তু আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা আছে কিনা বর্ণনাভঙ্গির আন্তরিকতার রূপ দেখিয়া নির্ধারণ করি। সেদিক দিয়া দেখিলে, উদ্ধৃত পদগুলি হইতে কৃষ্ণপ্রেমের ঐকান্তিকতা ও দুঃখের নিবিড়তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। রাধা-বিহনে কৃষ্ণের যথার্থ বেদনার রূপ আর একটি পদ দ্বারা উপস্থিত করিব। পদটিতে বর্ণনভঙ্গি অনুচ্ছ্বসিত, দূতীমুখে নয়, কৃষ্ণ স্বমুখে রাধাকে ছাড়িয়া আসার দুঃখকথা নিবেদন করিতেছেন এই পদে। পদের আরো বৈশিষ্ট্য, এটি মাথুর-বিরহের অন্তর্গত। এমন সুনিবিড় দুঃখের মৃদুভাষণ অল্পই দেখা যায়—

"সে সুন্দরীকে কি বিস্মৃত হওয়া যায়? হাত ধরিয়া মথুরায় যাইবার অনুমতি মাগিবার সময় সেখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। গদগদ স্বরে স্খলিত অধরে রাধা যাহা বলিল,—আমার কঠিন কলেবর, তাই চলিয়া আসিলাম, কিন্তু মন সেই জায়গায় রহিয়া গেল।

তাহাকে ছাড়িয়া রাত্রিদিন ভাল লাগে না। সেখানেই মন পড়িয়া আছে। রাজসভাতের মধ্যে অন্য রমণীর সঙ্গে বিবাগীর মত আছি। দু'এক দিনের মধ্যে আমি নিশ্চয় যাইব, এই বলিয়া রাইকে প্রবোধ দিবে।" (৭৪৮)

এখন বাকি আছে আরো কিছু পদ—কিছু অসাধারণ সৃষ্টি—বেদনার স্বর্গীয় সংগীত, যার রচয়িতারূপে বিদ্যাপতি সুধন্য কবি। বিদ্যাপতির সে সৃষ্টি-গরিমার পূর্ণরূপ উদঘাটিত করিতে পারিব, এমন স্পর্ধা নাই। কেবল পদগুলিকে পরপর গাঁথিয়া দেওয়া চলে। 'পরমের সুরে চরমের গীতি-কথা' কিছু উদ্ধৃত করা যাক। প্রথমে নামজপে নিরত একটি মধ্যরাত্রির মহাযোগিনী—

"মাধব বিরহিণী বামাকে দেখিলাম। অধরে হাসি নাই, সখীসঙ্গে বিলাস নাই, অহর্নিশ তোমার নাম জপ করিতেছে। শরৎচন্দ্রের (ন্যায়) মুখ মধুর ধ্বনি (নামজপ) করিতেছে মাত্র। কোমল অরুণবর্ণের কমল ম্লান হইল। বক্ষের হার ভার হইল, সুমুখীর নয়ন রুদ্ধ হয় না......চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুম মুছিয়া ফেলিল, সমস্ত তোমার জন্য ত্যাগ করিল; যেন জলহীন মীনের মত ফিরিতেছে, অহর্নিশ জাগিয়া রহিয়াছে।" (২১৬)

এই অবস্থায় রাধা অপূর্ব ক্ষমাশালিনী, দোষদর্শন করিবার ক্ষমতা গিয়াছে, হৃদয় শুধু প্রেমপূর—

"আমার মাধব দূর দেশে চলিয়া গেল, সখি, কেহ (তাহার) কুশল সংবাদ কহে না। লক্ষ ক্রোশ (দূরে) বাস করুক, যুগ যুগ জীবিত হউক। উঁহার কি দোষ, আমারই অভাগ্য।" (৫১৪)

তবু প্রাণ বোঝে না সব সময়, কেমন মোচড় দিয়া ওঠে, রোদনভরা কণ্ঠে রাধা বলেন—

"এমন হিতৈষী মিত্র কেহ নাই, যে তাহাকে বুঝায় যে, তুমি লক্ষ কোটি লোকের প্রভু, সকলের আশা তুমি পূর্ণ কর, আমাকে ভুলিয়া গেলে কেন?"—(৫১৫)

এবং নিরুপায় হৃদয় শেষাশ্রয়রূপে বাছিয়া লয় কান্নার পথ—যে কান্না পৃথিবীর আদি সঙ্গীত। রাধা কাঁদিতে থাকেন, আমরা সেই সুযোগে কবির

নিকট হইতে পাই অশ্রুধোয়া কয়েকটি অপরূপ চিত্র। প্রথম চিত্রটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর—

"নয়নের জল চরণতলে গেল। স্থলকমল জলকমল হইল। অধর নিমেষের জন্য অরুণ হয় না, (যেন) কিশলয়কে শিশিরে ধুইয়া ছাড়িয়াছে। শশিমুখীর অশ্রুর সীমা নাই। তোমার অনুরাগে সমস্ত শিথিল হইয়াছে।" (২৬৭)

স্নিগ্ধ কয়েকটি অলঙ্কারে সজ্জিত এই পদ। ৭৩৫ পদে সখীমুখে রাধার বিরহাবস্থা বর্ণিত। প্রথম চার পংক্তি অপূর্ব। সুন্দরের বেদনাও সুন্দর—ঐ চার পংক্তি হইতে প্রমাণিত হয়। রাধা কাঁদিতেছেন—অবিরাম অনর্গল অশ্রু বহিতেছে—সখী তেমন রাধারূপ বর্ণনা করিতে গিয়া অনির্বচনীয় কল্পনামূরতি আঁকিলেন—

মাধব সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন শাওন মালা॥ (৭৩৫)

আর একটি অশ্রুকাব্য চয়ন করা চলে এই প্রসঙ্গে—

"চক্ষের জলে ঘর বাহির পিচ্ছিল, সকল সখীর চক্ষে অশ্রু। পিছলিয়া পিছলিয়া পড়িয়া যায়, তবুও সুমুখী মনে তোর মিলনের আশা করিয়া বেগে ধাবমান হয়।......যে ধনী এতদিন তোর নাম শুনিলে আনন্দপূর্বক প্রাণ নিবেদন করিত, সুবদনী তাহাতেও যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে।" (৮৫২)

পদে কিছু অতিরঞ্জন আছে—অশ্রুজলে ঘর বাহির পিচ্ছিল হওয়া ও তাহাতে রাধার পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়া, এইসব। কিন্তু সে অতিরঞ্জন নিতান্ত লৌকিক দৃষ্টিতে। রাধার মত প্রেমে তাহা কিছু মাত্র অতিকৃত নয়। এই পদে আরো কিছু গভীর জীবনসত্য আছে: (ক) রাধা নিজের অশ্রুতে পা পিছলাইয়া পড়িতেছেন; অর্থাৎ বেদনা শক্তিও দেয়, আবার হরণও করে; (খ) ঐ সত্যটিই সুন্দরভাবে পরে পরিস্ফুট।—পূর্বে রাধা কৃষ্ণনাম শুনিয়া আনন্দে প্রাণ নিবেদন করিতেন, এখন দেহদৌর্বল্যে যেন তাহাতেও অশক্ত। এখানে জীবনের পরাজয়ের এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ফুটিয়াছে। দেহকে দগ্ধ করিলে আত্মার শিখা উজ্জ্বল হয়। কিন্তু ঐ আত্মা-শিখাকে ধারণ করার

মত আধার চাই। দেহ সেই আধার। দেহের ক্রমাগত ক্ষয়ে এমন একটি অবস্থা আসিতে পারে, যখন ঐ আত্মশিখাকে ধারণ করিতে সে অসমর্থ হইয়া পড়ে। সেই ক্ষণটি জীবন-বোধের পক্ষে মারাত্মক।

এটি বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত ভাবনা।

এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যুতে। বিরহের সেই চরম অবস্থা—দশমী দশা। বিদ্যাপতি মৃত্যুদশার উৎকৃষ্ট পদ অনেকগুলি লিখিয়াছেন। প্রেম জীবন দেয়, কবি বিদ্যাপতি শিহরিয়া দেখিলেন, মৃত্যুও তারই দান। বিরহ-খিন্নার মৃত্যুমূরতি আঁকিতে বিদ্যাপতি কোনো কোনো প্রচলিত সংস্কৃতাশ্রিত কাব্যচিত্রের অনুসরণ করিলেও কবির অনুভূতির দুঃখনিবিড়তাই আসলে পদগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। এরূপ পদ অনেকগুলি মেলে; দু'একটি মাত্র উদ্ধৃত করা সম্ভব। রাধার প্রতি সহানুভূতিতে দূতী ছুটিয়া আসিয়াছে; মদন রাধার উপর কিরূপ বিষপ্রয়োগ করিয়াছে বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণের কাছে মিনতি করিয়া দূতী বলিয়াছে—"হরি! বিষের জ্বালা কেমন বাড়িতেছে তাহা একটু দেখিয়া যাও।…তোমার পদপঙ্কজে আইলাম। এ হরি, তোহার জন্যই তাহার দুঃখ, তুমিই উহার দুঃখ নিবারণের উপায়" (৫৪৪)। দূতী কৃষ্ণকে যাইবার জন্য আরো কাতরভাবে অনুরোধ করে, কারণ, পূর্বে "তোমার সংবাদ দৌড়িয়া আনিয়া দিতেছি বলিয়া আশা দিতাম, কিন্তু এখন আমাদের কথা বিশ্বাস করে না" (৫৪৫)।

"তোমার দর্শন জীবনরক্ষার শেষ উপায়"—হায়, সেই 'তুমি'-উপায় মেলে না। তখন রাধা মৃত্যুকে স্থির জানিয়া প্রত্যাখ্যাত মলয়-ভ্রমর-চন্দনকে আহ্বান করিয়া উচ্ছ্বাসভরে বলেন—যাহা বলেন তাহাতে মৃত্যু-সমারোহের করুণ চিত্র জাগিয়া ওঠে—

বহু মলয়ানিল ঝরু মকরন্দ।
উগও সহস দশ দারুণ চন্দ॥
করও কমল বন কেলি ভমরা।
আবে কী ভালমন্দ হোএত হমরা॥ (৫২২)

উচ্ছ্বাসের শক্তি স্থায়ী হয় না। সুন্দরী রাধা তখন চিত্রিত পুত্তলিকার মত একদৃষ্টিতে "তাকাইয়া থাকেন"; "তাঁহার দেহ ক্ষীণ স্বর্ণরেখার মত" হইয়া যায়, "তাঁহার দুই হাতের কঙ্কণ বলয় খসিয়া পড়ে" এবং "তিনি মুক্তবেণী সংবরণ করেন", তাঁহার "চৈতন্য আছে কি মূর্ছিত," চোখে দেখিয়া

বোঝা যায় না, এবং দূতী নিরুপায় যাতনায় বলে—"তাহাকে দেখিয়া কাহারও আর নিজদেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা যায় না" (৭৩৭)। এই অবস্থার আর দুইটি চিত্রের উল্লেখ করা যায়, ৭৩৬ ও ৭৪২ পদে অঙ্কিত চিত্রদ্বয়। দুই পদের বক্তব্য প্রায় এক, চিত্রাংশও সুন্দর, তবে ৭৪২ পদটি অধিকতর আবেগ-মথিত বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি,—

মাধব, কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগ মাহা তাপিনী
বৈরী মদন-শর-ধারা॥
অরুণ নয়ন লোরে তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহি শেষা॥
আনি নলিনী কেও ধনীকে শুতাওলি
কেও দেই মুখপর নীরে।
নিশবদ হেরি কোই শ্বাস নেহারত
কেই দেই মন্দ সমীরে॥
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণই বিদ্যাপতি সোই কলাবতী
জীবন-বন্ধন আশ-পাশ॥ (৭৪২)

মৃত্যুর পরেও কি কিছু আছে? মৃত্যু তো অবসান। জীবনের অবসান,—দুঃখেরও বটে। রাধা পরিত্রাণকামনায় মৃত্যু চান। সুতরাং মৃত্যুমূর্ছিত পদগুলিই বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ বিরহপদ নয়। জ্বালার পদ চাই—যে জ্বালা মরিতেও দেয় না, বাঁচিতেও দেয় না—শুধু পুড়িতে দেয়। বিরহে চিতাশয্যার উপর রাধার চিরজীবন। রাধার অগ্নিজীবনের পদগুলি তাই উৎকৃষ্ট। আর এক ধরনের উৎকৃষ্ট পদ আছে, যেখানে আছে রাধার অহঙ্কার—আত্মদানের গৌরবানুভূতি। পরিপূর্ণ আত্মবিলয়ের নিঃশব্দ অবসানের পরিবর্তে

আত্মোৎসর্গের মঙ্গলনাদে বিদ্যাপতির বিরহপদ মহিমান্বিত। সুবিখ্যাত এই পদগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে আশঙ্কা হয়, আমাদের সমগ্র জাতিচিত্তের অনুভূতি ও আস্বাদন ইহাদের এমনভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। এই সব পদ যেন জাতির চেতনা ও বেদনার প্রাণরূপ। প্রথমে অশ্রুজলে ভাসমান বৃন্দাবনকে মনে পড়ে—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নজলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥ (৭৩৩)

রাধার কাছে সকলই শূন্য, কারণ তাহা কৃষ্ণশূন্য। একদিন সব পূর্ণ ছিল, কৃষ্ণের গলায় রাধা-মালতীর মালা উঠিয়াছিল। সে মালা দুই হাতে ছিঁড়িয়া কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন—অশ্রুনিঃশ্বাস দিয়া গড়া কয়েকটি শব্দ পাইলাম পরপর—

পিয়া গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈসে মালতীমালা॥ (৭২৬)

রাধা অতঃপর নিজ বেদনার গান গাহিবেন। সে গান কিন্তু দুঃখরাতের ম্লান রুদ্ধকণ্ঠের গীত হইবে না। রাধা উদ্দীপ্ত হইবেন, উদাত্ত হইবেন। দুঃখের ঘনগৌরব ধ্বনিময় হইয়া উঠিবে। দীর্ণ ক্রন্দন শুনিব—

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আতর ভেলা॥ (৭২৭)

অপূর্ব উন্মাদনায় কণ্ঠে সাগরকল্লোল তুলিবেন—

সজনি কো কহ আওব মধাঈ।
বিরহ-পয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মনে নহি পতিআঈ॥ (৭২৯)*

---

*অনুরূপ উক্তি অন্যত্র :—
বিরহ পয়োধি, কাম নাব তহি
আশ ধরএ কড়হার। (৫০৮)
(বা কণ্ঠহার)
—বিরহ পয়োধি, তাহাতে কাম নৌকা, কর্ণধার হইল আশা, অথবা (কন্ঠি) কণ্ঠহার আশা দিল।

বিরহের এই উদার ঘোষণা বৈষ্ণব কাব্যে অদ্বিতীয়। বিরহ যে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) "সৃষ্টির আগুন-জ্বলা"—এই সকল পদই তার চরম প্রমাণ। এমন সব পদ আছে বলিয়াই মিলন অর্থপূর্ণ, মূল্যবান। এই সকল পদের বেদন-মহাকাব্য-ধ্বনি মিলনের সুখানন্দকে গরীয়ান করিয়া তোলে।

এই ধরনের আরো অংশ উদ্ধৃত করা চলে, যেখানে আছে দুঃখের পরম জ্যোতি। রাধিকা দেহকে তুচ্ছ করিয়া নিজের প্রেমকে দীপ্ত করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলেন—

> গরল ভখি ঘোঞে মরব
> রচি দেহ মোর চিতা। (৭৩০)

'সখি হে, হামারি দুখের নাহি ওর' নামক অতিখ্যাত বর্ষাবিরহের পদটি অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছি বলিয়া এখানে তুলিলাম না, কিন্তু সেই ধ্বনি আর যে দুই ছত্রে ফুটিয়াছে উদ্ধৃত করিতে পারি—

> মধুপুর মোহন গেল রে
> মোর বিহরত ছাতি।—(৮৫০)

এবং উপস্থিত করিতে পারি হিল্লোলিত কল্লোলিত ব্যাকুলতা-প্রবাহটিকে—

> কহত কহত সখি বোলত বোলত রে
> হামারি পিয়া কোন্ দেশ রে।
> মদন শরানলে এ তনু জরজর
> কুশল শুনইত সন্দেশ রে॥ (৭৩১)

ঐ পদেই অতঃপর সুবিখ্যাত আত্মঘোষণা—

> শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
> তোড়হ গজমোতি হার রে।
> পিয়া যদি তেজল কি কাজ সিঙ্গারে
> যামুন সলিলে সব ডার রে॥
> সীথাক সিন্দুর পোছি কর দূর
> পিয়া বিনু সবহি নৈরাশ রে। (ঐ)

এই অবসরে উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়—রাধার সজ্ঞান গৌরববোধ। এখানে রাধার দেহবুদ্ধি আছে এবং রাধা সত্যই একেবারে

ছিন্ন ও ভ্রষ্ট মালতীর মালা নহেন। রাধার মধ্যে এই প্রভান্বিত আত্মবুদ্ধিই রাধার বিশেষ চরিত্র, যে রাধাকে বিদ্যাপতি দর্শন ও নির্মাণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির উন্নততম প্রেমও যে পার্থিব প্রেমের পরিণতি, এই সকল স্থান হইতে বোঝা যায়। জীবনবোধের এই গভীরতাতেই বিদ্যাপতির বিরহপদের মর্যাদা। সামান্য পূর্বে অংশবিশেষে উদ্ধৃত কয়েকটি পদের পরিত্যক্ত অংশের আলোচনা করিলে বিদ্যাপতির মনোবৈশিষ্ট্য বোঝা সম্ভব হইবে। "পিয়া গেল মধুপুর হাম কুলবালা" (৭২৬) পদের কয়েক পংক্তি হইল—

"কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥

এই পদে, যেখানে আর্তির অসাধারণ মহিমা, সেখানেও রাধা কর্তৃক নিজ দুঃখের বর্ণনায় আমিত্ব প্রাধান্য পাইয়াছে—আমি মালতীর মালার মত পড়িয়া রহিলাম, আমার নয়নের নিদ্রা গেল, আমার হাসি গেল, আমার সুখ গেল, আমার সর্বস্ব গেল—অর্থাৎ আমি। এ বস্তু চণ্ডীদাসীয় আত্মবিস্মৃতি নয়।

৭২৭ পদের ('চীর চন্দন উরে হার ন দেলা') শেষের দিকে মহিমা-লুণ্ঠিত রাধার আক্ষেপবাণী শোনা যায়। কৃষ্ণকে পাইয়া রাধা গরবিণী হইয়াছিলেন, প্রেমগর্বে কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, সে গর্ব ধূলায় শয়ান। রাধার নিঃশেষিত বিধ্বস্ত রূপ এই পদে পূর্ব মহিমার পটে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৭৩১ পদে তো ("কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে") রাধিকা পরিষ্কারভাবে নিজের ঈর্ষাকাতর হৃদয়ের রূপ উদঘাটিত করিয়াছেন—

হামারি নাগর ভথায় বিভোর
কেহন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাএ নাগর সুখী ভেল
হামারি হিয়া দয় শেল রে ॥

এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ "সজনি কো কহ আওব মাধাই" (৭২৯)। এই পদে রাধা নিজের ব্যথাকাতর অবস্থা ফুটাইতে কতকগুলি

অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। অলঙ্কারগুলির একটিতে অন্ততঃ রাধার আত্মবুদ্ধি ও অহঙ্কার নিতান্ত পরিস্ফুট—

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ঐ নবযৌবন বিরহে গমায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥

রাধার যৌবন-সৌন্দর্যের মূল্যকে আমরা স্বীকার করি; মানিতে বাধা নাই যৌবনে যৌবনবস্তুকে লাভ করিলে রাধার প্রেম পূর্ণ তৃপ্তি পাইত। কিন্তু তাই বলিয়া, রাধা-কর্তৃক যৌবন-গতে প্রিয়স্নেহ আসিলে তাহা লইয়া "কি করিবে"—অর্থাৎ প্রিয়স্নেহ তখন ক্ষীণমূল্য হইয়া যাইবে—এই ঘোষণা? রাধা তো এই পদে তাহাই বলিয়াছেন—এই নব-যৌবন যদি বিরহে কাটাইব, (পরে) প্রিয়স্নেহ লইয়া কি করিব? এই পংক্তির ব্যাখ্যা নিশ্চয় অন্যভাবে করা যায়, বলা যায়, রাধা যৌবন থাকিতে প্রিয়তমকে নিতান্তই চাহিতেছেন, এবং সেই বাসনার ভাষা-রূপ হইল ঐ প্রকার; কিংবা পরবর্তীকালে গতযৌবনাকে পাইয়া কৃষ্ণের কোনো সুখ হইবে না, তাই রাধার আক্ষেপ, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই সকল 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা বিদ্যাপতির ঐ বিশালায়ত পদের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিবে। না, তাহা নয়, নিজ যৌবন সম্বন্ধে রাধার ঐ আত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রীতিরূপটি অপূর্ব; উহাই এই পদের গৌরব—যৌবনের বেদীতে জীবনের আহ্বান রাধার বিরহানুভূতিতে চারিত্র-শক্তি ও প্রাণবলিষ্ঠতা দিয়াছে। বক্তব্যের এই রূপটি মিলনোল্লাসী বিদ্যাপতির নিজস্ব।

অধ্যাত্ম বিরহের আলোচনা শেষ করিয়া আনিয়াছি। সর্বপ্রকার বিরহ-রূপকে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সর্বশেষে বাকি আছে একটি রূপ—অভেদরূপ। এতদিন জানিতাম বিরহ হয় ভেদে—নায়ক ও নায়িকা যখন বিচ্ছিন্ন। এখন জানিতেছি অভেদেও বিরহ থাকে। এই অভেদ-বিরহের এক রূপ আছে প্রেমবৈচিত্ত্যে, যখন প্রেমের উৎকর্ষে আশ্লেষবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা বিরহভাবনায় শিহরিয়া ওঠে। আমরা এখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের কথা বলিতেছি না, বিদ্যাপতি অন্য একটি অভেদে বিরহ আনিয়াছেন। বিরহকালে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ যেমন স্থাবর জঙ্গম সর্বত্র রাধারূপ দেখেন, তেমনি বিদ্যাপতির রাধাও সর্বত্র কৃষ্ণকে চান। সে কামনার এমন ঐকান্তিকতা,

এমনই চিন্তা-ভাবনা-ধ্যানের প্রবলতা যে, একসময় রাধা কৃষ্ণ হইয়া যান। ভাবনায় অভেদ-প্রাপ্তির ভাবনা বিদ্যাপতির বিশেষত্ব। আমরা 'প্রার্থনা' আলোচনায় হরিহরের অভেদমূলক পদ, কিংবা হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির রূপ দেখিয়াছি। ৭৪১ পদে নানা অলঙ্কারে রাধার বিধ্বস্ত অবস্থা বিস্তৃতভাবে রূপায়িত করার পরে কবি ভণিতায় বলিলেন—

ভণই বিদ্যাপতি কয়িয়ে শপতি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিত ভাবিত তোহারি চরিত
ভরম হইল যথা॥

"বিদ্যাপতি শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আরো অপূর্ব কথা এই যে, তোমার চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে (তোমারই) ভ্রম হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজেই কৃষ্ণ এইরূপ ভ্রম হইতেছে।"

বিদ্যাপতির রাধাই কেবল কৃষ্ণ হন না, কৃষ্ণেরও রাধা হইবার সম্ভাবনার কথা বিদ্যাপতির মনে উঠিয়াছে। বৈষ্ণব-দর্শনে চৈতন্যাবতারের তাত্ত্বিক কারণের আভাস বিদ্যাপতির পদে খুঁজিয়া পাই—

কাহ্নু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥ (৭৫০)

প্রেমের অভেদ-ভাবনার সর্বোত্তম পদ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি।—সেই উৎকৃষ্ট পদ—

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিসরল
আপন গুণ লুবুধাঈ॥
মাধব, অপরূপ তোহারি সিনেহ।
অপনে বিরহে অপন তনু জরজর
জীবইতে ভেল সন্দেহ।
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছলছল লোচন-পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটইত
আধা আধা কহ বাণী॥

রাধা সয়ে যব পুন তহি মাধব
মাধব সয়ে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥
দুহু দিশে দারু-দহনে যৈসে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ (৭৫১)

এই পদটিকে প্রেমতন্ময়তায় তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্তির দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হয়। রাধিকা কৃষ্ণ-চিন্তায় স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন। এবং এমনই অনুভূতির নিবিড়তা যে, মথুরাগত কৃষ্ণের জন্য রাধার বিরহবোধ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া একটি নূতন অস্বাভাবিক বিরহের সৃষ্টি হইয়াছে—রাধা মাধব হইয়া রাধার জন্য কাঁদিতেছেন রাধাদেহের মন্দিরে।

এই অনুভূতির বৈচিত্র্য পদটিকে একটি অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যদান করিয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলীতে এই রকম আর একটি পদ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। বিদ্যাপতির কবি-স্বভাবের ব্যাপকতা, মুক্তি ও স্ফূর্তি, গহন গাম্ভীর্য এবং, জ্ঞানাত্মক ভাবসাধনার প্রমাণরূপে ইহার উল্লেখ করা চলে। ইহাকে অদ্বৈত-ভাবপ্রাপ্তির, বা সম্পূর্ণ সত্তা-রূপান্তরের দৃষ্টান্ত বলিতে ইচ্ছা করে, এবং যথার্থ মনন ও 'মরমে'র সমন্বয় যাঁহার মধ্যে, তিনিই এইরূপ একটি পদ লিখিবার অধিকারী।

পদটি কিন্তু আধ্যাত্মিক অবস্থাবিশেষের সাক্ষ্যমাত্র নয়—ইহার কাব্যগৌরব ভাবস্থ অবস্থার চিত্রণ-কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে না—ইহা বিরহের পদ, প্রথমতঃ এবং শেষতঃ, এবং বিরহকে এমনভাবে প্রকাশে অন্য যে-কোনো বৈষ্ণবকবি অসমর্থ। বিরহের এক রূপ আমরা জানি—হৃদয়বিদার হাহাকার—সেই হইল বিরহের পরিচিত রূপ। কিন্তু সে বিরহ একমুখী—কৃষ্ণের জন্য রাধার বিরহ, কচিৎ রাধার জন্য কৃষ্ণের। কিন্তু উভয়ের বিরহ যখন এক দেহে মিলিত হয়, সে যন্ত্রণার পরিমাপ করিবে কে? রাধা কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতেছেন, কৃষ্ণ রাধার জন্য কাঁদিতেছেন—কান্নার মিলিত অগ্নিশয্যাটি কিন্তু রাধাদেহে সজ্জিত। ভাবোল্লাসকে প্রভূত সম্মান করা হইয়াছে বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায়। সেখানে বিরহখিন্না রাধা ধ্যানলোকে কৃষ্ণকে পাইয়া

আনন্দোচ্ছুসিতা, সে এক অতি উচ্চ ভাবাবস্থা। আমরা সাহসের সঙ্গে বলিব, রাধার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনায় সে অবস্থাও লঘু। যতক্ষণ "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মধাই"—ততক্ষণ ভাবসম্মিলন। কিন্তু সেই মিলনানন্দ আস্বাদন করিতে না করিতে বিরহিণী রাধার ইদানীং পরিবর্তিত রূপ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বিরহযন্ত্রণা শুরু হইয়া গিয়াছে—কৃষ্ণ রাধাগুণ কামনা করিয়া বিচলিত—"আপন গুণ লুবুধাই"। রাধা যদি এই মাধবরূপে বেশীক্ষণ অবস্থান করিতে পারিতেন, বিরহ একমুখী হইয়া যন্ত্রণা লঘুমূল্য হইয়া পড়িত। সুতরাং পুনশ্চ রাধার পরিবর্তন, অর্থাৎ মাধবের জন্য রাধার আর্তনাদ। কবি এই অবস্থা দেখিয়া প্রায় বাক্যহারা—একটি সরল উপমায় অবস্থাটিকে আমাদের গোচর করিতে চাহিয়াছেন—'দুহু দিশে দারুদহনে যৈসে দগধই আকুল কীট পরাণ।'—কাঠের দুই দিক পুড়িলে মধ্যবর্তী কীটের যে অবস্থা হয়—রাধারও সেই অবস্থা।

শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মিক ভাবপর্যায় লইয়া বহু তত্ত্বব্যাখ্যা হইয়াছে। বৈষ্ণবপদে চিত্রিত রাধা বা কৃষ্ণের নানা রূপের সঙ্গে তাঁহার ভাববস্থার তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ বলিয়া কথিত এই পুরুষের দিব্যোন্মাদ অবস্থার যথার্থ রূপ-নির্দেশক যদি কোনো একটি পদ থাকে, তবে তাহা এইটি। স্বরূপ-দামোদর "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" শ্লোকে যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অবস্থাটি বহুপূর্বে একটি পদে অত্যাশ্চর্য কাব্যসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাধা ও কৃষ্ণ, উভয়ের বিরহে দুইদিক হইতে দগ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যের স্বর্ণদেহ মাত্র ৪৮ বৎসর পৃথিবীতে জ্বলিয়াছিল।

ভাবসম্মিলন : 'কেন্দ্রীয় অগ্নির' আলোকে

আমি পুষ্পের শব্দ শুনেছি, দেখেছি সুরের আলোক।

সর্বোন্নত মানুষেরা আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে যন্ত্রণাকে বরণ করেন। তাঁরা বেদনার মধ্যেই অমৃত-রহস্যের ও নিত্য-মুক্তির পথপ্রদীপকে দেখেছেন। ঐ বেদনাই মহোল্লাসের দীক্ষাগুরু।

দুঃখ-সহন হল নিত্যের জন্য দেহচালনা, ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর প্রেমালিঙ্গনের সাধনা।

সৌন্দর্য হোল অতীন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-বরণ।

যথার্থ সৌন্দর্য, মন ও বস্তুর আদর্শ ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। এক সময়ে এই ঐক্য এমনই সম্পূর্ণতা পায় যে, সেই চরমাবস্থা একটি পূর্ণাত্মক আবেগের সৃষ্টি করে। সুন্দর তখন সুমহান হয়। সে অবস্থা আধ্যাত্মিক, পরমের সঙ্গে সংযোগের ক্ষণ। পার্থিব বস্তু ও অহং-এর উপরে উঠতে না পারলে সে অবস্থালাভ সম্ভব হয় না।

সৌন্দর্যের দিব্যরূপের স্পর্শকালে, সৌন্দর্যচেতনা যখন মধুর অনুভূতি থেকে বিপুল আবেগে রূপান্তরিত হয়েছে—তখনকার সেই আনন্দোল্লাসের মধ্যে একটি বিস্ময়যুক্ত ভীতির সঞ্চার হয়। এই সব মাহেন্দ্রক্ষণে সৃষ্টি অভিনব প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হয়, এবং এমন একটি জ্যোতির্ময় গরিমা লাভ করে, যা সম্পূর্ণ তার অন্তর্লীন নয়—উপর থেকে বর্ষিত—বর্ণরঞ্জিত কাঁচের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত ঐশ্বর্যময় আলোকের মতই তার রূপ। এই সব গাঢ় তীব্র চেতনার ক্ষণে প্রতিটি তৃণখণ্ডও যেন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে পরম জ্যোতির এক এক উৎস।

পরমের বার্তা আসছে। যারা প্রস্তুত, তাদের কাছে পূর্ণ জীবন, পূর্ণ সুষমা, পূর্ণ সত্যের সংবাদ আসবে, স্থান-কালের ঊর্ধ্বাসীন সেই সংবাদ—যে সংবাদকে ধর্ম, সৌন্দর্য, প্রেম ও বেদনার ভাষায় অনুবাদ করা হয়, অনুবাদের কালে বিকৃতও করা হয় বহু সময়।

সে জগৎ অকল্পনীয়, অরূপ, উজ্জ্বলতার আধিক্যে ঘনকৃষ্ণ।

তাত্ত্বিকেরা যাকে কটাক্ষে মাত্র দেখতে পেয়েছেন, যাকে তাঁরা মাত্র সংজ্ঞাবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন, আবিষ্কার করতে পারেন নি, শিল্পী যার অত্যুজ্জ্বল ধাঁধানো রূপ দেখেছেন ক্ষণকালের জন্য, আধ্যাত্মিক (মিস্টিক) সেখানে নির্ভয়ে প্রশান্ত বিশ্বাসে তাঁর প্রিয়তমের নয়নের ভিতর দৃষ্টিপাত করেছেন।

পরম নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটি গোপন কথা উচ্চারিত হয়েছিল আমারি জন্য।

নিভৃত অন্ধ উদ্‌গত উদ্ধত প্রেম।

মানুষ কখনো কখনো তাঁর গোপন অভিপ্রায়ের সন্ধান পেয়ে যায়, সন্ধান পায় অসামান্ত সত্যের; দেখে—অখণ্ড শান্তিময় এক পরম ঐক্য সকল সৃষ্ট বস্তুর অন্তরে দীপ্যমান। তার সত্তার মধ্যে তখন জেগে ওঠে সম্ভ্রম, শরণ ও প্রেমের পবিত্র আবেগ। সে তখন বিস্তারিত হয়, ব্যক্তিত্বের বেড়া ভেঙে যায়, ইন্দ্রিয়-জগৎকে অতিক্রম করে, আত্মার আরোহণ করে, এবং কিছুকালের জন্য সর্বের মহাজীবনে প্রবেশাধিকার পায়।

মিস্টিক বলতে পারে, কার্যতঃ বলতে বাধ্য—'আমার রহস্য আমারই।' কিন্তু শিল্পী তেমন বলায় অনধিকারী; নিজ দর্শনকে উন্মোচন করার দায়িত্ব আছে তার। তার প্রেম-কথা তাকে বলতে হবেই।…রূপকে-সঙ্কেতে-অলঙ্কারে তার 'দর্শন'কে, যে অনন্ত অরণ্যের সন্ধান পেয়েছে তাকে, অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করতেই হবে। শিল্পী তাঁর প্রতিবেশী ও পরমেশ্বরের মধ্যে বার্তাবহ—কারণ শিল্প হল বস্তু ও সত্যের মধ্যে যোগসূত্র।

নিঃসঙ্গের অভিমুখে নিঃসঙ্গের পক্ষধ্বনি।

মিস্টিকদের বিষয়ে প্রযুক্ত 'প্রেম' শব্দটিকে গভীরতম পূর্ণতম অর্থে গ্রহণ করা চাই, কারণ এই প্রেম আত্মার মূলতম সবেগের চরম প্রকাশ; সাধারণতঃ আমরা যাকে 'প্রেম' বলে থাকি, তেমন উপরিচর আকর্ষণ বা ভাসমান আবেগ নয়।

তাঁর বিনাশী আলোয় অগণ্য প্রেমিকের আত্মা পুড়ছে। সংসার ছেড়ে আশ্রমকে আশ্রয় করেছে যেসব প্রেমিক, তারা অগ্নিদগ্ধ পতঙ্গের মত, তাদের পুড়িয়েছে প্রিয়তমের মুখাগ্নি।

জীবনের নির্ঝর হল প্রেম।
যে নেই প্রেমের মধ্যে, সে মৃত।

প্রেমের জন্য সব দেওয়াই হল মধুরতম দোকানদারি।

আমাকে ভালবাসতে দাও, মর মরতে দাও।

ওগো পরম আত্মা, সৃষ্টির পূর্বেও আমি তোমাকে চেয়েছি, এখনো তোমাকে চাইছি। তুমিও চাও আমাকে। আমাদের দুজনের বাসনা যখন মিলিত হবে, তখন পূর্ণ হবে প্রেমের পাত্র।

সে তৃপ্তি পায়, কারণ সে চায়নি।
তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ সে তাকে বিলীন করে দিয়েছে।
অধ্যাত্মজগতের এই হোল বিপরীত সত্য।

বাঁচি আর মরি, আমি তাঁরই।

তাঁকে খুঁজতে হবে না এখানে ওখানে, তিনি হৃদয়-দুয়ারেই দাঁড়িয়ে আছেন, একেবারে।

সেখানে দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে আছেন, যতক্ষণ না দ্বার খুলে দেবার জন্য, তাঁকে ভিতরে ডাক দেবার জন্য, তুমি প্রস্তুত হচ্ছ।

তাঁকে দূর থেকে জোর করে ডাকতে হয় না, কেননা তোমার থেকে তাঁর প্রতীক্ষা অনেক বেশী দুঃসহ। তুমি তাঁকে যতখানি চাইতে পারো তার চেয়ে সহস্রবার বেশী তিনি তোমাকে চান।

তুমি খুলে দিলে, আর তিনি প্রবেশ করলেন—মুহূর্তও কাটেনি এর মধ্যে।

আমি তোমাকে তাড়িত করে ফিরি, কারণ সেই আমার আনন্দ।
আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরে ফেলি, কারণ সেই আমার বাসনা।
আমি তোমাকে বেঁধে ফেলি, কারণ তোমার বন্ধনে আমার উল্লাস।
আমি আহত করি তোমাকে, কারণ তার দ্বারা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হই।
আমি যে তোমাকে আঘাত করেছি—সে তোমার দ্বারা পরিগৃহীত হব বলে।

পৃথিবী এড়াতে পারে না আকাশকে। সে উঁচুতে উঠুক বা নীচে নামুক, আকাশ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপরে, তাকে সুফলা করে তোলে, সে চাক বা না চাক। ঈশ্বরও তাই করে মানুষকে। যে মনে করে তাঁকে এড়িয়ে গেছে, সে তার বুকে উঠে পড়েছে, কারণ সকল পথের প্রান্তে তিনি আছেন।

আমাকে সে চুম্বন করুক—তার সেই মধুমুখে।

বিদেশী ভাষাবদ্ধ কতকগুলি সুন্দর রহস্যকে মুক্তভাবে অনুবাদ করিয়া দিলাম। চয়ন ও ভাষান্তরের কালে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করি নাই। এই প্রথম ইচ্ছা করিয়া এই রচনায় বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিয়াছি। কিন্তু একথা বলাও অহঙ্কার, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমি এতগুলি ভাবময় উক্তি উদ্ধৃত করিলাম কেন, যে উক্তিগুলি মানুষ-শিল্প-ঈশ্বর, সকল বিষয়ে প্রযুক্ত এবং অনেক সময়ই আপাত বিপরীত? বোধহয় এইজন্য যে, যে-আলোচনায় প্রবেশ করিতে চাহিতেছি, সেখানে লৌকিক প্রেমব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। এখানে দেহের প্রাকার ভাঙিয়াছে—এখানে ভাবমিলনের অতীন্দ্রিয় ভুবন।

হাঁ, সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই অতগুলি বিদেশী উক্তি সঞ্চয়ন। উক্তিগুলি পাঠ করিলেই বোঝা যায়, সর্বদেশীয় অতীন্দ্রিয়বাদীদের কেন একরাজ্যের অধিবাসী বলা হয়। গঙ্গার ও জর্ডন নদীর জলে এখানে মেশামেশি। এখানে পারসিক মরমীয়া ও ভারতীয় বৈষ্ণবের প্রেমালিঙ্গন। প্রেমের সর্বাধিক গভীর অধ্যায়ে প্রবেশের কালে বিদেশী প্রেমের সুগভীর বার্তাকে আমন্ত্রণ না করিয়া পারি নাই।

মনে হয় ভাবমিলনের আলোচনাকালে 'ঈশ্বরের হৃৎস্পন্দন' শুনিবার সময় আসিয়াছে। আমরা 'কেন্দ্রীয় অগ্নির' নিকটবর্তী। দিব্যের বিশাল বিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যে যে একটি নিভৃত নিথর শয্যা পাতা আছে, আমরা তার সন্নিকট। নিত্যের মধ্যে নয়নপাত করিতে পারে, এমন রহস্যময় আত্মার চক্ষু কোথায় আছে! সে রহস্যকথা যাঁহারা বলিতে চান, তাঁহারা বলেন—আমি তাহাকে প্রাণের পাঁজরে অনুভব করিয়াছি, আত্মার নয়নে দেখিয়াছি, দিব্যের কর্ণে শুনিয়াছি। সর্বাপেক্ষা সহজ পথ হইল—'তুমি নীরব থাক, ঈশ্বরকে কথা বলিতে দাও।' কিন্তু প্রতি মানুষই অভিমানী, প্রকাশব্যাকুল। দান্তের বিপুলতম ক্রন্দন ক্ষুদ্রতম মানুষেরও ক্রন্দন—

> সে লোকে পাড়ি দেবার যোগ্য ছিল না আমার পক্ষ,
> তবু জেগেছিল কামনা,
> কারণ আমার মনকে জ্বালিয়েছিল বিদ্যুতের দাহ।

সর্বাপেক্ষা সহজ পথ লইয়াছি, আমি মহৎ মানুষদের কথা শুনিতে চাহিয়াছি সূচনায়। ভাবসম্মিলনের সেই হইল গৌরচন্দ্রিকা।

মাথুরের অন্তহীন সাগরে নিক্ষিপ্ত রাধাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এইখানে শেষ করিলে বৈষ্ণবকাব্য মিলনাত্মক প্রেমকাব্য থাকে না। বিপ্রলম্ভের মাহাত্ম্য বৈষ্ণবকাব্যে স্বীকৃত, কিন্তু সম্ভোগের পুষ্টিকারক রূপেই। বৈষ্ণবের হৃদয়বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। সুনিশ্চিত বিচ্ছেদে তাই কাব্য সমাপ্ত হয় কিভাবে? অথচ ভাগবতে বা অপর কৃষ্ণ-কাহিনীতে কৃষ্ণের মথুরাপ্রস্থানের কথা আছে, তাহা কার্যতঃ বৃন্দাবন হইতে চিরবিদায়। সেক্ষেত্রে বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়। কোনো কোনো কবি (স্বয়ং বিদ্যাপতিও) অস্বস্তি কাটাইতে কখনো-বা কৃষ্ণকে মথুরা হইতে ফিরাইয়াছেন। কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করিলে কাব্যের ক্ষতি—মাথুর-বিরহের মহিমাহানি; তাছাড়া বৃন্দাবনে সত্যই তো কৃষ্ণকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখা যায় না। সুতরাং লীলার শেষ অংশে স্থায়ী বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কবিদের এখানে উভয় সঙ্কট। কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিলে কাব্য যায়, কাহিনীও যায়। অন্যদিকে না ফিরাইলে বৈষ্ণবকাব্য প্রেমমিলনের কাব্য থাকে না। তাত্ত্বিকেরা এই অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের প্রকটলীলা ও নিত্যলীলার তত্ত্ব কহিয়া সামঞ্জস্য আনিতে সচেষ্ট। প্রকটলীলায় বিচ্ছেদ—নিত্যলীলায় রাধাকৃষ্ণ চিরমিলিত। কবিদের পক্ষে নিত্যলীলার উপর দায় চাপাইয়া সরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই; কাব্যের পক্ষে সুসঙ্গত, মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা তাঁহাদের দিতে হয়। সুতরাং তাঁহারা পথ লইয়াছেন মনোমিলনের—প্রেমের ধ্যানশক্তিতে যেখানে বিচ্ছেদ-সাগরের মধ্যেও মিলনদ্বীপ রচনা করা যায়। এই মিলনের নাম ভাবসম্মিলন। বিরহিণী রাধার তীব্র ধ্যানের জগতে কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ দেহরূপে উপস্থিত। তেমন কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনে রাধা আত্মহারা। প্রেমানুভূতির অপরূপতা এইখানে।

ভাবসম্মিলন নামটির প্রাচীনত্ব লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শব্দটি নাকি পুরাতন নয়। তাছাড়া ভাবমিলন যে-কোনো সময়েই ঘটিতে পারে। যে-রাধার অন্তরে নিরন্তর 'মনোভবসিন্ধু' উচ্ছলিত এবং 'শ্যামর ইন্দু' উদিত, সেখানে অধিকতর অনুভূতি-গাঢ়তার ক্ষণে, সাময়িক বিরহের সময়েও, কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দৃষ্ট হওয়া অদ্ভুত কিছু নয়;—সুতরাং ভাবসম্মিলনের জন্য মাথুর-বিরহের পরবর্তীকালের কথা ভাবিব কেন? প্রতিবাদ অতি ন্যায্য; মানিতে বাধা নাই যে, রাধার মত প্রেমে ভাবমিলন যে-কোনো কালেই সম্ভব; ভাবমিলনের পদগুলিকে মিলনের অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত; করা প্রয়োজনও বটে, কারণ তাহাতে মিলন-পদগুলি নিছক দেহাসক্তির গ্লানি হইতে মুক্তি

পায়। এবং যেখানে ভাবগত উল্লাস আছে, সেখানে পরিচিত 'ভাবোল্লাস' নামটিই গ্রহণযোগ্য। এ সকল কথা খুবই সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য, ভাবসম্মিলন নামটি অতি সুন্দর, যদি একালে কথাটি তৈয়ারী হয়ও। ভাবসম্মিলনের ব্যাখ্যাটিও তেমনি মনোরম। একালের বৈষ্ণব কাব্যরসিক কথাটি রচনা করিয়া ও রচনার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া, বৈষ্ণব রস-ভাবনায় সত্যই উপযুক্ত কিছু যোগ করিতে পারিয়াছেন। ঐতিহ্যমুখেই এই সংযোগ তাঁহারা করিয়াছেন। ভারতীয় ভাবনায় মহৎ প্রেম বিচ্ছেদে সমাপ্ত নয়—উত্তর-কবির রচিত সীতার পাতাল-প্রস্থানেই মাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম—রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলনে বিশ্বাস, এবং রাধার প্রেমানুভূতির নিবিড়তায় আস্থা হইতে ভাবসম্মিলন-বিষয়ক ধারণার উদয়। রাধার কামনার প্রবলতা কৃষ্ণকে কেবল ধ্যানে অবতরণ করায় নাই, রক্তমাংসের শরীর পর্যন্ত দিয়াছে, যাহার সহিত দেহমিলন সম্ভব-পর। তাছাড়া ভাবসম্মিলন যে-কোনো কালে সম্ভব হইলেও কৃষ্ণের মথুরা-গমনের পরে অধিকতর সম্ভবপর, তাহাতে সন্দেহ কি? যখন কৃষ্ণ সত্যই বাস্তব দেহে আসিতে পারেন—যেমন সাময়িক বিরহের ক্ষেত্রে—তদপেক্ষা যখন কৃষ্ণের কোনরূপেই আসা সম্ভব নয় তেমন স্থানেই ভাবসম্মিলন অধিকতর যৌক্তিক হয় না কি? তেমন ভাবসম্মিলনের ক্ষেত্রে আমরা রাধার প্রেমোৎ-কর্ষ দর্শনে বিমুগ্ধ হই, অন্যদিকে এই মিলন যে অচিরস্থায়ী, অবিলম্বে রাধার সুখধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইবে, ও রাধা পুনরায় অধিকতর যন্ত্রণামধ্যে উৎক্ষিপ্ত হইবেন, ইহারই বেদনার করুণায় মন ভরিয়া থাকে। এইকালে রাধার এত-বড় প্রাপ্তিকেও মনে হয় আত্মপ্রবঞ্চনা, মনে হয় সর্বনাশের নীলার মত রাধার প্রেম, ভাবমিলনটুকু ভিতরের রক্তচ্ছটা।

পূর্ব অধ্যায়ের আলোচ্য বস্তু ছিল বিরহ। বিরহান্তে সাধারণ মিলনের কিছু চিত্র দেখিয়া লওয়া কর্তব্য। বিচ্ছেদ বর্ণনার পর মিলনের বর্ণনা করা হয় কারণ কবিরা নিরন্তর মিলন দেখাইতে চান না; বিচ্ছেদের ধাক্কায় মিলন-তরঙ্গকে বিক্ষুব্ধ করিয়া মিলনের বেগশক্তি প্রমাণ করিতে সচেষ্ট থাকেন। 'বুকে বুকে মুখে মুখে' যাহারা রজনী গোঙায়, তাহারা সাধারণতঃ দিবসে বিচ্ছিন্ন। গুরুজন, পরিজন ও নিষ্ঠুর প্রভাতী সূর্য মিলনের শত্রু। কবিরা রাধাকৃষ্ণের মনের মধ্যেও মিলনবৈরী আবিষ্কার করিয়াছেন—প্রেমকুটিল মান-ময় মন সেই বৈরী; অবিশ্বাসী, অধৈর্য মনও তাই। মান-পর্যায়ে নায়ক-নায়িকার স্বয়ংসৃষ্ট

বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদান্তে মিলনের চিত্র দেখিয়াছি। এখন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বিরহশেষের মিলন-বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। একটি পদই লইব—৭৫৮ পদটি—

চিরদিন সো বিহি ভেল অনুকূল।
দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহু অধরামৃত দুহু মুখ ভরু॥
দুহু তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুন সদনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহু তৈছে বিহার॥ (৭৫৮)

বিদ্যাপতির অন্যান্য মিলনপদের সঙ্গে এই পদের অন্তরগত পার্থক্য একটু লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়। দীর্ঘ বিরহের অন্তে মিলন হওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত মিলনের মধ্যেও বিরহ জড়াইয়া আছে। এই মিলন নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়-লোকে, তবু ইন্দ্রিয়ের বর্ণরশ্মিপাত করিতে কবির যেন সাহসের অভাব—বহুদিন পরে প্রিয়তমকে পাওয়া গিয়াছে, এই নিধিপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞ পুলকেই মনপ্রাণ পূর্ণ।

এই যে মিলনচিত্র দেখিলাম, ইহা দেহের ভারে নয়, ভাবের ভরে কম্পিত। এইরূপ আরো একটি সুন্দর ভাবাত্মক মিলন চিত্র পাই—যে পদে বাস্তব মিলন-বর্ণনার লোভ সংবরণ করিয়া কবি অনুভূতির অনির্বচনীয়তাকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন—

"সেই বিধি বহুদিন পরে নির্বাধ হইল। দুইজনের কামলিপ্সা পূর্ণ করিল। মাধব রতিসুখের স্থানে আসিল, রমণীর মনের উল্লাস বাড়িল। তাঁহার দেহের সুগন্ধে দিগন্ত ভরিয়া গেল। তাহা অনুভব করিয়া কামও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, কুমুদিনী ইন্দু পাইল, সখিগণের আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল।" (৭৫৭)

স্নিগ্ধ ও ভাবস্নাত। ইঙ্গিতে ও আবেশে অনবদ্য। রমণীর কামলিপ্সা পূর্ণ হইয়াছে—মিলনবিষয়ে এইটুকু বলাই যথেষ্ট। বাকি অংশে ঐ মিলনেরই রসধ্বনি। মাধব বহুদিন পরে রতিসুখের স্থানে উপনীত হওয়ায় কবির মনের পুলকোচ্ছ্বাস, সখিগণের আনন্দ-সিন্ধুর উত্তালতা, রমণীর হৃদয়ের

ভাবোদ্বেলতা। এই রসাবেশ-ক্ষণে মাধবের উপস্থিতির মাহাত্ম্য বাণীব্যঞ্জনায় উদ্ভাসমান—

সে তনু পরিমলে ভরল দিগন্ত।
অনুভবি মুরুছি পড়ল রতিকন্ত॥

এই দুইটি পদ কিন্তু ভাববিহ্বলতা সত্ত্বেও সাধারণ মিলনপর্যায়ের মধ্যেই পড়া উচিত। ভাবসম্মিলনের পদ বলিয়া কথিত কোনো পদে যদি মিলনের বর্ণনা উপজীব্য হয়, তবে পদ মিলনেরই। দেহে দেহে বাস্তব মিলন—যত ভাবই তাহার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হোক—সাধারণ মিলনপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বস্তু। পূর্বে সাধারণ মিলনের আলোচনাকালে দেখাইয়াছি, কবি বলিয়াছেন, মিলনের যথার্থ সুখ দেহে নয়—অনুভবে। ভাবসম্মিলনের বলিয়া কথিত পদে সঙ্গমক্ষণে রাধাকৃষ্ণকে দেখান হইলে তাহাকে সাধারণ মিলন-পর্যায়ের বহির্ভূত রাখিব কোন্ বিচারে? তাই ভাবসম্মিলন বলিতে আমরা বুঝি মিলনের পূর্বপর্যন্ত, এবং কখনো কখনো মিলন-পরবর্তী একটি আচ্ছন্ন কিংবা উন্মত্ত মানসিক অবস্থার চিত্রণ, যে অবস্থায় বিরহিণী রাধা মিলনের স্বপ্নভাবনায় কিংবা মিলনসুখের স্মৃতিচর্বণে রসাবিষ্ট।

প্রথমে ভাবী মিলনকল্পনার পদ দেখা যাক—

"আমার মন্দিরে যখন কানাই আসিবে তখন নয়ন ভরিয়া তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিব। আমি যখন 'না না' বলিব, মুরারি অধিক আদর প্রীতি করিবে। আমাকে হাতে ধরিয়া কোলে বসাইবে, চিরদিনের সাধ পুরাইব। আমি মান ত্যাগ করিয়া আলিঙ্গন করিব। রসে পূর্ণ হইয়া আমি নয়ন মুদিব। বিদ্যাপতি বলেন, বরনারী শুন, তোমার পিরীতির বলিহারি যাই।" (৭৫২)

বড় করুণ। স্থূলভাবে এটি সাধারণ রসসুখলিপ্সার পদ। কিন্তু ইহার কুণ্ঠিত সোহাগ-কামনাটুকু বেদনাবৃন্তের উপর কাঁপিতেছে। নয়নপদ্মের পাপড়ি উপচাইয়া যে অশ্রু নিশিদিন ঝরিয়াছে, কোনো এক মধুমিলনের কল্পনায় সেই অশ্রুকে পদ্মে বাঁধিয়া তাহার উপর আনন্দের আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। কবি তেমন অশ্রুজ্বলা সকরুণ আলোকটুকুকে এই পদে তুলিয়া দিয়াছেন। তাই এই পদ ভাবমিলনের।

স্বপ্নে সান্ত্বনালাভের এই প্রয়াস কতবড় দুঃখের অভিব্যক্তি কবি জানেন। একটি পদের ভণিতায় তিনি রাধাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—"বরনারী শুন,

ধৈর্য ধর, মুরারিকে তুমি পাইবে।" ভণিতা হইতে মনে হয়, পদের মধ্যে বরনারীর অধীর মনের বর্ণনা পাইব। কোথায়? পদে আছে,—"গোকুলে নন্দকুমার আসিলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। রজনীর কাজের কথা কি বলিব। স্বপ্নে নাগররাজকে দেখিলাম। আজ আমি শুভনিশি কাটাইলাম। প্রাণপ্রিয়কে প্রণাম করিলাম" (৭৫৬)। অর্থাৎ রাধা রীতিমত আনন্দে আছেন। তাঁহার খুশীর সীমা নাই, রজনীর কাজের কথা বলিতে তিনি অসমর্থ, তিনি শুভনিশি কাটাইয়াছেন ইত্যাদি কত কি উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসের উৎস কী সুগভীর যাতনার মধ্যে—কবি তাহা বোঝেন। তাই সান্ত্বনা দিয়াছেন পদশেষে। আর অমর করিয়া তুলিয়াছেন বেদনাখিন্না রাধার একটি প্রণামকে—"প্রাণপ্রিয়কে প্রণাম করিলাম।" একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

এর পরেই অন্ধকারকে ছিঁড়িয়া সহসা সূর্যোদয়। ফলে, ওরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ। জাগিয়া উঠেছে গান। বিদ্যাপতির মিলন-রসোল্লাসের অবিস্মরণীয় পদটি আমাদের মনে আছে—"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।" এই পদের ভাব বিদ্যাপতির পক্ষে অভিনব নয়—অন্যত্রও প্রিয়তমের আগমনে রাধা "গৃহে গৃহে সর্বক্ষণ উৎসব" দেখিয়াছেন, এবং বিরহ-দিনের দুঃখদায়ক বস্তুগুলিকে সুখের দিনে সুখ-ইন্ধনরূপে আহ্বান করিয়াছেন—সহস্র চন্দ্র উদিত হইলেও ক্ষতি নাই, ত্রিবিধ সমীর ("মন্দ, শীতল ও সুগন্ধ") দিনরাত প্রবাহিত হোক, মধুকর লতিকা পাইয়া গুঞ্জন করুক, কোকিল আসিয়া পঞ্চমে গান করুক। (৮৬১, ৮৬২)। এই সকল বক্তব্যই চরমোৎকর্ষ পাইয়াছে বিদ্যাপতির "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ" (৭৬০) পদের উত্তাল সিন্ধু-ধ্বনিতে।

"আজু রজনী" পদটি অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছি বলিয়া এখানে সে চেষ্টা আর করিব না, কেবল একটি ছত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে চাই—পদের ভণিতায়। সেখানে আছে "ধনি ধনি তুয়া নব নেহা।" এখানে 'নব নেহা' কথার অর্থ কি? এই পদে বর্ণিত প্রেম অতি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতির প্রকাশক। দীর্ঘ বিরহ ভিন্ন এই অনুভূতির গাঢ়তা আসে না। এখানে প্রাণভেদী উল্লাসরব, সুখ দুঃখের অতীত আনন্দবাণী। এমন প্রেমকে "নব নেহা" কবি বলেন কিরূপে? ইহা কি কবির অনবধানতা, কিংবা তিনি সত্যই নব প্রেমের অবস্থাতেও রাধার দ্বারা ঐরূপ ভাবোন্মাদনা সম্ভবপর মনে করেন?

নব প্রেমের রসলাস্যের চতুর কবিশিল্পী বিদ্যাপতি নব প্রেমকে ঐ প্রকার দিব্যতা দান করিবেন মনে করার কারণ নাই, এমনও মনে করার কারণ নাই বিদ্যাপতি তাঁহার অতিশ্রেষ্ঠ এই পদে শব্দব্যবহারে অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে রাধার পূর্বোক্ত-প্রকার ভাবদিব্য অবস্থার প্রকাশে "নব প্রেম" শব্দ দুটি ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন—ধন্য ধন্য এই নব প্রেম। এখানে 'নব প্রেম' চির প্রেমেরই প্রতিশব্দ। তবে 'চির প্রেম' শব্দ নয় কেন? তার কারণ, কবি একটি চমকের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন,—অনাদিকালের হৃদয়-উৎস-উৎসারিত প্রেম-বিষয়ে "নব প্রেম" বলিয়া বিপরীত শব্দের আঘাতে এই প্রেমের অপূর্ব স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। পাঠক সচকিত হইয়া দেখিল, সত্যই তো এই চির প্রেম নব প্রেমও বটে—চির প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আস্বাদনের আঘাতে তরঙ্গ ওঠে—তখন 'চির' চির থাকিয়াই 'নব' হইয়া ওঠে। প্রেমের নিত্য নব রূপের এই অভিপ্রেত ভাবটি চির প্রেম শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যাইত না—তাই কবি বলিলেন 'ধনি ধনি অপরূপ নব নেহা'।

আমি কোনো নূতন ব্যাখ্যা আরোপ করিতেছি না তার প্রমাণ দিতে পারি। পূর্বে (৪৩২ পদের আলোচনায়) একবার দেখিয়াছি, লৌকিক প্রেমের উদঘাটন কালেও, প্রেমকে স্থায়িত্ব দিতে গেলে তাহার মধ্যে প্রথম প্রেমের আস্বাদন বজায় রাখা প্রয়োজন, কবি একথা জানাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, পুরাতন প্রেমের মধ্যে নবীন ভাবারোপের প্রয়োজনীয়তা কবির জানা ছিল। অন্যদিকে পরম আধ্যাত্মিক 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়' (৭৬২) পদটিও বিচারে আনিতে পারি। এই পদ যে বিদ্যাপতির ইহা বহুভাবে প্রমাণ করিয়াছি।* সেখানে দেখিয়াছি, লক্ষ লক্ষ যুগের প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তিলে তিলে নূতন হোয়"। অর্থাৎ নব প্রেম।

একদিকে এই আছে—চির প্রেমের 'নব-নেহ' রূপ, অন্য দিকে তাহা 'চির' রূপও বটে, যেখানে দুটিমাত্র ছত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সঙ্গীতসুরে উচ্ছ্বসিত হইতেছে—মাতিয়া মাতিয়া মহাকীর্তনীয়া গাহিতেছেন, আর স্বয়ং মহাপ্রেম সেই সুর-ধ্বনিতে আত্মসংবিতের আস্বাদন করিতেছেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

* 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য'।

মাধব আসিবেন—এই স্বপ্নকামনা হইতে শুরু করিয়া মাধব 'চিরদিনে' আসিয়াছেন, এই স্নিগ্ধ-বাসনায় পৌঁছিয়াছি। ভাবসম্মিলনের আলোচনা শেষ করিব সেই কামনা-স্বপ্নের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ বিষয়ে কিছু বর্ণনাও দেখিয়া লওয়া যাইবে।

বিরহ-পর্যায়ের শেষে রাধার প্রেমমহিমার কিছু পরিচয় লইয়াছি। সেখানে, রাধা অনুক্ষণ মাধবকে স্মরণ করিতে করিতে মাধব হইয়া গিয়াছিলেন। কবি, রাধার মাধবে রূপান্তরের অবস্থা দেখিয়া নিষ্ঠুর মাধবের বিরুদ্ধে অসূয়াভরে ভাবিয়াছেন—যদি রাধার চিন্তায় মাধব রাধা হইত, তবে বেশ হইত—মাধব তখন বুঝিত, বিরহের কি যন্ত্রণা (৭৫০)। মাধব-চরিত্র সম্বন্ধে কবি অবশ্য শেষ-পর্যন্ত তাঁহার বিপরীত ধারণা বজায় রাখিতে পারেন নাই, তিনি জানেন রাধার তুল্যই মাধবের প্রেম, সমঘন, সমরাগ। সেই প্রেম-স্বরূপকে একটি পদে অলঙ্কারের সাহায্যে উপস্থিত করিয়াছেন—

"দুইজনেরই রসপূর্ণ তনু, গুণের সীমা নাই; দুইজনের যোগ লাগিল, মিলন ভাঙে না। কে না কত রকম উপায় করিল, দুইজনের ভেদ করাইতে পারিল না। সকল পৃথিবীময় খুঁজিলাম, দুগ্ধ ও জলের তুল্য (এমন) স্নেহ দেখি নাই। যদি কেহ কখনও অগ্নির মুখে আনিয়া দেয়, দণ্ড দিয়া জল শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করে, তখনই ক্ষীর তাপে উথলিয়া পড়ে এবং বিচ্ছেদভয়ে পূর্বেই (অগ্নিতে) ঝাঁপ দেয়। যদি কেহ তাহাতে জল আনিয়া দিল, বিরহ-বিচ্ছেদ তখনই দূরে গেল; বিদ্যাপতি কহিতেছেন, সুন্দর স্নেহ এইরূপ, রাধা-মাধবে এইরূপ ।" (৭৫৯)

এখানে বিশেষ জোরের সঙ্গে উভয়ের অভঙ্গ প্রেমের কথা বলা হইয়াছে। এ প্রেম ত্রিভুবনে অপ্রাপ্তব্য, বিচ্ছেদহীন, চেষ্টা করিলেও কেহ ভেদ আনিতে পারিবে না, যেমন দুধ-জলের ভালবাসা; যদি অগ্নিতাপে জলকে শুকাইয়া ফেলার চেষ্টা করা হয়, তবে বিচ্ছেদভয়ে দুধ উথলিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়; আবার অবস্থা দেখিয়া জল ঢালিয়া দিলেই শান্তি, ইত্যাদি। অর্থাৎ জোড়শূন্য জোড়। ভাবসম্মিলনের পদ আস্বাদনের পক্ষে রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমস্বরূপ স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বিরহাগ্নিতে দগ্ধ শ্রীমতীর একটি উৎকৃষ্ট চিত্র উদ্ধার করা যাক—

লোচন-নীর তটিনী নিরমাণে।
করএ কমলমুখী তভহি সনানে ॥

সরস মৃণাল করই জপমালী।
অহনিশি জপ করি নাম তোহারি ॥
বৃন্দাবন কাহ্নু ধনী তপ করই।
হৃদয়বেদী মদনানল বরই ॥
জীব কর সমিধ সমর কর আগি।
করতি হোম বধ হোএবহ ভাগি ॥
চিকুর বরহিরে সনরি করে লেজই ;
ফল উপহার পয়োধর দেজই ॥ (৫৪৩)

রাধার বিরহ-পীড়িত দেহরূপ হইতে সখীরা কৃষ্ণব্রতের রূপক আবিষ্কার করিয়াছে। প্রথমে, ব্রতচারিণীর স্নানে দেহশুদ্ধি। অশ্রু পবিত্রতম বারি—নয়ন-নীরের দ্বারা সৃষ্ট নদীতে কমলমুখী স্নান করিল। তারপরে জপাসনে উপবেশন ও নিরন্তর জপ—সরল মৃণালে তৈয়ারী হইল জপমালা এবং কৃষ্ণনাম জপমন্ত্র। জপের পর তপ। যজ্ঞের আয়োজন করা হইয়াছে বৃন্দাবনে। সেখানে হৃদয়ের বেদী, মদনের আগুন এবং জীবনের ইন্ধন। মদনাগ্নি স্মৃতিশিখাময়। আত্মদানের মহাযজ্ঞে হস্ত-ধৃত চিকুর হইল কুশ এবং পয়োধর—উৎসর্গ-ফল।

এই প্রেম-রূপকের সঙ্গে ধর্ম-রূপকের কোনো পার্থক্য আছে? অথবা এই প্রেমের স্পর্শে ধর্মই কি মহিমান্বিত হয় নাই? এই জাতীয় ভাবনা বিদ্যাপতিতে বহুভাবে বর্তমান। ১৭৭ পদে, বক্ষের যুগল শিবের নিকট রাধার প্রার্থনাচ্ছবি দেখিয়াছি। স্মরণ করিতে পারি, দেহে দৈবসাধনার অতি সুন্দর রচনাটিকে, বিদ্যাপতি যে-পদে কামকে দিয়া গঙ্গোদকে কনকশম্ভুর অর্চনা করাইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদে কামের অতিপ্রিয় বিহারভূমি পয়োধর-যুগল। বিদ্যাপতির পদেই আবার কাম নিজ রাজ্যে শিবের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছে—এমনকি—কামস্বর্গটিই শিবস্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে আরো একটি পদের (২৯৬) বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, যেখানে কবি নায়ক-নায়িকার স্বেচ্ছামিলনের মধ্যে বিবাহ-রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ পদের সঙ্গে "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে" (৭৫৪) পদের তুলনামূলক বিচার করিয়া উভয়ের ভাবপার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ২৯৬ পদে লৌকিক বাসনারই আধিপত্য, "পিয়া যব" পদে লোকোত্তরতার ব্যঞ্জনা। কিন্তু ভাব-পার্থক্য থাকিলেও ভাবনা-পার্থক্য নাই। ২৯৬ পদে সুরভিপূর্ণ নিকুঞ্জকে

বিবাহবেদী, মনের মিলকে গাঁটছড়া, অধরমধুকে মধুপর্ক, মুক্তাহারকে উজ্জ্বল আলিম্পন, নয়নকে বন্দনাকার, পয়োধরকে পূর্ণ কলস, দুই করপত্রকে কলস ঢাকিবার পল্লব এবং কামদেবকে সম্প্রদানকর্তা ভাবা হইয়াছে।

ঐ ২৯৬ সংখ্যক পদের সঙ্গে "পিয়া যব আওব" পদটি বহিঃরূপের দিক দিয়া তুলনীয়। 'পিয়া যব আওব' পদটি উদ্ধৃত করা যাক :

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥ (৭৫৪)

(ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি)

আলোচ্য দুই পদে অন্তঃরূপে কী প্রচুর পার্থক্য! দেহদানকে এমন আধ্যাত্মিক পবিত্রতা—দ্বিতীয় পদের মত—অল্পক্ষেত্রেই দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ দেহোৎসর্গের ভাবী কল্পনায় রাধার মন আচ্ছন্ন, এবং এমন পূজাশুচি অন্তরে সেই দেহনিবেদনের বাসনা উচ্চারিত যে, যেন তাহা সত্যই উৎসর্গমন্ত্র। এই পদের একদিকে রহিয়াছে প্রচলিত আলঙ্কারিক কবিকল্পনা (যথার্থতঃ পদটি অমরুশতকের শ্লোকাবলম্বনে রচিত), যদনুযায়ী কুচযুগ—স্বর্ণ-কলস, নেত্র—মুকুর, নিতম্ব—কদলী ; অন্যদিকে উৎসবের রূপকল্পনা—যে উৎসবের মঙ্গলাচারে কলস, দর্পণ, বেদী, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। বিদ্যাপতি একটি নূতন ও চিরন্তন উৎসবের বর্ণনা করিতেছেন—দেহমন্দিরে প্রিয়-অভিষেক উৎসব। অন্যকালে, দেহে দেহে মিলনের কামাক্রান্ত প্রহরে, নারীর কুচযুগল, নিতম্ব, কেশপাশ, নয়ন, অলঙ্কারশিঞ্জন, পুরুষের নিকট আসব-স্বরূপ। কিন্তু এখন দেহমিলন নয়, দেহমন্দিরে পূজা—অতএব কুচ-নিতম্বাদি মদন-ইন্ধনগুলি

ভিন্ন তাৎপর্য উপস্থাপিত করিয়াছে। এখন সেগুলি প্রকাশ্য আবাহনের পূজা-দ্রব্য। এ ব্যাপারে ভারতীয় আলঙ্কারিক কবিকল্পনা কবিকে বড় সাহায্য করিয়াছে। কবি বিনা দ্বিধায় বিভিন্ন দেহাঙ্গের উপমানগুলিকে উৎসর্গ দ্রব্যবিশেষরূপে নির্দেশ করিতে পারিতেছেন। পদটিতে আরো লক্ষণীয়—ইহার উল্লাসরস। এখানে গোপন-মিলনের শারীর প্রকরণকে উন্মুক্ত আনন্দে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, অথচ তাহাতে পবিত্রতা অক্ষুন্ন। কবির কৃতিত্ব সেইখানে।*

এবং বিদ্যাপতি ৭৫৫ পদেও একই কথা বলিতেছেন। 'হরি গোকুলপুরে আসিলে ঘরে ঘরে নগরে জয়তূর্য বাজিবে।' কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের চতুর নাগর নন, বিজয়ী রাজপুত্র। সেই রাজার দুলালের জন্য রাধা কি কি করিবেন, কিভাবে তাঁহাকে অর্চনা করিবেন, তার একটি তালিকা ৭৫৪ পদে পাইয়াছি। আলোচ্য পদে আরো দুই একটি নূতন পূজাদ্রব্য যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পদে কবি ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, অভিষেকবারি, আহুতিদ্রব্যের কথা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, নিশ্চয় স্থানাভাবে। বর্তমান পদে (রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যানুযায়ী) নিজ অঙ্গসৌরভরূপ ধূপ, অঙ্গকান্তিরূপ দীপ, উপভোগরূপ নৈবেদ্য, লোচন-নীররূপ অভিষেকবারি ও আলিঙ্গনরূপ আহুতি অধিকন্তু সংযোগ করিয়াছেন। ফলে দুই পদ মিলিয়া একটি পরিপূর্ণ জপ-তপ-যজ্ঞের চিত্র। বিদ্যাপতি ভণিতায় জানাইয়াছেন, এই যজ্ঞকাণ্ডের সূত্রধার হইতে পারিয়া তিনি ধন্য।

ভাবসম্মিলনের শেষ কথা এখনো বাকি আছে। বিদ্যাপতি এক অতি ক্ষুদ্র

---

* ভাবোন্নয়নে বিদ্যাপতির সাফল্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। 'পিয়া যব আওব' পদে রাধা তাঁহার বিভিন্ন দেহাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চনা করিবার অভিলাষ ঘোষণা করিয়াছেন। রাধার দেহদানে আমরা পূর্ণ উৎসর্গের শুচিতা দেখিয়াছি। এখন যদি জিনিসটিকে বিপরীত দিক দিয়া দেখা যায়, যদি রাধার দেহদানকে গ্রহণ করিবেন যিনি, তাঁর মনোভাবের হিসাব লওয়া যায়,—অবস্থা কী না শোচনীয় হইয়া ওঠে! কালিদাসের রচনা বলিয়া কথিত শৃঙ্গারতিলকের প্রথম শ্লোকে কবি নারীদেহকে পুরুষের চোখে দেখিতে চাহিয়াছেন। ঐ পুরুষ যেন নারীর তনু-দানকে গ্রহণ করিবে। কিন্তু কোন্ মনে? কবি বলিতেছেন,—"কন্দর্প-শরানলে দগ্ধ পুরুষের অবগাহনের জন্য বিধাতা একটি রমণীয় সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন। সে সরোবরে কান্তার দুই বাহু মৃণাল, মুখ কমল, লাবণ্যলীলা জল, শ্রোণী অবতরণের সোপান, নেত্র শফরী, কেশপাশ শৈবাল এবং স্তনযুগল চক্রবাক-মিথুন।" ভাবের দৃষ্টি এবং কামের দৃষ্টিতে পার্থক্য কতখানি উল্লিখিত অংশ হইতে বোঝা যায়।

পদে সেই শেষ কথাটি বলিয়াছেন। কিন্তু বলিতে বলিতে শেষ কথা অশেষ কথা হইয়া উঠিয়াছে। সেই পদের আলোচনা করিয়াই আমরা 'প্রেমের কবি বিদ্যাপতি' প্রসঙ্গ শেষ করিব।

কয়েকটি পদের আলোচনায় এখনি দেখিলাম, বিদ্যাপতির রাধা কিভাবে আপনাকে—কায়-মন-প্রাণ সমন্বিত আত্মরূপকে—কৃষ্ণাগ্নিতে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই আত্মোৎসর্গের পরিণতি কি? পরিণতি আর কিছুই নয়—যখন অগ্নির ভিতর হইতে যাজ্ঞসেনী-রাধা বাহির হইয়া আসিবেন, তখন নিজের দেহের রেখায় তিনি কৃষ্ণকে তুলিয়া রাখিয়াছেন। কৃষ্ণ তখন রাধা-তনুতে আত্মদান করিয়াছেন। সেই অবস্থার চিত্রণ, ধরা যাক এই পদে মেলে, অসাধারণ এই পদ—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোঁহা হোয়॥

এই পদে কবি প্রেমের একটি চিরন্তন প্রশ্নের মুখোমুখি—'কে তুমি'? প্রশ্নেরই গৌরব, উত্তরের নয়, যদিও কবি উত্তর দিয়াছেন। ইহা কোনো রক্তহীন দার্শনিক প্রশ্ন নয়, ইহাতে যদি কোনো দর্শন থাকে জীবনেরই দর্শন। রক্তমাংসের কামনা, তার পূর্তি ও তৃপ্তি, পরিপূর্ণ আনন্দময় আত্মসমর্পণ—প্রেম এখানেই থামে না—জীবনের অসীমতা আরো অগ্রসর হইয়া একটি বিস্ময়-গভীর প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে সীমারূপ নেয়—'কে তুমি?' রহস্যসিন্ধুর তরঙ্গচূড়ায় সমুদ্র সম্বন্ধে যে প্রশ্ন থাকে, নৈশ আকাশের ছায়াপথে আকাশ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন থাকে, এ সেই প্রশ্ন। প্রেমের জগতে দুইটি মাত্র প্রশ্ন আছে—কোথা তুমি? এবং, কে তুমি? রাধিকা কৃষ্ণকে পূর্ণ করিয়া পাইয়াছেন, তাই প্রথম প্রশ্ন হইতে দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনি উপনীত—কোথা তুমি নয়, কে তুমি? কত সংক্ষেপে অথচ অব্যর্থ প্রতিভায় বিদ্যাপতি রাধিকার জিজ্ঞাসাটিকে মথিত

করিয়া তুলিয়াছেন উদ্ধৃত পদে। আট চরণের পদের দুইটি ভাগ—প্রথম ছয় ও শেষ দুই। প্রথম অংশে আছে রাধার একান্ত আত্মদানের অপূর্ব আহুতিমন্ত্র,—প্রিয়তম হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বূল, হৃদয়ের মৃগমদ, গ্রীবার হার, সুতরাং দেহের সর্বস্ব এবং গেহের সার। বহিরঙ্গ প্রীতি হইতে অন্তরঙ্গ প্রীতি, দেহদান হইতে প্রাণদানের দিকে কী নিশ্চিত গতি—ক্রমোচ্চ ভাবনায় অসাধারণ একটি কাব্য। প্রথমে নারীর নিকট প্রায় অত্যাজ্য প্রসাধনদ্রব্যগুলির সঙ্গে প্রিয়তমের তুলনা—হাতের দর্পণ হইতে গ্রীবার হার। কিন্তু ঐ বস্তুগুলি যত প্রিয়ই হোক না কেন প্রসাধনদ্রব্য তো বটে, সুতরাং বর্জনসম্ভব। কিন্তু পাখীর পাখা? ঐ পাখা পাখীর সব কিছু, তার আকাশ-বিহারের অবলম্বন। রাধিকার ভালবাসায় ইহাও শেষ কথা নয়—পাখা ছাড়াও পাখী বাঁচে। সুতরাং মীনের পানি। এহো হয়, তবু আগে কহ আর; পানি ছাড়া মীন বাঁচে না, তথাপি পানিই প্রাণ নয়;—'এহোত্তম' হইল জীবের জীবন। জীবন ছাড়া জীব নাই। প্রেমের অভেদ-সম্পর্কের ঐ শেষ কথা। তবু কি শেষ? প্রেম কি শুধু জীবনময়? জীবদেহের কারাগারে প্রেমকে আটক রাখিবেন কবি, যে-প্রেম রাধারাণীর? রাধা জীবের জীবনকে অতিক্রম করিয়া আত্মায় গাহন করিলেন; প্রেম সেই অসীম আত্মার ব্যঞ্জনাকে ফুটাইয়া তুলিল একটি মুগ্ধ আকৃতির মধ্যে—'তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়'?

এই অসীম প্রশ্নেই বিদ্যাপতির প্রেম সমাপ্ত।

"দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি?
পেল না উত্তর॥"

বিদ্যাপতির প্রকৃতি-দৃষ্টি

(ক)

প্রাচীন ও আধুনিক প্রকৃতি-দৃষ্টির রূপ

বিদ্যাপতির প্রেম-কবিতার আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। সুদীর্ঘ আলোচনায় বিদ্যাপতির প্রেমের রূপ ও স্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছি। আমাদের মূল প্রতিপাদ্য —প্রেম ও সৌন্দর্যের কবিরূপে বিদ্যাপতির পরিচয়। প্রেম-প্রসঙ্গ সমাপ্ত, সৌন্দর্য-বিষয়ে আলোচনাই বাকি।

প্রেমকে কিন্তু কোথাও একেবারে পরিহার করা অসম্ভব। যেখানে সৌন্দর্য দেখিতে চাহিব, সেখানেও প্রেমের প্রচ্ছায়ে সৌন্দর্যের দর্শন। বিদ্যাপতির প্রকৃতিকাব্য বিষয়েও একই কথা সত্য। বর্তমান পরিচ্ছেদে তাঁহার প্রকৃতি-কবিতা ও নিসর্গ-দৃষ্টি আলোচিত হইবে।

বিদ্যাপতির কাব্যে বিশুদ্ধ নিসর্গ-প্রকৃতির চিত্রণ প্রায়ই দেখা যায় না। আশাও করা যায় না। কারণ নিসর্গ-প্রকৃতিকে মানবপরিচ্ছিন্ন আত্মসম্পূর্ণ মূল্যদানের প্রবৃত্তি ছিল না সে যুগের কবিদের। বিদ্যাপতি প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। সংস্কৃতে নিরপেক্ষ প্রকৃতিকাব্য নাই তাহা নয়, কিন্তু আমাদের অতীত কবিপুরুষগণ জড়, জীব ও প্রকৃতি-জগতের অভেদ-চেতনায় এতই বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন দর্শন সাধারণভাবে তাঁহাদের মনোস্বভাবের অনুকূল ছিল না। আবার চেতনলোকে তাঁহারা মানুষকেই অধিকতর মানিয়াছেন। সুতরাং প্রায়ই দেখা, তাঁহাদের রচনায় ঐ প্রকৃতি মানব-অনুভূতির ধারণক্ষেত্র মাত্র। যেখানে তাঁহারা শুধু প্রকৃতিকেই দেখিতে চাহিয়াছেন, সেখানে ক্লাসিক্যাল কাব্যরীতির বস্তুগত রূপমুগ্ধতা এত প্রাধান্যযুক্ত যে, প্রকৃতি শুধু দেহরূপময়, তাহা আধুনিক কালের নিসর্গ-প্রকৃতির মত সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। সাম্প্রতিক মানুষের মত সাম্প্রতিক প্রকৃতিও যেন বিভক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অর্থাৎ, একদিন যেমন মানুষের বহিরঙ্গ রূপক্ষুধা প্রকৃতিকে ভোগ্য পণ্যরূপে গ্রাস করিয়াছিল, বর্তমানেও সেই আত্মসর্বস্বতাই ভাবতৃষ্ণারূপে প্রকৃতির মধ্যে নিজ যন্ত্রণার প্রতিমূর্তি সন্ধান করিতেছে।

একদিক দিয়া কিন্তু প্রকৃতিকাব্যে আধুনিক কবি অগ্রগামী। প্রকৃতির সমগ্র সত্তাকে—হয়ত দেহসত্তাকে—অনুভব করিয়া সে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। একটা 'প্রাকৃতিক' জীবনদেবতাকে ও 'প্রাকৃতিক' বিশ্বদেবতাকে সে দর্শন করিতে সমর্থ। সংস্কৃত কাব্য যেখানে প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপের দর্শনে ও চিত্রণে উল্লসিত এবং সেই উল্লাসের উত্তেজনায় অধিকাংশক্ষেত্রে প্রকৃতির সামগ্রিকতা (কবিদের ধর্মীয় অন্বয়বোধ সত্ত্বেও) উপেক্ষিত, সেখানে আধুনিক কবি প্রকৃতিকে চেতনার দিক দিয়া অন্ততঃ বিরাটতর পটভূমিকায় দর্শন ও আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছুক। সংস্কৃতে ছিল সৌন্দর্য দর্শনের আরোহপদ্ধতি ; বর্তমানের পদ্ধতি অবরোহ। উভয় পক্ষেই শক্তি ও দুর্বলতা আছে। সংস্কৃত (বা সংস্কৃত-ভাবিত) কাব্যে যেখানে নখে নখে চাঁদ দেখিতে দেখিতে আসল চাঁদ কি ভুলিয়া যাইতে হয়, আধুনিক কাব্যে সেখানে অবিরত বিশ্বচৈতন্যের সাক্ষাৎ পাইতে পাইতে বিশ্বচৈতন্য আমাদের নিকট জলবায়ুর মত সহজ সুতরাং মূল্যহীন হইয়া পড়ে। দুইক্ষেত্রেই দুই বৃহৎ বস্তুর—আকাশের চাঁদের ও বিশ্বচৈতন্যের পরাজয়। নখে যে চাঁদ এবং মুখস্থ বচনে যে বিশ্বচৈতন্য নাই, বোঝা দরকার।

শেষপর্যন্ত প্রকৃতির ব্যাপারে আমরা আধুনিক দৃষ্টির পক্ষপাতী। সমগ্রের ভাবনার মধ্যে রহস্যময় আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহা আমাদের রসচেতনাকে পরিতৃপ্ত করে। সমগ্রকে আঁকিতে গিয়া লেখকেরা স্ব-কল্পিত তাত্ত্বিকতার প্রলোভনে পড়িতে পারেন ; ভাবশূন্য ভাবাড়ম্বর বা রূপশক্তিহীন অরূপতার আস্ফালনও সম্ভবপর, কিন্তু কবিগণ তাঁহাদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও আমাদের সেই মুক্তি দেন, যে মুক্তি চিত্তস্ফূর্তির অনুকূল, এবং আত্মসংবিতের আস্বাদনক্ষম। তাছাড়া প্রকৃতিকে অখণ্ড দেখার পিছনে একপ্রকার মানসিক গণতান্ত্রিকতা আছে ; এবং এ যুগ গণতন্ত্রের। অভিজাততন্ত্রই নিশ্চিন্ত আলস্যে একটি কেশকে পর্যন্ত সহস্রভাগে চিরিয়া দেখিবার ধৈর্য ধরিতে ও চিরিবার পর প্রতিখণ্ডের রূপ নিরীক্ষণের সময় সংগ্রহ করিতে পারে। সাধারণ মানুষেরা প্রকৃতিকে, তাহার ভয়ঙ্করী ও শুভঙ্করী, উভয়রূপেই অখণ্ড দেখে, এবং পূর্ণতার যে-কোনো কল্পনা তাহাদের মনে আনন্দসঞ্চার করে। কল্পনাভঙ্গি পূর্ণভাবে না বুঝিলেও সে আনন্দ পায়, কারণ বৃহতের প্রতি সম্ভ্রম তাহার অভ্যস্ত স্বভাব। তাই নিখিল প্রকৃতির বন্দনাকারী এ-যুগের রোমান্টিক কবিগণ আত্মপরতা সত্ত্বেও এক অর্থে গণকবি।

বিদ্যাপতির প্রকৃতি-দৃষ্টি আলোচনা করিতে গিয়া আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিদ্যাপতি প্রকৃতি-দৃষ্টির ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় কবিদৃষ্টিরই উত্তরাধিকারী। তাঁহার রচনায় বিশুদ্ধ প্রকৃতিবর্ণনা প্রায় পাওয়া যায় না, এবং যেখানে পাওয়া যায়—ঐ প্রকৃতি সেখানে সন্দেহাতীতভাবে মানবীকৃত। বসন্ত সেখানে সত্যই কন্দর্প-সহচর, অনঙ্গের মত অঙ্গধারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি পরিচিত পদ্ধতিতে প্রেমিক-প্রেমিকার দেহ-মনের উপর প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির সাহায্য লইয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রকৃতিদৃষ্টির আলোচনায় দ্বিতীয়ক্ষেত্রেই মুখ্যতঃ আমাদের দৃষ্টিসন্নিবেশ করিতে হইবে।

(খ)

বিদ্যাপতির পদে বর্ষা

কালিদাসের ঋতুসংহারে বর্ষার রূপ

সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ প্রকৃতিকাব্য যদি কিছু থাকে লক্ষ্য করা যাক। তাহাদের গুণের উপরই নিসর্গ-কবিরূপে বিদ্যাপতির গৌরব নির্ভরশীল। এ জাতীয় রচনার পরিমাণ অতি অল্প। গ্রীষ্ম সম্বন্ধে একটি পদ (১৪) আছে। তাহাতে রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর শোচনীয় অবস্থার কথা সংক্ষেপে বলিয়া কবি বর্ষণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। উত্তর বিহারের অধিবাসীর এই প্রার্থনা, বলা চলে, রক্তের অক্ষরে লেখা। কিন্তু কাব্যের অরুণলেখার মর্যাদার অধিকারী পদটি নয়। এরপর বসন্ত ছাড়া নিছক প্রকৃতি-কবিতা আর পাই না। বসন্তবিষয়ক কয়েকটি পদ আছে, যার বিষয়বস্তু অবিমিশ্র বসন্ত। সেই পদগুলি বিদ্যাপতির মহিমাজ্ঞাপন করে।

বসন্ত ও বর্ষা—বিদ্যাপতির কাব্যের এই দুই ঋতু। ভারতীয় কাব্যগগনেও অদ্যাবধি এই দুই ঋতুর সমারোহ। ইদানীং কিছু দুঃখবাদী শীতকবি, বিদ্রোহবাদী গ্রীষ্মকবি ও উৎপাদনবাদী হেমন্তকবির আবির্ভাব ঘটিলেও রসকবিরা বর্ষা ও বসন্তের সম্বন্ধে মোহত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবশ্য

চিরদিনই সুপবিত্র শরৎ ঋতুর অল্পাধিক বর্ণনা কাব্যে রহিয়াছে। কালিদাসের ঋতুসংহারে শরৎ বর্ণনা সর্বশ্রেষ্ঠ ইহাও সত্য। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে ভারতীয় মনোজগতে বর্ষা ও বসন্তের প্রাধান্যের জন্য, শেষপর্যন্ত ভারতীয় কাব্যেও তাহাদের প্রাধান্য ঘটিয়াছে।

ঐ বসন্ত ও বর্ষার মধ্যে—ইতিমধ্যেই মেঘদূতের কবি কালিদাস বর্ষার ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিয়াছেন। বসন্তের পুষ্পিত প্রগল্ভতার উপর শুধু মেঘদূত কাব্যেই ঘন মেঘগর্জন ধ্বনিত হয় নাই—অন্যত্রও হইয়াছে—পল্লবিনী উমার উপর পড়িয়াছে শিব-রোষের বজ্র এবং নতমুখী-অপমানিত উমার সঙ্গে পাঠক মন্দাকিনীতীরের বেদনাবর্ষায় প্রস্থান করিয়াছেন! সংস্কৃত কবি কালিদাসের ভিতরে যদি-বা কিছু বর্ষা-বসন্তের বিবাদ থাকে, বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ তাহা নিঃশেষে মিটাইয়া দিয়াছেন। বাংলা দেশে যে মহাকবির আবির্ভাব—বাংলার শ্রেষ্ঠ ঋতুর মঙ্গলগান তাঁহার মহারসকাব্যে—বর্ষামঙ্গল কাব্যে।

বিদ্যাপতির কাব্যে বসন্তের আপেক্ষিক প্রাধান্য। কবির যৌবনাসক্তির অখণ্ড প্রমাণ এখানে আছে। বিশুদ্ধ বসন্তকে লইয়া তাঁহার কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য কবিতা মিলিতেছে। বর্ষা সে মর্যাদা পায় নাই। যেখানে বিদ্যাপতি মানবমনে এই দুই ঋতুর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেও দেখা যায়, বসন্তেরই প্রাধান্য, কারণ কেবল দুঃখের দিনেই বর্ষার প্রভাব—বসন্তের প্রভাব দুঃখ ও আনন্দ উভয়ক্ষেত্রেই।

এই দিক দিয়া বিদ্যাপতির বর্ষামূলক পদগুলি সঙ্কুচিত। বর্ষার একটি নিজস্ব আনন্দরূপ আছে। আধুনিক কালের মন্ময় কবিদের কথা বাদ দিতে পারি, প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের উল্লাসের অবধি ছিল না বর্ষা-দর্শনে। বর্ষার ঐ চিত্তজাগরণী শক্তিতে বিশ্বাস করিলে বর্ষার মূল মর্যাদাকে অস্বীকার করা হয়। সে ক্ষেত্রে বর্ষা নিছক প্রতিক্রিয়াকারী জড় আবেষ্টনীতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে।

কালিদাসের ঋতুসংহারের কথাই ধরা যাক। বহুল আলোচিত মেঘদূত বাদ থাকিতে পারে। ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনায় কালিদাসের আনন্দানুভূতি বহুভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কবির আনন্দের কারণরূপে একদিকে আছে বর্ষার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—যাহাকে কবি বর্ণনা করিয়াছেন (এবং যে বস্তুর সুবিস্তৃত সুবিখ্যাত বর্ণনা মেঘদূত কাব্যে মেলে),—অন্যদিকে গ্রীষ্মদগ্ধ কবি

খ্যাতপাবসানের জন্যও বর্ষার আবাহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভয়াবহ গ্রীষ্ম হইতে মুক্তি দেয় বর্ষা, সে প্রথমেই বরণীয় ও প্রণম্য। নব বর্ষার আনন্দগান কবির মতই প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের। ময়ূরের নৃত্য কালিদাসের কাব্যে প্রাণী ও প্রকৃতির আনন্দের প্রতীকচ্ছবি হইয়া উঠিয়াছে। 'বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ কলাপশোভিত' হইয়া ময়ূরকুল যখন মনোহর কেকাধ্বনিসহ খরবেগে নির্ঝরের ধারামধ্যবর্তী উপলরাশির উপর নৃত্য করিতে থাকে, তখন কবির চিত্তে বর্ষার সুমহান উৎসব-ছন্দটি পূর্ণ হইয়া ওঠে। এবং তখনি কবির চোখে বনস্থলীর [illegible] উন্মুক্ত হইয়া পড়ে,—"নব সলিলনিষেকে বনস্থলীর তাপ দূর হইয়াছে, তাহার আর আনন্দের অবধি নাই। চারিদিকে বিকশিত-কুসুম-কদম্বতরুরাজিচ্ছলে বনভূমির হাস্যচ্ছটাপূর্ণ প্রফুল্লতা প্রকাশ পাইতেছে, এবং বায়ুবিকম্পিত শাখাবিশিষ্ট তরুরাজিচ্ছলে সে যেন কত নৃত্য করিতেছে ও কেতকী কুসুমের পরাগলিপ্ত ধবল কেশর ও সূচীবৎ তীক্ষ্ণ কিঞ্জল্কগুলির দ্বারা যেন কতই হাসিতেছে ॥" (ঋতুসংহার)

আনন্দ হইতে আনন্দ নহে, অন্যের সর্বনাশ হইতেও আনন্দ। ঋতুসংহারের প্রথম শ্লোকে কবি বর্ষার রাজমূর্তি দেখিয়াছেন। জলকণাবর্ষী জলধর ঐ [illegible] মত্ত মাতঙ্গ, তড়িল্লতা বিজয়পতাকা, গম্ভীর বজ্রনাদ আগমন-ঘোষণার শব্দ-মাদল। কালিদাস ঋতু-সংহারের ধ্বনি-গরীয়ান্ প্রথম শ্লোকেই রাজ-বোধনের মাদল বাজাইয়াছেন। সমাগত উদ্ধতদ্যুতি বর্ষারাজ অবিলম্বে রাজকার্য শুরু করিয়া দিলেন। দুঃখের বিষয় দুর্বলের প্রতি আক্রমণ ও অত্যাচারও সে রাজকার্যের মধ্যে পড়ে। আরও দুঃখ এই, সচরাচর সহানুভূতি-পরায়ণ কবি এক্ষেত্রে রাজ-অন্যায়ের সমর্থক। বর্ষার রাজকবি কালিদাস বিরহবিধুর প্রবাসীদের উপর বর্ষারাজের নিষ্ঠুর যুদ্ধবিবরণ আনন্দভরে বর্ণনা করিয়াছেন,—"প্রিয়ে, ঐ দেখ, মেঘরাজি যেন রণসাজে সাজিয়া বিরহবিধুর প্রবাসীদের উপর কি অজস্র বাণবর্ষণ করিতেছে। অশনির ঘোরনাদ তাহার রণদুন্দুভিধ্বনি, বিদ্যুল্লতা তাহার ইন্দ্রধনুর মৌর্বী, এবং সুতীক্ষ্ণ বর্ষণধারা যেন তাহার নিশিত সায়ক।" (বসুমতী সংস্করণ)

বর্ষার এই শক্তি ও বেগের আনন্দ কালিদাস উপভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টি কালিদাসীয় বর্ষার অন্তঃপ্রকৃতিকে যথার্থভাবে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের পূর্বমেঘের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—সেখানে আছে ছুটে-চলার বিরহ—তাই সে বিরহ

বাঁধে না, মুক্তি দেয় আনন্দে। এই বেগরূপের প্রতি [illegible] আকর্ষণ ফুটিয়াছে ঋতুসংহারের একটি শ্লোকে, যেখানে তিনি কর্দমাবিল, অত্যন্ত বেগযুক্ত, তীরতরু-উন্মূলকারী বর্ষানদীর সঙ্গে কুলভ্রষ্টা কামিনীর অঙ্গিভঙ্গি ও গতির তুলনা করিয়াছেন। প্রচণ্ড গতির প্রাণমহিমা সেখানে অন্যায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার মনোভাবকে অভিভূত করিয়া কবিচিত্তে সভয় সম্ভ্রম জাগাইয়া [illegible]।

তাই বর্ষার একটা উচ্ছ্বসিত উন্মত্ত আনন্দরূপ আছে, সে আনন্দ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে, হৃদয় নাচে রে' ;—বিদ্যাপতি সে আনন্দ সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে অসমর্থ। বিদ্যাপতির মধ্যেও বর্ষার উন্মাদনা-চিত্র নাই তাহা নয়। বর্ষার উন্মাদনা বিদ্যাপতিতে এ ভাবে ফুটিয়াছে—

"গগনে গরজে ঘন কুকয়ে ময়ূর।" (৭২১)

*

কুলিশ শতশত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী—"(৭২০)

*

"ফিরি ফিরি উতরোল ডাকে ডাহুকিনী"—(৭১৯)

*

"মাস অখাঢ় উন্নত নব মেঘ"—(১৭৪)

*

"ভাদর মাস বরিখ ঘন ঘোর।
সভদিস কুহকএ দাদুল মোর॥"—(ঐ)

*

"বহুদিস ঝিঁঙুর ঝঙ্কর সজনি
পিক সুন্দর কর গান॥"—(৫০৩)
(ঝিঁঙুর—ঝিল্লী)

*

"পিয় পিয় রটয়ে পপিহয়াযে"—(৫৩৮)

পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন করিয়া ছত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। তাই বিদ্যাপতি কিছু পরিমাণে বর্ষার আনন্দরূপ দেখিতে পারিয়াছেন, একথা বলিতে

পারিতেছি। নচেৎ সমগ্র কবিতার মধ্যে ঐ সকল উল্লাস-ছত্র একেবারে হারাইয়া যায়। একমাত্র যথার্থ উল্লাস-অংশ পাই—সুপরিচিত "কুলিশ শত শত···ময়ুর নাচত মাতিয়া" ইত্যাদি স্থানে। ঐ অংশটিই আমাদের অদ্যাবধি মাতাইয়া রাখিয়াছে বিদ্যাপতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যাংশ রূপে। ঐ সামান্য একটু অংশই, বেশী নয়। আশ্চর্যের বিষয়, গ্রীষ্মদেশের কবি বিদ্যাপতি বর্ষার মধ্যে কেবল দুঃখরূপকেই দেখিলেন! একেবারে কামীজনের দৃষ্টিতে বর্ষাকে দেখা! বিদ্যাপতির দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করিয়া বলা চলে, এখানে তিনি কবিপ্রথার নিতান্ত দাস।

সত্যই বিদ্যাপতির কাব্যে বর্ষা ভীতি-উৎপাদনকারী যন্ত্রবিশেষ। ঐ কার্যে অভিসার ও বিরহে বারবার বর্ষার আমদানি করা হইয়াছে। অভিসারের পক্ষে বর্ষারাত্রি ভয়ঙ্কর। বিভীষিকাময়ী বর্ষারাত্রিতে অভিসারের দ্বারা নায়িকার চিত্তবল ও প্রেমবল প্রমাণিত হয়। বর্ষার কালো পটখানি নায়িকার কৃচ্ছ্রজ্যোতিকে দীপ্ততর করিবার জন্য আনীত হয়।

চিত্রণগুণে এমন সব স্থানে বর্ষার যত চিত্র-সৌন্দর্যই পাই না কেন (সৌন্দর্য যে আছে বর্ষাভিসারের আলোচনায় দেখাইয়াছি), বর্ষা ভাবমর্যাদায় বঞ্চিত হইয়াছে।

বরং বলা যায়, বর্ষাবিরহের পদে বর্ষার ভাবমূল্য আছে। এই একটি ক্ষেত্রে বর্ষা প্রয়োজনসীমাকে অতিক্রম করিয়াছে। এইখানেই বর্ষা, সহসা মেঘ-গর্জন দ্বারা নায়িকার সন্ত্রস্ত স্বেচ্ছালিঙ্গনে নায়ককে খুসী করার কবিকৌশল হইতে মুক্ত। বর্ষা এখানে কেবল বজ্রবিদ্যুতে নায়িকাকে আর্ত করিতেছে না—অধিকন্তু একটি নিগূঢ় অনির্দেশ্য অপরিমেয় বেদনার মধ্যে তাহাকে নিমজ্জিত করিতেছে; সেই অগাধ অন্তহীন নিঃসঙ্গ বেদনা বর্ষার নিজস্ব স্বভাব।

স্বভাবতঃ আমাদের পুনরায় মনে পড়িবে সুবিখ্যাত বর্ষা পদটি—"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।" সেখানে ভরা বাদরে, মাহ ভাদরে রাধার মন্দির শূন্য; সেখানে ঘন বর্ষা ঝাঁপিয়া আসে, ভুবন ভরিয়া বর্ষণ হয়; সেখানে বজ্রের ঝলক, ময়ূরের নৃত্য, দাদুরীর মত্ততা, ডাহুকীর ডাক। ইহারই মধ্যে রাধার 'ফাটি যাওত ছাতিয়া'—কী মর্মান্তিক সত্য।*

---

*শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" পড়িয়া 'সোচ্চারে' বলিয়াছেন—"একটি মাত্র মুহূর্তে বৈষ্ণব কবি যা পেয়েছেন, শতোত্তর মন্দাক্রান্তা শ্লোক তাতে বিফল হোল।" ধন্য সেই মুহূর্ত! কালিদাস জানিতেন না, তাঁহার মৃত্যুবাণ তাঁহারই

এমন অংশ আরো দু'এক স্থানে মেলে। যেমন—

"বরিষএ লাগল গরজি পয়োধর
ধরণী দন্তুদি ভেলী।...... ...
সজনি আবে হমে মদন অধারে।
শূন মন্দিরো পাউস কে যামিনী
কামিনী কি পরকারে॥ (৫০)

"মেঘ গর্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল, ধরণী দীর্ণ হইল।......সজনি, এখন আমি মদনের আধার। শূন্য মন্দির, বর্ষা রাত্রি, কামিনী কি করিবে ?"

"তোর সুমরি গুণ 	মোর হৃদয় শূন
মোর নয়ন রহু ঝাঁপি।
গরজ গগন ভরি 	জলধর হরি হরি
অব হমর হিয় কাঁপি॥" (৫৩৬)

*

অবধি সমাপল মাস অষাঢ়।
অবে দিনে দিনে হে জীবন ভেল গাঢ়॥
কহব সমাদ বালভু সখি মোর।
সবতহ সময় জলদ বড় ঘোর॥ (৫৩৭)

আষাঢ় মাস অবধি সমাপ্ত হইল, এখন দিন দিন জীবন গাঢ় হইতেছে। সখি, বল্লভকে আমার এই সংবাদ কহিবে, মেঘের সময় সর্বাপেক্ষা দুঃসহ।

বিপত অপত তরু 	পাওল রে
পুন নব নব পাত।
বিরহিন নয়ন 	বিহল বিহি রে
অবিরত বরিষাত॥ (৫৩৮)

ভাবশিল্প বিদ্যাপতির হাতে নির্মিত হইবে। এমন কি স্বয়ং বিদ্যাপতিও কি জানিতেন তিনি এতবড় একটি শুকমারা শ্লোক নির্মাণ করিয়াছেন? . বিদ্যাপতি একটি মাত্র শ্লোকে শতোত্তর মন্দাক্রান্তাকে মারিয়াছেন, বুদ্ধদেব বাবু একটি মাত্র বাক্যে সেই মৃতের কঙ্কাল তুলিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমাদের বলিবার কথা, বৈষ্ণব কবি, এবং পরবর্ত রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু কবি, একটি ও অজস্র শ্লোকে শতোত্তর মন্দাক্রান্তাকে 'সকল' (বিকল' নয়) করিয়া তুলিয়াছেন। মানসীর মেঘদূত কবিতায় ও অন্যত্র তাহা সবিনয়ে স্বীকার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

বিপত্র অপত্র তরু পুনরায় নূতন নূতন পত্র পাইল। বিরহিণীর চক্ষে বিধাতা অবিরল বর্ষার সৃষ্টি করিলেন।

*

কে পতিআ লএ জাএত রে
মোরা পিয়তম পাশ।
হিয় নহি সহএ অসহ দুখ রে
ভেল শাওন মাস॥
একসরি ভবন পিয়া বিনু রে
মোরা রহলো ন জায়।
সখি অনকর দুখ দারুণ রে
জগ কে পতিয়ায়॥ (৫৩৯)

*

আমার প্রিয়তমের কাছে কে পত্র লইয়া যাইবে? হৃদয় অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতে পারে না—শ্রাবণ মাস হইল। প্রিয় বিনা একাকিনী, ভবনে আর থাকাও যায় না। সখি, অপরের দারুণ দুঃখ জগতে কে বিশ্বাস করে?

*

সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসএ মোয়॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙর
ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোর
ধারা সঘন বরষ ধরণীতল
বিজুরী দশদিশ বিন্দই।
ফিরি ফিরি উতরোল ডাক ডাহুকিনী
বিরহিণী কৈসে জীবই।

*

গগন গরজি ঘন ঘোর।
হে সখি, কখন আওব পহুঁ মোর॥ (৩৩৯)

আলোচ্য ক্ষেত্রে আমি বর্ষা-বিরহের সেই অংশগুলি নির্বাচন করিয়াছি, যেখানে বিরহিণীর মনে বর্ষা একটি ব্যাপক ও অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে।

অনির্বচনীয় বিষাদ বর্ষারই সৃষ্টি। এবং বিদ্যাপতির মত সংবেদনশীল কবির পক্ষে সেই নিখিল প্রণয়িজন-মন-মন্থনকারী বর্ষা-স্বরূপকে বিস্মৃত হওয়া নিশ্চয় একেবারে সম্ভব ছিল না। "শূন্যমন্দির, বর্ষা রাত্রি, কামিনী কি করিবে?" ;—"সকল সময়ের মধ্যে (বিরহিণীর পক্ষে) ঘোরতম সময় বর্ষা" ; —"অসহ্য দুঃখ আর সহ্য হয় না, শ্রাবণ মাস আসিয়াছে" ;—"চতুর্দিকে নূতন নূতন মেঘ ঘিরিয়াছে, আমার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতেছে" ;— "ফিরি ফিরি উতরোল ডাহুকী ডাকিতেছে, বিরহিণী বাঁচে কিসে?" ; —"গগনে ঘন মেঘ গর্জন করিতেছে, হে সখি, কখন প্রভু আসিবে?"—এই সব দেখিয়া যদি আমরা কবির নিকট প্রশ্ন করি, সকল ঋতুর মধ্যে বর্ষাকে ঘোরতম লাগিবার কারণ কি, তার একটি অতি সহজ উত্তর আছে, আমাদের বিশ্বাস সেই সহজ উত্তর দিবার মত অগভীর কবি বিদ্যাপতি নন। না, বর্ষার ভীষণতার জন্য নায়িকা আর্তি বোধ করিতেছে না—বর্ষার সমাচ্ছন্ন দিনে রাত্রির মধ্যে হৃদয়কে ভাবাচ্ছন্ন করিবার শক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নিবন্ধে অজস্রভাবে, অতুলনীয় ভাষায়, বর্ষার 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল' রূপকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিদ্যাপতি বর্ষার সেই স্বভাব-রূপ কিছু কিছু কাব্যে আঁকিয়াছেন—তাহাকে তিনি জানিতেন নিশ্চয়—কিন্তু স্পষ্টভাবে, সচেতনভাবে, তত্ত্বাকারে জানান নাই। বর্ষা-কবিরূপে এইখানেই তাঁহার অসম্পূর্ণতা।

(গ)

বিদ্যাপতির পদে বসন্ত

বসন্তের জীবন-কাহিনী

উপরিউক্ত অসম্পূর্ণতার গৌরবময় অতিক্রমণ বসন্ত কাব্যে। সেখানে একদিকে ঋতুরূপে বসন্তের পৃথক মর্যাদাঘোষণা, অন্যদিকে বসন্ত কিভাবে মানবমনে প্রভাব প্রয়োগ করে তারই ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত। মানব-অনুভূতি-লোকের প্রধানতম দুইটি ভূখণ্ডে বসন্তের আধিপত্য—মিলনলোক ও বিরহলোকে। বসন্ত জীবনের অগ্নি ;—মিলনকালে আরতির নৃত্যশিখা, বিরহে দহনের শিখাবেষ্টন। প্রিয় থাকিলে 'লাখ উদয় করু চন্দা', না থাকিলে—'চন্দ্র চণ্ডালের মত হইল'।

প্রথমেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বসন্তের রূপ দেখা যাক। কবি কয়েকটি পদে বসন্তকে জীব-জীবন দান করিয়াছেন। পদগুলির বিষয়বস্তু আলোচনাযোগ্য। সেগুলির দ্বারা বসন্তের প্রায় পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী পাওয়া যায়। জন্ম দিয়া শুরু হোক।

১৩৮ পদে বসন্তের জন্ম। বসন্ত সম্বন্ধে এই পদ গুরুমূল্য। পদের বাহিরের রূপটি অমার্জিত; ভাষার ব্যবধানের ও অন্যান্য কারণের জন্য ইহার বাণীলাবণ্যের স্বাদগ্রহণ করা সম্ভব নয় বাঙালীর পক্ষে, কিন্তু অর্থ অনুধাবন করিলে পদটির কল্পনাসৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হয়। সংস্করণের সুন্দর অনুবাদের জন্য অর্থগ্রহণে বাধাও নাই।

পদের বিষয় বসন্তের জন্ম বলিয়া কবি মানবজন্মের মঙ্গল-উৎসবের অনুরূপ করিয়া বসন্তজন্মের গীতিকথা কহিবেন। শিশু-শুভোদয়ের প্রত্যেকটি উৎসব-প্রকরণ তিনি প্রকৃতিতে সন্ধান করিয়াছেন—কল্পনা ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ তাঁহার প্রতিভা তাহা পাইয়াছেও। সন্তানজন্মের পবিত্র আনন্দোচ্ছ্বাসে পদটি পূর্ণ। সেটিকে সুন্দরের নবপত্রিকা বলা চলে।

পুণ্য মাঘমাসে পূর্ণগর্ভা শ্রীপঞ্চমীর দিনে বড় যন্ত্রণার মধ্যে বসন্তের জন্ম। বনস্পতি ধাত্রী। তখন শুভক্ষণ, শুক্লপক্ষ, অরুণোদয়ের আলোকলগ্ন। ষোড়শ অঙ্গ, বত্রিশ লক্ষণে ভূষিত নব শিশুর আবির্ভাবে বহমান মলয়ানিল, যুবতীগণের হর্ষিত নৃত্য এবং মহারসযুক্ত মধুর মাঙ্গলিক গীতি। আকাশে নবীন মেঘের ঈষৎ প্রকাশ, মুক্তাতুল্য মাধবী ফুলের বিকাশ—ঐ মাধবী-লতার তোরণ দিকে দিকে। চারিপাশে গীতিবাদ্যের বড় সমারোহ, পীতবর্ণ পাটলি ফুলের 'মহুয়রী' গান, ধুতুরার তূর্যবাদন, এবং নাগেশ্বর-কলির শঙ্খধ্বনি। জন্মের পর শিশুর জন্য কমলকলি হইতে মধুকর মধু আনিল, পদ্মনাল ভাঙিয়া বালকের কটিতে সূতা বাঁধিল, এবং কটিতে ঝুলাইয়া দিল কিংশুক ফুলের বাঘনখ। বালক বোধহয় কাঁদিতেছে—তাহার জন্য বিছান হইল নব পল্লবের শ্যামরুচি শয্যা, তাহার মাথায় জড়াইয়া দেওয়া হইল কদম্বের মালা—ঘুমপাড়ানিয়া গান গাহিতে বসিল ভ্রমর। গান গাহিতে গাহিতে শিশুকে দেখাইল আকাশে চক্রাকার পূর্ণিমাচন্দ্র। বাহিরে অন্য ব্যবস্থাদিও চলিতেছে; কোকিল গণিতশাস্ত্র জানে, রাশি নক্ষত্র স্থির করিয়া কনকবর্ণ কেশরপত্রে জন্মপত্রিকা রচনায় বসিল, বালকের নাম রাখিল ঋতু বসন্ত।

কিন্তু বসন্ত কতক্ষণ শিশু থাকে? যার স্পর্শে যৌবনের জাগরণ, জাগ্রতের উন্মাদন, উন্মাদের মূর্ছা—কবি জানেন, তাহাকে শিশু রাখা চলে না। তাই যৌবন-বনচর বসন্তকে তাহার জন্ম-বিবরণীতেই কবি যৌবনপ্রাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বিনা প্রস্তুতিতে জানাইয়াছেন—"বালক বসন্ত তরুণ হইয়া ধাবিত হইল, সকল সংসার বাড়িতে লাগিল।" কবি কথাটি এত আকস্মিক ও দ্রুতভাবে বলিয়াছেন যে, কাব্যের সঙ্গতি যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ক্ষুণ্ণ হোক ক্ষতি নাই, কবির অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেই হইল। কবির অভিপ্রায়, চিরযৌবন বসন্তকে দিয়া নরনারীর যৌবন-উপবনে আগুন ধরাইয়া দিবেন। কবিতার শেষে নব-যুবতীকে কবির উপদেশ—হে যুবতী, নব বসন্ত-ঋতু অনুসরণ কর! বলাবাহুল্য এখানে কাব্যের প্রতি অবিচার করিয়া কবি নিজ উদ্দেশ্যের পোষকতা করিয়াছেন।

কাব্যের ঔচিত্য লঙ্ঘন করিয়া কবি যেভাবে বসন্তকে দ্রুত বয়স্থ করিলেন, তাহাতে কবির -পরবর্তী উদ্দেশ্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। 'রভস হুলাহুলি' অর্থাৎ উল্লাসের মাদকরসে তাঁহার প্রয়োজন। বসন্ত-জন্মে সে উল্লাসের সূচনা, পূর্ণতা হইল বসন্তের যৌবনে। কবি আগ্নেয় যৌবনকে দেখিতে চান। বসন্ত তাহার যৌবন-বসন্তে কিরূপ মলয়ের দারুণ 'কাল-বৈশাখী' আনিবে, সে পরিচয় পরে লক্ষ্য করিব, বর্তমানে আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে ১৪০ পদের বসত-রাজ-বন্দনা। রাজসজ্জা ও বরসজ্জার সম্ভ্রমসুরভিত চিত্রটি খুবই সুন্দর :

> "বসন্তরাজাকে বসিবার জন্য অভিনব পল্লব দিল। মাঙ্গলিক পাত্র হইল শ্বেত কমল। মন্দাকিনীর জল হইল মকরন্দ, দীপ আনিয়া দিল অরুণ অশোক। সখি, আজ পুণ্যমন্ত দিবস, বসন্তরাজের বরণ করি। পূর্ণচন্দ্র দধির কৌটা হইল, এবং ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে আহ্বান করিল। কিংশুক, দীপ্ত সিন্দূর এবং কেতকীর ধূলিতে পট্টবস্ত্র।"

রক্তবর্ণ অশোককে দীপরূপে, পূর্ণচন্দ্রকে দধির কৌটারূপে ও কিংশুককে দীপ্ত সিন্দূররূপে কল্পনার মধ্যে কবির রসদৃষ্টির পরিচয় আছে। পূর্ণচন্দ্রকে দধি-টীকারূপে কল্পনা তো অপূর্ব। আকাশের নির্মল বিস্তৃত ললাটপট্টে সদ্য সন্ধ্যার পূর্ণচন্দ্রকে মঙ্গলটীকা রূপে দর্শন একটি পবিত্র প্রসারিত প্রকৃতি-ভাবনায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

বসন্ত এখন রীতিমত রাজা। ঋতুপতি বসন্তরাজ। তাঁহার দীপ্ত গরিমা

দিকে দিকে বিকীর্ণ। কবি পুনরায় ৭১০ পদে প্রকৃতিরাজ্যে বসন্তরাজের পদার্পণের অবস্থাটি দেখিতে চাহিয়াছেন—

"ঋতুপতি বসন্ত-রাজা আসিলেন। অলিকুল মাধবীর দিকে ধাবিত হইল।.......হেমদণ্ড ধরিল কেশর কুসুম। নব পীঠল বৃক্ষের পত্র রাজাসন হইল। কাঞ্চন (বৃক্ষ), ছত্র ধরিল মাথায়। আম্রমুকুল হইল শিরোভূষণ। সম্মুখে কোকিল পঞ্চমতানে গান ধরিল। শিখীকুল নৃত্য করিতে লাগিল। অন্য দ্বিজকুল (পক্ষীকুল) আশীর্বাদ উচ্চারণ করিল। কুসুম-পরাগ উড়িয়া চন্দ্রাতপ হইল।"

রাজসভার পরিপাটি বর্ণনা। রাজার স্বকীয় সৌন্দর্য-মহিমায় ও রাজসভার ঐশ্বর্যশ্রীতে ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু এমন সময় একি বিপরীত সংবাদ! সহসা ছন্দোপতন ঘটাইয়া সংবাদ আসিল—যে পাষণ্ড শীত ইতিপূর্বে 'ন্যায়বিচারে', পরাস্ত হইয়াছে, সে এখনো পলায়িত নয়, এমন কি বসন্ত-রাজের 'পাটলীফুলের তূণ' ও 'অশোক ফুলের বাণ' আছে, এ সংবাদেও কোনোরূপ বিচলিত না হইয়া আক্রমণ করিয়া চলিয়াছে। তখন আর কি, সাজ সাজ—'মধুমক্ষিকারা সৈন্যরূপে সাজিল', এবং বিনা চেষ্টায় তাহারা শীতসৈন্য শিশির-দলকে নির্মূল করিয়া ফেলিল, উদ্ধার করিয়া আনিল মৃতপ্রায়া পদ্মিনীকে। পদ্মিনীও কৃতজ্ঞতায় পত্রাঞ্চল বিছাইয়া (আঁধ আঁচর!) সমাদরে সকল মক্ষিকা-সৈন্যকে তাহাতে বসাইয়া আপ্যায়ন করিল। এরপর আর নব বৃন্দাবনের রাজা, 'সময়ের সার' বসন্তের বিহারের কোন বাধা নাই। কেবল পাঠক একটু হতাশা বোধ করিতে পারেন—শীত ও বসন্তের লড়াইটা তেমন জমিল না। জমিবে কিরূপে? শীতের বিরুদ্ধে যে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল! ব্রহ্মাস্ত্রটি হইল—কিংশুক ও লবঙ্গলতাকে একত্র দেখাইয়া দেওয়া। অস্ত্রের বহরে পাঠক চমকাইবেন না। সম্পাদক মহাশয় জানাইতেছেন—"কিংশুক, শীতের শেষভাগে ফুটিতে আরম্ভ করে এবং বসন্তের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে। লবঙ্গলতার ফুল ফুটে বসন্তকালে। কবির অভিপ্রায় এই যে, যখন শীতের অনুগত কিংশুক বসন্তের অনুগত লবঙ্গলতার সঙ্গে যোগদান করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা নাই মনে করিয়া শীত ঋতু প্রথমেই পলায়ন করিল।"

সদ্য আলোচিত পদে 'ইতিপূর্বে পরাজিত শীতের' পুনরাক্রমণের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং শীত-বসন্তের একটা প্রারম্ভিক যুদ্ধপর্ব ছিল। সেই যুদ্ধ ব্যাপারটি ঠিক কোথায় স্থাপন করিব স্থির করিতে না পারিয়া এতক্ষণ স্থগিত রাখিয়াছিলাম। ভূমিলাভ করা মাত্রই তো শীতের সঙ্গে বসন্তের

সংগ্রাম—অহিরাবণের সংগ্রামের মত—দেখাইয়া দেওয়া যায় না। অবশ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়াই বসন্তের অভ্যুদয়। কিন্তু সংগ্রামকে রীতিমত সংগ্রাম করিতে হইলে বসন্তকে বয়সে কিছু বাড়িতে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ১৪১ পদে কবি শীত-বসন্তের সংঘর্ষ ও বসন্তের বিজয়কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কবির উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনায় বসন্ত-বিজয় সমাদৃত। 'বলো জয় জয়, বলো নাহি ভয়, কালের প্রয়াণপথে, আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে।' শীতেরই পরাজয়। সে জড়তার পোষক, প্রাণের শত্রু। বসন্ত হইল প্রাণের প্রত্যাবর্তন। আলোয় অন্ধকার থাকে না, বসন্তে শীত। সুতরাং বসন্ত জিতিবেই। কিন্তু শীত-বসন্তের সংঘাতের বর্ণনায় কবি তাঁহার উচিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারেন নাই, যদিও নিরপেক্ষতার একটা ভঙ্গি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"শীত-বসন্তের বিবাদ, জয়পরাজয় কে করিবে? দিবাকর দুইদিকের বিচারক হইল। দ্বিজবর কোকিল সাক্ষ্য দিল। নব-পল্লব জয়পত্রের তুল্য হইল। মধুকরমালা অক্ষর-পংক্তি। বাদী (বসন্ত) হইতে প্রতিবাদী (শীত) ভীত। শীত শিশিরবিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়া অন্তর্হিত হইল।" শীত-বসন্তের সংঘর্ষে কবি বিচারক করিয়াছেন সূর্যকে, অথচ বসন্তের মতই সূর্যেরও শীতের সঙ্গে শত্রুতা। কোকিলকে করিয়াছেন সাক্ষী, যে মুখ খুলিলেই শীতের মরণ-সঙ্গীত। নবপল্লব হইয়াছে জয়পত্র ও মধুকরমালা অক্ষর-পংক্তি—যে জয়পত্রের উদ্গম ও তাহাতে মধুকরমালার অক্ষরপাতমাত্রে শীতের মৃত্যুলিপির লিখন-সূচনা। ন্যায় বিচার বটে! অবশ্য এর চেয়ে বেশী কিছু বিদ্যাপতির মত বসন্তরাজের সভাকবির নিকট আশাও করা যায় না।

অতঃপর বসন্তমুগ্ধের অনুগত কণ্ঠে বসন্তের জয়রব ঃ—

মলয় পবন বহ।
বসন্ত বিজয় কহ॥
ভমর করই রোল।
পরিমল নহি ওর॥
ঋতুপতি রঙ্গ হেলা।
হৃদয় রভসঁ ভেলা॥
অনঙ্গ মঙ্গল মেলি।
কামিনী করথু কেলি॥

তরুণ তরুণী সঙ্গে।
রয়নি খেপবি রঙ্গে॥
বিরহী বিপদ লাগি।
কেসু উপজল আগি॥—(২১৮)

পদের শেষের দিকে বসন্ত-নন্দনে তরুণ-তরুণী প্রবেশ করিয়াছে। আমরাও মানবজীবনে বসন্তের ভূমিকা লক্ষ্য করিতে আগ্রহী। তার আগে বসন্তের নিজস্ব লীলার প্রসঙ্গ শেষ করিয়া লই।

এবার বসন্তের বিবাহকথা। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু লইয়া জীবন। জন্ম বর্ণিত হইয়াছে, বসন্তের মৃত্যুর কথা কবি বলিবেন না, কারণ বসন্তের মৃত্যু কবির কাছে নিজ মৃত্যুর তুল্য, তাই এবার জীবনের অন্য পরম অধ্যায় —বিবাহ-ব্যাপার বলিয়া লইতেছেন। সংসারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কার বিবাহ। স্বয়ং মদনকেও বিবাহ করিতে হইয়াছে। কবি ২১৯ পদে পরমানন্দে মদনসখা বসন্তের বিবাহ-আয়োজনে ব্যাপৃত। উপযুক্ত পাত্র, তাই আয়োজনে উল্লাস। পাত্রের পূর্ণযৌবনের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যশ্রীর বৈভব, হৃদয়হরণের গৌরব, এবং শীতদমনের বীর্য। পরিণয়উৎসব শুরু হয়—

"লতা তরুমণ্ডপকে জয় করিল [তরুকে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ রচনা করিল (?),] নির্মল শশধর (মণ্ডপের) ভিত্তি ধবল করিল, মৃণালের উত্তম আলিপনা হইল। পল্লব নিশীথবস্ত্র দিল। হে সখি, স্থির চিত্তে দেখ, বনস্থলীতে আজ বসন্তের বিবাহ। ভ্রমরীগণ হুলুধ্বনি দিতেছে, পুরোহিত কোকিল মন্ত্র পড়াইতেছে। চন্দ্র ও ধীর সমীর বরযাত্রী। ফুলের বৃক্ষ-তোরণ নির্মাণ করিল কনকবর্ণ কিংশুক। লাজ বর্ষণ করিল বেলফুল। এবং সিন্দুর দান করিল কিংশুক ফুল।" (২১৯)

সকল সংবাদ পাইলাম, বিবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়োজনের বিস্তৃত বিবরণ, কিন্তু মূল সংবাদটি পাইলাম না—কন্যাটি কে? তবে কি কন্যা পত্রে পত্রে, ফুলে ফুলে, হৃদয়ে হৃদয়ে! তাহাই সম্ভব, কবি বিবাহার্থী বসন্তের পাত্রীর নাম না জানাইয়া বিশ্বসংসারকে পাত্রী করিয়া তুলিয়াছেন। 'অভিনব নাগর বসন্ত' সকল প্রাণের পরম পতি।

এহেন বসন্তকে দেখিবার জন্য কবি সকলকে আহ্বান জানাইয়াছেন—

চল দেখএ যাউ ঋতু বসন্ত।
যহাঁ কুন্দ কুসুম কেতকী হসন্ত॥
যহাঁ চন্দা নিরমল ভমর কার।
রয়নি উজাগর দিন অন্ধার॥

চল বসন্ত ঋতু দেখিতে যাই, যেখানে কুন্দ কুসুম হাসিতেছে, যেখানে নির্মল চন্দ্র, ভ্রমর কালো, রজনী উজ্জ্বল এবং দিন অন্ধকার।

কবির ভাষায় এখানে আশ্চর্য সংযমের নৈপুণ্য।

অতঃপর একটি কথাই বাকি থাকে—এ বসন্ত কিসের জন্য? বসন্ত কি কেবল প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার রসতৃপ্তির উদ্দীপন? নহে নহে। মধুর বৃন্দাবনের বৈষ্ণব বিদ্যাপতি মধুঘন কণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন, তাহা রসের মত গাঢ়, এবং লীলার তুল্য উচ্ছল—

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥......
মধুর নটনগতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটসঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

বিরহে বসন্ত

বসন্তের নিজস্ব কাহিনী, এই পর্যন্ত। বাকি আছে বসন্ত-উদ্দীপিত মানবজীবনের কাহিনী। অধিকাংশ মানবের কাছে, অধিকাংশ কবির কাছেও, ভোগাসব রূপে বসন্তের সমাদর। বসন্ত মদনের সহচর। মানব-জীবনে মদনের প্রভাবের পরিমাপ হয় না। জীবনের বিস্তৃতরাজ্যে মদনের একচ্ছত্র অধিকার। মদনের পরম সখা বসন্ত—বন্ধুর অধীনস্থ রাজ্যে, মানুষের জীবন-রাজ্যে, মদন বৎসরে মাস-দুই বেড়াইয়া যান।

সেই দুই মাসের ঐতিহাসিক হইলেন কবিগণ। বহুকাল ধরিয়া এই ইতিহাস তাঁহারা লিখিয়া আসিতেছেন। বসন্তের ঝরাপাতার সঙ্গে ইতিহাসের পাতাগুলি হারাইয়া গিয়াছে বারবার। আবার বৎসর ঘুরিয়া গেলে উদ্‌গত পল্লবের গাত্রে বিস্মৃত ইতিহাস অপরাজেয় অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন নিত্য ইতিহাস আর হয় না।

দুই একজন কবির বসন্ত-কাহিনীর পত্র কিন্তু বৈশাখী ঝড়ে উড়িয়া যায় না। তাঁহারা কবিরও কবি, তাঁহারা মহাকবি। তেমন একজন কবির নাম কালিদাস, আর একজনের নাম রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আলোচ্য কবি কিন্তু

কালিদাসও নন, রবীন্দ্রনাথও নন—বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির কাব্য বুঝিতে কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের সাহায্য লইয়াছি। প্রেম-জীবনে বসন্ত-প্রভাবের কথা বিদ্যাপতি প্রচুরভাবে বলিয়াছেন। সে প্রভাবের স্বরূপ কি, মদনকে কেন বসন্তসখা বলা হয়, সে কথার উত্তর পাইলে সুবিধা হয়। হয়ত কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিয়াছেন।

কবিরা কিন্তু গতানুগতিক পন্থায় উত্তর দেন না। তাঁহারা কখনো প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিয়া বসেন, কখনো নিরুত্তর থাকিয়া উত্তর দেন। বর্ণনা ও ব্যঞ্জনা, বচনীয় এবং অনির্বচনীয়—দুই জগৎই তাঁহাদের।

যা হউক, সহজ কথাতে আসা যাক। মদন ও বসন্তের সম্পর্কের রূপের কথা ভাবিতেছিলাম। সম্পর্ক বুঝাইতে কালিদাস সুন্দর কল্পনা-প্রয়োগ করিয়াছেন। বৃহৎ কর্তব্যে মদন যেমন তাহার সখাকে সঙ্গে লইয়া যান, তেমনি বসন্তও পরম প্রীতিভরে নিজ বন্ধুর নামাঙ্কন করিয়া যান নিজ সমৃদ্ধির কালে। কুমারসম্ভবের এক শ্লোকে কালিদাস দেখাইয়াছেন, বসন্ত ভ্রমররূপ অক্ষর-পংক্তির দ্বারা নব চূতবাণের উপর মদনের নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। যখন মানিনীরা মানভরে মদনকে প্রত্যাখ্যান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন কালিদাস পুনশ্চ দেখিতেছেন, বসন্ত নববিকশিত সহকারমঞ্জরী কোকিলকে জোগাইয়া দিল এবং সেই মঞ্জরী চিবাইয়া কোকিল যে গান গাহিতে লাগিল, তাহাতে মানিনীরা মদনের পায়ের তলায় স্বেচ্ছায় মাথা নামাইয়া দিল। "ধরণীর ধ্যানভরা ধন" বসন্তের সঙ্গে পঞ্চশরের একান্ত সম্পর্কও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রিয় বিষয়। "লক্ষ দিন-যামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা অশ্রু গান হাসি" বসন্তরাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়—এই "অশ্রু গান হাসি", এই "বিচিত্র বেদনা", "কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস" বসন্তের মতই পঞ্চশরেরও দান, যে পঞ্চশরের মকরকেতু মধুপবনে ওড়ে এবং ওড়ে। মদন-বসন্তের নিত্য সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন 'মদনভস্মের পরে'-র অবস্থা বর্ণনায়—

> ফাগুন মাসে নিমেষমাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
> শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।

এসকল কথা বিদ্যাপতিও লিখিতে পারেন। লিখিয়াছেনও অজস্রভাবে; কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির সঙ্গে একটি বিষয়ে তাঁহাদের মনোভাবের ঐক্য দেখাইয়া দেওয়া যায় এখনি। তিনজনেই মুনিগণের

ধ্যানভঙ্গে উল্লাস বোধ করিয়াছেন। কুমারসম্ভব কাব্যের ইতিহাস তো যোগীশ্বরের ধ্যানভঙ্গের ইতিহাস। এবং সেই তপোভঙ্গ লইয়া রবীন্দ্রনাথের কত না উচ্ছ্বাস! রবীন্দ্রনাথ উৎসাহভরে মদন-বসন্তের সহকর্মিত্ব এ ব্যাপারে দাবি করিয়াছেন। কুমারসম্ভব কাব্যের অতিবড় সমঝদার রবীন্দ্রনাথ কৌমার্যকে অসম্ভব করিয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার কাব্যে, নাটকে তার অজস্র প্রমাণ মিলিবে। বিদ্যাপতিও এ ব্যাপারে পিছাইয়া নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা চলে, তিনি না-হয় নিজের ক্ষেত্রে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির সম্ভাবনাকে প্রথম জীবনেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কালিদাস বা বিদ্যাপতি তো বৈরাগ্যকে সম্মান করিয়াছেন। তথাপি ইহাই বিচিত্র, কবিরূপে মুনিগণের সঙ্গে তাঁহাদের অনিবার্য শত্রুতা।

বসন্তে মুনিগণের অসুবিধা আবার সর্বাধিক। কালিদাস বারবার সে কথা জানাইয়াছেন, কি ঋতুসংহারে, কি কুমারসম্ভবে, কি রঘুবংশে। ঋতু-সংহারের বসন্ত বর্ণনার ২৩ শ্লোকে নববধূর ন্যায় বিভ্রম-সুন্দর হাস্যযুক্ত কুন্দকুসুমে সজ্জিত উপবন দেখিয়া নিবৃত্তরাগ মুনির চিত্তহরণের কথা কবি বলিয়াছেন। কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে দুই স্থানে সেই কথা আছে। সংযমী মুনিগণের তপস্যা ও সমাধির প্রতিকূল উপভোগক্ষম বসন্তের কথা ২৪ শ্লোকে, এবং ৩৪ শ্লোকে বসন্তাগমে বিচলিতচিত্ত তপস্বীদের প্রাণপণ আত্মসংবরণের চেষ্টার কথা; কিংবা ধরা যাক, রঘুবংশের নবম সর্গে 'মলয়-মারুত-কম্পিত-পল্লব' সহকারলতার নৃত্যরঙ্গ দেখিয়া কামজিৎ মুনিগণের হৃদয়-বিক্ষোভ। এবং এরূপ আরো বহুস্থানে—কালিদাসের কাব্যের পাঠক-মাত্রই তাহা জানেন। বিদ্যাপতির সত্যদৃষ্টিও মুনিগণের ধ্যানভঙ্গের কাহিনী আবিষ্কার করিয়াছে, তাঁহার নায়িকার ঋষি-হৃদি-হর সৌন্দর্যের কথা পূর্বেই জানাইয়াছি। নায়িকার রূপ মানে মদনের রূপ। এই মদন-রূপ-প্রভাবের মতই বসন্ত-প্রভাবেও বিদ্যাপতি ঋষির ধৈর্যচ্যুতির কথা জানাইয়াছেন। পদটি অংশতঃ উদ্ধৃত করা চলে :—

আওল উনমত সময় বসন্ত।
দারুণ মদন নিদারুণ কন্ত॥
ঋতুরাজ আজ বিরাজ হে সখি
নাগরীজন বন্দিতে।
নবরঙ্গ নবদল দেখি উপবন
সহজ শোভিত কুসুমিতে॥

আরে, কুসুমিত কানন কোকিল নাদ।
মুনিহুক মানস উপজু বিষাদ॥
অতি মত্ত মধুকর মধুর রব কর
মালতী মধু-সঞ্চিতে।
সময় কন্ত উদন্ত নহি কিছু
হমহি বিধি-বশ-বঞ্চিতে॥
বঞ্চিত নাগর সেহ সংসার।
ঋতুপতি সোঁ ন করএ বিহার॥ (৮৬৮)

এই পদে বসন্তের বিশেষণ 'নাগরী-জন-বন্দিত'। উন্মত্ত বসন্ত, দারুণ মদন এবং নিদারুণ কান্ত। এই বসন্তে "মালতীর মধু সংগ্রহের জন্য অতি মত্ত মধুকর মধুর রব করিতেছে।" এবং কুসুমিত কাননে কোকিলের রব শুনিয়া মুনির মনে অনির্বচনীয় বিষাদ। নায়িকা এই অবস্থায় অসঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিয়াছে,--"এই জগতে সেই নাগরই বঞ্চিত যে বসন্তকালে বিহার না করে।"

মুনিগণের বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মত আদর্শগত আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও এবং বৈরাগ্যের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রমশীল হইয়াও কালিদাস ও বিদ্যাপতি মুনিদের মধ্যে বাসন্তী-বিপর্যয়ের রূপ কেন দেখিলেন, তার সহজ উত্তর, এক্ষেত্রে তাঁহারা রক্তমাংসের চিরন্তন দুর্বলতার দ্রষ্টা—মুনিরাও মানুষ! আর একটি কারণ আছে মুনিদের অস্থৈর্যের উল্লেখের পিছনে—তাঁহারাও অধীর?—এই সভয় চমৎকৃতি সৃষ্টির জন্য। জিতেন্দ্রিয় ঋষির পরাভূত ইন্দ্রিয়কে যুদ্ধক্ষম করিতে পারে যে-বসন্ত, না জানি তাহার কিরূপ শক্তি!

বলাবাহুল্য এর পর পঞ্চশরের পূজারী-পূজারিণীর উপর বসন্তের প্রভাবের পরিমাণ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিতে পাঠকের লজ্জা হইবে। কোনো অতিশয়োক্তিই আর অতিশয়োক্তি মনে হওয়ার কথা নয়। এখন কেবল বিদ্যাপতিকৃত এই বিষয়ের পদগুলি দেখিয়া লওয়া বাকি। বসন্ত-প্রতিক্রিয়ার চিত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—বিরহে বসন্তের প্রভাব এবং মিলনে।

বিরহ-মিলনের কথা ঈষৎ পরে বলিব—বসন্তের সাধারণ দৌরাত্ম্যের কথা প্রথমে ধরা যাক। ২১৭ পদে নায়িকা বসন্তের বিষয়ে বলিয়াছে—"দুর্নিবার বসন্ত।' সে বসন্তে 'উন্মত্ত ভ্রমর ফিরিয়া ফিরিয়া কাননে কাননে নাগকেশর পুষ্পে বিচরণ' করে। এই অবস্থায় মারাত্মক চন্দ্রোদয়

হইল। অন্তর্যাতনায় অস্থির নায়িকা ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া কটু গালি দিল—

চন্দা উগি চণ্ডাল ভেল।
দ্বিজরাজ ধরমতা বিসরি গেল॥

"চন্দ্র উদয় হইয়া চণ্ডাল হইল, দ্বিজশ্রেষ্ঠের ধর্ম ভুলিয়া গেল। (চন্দ্রের অপর নাম দ্বিজরাজ)।"

বসন্ত-বিষয়ক অধিকাংশ পদে নায়িকার উপরই বসন্ত-প্রভাব দেখিতে হইবে। তার মধ্যে নায়কের উপর প্রভাবের দৃষ্টান্ত তাই মনোযোগের যোগ্য। ৪৭৫ পদটি সে ব্যাপারে উল্লেখ্য। এই পদে বসন্ত অতি মাদকতাময় সৌন্দর্যসহ বর্তমান রহিয়াছে, এবং সেই বসন্তের প্রভাব সংক্ষেপে অথচ সুনিশ্চিতভাবে মাধবের উপর ক্রিয়াশীল দেখান হইয়াছে। বসন্তের মদনানন্দ চিত্র—"অভিনব কোমল সুন্দর পত্র—সমস্ত বনভূমির রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ। মলয় পবন নানা ছন্দে বহিতেছে, আপনার রসে কুসুম আপনি উন্মত্ত। ("পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম"),······সহকার-শাখায় কোকিল ডাকিতেছে,······মধুকর মধুপান করিতেছে, তারপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানিনীর (মান নিঃশেষে পান করিবার জন্য) সন্ধান করিতেছে" সমস্ত কিছু দেখিয়া কবির মন্তব্য—"জগতে এইবার মদনের নূতন অধিকার প্রতিষ্ঠিত।" ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ কথা—

দেখি দেখি মাধব মন উলসন্ত।
বিরিন্দাবন ভেল বেকত বসন্ত॥

"দেখিয়া দেখিয়া মাধবের মনে উল্লাস হইল—বৃন্দাবনে বসন্ত ব্যক্ত হইল।"

ছত্র দুইটির অর্থ কি? বৃন্দাবনে বসন্তের ব্যক্তরূপ দেখিয়া মাধবের মনে উল্লাস হইল, অথবা পৃথিবীতে বসন্তের আগমন-সূচনা দেখিয়া মাধবের মনে উল্লাস এবং সেই উল্লাসের জাগরণমাত্র বৃন্দাবনে বসন্তের অভ্যুদয়? দ্বিতীয় অর্থটিই সুষ্ঠুতর মনে হয়। অর্থাৎ মাধবের উল্লাস মানেই বৃন্দাবনের বসন্ত। বিদ্যাপতি এখানে সৌন্দর্যকে মানুষের অনুভূতিসাপেক্ষ বলিয়া শুধু নির্দেশ করিলেন না, আরো জানাইলেন, সকল সৌন্দর্যের মূলে আছে স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপের আনন্দবোধ। যিনি রসস্বরূপ, তাঁহার আত্মবোধে হয় সৃষ্টি, আত্মসংবরণে হয় বিনাশ—বিদ্যাপতির নিগূঢ় ইঙ্গিত ইহাই।

মানবজীবনে বসন্তের প্রভাবের কথা বলিতেছিলাম। বিরহাবস্থায় বসন্ত সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। মিলনকালে সুখসহচর-রূপে বসন্ত আসিয়াছিল, বিরহ-কালে সুখ তো দিতে পারিলই না, উপরন্তু স্মৃতি জাগাইয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। কালিদাস, বসন্তে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উপবনকে দেখিয়াছেন ('রঘু'—৯—৪০), রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন রঙের ঝড়ে ধৈর্যহারা পলাশকাননকে ('নবীন'), বিদ্যাপতির নায়িকা দেখিল,—"বনের শেষ সীমা পর্যন্ত ফুল ফুটিয়াছে"—(৭১৩)। আরো দেখিল—

সাহর সৌরভে দিশা চাঁদ উজোরি নিশা
তরুতর মধুকর পরসলা।—(১৭২)

"সহকারের সৌরভে দিক পূর্ণ, চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল নিশা, বৃক্ষতল মধুকরে আবৃত।"

*

"কত সহকার, কত সুরভি, কত নব মঞ্জরী। কত কোকিলের গুঞ্জরিত পঞ্চম তান, কত ভ্রমরের ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুপান, কত কসুম-শরবিদ্ধ সারসের ক্রন্দন।—(৫০৫)

এই অবস্থায় রাধার মনে একদিকে জাগিয়া ওঠে চিরন্তন ব্যাকুলতা, যে ব্যাকুলতা বসন্তে বিশেষভাবে জাগে এবং রাধা তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলেন—এমন সময় "মনোরথের সীমা থাকে না", "পৃথিবীতে বেদনা বুঝিবার লোক মেলে না"; অন্যদিকে রাধা কাঁদিয়া পড়েন দেহের ও মনের প্রত্যক্ষ জ্বালায়। রাধা অনেক সময় রূপসচেতন, বিধাতাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা যায়, কারণ বিধাতা, যাহার নায়ক বিচক্ষণ নয়, তাহাকে রূপ দিয়াছেন। রূপ অন্যের পক্ষে মঙ্গলকর, রাধার পক্ষে কালস্বরূপ (১৮৮)। এই সময়ই বসন্তের সৌন্দর্য দেখিয়া রাধার আক্ষেপ—"পশ্চিমে সূর্যোদয়ের মত আমার সুখ ও দুঃখ" (১৭২)। বসন্তের সৌন্দর্য নিষ্ক্রিয় নয়, আক্রমণকারী, বসন্তের অনুচরেরা রাধাকে আক্রমণ করিতে শুরু করে, তখন কখনো ভ্রমরের ভয়ে রাধা পলায়ন করেন (১৪২), কখনো তিনি কোকিল-ভ্রমরাদিগকে তাড়াইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন (১৭১); নাসা-নয়ন-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রোধের সাহায্যেও পরিত্রাণের প্রয়াস পান (১৭৯); কিন্তু সকলই বৃথা, কোকিল-ভ্রমরকে তাড়ানো যায়,—তাড়ানো যায় না দক্ষিণ পবনকে কিংবা মধুমাসের স্মৃতিকে। তাই কবি বিচলিতচিত্তে প্রশ্ন করিয়াছেন—"দক্ষিণ-পবন-সৌরভে যদি সন্তরণ করিবে, তাহা হইলে দুইজনে মনে মনে (পরস্পরকে) কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে? (১৭১)।

কবির সহানুভূতিসূচক প্রশ্নের চেয়ে অনেক বেশী বেদনাদায়ক হইল রাধার প্রশ্নগুলি। রাধার কাতর কথাটি আমাদের একেবারে বুকে আসিয়া বেঁধে—

"সখি, সে দেশে কি বসন্ত হয় না?"

ইহার পর বসন্তে বিরহিণীর একটি চিত্রই দিবার আছে,—

"(সুন্দরী) অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইল। চৌদিকে ভ্রমরের ঝঙ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, মূর্ছিত হইয়া ধরণীতলে পড়িল।" (৫৪৭)

মিলনে বসন্ত

মিলনে বসন্তই ঋতুশ্রেষ্ঠ, কবিরা বসন্ত-মিলনে যতখানি পারেন ইন্দ্রিয়রস ঢালিয়া দেন। বসন্তের উন্মাদনাকে রবীন্দ্রনাথ দুইছত্রে ফুটাইয়াছেন,—

মাতিয়া পাগল-নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

যৌবন-জীবনে বসন্তের আবাহনে বিদ্যাপতিও উৎসাহী। 'সকল রস-মণ্ডল' বসন্তের আগমনে ফুল্ল মল্লিকা-পাত্রে ক্ষুধিত ভ্রমর কর্তৃক মধুপান এবং বিনা কারণে কামিনীর কুন্তল আকুল (১৩৯); চারিদিকে কোকিলের অমিয়রসপূর্ণ গান; সে গান শুনিয়া উদ্দীপিত রাধিকা সখীকে বলিতেছেন, —আমার বস্ত্রাদি সংযত করিয়া দাও, কানাইয়ের নিকট যাইতে হইবে (১৪৩)। বসন্তাগমে ইতিমধ্যেই দেহবিকার শুরু হইয়া বস্ত্র অসংবৃত হইয়া পড়িয়াছে—'বস্ত্রাদি সংযত করিয়া দাও, কথার মধ্যে সেই ব্যঞ্জনাই আছে। এই পরিস্থিতিতে দুইটি যুদ্ধচিত্র কবি আঁকিয়াছেন। প্রণয়াবস্থার, মদনাবেশের, কথা বলিতে গিয়া বিদ্যাপতিকে (এবং সংস্কৃত কবিগণকে) বারবার যুদ্ধের উপমা আনিতে হইয়াছে। দুর্ধর্ষ কামনা ও কামনাপূরণের জন্য জীবনপণের প্রয়াসকে যুদ্ধের রূপক ছাড়া পরিস্ফুট করা কঠিন। দুইটি পদের একটিতে নায়িকার বিরুদ্ধে বসন্তসহায় মদনের আক্রমণ; অন্যটিতে নবযৌবনা নায়িকা স্বয়ং নায়ককে আক্রমণে প্রস্তুত—বসন্ত তাহার দূত।

নায়িকার বিরুদ্ধে মদনের আক্রমণ-বিষয়ক পদে যুদ্ধের অতি ভয়ঙ্কর চিত্র—চারিদিকে তূর্যধ্বনি, লুণ্ঠনাভিলাষী সৈন্যদের ইতস্ততঃ ধাবন, বহুসংখ্যক পতাকার আন্দোলন, সম্মোহন-শরের বর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড—কি নাই? মদনের এই 'অকারণ' আক্রমণে প্রধান রসদদার বসন্ত। কবি জানাইয়াছেন

—তূর্যধ্বনি করিয়াছে কোকিল, লুণ্ঠনলোভী সৈন্যদল হইল মধুলুব্ধ ভ্রমর, আম্রবৃক্ষের নব নব কিশলয় হইল ধ্বজা, সম্মোহক শর আর কিছু নয় কুসুমশর, এবং অগ্নি যদি কোথাও থাকে, আছে বিকচ পরাগের মধ্যে (৫০৬)। (বিকচ পরাগের অগ্নির কথা সংস্কৃত কাব্যের অন্যত্রও মেলে।)

যুদ্ধের এই চিত্র মনোহারী। বিদ্যাপতি জীবনে সত্যকার রক্তঝরা যুদ্ধ দেখিয়াছেন। তবু প্রণয়সমরের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ যায় নাই, ইহাতে আমরা খুশী। যুদ্ধের ব্যাপারে সকলের বিশেষ সহানুভূতি থাকে পরাজিত পক্ষের পক্ষে। বিদ্যাপতি পরাজিত-পক্ষের পুনরুত্থান ও প্রতিঘাতকাহিনী রচনা করিয়াছেন একটি পদে। সেখানে প্রণয়-সমরের উদ্যোগ-পর্ব প্রকৃত সমরের মতই সাড়ম্বরে উপস্থাপিত। শৈশবে প্রেমযুদ্ধে পরাজিত নায়িকা যৌবনলাভ করিয়া পুনরাক্রমণের জন্য প্রত্যাবৃত্ত ; প্রভূত পরিমাণে অস্ত্র এখন তাহার আয়ত্তে ; সবচেয়ে মারাত্মক হইল—অক্ষি-ধনু ও কটাক্ষ-শর। এইরূপ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিশ্চয় মন্মথকে পত্র পাঠান যায় যে, ঋতুপতি বসন্তকে দূত পাঠাও (৪৭৮)। বসন্ত এই দৌত্যের অনুরূপ মর্যাদা অল্পই পাইয়াছে। রাধামাধবের ভয়াবহ প্রণয়যুদ্ধের উদ্দীপন-দূত—বসন্ত।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনির্ণীত। রাধামাধবের প্রেম যদি নিত্য প্রেম হয়, প্রেম-সমরও তাই। সমরে জয়পরাজয় সহজে স্থির হইয়া গেলে তাহা নিত্য সমর থাকে না। সুতরাং কে হারিল, কে জিতিল কথাটা অবান্তর। কামতান্ত্রিক কবিগণ মাঝে মাঝে বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছেন, কোমলা নারী-নবনীতে এত শক্তি আসে কোথা হইতে ? তবু চিত্রাঙ্কনের সময় পুরুষের দেহবিক্রমকে প্রবলতর করিয়া দেখাইতে হইয়াছে—বহিঃপৃথিবীতে পুরুষ অধিক দেহশক্তিধারী বলিয়া। তাই ৪৭৭ পদে বসন্তের প্ররোচনায় প্রাণী ও মানুষ উভয় পক্ষের উদ্‌ভ্রান্তি ও উন্মত্ততার কথা কবি যখন বলিতেছেন, যখন বসন্ত-মাদনে মালতীর মধুতে মধুকরের ভুল হইয়া যাইতেছে, তখন পুরুষের আচরণ সম্বন্ধে এমন একটি উপমা দিলেন, যাহাতে জ্ঞানশূন্য ক্ষুধিত যৌবনের ক্ষুন্নিবৃত্তির অতি তীব্র ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল। নায়িকা বলিতেছে, অলঙ্কারটি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—হে সখি, তরুবর লতাকে ধরিয়া যেমন চাপিয়া ফেলে……সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

ক্ষুধারূপই শেষ রূপ নয়। ক্ষুধা তৃষ্ণার অতীত একটা আনন্দরূপ আছে। বসন্তে সেই আনন্দসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ। তখন 'নতুন' সব কিছু। রবীন্দ্রনাথ

বলেন, 'নতুন' নয় 'নবীন'।—"যাঁদের রসবেদনা আছে, তাঁরা কালে কালে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাইনে, আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসঙ্কোচে বারেবারে রঙিন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরাপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' সেই নিত্য নন্দিত সহজ শোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান শুরু করে দাও।" (নবীন)

বিদ্যাপতির গান বহু পূর্বেই শুরু হইয়াছিল,—

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নবল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন কুঞ্জবন শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর॥
নবল রসাল-মুকুল-মধু-মাতল
নব কোকিল কুল গাঈ।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব রস কানন ধাঈ॥
নব যুবরাজ নবল নব নাগরী
মিলএ নব নব ভাঁতি।
নিতি ঐসন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মাতি মাতি॥ (৭১২)

নব-মঙ্গল-সঙ্গীতের মতই বিদ্যাপতির আছে বসন্ত-রসের সঙ্গীত। পূর্বপদে যেমন সবই 'নব', এখানে সবই 'রস'। বসন্তরাত্রে 'রসময়' 'রাস-রভস-রসের' মাঝে রসিকবর-রাজ মাধবের অবস্থান; রাস-রসিকের রস-তরঙ্গে রসবতী রমণী-রত্ন রাধিকার অবগাহন; রঙ্গিণীগণের রসনৃত্য এবং রসবন্ত রাগের সৃষ্টি; রতিরসের উদ্দীপনকারিণী রাগিণীগণের রমণ-স্বরূপ বসন্তের ব্যক্ত ব্যাপক প্রভাব—ইহারই মধ্যে রাধারমণের মুরলীধ্বনি।

বসন্তের ছন্দ সমস্ত পদটিতে নৃত্যমান। দেহপীড়ার পরিবর্তে সেখানে মুক্ত আনন্দের প্রাণ-বিকাশ। পদের কয়েক ছত্র—

ঋতুপতি-রাতি রসিকবর-রাজ।
রসময় রাস রভস-রস-মাঝ॥
রসবতী রমণীরতন ধনী রাহি।
রাসরসিক-সহ রস অবগাহি॥
রঙ্গিণীগণ রস সঙ্গহি নটঈ।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটঈ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত॥
রটতি রবার মহতী কপিনাশ। (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)
রাধারমণ করু মুরলী-বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥ (১১০)

বসন্ত-বিষয়ে কালিদাস ও বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির বসন্ত-পরিচয় এখানেই শেষ। আর সামান্য দু'একটি কথা বলিব। বিদ্যাপতির বসন্ত-বিষয়ক পদগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। বসন্ত-পর্যায়ে বসন্তকে স্বতন্ত্র চরিত্রের মর্যাদা দান বিদ্যাপতির দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, একথাও বলিয়াছি। ঋতুসংহারের কবি কালিদাস এরূপ ক্ষেত্রে সমালোচনার সম্মুখীন। ঋতুসংহারে ছয় ঋতুকে কালিদাস ছয় সেবাদাসীর মত ব্যবহার করিয়াছেন—প্রশংসাচ্ছলে কথিত রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে আজ ব্যাজস্তুতি মনে হইতেছে। কেবল ঋতুসংহারের বসন্ত কেন, কালিদাস যেখানেই বসন্ত-বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেই "বসন্ত ঋতুকে কালিদাস নিছক সম্ভোগবিলাসী রসিকের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন,"—সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক মূল্যবান আলোচনায় ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাহা জানাইয়াছেন। ডাঃ দাশগুপ্ত অবশ্য কুমারসম্ভবের অকালবসন্তের প্রসিদ্ধ বর্ণনায় নাটকীয় ও অন্যান্য গুণে বসন্ত জীবন্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে, এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও অকালবসন্তের বসন্তও সম্ভোগের উপাদান, কাব্যের ঘটনাধারা হইতে তাহা প্রত্যক্ষ। ধ্যানভঙ্গ করিতে বসন্তের আবির্ভাব, সুতরাং কামনার সহস্রশিখা সে বসন্তের সর্বদেহে। উগ্র সম্ভোগবাসনা ঐ বসন্তের

বৈশিষ্ট্য, স্বাভাবিক ক্রমপরিণত বসন্তে যাহা অনুরূপ-পরিমাণে ঘটিতে পারিত না। অকালবসন্ত বনভূমির উপর ফাটিয়া পড়িয়া বনভূমিকে সবলে গ্রহণ করিয়াছিল।

সুতরাং কালিদাসের বসন্ত-সম্বন্ধে মনোভাব বুঝিতে অসুবিধা নাই, এবং ডাঃ দাশগুপ্তের সমালোচনা (!) সর্বথা স্বীকার্য। এ ব্যাপারে বিদ্যাপতি কালিদাসের অনুসারক নিশ্চয়। বিদ্যাপতিও সম্ভোগ-বিলাসীর দৃষ্টিতে বসন্তকে দেখিয়াছেন। কিন্তু ভোগরূপের দর্শনে ও বর্ণনে বিদ্যাপতির মনোভাব কালিদাস অপেক্ষা যথেষ্ট সঙ্কুচিত। প্রকাশরূপের ন্যূনতার দিক দিয়া এই সঙ্কোচের কথা বলিতেছি না, কালিদাস প্রাচীন ভারতবর্ষের মহাকবি, বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার তুলনার কথা ওঠে না, এবং মহাকবিদের সঙ্গে অন্য কবির পার্থক্যের মধ্যে নিশ্চয়ই সৃষ্টির রূপসৌন্দর্যের পার্থক্যের হিসাব আছে। আমি এখানে কেবল কল্পনা ও ভাববৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিতেছি; বসন্তকে স্বতন্ত্র রূপমূর্তি দানের দিক দিয়া বিদ্যাপতির দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের কথা বলিতেছি। সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেই আমাদের বক্তব্য, কালিদাসের 'সম্ভোগের বসন্ত' বিদ্যাপতির 'সম্ভোগের বসন্ত' অপেক্ষা ভাবপ্রসারিত। ঋতুসংহারের কথাই ধরা যাক, সেখানে বসন্তের 'বর্ণময়ী মদিরার ধারা' তৃষিত যৌবনের মুখে শতবার উচ্ছ্বসিত, তবু সেই সম্ভোগ ক্ষুধা-ক্লিষ্ট নয়। কালিদাস বসন্তের 'লাবণ্য-সম্ভ্রম' রূপ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে আবেশের কথা, আলসের কথা ছড়াইয়া আছে;—'অঙ্গানি নিদ্রালস বিভ্রমাণি', 'বিলাসিনীভিঃ মদালসাভিঃ', 'কামমদালসাঙ্গী অঙ্গনা,' 'কন্দর্প-দর্প-শিথিলীকৃতগাত্রযষ্ট্যঃ' ইত্যাদি। বসন্তের দেহদাহের মধ্যে এই অলস-আবেশভাব ব্যাপ্তির সূচনা করিয়াছে। বিদ্যাপতিতে কিন্তু লোলুপ ক্ষুধারই প্রাধান্য। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। কুমারসম্ভব হইতে অত্যন্ত পরিচিত পদের দৃষ্টান্ত তুলিতেছি। প্রবল প্রগল্‌ভতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে অকাল-বসন্ত। তির্যক প্রাণীর উপর বসন্তের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাস। তার মধ্যে এই শ্লোকটি বিশেষ বিখ্যাত—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

ভ্রমর কুসুমপাত্র হইতে তাহার প্রিয়ার পীতাবশিষ্ট মধু পশ্চাৎ পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণসার মৃগ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষী মৃগীর গাত্র শৃঙ্গদ্বারা কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল।

এই শ্লোকের প্রথম ছত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিদ্যাপতির একটি পদের কিছু অংশের ঐক্য আছে—

"সহকারের সৌরভে গগন ভরিয়াছে, ভ্রমর-ভ্রমরী কলহ করিতেছে; লোভের জন্য একসঙ্গে থাকিয়াও দ্বন্দ্ব করিতেছে, কারণ অধিক পিপাসিত, কিন্তু মধু অল্প" (১৭৩)।

ঐক্য নয়, অনৈক্যই প্রবল। কালিদাসে বসন্তামোদিত ভ্রমর, ভ্রমরীকে আগে মধুপান করিতে দিয়া পরে তৃপ্তিভরে পীতাবশিষ্ট মধু পান করিয়াছে, আর বিদ্যাপতিতে লোভতাড়নে ভ্রমর-ভ্রমরী মধু'র অধিকার লইয়া বিবদমান। বসন্তের প্রভাব-বিষয়ে ধারণায় কালিদাস ও বিদ্যাপতিতে এই পার্থক্যই আছে। একজনের মধ্যে বসন্তে সুখালস, অন্যজনে তীব্র লোভার্ত তৃষ্ণা। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, কিভাবে নায়িকা নায়কের আলিঙ্গনের সঙ্গে "তরুবর কর্তৃক লতাকে একেবারে চাপিয়া ধরার" তুলনা করিয়াছে। কুমার-সম্ভবে অকালবসন্তের বর্ণনাতেও তরুকর্তৃক লতালিঙ্গনের কথা আছে, কিন্তু সেখানে তরু বিনম্র শাখাভুজের বন্ধনে কুসুম-স্তন-নত লতাবধূদের বাঁধিতে চাহিয়াছে।

আরো এক দিক দিয়া কালিদাস বসন্ত-সম্ভোগকে ভাবময়, সুরময় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বসন্তের যুগযুগান্তরব্যাপ্ত অমর বেদনা বলিয়া ভাবিয়াছেন, কালিদাস তাহাকে জননান্তর সৌহৃদ্যস্মৃতির সহিত যুক্ত হৃদয়ের পর্যাকুলতা বলিয়াছেন। ঋতুসংহারের ভোগলগ্নে বাসনা-বাঁশরীর মত্ত সুরের মধ্যেও কালিদাস হৃদয়ের পর্যাকুল স্বভাবের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। 'বিস্মৃত হইতে পারেন নাই' কথাটি যথেষ্ট নয়, এতবেশী মনে রাখিয়াছেন যে, বারবার সে বিষয়ে পুনরুক্তি করিতে দ্বিধা করেন নাই—

> উচ্ছ্বাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি গাত্রাণি কন্দর্প-সমাকুলানি।
> সমীপবর্তিষ্বধুনা প্রিয়েষু সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ॥
>
> (ঋতু-বসন্ত-৮)

প্রিয়তমে! বসন্তের এমনই প্রভাব যে, ঐ দেখ, স্ব স্ব প্রণয়ভাজন সমীপে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কামিনীরা কেমন যেন সমুৎসুক, উৎকণ্ঠিত ও বিরহাতুরবৎ হইয়া উঠিতেছে।

তাহাদের মদন-সন্তাপক্লিষ্ট কলেবর থাকিয়া থাকিয়া কেমন উদ্ভাসিত ও পরক্ষণেই আবার শিথিল-গ্রন্থি, একেবারে আলস-অধীর হইয়া পড়িতেছে।—(অনুবাদ—বসুমতী)

*

তাম্র-প্রবাল-স্তবকাবনম্রাশ্চূতদ্রুমাঃ পুষ্পিত-চারু-শাখাঃ।
কুর্বন্তি কামং পবনবধূতাঃ পর্যুৎসুকং মানসমঙ্গনানাম্ ॥ (১৫)

প্রিয়ে! তাম্রাভ নব-পল্লবগুচ্ছে ইষদানত এবং শাখায় শাখায় কুসুমভারে পরিশোভিত হইয়া, ঐ দেখ, সহকার তরু বায়ুভরে কাঁপিতে কাঁপিতে বসন্ত-প্রভাব-পীড়িতা যুবতীদিগকে কিরূপ উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে। (ঐ)

*

মত্তদ্বিরেফ-পরিচুম্বিত-চারুপুষ্পা মন্দানিলাকুলিত-নম্র-মৃদু-প্রবালাঃ।
কুর্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসুকত্বং চূতাভিরামকলিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ ॥ (১৭)

প্রিয়তমে! ঐ দেখ, সহকারের মনোহর মুকুলগুলিকে প্রমত্ত ভ্রমর কেমন বারবার চুম্বন করিতেছে ও মৃদুমন্দ সমীর-হিল্লোলে উহার অচিরোদ্গত পল্লবগুচ্ছ কেমন দুলিতে দুলিতে এক একবার নত হইয়া পড়িতেছে। আজ ঐ সহকারের দিকে চাহিয়া কামিনীগণের হৃদয়ে যে কতদূর ঔৎসুক্যের উদয় হইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ? (ঐ)

*

পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্ত হর্ষৈঃ কূজদ্ভিরুন্মদকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ।
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন পর্য্যাকুলং কুল গৃহেঽপি কৃতং বধূনাম্ ॥—(২১)

প্রিয়ে! আজ রোমাঞ্চকারী, মনোহারী, আনন্দবর্ষী কোকিলঝঙ্কারে এবং মধুমত্ত ভ্রমরের কলমধুর গুঞ্জরণে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা যে সমুদয় কুলবধূ,—তাহাদের বিনয়াবৃত হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্ম পর্যুৎসুক হইয়া উঠিতেছে।—(ঐ)

আশ্লেষবদ্ধ শ্বাসরুদ্ধ মিলনের কিংবা বাসনাকুল মিলনকামনার মধ্যে পর্যাকুল অনির্বচনীয় অনুভূতির রূপ দেখাইতে একটু বিস্তৃতভাবে ঋতুসংহার উদ্ধৃত করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য, কালিদাস তাঁহার প্রথম জীবনের কাব্য ঋতুসংহারের (কেহ কেহ নাকি ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা নয় বলিতে চান, হায়!) সম্ভোগ-অধ্যায়ের ভিতরেও কি পরিমাণে মুক্তির নিশ্বাস আনিতে পারিয়াছেন দেখাইয়া দেওয়া। এই ধরনের ব্যাপক অনির্দেশ্য অনুভূতির প্রকাশ কালিদাসের কাব্যের অন্যত্রও আছে, বর্তমানে তাহা আমাদের আলোচ্য নয়। বিদ্যাপতির বসন্ত-বর্ণনার ভাবশূন্যতা দেখাইবার জন্য এই প্রসঙ্গ আনিয়াছি। বিদ্যাপতিতে বসন্তের এই সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় অনুভূতির রূপটি নাই। যে-কোনো গভীর অনুভূতি মানুষকে দেহসীমার

বাহিরে লইয়া যায়। বসন্তে পরিবেশপ্রভাবে মানুষ স্বতঃই দেহাতিক্রমী গোপন চেতনায় অধীর হয়। আশ্চর্যের বিষয়, বিদ্যাপতি তাহা লক্ষ্য করেন নাই, খুবই আশ্চর্য, কারণ এই জাতীয় অনুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যথেষ্টভাবে বিদ্যাপতির বিরহকাব্যে ও ভাবমিলন কাব্যের মধ্যে বর্তমান। বিদ্যাপতি, দুঃখের বিষয়, বসন্তকে কেবল শৃঙ্গার-বোধন পরিবেশরূপে দেখিয়াছেন। আমি এই প্রসঙ্গে বসন্তের ব্যক্তিরূপমূলক পদগুলি বাদ দিতেছি। বসন্তে নরনারীর চিরন্তন ব্যাকুলতার আভাস যেখানে আসিয়াছে (যথা, কিছু পূর্বে আলোচিত পদে যাহার স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াছি), সে কবির অজ্ঞাতেই আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। কালিদাসের মধ্যে বসন্ত-প্রভাবে নরনারীর কিংবা প্রাণিগণের মধ্যে যে স্নেহানুভূতির সঞ্চার ঘটে, যার বশে ভ্রমর ভ্রমরীকে অগ্রে মধুপান করিতে দেয়, পদ্মপরাগগন্ধী জল শুঁড়ের দ্বারা টানিয়া হস্তিনী হস্তীর মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া তাহাকে জলপান করায়, চক্রবাক অর্ধভুক্ত পদ্মমৃণাল চক্রবাকীর মুখে তুলিয়া ধরে, কিংবা শ্রমজলসিক্ত দেহ ও আসবঘূর্ণিত নেত্রযুগলশালী কিন্নরীর মুখচুম্বন করে কিন্নর—সেই স্নেহগাঢ় প্রেমবিহ্বলতাও বিদ্যাপতির তৃষ্ণাজ্বালায় কিরূপ বিপর্যস্ত পূর্বেই দেখিয়াছি। বিদ্যাপতি অবশ্য বসন্তের নৃত্য ও রঙ্গ আনিয়াছেন; রাধামাধবের বাসন্তী রাসবিহারের সুন্দর বর্ণনার পরিচয় আমরা দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে—সেই নৃত্যরঙ্গে—ভাবদৈন্যের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হইয়াছে কিনা সন্দেহ হয়।

বিদ্যাপতির বসন্ত-কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের মহুয়ার বসন্ত-কবিতা

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিকবি রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-কবিতার সঙ্গে এই বিষয়ে বিদ্যাপতির সামান্য রচনার উৎকর্ষগত তুলনার কথা ওঠে না। কেবল একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। মহুয়ার বসন্ত-কবিতার সঙ্গে বিদ্যাপতির বসন্তের ব্যক্তি-চরিত্রমূলক কবিতাগুলির কিছু ভাবৈক্য দেখান যায়। উভয় ক্ষেত্রেই বসন্তকে প্রাণবান চরিত্ররূপে দেখান হইয়াছে। সে তো সংস্কৃত পুরাণেও হইয়াছে। বিদ্যাপতি বা রবীন্দ্রনাথ আরো কিছু অগ্রসর। তাঁহারা বসন্তের জন্ম হইতে ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং শীতের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া বসন্তের আবির্ভাব ব্যাপারটি তাঁহাদের

কাব্যে নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে শীতকে জড়তার প্রতীক করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ী বসন্তকে নবীনের দূত করিয়াছেন। কখনো কখনো বসন্ত স্বয়ং 'নবীন', হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতিতে বসন্তের উপর ভাবারোপ এতখানি প্রত্যক্ষ নয়, তিনি প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন-আনয়নকারী বসন্তের মহিমার চিন্তায় অধিক ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু যেখানে তিনি বসন্তের রাজমহিমা, শীতের সঙ্গে তাহার সংগ্রামবিজয়ী রূপ, কিংবা বসন্ত-বিবাহের কথা বলিয়াছেন, সেখানে কেবল রূপদৃষ্টি নয়, ভাবদৃষ্টির দ্বারাও কবি চালিত ছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হয় না।

মহুয়ার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাপতির এই বহিরঙ্গ ঐক্যের হেতু চিন্তা করা চলে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের বসন্তদৃষ্টির সঙ্গে অবশ্য বিদ্যাপতির দৃষ্টির মিল নাই। রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম হইয়াছিল নবীন পৃথিবীতে। তখন নিজের প্রাণরূপই তাঁহার নিকট প্রধান আস্বাদনীয় কিংবা দর্শনীয় বস্তু। প্রকৃতিতে তখন ব্যক্তি-প্রাণের প্রতিফলন কবি দেখিতে চাহিয়াছেন। মানসী—সোনার তরী—চিত্রার সেই রবীন্দ্রনাথ। মহুয়া রচনার কালে রবীন্দ্রনাথ প্রায় বৃদ্ধ। তাঁহার আবেগ সংযত। মননশীল রূপতান্ত্রিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির দর্শন ও বিশ্লেষণে তিনি তখন নিযুক্ত। তাই নিসর্গের বিভিন্ন অবয়ব পৃথক ব্যক্তিক মর্যাদা লাভ করিয়া তাঁহার কাব্যে উপনীত। বাসন্তী পুষ্পলতাকে তিনি শুধু প্রাণের নয়, বুদ্ধিচেতনার অংশী করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিগণ—যেহেতু তাঁহারা পুরাতন পৃথিবীর অধিবাসী—সে কারণে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন প্রাণারোপ করিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের অনুবর্তী বিদ্যাপতিও। সেইজন্যই মহুয়ার রবীন্দ্রনাথ ও বসন্তের কবি বিদ্যাপতির মধ্যে আমরা মানস-সাধর্ম অনুভব করি। একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য, বিশালতর, মহত্তর ও পরবর্তী কবিরূপেও বটেন, বিদ্যাপতিকে অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ছিলেন।

বিদ্যাপতির বসন্ত-কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মহুয়ার বসন্ত-কবিতার আক্ষরিক ঐক্য দেখান আমার উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার পিছনে বিদ্যাপতির বসন্ত-কবিতার প্রভাব ছিল, এরূপ বিশ্বাস আমার নাই। কিন্তু বর্ণনাভঙ্গিগত ঐক্য কি প্রচুর! শীতকে পরাভূত করিয়া বসন্তের বিজয়ী রূপ বিদ্যাপতি দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট বসন্ত "নিত্যকালের

মায়াবী" রূপে প্রতিভাত এবং তাহার আগমনের বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে—

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়',
কালের প্রয়াণ-পথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থর থর করি উঠুক পরাণ
প্রান্তরে পর্বতে॥
বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়—
করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে,
মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে
মধুপের মনোহরা।'
(বোধন—মহুয়া)

বিদ্যাপতি "কিংশুক ফুলে আগুন" দেখিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি।
(শুভযোগ)

এইবার রবীন্দ্রনাথের মহুয়া হইতে কিছু বসন্ত-বর্ণনা তুলিয়া দিতেছি, যাহার সঙ্গে বিদ্যাপতির পূর্বোধৃত বহু অংশের ভাবগত ঐক্য সহজেই চোখে পড়িবে।—

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল—
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যার উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী।
(বোধন)

*

বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
(মাধবী)

নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
(প্রত্যাশা)

কিশলয়গুলি
কম্পমান করুণ অঙ্গুলি।
(দ্বৈত)

নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণী-হিল্লোল ওঠে প্রভাতের
স্বর্ণ কূলে,—
(বরণডালা)

যেমন নূতন বনের দুকূল
যেমন নূতন আমের মুকুল—
(নিবেদন)

অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতি-সংঘ আনে পাখায় পাখায়
বসন্তের বর্ণমালা চিত্রল অক্ষরে;—
(লয়)

কেবল বসন্তের বর্ণনায় নয়, মহুয়ার নিবিড় আষাঢ়ের বর্ণনাতেও কবি ধরণীর যে মূর্তি আঁকিয়াছেন, তাহা বিদ্যাপতির বর্ণনানুরূপ—

পরি লয় নূতন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন।
(লগ্ন)

পূর্বে বিদ্যাপতি-কৃত বসন্ত-বিবাহের কথা বলিয়াছি। সেদিন সমস্ত বনভূমি ছিল উৎসবে মাতোয়ারা। বসন্ত বর, কিন্তু কন্যা কে, বিদ্যাপতি তাহা জানান নাই বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথও বসন্ত-বিবাহের কথা বলিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ধরিত্রীকে কন্যা করিয়াছেন—

পথ পাশে মল্লিকা দাঁড়াল আসি,
বাতাসে সুগন্ধে বাজাল বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর, অম্বরে ছড়ায়ে হাসি॥
অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকর-গুঞ্জিত
কিশলয় পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া॥
কিংশুক কুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সঙ্গীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে॥
(বরযাত্রা)

বিদ্যাপতির বক্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁহার অসাধারণ ভাষার ঐশ্বর্য দিয়াছেন।

সবশেষে শীতের সঙ্গে সংগ্রামী বসন্তের যে-রূপ বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন, তাহারই মত আর একটি ছবি তুলিয়া দিতেছি, সে ছবি রবীন্দ্রনাথের,—

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ।
বন্দীরা পেল ছাড়া।………

জীবনের রথে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে—
দলে দলে আসে আমের মুকুল,
বনে বনে দেয় সাড়া ॥

কিশলয় দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কল-কোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে ।......

মরু যাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে
জাগে মৌমাছিপাড়া ॥

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ ।......

বর্ম তোমার পল্লব দলে,
আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া ।......

হে অজেয়, তব রণভূমি-'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণ বায়ু মর্মরস্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া ॥
(বসন্ত)

বিদ্যাপতির বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার ঐক্যও যেমন, তেমনি পার্থক্য। ঐক্যের কারণ বলিয়াছি, পার্থক্যের কারণ না বলিলেও চলে— রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশী পরিমাণে ভাববাদী। তাঁহার কল্পনাও বহুব্যাপক। সে হিসাবে পার্থক্য আসিয়াছে। বিদ্যাপতি রূপনিষ্ঠায় অটল ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ রূপনিষ্ঠার উপর নিজের স্বকীয় চিন্তা ও ভাবুকতা আরোপ করিয়াছেন। বসন্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে যতখানি রূপধারক, ততোধিক ভাববাহক। বসন্ত তখন নূতনের প্রতীক, জড়ের শত্রু, অজেয় প্রেমের সহচর। রবীন্দ্রনাথ মহুয়ায় পঞ্চশরকে নবমর্যাদা দিতে চাহিয়াছেন। সেখানে

তিনি বলিষ্ঠ প্রেমের পূজারী। প্রাণ-বলীয়ান প্রেমে কামের যোগ্যস্থান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা নাই। আর, তিনি দগ্ধ পঞ্চশরকে বিশ্বময় ভস্ম-ধূলিরূপে বিস্তৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট নন, তিনি ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়িয়া বীরের তনুতে তনু লইবার জন্য অতনুকে আহ্বান জানাইয়াছেন। বসন্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহাই বলিতে চান—সে বসন্তের 'মৃত্যুদমন শৌর্য'—জড়দৈত্যের সঙ্গে চিরসংগ্রামকাহিনী সে ধূলির পটে লিখিয়া চলে—মনোহর রঙে ভূমিতলে যুদ্ধের লিপি রাখিয়া যায়। বসন্তের উপর এই নূতন ভাবারোপ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। সংস্কৃত, ও সংস্কৃত ভাবাশ্রিত কাব্যে সৌন্দর্যের দাসত্ব করিয়া এবং কামীর শয্যা বিছাইয়া বসন্ত রিক্তবিত্ত হইয়া পড়িয়াছে। কল্পনার সেই দৈন্য ও ক্লান্তি দূর করিতে নূতন আইডিয়ার আমন্ত্রণ প্রয়োজন। পরিণত বয়সের প্রকৃতিকাব্যে রবীন্দ্রনাথ সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বসন্ত-বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-বর্ণনার কিছু ঐক্য আছে, কিন্তু বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথীয় ভাবসম্পদের অধিকারহীন, তাহা না বলিলেও চলে।

রূপানুরাগ : 'রূপ হতে রূপে'

শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগ

প্রেম ও সৌন্দর্যের কবিরূপে বিদ্যাপতির পরিচয় এই প্রবন্ধের মুখ্য প্রতিপাদ্য, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রেমের কবিরূপে বিদ্যাপতির প্রতিভার পরিচয় লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ঐ আলোচনাতেই সৌন্দর্যের কবিরূপেও বিদ্যাপতিকে যথেষ্ট চিনিয়াছি। কারণ বিদ্যাপতির নিকট প্রেম যেমন কাম ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় রূপ ছাড়া। কবির প্রেম-কাব্যের আলোচনায় জীবনে রূপের ভূমিকা দেখিয়াছি। প্রমাণিত হইয়াছে—'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র' এবং সুন্দর দেহের। বিদ্যাপতির সুন্দর ভাষা ও অলঙ্কার ঐ প্রেমের প্রাণশক্তির পক্ষে কতখানি প্রয়োজন তাহা উদঘাটিত হইয়াছে। প্রেমের মুহূর্তগুলিকে চিরন্তন করিতে শব্দ ও ভাষার তাৎকালিক মণিদ্যুতি একান্ত সহায়তা করিয়াছে। বিদ্যাপতির প্রেম, রূপের বসনে সাজিয়া যৌবনের সিংহাসনে আসীন।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কবির রূপসৃষ্টিকে আরো কিছু ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করিব। এখানে 'রূপানুরাগ' পর্যায় আমাদের আলোচ্য। বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে রূপানুরাগকে পৃথক পর্যায় করা মুশকিল। প্রথমতঃ সকল পর্যায়ে রূপের এমন প্রাধান্য যে, রূপ-প্রধান পদগুলিকে বাছিয়া লইতে গেলে বিদ্যাপতি-পদাবলীর অতি বৃহৎ অংশ বাহির হইয়া আসে। এ ক্ষেত্রে হয়ত যেখানে কবির মুখ্য উদ্দেশ্য বহিরঙ্গ রূপসৃষ্টি করা, তেমন পদগুলিকে পৃথক করিতে চাহিব। কিন্তু মনে রাখা ভাল, ঐ সকল ক্ষেত্রে রূপকে দেখা হইয়াছে প্রেমের বা কামনার দৃষ্টিতে। সুতরাং সেখানে বাহিরে রূপানুরাগ সত্ত্বেও ভিতরে প্রাণ-কামনার শিহরণ। সে যাহা হউক, রূপানুরাগ নামক পর্যায় যখন আছে, এবং রূপবাদী কবিরূপে যখন বিদ্যাপতির খ্যাতি, আমরা কিছু পদ পৃথক করিয়া লইবই।

রূপানুরাগের আলোচনা কার্যতঃ আলঙ্কারিক বিদ্যাপতির আলোচনা। অলঙ্কার-প্রয়োগের এই সুচারু সময়। বিদ্যাপতির কাব্যে অলঙ্কার-বিরল

অংশ প্রায় মেলে না ; তার মধ্যে 'রূপানুরাগে' সৌন্দর্য-সন্নিবেশের বিশেষ উল্লাস। আবার বিদ্যাপতির প্রেম মূলতঃ দেহগত ; দেহগত প্রেমে দেহের রূপ দেখিয়া মনের উন্মাদনা। এমন প্রেমে রূপের কথা স্বতঃই বড় হয়। রূপানুরাগে রাধার ও কৃষ্ণের উভয়েরই রূপের পরিচয় পাই। পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, বিদ্যাপতির কাব্যে রাধারূপেরই প্রতিষ্ঠা—পুরুষের চোখ নারীসৌন্দর্যে বিভোর। কবি নিজেও পুরুষ ছিলেন। অপরপক্ষে নারীরা 'হৃদয়-চক্ষু', আত্মসংবরণ করিয়া রূপদর্শনে প্রায় অসমর্থ ; তাই বিদ্যাপতির কাব্য কৃষ্ণরূপ বিশেষ চিত্রিত নাই। পরবর্তী বৈষ্ণবকাব্যে কিন্তু কৃষ্ণরূপের বিস্তৃততর পরিচয় আছে। পরবর্তীকালে রূপশেখর রসময় দেবতা কৃষ্ণের রূপার্চনা ধর্মার্চনার অঙ্গস্বরূপ। বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমনায়ক—বিদগ্ধ নাগরিক পুরুষ। প্রেমসম্ভোগে তাঁহার মানসিক পটুত্ব ও শারীরিক বিক্রম—এই দুই গুণের প্রকাশ দেখাইতে পারিলেই কবি চরিতার্থ। সৌন্দর্য যদি কোথাও দেখাইতে হয়, সে রাধার দেহাধারে। রূপানুরাগের 'রূপ' বলিতে তাই রাধারূপের চিত্রণই বুঝিতে হইবে।

রূপের বর্ণনায় বিদ্যাপতি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসারক, বলাই বাহুল্য। তিনি নিজস্ব ভাবেও অনেক অলঙ্কার যোজনা করিয়াছেন। সেই নূতন অলঙ্কারগুলিও সংস্কৃত ভাবাশ্রিত। বিদ্যাপতি অধিকন্তু লোকরসের আস্বাদক ছিলেন। লোকবচনের বহুল ব্যবহারে এবং অবহট্‌ঠ ও মৈথিলে শ্রেষ্ঠ কাব্যফল উৎসর্গ করার মধ্যে, তাঁহার লোকরস ও লোকভাষাপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় মেলে। তাই বিদ্যাপতি যেখানে বিশেষভাবে সংস্কৃত-ভাবাশ্রিত, সেখানেও তাঁহার কাব্যে সংস্কৃতের প্রস্তর-প্রতিমা জীবনাবেগে চঞ্চল। বিদ্যাপতির রূপনায়িকারা প্রাচীন প্রসাধন ও অলঙ্কারে অঙ্গ ঢাকিয়া আসিলেও কামনা ও ক্ষুধায় চির বর্তমানা। প্রাচীন অভিজাত গৃহের সংস্কার, পিতামহী-ব্যবহৃত অলঙ্কাররাজির ভার তাহাদের সর্বত্র নিষ্প্রাণ করিতে পারে নাই।

রূপমূলক পদের অন্তর্গত প্রচলিত অলঙ্কারের বিবরণ এখন স্থগিত থাক ; নিশ্চয় সেগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির কবিনৈপুণ্যের পরিচয় আছে ; 'আজি হতে' পাঁচশত বৎসর পূর্বে, বিদ্যাপতির নিজ যুগে, ঐ প্রকার অলঙ্কার-রসিকতা শিক্ষিত-মধ্যে যথেষ্টই ছিল। না থাকিলে বিদ্যাপতি অযথা শক্তিক্ষয় করিতেন না। এখন, কবি-ব্যবহৃত অলঙ্কার বা রূপবর্ণনার সেইটুকুই লইব, কিছু পরিমাণে যাহাকে অন্ততঃ আধুনিক মন গ্রহণ করিতে সমর্থ।

রূপানুরাগ পদগুলিকে মোটামুটি কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।—

(১) আলঙ্কারিক কলাচাতুর্যময় পদ

অত্যুক্তি, অতিরঞ্জন ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন এখানে কবির অভিপ্রায়। অলঙ্কারের অঙ্ক কষিয়া এখানে রূপ মিলাইয়া লইতে হয়। "কবরী ভয়ে চামরী" (৬২০) ইত্যাদি পদ ইহার দৃষ্টান্ত।

(২) দেহের সর্বাঙ্গের বর্ণনামূলক পদ

সমগ্র দেহটি যেন সম্মুখে রাখিয়া কবি এই সব লিখিয়াছেন। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় নাই। রাধার আপাদমস্তক খোলাখুলি বলিবেন কবি।

বিভিন্ন দেহাংশের বর্ণনার জন্য এক বা একাধিক অলংকার আছে। কবি সেগুলি অক্লেশে ব্যবহার করেন। দুই চারিটা যোগ করিয়াও দেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে হইবে।

(৩) বিস্রস্তবাস দেহের কিংবা অরক্ষিত দেহের সৌন্দর্য

মনশ্চাঞ্চল্য সৃষ্টির এমন সুযোগ অল্পই আছে। পবনে বা অন্যভাবে দেহ বসন বিস্রস্ত হইলে অনাবৃত তনুদর্শনের সুখমাতাল নায়ক। নির্জনে, নায়িকার অজান্তে, তাহার উদ্ঘাটিত দেহরূপ প্রেক্ষণেও অনুরূপ বিহ্বলতা। বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে সেই বর্ণনা। যথা ৫, ৩৯, ৪৮৪ ইত্যাদি।

একটি দৃষ্টান্ত,—

পবনের স্পর্শে বসন বিস্রস্ত হইল, আমি সুন্দরীর দেহ দেখিলাম। মনে হইল যেন নূতন মেঘের নীচে চমকিত বিদ্যুৎরেখা।......তাহার অপূর্ব কমলতুল্য কুচযুগ দেখিলাম। উহা বিকশিত নহে। তাহার কিছু কারণ আছে—সম্মুখে মুখরূপ চন্দ্র আছে। (চন্দ্রের সমক্ষে কমল বিকশিত হয় না)।" (৫)

(৪) স্নানমূলক পদ

স্নানসায়র কবিগণের রসতীর্থ। স্নাননিরতার চিত্রাঙ্কন আছে কয়েকটি পদে। রাধার দেহে সিক্ত বসনের স্নিগ্ধ প্রলেপ, কৃষ্ণের মনে কামনার

অগ্নিদাহ। দু'একটি পদের আলংকারিক বয়ন যথার্থ কাব্য-গুণসম্পন্ন। সায়রোত্থিতা আর্দ্র বসনাকে দেখিয়া কবির মন রীতিমত রসার্দ্র। শ্রেষ্ঠ পদটি প্রথমেই উদ্ধৃত করা যাক,—

"কামিনী স্নান করিতেছে। দেখিতেই পঞ্চবাণ হৃদয়ে শর হানিল। চিকুর হইতে জলধারা গলিয়া পড়িতেছে, যেন মুখশশীর ভয়ে (কেশপাশরূপী) অন্ধকার রোদন করিতেছে। কুচযুগ যেন সুন্দর চক্রবাকমিথুন।...তাহারা পাছে আকাশে উড়িয়া যায়, এই ভয়ে বাহুপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর্দ্র বসন দেহের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মুনিরও মনে মন্মথ জাগে।" (২২৮)

দুইটি অলঙ্কারে কল্পনা ও সৌন্দর্যশক্তির পরিচয়,—(১) ঘন কালো চিকুর হইতে বিগলিত জলধারা হইল মুখশশীর ভয়ে অন্ধকারের ক্রন্দন, (২) চক্রবাক মিথুনের মত কুচযুগল, তাহারা পাছে আকাশে উড়িয়া যায় (আকাশ নিকটেই, যেখানে আকর্ষণকারী মুখশশী বিরাজ করিতেছে) সেই ভয়ে তাহাদের বাহু-পাশে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। স্নানকালে স্বাভাবিক দেহসঙ্কোচে দুই হস্তে মুক্ত বক্ষ আবরণচেষ্টাকে আর কোন্ উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারে প্রকাশ করা সম্ভব ? রাধিকার দেহের সৌন্দর্য-প্রভাবকে, ঐ সৌন্দর্যের দ্বারা মুনিগণের ধ্যানভঙ্গের সম্ভাবনার কথা জানাইয়া কবি ঘোষণা করিয়াছেন।

আরো একটি পদে স্নাননিরতাকে দেখিয়া কৃষ্ণের রূপোল্লাস —

"আজ আমার শুভদিন, স্নানের সময় কামিনীকে দেখিলাম। চিকুর বহিয়া জলধারা গলিয়া পড়িতেছে, যেন মেঘ মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে। মুখ প্রচুর মুছিল, যেন কনকমুকুর মাজিয়া রাখিল। নীবিবন্ধগ্রন্থির উদ্দেশ করিল। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ইহাতে নায়কের আকাঙ্ক্ষা চরম সীমা পাইল।' (৬২৬)

দুইটি শ্রেষ্ঠ পদে রাধার স্নানশেষ রূপ—

যুবতী স্নানকেলি করিয়া সানন্দে যমুনাতীরে উঠিল। কেশে জড়ানো হার গুছাইবার সময় যেন যুথে যুথে চাঁদের উদয় হইল (কৃষ্ণকেশরূপ আকাশ এবং নখরূপ চাঁদ)। মানিনি! তোমার অপূর্ব নির্মাণ। মনে হয় যেন (তোমার দেহে) পঞ্চবাণের সেনা সাজিয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ আনিয়া তাহাতে সোনা কষিয়া তোমার মুখশ্রেষ্ঠ সৃজন করিয়াছে। চাঁদের যাহা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা (মুখ হইতে) কাটিয়া ফেলিল, তাহাতেই যেন সকল তারার সৃষ্টি। আর সোনার যাহা উদ্বৃত্ত রহিল, তাহাতে হইল দুই পয়োধর।"—(৩২০)

"ঘাটেতে দেখিলাম সুন্দরী স্নান করিয়াছে।......কেশ নিঙড়াইতেছে, জলধারা বহিতেছে, চামরে যেন মুক্তাহার ঝরিতেছে। সিক্ত অলকগুলি অতি সুন্দর, যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল

কমলকে ঘিরিয়াছে। জল লাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও অঞ্জনশূন্য, যেন পদ্মপত্র সিন্দুরে মণ্ডিত। পয়োধরের প্রান্তে সিক্ত বসন লাগিয়া রহিয়াছে, যেন সোনার বিল্বফলে তুষার পড়িয়াছে।... "এখনি আমাকে ছাড়িয়া, আমার প্রতি স্নেহত্যাগ করিবে, তখন আর এরূপ আনন্দ পাইব না',—এই ভাবিয়া নায়িকার বসন কাঁদিতেছে, তাই তাহা হইতে জলধারা পড়িতেছে।"(৬২৭)

অলংকারের মায়াপুরী। নূতন ও পুরাতন অলংকার মিলিয়া সৌন্দর্যের যাদুবিস্তার। অপ্রাণীতে প্রাণার্পণ কবিদের নিত্যকর্ম—কবি সে জিনিসকেই এখানে নিত্যকীর্তিতে উন্নীত করিয়াছেন। আকাশে অগণ্য তারা জ্বলে, মানুষ দেখে এবং মুগ্ধ হয়। মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক মারফত তারকার সৃষ্টি কাহিনী শুনিয়া লয়। কিন্তু কবিদেরও এ ব্যাপারে কিছু বলিবার আছে। বিদ্যাপতি প্রথম পদটিতে তারকাসৃষ্টির কবিকাহিনী লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় পদে তিনি ভাগ্যহীন দেহবসনকে কাঁদাইয়াছেন। যে বসন সিক্ত হইয়া বুকের স্বর্ণবিল্বফলের উপর আনন্দিত তুষারের মত ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে সেই স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে অচিরকালে। নায়িকার পুণ্যক্ষীণ বসন আসন্ন দুর্দশার কল্পনায় যখন প্রবলভাবে কাঁদিয়াছে, তখন কবি তাহার প্রতি সবিশেষ সহানুভূতিপরায়ণ ছিলেন, এবং নায়কও। কবির সহানুভূতির কারণ বুঝি—সর্ববস্তুতে কবিদের সহানুভূতি থাকে। কিন্তু নায়কের সহানুভূতির কারণ? ইহাকে সহানুভূতি না বলিয়া সহমর্মিতা বলাই ভাল; বিদ্যাপতির নায়িকা যে একবার বলিয়াছিল,—প্রিয়তমের দেহ আমার বস্ত্র হইল।

(৫) স্বপ্নে রূপদর্শন

স্বপ্নে রূপদর্শন ও মিলনমূলক কয়েকটি পদ আছে বিদ্যাপতির। স্বপ্ন-মিলনের পদগুলি মিলন-পর্যায়ে আলোচিত। স্বপ্নদর্শনের দুইটি পদই এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

দুইটির মধ্যে আবার একটিকে (৩৫) বাদ দিতেছি। সেটিতে কৃষ্ণের রূপবর্ণনা। শ্রীরাধার রূপানুরাগ অংশে তাহা উল্লিখিত হইবে। এখানে মাত্র একটি পদই উদ্ধৃত করিব—একটি অসাধারণ পদ।

স্বপ্নে রূপদর্শন বা মিলনের বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার বিশেষ পরিতৃপ্তি। স্বপ্নে কল্পনা নিরঙ্কুশ, সেখানে অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণার অবাধ পানতৃপ্তি; অব্যাহত

দর্শন বা আস্বাদন। বাস্তব স্বপ্নে অনেক কুশ্রীতা থাকিলেও কবিরা সাধারণ-ভাবে মধুস্বপ্নের পসারী। স্বপ্নমূলক পদগুলিতে কেবল একটি আশঙ্কার ছায়াপাত আছে—স্বপ্ন ভঙ্গুর—স্বপ্নজাল ছিড়িয়া দিনের সূর্য রুদ্রমূর্তিতে আঘাত করে চোখে।

সৌন্দর্যের সরল চাতুরী কী অপূর্ব রসসৃষ্টি করিতে পারে, আলোচ্য ৩৬ পদে তার পরিচয় আছে। বড় অনুকূল পরিবেশ ; সরস বসন্তের আগমন, দক্ষিণ পবনের মন্দগতি ; এমন সময়ে নিদ্রার সুখাবেশ। পরিবেশের অনুরূপ একটি লাবণ্যময় স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিল। স্বপ্নে নারীর কাছে এক পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। মধুকণ্ঠে যে কথাগুলিকে তিনি বলিলেন তাহাতে বাণীকৌশল থাকিতে পারে, কিন্তু কখনো কখনো এমন সময়ও আসে যখন মানুষের জীবন ঐ বাণীরই মতো সুষমাশ্রী লাভ করে। স্বপ্নে আবির্ভূত পুরুষ নায়িকাকে বলিল—

"তোমার মুখ হইতে কাপড় সরাও। যদিও বিধাতা অনেক যত্ন করিয়াছেন, তথাপি চাঁদকে তোমার মুখের মতন করিতে পারেন নাই। কয়েকবার চাঁদকে কাটিয়া নূতনভাবে বানাইলেন, তথাপি চাঁদ মুখের সমান হইল না। কমল যে লোচনের তুল্য হয় নাই জগতে কে না জানে ?" (৩৬)

(৬) চন্দ্রকেন্দ্রিক পদ

বলাবাহুল্য কবিগণ চন্দ্রাহত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় কবিগণের চন্দ্র-চন্দন-মাল্য-বনিতার প্রতি আসক্তি সুবিদিত। চন্দ্রালঙ্কারের অগণিত ব্যবহার বিদ্যাপতির কাব্যেও দেখা যায়। সামান্য পূর্বে পূর্ণিমার চাঁদে সোনা কষিয়া মুখ-সৃষ্টির সুন্দর কবিকল্পনাটি দেখিয়াছি। বর্তমানে চন্দ্রমূলক এমন কয়েকটি পদ গ্রহণ করিতেছি, যেখানে চন্দ্র সাধারণ আলঙ্কারিক প্রয়োজন এড়াইয়া অভিনব রসকল্পনার আশ্রয় হইয়াছে—রোমান্টিক অতি-ছোট গল্প হইয়া উঠিয়াছে। কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক :—

"হে গৌরি, বসনে বদন ঢাকিয়া রাখ, রাজা শুনিয়াছেন যে, চাঁদ চুরি গিয়াছে। ঘরে ঘরে প্রহরীরা খুঁজিতেছে। এখন তোমারই দোষ হইবে (রাধা চন্দ্রমুখী)। কিন্তু চাঁদকে যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে ? যেখানে লুকাইয়া রাখিবে সেখানে উজ্জ্বল হইবে।...বিদ্যাপতি বলেন, নিঃশঙ্ক হও, চাঁদের কিছু কলঙ্ক আছে।" (২৯)

"তোমার মুখশ্রী এত সুন্দর যে, ভয় হয় পাছে লোকে বলে, তুমি চাঁদকে চুরি করিয়াছ। তুমি কাহাকেও যেন মুখ দেখাইও না। রাহু তোমার মুখকে চাঁদ মনে করিয়া গ্রাস করিবে।......চন্দ্র সাগরের সার অমৃত চুরি করিয়াছে বলিয়া রাহু বড় কলহ করে (আবার তুমি সেই চাঁদ চুরি করিয়াছ)। বিদ্যাপতি বলেন, তোমার ভয়ের কারণ নাই, কোনো চাঁদেরও কিছু কলঙ্ক আছে।" (৩০৫)

এমন রূপকথা সহজে মেলে না, এমন রসকথা।

(৭) দেহে বিপরীত গুণসম্পন্ন বস্তু : আশ্চর্যজনক সমাবেশ

এমন কিছু বস্তু আছে যাহাদের পরস্পর-বিরোধিতা ভারতীয় কাব্য-জগতে সুপ্রসিদ্ধ। কবি রাধাদেহে সেই সকল বিবদমান বস্তুর পাশাপাশি অবস্থান দেখিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরো কিছু জিনিস রাধাদেহে মেলে, যেগুলির উৎস দুর্নিরীক্ষ্য। তাহাদের কথাও কাব্যে আছে।—

"(তাহার গমন দেখিয়া মনে হইল যেন) সুবর্ণলতা বিনা অবলম্বনে চলিয়া যাইতেছে।"(৫)

"চাঁদ (মুখ) আকাশে এবং কমল (নয়ন) পাতালে থাকে, উভয়ের একসঙ্গে বাস ঘটিল কেমন করিয়া?" (২৪)

"মেরুর (কুচ) উপর দুটি কমল ফুটাইল, তাহারা বিনা নালেও শোভা পাইল। মণিময় হার যেন গঙ্গার ধারা, তাই কমল শুকাইয়া যাইতেছে না।......রবি (সিন্দুরবিন্দু) ও শশী (মুখ) পাশাপাশি উদিত হইয়াছে। রাহু (কেশ) দূরে বাস করে, তাই রবি-শশীকে গ্রাস করে না।" (২৫)

"এক আশ্চর্য বস্তু দেখিলাম, জল নাই অথচ কমল (পয়োধর) ফুটিয়াছে। দুইটি শম্ভুর উপর যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ (নখরেখা)।" (২৬)

"মাধব, ফিরিয়া দেখ, কি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী দেখা যাইতেছে। নদীর (ত্রিবলীর) কূলে যেন গভীর এক কূপ (নাভি), সেখানে জল নাই, তবু শৈবাল (রোমাবলী) জন্মিয়াছে।"—(২৭)

"কেশকলাপ অন্ধকারের ন্যায়, বদন পূর্ণিমার চাঁদের মতন, আর নয়ন কমলতুল্য, কে বিশ্বাস করিবে যে (অন্ধকার, পূর্ণচন্দ্র এবং পঙ্কজ) একস্থানে থাকিতে পারে? সহজ সুন্দর গৌরবর্ণ কলেবর, তাহাতে পীন পয়োধর শোভমান, যেন কনকলতার উপর আশ্চর্যজনক সুমেরুগিরি ফলিল।" (৩২)

উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে তৃতীয়টি আমাদের কিছু অসুবিধায় ফেলিয়াছে। সেখানে মেরুর উপর প্রস্ফুটিত কমলদ্বয় বিনা নালে শোভমান মনে হইলেও কবি পদ্মের রস-সঞ্চারণ-পথটি গোপন করিতে পারেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন, মণিময় হার-রূপ গঙ্গার ধারা রস জোগাইয়া কমল দুটিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। কবি অকারণের সৃষ্টি দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ কারণের ফাঁদে পড়িলেন কেন? বলাবাহুল্য তিনি মণিময় হারকে গঙ্গাধারা বলিবার আলঙ্কারিক প্রলোভনে পড়িয়া গিয়াছিলেন। এখানে কাব্যে সঙ্গতির ক্ষতি।

শ্রীরাধার রূপানুরাগ

বিদ্যাপতির রচনায় শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগের প্রাধান্যের কথা বলিয়াছি। কৃষ্ণের নয়নবাসনায় রাধারূপ সেখানে প্রতিবিম্বিত। আরো বলিয়াছি, রাধার কৃষ্ণদর্শন অনুরূপ রূপমহিমা লাভ করিতে পারে নাই। তবু রাধার রূপানুরাগের আলোচনা বাদ দেওয়া যায় না। রাধাও রূপ ভালবাসিতেন। লৌকিক রাধার অহঙ্কৃত মনোভাবের প্রকৃতি পূর্বে দেখিয়াছি। নিজের রূপযৌবন সম্পর্কে তাহার ছিল উগ্র উচ্চ ধারণা। তাহার রূপযৌবনের যথেষ্ট সমাদর করিতে পারে নাই বলিয়া কৃষ্ণ 'মূর্খ', 'গোঁয়ার', 'বেরসিক'; এক-কথায় অনাগরিক। এমন লৌকিক রাধা স্বভাবতঃই কৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। ভাবোন্নত বিরহ-পর্যায়েও দেখা যায়, কৃষ্ণের মহান চরিত্রের মত মহান রূপের জন্যও রাধার বাসনা-ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছে। অতএব রাধা, কৃষ্ণের রূপ যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং কখনো কখনো তাহা বর্ণনাও করিয়াছেন আনন্দের সঙ্গে।

তেমন একটি সুন্দর ক্ষেত্র—ধরা যাক ৩৫ পদটি। স্বপ্ন-দর্শনের এই পদে কৃষ্ণরূপের মনোহর পরিচয়—

"নীলকলেবর পীতবসনধারী, শ্বেতচন্দনের তিলক, যেন শ্যামল মেঘ বিদ্যুতে (পীত-বসনে) মণ্ডিত হইয়াছে, আর তাহাতে শশিকলার (চন্দনতিলক) উদয় হইয়াছে। হরি হরি, অন্য কাহাকেও যেন বলিও না, আজ আমি স্বপ্নে নন্দকুমারকে দেখিলাম।"

এমন সুন্দর কৃষ্ণ-রূপের বর্ণনা বিক্ষিপ্তভাবে আরো কিছু সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রূপ সম্বন্ধে রাধার দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের আলোচ্য। সে প্রসঙ্গে আসিলে দেখিব, রাধা রূপদৃষ্টিতে অবিচল ছিলেন না—তাঁহার ভাবের, প্রেমের দৃষ্টি। কৃষ্ণতনু সেখানে, তাঁহার ভালোবাসার সায়রে গলিয়া গিয়াছে। অসাধারণ ভাব-কল্পনায় সমাপ্ত পদটি দেখা যাক। রাধা বলিতেছেন—

"তাঁহার সুন্দর অঙ্গ লক্ষ্য করিলাম; মনে হইল যেন পদ্মপত্র স্পর্শ করিতেছি। তনুতে ঘর্মবিন্দু প্রসারিত হইল, (যেন) তারকাবেষ্টিত চন্দ্র নির্মঞ্ছন করিয়া ফেলিয়া দিল। পরম রসাল হইয়া কাঁপিল, যেন তমাল মনসিজের জপ করিতে করিতে গলিয়া গেল।" (২৩৯)

অলঙ্কারের সৌন্দর্য বটে, এবং সে সৌন্দর্য আসিয়াছে ভাবের মহিমায়। দেহের ঘর্মবিন্দুর সহিত তারকাবেষ্টিত চন্দ্র কর্তৃক নির্মঞ্ছনরূপে তারকাত্যাগের কল্পনায় চাতুর্য আছে, ততোধিক নয়। কিন্তু কৃষ্ণের অঙ্গ লক্ষ্য করা—আর চক্ষু দিয়া পদ্মপত্র স্পর্শ করা—এই উভয়কে এক করিয়া দেখাই অপরূপ। ইহাতে একদিকে ইঙ্গিতে নিজ চক্ষুকে কমললুব্ধ ভ্রমরের মত বলা তো হইলই, উপরন্তু কৃষ্ণদেহের সঙ্গে—কৃষ্ণের পুরুষদেহ সত্ত্বেও—পদ্মপত্রের তুলনা দিয়া কি চমৎকারভাবে সে দেহের সুকুমারতা, স্নিগ্ধতা ব্যঞ্জিত হইল। এখানে কেবল রাধা কৃষ্ণকে দেখেন নাই,—এই পদের গোড়াতে বলা হইয়াছে,—"হে সখি, (তিনি) হাসিয়া আমাকে অল্প দেখিলেন, (তাহাতে) আমার কৌতূহল পূর্ণ হইল। দেখিয়াই হরি আনমনা হইলেন, যেন মন্মথ (তাঁহার) মনে বাণবিদ্ধ করিল।" রাধা এই বিহ্বল কৃষ্ণের রূপই বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং ঐ পদ্মপত্রের উপমা দ্বারা কৃষ্ণের দেহের সুকুমারতা ছাড়াও প্রেম-পবনে বিচলিত শরীরের কম্পন, স্পন্দন, সবকিছুই উন্মোচিত হইয়াছে।

এখানেই শেষ কথা নয়—আরো উৎকৃষ্ট শেষ বর্ণনাটি,—স্বেদসিঞ্চিত কৃষ্ণতনু সম্বন্ধে রাধা বলিলেন—'তাহা পরম রসাল হইয়া কাঁপিল, যেন তমাল মনসিজের জপ করিতে করিতে গলিয়া গেল।' কৃষ্ণ-তমাল ভাবভরে গলিয়া পড়িতেছে—মনসিজ-মন্ত্রে পুরুষদেহের বিগলন-বিলয়ের রূপটি রাধার চোখে কবি দেখিয়াছেন; এবং ইহারই নাম কবিদৃষ্টি।

শ্রীরাধার রূপানুরাগের পদে এই প্রকার রূপদৃষ্টি ও ভাবদৃষ্টির সম্মিলন। রাধার প্রথমানুরাগের একটি পদ—

"যমুনার তীরে তীরে সঙ্কীর্ণ পথ, মুখ ফিরাইয়া ভাল করিয়া সঙ্গ হইল না, অর্থাৎ দেখা গেল না। তরুণ কানাইয়ের সঙ্গে যখন তরুতলে দেখা হইল, তখন সে যেন নয়ন-তরঙ্গে আমাকে স্নান করাইয়া গেল। কে বিশ্বাস করিবে যে এই জনাকীর্ণ নগরীর মাঝে দেখিতে দেখিতে আমার হৃদয় হরণ করিল।" (৩৩)

কবি প্রথমতঃ এই পদে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর দেখাদেখিকে চমৎকার করিবার জন্য যমুনার তীরে তীরে সঙ্কীর্ণ পথের সুযোগ লইয়াছেন। অবস্থান ও পরিবেশঘটিত এইরূপ সুযোগের ব্যবহার কবির রূপানুরাগের পদে অন্যত্রও যথেষ্ট মেলে। এখানে কৃষ্ণের রূপের বর্ণনা কিন্তু প্রায় নাই, —রাধা কেবল কৃষ্ণের নয়নের আক্রমণের কথাই বলিলেন—এবং উচ্চাঙ্গের ভাষায়—'নয়ন-তরঙ্গে স্নান করাইয়া গেল'।

এই ধরনের আরো পদ আছে, যেখানে কৃষ্ণরূপের বর্ণনা শুরু করা মাত্র রাধা বিহ্বল হইয়া নিজের দেহ ও মনোবিপর্যয়ের কাহিনী কহিয়াছেন। ২৩৮ পদ তাহার নিদর্শন। যেখানে কৃষ্ণের বিস্তৃততর বর্ণনা পাই, সেখানেও সকল রূপবর্ণনার চাতুর্যকে অভিভূত করিয়া হয়ত ছড়াইয়া আছে ভাবময় চিত্তের দু'একটি সুষমাময় ছত্র। যেমন, ৬২৯ এবং ৬৩০ পদে কৃষ্ণের রূপাঙ্কন কিছু অল্প নয়। ৬২৯ পদে রাধা বলিতেছেন—তাঁহার দেহ অভিনব জলধরের ন্যায় সুন্দর, তিনি সৌদামিনি-রেখার ন্যায় পীতবাস পরিহিত, কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত, যেন সুবেশ মদন কাজলে সাজিল ইত্যাদি। ৬৩০ পদে রাধার বিমুগ্ধতা অলঙ্কার-পথে নির্গত হইয়াছে।—

"কমল যুগলের (চরণদ্বয়) উপর চাঁদের মালা (নখ-পংক্তি), তাহার উপর তরুণ তমাল বৃক্ষ (ঊরু) উৎপন্ন হইল। তাহার উপর বিদ্যুল্লতা (পীতধটী) বেষ্টন করিল, এবং সে ধীরে ধীরে কালিন্দীতীরে চলিয়া যাইতেছে। শাখাশিখরে (হস্তাঙ্গুলিতে) চন্দ্রশ্রেণী (নখপংক্তি); তাহাতে অরুণের সদৃশ নব পল্লব (করতল)। বিমল বিম্বফল-যুগলের (ওষ্ঠাধরের) বিকাশ (হইয়াছে)। তাহার উপর শুকপক্ষী (নাসা) স্থির হইয়া বাস করিতেছে। তাহার উপর চঞ্চল খঞ্জনযুগল (চক্ষুর্দ্বয়), তাহার উপর ময়ূর (ময়ূরপুচ্ছ) সাপিনীকে (চূড়াবদ্ধ কেশকে) আচ্ছাদিত করিয়াছে।"

অর্থাৎ কবি কিছু বাকি রাখেন নাই—'মদনের ভাণ্ডার'কে উপস্থিত করিতে অলঙ্কারের ভাণ্ডার উজাড় করিয়াছেন। 'উজাড়' কথাটি বলা ঠিক হয় নাই, কবির সাত পুরুষের অলঙ্কারের সম্পদ। তবে পূর্বার্জিত সম্পত্তির

নিশ্চিন্ত প্রয়াসশূন্য উপভোগে চরিত্রনাশ হয়—কবি তাহা জানিতেন; তাই উদ্ধৃত দুইপদের শীর্ষলগ্ন এমন দুইটি ছত্র পাই যাহারা কবিতা দুইটিকে বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছে। দুই পদের শীর্ষ-বক্তব্য এক :—

"কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব স্বপন-স্বরূপ ॥" (৬২৯)

এবং

"এ সখি পেখলি এক অপরূপ।
শুনইত মানবি স্বপন-স্বরূপ ॥" (৬৩০)

রাধার রূপানুরাগের প্রথম ও শেষ কথা—'স্বপন-স্বরূপ'।

বিদ্যাপতির সৌন্দর্য সাধনা :
আলঙ্কারিক কবি

রূপানুরাগের সাধারণ আলোচনা ছাড়িয়া এইবার 'বিশেষে' প্রবেশ করিব। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে চেষ্টা করিব—বিদ্যাপতি মানবদেহকে কোন্ কোন্ অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। ইতিপূর্বে এ-বিষয়ে নানা প্রসঙ্গে যথেষ্টই বলিয়াছি, বর্তমান আলোচনায় কিছু কিছু পুনরুক্তি ঘটিবে। পাঠক (যদি কেহ থাকেন), আশা করি, অধৈর্য হইয়া আলোচনার এই অংশ বাদ দিলেও ক্ষতি নাই।

মানবদেহ, মূলতঃ নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও উপাঙ্গ এখানে আলোচনার বিষয়। তাহাদের সম্বন্ধে বিদ্যাপতি-রচিত অলঙ্কারগুলি সংগ্রহ করিয়া দিতে চেষ্টা করিব। এক অঙ্গের একাধিক অলঙ্কার আছে। অলঙ্কার যোজনাকালে অনেক সময় একাধিক অঙ্গ একত্রে গৃহীত হইয়াছে। প্রায় সকল অলঙ্কারকেই পরীক্ষা করার ইচ্ছা আছে। এই আলোচনায় বিদ্যাপতির দুইটি পরিচয় উন্মুক্ত হইবে। এক, তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, দুই, তিনি কবি ছিলেন। আমি পূর্বে বলিয়াছি, ভারতবর্ষের তাবৎ কবিসমাজে আলঙ্কারিক কবিরূপে বিদ্যাপতি উচ্চ আসন দাবী করিতে পারেন। ইতিমধ্যে বিদ্যাপতির অলঙ্কারের যে আলোচনা হইয়াছে ও বর্তমানে যে আলোচনা হইবে, তাহার পটভূমিকায় বিদ্যাপতি-বিষয়ে আমার দাবী যৌক্তিক কিনা বিদগ্ধজন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আলোচনার এই অংশে কেহ যেন ধরিয়া না লন, আমি বিদ্যাপতির অলঙ্কারের প্রথানুগ শ্রেণীভাগ, নামবিচার প্রভৃতি বিষয়ে প্রবেশ করিব। সেই কঠিন তত্ত্ববিচারে আমার সামর্থ্য নাই। এ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা অনেক পণ্ডিত ও রসিকজন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, স্বর্গতঃ ডাঃ সুধীর-কুমার দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ইঁহাদের রচনাদির কথা আমাদের মনে পড়িবে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁহার 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদ হইতে যে বহুল অংশ দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেখান হইতে ঐ সকল অলঙ্কারের 'রূপ'-প্রকৃতি সম্বন্ধে

পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা সম্ভব। আমার উদ্দেশ্য বিদ্যাপতির সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিচয় উপস্থাপিত করা। বিদ্যাপতি মূলতঃ অলঙ্কারের সাহায্যেই সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে সচেষ্ট। তাই সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতির আলোচনায় তাঁহার অলঙ্কারকে বাদ দিতে পারি নাই। অলঙ্কারগুলি চিত্রকল্প-সৃষ্টিতে কতখানি সহায়তা ও সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহাই আমার উপজীব্য বস্তু। বিদ্যাপতির পদের মূল ভাবগঠনে অলঙ্কারের সাহায্যের পরিমাণ সম্বন্ধেও সচেতন থাকিতে হইবে। বিদ্যাপতি অলঙ্কারলুব্ধ কবি ছিলেন বলিয়া এই ব্যাপারে কিছু সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অলঙ্কারের জন্যই অলঙ্কার—বিদ্যাপতি এই ফাঁদেও পড়িয়াছেন। কিন্তু এমন বহুক্ষেত্র মিলিবে যেখানে বিদ্যাপতির অলঙ্কার 'কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের' মতো অচ্ছেদ্য। কিংবা যখন তাহা প্রসাধনও, তখনও তাহা সেই ধরনের প্রসাধন, যাহা থাকিয়া রমণীকে রমণী করিয়া তোলে, অর্থাৎ অস্তিত্বের অংশ।

অলঙ্কারসমূহকে দুই অংশে ভাগ করিব—এক, দেহবর্ণনাত্মক, দুই, ভাবাত্মক।

প্রথমে দেহবর্ণনাত্মক অলঙ্কারগুলির বিচার করা যাক।

দেহের মধ্যে মুখ ও বুকেরই প্রাধান্য। মুখের মধ্যে নয়নের। তাছাড়া কেশের। তারপর অধরের। নায়িকার সমগ্র রূপ এবং গমনভঙ্গির অলঙ্কারও যথেষ্ট। দেহসজ্জার মধ্যে হারের মহিমা সর্বাধিক। বিভিন্ন দেহাঙ্গকে যদি বিভাব ধরা যায়—সেই বিভাবের অনুভাবও বিদ্যাপতির কাব্যে অলঙ্কারময়। মুখের কাজ হাসি ও বচন, চোখের কাজ অশ্রু ও কটাক্ষ, ঠোঁটের কাজ চুম্বন ও হাতের কাজ আলিঙ্গন—বিদ্যাপতি অলঙ্কার প্রয়োগকালে ইহাদের ভোলেন নাই। এবং আরো অনেক কিছু মনে রাখিয়াছেন আমরা ক্রমশঃ দেখিব।

দেহের মধ্যে মুখ, চোখ এবং বুকের প্রাধান্যের কথা বলিয়াছি। মুখের মুখ্যত্বের কারণ বোধগম্য। মুখের সৌন্দর্য সর্বদেশীয় কাব্যেই ভাষাময় এবং নয়নের ভাষা বোঝে না এমন অন্ধ-কবি প্রেমজগতে নাই। বুকের প্রাধান্য বোধহয় বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয়। আমি অতি-প্রাধান্যের কথাই বলিতেছি।

উন্মুক্ত বক্ষ বর্ণনায় প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনো কুণ্ঠা ছিল না। কুণ্ঠা না থাকার কারণ, হয়ত ভারতের প্রাচীন পরিচ্ছদপদ্ধতি। নারিগণের

ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণের ব্যাপারে অতি প্রাচীন ভারতবর্ষে বাধ্যবাধকতা ছিল মনে হয় না। পুরাতন ভাস্কর্যে তাহার প্রমাণ আছে। পরবর্তীকালে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণের পদ্ধতি আসিলেও পূর্বসংস্কার নারীর বক্ষদর্শনে কবি ও শিল্পিগণকে অসঙ্কুচিত রাখিয়াছিল। ভারতের ঐতিহ্যপ্রীতি উন্মুক্ত বক্ষের দর্শন-স্মৃতিকে কাব্যে দীর্ঘদিনের জন্য ধরিয়া রাখিয়াছিল। দেহবন্দনায় বক্ষ-প্রাধান্যের পরম প্রমাণ কালিদাসের (?) সরস্বতীস্তোত্র, যাহাতে দেবীদেহের একটি মাত্র অংশেরই উল্লেখযোগ্য উল্লেখ আছে—দেবীর অনেক গুণের একটি গুণ—তিনি 'কুচযুগশোভিত'।

আবার এই স্তন-বর্ণনার সাহায্যেই ভারতীয় কবিমনের ঊর্ধ্বগতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কবিরা পয়োধরের সঙ্গে শিবলিঙ্গের তুলনা বহুভাবে করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কাব্যেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তুলনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিতে কণ্ঠের মুক্তাহারকে গঙ্গাধারা ভাবা হইয়াছে—শিব-শিরে গঙ্গাভিষেক। বিচিত্র ভারতবর্ষের কবিমন। পয়োধরকে অন্যতম প্রধান কামকেন্দ্র স্বীকার করা হইতেছে, আবার তাহাকেই উপমিত করা হইতেছে দেবদেহের সঙ্গে। দেবতাকে আত্মসাৎ করার উপভোগ্য দৃষ্টান্ত।

কিন্তু মনের ঐ নিঃসঙ্কোচ রূপ কি একজাতীয় মানসিক নির্মলতার স্মারক নয়? দৃষ্টির ভাষান্তরে বস্তুর রূপান্তর কিভাবে হয়, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। বক্ষের যুগল স্বর্গ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়োন্মত্ত তরুণ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'দেবতা-বিহারভূমি কনক-অচল।' তরুণ রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে সত্যই কোনো স্বর্গীয় দেবতার কথা ভাবেন নাই। বিদ্যাপতি কখনো কখনো তেমন ভাবিয়াছেন।

স্পষ্ট আলোচনা শুরু করা যাক। অর্থাৎ অলঙ্কারের সঙ্কলন।

মুখমণ্ডল

(এই অংশে মুখ, নয়ন, জ্র, কটাক্ষ, অশ্রু, অধর, দশন, হাসি, চিবুক, নাক, কান, কপাল আলোচিত হইবে। ইহার সঙ্গে কেশ ও সিন্দুরও যোগ করিয়াছি)

মুখ

মৌখিক ব্যাপার কতখানি আন্তরিক হয়, কবিদের কাব্য বিনা কিভাবে বুঝিতাম? মুখের এত বর্ণনা সম্ভব? আইনস্টাইন তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্ব জনসাধারণের জন্য সরল করিয়া দিয়াছিলেন একটি দৃষ্টান্তে- কোনো সুন্দরী তরুণীর পাশে বসিলে ঘণ্টা মুহূর্ত মনে হয়, এবং গরম চুল্লীর পাশে এক মুহূর্ত মনে হয় অসহ্য একটি ঘণ্টা। আইনস্টাইন কি কবিতা লিখিতেন? নচেৎ বিদ্যাপতি কেন বলিলেন, সে মুখের দিকে চাহিয়া যুগ বহিয়া যায়?

বিদ্যাপতির বহু পদ অলঙ্কারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ তালিকাবিশেষ। তার মধ্যে বিশেষভাবে ২৫ ও ৮৯ পদ দুইটিতে বিদ্যাপতি ভারতীয় কাব্যভাণ্ডার হইতে অলঙ্কারের হিসাব উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা মাঝে মাঝে পদ দুইটিকে স্মরণ করিব। পদ দুইটিকে, বিশেষতঃ ৮৯ পদকে আমরা ভারতীয় অলঙ্কার-গ্রন্থের সূচী-পদ বলিতে পারি।

৮৯ পদে বলা হইয়াছে—'চন্দ্র, কমল ও স্বর্ণমুকুর' জিনিয়া রাধার মুখ। বাস্তবিক বিদ্যাপতি তাঁহার মুখ-বিষয়ক শতাধিক অলঙ্কারে তুলনাহীন বাধ্যতায় ঐ বক্তব্যকে মান্য করিয়াছেন। চন্দ্র, কমল ও স্বর্ণমুকুরের বাহিরে তিনি যান নাই। দু'একবার ভিন্ন-কিছু বলিতে চাহিয়াছেন, সে আক্ষরিকভাবে দু'একবারই বটে। কবি একবার বলিয়াছেন—সে মুখ মদনকে পরাজিত করে (৫৫৬); অন্যত্র এক জায়গায় রাধার মুখ সম্বন্ধে শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ এবং সেই দুগ্ধে অমৃতের সার মিশ্রিত, ইত্যাদি নিতান্ত সাধারণ স্তরের বর্ণনা করা হইয়াছে (৩৮৪)। কিন্তু তেমনও বেশী কোথাও

নয়। কনক-মুকুরকেও বেশী মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, কনক-মুকুরের ব্যবহার বোধহয় মাত্র একবার—"মুখ প্রচুর মুছিল, যেন কনক-মুকুর মাজিয়া রাখিল।" (৬২৬)

এমন কি কমলের মত মুখের প্রসিদ্ধ উপমানেও বিদ্যাপতির অতিরিক্ত আগ্রহ ছিল না। তবে কমলের উপমান নিতান্ত অল্প নহে, কবি কয়েকটি অলঙ্কারে সাফল্যলাভও করিয়াছেন। মুখ ছাড়া, মুখসৌরভের সঙ্গেও কমলিনী-সৌরভের তুলনা করিয়াছেন (২৭৯), কিংবা একই জাতীয়—"পদ্ম অমৃতলহরী নিঃসরণ করিতেছে" (২৩১) ; কিন্তু এ বিষয়ে সুন্দরতম রচনা আছে দুই স্থানে। ২২০ পদে কবি লজ্জানত রাধার একটি ছবি আঁকিয়াছেন—"করে অঞ্চল ধরিতে লজ্জাভরে নত হইল, তাহাতে কেমন হইল, না—যেন কমলের নালের সহিত কাম কমলকে নুইয়া ধরিল।" কেবল নত কমল নয়, নালের সহিত নতিকৃত কমল। কামবিবশা রাধার মুখ নত করা এবং কাম কর্তৃক কমলকে নোয়াইয়া ধরা—চমৎকার তুলনা। অলঙ্কারটি ব্যঞ্জনাধর্মী। রাধার মুখের উপমান কমল ছাড়াও এখানে কমলের মৃণালের কথা আছে। মৃণাল যেন রাধার দেহ (কেবল রাধার কণ্ঠ নয়)—মৃণালের সঙ্গে ইঙ্গিতে উপমিত রাধার নমনীয় তনুরেখাটি কবিকল্পনায় আবেগে কাঁপিয়াছে। এই ধরণের দ্বিতীয় অলঙ্কারটি আরো সুন্দর—চিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া নয়—ঐ অলঙ্কারে রাধামুখের সৌন্দর্যের সঙ্গে সৌন্দর্যবিহ্বল কৃষ্ণচিত্ত অদ্ভুতভাবে যুক্ত হইয়াছে বলিয়া। বিস্রস্তবাসা রমণীকে সহসাগত কান্তের সমক্ষে লজ্জা ও লীলার মধ্যে কবি দুলাইয়াছেন। রাধার উদ্ঘাটিত রূপ দেখিয়া কৃষ্ণের মন চঞ্চল ও লোচন বিকল, উভয়েই আয়ত্তের বাহিরে। এবং সুন্দরী রাধা "মুখ আড় করিয়া, মধুর হাসিয়া মাথা নীচু করিল, যেন উল্টনো কমলের কান্তি পূর্ণভাবে দেখা গেল না বলিয়া (দেখিতে দেখিতে) যুগ বহিয়া গেল" (৩৯)। একটি ব্যাকুল পিপাসা যুগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—এখানে।

কিন্তু কমল নয়—চন্দ্র। বিদ্যাপতি মুখের বর্ণনায় চন্দ্রে মাতিয়া ছিলেন। এক্ষেত্রে কবির প্রতিভার জয় ও পরাজয় উভয়ই সূচিত। মুখ বর্ণনার জন্য এত অল্পসংখ্যক উপমান? বিদ্যাপতি নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারিলেন না কেন! উদ্ভাবনী শক্তির কিরূপ শোচনীয় অভাব!

তবু কি বিপুল উদ্ভাবনী শক্তি! একথা সত্য, কবি চন্দ্র-ঘরে বন্দী হইয়াছিলেন। তবু বন্দীর বন্দনার সীমা নাই। এক চন্দ্র লক্ষ চন্দ্র হইয়া বিদ্যাপতির কাব্যে উদ্ভাসিত। বিদ্যাপতির একটি উক্তি শুধু মনে পড়ে—'লাখ উদয় করু চন্দা'।

কত রকম চাঁদ—বর্ণনার কত বাহার। শরতের চাঁদ, শীতের চাঁদ, প্রতিপদের চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, অমাবস্যার চাঁদ, দিবসের চাঁদ, গ্রহণের চাঁদ, ক্ষীণ চাঁদ, অর্ধেক চাঁদ, আনন্দিত চাঁদ, উপভুক্ত চাঁদ, কলঙ্কিত চাঁদ, পরাজিত চাঁদ, বিদ্বিষ্ট চাঁদ, আতঙ্কিত চাঁদ, স্পষ্ট চাঁদ এবং ব্যঞ্জনায় চাঁদ, অর্থাৎ চাঁদের হাট। কিছু চন্দ্রমা দর্শন করা যাক।

অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি ব্যঞ্জনাবাদী নন—স্পষ্টভাষায় কথা বলেন। তবু ইঙ্গিতে কথা বলিবার লোভ একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই। রাধাকে যেখানে পূর্ণিমারাত্রে অভিসারে দূতী উৎসাহিত করিতেছে, সেখানে তাহার বক্তব্য—"তুমি যেন অন্ধকারকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিও না, তোমার মুখ তিমিরারি (৩৩৫)।" অর্থাৎ চাঁদ না থাকিলেও চাঁদ আছে—আকাশে না থাকিলে মাটিতে আছে। এরই নাম 'অমাবস্যার চাঁদ'। কৃষ্ণ-পটে রাধা-চাঁদ। কবির বর্ণনায় মাঝে মাঝে বালকোচিত বর্ণনা-বাহার দেখা যায়—'চন্দ্র' কথাটি উচ্চারণ না করিয়া বলিয়াছেন—'জলনিধির সুতের ন্যায় তাহার বদনের শোভা' (২৩৫)। কবি সর্বত্র এইরূপ নহেন। আমরা কয়েকটি চিত্র লক্ষ্য করিতে পারি।

সকল ঋতুর চাঁদের মধ্যে শরতের চাঁদ সম্বন্ধে কবির আকর্ষণ গভীর, কারণ সত্যই ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের তুলনা নাই। রাধামুখের সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের তুলনা তাঁহার পদে সহজেই আসিয়া যায় (যথা ১৩৩)। শরতের চাঁদ বলিলেই চলে না, ষোলকলা চাঁদ দরকার—পূর্ণিমার চাঁদ। রাধার মুখ-সৃষ্টিতে পূর্ণিমার চাঁদের অবদান পূর্বেই দেখিয়াছি—পূর্ণিমার চাঁদ আনিয়া তাহাতে সোনা কষিয়া কিভাবে ঐ অতুলনীয় বস্তুটি সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা জানিয়াছি (২২৯)। কবি সেবাপরায়ণ পূর্ণিমার চাঁদকে দেখিয়া আত্মহারা ভাবে বলিয়াছেন—"পূর্ণিমার চন্দ্র যাহার মুখমণ্ডলের সেবা করে" (১৫৪)। নায়িকা যখন বিরহক্ষীণা তখন সে আর পূর্ণিমার চাঁদ থাকে না, তখন—"দিবা-ভাগের ক্ষীণচন্দ্র" (১৮৪), কিংবা—"দিবসে চাঁদ শোভা পায় না" (২০৬)।

তবে নায়িকা যে আসলে পূর্ণিমার চাঁদ একথা কবির পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। প্রথমসমাগমভীত নায়িকার রূপ বুঝাইতে বলিতে হয়—"দেখ পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে" (৬৫), অথবা বিরহক্ষীণার রূপ আঁকিতে—"পূর্ণিমার চন্দ্র-বিনিন্দিত রূপ এখন (প্রতিপদের) শশিরেখার ন্যায় হইয়াছে" (৭৩৫)।

বিরহে রাধার মুখ ক্ষীণ চন্দ্রের মত হয়, অন্য ভাবেও হয়। কবি অপর এক মনোরম অর্ধচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণ গোপনে রাধার ঘরের কপাট খুলিয়া, চুরি করিয়া ঘোমটা খুলিয়া অধর ও মুখ দেখিয়াছিলেন। রাধার ঈষন্মুক্ত মুখ দেখিয়া কবি বলিলেন—"যেন অর্ধেক চন্দ্রের উদয় হইল" (৮৪৫)।

চকোর চন্দ্রের সম্পর্ক ঐতিহাসিক—কাব্য পৃথিবীতে। বিদ্যাপতিও তাহা মানিয়াছেন। তেমন কিছু অংশ—

"হে রমণি! বদন ব্যক্ত করিও না, চতুর্দিক উজ্জ্বল হইবে; চন্দ্র মনে করিয়া সুধারসের লোভে চকোর উচ্ছিষ্ট করিয়া যাইবে। (৯৮)

"তোমার বদনকমল হাসিয়া লুকাইলে, তাহা দেখিয়া আমার মন অস্থির হইল। চন্দ্র উদিত হইয়াও অমৃত মোচন করে না, চকোর কি পান করিয়া বাঁচিবে?" (৩৮২)

"অলক্ষ্যে গোপ আসিল, চলিয়া গেল। বস্ত্র খসিয়া পড়িল সামলান গেল না। সে আমার অর্ধমুখ দেখিল, চকোর চন্দ্রকে উচ্ছিষ্ট করিয়া গেল।" (৫৫৮)

মুখের সঙ্গে চাঁদের অজস্র তুলনা পড়িতে পড়িতে আমার ইচ্ছা হয় সুদূর অতীতের সেই ক্ষণটিতে ফিরিয়া যাইতে, যখন প্রথম একজন পৃথিবীর কবি তাঁহার প্রিয়ার মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনাটি করিয়াছিলেন। সেই রোমাঞ্চ, অপূর্ব উপমার মাদকতা—হায়, আর ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কবিরা আর সরল পন্থায় 'মুখ চাঁদের মত', এই কথাটি বলিয়া খুসী হন না—উপমার তীব্রতা আনিতে হয় নানা পন্থায়। তার একটি হইল—কে বলে চাঁদ মুখের মত? চাঁদে আছে কলঙ্ক, নায়িকার মুখ অকলঙ্ক। বিদ্যাপতির একটি কাব্য-ছত্র লীলায়িত হইয়াছে সেই রাগ-রসে—"কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণী-হীন হিমধামা।"

চন্দ্র-লাঞ্ছনার কিছু পদাংশ উদ্ধৃত করা যাক—

"তুমি বদনের দ্বারা (চন্দ্রকে) জয় করিয়া ম্লান কর, লজ্জায় চন্দ্র নিকটে আসে না, পথ আলো করিতে ভয় পায়, তোমার গমন অন্ধকারেই হইবে।" (৯৩)

"চাঁদ তোমার রীতি ভাল নয়, এইজন্যই তো তোমাতে কলঙ্ক লাগিল।......জগতের নাগরীরা যখন মুখ-শোভায় তোমাকে জয় করিল, তখন তুমি হারিয়া আকাশে পলায়ন করিলে ; সেখানেও রাহু তোমাকে গ্রাস করিল।" (৩১৮)

"তোর মুখ তোরই তুল্য, চন্দ্র লবণবৃষ্টি করে না।......তোর মুখের সহিত কিছু ভেদ করাইবার জন্য (বিধাতা) চন্দ্রের কলঙ্ক দিল।" (৩৮৪)

"হে বিমল কমলমুখি! মান করিও না, তোমার মুখ চন্দ্রের তুল্য হইবে (ম্লান মুখ—কলঙ্কিত চন্দ্র)।" (৩৯৫)

"গোপী নিজের মুখ দেখিয়া হাসিল ; শরণার্থী মৃগকে লইয়া যেন চন্দ্র পলায়ন করিল (মৃগ মৃগাঙ্কের কলঙ্ক ; রাধার হাস্যযুক্ত মুখ কলঙ্কহীন চন্দ্রতুল্য, তাই চন্দ্র পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল)।" (৫৭২)

চাঁদেরও দিন আসে। সেদিন চাঁদ প্রতিশোধ নেয় ভাল ভাবে। রাধার বিরহাবস্থায় চন্দ্র-দাহ সম্বন্ধে কবি বলেন—"মুখ চন্দ্রকে জয় করিয়াছিল, সেইজন্য সে তাপিত করিতেছে" (১৮০)। তাই বলিয়া, সেই ভয়ে চাঁদ ও মুখকে সমান বলিতে হইবে? কবি দৃঢ়ভাবে কাব্যিক প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, আমরা সেটি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব—

"ও (চন্দ্র) রাহুভীত, এ (তোমার মুখ) নিঃশঙ্ক, চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক। এই দুইকে সমান বলা তেমনি অনুচিত, যেমন সোনার সহিত কাক অথবা সাপের তুলনা করা অন্যায়। প্রিয় আমার বড়ই অজ্ঞান, তাই তোমার মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা করে। কামিনী কুটিল কটাক্ষ বিকীর্ণ করে, চাঁদ তাহা পারে না, সেইজন্য কামিনী দয়িতকে কিঙ্কর করিয়া রাখে। উহাতে সুধা আছে, তোমার মুখে হাসি আছে, দুইয়ের সমতা এখানেই কিছু দেখা যায়। কবি কণ্ঠহার বিদ্যাপতি বলেন, তাহার (নায়িকার) কাম-উদ্দীপন শক্তি বেশীর ভাগ আছে।" (২৮)

কবিতা হিসাবে এটি কেমন? কিছুই নয়। কিন্তু কবির বক্তব্য বুঝিতে অসুবিধা হয় কি?

মুখ সম্বন্ধে প্রায় সব অলঙ্কার সঞ্চয় করিয়া দিলাম। মুখের সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক-মূলক পদগুলির মধ্যে 'চাঁদ-চুরি' জাতীয় পদগুলিই (২৯,৩৬,৩০৫) শ্রেষ্ঠ। সেগুলি অল্প পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগ অংশে উদ্ধৃত করিয়াছি। বর্তমান অংশে মুখ-বিষয়ক যে-সকল অলঙ্কার তুলিয়াছি, দেখা যাইবে, সেগুলি শুধু মাত্র মুখকে লইয়াই। মুখের সঙ্গে অন্য দেহাঙ্গকে যুক্ত করিয়াও অনেক অলঙ্কার আছে। সেগুলি পরে বিচার করিব। মুখমণ্ডলের অন্য

অংশের অলঙ্কার-বিচারেও একই পদ্ধতি লইব। প্রথমে কেবল সেই অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের নিজস্ব অলঙ্কার-সন্ধান, পরে অপর অঙ্গের সঙ্গে যুক্তভাবে অলঙ্কার-বিচার।

নয়ন

মুখমণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নয়ন। নয়নের বিষামৃতে কবিরা মূর্ছিত। তোমার নয়নে আমার মৃত্যু—কবিদের সাধারণ বক্তব্য। আবার নয়নে নিখিল। কবির নায়ক ও নায়িকা নয়ন দিয়া পান করে কিংবা নয়নের দ্বারা পীত হয়। এমন নয়ন-বিষয়ে কবি-বচন অসংখ্য হইবে সন্দেহ নাই। বিশাল নীল আকাশের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়নে পাওয়া যায়, দীঘির অতল কালো জল নয়নে চিরবিশ্রাম করে, নয়নের গবাক্ষ দিয়া জীবনরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়। নয়নের দর্পণে উদ্ভাসমান সৃষ্টির ইতিহাস, কিংবা সব ঘুচিয়া সব হারাইয়া অন্ধকারে একটি নয়ন-নীড়ের কবোঞ্চ আশ্রয়। বিদ্যাপতির মত কবি, যিনি অলঙ্কার-শাস্ত্রের উপমানকে বিশেষ মান্য করেন, তিনিও নয়নের কথা বলিতে গিয়া স্বাধীনতা লইয়াছেন। মুখের সম্বন্ধে মুখ্য উপমান দেখিয়াছি মাত্র দুইটি, চন্দ্র ও কমল। কবি ৮৯ পদের তালিকায় স্বর্ণ-মুকুরকেও যোগ করিয়াছেন, যদিও কাব্যে বিশেষ স্থান দেন নাই। নয়নের ক্ষেত্রে অপরপক্ষে আলঙ্কারিক উপমানও সংখ্যায় যথেষ্ট বেশী। ৮৯ পদে বলা হইয়াছে—"নয়ন : কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জন জিনিয়া।"

এই তথ্যটি প্রয়োজনীয়। অলঙ্কারশাস্ত্রও নয়নের বিষয়ে কল্পনা-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে। নয়নের বিশেষ প্রকৃতি ইহাতে সূচিত—সমস্ত অঙ্গের মধ্যে নয়নই সর্বাপেক্ষা গতিশীল। এবং সেইজন্যই নয়নের অবলম্বনে কবিদের বিশেষ কল্পনাস্ফূর্তি। আলঙ্কারিক উপমানগুলিকে যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াও বিদ্যাপতি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, বহু নিজস্ব ভাবনা ও তৃষ্ণা নয়নের রূপাঙ্কনে যোগ করিয়া তবে তাঁহার তৃপ্তি হইয়াছে।

প্রথমে প্রচলিত উপমানগুলির আলোচনা করা যাক। কমল-চকোর-সফরী-ভ্রমর-মৃগী-খঞ্জনের মধ্যে কমলেরই প্রাধান্য। তারপর চকোর, খঞ্জন, মৃগী ইত্যাদি। কমলের প্রাধান্যের কারণ, সব কয়টি উপমানের মধ্যে কমলই কবিদের পরিচিততম। সুতরাং নানা অবস্থায় কমলকে নিরীক্ষণের স্মৃতি কবিরা কাব্যবস্তু করিতে পারিয়াছেন। পুষ্পমধ্যে কমল অনন্য। নয়নের সর্ববিধ রূপ—চাঞ্চল্যের কিংবা স্থিরতার, শিহরণের কিংবা শান্তির, সুকুমারতার এবং গভীরতার—প্রকাশ করা সম্ভব কমলের ভাষায়। অন্য প্রচলিত উপমানের মধ্যে ভ্রমর অতি পরিচিত হইলেও ভ্রমরের উপমানে নয়নের বহিরঙ্গ রূপসাদৃশ্য যতখানি দৃষ্টিগোচর, অন্তর-রূপ সেরূপ নয়। ভ্রমর তাহার কৃষ্ণ-সুন্দর দেহটি বহন করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহার আত্মাকে সে বহন করে কিনা আমরা জানি না। সেইজন্য দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট উপমান, হরিণ-নয়ন। হরিণ-নয়নের অবোধ মহৎ সরলতা, প্রশান্ত নির্ভরতা, করুণ আয়ত গভীরতা—সে বস্তু অন্যত্র কোথাও নাই। কবিরা তাই হরিণ-নয়নকে উপমানরূপে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছেন। হরিণের চোখটুকু কেবল নায়িকা-চোখের উপমান হইবে কেন—গোটা হরিণটি নায়িকার নয়নের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হরিণের গতি ও ভীতি, মুক্তসঞ্চরণ ও সচকিত পলায়ন, পুনরায় বিশ্বাস এবং রক্তাক্ত বিনাশ—রাধার নয়নরূপের সঙ্গে হরিণের জীবনরূপের সাদৃশ্যকে কবির মনে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে।

চকোর খঞ্জন, সফরী, কবি-প্রসিদ্ধির বাঁধানো রাস্তায় প্রবেশ করিয়াছে—কবি তাহারই মধ্যে যতটুকু সৌন্দর্য সংগ্রহ করা যায়—তাহাতেই ব্যাপৃত।

কমল যেখানে নয়নের উপমান, সেখানে রীতি অনুযায়ী বিদ্যাপতি কখনো বলিয়াছেন, নয়ন কমলের তুল্য, আর কখনো বলিয়াছেন, তুল্য হইবার যোগ্যতা নয়নের নাই। যেমন—

"লোচন যেন অম্বুজ ধারণ করিয়াছে",—(২৩৬)

"নব অরবিন্দ যাহার নয়নের নির্মঞ্ছন মাত্র",—(১৫৪)

"কমল যে লোচনের তুল্য হয় নাই, জগতের কে না জানে? পঙ্কজ নিজের অপমানের লজ্জায় জলের ভিতর যাইয়া লুকাইল,"—(৩৬)

বিকশিত কমলের মতই অর্ধস্ফুট কমলও কবিদের আগ্রহের বস্তু। প্রিয়তম যখন ভুজপাশে বাঁধিয়া গ্রীবা ধরিবে, তখন আবেশগ্রস্ত নায়িকার

নয়ন "কমলবরের মুকুলের কান্তি" ধরিবে (১১১), এইরূপ সম্ভাবনার কথা কবি বলিয়াছেন। অর্ধোন্মুক্ত কমলের মত, মুদিত নয়ন-কমলের কথাও পাওয়া যায়। শৃঙ্গার-কালে লজ্জারুণা নায়িকা নতমুখে প্রদীপ দেখিতেছে, সেইকালে নায়কের আচরণকে কবি একটি স্নিগ্ধ সুন্দর ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন—"ভ্রমর মুদ্রিত কমলের মধুপান করিল।" (৪৮৬)। নতমুখ, প্রায় মুদ্রিত নয়ন এবং নয়ন-পাতে নায়কের স্নেহ-ধীর চুম্বন—অলঙ্কারটিতে রূপায়িত।

এই অংশে সবচেয়ে সুন্দর অলঙ্কার মেলে রক্তবর্ণ নয়নের সঙ্গে কমলের তুলনার ক্ষেত্রে। এক জায়গায় কবি কমলের সঙ্গে না করিয়া কমলপত্রের সঙ্গে নয়নের তুলনা করিয়াছেন। স্নান-সমাপিতা নায়িকার রক্তবর্ণ চক্ষুর বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—"জল লাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও অঞ্জনশূন্য হইয়াছে—যেন পদ্মপত্র সিন্দুরে মণ্ডিত হইয়াছে"—(৬২৭)। নয়ন-রক্তিমার নানা কারণ সম্ভব। একটি দেখিলাম, জলস্পর্শে। নয়ন রোষারুণও হয়। সুখোন্মত্ত কবি কিন্তু রাত্রিজাগরণকেই নয়নের রক্ত-বর্ণের কারণরূপে দেখিতে চান। এ বিষয়ে দুইটি অলঙ্কার—

"দেখিতেছি নয়ন যেন রক্তিম কমলদলের ন্যায়, (তাহাতে) মধুলোভে ভ্রমর বসিয়া আছে,(অর্থাৎ রাত্রিজাগরণে চোখ লাল ও চোখের নীচে কালো দাগ)। (২)

"(রাত্রি জাগরণজনিত) অরুণলোচন ঘুরাইতে লাগিল (রহস্য প্রকাশের ভয়ে চঞ্চল হইয়া)। যেন রক্তকমল হাওয়ায় দুলিতে লাগিল।" (৬৬)

প্রথম অলঙ্কারটিতে চাতুর্য ভিন্ন কিছু নাই। দ্বিতীয়টি যথার্থ শক্তিপূর্ণ। রক্ত-নয়ন দুলিতেছে—রক্তকমল হাওয়ায় দুলিতেছে—সৌন্দর্য দুলিয়াছে কবির বর্ণনায়।

নয়ন ও কমল-বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছু বিচারের প্রয়োজন আছে—

"দর্শনের জন্য লোচন দীর্ঘ (দূর পর্যন্ত) ধাবিত হইল; যেন দিনমণি কমলকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।" (২৪০)

এখানে কমলই বা কি, আর দিনমণিই বা কি? সহজ সমাধান হইল নায়িকার মুখ হইতেছে কমল এবং নয়ন দিনমণি। মুখের সঙ্গে কমলের তুলনা প্রসিদ্ধ এবং নয়নের সঙ্গে সূর্যের তুলনাও অপ্রচলিত নয়। সে ক্ষেত্রে

এই অলঙ্কারটি 'মুখ'-অংশে গ্রহণ করা উচিত ছিল। আমি কিন্তু এখানে নয়নকে 'কমল' এবং ব্যাকুল ধাবিত দৃষ্টিকে 'দিনমণি' ভাবিতে ইচ্ছুক। এরূপ ভাবিলে কবিকল্পনা বেশী মর্যাদা পায়। এরূপ ভাবিবার আরো কারণ, ৩৮২ পদে কবি বলিয়াছেন—"তোমার নয়ন অরুণ ও কমলের কান্তি চুরি করিয়াছে।" নয়নকে একই সঙ্গে অরুণ ও কমল ভাবা অসম্ভব ছিল না বিদ্যাপতির পক্ষে। সেইজন্য বলিতে পারি, বিদ্যাপতি আলোচ্য পদে 'আশ্রয়'-নয়নকে কমল ভাবিয়াছেন, এবং 'ধাবিত' নয়নকে ভাবিয়াছেন অরুণ (দিনমণি)।

অলঙ্কারটি চিত্ররূপে সুন্দর। তবে কল্পনায় সঙ্গতির অভাব আছে। কমলকে সূর্য পরিত্যাগ করে বেদনায়, অনিচ্ছায়, অতি ধীরে। কিন্তু রাধার নয়ন-সূর্য ফুটিয়াছে আনন্দে ও আগ্রহে। সুতরাং তুলনায় ভাবের অসঙ্গতি।

নয়নের সঙ্গে চকোরের সম্পর্কের কথা ভাবিতে গেলেই শ্রেষ্ঠ ছত্ররূপে চণ্ডীদাসের সৃষ্টিখণ্ডটুকু মনে পড়ে,—"নয়ান চকোর মোর পিতে করে উতরোল, নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।" বিদ্যাপতি যেখানে নয়ন-চকোরের কথা বলেন, সেখানে চণ্ডীদাসীয় তৃষ্ণার আকুলতা নাই—বাস্তব ক্ষুধারই প্রাধান্য। যেমন, অনিচ্ছুক রাধিকা উন্মত্ত কৃষ্ণকে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন, —"হরি, বল (প্রকাশ) করিও না, লোভ করিও না, অধিক আসক্তিতে সুখশোভা থাকে না। আপনার নয়ন-চকোর সরাইয়া লইয়া যাও, বেগে আসিয়া আমার মুখশশী পান করিবে" (৫৩)। বিরক্তির ক্ষেত্রে কেহ অপরের নয়নের সঙ্গে চকোরের তুলনা করে না,—নিজের মুখের সঙ্গে মুখশশীর তুলনা তো নয়ই। অলঙ্কার এখানে অনুচিত। ২০৭ পদেও নয়নের সঙ্গে লুব্ধ চকোরীর তুলনা,—"সুন্দরি! নয়নে দেখিতেই হরিকে চিনিস, যেমন লুব্ধ চকোরী চন্দ্রকিরণকে (চিনে)।" ..

বিরহকালে নয়ন-চকোরের লুব্ধতা না থাকিলেও নয়ন তখনো চকোর থাকিতে পারে। পুথিগত অলঙ্কার কাব্যের কিরূপ ক্ষতি করে তার একটি কৌতূহলকর দৃষ্টান্ত মেলে ২৪৬ পদে। পদটি সমগ্রতঃ উচ্চাঙ্গের। অন্য প্রসঙ্গে পদটি ব্যাখ্যা করিব। এখানে বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় অংশের বিচার করি। বিরহিণীর রূপের বর্ণনা—

"তোমার উজ্জ্বল নয়ন নবমেঘের মত বারিবর্ষণ করিতেছে, যেন চন্দ্রকরে কবলিত হইয়া চকোর অমৃত উদ্‌গিরণ করিতেছে।" (২৪৬)

এখানে নয়নের দুটি উপমান—নব মেঘ ও চকোর। অশ্রুর উপমান—বারি এবং অমৃত। নয়নের উজ্জ্বলতার একটি মাত্রই তুলনা—চন্দ্রকর-কবলিত। বলাবাহুল্য নবমেঘের বারিবর্ষণ এবং চকোরের অমৃত-উদ্‌গিরণ একই সঙ্গে চলিতে পারে না। সাধারণভাবে মনে হওয়া সম্ভব, যখন বিরহিণীর মূর্তি, তখন নব মেঘের বারিবর্ষণই সঙ্গত অলঙ্কার। কিন্তু সমগ্র পদে কবি যেভাবে বিরহিণীর চেহারা হইতে নয়ন-সুখ আদায় করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র পদের সঙ্গে একত্রে ধরিলে চকোরের অমৃত-উদ্‌গিরণই অধিকতর স্বাভাবিক অলঙ্কার। সে যাহাই হউক, আমাদের বক্তব্য—কবি আতিশয্যবশতঃ দুই ভিন্নধর্মী উপমানকে একত্র করিয়া ভাল করেন নাই।

চকোরের নিত্য তৃষ্ণা ও নিত্য ক্ষুধা বলিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণামথিত দুটি অলঙ্কারকে মূল্য দিতেছি—

"তোর চোখ ঘুমে ভরিয়া আছে, চকোর যেন অমিয়লুব্ধ হইয়াছে।" (৬৮)

"তোর নয়ন আলস্যে পূর্ণ, যেন চকোর চন্দ্র-সুধামত্ত।" (২৯৮)

নিদ্রার সঙ্গে, আলস্যের সঙ্গে লুব্ধতার সঙ্গে, মত্ততার সঙ্গে, চকোরের সম্পর্ক—এবং নয়নের সম্পর্ক—কবি একত্রে দেখাইয়াছেন।

নায়িকা-নয়নের উপমান হইবার পক্ষে হরিণ-নয়নের যোগ্যতা লইয়া যথেষ্ট উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি। কার্যতঃ বিদ্যাপতি কিন্তু সে সুযোগ পূর্ণভাবে লন নাই ;—"নয়ন হরিণের মত" (২৫),—"হরিণকে লোচনের লীলা ফিরাইয়া দিল" (কালিদাসীয় উপমা) (১৮১)—"নয়নের ভয়ে হরিণ বনবাসে লুকাইল"—(৬২০) ইত্যাদি সাধারণ স্তরের অলঙ্কার মেলে।

ভ্রমর সম্বন্ধেও স্বতন্ত্র অলঙ্কার অল্প পাইতেছি—"ভ্রমরতুল্য কালো চোখ দিয়া কটাক্ষ দিয়া গেল" (৪), কিংবা সুপরিচিত—"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার, মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার"—(৬১১)। রূপাবিষ্ট নয়ন এবং মধুমত্ত ভ্রমরের তুলনায় যত সৌন্দর্যই থাক, বহু পরিচয়ে সে সৌন্দর্য অনেকাংশে এখন মলিন।

খঞ্জনের উপমাও গতানুগতিক। যদিও "চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল" (২৭)—এই রকম রস-চঞ্চল একটি ছত্র পাইতেছি, তবু অন্য অলঙ্কারগুলি

বিশেষ খুসী করিবে না। জগদানন্দ দাস বর্ণিত "আঁখি-পাখী"র যে বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ পরিতৃপ্ত, সেই "আঁখি-পাখী"র কথা বিদ্যাপতি পূর্বেই বলিয়াছেন, যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে। বার্ধক্যে নিরুৎসুক বিরক্ত আঁখির বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—"আঁথি-পক্ষী দুইটি সবই বিকার জানিয়া শ্রান্ত-হইয়া শুইল" (৬০৮)। এই আঁখি-পাখী কোন্ পাখী? মনে হয় খঞ্জন, যেহেতু অলঙ্কারশাস্ত্রে নয়নের সঙ্গে খঞ্জনের তুলনাই প্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতি নয়নের কথা বলিতে গিয়া আরো কয়েকটি পদে খঞ্জনের কথা বলিয়াছেন, উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কেবল ৬২১ পদের প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করা উচিত—"কমলিনীর ন্যায় অনুপম সুন্দর-নয়না বক্র দৃষ্টিতে অল্প চাহিল। যেন পক্ষিশ্রেষ্ঠ (খঞ্জন) আমার (দৃষ্টিকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি লুকাইল।" (৬২১)

উদ্ধৃত অংশে নয়নের দুইটি অলঙ্কার—কমলিনী ও খঞ্জন। খঞ্জনের প্রাধান্য বলিয়া 'নয়ন-কমল' অংশে ইহার আলোচনা করি নাই। এখানে খঞ্জনের উপর বিপরীত আচরণ আরোপ করিয়া চাতুর্যসৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ পাখীকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, আলোচ্য ক্ষেত্রে খঞ্জন পাখীই কৃষ্ণের নয়নকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। কবি এই অলঙ্কারের দ্বারা বুঝাইতে চান, রাধা কটাক্ষপাত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়াছেন, ফিরাইবার সময় কটাক্ষের বন্ধনে কৃষ্ণ নয়নকে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়াছেন।

নয়নের অলঙ্কার-প্রসিদ্ধ উপমানাদি এই পর্যন্ত। অতঃপর অন্য শ্রেণীর উপমানের বিচার। এক জায়গায় কবি কুন্দ পুষ্পের সঙ্গে নয়নের তুলনা করিয়াছেন। শ্বেতবর্ণ কুন্দের আকৃতির সঙ্গে নিশ্চয় নয়, কুন্দের প্রকৃতি বা গুণের কথাই কবির মনে জাগিয়াছিল—"কুন্দ যেমন ভ্রমরকে মিলনের জন্য আহ্বান করে, তেমনি তুমি নয়নে অনঙ্গকে জাগাইবে" (৮২)। নয়নকে মুকুলের সঙ্গে ("মুকুলের ন্যায় অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু বিকশিত হয় না",—২৮১), তুলনা করা হইয়াছে। নয়নকে বলা হইয়াছে বন্দনাকার (২৯৬), চোর (৩৪) ও দূত (১৭, ৪১)। নয়নের সঙ্গে দূতের তুলনা সঙ্গত, প্রেমের ব্যাপারে নয়নের মত দূতীয়ালী কেহই করিতে পারে না। এবং নয়নের মত অত্যাচার করাও অন্যের সাধ্যে কুলায় না—"নাগরকে

নয়নের পাশে বাঁধিয়া আনিয়া" (২৪৮) নায়িকা কিরূপ না শাস্তি দেয়। এই নয়ন কখনো চঞ্চল হইয়া চরণের চপলতা গ্রহণ করে (১৭, ৬১৩), কখনো তরঙ্গে তরঙ্গে হিল্লোলিত হয়। নয়নের সেই 'তরঙ্গলীলা' কবির আদরের বস্তু—

"সহজ প্রসন মুখ দরশ হৃদয় সুখ
লোচন তরল তরঙ্গ।" (২৪)

*

"তাহার নয়নে ও চন্দ্রে তরঙ্গ।" (১০১)

*

"আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়ন-তরঙ্গ।" (৬২৪)

*

"লজ্জায় এত আকুল যে সম্মুখের দিকে তাকায় না, কিন্তু নয়ন-তরঙ্গের দ্বারা প্রাণ আকুল করিয়া দেয়।" (১৮)

নয়নে আছে জীবন এবং নয়নে আছে মরণ। জীবনের রূপ দেখিলাম, মরণের রূপ দেখা যাক—

"তিন বাণে মদন তিন জগৎ জয় করিয়া লইল; অবশিষ্ট দুই বাণ, যেন নিষ্ঠুর বিধাতা [illegible] বধ করিবার জন্য তোমার নয়নে সমর্পণ করিল।" (২২)

"বিষম মদনশর তুল্য তোমার দুই নয়ন আমার হৃদয় ভেদ করিল। (৪০)

"সে নয়ন-তরঙ্গে অনঙ্গ জাগাইয়া অবলা মারিবার উপায় জানে।" (৪০০)

এইখানেই নয়নের শক্তি, যখন সে মৃত্যু আনিতেছে, যখন সে "অনঙ্গের গুপ্ত রঙ্গ" (৯৮)। নয়নের দীনতার মূর্তিও আছে। নয়নের কাতরতা কবি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ফুটাইয়াছেন—

"নয়নের (কাতর) দৃষ্টি পাঠাইয়া আশা রক্ষা করিতেছে।" (৩৭৬)

"যে পথে বরনারী গমন করিল সেই পথে আমার দুই নয়ন ধাবিত হইল, যেমন আশালুব্ধ ভিক্ষুক কৃপণের পিছনে পিছনে যায়।" (৩৮)

অশ্রুবর্ষী নয়নে দীনতার চরম—

"শ্রাবণের মেঘের মত দু'নয়ন ঝরিতেছে।" (৬৩২)

নয়নের কথা শেষ করা ভাল। নয়নের বহুল বর্ণনা বিদ্যাপতির পদে দেখিলাম। যখন এই নয়ন সুকুমারী নায়িকার, তখন কমল বা চকোর,

যখন ভয়ঙ্করী মহাদেবীর, তখন "চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি" (১০)। আমরা মূলতঃ নায়িকা-নয়ন লইয়াই ব্যস্ত। আমাদের মনে পড়ে ২৭৯ পদটির কথা, যেখানে কবি অন্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় নয়নকে অতিরিক্ত সম্মান দান করিয়াছেন। রাধিকা আসিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহার শিরীষ-পুষ্পতনুর স্পর্শ, কমলিনী-মুখের ঘ্রাণ, কোকিলকণ্ঠের শ্রবণ এবং অপূর্ব অধরামৃতের আস্বাদন পাইয়াছেন—কিন্তু পান নাই নিজ নয়নের আনন্দ, কারণ নায়িকা আসিয়াছেন অন্ধকারে। সব পাইয়াও নায়ক তাই তৃষিত-হৃদয়। প্রেমে ও উপভোগে দর্শনের এমনই মূল্য। এমন নয়ন সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কয়েকটি অতি উচ্চাঙ্গের বর্ণনা আছে। সেগুলি উদ্ধৃত করিলেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হইবে –

"যাহার নয়ন যেখানেই লাগিল, সেখানেই শিথিল হইয়া গেল। তাহার রূপ সম্পূর্ণ নির্ণয় করে এমন কাহাকেও দেখি না।" (৩০২)

"সমস্ত অবয়ব নয়নে শোভা পায়।" (৪১৫)

"দূরে থাকিয়া মন অন্য প্রকার করি, পিপাসিত নয়ন নিষেধ মানে না।" (৪২৫)

"শশিবদনা কেমন করিয়া যেন আমার দৃষ্টিতে পড়িল, (আমার) দুইটি নয়ন নিমেষ নিরোধ করিয়া রহিল।" (৬১৮)

"নয়নে নয়নে আনন্দের ঢেউ তুলিব, প্রেম আনিব ; আমাকে গলার হার করিবে, হৃদয়মধ্যে রাখিবে।" (৮৭২)

ভ্রূ

নয়নের ঠিক উপরেই থাকে ভ্রূ। নয়নের কথা বলিতে গিয়া কবিদের মনে এমনভাবে নয়নবাণের কথা মনে পড়ে যে, ভ্রূর প্রসঙ্গে তাঁহারা ধনুর কল্পনা ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না। নয়ন-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, নয়নে গচ্ছিত আছে যে-সে বাণ নয়—মদনের বাণ—সুতরাং ভ্রূ-ও মদনের ধনু। ভ্রূর বাঁকানো রূপের সঙ্গে ধনুর তুলনা অতি স্বাভাবিক। কল্পনাটি আরো পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে কাজলকে পাইয়া—কাজল ঐ ভ্রূ-ধনুর গুণ।

একই কথা নানাভাবে বলার চেষ্টা করিয়াছেন কবি –

"(ভ্রূদ্বয়) যেন কামধনুর জ্যা-সদৃশ।" (২৭)

"কানাই, ভ্রূ-ভঙ্গিমা কি দেখিতেছ, মন্মথ নিজের ধনু আমাকে দান করিয়া গেল।"(৪২)

"মদনের ধনু যায় ভ্রূযুগলের,—" (১৫৪)

"ভ্রূভঙ্গ দেখিয়া অনঙ্গ (পরাভব মানিয়াছিল; এখন তাহাকে সেই) ধনু ফিরাইয়া দিল।" (১৮১)

"নিশ্চল ভ্রূ যেন বিশ্রাম লইতেছে, যুদ্ধ জয় করিয়া মদন ধনুস্ত্যাগ করিল।" (২৯৮)

"কানু তুমি ভ্রূর শোভা কি দেখিতেছ? অনঙ্গ নিজে আমাকে ধনু সমর্পণ করিয়াছে।" (৩৪০)

"ভ্রূর কথা আর বলিও না, মদন যেন কাজলের ধনু জুড়িয়াছে।" (৬১১)

৮৯ পদে ভ্রূর উপমান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—মদনের ধনু, মধুকর ও সর্প। মদনের ধনুই সর্বাধিক। ২১৪ পদে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনাও করা হইয়াছে। কিন্তু কবি সর্পকে এ ব্যাপারে আহ্বান করেন নাই। একবার ভ্রূর সঙ্গে কাশফুলের তুলনা দিয়াছেন। সে বার্ধক্যের ভ্রূ। সেই তুলনায় বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় আছে।

কটাক্ষ

নয়নের নানা কাজের মধ্যে মূল দুই কাজ—কটাক্ষ করা এবং অশ্রু-বিসর্জন করা। বিদ্যাপতির পদে এই দুইটি ব্যাপার বহুবিধ অলঙ্কারের সামগ্রী। প্রথমে কটাক্ষের আলোচনা করা যাক।

পূর্বে নয়নের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সকল দেহাঙ্গের মধ্যে নয়নই সর্বাপেক্ষা গতিময়। এই গতির আবেগ কটাক্ষে বিকীর্ণ। মণির দীপ্তির মতই নয়নের কটাক্ষ। কটাক্ষের অক্ষরে নয়নের ভাষা লিখিত। কটাক্ষ আছে বলিয়াই স্থির নয়নের এত সমাদর। নচেৎ চক্ষু মৎস্য-চক্ষু—নিষ্প্রাণ, শীতল। নয়নাগ্নির স্ফুলিঙ্গ বিদ্যাপতির পদে আনন্দরূপ লইয়াছে নানাভাবে।

চাহনি মাত্রেই কিন্তু কটাক্ষ নয়। চাহনির বর্ণনায় বিদ্যাপতি একবার বলিয়াছেন (যদিও সুন্দরভাবে নয়)—দুধের ন্যায় ধবল দৃষ্টি (১৩৭)। অন্যত্র সত্যই সুন্দর বর্ণনা—"তাহার দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়ে, সেখানে সেখানে যেন কমল ফুটিয়া ওঠে" (৬১৯)। দৃষ্টির এই দুই বর্ণনাকে কেহ কটাক্ষ বলিবেন না। কটাক্ষ বাসনার চাহনি, স্বেচ্ছায় অথবা সংস্কারে। বয়ঃসন্ধির পদে নায়িকার কটাক্ষ দেহবিকাশের সঙ্গে একই ছন্দে বাঁধা। যেমন—"শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল" (৬১৪), কিংবা "খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরঈ" (৬১০)।

কবি কটাক্ষের আরো বর্ণনা করিয়াছেন—"তাহার কটাক্ষে মদন রহিয়াছে" (২৫),—"মৃদুমন্দ হাসিয়া, ভ্রূভঙ্গ করিয়া কুটিল দৃষ্টিপাত করিলে তোমাকে অধিক উজ্জ্বল দেখায়" (১৮)। একটি "দুর্লভ নয়ন-কোণ" (দুলহ লোচনকোণা) ও কটাক্ষের বর্ণনায় কবির ভাষা কটাক্ষের মতই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—

"ঈষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।" (৩১)

কটাক্ষের রস-বিষাক্ত রূপ বিদ্যাপতির পদে যেখানে শ্রেষ্ঠ, তেমন দু'একটি অংশে উদ্ধৃত করা যাক,—

"লঘু লঘু সঞ্চর কুটিল কটাখ।
দুঅও নয়ন লহ এক হোক লাখ॥" (৩৭)

"কুটিল কটাক্ষ ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে, তাহাতে যেন দুই নয়ন এক লক্ষ বলিয়া মনে হয়।"

"কুটিল কটাক্ষে সম্বন্ধ (অনুরাগের) স্থাপিত হইল, আকাশ যেন ভ্রমরদলে পূর্ণ হইল। কাহার সুন্দরী কে জানে? কিন্তু আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল। লীলাকমল দ্বারা যেন ভ্রমরকে (কটাক্ষকে) নিবারণ করিয়া সুন্দরী চকিতে চাহিয়া চমকিয়া চলিল।" (২৩০)

"যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ।
ততহি মদন-শর লাখ॥" (৬১৯)

"গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পলটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বরনারী॥" (৬২২)

গজগামিনী একটু হাসিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া গেল, যেন ইন্দ্রজাল, যেন কুসুম-সায়ক, যেন কুহক বিস্তার করিয়া নারী চলিয়া গেল।

"দএ গেলি সুন্দরি! দএ গেলি রে।
দএ গেলি দুই দিঠে বেরা।
পুনু মন কর ততহি যাইঅ
দেখিঅ দোসরি বেরা॥" (৪)

দিয়ে গেল, দিয়ে গেল, সুন্দরী আমাকে দুই নয়ন (মেরে) দিয়ে গেল রে। আবার ইচ্ছা করে সেখানে যাই, আবার দেখি।

বাসনার ও সৌন্দর্যের রোমাঞ্চগুলিকে বিশ্লেষণ করিবার সাধ্য আমার নাই। প্রয়োজনও নাই।

অশ্রু

কালিদাস একটি মাত্র অশ্রুবিন্দুর বর্ণনা একবার করিয়াছেন। সাহিত্যে যখনি অশ্রুর কথা পড়ি, তখনি আমার সেই অশ্রুবিন্দুটিকে মনে পড়ে, তাহার কাছে সকলই তুচ্ছ হইয়া যায়।

দীর্ঘ গ্রীষ্মে তপস্বিনী উমা আপনাকে পুড়াইয়া অঙ্গার করিয়াছেন হীরক হইবার জন্য। বর্ষা আসিল। তখন – কালিদাসের একটি শ্লোক —

> স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ পয়োধরোৎসেধনিপাত-চূর্ণিতাঃ।
> বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ॥ (৫-২৪)

(বর্ষার প্রথম জলবিন্দু তাঁহার ঘন সন্নিবিষ্ট নয়ন-রোমাবলীতে আসিয়া পড়িত, সেখানে ক্ষণকাল থাকিয়া অধরে পড়িত, তারপর সেখান হইতে কঠোরস্তনী পার্বতীর পীন স্তনের উপরিভাগে যেমন পড়িত, অমনি কাঠিন্য নিবন্ধন সেগুলি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। বিগলিত বিচূর্ণিত বিন্দুর জলধারা উমার উদররেখায় স্খলিত হইয়া পড়িত এবং গড়াইতে গড়াইতে তাঁহার নাভিরন্ধ্রে প্রবেশ করিত।)

বর্ষার প্রথম জলবিন্দু পড়িল উমার নয়ন-পক্ষ্মে, সেখান হইতে অধরে, সেখান হইতে স্তনাগ্রে। সেখান হইতে চূর্ণ হইয়া নিম্নদেহের রেখায় রেখায়। একটি বারিবিন্দুর ছড়াইয়া পড়িবার সমস্ত রূপটি কালিদাস কল্পনায় দেখিয়াছেন। সাহিত্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ অশ্রুবিন্দু—আকাশের অশ্রু—যাহা তপস্বিনী উমার প্রতি সমবেদনায় ও ভালবাসায় ঝরিয়াছে।

এই অশ্রু বড় পবিত্র, করুণার বিগলিত রূপ। অশ্রু নির্মল করে, অশ্রু উজ্জ্বল করে। উদ্ধার করে। বেদনায় আনে পুণ্য, প্রেমে আনে পরমতা। হৃদয়, নয়ন-পথে অশ্রু হইয়া ঝরে। চণ্ডীদাস অশ্রুর পরম কবি।

বিদ্যাপতি আনন্দের মত বেদনাকেও কাব্যের আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যেও অশ্রু নির্গলিত হইবে। সেখানে অশ্রুর অনবদ্য অলঙ্কার আছে। কালিদাসের কথা মনে রাখিলেও সেগুলিকে সুন্দর বলা চলে। আবার এই অশ্রুর অলঙ্কারসৃষ্টিতে বিদ্যাপতির ব্যর্থতাও চোখে পড়ে। কয়েক স্থানে কবির রূপাসক্তি পদের ভাবরূপকে পীড়িত করিয়াছে।

অশ্রুর সঙ্গে বৃষ্টির তুলনা স্বতঃই আসে ; অশ্রুর পিছনে আছে নয়ন-উৎস ; বৃষ্টির পিছনে আছে ঘনশ্যাম মেঘ। বিদ্যাপতি পরিচিতকেই প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন ১০৯ পদে—"রাধা-নয়নরূপ মেঘ হইতে বর্ষণ হইল।" ইহারই সুন্দরতর রূপ—

মাধব সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত-নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন শাওন-মালা ॥ (৭৩৫)

বিরহে এই অশ্রুর অনর্গল প্রবাহ। নয়ন-নীরের দ্বারা নদী সৃষ্টি করিয়া রাধিকা তাহাতে পড়িয়া আছেন—কবি এইরূপ পুণ্যশুচি চিত্র কয়েকটি আঁকিয়াছেন। সেগুলি মিশ্র অলঙ্কার বলিয়া পরে আলোচনা করিব।—"নয়নের জল স্থির থাকিল না, রোদন করিয়া মৃত্তিকাকে পঙ্ক করিল" (৭৪৩)—এইরূপ বর্ণনাও পাই। বিরহের বেদনাশ্রু ভাব-মিলনে অভিষেক-বারি হইয়া ওঠে, কবি সে কথাও শ্রদ্ধাভরে জানাইয়াছেন (৭৫৫)।

সর্বত্রই অবশ্য অশ্রুর অলঙ্কার সুসঙ্গত নয়। বিরহাশ্রু, ত্যাগের, তপস্যার, আত্মদানের ভাবসঞ্চার করে। তখন বহিরঙ্গ অলঙ্কারের বিলয়। দেহ সত্তা-জ্যোতিতে আলোকিত। তখনো যদি কবি রাধিকাকে সুন্দরীরূপে দেখার লোভ দমন না করিতে পারেন, তবে তাহা দুর্ভাগ্যের বিষয়, কবি ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই। দু' একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক,—

"করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে……অহর্নিশ অশ্রুধারা ঝরিতেছে, যেন খঞ্জন মুক্তাহার গিলিয়া উদ্‌গিরণ করিতেছে।……বিরহে খিন্ন তনু শীর্ণ হইল……শোকে শোকে প্রাণ সংশয় পড়িল।" (১৭০)

"করতললগ্ন মুখের সৌন্দর্য নাই, যেন দিবাভাগের ক্ষীণ চন্দ্র। প্রকৃতি স্থির নাই ; নয়নে অশ্রু বহিতেছে, (যেন) কমল হইতে মধু ক্ষরিতেছে।" (১৮৪)

কবিরূপে বিদ্যাপতির কয়েকটি অসুবিধা ছিল। মুখ বলিলেই মুখচন্দ্র বা মুখপদ্ম তাঁহাকে বলিতে হয়। নয়ন বলিলেই খঞ্জন, ইত্যাদি। সুতরাং যখন 'শোকে শোকে প্রাণ সংশয়', তখনো নয়নের অহর্নিশ অশ্রুধারা সম্বন্ধে কোনো কাল্পনিক খঞ্জনের অধিকতর কাল্পনিক বমনক্রিয়া কল্পনা করিতে হইয়াছে। খঞ্জনকে মুক্তাহার উদ্‌গিরণ করিতে কেহ কোনোদিন দেখে নাই। সুখের সময় তেমন রসালো কল্পনার সুখ আছে, অন্যের প্রাণ-সংশয়ের কালে কবি নিজের সুখস্পৃহা কিছু কমাইলে পারিতেন।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে প্রথমটির মত মারাত্মক রূপকামন নাই। তবু যেখানে কবি প্রথমেই বলিলেন—'করতললগ্ন মুখের সৌন্দর্য নাই'—সেখানে নয়নের অশ্রুকে কমলের মধুক্ষরণ না বলিলেও পারিতেন। কবির উদ্দেশ্য বেদনারূপ সৃষ্টি করা, 'মধু' সেখানে আনন্দচেতনার সঞ্চার করিয়া ভাবহানি করিতেছে।

অপরপক্ষে পূর্ব ২৪৬ পদের আলোচনায় দেখাইয়াছি, অশ্রুর বর্ণনাতে নব মেঘের বারিবর্ষণ অপেক্ষা চকোরের অমৃত-উদ্গিরণ সমগ্র পদের পরিপ্রেক্ষিতে কিরূপ অধিক উপযোগী। সেখানে আছে নব-বিরহিণীর চিত্র—মেয়েটি সেখানে কাঁদিয়া সুন্দর। আরো একটি পদের উদাহরণ লওয়া যায়। পদটিতে মিশ্র অলঙ্কার হইলেও এখনি আলোচনা সারিয়া লইতেছি—

"ধনী বসিয়া রহিল, কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, আমাকে দেখিয়া বাহিরে আসিল না; পরম বিরোধী হইয়া না না করিয়া আমার হাত দূর করিয়া দিল। মাধব বল. কেন রমণীকে রাগাইলে?...তাহার গৌরবর্ণ কলেবর (ও) মুখচন্দ্র রোষে অরুণশোভা হইল; কাম যেন রূপ দেখিবার ছলে কনকলতায় (দেহে) নব রক্তোৎপল দিল। নয়নের অশ্রুধারা ছিন্ন হারের ন্যায় কুচপর্বতের উপর আছাড়িয়া পড়িল। কনক-কলস করিয়া মদন অমৃত পূর্ণ করিল, অধিক কি উথলিয়া পড়িল?" (৪১১)

অভিমানিনী নায়িকার চিত্র। সুতরাং বেদনার গভীরতা নাই। এখানে রোষাশ্রু। কবি এমন নায়িকার নিকট হইতে দর্শনসুখ আদায় করিতে পারেন। গৌর কলেবর, আরক্ত মুখ—যেন কামকর্তৃক কনকলতায় রক্তোৎপল অর্পণ। নয়ন হইতে অভিমানের অশ্রু ঝরিতেছে—রূপবতীর সেই অশ্রুবিন্দুগুলির সহিত ছিন্নহারের কল্পনা কিরূপ না সুসঙ্গত। নায়িকার দেহ রোষকঠিন। সুতরাং অশ্রুর ছিন্নহার কুচ-পর্বতের উপর আছাড়িয়া পড়িতেছে। বিরহের ক্ষেত্রে এই কঠিনতার চেতনা আসিত না, তখন অশ্রু 'আছাড়িয়া' পড়িত না, 'গলিয়া' পড়িত। কবি সমগ্র চিত্রটি লুব্ধভাবে দেখিতেছেন। দেখিতেছেন একটি গৌরদেহ, আরক্ত মুখ, কঠিন উন্নত বক্ষ, তাহার উপর ঝরিয়া পড়া আত্মদংশনের নিরুপায় অশ্রু—দেখিতে দেখিতে সমস্ত চিত্রটি এক অপূর্ব রসের কোমলতায় ভরিয়া গেল, কবির মনে হইল বুকের অমৃতপাত্র হইতে অমৃত উথলিয়া উঠিতেছে। বলাবাহুল্য, কবি দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোলপাড় করা হৃদয়কেও দেখিয়াছিলেন একই কালে।

অধরোষ্ঠ

অধরের তিন প্রচলিত উপমান—বিম্ব, প্রবাল ও বান্ধুলী। বিম্বের সঙ্গে তুলনা কয়েকপদে, (যথা ২৫, ৮৯, ২০৬, ২১৪ ইত্যাদি)—গতানুগতিক বলিয়া উদ্ধৃতিযোগ্য নয়। বান্ধুলী-উপামান সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথা বলা যায়। ঈষৎ কুশলী অংশগুলির রূপ—"মাধুরী (বান্ধুলী) ফুলের ন্যায় অধরকে মাধুরী ফুলেরই মত দেখিতেছি—তাহাতে মধুও ধরা আছে (অনুপ ভুক্ত নায়িকার সম্বন্ধে বর্ণনা)" (৮০),—"অধর বান্ধুলী ফুল, প্রিয় মধুকরতুল্য, মধু বিনা কতক্ষণ বাঁচিবে?" (১২১);—"অধরের তুলনায় বান্ধুলী ফুলের স্তবক ও নির্মাল্য (পূজার পর যে ফুল পরিত্যক্ত হইয়াছে) (১৫৪);—"বান্ধুলীকে অধররুচি ফিরাইয়া দিল" (১৮১)। প্রবালের সঙ্গে অধরের তুলনার ক্ষেত্রেও কবি নূতনত্ব সৃষ্টিতে অসমর্থ। এ ব্যাপারে বিদ্যাপতির অমৌলিকতার নমুনা দিতে পারি। তিনটি পদে প্রায় এক ভাষায় একই কথা বলিয়াছেন—

"নীরস ধূসর করু অধর-পঁবার।
কোন কুবুধি লুটু মদন-ভঁড়ার॥" (৬৮)

(অধর-প্রবালকে নীরস ধূসর করিয়াছে। কোন্ কুবুদ্ধি মদন-ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছে?)

*

"অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঁওয়র।
কোন লুটল তুআ অমিয়া ভাণ্ডার॥" (৬৯)

(তোমার সুরঞ্জিত অধর যেন নীরস প্রবাল। কে তোমার অমিয়-ভাণ্ডার লুঠ করিল?")

*

"নীরসি ধূসর ভেল অধর পঁবার।
কওোনে লুটল সখি মদন ভড়ার॥" (৪৮১)

(অধর-প্রবাল নীরস ধূসর হইল। সখি! কে মদন ভাণ্ডার লুঠ করিল?

রক্তপ্রবালের লালিমা সম্বন্ধে কবির এমন লোভ যে তাহাকে লুণ্ঠন করিয়া নীরক্ত, নীরস না করা পর্যন্ত শান্তি নাই—উদ্ধৃত অংশগুলিতে তাহাই দেখিলাম। ২৭৬ পদে প্রবালের কথা না থাকিলেও অধরকে রসশূন্য ধূসর করার কথা আছে। অধরের অলংকারে শেষপর্যন্ত এই কামনার তৃষ্ণাই প্রবল। অধরের

স্বতন্ত্র সৌন্দর্য-দর্শন অপেক্ষা অধরপানের তীব্র কামনার কথা নানা অলঙ্কারে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তেমন কয়েকটি অংশ তুলিতেছি—

"অধর-সুধা পান করিয়া অমৃতের স্বাদ পাইলাম।" (২৭৯)

"চিবুক ধরিয়া অধর-মধু পান করিল, কে জানে আমি প্রাণে বাঁচিব কি না?" (২৮২)

"অধর-মধুপানের দ্বারা মধুপর্কের রীতি সম্পন্ন হইল।" (২৯৬)

"তোমার অধরে যেন অমিয় বাস স্থাপন করিল। ভাল লোকে বিশ্বাস করিয়া উহার আরতি করিল। উহা পান করিলে হয়ত অমর হওয়া যায়; কিন্তু যে জীবনে মানই খণ্ডিত হইল, তাহাতে কি লাভ?" (৪০৫)

"মালতীর রসে ভ্রমর যেরূপ বিলাস করে, সেইরূপ (আমার) অধর পান করিল।" (৪৭৭)

"অধরে সুধারস দেখিয়া লুব্ধ হয়।" (৪৮৮)

অংশগুলিতে তীব্র কামনা। অলঙ্কারও তৃষ্ণা-ধর্মী। "সুন্দর প্রবালতুল্য অধরে সিন্দুর"-ও দশনচিহ্নের কথা আছে ৪৯১ পদে। দশন-চিহ্নের অলঙ্কারে লালসার রূপ—"অধরে দশন-চিহ্ন দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপে, মনে হয় চন্দ্রমণ্ডলকে যেন রাহু আক্রমণ করিয়াছে।" বলাবাহুল্য অধরের সঙ্গে চন্দ্রমণ্ডলের এবং দশন-চিহ্নের সঙ্গে রাহুর আক্রমণের তুলনায় উভয়ের রূপ-সাদৃশ্য আবিষ্কারের ইচ্ছা নাই, এখান কবি বাসনারূপকেই অলঙ্কারে ফুটাইতে চাহিয়াছেন।

এই বাসনারূপের রসাশ্রিত প্রকাশ আছে একটি অলঙ্কারে—"বিরহে শুষ্ক হইলে অধর দিলে ভাল হয়; রৌদ্রে ছায়া সুন্দর" (২২৩)। প্রেম-বিলাসের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কথাগুলি বলা হইয়াছে। গরবিণী ইচ্ছামত নায়ককে গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান করে। কখনো দূরে ঠেলিয়া দিয়া বিরহে পোড়ায়, আবার দগ্ধ মূর্তি দেখিয়া অধরের কৃপাচ্ছায়া দান করে। বিরহের শুষ্ক অধর এবং মিলনের ছায়াস্নিগ্ধ অধর— কবির কল্পনা এখানে ভাবরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে রীতিমত।

এবং এই একটি স্থানেই মাত্র অধরপান বা চুম্বনের কাব্যিক প্রকাশ। আমরা জানি অনেক পরবর্তী রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও ভাষা বিদ্যাপতির আয়ত্তে ছিল না। অধরের কানে অধরের ভাষা, দুটি নিরুদ্দেশ ভালবাসার অধরসঙ্গমে তীর্থমিলন, কিংবা দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন— এই কল্পনা রবীন্দ্রনাথেরই। বিদ্যাপতির চুম্বন চুম্বন নয় অধরপান —তৃষ্ণার

'স্থধারূপ'। তবু ঐ একটি ক্ষেত্রে—রৌদ্রে সুন্দর ছায়ার সঙ্গে চুম্বনের তুলনাটিতে—রোমান্টিক কল্পনা উচ্ছল হইয়াছে।

চুম্বনের আরো দু' একটি বর্ণনা পাই। পূর্বে 'নয়ন'-অংশে নতমুখ নায়িকার নয়ন-চুম্বনের সঙ্গে ভ্রমর কর্তৃক মুদিত কমলের মধুপানের বর্ণনা পাইয়াছি (৪৮৬)। বিপরীত মিলনের সময় নায়িকা কর্তৃক নায়কের মুখচুম্বন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যেন অধোমুখ হইয়া চাঁদ সরোজ পান করিতেছে" (৪৯৭)। নায়ক কর্তৃক নায়িকা-চুম্বন বিষয়েও প্রায় একই কথা—"নাগর সুমুখীকে নিরীক্ষণ করিয়া মুখচুম্বন করিল, যেন চন্দ্রবিম্ব কমলের মধুপান করিল" (৮৫৩)। বিরাগের ক্ষেত্রে চুম্বনের রূপ—"নায়ক যখন চুম্বন করিতে চায়, তখন সে মুখ নীচু করে, মনে হয় যেন রোগী ঔষধ পান করিতেছে" (৬৭৭)।

প্রেম দেহময়—এই কথাটি বিদ্যাপতি মাঝে মাঝে ভুলিলে পারিতেন। অধর বা চুম্বনের বর্ণনা-সম্বন্ধে সেই কথা মনে হয়। প্রেম-শৃঙ্গারের এক মুখ্য রূপ চুম্বন। চুম্বনে কামনার আতিশয্য আছে। আবার এই চুম্বনই প্রেমের মনোরূপ উদ্ঘাটিত করে। চুম্বনে দেহপটে কামনার স্নিগ্ধতম এবং সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস রচিত হয়। বিদ্যাপতি অধর কিংবা অধরপানের বর্ণনায় সুকুমারতা সৃষ্টিতে অসমর্থ ছিলেন। কালিদাসের পন্থায় অধরকে কিশলয়ের সঙ্গে একবার তুলনা করিলেও, নয়। (২৬৭ পদে অশ্রুধোয়া অধরের সঙ্গে শিশিরধোয়া কিশলয়ের তুলনা আছে।)

দন্ত ও হাসি

বাস্তবে দন্তবিকাশের বিরুদ্ধে আমাদের যত অভিযোগই থাক, সাহিত্যে তাহা পরম সমাদৃত। তখন বলা হয়, 'দন্তরুচিকৌমুদী'। সে কৌমুদী মানের অন্ধকার শুধু নয়, মনের অন্ধকারও দূর করে। দাঁতের জ্যোৎস্নায় ঝিকিমিকি একটি সুন্দর হাসির জন্য কবিরা পৃথিবী বিলাইতে পারেন।

দাঁতের কাজ দংশন ও চর্বণ। মানব-জীবনে প্রয়োজনীয় নিত্য কর্তব্য সেগুলি। সাহিত্যে ঐ স্থূল দংশন ও চর্বণ রূপান্তরিত হয়। তখন চর্বণের

নাম রস-চর্বণা, দংশন হয় প্রেম-দংশন। দশন-চিহ্নে প্রণয়-প্রবলতার স্বাক্ষর থাকে।

বিদ্যাপতি, তাঁহার সঙ্গে সকল কবিই, নায়ক-নায়িকাকে সুন্দর দন্তের অধিকারী করিয়াছেন। তাহাদের দন্তজ্যোতিতে কবিকল্পনা জ্যোতির্ময়। মহামায়ার বর্ণনাকালে "দশনাগ্রভাগের বঙ্কিম বিকাশ চন্দ্রকলার ন্যায়" (১০) বলা স্বাভাবিক। নায়িকার দশন সম্বন্ধেও কবির একই বক্তব্য—"হাস্যবিলাসিনীর দন্তপংক্তি দেখিয়া মনে হয় যেন তরলিত জ্যোতি" (৪)। এখানে দাঁতের তরল জ্যোতি হাসির তরঙ্গে খেলিয়াছে। ৭০০ পদেও এই দন্ত-জ্যোতির কথা আছে—"কেন দশন-বিকাশের কিরণ হইল ?"

দন্তের সাধারণ উপমান বিষয়ে ৮৯ পদ বলিতেছে—নায়িকার দন্ত মুক্তা, কুন্দ ও করকবীজ (দাড়িম্ববীজ) জিনিয়া। তিন বস্তুরই প্রয়োগ পাওয়া যায়। দাড়িম্ব-বীজ (২৫, ১৮১), কুন্দ (৮৯, ২৩১), মুক্তা (৮৯, ৬২৪), প্রভৃতির উল্লেখ মিলিতেছে। ইহা ছাড়া শিখরবীজের (?) কথাও আছে একটি পদে (২৩৫)। এই সকল উল্লেখ প্রথাগত। ইহাদের মধ্যে মুক্তাবিষয়ক একটি ছত্রকে স্মরণ করিতে পারি—

> দশন-মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ল
> মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা। (৬২৪)

হাসি দন্তের গাত্রবর্তী। একেবারে অঙ্গাঙ্গি। হাসি সমস্ত মুখের, তবু, হাসিলে দন্তেরই আবরণমোচন। সুতরাং কবিরা দাঁতকে ও হাসিকে প্রায় একত্র দেখিয়াছেন। অধর ও চুম্বনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অথচ রবীন্দ্রনাথ তাহা করিয়াছেন। দাঁত হইতে হাসিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইলেও বিদ্যাপতি তাহাতে অনিচ্ছুক।

রবীন্দ্রনাথের 'হাসির' কথা মনে পড়িতেছে। তরুণ কবির মনে বারবার একটি হাসির স্মৃতি জাগিয়াছে, 'দুটি রাঙা অধরের কিশলয়পাতে' যে-হাসিকে 'কুঁড়ির মতন' কবির মাধবী-নায়িকা আপন ছায়াতে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সে হাসি পুনর্বার চয়ন করিবার জন্য কবি ব্যাকুল। যখন বৃদ্ধ জগতের 'সবারে বঞ্চিয়া' কবি সত্যই আবার সেই হাসি চয়ন করিতে পারিবেন, তখন—

"তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন।"
(হাসি—কড়ি ও কোমল)

রবীন্দ্রনাথ বলেন, ঠোঁটের হাসিকে ঠোঁট দিয়া তুলিয়া লইতে হয়—উভয়ের মাঝে থাকে 'শরমের হাস'।

বিদ্যাপতির কাছে হাসি ছিল আলোময়—মধুময়। তিনি যখনি হাসির কথা আনিয়াছেন, সেই সঙ্গে আনিয়াছেন চাঁদকে—জ্যোৎস্নাকে—সুধাকে। এরূপ করিয়াছেন হাসির রূপ-রসের বর্ণনার ক্ষেত্রে। হাসির আবার একটা ধ্বনিরূপও আছে। সেই হাস্যধ্বনির সঙ্গে কবি পৃথিবীর মধুরতম ধ্বনির তুলনা করিয়াছেন—"তাহার বচনবিলাসের সময় মধুর হাসি দেখিয়া মনে হয় যে, ত্রিভুবনে মত্ত কোকিল, বেণু ও বীণাধ্বনি একসঙ্গে সাজাইয়া আনা হইয়াছে" (৩০)। হাসির নানারূপের মধ্যে "মন্দ হাসিও" আছে। একবার রাধার 'মন্দ-হাসি'কে সাক্ষী করা হইয়াছে (৮৭)। 'অনিবার্য হাসিকেও' কবি দেখিয়াছেন—"হৃদয়ের উল্লাস গোপন করিতে পারি না, মুখ মুদিত করিলেও হাসি ব্যক্ত হয়।" (৪২৫)।

তবু—"চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো।" ঘুরাইয়া বলা চলে—'হাসির চাঁদ বাঁধ ভেঙেছে।' দেবী দুর্গার বর্ণনাতে কবি বলিয়াছেন,—"চন্দ্রিকাচয়চারুহাসিনী" (১০)। রাধিকা অথবা নায়িকার বর্ণনাতেও তাই—চাঁদ—জ্যোৎস্না—সুধা—

"আমাকে দেখিয়া অপরের অলক্ষ্যে একটু মুচকিয়া হাসিল; তাহাতে মনে হইল যেন রজনী চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইল" (২৩০)।

*

"সুধার সমান হাস্য দেয়" (২৬৮)।

*

"তাহার মুখে দেখি হাসির সুধারস" (৪২৫)

*

"যে মন্দিরে রাধা ছিল, মাধব আসিয়া তাহার কপাট খুলিল। অলস কোপে অধিক হাসিয়া তাহার দিকে তাকাইল, যেন আধখানা চাঁদের উদয় হইল" (৪৭২)।

(এখানে রাধার কোপহাস্যময় মুখ চাঁদের তুলনাস্থল হইতে পারে, কিংবা কোপের দ্বারা খণ্ডিত হাসিকেই অর্ধচন্দ্র বলা হইতে পারে।)

*

"যেখানে তাহার লঘু হাস্যের সঞ্চার হয়, সেখানে যেন অমৃত ঢালিয়া পড়ে।" (৬১৯)

*

"মুখে মধুর বচন সিঞ্চন করে ; ঈষৎ হাসিয়া যেন অমৃতের তরঙ্গ প্রসারিত করে।" (৮৫৮)

হাসিকে জয়দেব তিমিরহর বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি অনুরূপভাবে হাসিকে মুখচন্দ্রের কলঙ্কহর বলিয়াছেন। যথা—

"অল্প মুচকিয়া হাসিল, যেন হিমকর (চন্দ্র) মৃগ (কলঙ্ক) পরিত্যাগ করিয়া কুমুদিনীকে কোলে লইল।" (৬৯৩)

নাক : কান : কপাল : চিবুক

নাক সম্বন্ধে ৮৯ পদ বলে—"নাসা,—তিলফুল, গরুড় ও চঞ্চু জিনিয়া।" চঞ্চু সম্ভবতঃ শুক পাখীর। ২৬, ২১৪ ও ৬৫০ পদগুলিতে নায়িকা-নাসা কখনো শুকপাখীকে তুলনায় গৌরবে সম্মানিত করিয়া, কখনো পরাজয়ের লজ্জায় ঠেলিয়া দিয়া বর্তমান আছে।

বৈষ্ণবপদে কানকে মোটেই সম্মান দেওয়া হয় নাই। কান একটি যন্ত্র মাত্র, যাহার দ্বারা শোনা হয়। চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভাবাশ্রিত ছত্রটিতে কানের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইয়া দিয়াছেন—'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।' বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে, আমাদের পরিচিত ৮৯ পদ একবার অনুগ্রহভরে জানাইয়াছে—"শ্রবণ গৃধিনী জিনিয়া।"

বিদ্যাপতির পদে কপালের উল্লেখ প্রায় নাই। শিবের কপালে চাঁদের কৌটার কথা একবার বলা হইয়াছে (১২), এবং ৮৯ পদ কপালের কাছে অর্ধচন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছে।

চিবুকও তথৈবচ। একবার মাত্র পাইতেছি। তাও পয়োধরের সঙ্গে সম্পর্কে। এই মিশ্র অলঙ্কারকে এখনি আলোচনা করিতাম না, কিন্তু চিবুক বিষয়ে ইহাই সবে ধন বলিয়া উল্লেখ প্রয়োজন—

"স্থূল পয়োধর চিবুক চুম্বন করিতেছে, কি উপমা দিবে? বদনচন্দ্র যে ভয়ে লুকাইল, চকোর তাহা ফিরিয়া দেখিতেছে" (৩০২)।

হায়! চিবুক শেষপর্যন্ত চিবুক রহিল না, বদনে হারাইয়া গেল। বদনচন্দ্র লুকাইতে চাহিতেছে কুচগিরির সন্ধিপথে, হয়ত কেশ-রাহুর ভয়ে।

নয়ন-চকোর তখন তাহার সন্ত্রস্ত ও পলায়িত মুখচন্দ্ররূপ প্রিয়তমের সন্ধানে ব্যস্ত। এই খোঁজাখুঁজি ছোটাছুটির মধ্যে কবি চিবুকের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

সিন্দূর

ভারতকন্যার নির্মল ললাটের সিন্দূরবিন্দুকে মধুসূদন সাহিত্যে অমর করিয়াছেন দুইটি ছত্রে—

> সিন্দূরবিন্দু শোভিল ললাটে,
> গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা।

বিদ্যাপতির পদে ললাটের সিন্দূরবিন্দু এবং কেশের সিন্দূররেখার পরিচয় পাই। এই রক্তবিন্দুটির যথোচিত মহিমারক্ষা বিদ্যাপতি করিতে পারেন নাই। না পারিবার কারণও আছে। সিন্দূরবিন্দু অথবা সিন্দূররেখা বিদ্যাপতির নিকট দৃশ্য-সৌন্দর্যের উপাদান মাত্র ছিল।' ঐগুলি প্রসাধন-চিহ্ন। কপালে সিঁদুর পরিলে কিংবা চুলে সিঁদুর দিলে ভাল দেখায়—বিদ্যাপতির দৃষ্টি ছিল এই বহিরঙ্গ সৌন্দর্যে। অথচ ভারতীয় সংস্কারে সিন্দূরবিন্দু ও সিন্দূররেখা একটি ভাবের সহিত যুক্ত—তাহা পাতিব্রত্যের জ্যোতির্লেখা। মধুসূদন জননী সীতার ললাটে সিন্দূরবিন্দু দিয়া ললাটাকাশে একটি অরুন্ধতী নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধার ছিল প্রেমের মহিমা—পাতিব্রত্যের নয়। তাই সিন্দূরবিন্দু অথবা সিন্দূররেখার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি আমাদের জাতীয় সংস্কারের সমর্থন গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বিদ্যাপতির কাব্যে আবার সিন্দূরবিন্দু অতিশয়োক্তিদুষ্ট। বেশ কয়েকবার কবি সিন্দূরবিন্দুর সঙ্গে সূর্যের তুলনা করিয়াছেন। এই গতানুগতিক অলঙ্কারে সূর্যের মহিমা কমিয়াছে, সিন্দূরের মহিমা বাড়ে নাই। কবি শশী (মুখ) ও সূর্যকে (সিন্দূরবিন্দু) পাশাপাশি উদিত করার উত্তেজনায় এতই অধীর ছিলেন যে, নিজ কল্পনার অনৌচিত্য তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

'২৩, ২৫, ৩০, ৬৫ ইত্যাদি পদে সিন্দূরবিন্দু ও সিন্দূররেখার কথা আছে। সে সবগুলিই প্রায় কেশের সহিত একত্রে বলিয়া মিশ্র অলঙ্কারের আলোচনায় সেগুলির উল্লেখ করিব।

কেশ : বেণী

কেশবতী কন্যার জন্য ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। গ্রীষ্মদেশের উদার মহান আকাশের তলায় কৃষ্ণনয়নী কৃষ্ণকেশী নারীর আছে অনিবার্য মোহিনী শক্তি। অনৈকা ভারতীয় কৃষ্ণার কেশসূত্রে গোটা মহাভারতটি গ্রথিত।

সকল প্রসাধনকার্যের মধ্যে কেশ-প্রসাধনই বাংলাসাহিত্যে 'রচনা' শব্দের অধিকার পাইয়াছে। 'মুখ-রচনা' 'দেহ-রচনা' বলি না, বলি 'কেশ-রচনা'। মৈথিলী বিদ্যাপতি কেশ-রচনায় পারদর্শী কবি।

নিছক কেশ সম্বন্ধে বেশী অলঙ্কার পাইব না বিদ্যাপতির কাব্যে। আকারগত বিপুলতার জন্য কেশ অন্যান্য অঙ্গকে কোনো না কোনো ভাবে স্পর্শ করিয়া আছে। বিশেষতঃ মুখহারা কেশকে প্রায় কখনো দেখা যায় না। মুখচন্দ্র কেশনিশায় সমুদিত।

কেশের স্বতন্ত্র অলঙ্কারও কিছু কিছু আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও সত্য অলঙ্কার—'মেঘের মত কেশ'। কুচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ কেশ—আমাদের রূপকথা। কবিও কাব্যের রূপ-কথায় সেই কথাই স্বীকার করেন। 'কুন্তল—মেঘ, অন্ধকার ও চামর জিনিয়া' (৮১)—কবি জানাইয়াছেন। 'মেঘ' ও 'অন্ধকার'কে মিশ্র অলঙ্কারে বেশী দেখা যায়—কেশের স্বতন্ত্র বর্ণনায় 'চামরে'র উপমানই বেশী। কারণ 'অন্ধকার' ও 'মেঘ' আকারে ব্যাপক, অন্য বস্তুর সঙ্গে জড়াইয়া তাহারা আছে। চামরকে পৃথকভাবে দেখা সম্ভব। তাছাড়া 'মেঘ' ও 'অন্ধকারে'র সঙ্গে কেশের তুলনা করা হয় বর্ণের ও ভাবের হিসাবে। চামর কিন্তু চেহারায় কেশেরই তুল্য। সে কারণে শুধুমাত্র কেশের বর্ণনায় চামরকে এত বেশী স্মরণ করা হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"চামরীকে কেশপাশ ফিরাইয়া দিল।" (১৮১)

*

"তাহার চিকুর চামরের ন্যায়, অনুপম।" (২৩৫)

*

"কবরীর ভয়ে চামরী পর্বতের গুহায় লুকাইল।" (৬২০)

কেশচামরের দ্বারা রাধা নিজের দেহ-বেদীকে—যে বেদীতে প্রিয়-প্রতিষ্ঠা করিবেন—পরিষ্কৃত করিবার কথা ভাবিয়াছেন ("ঝাড়ব করব তাহে চিকুর বিছানে,"—৭৫৪)। অধ্যাত্ম আত্মদানের সেই ক্ষণে কেশ পবিত্র সম্মার্জনী। ইন্দ্রিয়-সমর-পর্বে এই কেশই আবার অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র। ২২০ পদে আছে—"(রাধা) পথে (যাইতে) নিকটে আসিল, মদনের যষ্টিতুল্য দৃঢ়বন্ধ কেশ স্পর্শ করিয়া দেখাইল।" মদনের কথা শ্রীকৃষ্ণের কেশবর্ণনার সময়ও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্চিত সুকৃষ্ণ কেশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যেন সুবেশ মদন কাজলে সাজিল" (৬২৯)। যুদ্ধ-ব্যাপারে কেশাস্ত্রের কথা কবি ৩০৩ পদেও বলিয়াছেন। 'শ্যামা সুনয়না অপূর্ব ভূষণে সজ্জিতা রতিস্বরূপা', নায়িকা দেবপুর জয় করিয়াছে। কবি তাহার অস্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন। নায়িকার অধিক সংগ্রাম মদনের সঙ্গে। কটাক্ষশর প্রহার করিয়া নায়িকা শেষপর্যন্ত মদনকে পরাস্ত করিলেও নিজেও কিছু আহত হইয়াছিল। বেণীসর্প নায়িকার একটি অস্ত্র। কবি বেণীসর্পের আঁকিয়া বাঁকিয়া লুটাইয়া পড়িয়া থাকার কারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—কামের প্রহারেই এইরূপ হইয়াছে।

মুখমণ্ডল ও কেশের যৌগিক অলঙ্কার

এতক্ষণ আমরা মুখমণ্ডলের অযৌগিক অলঙ্কারগুলির আলোচনা করিতেছিলাম। 'অযৌগিক অলঙ্কার' কথার অর্থ বুঝাইয়া বলা উচিত। কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ যখন অন্য অঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে অলঙ্কারের আশ্রয় হয়, তখন সেই অলঙ্কার 'অযৌগিক'। 'যৌগিক' অলঙ্কার বলিতে বুঝিব—যখন দুই বা ততোধিক অঙ্গ একত্রে অলঙ্কারের আশ্রয় হইয়াছে। তুলনামূলক বিচার করিলে অযৌগিক অপেক্ষা যৌগিক অলঙ্কারই কাব্যাংশে উৎকৃষ্টতর। যৌগিক অলঙ্কারে রূপ-চিত্রের পূর্ণতা। ক্ষুদ্র অঙ্গ বা উপাঙ্গ লইয়া বাড়াবাড়ি করা ভারতীয় অলঙ্কারের সাধারণ দোষ। তাহাতে কল্পনার চতুরতা যতখানি—বলিষ্ঠতা সেরূপ নয়। এই কল্পনাকে সূক্ষ্ম বলাও সম্ভব নয় সকল সময়। 'ক্ষুদ্র' এবং 'সূক্ষ্মে'র মধ্যে পার্থক্য আছে। তুচ্ছ লইয়া বাড়াবাড়ি করার জন্য বহু সময় ভারতীয় অলঙ্কারে প্রাণচ্ছন্দের অভাব হইয়াছে।

যৌগিক অলঙ্কারগুলিতে অন্ততঃ চিত্র-রূপের পূর্ণতর বিকাশ পাই। কারণ এগুলির মধ্যে কয়েকটি অঙ্গকে একত্র দেখার চেষ্টা আছে। সেই সঙ্গে যৌগিক উপমাগুলি আবার অন্য একটি ত্রুটির সম্মুখীন—কবিরা যদি একবার অলঙ্কার-জপ-মালার প্রথম বীজটি আঙুলে পাইয়া যান, অবিলম্বে সমস্ত মালাটি হাতে (অর্থাৎ পদে) ঘুরিয়া যায়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি উপমান আছে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে, সেই সম্পর্ক প্রদর্শনে কবিদের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। তখন উপমেয় বস্তুটি মূল্যে গৌণ—উপমানই আসল হইয়া ওঠে।

এই অংশে মুখমণ্ডলের যৌগিক অলঙ্কারগুলিরই আলোচনা হইবে। অর্থাৎ মুখের বিভিন্ন অংশের অলঙ্কার একত্রে বিচার করিব। মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মুখমণ্ডলের নিম্নবর্তী দেহের অন্যান্য অংশের সংযোগ-মূলক অলঙ্কারও রহিয়াছে। যেমন ধরা যাক, মুখমণ্ডলের অংশ কেশ। কুচ মুখমণ্ডলের মধ্যে পড়ে না। অথচ কেশ ও কুচের অলঙ্কার আছে। এই জাতীয় অলঙ্কারগুলি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হইবে।

মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রম আমরা অযৌগিক অলঙ্কারের আলোচনায় যেরূপ ধরিয়াছি, এখানেও সেইরূপ থাকিবে। সেই ক্রম-অনুসারে অলঙ্কার উদ্ধৃত ও বিচার করিব। স্থিরীকৃত ক্রমানুসারে পূর্বে যে অঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত যুক্ত যে-কোনো পরবর্তী অঙ্গকে একত্র করিয়া লইব। যেমন, মুখমণ্ডলের প্রথম অঙ্গ 'মুখ'। অন্য যে কোনো অঙ্গের সঙ্গে মুখ যুক্ত থাকিলে—সমস্ত অলঙ্কারগুলি মুখ-অংশে আসিবে—এমনকি যদি ঐ অলঙ্কারে অন্য অঙ্গের তাৎপর্যগত প্রাধান্য থাকে—তবুও। যথা, কোনো একটি স্থানে মুখ ও নয়ন এক অলঙ্কারের অধীন, অলঙ্কারটিতে নয়নেরই ভাব-প্রাধান্য। তবু সে অলঙ্কারটি 'মুখ' অংশে অলোচিত হইবে—যেহেতু আমাদের ক্রম-অনুযায়ী নয়নের পূর্বে আছে মুখ।

(ক) মুখ এবং—

অন্য অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত মুখের অলঙ্কার যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। অলঙ্কারগুলি সংখ্যায় যতখানি, উৎকর্ষে সেরূপ নয়। অধিকাংশ অলঙ্কারই

প্রথাগত। সাদৃশ্যসন্ধানের জন্য বিদ্যাপতি বাস্তব জীবনের দিকে তাকান নাই।

তবে আলঙ্কারিক কল্পনার কৃত্রিম সৌন্দর্য অলঙ্কারগুলিতে পাওয়া যায়। দু'একটি অলঙ্কার সত্যই রূপ-চমকিত। দৃষ্টান্তসহ বিচার করা যাক—

মুখ ও নয়ন

চাঁদ ও চকোর ; চাঁদ ও কমল ; কমল ও খঞ্জন—ইহাদের সম্পর্কের যোগ বিয়োগ অলঙ্কারগুলিতে মিলে।

যেমন চাঁদ ও চকোর সম্পর্ক—

"বিধাতা চন্দ্রের সার লইয়া মুখের সৃষ্টি করিল; চকোরের আঁখির ন্যায় চঞ্চল নয়ন সৃষ্টি করিল, যেন অমৃত দিয়া মুখ ধুইবার পর অঞ্চল দিয়া মুছিল—দশদিক আলোকিত হইল।" (২১)

এখানে শেষ পর্যন্ত নয়নের তুলনায় মুখেরই প্রাধান্য।

যেমন চাঁদ ও কমল—

কবির বিস্ময়, চাঁদ ও কমল একসঙ্গে থাকে কি করিয়া? প্রথমতঃ উভয়ের মধ্যে স্থানের ব্যবধান, একজন থাকে আকাশে, অন্যজন মর্ত্যে, দ্বিতীয়তঃ কবিকল্পনায় চাঁদে কমলে পিরীতির সম্পর্ক নয়। অথচ কবি রাধার মুখে উভয়কে একত্র দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া চমকাইয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, চাঁদ কমলকে একত্র দেখাইবার কালে কবি-প্রসিদ্ধি যেমন লঙ্ঘিত হইয়াছে, তেমনি নূতন একটি কবিকল্পনা উদিত হইয়াছে। এইরূপ পদ—২৪, ২৬৪।

যেমন কমল ও খঞ্জন—

মুখ ও নয়নের একত্র রূপ দেখিয়া কমলে খঞ্জনের খেলার কথাও কয়েকটি পদে কবির মনে পড়িয়াছে (৩০, ৩৭)। তার মধ্যে ৩০ পদের বর্ণনাটি সুন্দর—

"তাহার বদন শরৎকালের শশধরের মত সুন্দর এবং নয়ন চঞ্চল, উহা দেখিয়া মনে হয় যেন খঞ্জনযুগল বিশুদ্ধ সোনায় গড়া কমলে চড়িয়া খেলা করিতেছে।"

এখানে মুখ-নয়নের বর্ণনায় দুইটি অলঙ্কার; এক—মুখ শরৎ-শশধরের মতো এবং তৎসহ চঞ্চল নয়ন; নয়নের কোনো অলঙ্কার নাই। দুই—মুখ সোনার কমলের ন্যায়, তাহাতে নয়নরূপ জোড়া খঞ্জন খেলা করিতেছে। আলঙ্কারিক কল্পনার দিক দিয়া দ্বিতীয়টি পূর্ণতর। প্রথমটি অধিকতর ভাবাত্মক।

কবি সুন্দরী রাধার মতই ভয়ঙ্করী মহামায়ার অর্চনাকারী ছিলেন। একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন মুখ ও নয়নের। মহাদেবীর ঘনশ্যামল মুখের উপর নয়ন দেখিয়া মনে হইয়াছে যেন মেঘে রক্তকমল ফুটিয়াছে। উপমাটি প্রশংসনীয়, তবু বলিব মহাকালীর মুখের সঙ্গে মেঘের তুলনা যতখানি সার্থক—ঐ মেঘে রক্তকমল সেরূপ নয়। কমলের সুকুমারতা ও লাবণ্য কবি এখানে না আনিলেও পারিতেন। "পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস রাঙাইছে আঁখি"—এইরূপ দীপ্ত মহান কল্পনার অধিকার ছিল না বিদ্যাপতির।

মুখ-নয়ন-কাজল

"বদন সুন্দর, লোচন কজ্জলে রঞ্জিত, (যেন) সোনার কমলের মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী রহিয়াছে, আর পাশে শ্রীযুক্ত খঞ্জন খেলা করিতেছে।" (২২)

সোনার কমলে শয়ান কাল ভুজঙ্গিনী এবং তাহার পাশে সুন্দর খঞ্জনের খেলা—কৃত্রিম কাব্যলোকের মনোহারী চিত্র।

মুখ-নয়ন-ভ্রূ-পক্ষ্ম

"সহজ সুন্দর মুখ ও ভ্রূর সুরেখাযুক্ত চোখ (দেখিয়া মনে হয় যেন) ভ্রমর পঙ্কজের মধুপান করিয়া উড়িবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিয়াছে।" (৩৮)

এখানে ভ্রূ-সহিত নয়ন হইল ভ্রমর, পঙ্কজ মুখ এবং ভ্রমর-পক্ষ অক্ষিপক্ষ্ম। নয়নের কম্পিত পক্ষ্ম দেখিয়া বিদ্যাপতির মনে বহুবার মধুমত্ত ভ্রমরের তীব্র পক্ষ-কাঁপনের চিত্র মনে পড়িয়াছে (তু: ৩৪, ২৩২ পদ)। কল্পনাটিতে বাস্তবতা আছে।

মুখ-নয়ন-অধর

"সুন্দর বদনে অধর সুশোভিত, যেন বান্ধুলী ফুলে কমলকে পূজা করা হইয়াছে। সেইস্থানে দুই সুললিত শ্যামল নয়ন, (যেন) বিমল পদ্মেতে ভ্রমর বসিল।" (২০)

অলঙ্কারের দ্বিতীয় অংশ যেখানে মুখ ও নয়নের কথা বলিতে কবি বিমল পদ্মেতে ভ্রমরের কথা বলিয়াছেন, সেখানে কল্পনা গতানুগতিক। কিন্তু প্রথম অংশে মুখ ও অধরের একত্র রূপ দেখিয়া যেখানে কবি ফুলের দ্বারা ফুলের পূজার কথা ভাবিয়াছেন, সেখানে কল্পনা অপেক্ষাকৃত উন্নত।

লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকারে।
মধুক মাতল উড়এ না পারে॥ (২৩২)

এখানে লোচনযুগলের সঙ্গে মধুমত্ত ভ্রমরের তুলনা। কিন্তু লোচন মধুমত্ত হয় কি ভাবে ? এই পদে নায়ক সম্মুখে নাই যে তাঁহাকে দেখিয়া রাধা-নয়ন মত্ত হইবে। সুতরাং নয়ন-ভ্রমরের পেয় মধুর সন্ধান অন্যত্র করিতে হইবে। কবি ঐ দুই ছত্রের পূর্বের দুই ছত্রে মুখ ও অধর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেন কমলের সঙ্গে বান্ধুলী ফুল। সন্দেহ নাই, রাধার নয়ন রাধারই মুখ ও অধরের মধুতে আবিষ্ট হইয়াছিল।

মুখ-নয়ন-কেশ

ইহাদের একত্র অবস্থান দেখিয়া কবি চমকিত, কারণ তাহা পূর্ণিমার চাঁদ, কমল ও অন্ধকারের একত্র অবস্থানের তুল্য (৩২)। কবি এত বেশীবার এই ভাবে চমকাইয়াছেন যে, পাঠক আর চমকায় না।

মুখ ও কেশ

মুখ ও নয়নের একত্র রূপের অপেক্ষা মুখ ও কেশের একত্র রূপ বিদ্যাপতির কল্পনাশক্তিকে অধিক আর্কষণ করিয়াছে। মুখ ও কেশের (কখনো কখনো অন্য আরো দু'একটি অঙ্গ সহিত) অনেকগুলি যৌগিক অলঙ্কার আছে। অলঙ্কারগুলিতে পাই —

(১) চন্দ্র ও অন্ধকারের সম্পর্ক ;
(২) চন্দ্র ও রাহুর সম্পর্ক ;
(৩) পরস্পর বিরোধী বস্তুর আশ্চর্যজনক একত্র সমাবেশ ;
(৪) কমল ও ভ্রমরের সম্পর্ক ;

অন্ধকার, রাহু, ভ্রমর ইত্যাদি কেশের উপমান; মুখের উপমান, চন্দ্র এবং কমল।

(১) চন্দ্র ও অন্ধকারের সম্পর্কের কথা আছে ২৭, ৬৬, ২২৮, ৪৯৪ পদে—

"(মুখচন্দ্রের) উপর তিমিরতুল্য কেশপাশ ; চন্দ্র ও তিমিরে বিবাদ বাধিল!" (২৭)
"আকুল কেশপাশ বদন ঢাকিল, যেন চাঁদকে অন্ধকারপুঞ্জ ঢাকিয়া ফেলিল।" (৬৬)
"অলকের ভারে মুখ ঢাকে, যেন চন্দ্রমণ্ডলে অন্ধকার মিলিত হয়।" (৪৯৪)
"চিকুর হইতে জলধারা পড়িতেছে, যেন মুখশশীর ভয়ে অন্ধকার রোদন করিতেছে।"(২২৮)

প্রথম তিনটি উদ্ধৃতির কল্পনা সুন্দর ও সাধারণ। শেষ উদ্ধৃতিই কল্পনাংশে উৎকৃষ্ট। কেশ-বারির সহিত মুখ-চন্দ্র ভীত কেশ-অন্ধকারের রোদন-বারির তুলনায় রূপচমক আছে।

এই অলঙ্কারটির কিন্তু আর একটু আলোচনা প্রয়োজন। ইহার আধার-পদটি খুবই বিখ্যাত এবং বেশ কয়েকটি পাঠ পাওয়া যায়। সেই সকল পাঠের মধ্যে একটি স্থানে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়—আমাদের আলোচ্য অলঙ্কারটিতেই। বাংলাদেশে প্রচলিত পাঠ এবং নেপাল পুঁথির পাঠে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি,—মুখশশীর ভয়ে কেশ-অন্ধকার রোদন করিতেছে ইত্যাদি। কিন্তু গ্রীয়ার্সন ও রাগতরঙ্গিণীর পাঠের বয়ান একেবারে উল্টা। গ্রীয়ার্সন অনুযায়ী, —"শশিহীন হইয়া যেন অন্ধকার অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে (এবং কাঁদিতেছে)" ; আর, রাগতরঙ্গিণী অনুসারে —"মুখশশীর জন্য যেন অন্ধকার কাঁদিতেছে।

সঙ্কলনের সম্পাদকগণ বাংলাদেশের পাঠের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, —"রাগতরঙ্গিণীর······পাঠে ভাল অর্থ হয় না; গ্রিয়ার্সনের পাঠের অর্থ··· সঙ্গত নহে, কেন না অন্ধকার তো শশীর শত্রু। বাংলাদেশে মৈথিল শব্দ বিকৃত হইলেও ভাবের বিশুদ্ধতা যে রক্ষিত হইয়াছিল, এই পদটি তাহার অন্যতম প্রমাণ।"

সম্পাদক মহাশয়গণ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কথা লিখিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের গৃহীত অর্থ স্বাভাবিক, নিরাপদ—বিদ্যাপতিও সাধারণভাবে শশী ও অন্ধকারের বিবাদে বিশ্বাস করিতেন, উপরের প্রথম তিন উদ্ধৃতি তার প্রমাণ।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথা বলিতে হয়, রাগতরঙ্গিণী বা গ্রিয়ার্সন পাঠের অর্থ অসঙ্গত বা অপকৃষ্ট, সম্পাদকদের এই উক্তি ঠিক নয়। বাংলাদেশের পাঠে আছে প্রচলিতের সমাদর, গ্রিয়ার্সনের পাঠে কল্পনার নবত্ব। অন্ধকার সর্বত্রই চাঁদের ভয়ে কাঁদে—চাঁদের জন্য কি কাঁদিতে পারে না? বিদ্যাপতি যদি গ্রিয়ার্সন-পাঠ- অনুযায়ী অন্ধকারের আত্মঘাতী ভালবাসার রূপ দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি প্রশংসার পাত্র। অন্ধকারের চন্দ্র-প্রীতি মৃত্যুপ্রীতির তুল্য। চন্দ্র যদি সুন্দর হয়—সে অন্ধকারের কাছেও সুন্দর। অন্ধকার তাহাকে চাহিবে, কিন্তু পাইবে না—সেই চির অপরিতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা বিদ্যাপতি হয়ত অন্ধকারকে দান করিয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীর পাঠও একই কথা বলিতেছে,—'অন্ধকার শশিহীন হইয়া অবসাদগ্রস্ত'। অন্ধকার ও আলোর এই বিচিত্র সম্পর্ক—অন্ধকার নহিলে আলো থাকে না, আলো নহিলে অন্ধকার। বিদ্যাপতি বেশ কয়েকবার অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্রোদয়ের কথা লিখিয়াছেন। ভারতীয় কল্পনায় এই অন্ধকারের চন্দ্রপ্রীতির তুল্য কল্পনা রহিয়াছে – ঊষার সূর্যপ্রীতি।

তাছাড়া এই পদের পরবর্তী অংশের দিকে দেখিলেও গ্রিয়ার্সন-পাঠের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে একস্থানে আছে—"কুচযুগ যেন সুন্দর চক্রবাক-মিথুন, কে যেন (তাহাদের) নিজকুলে আনিয়া মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে। তাহারা পাছে আকাশে উড়িয়া যায়, এই ভয়ে (সুন্দরী) বাহুপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" চক্রবাক যদি চাতকপাখী হয়* তবে তাহাদের আকাশ-কামনার কারণ আমরা জানি। তাহাদের চাই মেঘ-বারি, পানের জন্য। তৃষ্ণায় ফাটিয়া মরিলেও অন্য জল তাহারা পান করে না। সুতরাং আকাশে তৃষ্ণার্ত চাতকের বৃথা ক্রন্দন বৎসরের অধিকাংশ সময় ভরিয়া থাকে।

---

*অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস জানাইয়াছেন, বাংলাদেশে চক্রবাককে চাতক বলা হয়—কিন্তু চাতক ভিন্ন পাখী। মিথিলা কি বাংলার মত একই ভুল করে?

অন্ধকার চায় চন্দ্রকে—পায় না, তাই কাঁদে। চাতকও আকাশে ডানা মেলিতে চায়—তৃষ্ণার পানীয় চাহিয়া,—অধিকাংশ সময় তাহা পায় না। কবি অন্ধকারের চন্দ্রকামনা এবং চাতকের আকাশ-কামনা হয়ত একরূপে দেখিয়াছিলেন।

(২) চন্দ্র ও রাহুর সম্পর্কের কথা মেলে—২৫, ১৬৮, ৩৪০, ৪১৬, ৪১৭, ৫১২, ৫৪৬ ইত্যাদি পদে—

"রবি (সিন্দুর) ও শশী (মুখ) পাশাপাশি উদিত। রাহু (কেশ) দূরে বাস করে, নিকটে আসে না, তাই রবিশশীকে গ্রাস করে না।" (২৫)

"নমিত অলকে বেষ্টিত মুখমণ্ডল শোভা পাইতেছে,—রাহুর বাহু শশিমণ্ডলকে লোভে স্পর্শ করিল।" (১৬৮—৪১৬ ও ৪১৭ পদেও প্রায় এক অলঙ্কার)

"মন্মথ রাহুর (কেশের) ভয়ে চাঁদ (মুখ) হইতে সুধা আনিয়া অধরে রাখিয়াছে।" (৩৪০—৫১২ পদেও প্রায় একই অলঙ্কার)

"মুক্ত কেশ রাহুর তুল্য, (তাহার ভয়ে) সুধাকর (মুখ) কামিনীর ক্রোড়ে রোদন করিতেছে।" (৫৪৬)

অলঙ্কারগুলিতে কল্পনার তীব্র বাস্তবতা আছে, বিশেষতঃ মুখের উপর নমিত অলকের সঙ্গে শশিমণ্ডলের প্রতি রাহুর লোভযুক্ত বাহুপ্রসারণের তুলনায়। কুটিল লুব্ধ কেশ মুখের উপর প্রসারিত; সেই কেশ যেন রাহু—যতখানি মুখকে কেশ ঢাকিয়াছে, ততখানি মুখ রাহুর দ্বারা গ্রস্ত। ব্যাপারটা বিপদের। কবিও বিপজ্জনক চিত্রের সৌন্দর্যে বিচলিত।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে যেখানে কেশরূপ রাহুর ভয়ে মন্মথ চাঁদমুখ হইতে সুধা আনিয়া অধরে রাখিয়াছে—সেখানে কবির বক্তব্য—সমস্ত মুখেই সুধা আছে, তবে অধরেই বেশী। নায়কের নিকট সেই অধর-সুধা পরম পানীয়। এই অলঙ্কারে মুখের বা কেশের অপেক্ষা অধরেরই প্রাধান্য।

শেষ উদ্ধৃতিতে পরিস্ফুটিত অলঙ্কার-চিত্রটি চমৎকার। অলঙ্কারকে একটু ভাঙ্গিয়া লইলেই গোটা ছবিটি পাওয়া যায়। বর্ণনা বিরহিণী রাধার। রাধা নিজের কোলে মুখ গুঁজিয়া বেদনাভরে বসিয়া আছেন—এবং কাঁদিতেছেন। তাঁহার অযত্ন শিথিল কেশ মুক্ত হইয়া মাথা, মুখ, হাতের উপর দিয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া কবির মনে হইল, রাহুর ভয়ে সুধাকর কামিনীর কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতেছে। চিত্রটি সুন্দর হইলেও অবশ্য কবির

মনোভাবের ঔচিত্য বিষয়ে প্রশ্ন করা যায়। বিরহিণীর বিষাদ ক্রন্দন মূর্তির প্রত্যক্ষ বেদনারূপকে কবি স্বীকার করেন নাই। তাঁহাকে রাহুর ভয়ে চাঁদের ক্রন্দনের কথা ভাবিতে হইয়াছে। অথচ চন্দ্রমুখী রাধা কৃষ্ণ-রাহুর দ্বারা গৃহীত না হওয়ার জন্যই কাঁদিতেছেন। এই ভাববিরোধে অলঙ্কারটি খণ্ডিত।

(৩) পরস্পর-বিরোধী বস্তুর আশ্চর্যজনক সমাবেশ বিদ্যাপতি নানাপ্রসঙ্গে এতবেশী করিয়াছেন যে বিস্ময়ের ধার একেবারে মরিয়া গিয়াছে। ২৫ পদে সেরূপ দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। ২৩ পদেও একই বক্তব্য—সেই সিন্দুররূপ সূর্য। মুখরূপ চন্দ্র, অন্ধকাররূপ কেশ একত্রে থাকিয়া কবিকে খুবই চমকিত করিয়াছে—পাঠককে ততদূর নয়।

(৪) মুখ ও কেশের একত্র বর্ণনায় কমল ও ভ্রমর কয়েকটি সুন্দর অলঙ্কারের আশ্রয়। ২৫, ২৩০, ৩০৩, ৬২৭ পদে অলঙ্কারগুলি পাওয়া যাইবে—

"কমলতুল্যমুখের উপর দশটি ভ্রমর (চূর্ণকুন্তল) কেলি করিয়া মধুপান করিতেছে।" (২৫)

"মস্তকে চিকুরসম্ভার—তার উপর ভ্রমর পক্ষ প্রসারিত করিয়া রসপান করিতেছে।" (২৩৬)

"বিশালাক্ষী চন্দ্রবদনা ধনী যেন ভ্রমরমালা-ভূষিত পদ্ম।" (৩০৩)

"সিক্ত অলকগুলি অতি সুন্দর, যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল কমলকে ঘিরিয়াছে।" (৬২৭)

২৫, ২৩৬ এবং ৬২৭ পদে অলঙ্কারের একই রূপ। চূর্ণ কুন্তল কিংবা সিক্ত অলকের ভ্রমররূপে মুখমধু-পানের প্রয়াস-চিত্র আনন্দদায়ক। ৩০৩ পদের অলঙ্কার-আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের স্থান আছে। 'ভ্রমর-মালাভূষিত পদ্ম' —এই অলঙ্কার কোন্ দুই অঙ্গের? মুখ ও নয়ন কিংবা মুখ ও কেশ—উভয়েরই হইতে পারে। অলঙ্কারটি মুখকে অধিক গুরুত্ব দিয়াছে। মুখের দুই উপমান—চন্দ্র (চন্দ্রবদনা ধনী), এবং পদ্ম। মুখের সৌন্দর্য বুঝাইতে এখানে শেষপর্যন্ত পদ্মের উপর কবি নির্ভর করিয়াছেন। ঐ পদ্ম আবার ভ্রমরমালাভূষিত। কিন্তু পদ্মের চারিপাশের ভ্রমরগুলি কিসের সঙ্গে উপমিত? যদি নয়নের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়—যাহা সহজেই হইতে পারে —তাহা হইলে ব্যুৎপত্তির কিছু অসুবিধা হয়। নয়ন সংখ্যায় দুই—অথচ এখানে পদ্ম ভ্রমরমালায় ভূষিত। এখানে অর্থসঙ্গতি আনিতে গেলে বিদ্যাপতি অন্যত্র নয়ন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, স্মরণ করিতে হয়। লোল লোচনের বর্ণনায় বিদ্যাপতির নায়ক বিভ্রান্ত চিত্তে বলিয়াছে—'হায়! এক

নয়ন মনে হয় লক্ষ নয়ন।' সেক্ষেত্রে দুই নয়নের পক্ষে ভ্রমরমালা হইতে বাধা নাই।

আর যদি এখানে অলঙ্কারের আশ্রয় ধরা হয় মুখ ও কেশকে, তবে মুখপদ্মের চতুর্দিককার ভ্রমরমালা হয় চূর্ণ কেশ। চূর্ণ কেশের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, অনুমান করিয়া লইতে হয়। বিদ্যাপতি ২৫ পদে চূর্ণ কেশকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনাও করিয়াছেন।

আমাদের ধারণা, কবি এই অলঙ্কারে মুখ ও নয়নের কথাই বলিয়াছেন।

মুখ ও অধর

২৩২ ও ৬৩১ পদে কমলের সঙ্গে মুখের, ও অধরের সঙ্গে বান্ধুলী ফুলের তুলনা। তুলনা গতানুগতিক।

মুখ ও হাসি

"শরতের চন্দ্রতুল্য বদন বস্ত্র দ্বারা কেন ঢাকিতেছ? অল্প হাস্য-সুধারস বর্ষণ করিলেও নয়নের পিপাসা মিটিবে।" (১৬৩)

"সুন্দর বদন, হাসিয়া কথা বলে, যেন শরতের চাঁদ অমিয় বর্ষণ করে।" (৬৩১)

শরতের চাঁদের মতো মুখ, তাহাতে হাসির অমৃত-জ্যোৎস্না কথাটা—বারবার শুনিয়াও পুরাতন হয় না।

মুখ ও ঘর্ম এবং মুখ ও শ্রমজল

"মুখে ঘর্মবিন্দু ও সুন্দর জ্যোতি দেখা দিল, তাহাতে মনে হইল যেন সোনার কমলে মুক্তা ফলিয়াছে।" (৪৯৩)

"শ্রমজলবিন্দু বদনে শোভা পাইল,—যেন মদন মুক্তা দিয়া চন্দ্রকে পূজা করিল।" (৪৯৭)

এক অপূর্ব রমণীয় পৃথিবীর জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা আছে, যেখানে সোনার কমলে মুক্তা ফলে এবং মদন সেই মুক্তা দিয়া চন্দ্রকে পূজা করে। কবি তাঁহার নায়িকার স্বেদস্ফুট আননে সেই জগৎটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

প্রথম অলঙ্কারটিতে অবাস্তব রমণীয়তার প্রসার—দ্বিতীয়টিতে ভাবরসের গাঢ়তা। সুন্দরীর মুখে শ্রমজলবিন্দু দেখিয়া মুক্তাবিন্দুর কল্পনায় অভিনবত্ব নাই। কিন্তু ঐ মুক্তা দিয়া চন্দ্রের পূজা করিয়াছে মদন—ইহাতে বক্তব্যের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। শ্রমজল, মদনরঙ্গে উন্মত্ত নারীর পুলকের সৃষ্টি। মদনের কর্ষণেই ঐ বারিবিন্দুর উৎপত্তি। সুতরাং মদনের নিজের সাধনার সৃষ্টি ঐ মুক্তারাজি দিয়া কবি মদনকে চন্দ্রপূজা করাইতে পারেন।

মুখ ও তিলক

৯৬, ৯৭, ৩১২—এই সকল পদে মুখে তিলক-রচনা দেখিয়া কবিচিত্তে একই অলঙ্কার জাগিয়াছে—রাধার অকলঙ্ক মুখে তিলক কলঙ্কতুল্য। কবি সন্ত্রস্ত হইয়া নিষেধ করেন—আহা, মুখকে যেন তিলক-কলঙ্কিত করিয়া চন্দ্রতুল্য করিও না। কবির ব্যাকুলতা দ্বারা আমরা বেশ বুঝিয়াছি—অমন সুন্দর চাঁদও রাধামুখের উপযোগী উপমান নয়।

৫২ পদে আছে—'আননে বঙ্কিম শশিরেখা'। সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা অনুসারে ঐ বঙ্কিম শশিরেখা হইল তিলক। যদি তাই হয়, তবে তিলকের জন্য মর্যাদা-সমন্বিত একটি নূতন অলঙ্কার পাওয়া গেল।

মুখ ও বস্ত্র

অবরোধ এবং অবগুণ্ঠন ভারতীয় নারীর দাসত্বের হীন অভ্যাস, যাহা পতনের যুগে তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রগতির যুগে আমরা সকলেই একথা জানি ও মানি। কিন্তু কবিরা চিরদিন ছন্নছাড়া। তাঁহারা অবরোধ পছন্দ করেন, কারণ চন্দ্র-সূর্যের প্রবেশ-নিষিদ্ধ স্থানে উঁকি মারিতে তাঁহাদের নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ; এবং অবগুণ্ঠন-লুণ্ঠনে তাঁহাদের সুতীব্র উল্লাস। য়ুরোপে, যেখানে দেহসজ্জার ব্যাপারে অনম্বর-সাধনা চলিতেছে, সেখানেও অবগুণ্ঠনের ব্যবহারমূল্য কমে নাই।

৫৯ পদে আছে—"মুখ বস্ত্রে ঢাকিয়া গোপন করে, মেঘের নীচে চন্দ্র প্রকাশ পায় না।" এবং ৪৭২-খ পদে—"মাধব আসিয়া যে-গৃহে রাধা

আছেন তাহার কপাট মুক্ত করিলেন, বস্ত্র খুলিয়া অর্ধ-মুখ দেখিলেন, যেন অর্ধ-চন্দ্র উদিত হইল।"

রাধার নীলাম্বরী এবং শুভ্র মুখ-লাবণ্য অনিবার্যভাবে মেঘ ও চন্দ্রকে একত্র করিয়াছে কবির কল্পনায়—একেবারে অনিবার্যভাবে।

কিন্তু বস্ত্রাবৃত মুখ যথার্থ অলঙ্কার-সামর্থ্য লাভ করিয়াছে ৬৭৮ পদে যেখানে আছে—"গৌরাঙ্গী হাসিয়া তাকাইয়া বসনে মুখ লুকাইল, মনে হইল যেন রত্নদান করিয়া আবার তাহা চুরি করিয়া লইল।" কবি আর গতানুগতিক অলঙ্কারের মধ্যে বাঁধা নাই। সহসা রত্নলাভের উৎফুল্ল আবেগ এবং তেমনি সহসা তাহাকে হারাইবার হতাশা, একটি কৌতুকময় নৈরাশ্যে পদটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি এখানে অনুভূতির বাস্তবতা-সৃষ্টিতে সমর্থ।

(খ) নয়ন এবং—

কেবল নয়ন-বিষয়ক অলঙ্কারের আলোচনার সময় নয়নের অলঙ্কার-যোগ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আবেগ প্রকাশ করিয়াছি। বলিয়াছি—গতিতে, লাবণ্যে, চাঞ্চল্যে মুখের সকল অঙ্গের মধ্যে নয়নই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্বের অলোচনায় নয়নের আকর্ষণী ক্ষমতার কথা বলিলেও যথেষ্ট সংখ্যক নয়নমূলক উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিতে পারি নাই। এখানে যৌগিক অলঙ্কারর অংশে নয়ন-কেন্দ্রিক কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পাইতেছি।

নয়ন-কাজল-ভ্রূ : নয়ন-কাজল-কটাক্ষ : নয়ন-কাজল

কাজলের সঙ্গে সহযোগে রমণীয় নয়ন কমনীয় হয়। রমণীরা সেটা জানেন বলিয়া নয়নের তটে কাজলের মোহন মরণ দীর্ঘ করিয়া টানিতে ভোলেন না। ইদানীং চোখের পাতার উপরও নীল গরলের ছায়াপাত যথেষ্টই করা হইতেছে।

গতানুগতিক অলঙ্কারও এখানে মেলে। কখনো নীরস গতানুগতিক, কখনো দক্ষ গতানুগতিক। ৯৭ পদে বলা হইল—নয়ন দুধে-ধোওয়া ভ্রমর, তাহাতে কাজল দিলে মসীবর্ণ হইয়া যাইবে। এখানে অলঙ্কার খুবই

প্রয়াসলাঞ্ছিত। ৯৩২ পদে আছে—"তাহার ধবল নয়নশ্রেষ্ঠ কাজরে রঞ্জিত, যেন অরুণ কমলদলে ভ্রমর বসিয়াছে।" এই অতি সাধারণ অলঙ্কারটিতে আবার রূপগত অনৌচিত্য আছে। যে নয়নকে ধবলবর্ণ বলা হইল, তাহা অবিলম্বে অরুণবর্ণ (কমল) হয় কিভাবে? ৩০৫ পদে নয়ন-কাজল-কটাক্ষ একসঙ্গে—"তোমার শুভ্র নয়ন কাজলে কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে আবার তীক্ষ্ণ তরল কটাক্ষধার। (ব্যাধ) ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া তোমাকে খঞ্জন ভাবিয়া ফাঁসগুণ জুড়িয়া বাঁধিয়া না লয়।" অলঙ্কারটি আপাততঃ মন্দ নয় মনে হয়। কোনো এক অদৃশ্য ব্যাধ রাধার নয়নকে খঞ্জন-পাখি মনে করিয়া ফাঁস-গুণে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। কবি এই ধরনের কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, কারণ, কবি দেখিলেন, নয়নের চঞ্চল খঞ্জন-পাখি কাজলের ফাঁসে আটক পড়িয়া আছে। এখন, যখন পাখিও আছে ফাঁসও আছে, তখন শিকারীও নিশ্চয় আছে। শিকারী যে আছে তার অন্য লক্ষণও কবি দেখিতে পাইয়াছেন—শিকারীর তীর দেখা যাইতেছে—ঐ রাধার নয়নের কটাক্ষ-তীর।

কিন্তু অলঙ্কারটিতে ঔচিত্যের অভাব আছে। ব্যাধ-পাশে বাঁধা পড়িয়াছিল যে খঞ্জন, তাহার কটাক্ষ-তীর হয় না। অর্থাৎ কটাক্ষ এখানে বাড়তি যোজনা। এইরূপ ঘটিবার কারণ—লোচনের কথা বলিলেই কবির কটাক্ষের কথা মনে হয়, এবং কটাক্ষ মনে পড়িলেই তীর আসিয়া যায় সাবলীলভাবে।

১০১ ও ৬২৩ পদের এই বিষয়ক অলঙ্কার সম্বন্ধে আমাদের এইটুকু প্রশংসা—সেগুলিতে দক্ষতা আছে। ১০১ পদে পাই, শুক্লাভিসারের জন্য রাধা নয়নের কাজল ধুইয়া ফেলিলেন। তাহাতে মনে হইল যেন চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী ফুটিল। কজ্জলমুক্ত কুমুদিনীই নয়ন—কিন্তু চন্দ্র কিসের উপমান? কবি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই, কিন্তু তিনি জানেন এবং আমরাও জানি, চাঁদের অভাব নাই—এক চাঁদ রাধার মুখেই আছে, দ্বিতীয় চাঁদ আছে জ্যোৎস্নাপুলকিত আকাশে। যে-কোনো চাঁদকে ভাবিলেই চলিয়া যাইবে।

৬২৩ পদে নয়ন-কাজল-ভ্রূ দুইটি অলঙ্কারে সম্মানিত—"নয়ন-কমল অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া তাহাতে ভ্রূ'র বিভ্রম-বিলাস। চকিত চকোর-যুগলকে বিধি কেবল কজ্জলপাশে বাঁধিল।"—এখানে প্রথমতঃ নয়নকে কমলের

সঙ্গে, পরে চকোর-যুগলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। নয়ন সম্বন্ধে কমলের উপমাটি অবান্তরবোধে বাদ দিয়া চকোর-যুগলের উপমাই গ্রহণ করিতে হইবে। ভ্রূ'র বিভ্রমবিলাসের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ভ্রূ'র কোনো উপমান দেওয়া হয় নাই। কেবল ভ্রূ'র বিভ্রম-বিলাসরূপ কার্যটি নয়ন-চকোরের চকিত চাঞ্চল্যের রূপ আনিয়াছে। অলঙ্কারের আসল সৌন্দর্য দ্বিতীয় অংশে, যেখানে নয়ন-চকোরকে কাজলের ফাঁসে বাঁধিয়া রাখার কথা বলা হইয়াছে। চকোর চিরদিন চন্দ্র-সুধাপানের বাসনায় অধীর। রাধার মুখে আছে কাব্যের পূর্ণ ভুবন। সেখানে আছে নয়নের চকোর এবং মুখের চন্দ্র। রাধার অধীর চঞ্চল নয়ন যেন চন্দ্র-মুখ-সুধা পান করিবার জন্য ছটফট করিতেছে—উড়িতে চাহিতেছে অথচ পারিতেছে না—কবি কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন—কাজলের ফাঁসে চকোরকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

এ সকল অলঙ্কার কিছুই নয়, যখন আমদের হাতে আছে আরো তিনটি অলঙ্কার—শ্রেষ্ঠ তিনটি—যাহার প্রথম দুইটি রূপে সুন্দর, শেষেরটি সুন্দর ভাবে। প্রথম দুইটি অলঙ্কার উদ্ধৃত করা যাক—

"অল্প কজ্জলে রঞ্জিত তাহার চোখ দেখিয়া মনে হইল যেমন ভ্রমর মধুপান করিয়া মত্ত হইল এবং শিশিরে তাহার পাখা ভিজিল।" (৪৮)

"চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে পেলল
অলিভরে উলটায়॥" (২৩)

প্রথম উদ্ধৃতিতে নবযৌবনা রাধার রূপবর্ণনা। প্রথম প্রণয় তখন, রাধা ও কৃষ্ণের—এই কথাটি মনে রাখিলে অলঙ্কার-সৌন্দর্য ভালভাবে বোঝা যাইবে। কল্পনাটি চমৎকার। রাধার নয়নকে বলা হইল মধুমত্ত ভ্রমর। বলিয়াছি এখানে রাধার নবানুরাগ—দেহে-মনে-নয়নে থরোথরো চেতনা—তাহাই মত্ততা। নয়নে বিশেষভাবে সেই মত্ততার আবেশ ও কাঁপন। কবি নয়নকে মধুমত্ত বলিয়াই শেষ করেন নাই, উহাকে কাজলের শিশিরে সিক্ত করাইয়াছেন। কাজলে ও শিশিরে ঐক্য বহিঃরূপে নয়, ভাবরূপে—নয়নের গাঢ়তা এবং সিক্ততা কাজলে ফুটিয়া ওঠে—সুতরাং নয়ন-ভ্রমরটি শিশিরসিক্ত। ইহাতে আরও একটু ব্যঞ্জনা আছে, প্রভাতে মধুপান করিলেই

তবে ভ্রমর শিশিরসিক্ত হইতে পারে—এবং কবি রাধার যৌবন-প্রভাতের কথাই বলিয়াছেন—যৌবন-প্রাতেই রাধা রসোন্মত্তা।

দ্বিতীয় অলঙ্কারটি চিত্ররূপে আরো উচ্চাঙ্গের, যদিও পূর্বোক্ত শিশিরের ব্যঞ্জনাটুকু এখানে নাই। কোনো একটি অলঙ্কার লীলাযৌবনকে কতখানি উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে, ওটি তারই দৃষ্টান্ত। অলঙ্কারটির বক্তব্য—কজ্জল-রঞ্জিত চঞ্চল লোচনের বাঁকা চাহনি দেখিয়া মনে হয় যেন পবনে আন্দোলিত নীলপদ্ম ভ্রমরের ভারে উলটিয়া পড়িয়াছে। এখানে দুইটি চিত্র আছে—একটি উপমেয়-চিত্র, অর্থাৎ রাধার কাজল-আঁকা বাঁকা নয়নের রূপ; দ্বিতীয় হইল একটি নিসর্গচিত্র, অলিভরে নীলপদ্ম নুইয়া পড়িয়াছে। এই দুই চিত্রকে এক করা হইয়াছে। প্রথমে আমরা নিসর্গচিত্রটি পূর্ণভাবে লক্ষ্য করিলে ভাল করিব। একটি সরোবর—তাহাতে নীলপদ্ম—পবনে সর্বদা এপাশে ওপাশে দুলিতেছে; এমন সময় কোনো 'গুরুভার' ভ্রমর মধুলোভে তাহাতে আসিয়া বসিল। নীলপদ্মটি তখন—সেই ভারে—একপাশে উলটিয়া পড়িল। এইবার দৃষ্টি দেওয়া যাক উপমেয়র প্রতি। দুইটি নয়ন—সদাই চঞ্চল, ভীরুতায় ও ঔৎসুক্যে—সহসা মনোহর-কিছু দেখিয়া, চাঞ্চল্য হারাইয়া, একপাশে হেলিয়া পড়িল, এবং সেইভাবেই রহিয়া গেল। কবির কাছে দুইটি চিত্র একেবারে একাকার হইয়া গেল।

এই উৎকৃষ্ট অলঙ্কারটির আস্বাদনে একটি জায়গায় মাত্র অসুবিধায় পড়িতেছি—অঞ্জন কিসের সঙ্গে উপমিত? অঞ্জনকে ভ্রমর ভাবা কি সঙ্গত? ভ্রমর থাকিয়া এখানে কোনো অসুবিধা করিতেছে না, কারণ স্বভাব-চঞ্চল নয়নের দীর্ঘ অপাঙ্গ চাহনির সঙ্গে ভ্রমরের ভারে নীলপদ্মের উল্টাইয়া যাওয়ার গোটা চিত্রটি একত্রে আস্বাদ্য। ভ্রমর কিসের উপমান তাহা জানিবার কোনো প্রয়োজন নাই। অথচ 'বঙ্ক নেহারণি'তে 'অঞ্জন শোভন তায়' বলিয়া কবি অঞ্জনকে যে পৃথক মর্যাদা দিয়াছেন, তাহাতে খুবই স্বাভাবিক ভাবে মনে হয়, কবি অঞ্জনের সঙ্গে ভ্রমরের তুলনাই দিয়াছেন।

রূপগত সাদৃশ্যের পূর্ণতা না থাকিলেও (অলঙ্কারে সকল সময় থাকার প্রয়োজন নাই, থাকেও না) ভ্রমর ও অঞ্জনের তুলনা যথেষ্ট সুন্দর। এখানে অঞ্জন বলিতে বিশেষভাবে নয়ন-প্রান্ত হইতে বাহিরের দিকে প্রসারিত অঞ্জনরেখাকেই বুঝাইতেছে। অপাঙ্গ চাহনির সময় যখন আঁখি-তারকা

নয়ন-প্রান্তে সরিয়া যায়, তখন সে যেন—কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে—কাজলের টানা দাগটির উপর আবেশমূর্ছিত হইয়া থাকে। কমল-প্রান্ত ধরিয়া যে ভ্রমরটি ঝুলিতেছে, তাহার সহিত তাই নয়নাঞ্জনরেখার তুলনা সার্থক।

নয়ন ও কাজল-বিষয়ক ভাবাত্মক উপমাটিতে দৃশ্যসৌন্দর্য কিছুই নাই। ভাবোল্লসিতা রাধা বলিয়াছেন—'দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি।' (৭৫৪) অর্থাৎ রাধা বলিতেছেন, তিনি প্রিয়-আবাহনে নিজের কাজল-রঞ্জিত আঁখিকেই কৃষ্ণের দর্পণ করিবেন। কাঁচের পিছনে কাজল লাগাইয়া দর্পণের সৃষ্টি করা হয়। রাধার কাঁচ-স্বচ্ছ নয়ন, কাজলে রঞ্জিত হইয়া তাহা দর্পণতুল্য হইয়াছে। রাধার গভীর নয়নের সন্নিহিত হইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, কৃষ্ণ আত্মহারা হইয়া যান—প্রেমের ঘনিষ্ঠ ক্ষণে সে জিনিস বার বার ঘটিয়াছে। সেই জিনিসকেই রাধা ভিন্নভাবে বর্ণনার দ্বারা ব্যঞ্জনায় সুগভীর করিয়া তুলিয়াছেন। ভাবসম্মিলনের ভাবাবস্থায় অভিমানশূন্য রাধা যেন বলিতে চান—রাধার নয়নশোভা দর্শন করিবার জন্য, কিংবা নয়ন-রহস্যে ডুব দিবার জন্যই কৃষ্ণ রাধার নয়ন-সম্মুখে আপনার মুগ্ধ নয়ন মেলিয়া থাকেন না—রাধার নয়ন-দর্পণে তিনি আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখেন। কেবল কি প্রতিবিম্বিত দেখেন নিজেকে? না, তাহারও বেশী-কিছু দেখেন তিনি—তিনি একটি অধিকতর সত্য-কৃষ্ণকে সেখানে দেখিতে পান, যাহাকে রাধা তাঁহার নয়নে চিরদিনের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছেন।

নয়ন ও অশ্রু

এখানে উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার পাওয়া উচিত ছিল—বৈষ্ণব কাব্য যেহেতু নয়ন-জলের কাব্য। কিন্তু তেমন বেশী পাওয়া যাইতেছে না। ২৪৬ পদের নয়ন কর্তৃক নব মেঘের মত বারিবর্ষণ বা চন্দ্র-করে কবলিত চকোরের তুল্য অমৃতবর্ষণ ইত্যাদি অলঙ্কার পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ১৮৪ পদে আছে, নয়নের অশ্রু ঝরিতেছে, যেন কমলের মধু ক্ষরিতেছে। কল্পনা গতানুগতিক। এক্ষেত্রে আমাদের প্রার্থনা—ঝরিয়া ঝরিয়া নয়নমধু যেন নিঃশেষ না হয়, "মধুহীন কোরো না গো তব 'আঁখি' কোকনদে।"

নয়নাশ্রুর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারগুলি পরে মিলিবে। নয়নের কাজল নয়নেই সমাপ্ত, কিন্তু নয়নের অশ্রু ঝরিয়া পড়ে রাধার বরদেহে, সেখান হইতে স্খলিত হইয়া—ধন্য-পৃথিবীতে। সমস্ত দেহের যৌগিক অলঙ্কার আলোচনাকালে সেইগুলি লক্ষ্য করিব।

নয়ন ও নাসা

২৬ পদে আছে—শুকপাখির উপর হরিণী। কিছু বলিবার নাই।

নয়ন ও হাসি

পূর্বেই ৩১ পদের এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি—

ঈষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বাণে ॥

হাসি কি নয়ন-বাণের বিষ? যদি তাই হয়, তবে এটি নয়ন ও হাসির যৌগিক অলঙ্কার।

নয়ন ও প্রেম

এইখানে একটি উৎকৃষ্ট পুরাতন অলঙ্কারের দেখা পাইতেছি। ৫৬৪ পদে স্বপ্নদৃষ্ট প্রিয়তমের নয়নপাতের বর্ণনায় নয়িকা বলিতেছে—"তাহার বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত, চন্দ্র উদিত হইলে যেন সমুদ্র উদ্বেলিত হইল" (৫৬৪)। নয়ন-চন্দ্রের কলাবিকাশে যে-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল, বলিতে হইবে না যে, তাহা প্রেম-সমুদ্র। কালিদাস চন্দ্রোদয়ারম্ভে ইবাম্বুরাশির কিঞ্চিৎ ধৈর্যলুপ্তির কথা বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণের নয়ন-বিকাশে রাধা-সাগর আরো একটু বেশী অধৈর্য। প্রেমজীবনে নয়নেন্দ্রিয়ের মূল্য, তাহার উদ্দীপনক্ষমতা, অলঙ্কারটিতে সুন্দরভাবে উদঘাটিত। খুব বেশী না হইলেও নয়নকে কখনো কখনো চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়; এই প্রথম (অন্ততঃ বিদ্যাপতির পদে)

নয়ন সন্ধ্যাকার চন্দ্রের গৌরব পাইল—পাইল সমুদ্রকে উদ্বেল করিবার চান্দ্র-সামর্থ্য।

(গ) ভ্রূ এবং—

ভ্রূ কার্যতঃ নয়নের অংশ। ইহাকে নয়নাকাশের দিগন্ত বলা যায় কিংবা নয়ন-প্রতিমার চালচিত্র কিংবা নয়ন-গবাক্ষের খিলান। অতএব ভ্রূ ছাড়া নয়ন নাই। রূপের ব্যাপারে ভ্রূ এতই মূল্যবান যে, আধুনিক সুন্দরীরা বিধাতার দানের উপর নির্ভর করিতেছেন না—তাঁহারা ভ্রূ চাঁছিয়া ভ্রূ আঁকিতেছেন।

ভ্রূ-কাজল : ভ্রূ-কাজল-কটাক্ষ : ভ্রূ-কটাক্ষ : ভ্রূ-অধর-দশন

ভ্রূ'র যৌগিক অলঙ্কারের সব কয়টি একত্রে বিচারের জন্য লইয়াছি, কবির কল্পনার একনিষ্ঠতাই তার কারণ। কবি ভ্রূ-বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া মূলতঃ একটি সদৃশ বস্তু ভাবিতে পারিয়াছেন—ভ্রূ হইল ধনু। ভ্রূকে ধনু করিয়া তাহাতে কখনো কাজলের গুণ চড়াইয়াছেন, কখনো বসাইয়াছেন কটাক্ষের তীর, এবং পুরুষের দর্প ও দৌরাত্ম্য চিরদিনের মত বিঁধিয়া শেষ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি অসহায়া নায়িকার সঙ্গে বাণবিদ্ধ হরিণীর তুলনা করেন। সেই বৈষ্ণব কবিই আবার হরিণীর নয়নবাণে বিদ্ধ পুরুষসিংহের অসহায়ত্ব দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রেমের জগতে হার-জিতে আছে 'মহান অনিশ্চয়তা'।

২৩২ পদে ভ্রূ ও কাজলের বর্ণনায় বলা হইল—মদন কাজলের ধনু জুড়িয়াছে; তার মানে মদন ভ্রূ-ধনুতে কাজলের গুণ জুড়িয়াছে। অলঙ্কারটিতে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বস্তু হইল রূপগত বাস্তবতা—উপরে বাঁকানো ভ্রূ এবং তলায় টানা কাজল অবিকল জ্যা-যোজিত ধনুর মতই বটে।

৩০১ পদেও একই কথা—কেবল, ভ্রূ-ধনু ও কাজলের গুণের সঙ্গে কটাক্ষের তীর যোগ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে তীর নায়িকা ছুঁড়িতেছে না; কবি মদনকে তীরন্দাজ করিয়া নায়িকার অধিকারহরণ করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন—মেয়েরা জানে না তাহারা কি করে।

আবার জানেও বটে। যেমন ৪৭৮ পদে অস্ত্রশস্ত্রের যুবতীর যুদ্ধযাত্রার সম্ভ্রমদ্যোতক বর্ণনা কবি করিয়াছেন। নব-যৌবনবতী নায়িকা নানা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে চক্ষুতে গুণ দিয়া কটাক্ষকে শর করিয়া ধাইয়া আসিতেছে। অতএব সাবধান।

সত্যই নায়কের সাবধান হওয়া উচিত। কটাক্ষ-শরে তাহার অব্যর্থ সুন্দর মরণের এক চমৎকার রূপ আঁকিয়াছেন কবি। ১৭ পদের প্রাণহারী অলঙ্কারে কবি বলেন—"তাহার ভ্রূ—ধনু এবং কাজল-রেখা—গুণ ; এমন নয়নশর মারে যে, পুচ্ছমাত্র অবশিষ্ট থাকে।"

সর্বনাশ, প্রাণনাশ! নায়িকার নয়ন-শরে এত শক্তি!—সমস্ত বাণটি ভিতরে প্রবেশ করিয়া যায় এবং পুচ্ছটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আরো বিপদের কথা—এই পদে নায়িকার সদ্য যৌবনোন্মেষের বিবরণ—এখনো তাহার বালিকাস্বভাব যায় নাই, অথচ নানা বিপজ্জনক অস্ত্র আয়ত্তে আসিয়াছে ; নূতন অস্ত্রসম্পদ লইয়া সে অরক্ষিত কৌতূহলে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে ও দু'একটা ছুঁড়িয়া দেয়। তাহার নয়নে যে যে অস্ত্র আছে তাহার রূপ সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—মদন সেখানে নিজের শেষ দুই বাণ গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন—সে এমন নয়নশর মারে যে, পুচ্ছটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পুচ্ছ অবশিষ্ট থাকে কথার মানে কি ? সাধারণ অর্থ, পুচ্ছ ছাড়া সমস্ত শরটি ঢুকিয়া যায়। আরো একটু জিনিস আছে। চিত্রটি ভাবিয়া লইতে বলিব। কটাক্ষ করিবার পূর্বে নয়নশর উন্মুক্ত ছিল ; অর্থাৎ নায়িকা খোলা চোখে চাহিয়া ছিল ; তারপর কটাক্ষ করিল। কটাক্ষ করিবার সময় চোখ চকিতে প্রান্তে বুজিয়া যায়—তখন অক্ষিতারকা দেখা যায় না এবং দুই আঁখিপাতের পক্ষ্মলোম জুড়িয়া একত্র ঘন হইয়া থাকে। কবি সেই কুঞ্চিত নয়নের পক্ষ্মলোমকে নয়নশরের পুচ্ছ বলিতেছেন। এখানে চিত্রকল্পের পূর্ণতা।

৫৬০ পদে নয়ন-চন্দ্রের ক্ষণবিকাশ এবং তাহাতে প্রেম-সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের রূপ পূর্বে দেখিয়াছি। এই অংশের ঠিক আগে নায়িকা স্বপ্নে প্রিয়সমাগমের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছে—"ধনুগুর্ণ দেখি না, সন্ধান দেখি না—(অথচ চারিদিকে কুসুম-বাণ পড়িতেছে)।" এই অংশের পরেই

নায়কের নয়নের বর্ণনা যেহেতু আছে, তাই মনে হয়, নায়িকা আসল ধনুর্বাণ বা শরসন্ধান না দেখিলেও নায়কের ভ্রূ-ধনু, কাজল-গুণ ও কটাক্ষ-তীর দেখিয়াছিল। বিদ্যাপতি নয়নবাণকে কুসুমবাণ বহুবার বলিয়াছেন।

তবে আমাদের মনে হয়—এইরূপ স্পষ্ট আলঙ্কারিক কল্পনা এখানে না আনাই ভাল। না আনিলে বাসনাবিহ্বল নায়িকার বিস্ময়ের চমক আরো প্রকাশিত হয়।

২৯৯ পদের কল্পনা গতানুগতিক। অধরের বিম্বফল ও দশনের দাড়িম্ববীজ দেখিয়া নয়ন-শুকের লোভ হয়, কিন্তু ভ্রূ-ধনু দেখিয়া আগাইতে সাহস করে না। ভাগ্যে ভ্রূ ধনু ছিল! নহিলে সকল নারীর নাক ঠোঁটে ঝুলিত।

দেখিলাম, ভ্রূ'র একটি মাত্র উপমান। তাহাকেই নানাভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। বিদ্যাপতির পক্ষে বলা যায়, প্রতিবার আমরা হয়ত নূতন কল্পনা পাই নাই, কিন্তু প্রয়োগকৌশলের গুণে আস্বাদনের নবত্ব অনুভব করিয়াছি।

(ঘ) অধর এবং—

অধরের সঙ্গে দশনের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। অধরের বসনে দশনের বেশ। অধরের পত্রপুট দশনের দাড়িম্বকে ঢাকিয়া রাখে। সুতরাং অধরের যৌগিক অলঙ্কারে অধর ও দশনের কথাই মুখ্যত্ব পাইবে বলিতে হইবে না।

অলঙ্কারগুলি কৃত্রিম সৌন্দর্যে পূর্ণ। প্রেম-মনস্তাত্ত্বিকেরা জানাইয়াছেন, অধর-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ উন্নততর সভ্যতার সৃষ্টি। এবং সভ্যতা কৃত্রিম, বহুলাংশে। অধর-দশনের অলঙ্কারিক কল্পনাও তাই। কালিদাস শকুন্তলার অধরে প্রকৃতির কিশলয়রাগের বর্ণ-সৌকুমার্য দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতিও দু'একবার নব-পল্লবের সঙ্গে অধরের তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রবাল ও বিম্বের রূপেই তিনি মুগ্ধ। নিসর্গজগতে বিম্ব সর্বাপেক্ষা নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম।

অন্যান্য তুলনাও আছে—অধরের সঙ্গে চন্দ্রের ও সিন্দূরের, এবং দশনের সঙ্গে মুক্তার; সাধারণ মুক্তা ও গজমুক্তা। একবার কুন্দের সঙ্গে দশনের তুলনাও পাইতেছি। কুন্দ-দন্ত অবশ্য বৈষ্ণবসাহিত্যে সাধারণ বর্ণনা। অধর-দশন-মূলক অলঙ্কারগুলি উদ্ধৃত করা যাক—

"বাছিয়া বাছিয়া জ্যোতির্ময় তারা দিয়া যেন হার গাঁথা হইয়াছে। অধররূপ সুন্দর চন্দ্রে যেন মুক্তা বসান হইয়াছে।"—(৪৮)

"অধরের সীমায় নয়নের জ্যোতি উজ্জ্বল হইবে, সিন্দুরের প্রান্তে যেন মুক্তা বসান হইয়াছে।" (২৯)

"অধর নয়নপল্লব এবং দশম দাড়িম্বজ্যোতির তুল্য—যেন সুধারসে সিক্ত প্রবালদলের মধ্যে গজমুক্তা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।" (৩০)

"প্রবাল-পল্লবে কুন্দফুল ফুটিল।"—(২৩১)

প্রথম উদ্ধৃতিতে দন্তের একটি একক বর্ণনা আছে—খুবই চমৎকার—দাঁতগুলি সুনির্বাচিত জ্যোর্তিময় তারার হার। তারপর অধরকে চন্দ্র করিয়া তাহাতে দাঁতের মুক্তা বসানো হইল। মুক্তাবসানো একটি চাঁদ দেখিতে কার না সাধ হয়।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে পাইতেছি—মুক্তাবসানো সিন্দুর—ব্যাপারটা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে কবি অধরের সঙ্গে নবপল্লবের এবং দশনের সঙ্গে দাড়িম্বজ্যোতির তুলনা করিয়া তৃপ্তি পাইয়া উহারই সঙ্গে আরো কিছু জুড়িয়া দিয়াছেন। সুধারসে সিক্ত প্রবালের উপর বিক্ষিপ্ত গজমুক্তা দর্শনে আনন্দ পাইতে হইলে নিজ কল্পনাকে পীড়ন করিতে হইবে পাঠককে। এবং যদি তেমন কল্পনাশক্তি থাকে তাহা হইলে প্রবালের পল্লবের উপর ফুটন্ত কুন্দ ফুলগুলি সত্যই সুন্দর মনে হইবে।

অধরের সঙ্গে যুক্ত বেণীর একটি অলঙ্কার পাইতেছি—"অধরের লোভে বিষধর নামিয়া আসিল, সাপকে ফিরিয়া ধরিতে চাহিলাম" (২৪২)। কৃষ্ণকে দেখিয়া মদনপীড়িতা রাধার ঐ উক্তি। দেহচাঞ্চল্যে মাথার বেণী মুখে পড়িয়াছে এবং রাধিকা তাহাকে সরাইতে চেষ্টা করিতেছেন—এইরূপ একটি অবস্থার বর্ণনা। বেণীর সঙ্গে সর্পের তুলনা বৈষ্ণবসাহিত্যে পরিচিত, এবং সর্পও 'মানুষ', তাহারও লোভ আছে—অধরের সুন্দর ফলটির বিষয়ে সে কামনা বোধ করিতে পারে। এই আলঙ্কারিক চাতুর্যের প্রশংসা করিতে পারিতাম, যদি কথাগুলি রাধার নিজের মুখে বসান না হইত। নিজের রূপযৌবনের বর্ণনায় রাধা অনাবশ্যক নিরপেক্ষ সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন ॥

(ঙ) দশন এবং—

দশন ও হাসির সম্পর্ক আছে দুইটি অলঙ্কারে—

"হাস্য-বিলাসিনীর দন্তপংক্তি দেখিয়া মনে হয় যেন তরলিত জ্যোতি।" (৪-ক)

"হাসি-সুধারসকে উজ্জ্বল করিও না, কেন না বণিক ও ধনী বলিবে এ ধন (দশন রূপ মুক্তা) তাহাদের।" (২৯)

দাঁতের উপর হাসির আলো বণিকের—ধনিকের—কবির—ও পাঠকের মাথা ঘুরাইয়া দেয়।

(চ) কেশ এবং—

সুন্দরী নারীর কেশের বর্ণনায় এদেশে বলা হয়, আগুল্‌ফলম্বিত কেশ। মাথার উৎস হইতে নির্গত হইয়া কেশ-নদী দেহের মহাদেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া এক অপূর্ব অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হয়। সুতরাং কেশ মুখমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে না; কেশের অলঙ্কারও তাই। সমস্ত দেহের উপর কেশের মেঘবিস্তার। কেশের বসনে অঙ্গ ঢাকিতে নায়িকাকে দেখিয়াছেন কবিরা। তাই যদি হয়, সমস্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাঁহারা কেশের অলঙ্কার রচনা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন কেশ-নদীর কোনো কোনো শাখা পিঠের প্রশস্ত ভূমি ত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে দুর্গম গিরিপথে গমন করিয়াছে—এমন দৃশ্য ভারতীয় কবি সন্ধানীর চোখে দেখিয়াছেন বারবার। কেশ ও পয়োধর তেমন কয়েকটি সুন্দর অলঙ্কারের আধার।

মুখমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেশের যৌগিক অলঙ্কারও পাওয়া যায়—এবং উচ্চশ্রেণীর জিনিসই পাওয়া যায়। কেশ ও কুসুম-বিষয়ক সেইরূপ দুইটি অলঙ্কারের আলোচনা শুরুতেই করা যাক—

কেশের কুসুম মুক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, (যেন) অন্ধকার পূজা সমাপন করিয়া তারাপুঞ্জ ত্যাগ করিল।" (৪৯৫)

"করে কুচ ধারণ করিতে নারী আকুল হইল, দেখিয়া মুরারি অধরমধু পান করিল। চামরের ন্যায় চিকুর হইতে কুসুমের ধারা ঝরিতে লাগিল, উহা যেন অন্ধকার পান করিয়া এব তারারাজি বমন করিতে লাগিল।" (৮৫৫)

প্রথম উদ্ধৃতির অলঙ্কারে কেশের স্খলিত কুসুমের সঙ্গে—অন্ধকার কর্তৃক পূজার পর তারকা-ফুল ত্যাগের তুলনা করা হইয়াছে। আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় কল্পনা। অন্ধকার পূজা করে! কাহাকে কে জানে, তবু পূজা করে। পূজা করে তারকার ফুলের দ্বারা। কবি অন্ধকার রাত্রে তারাখসা দেখিয়াছেন একই সঙ্গে। কল্পনা করিয়াছেন—একটি নয়—অজস্র তারকা ঝরঝর করিয়া খসিতেছে। সেই কল্পনা আরোপ করিয়াছেন এক কেশনিশার পুষ্পতারা খসার উপর।

এই পদ বিপরীত রতির। কবি এখানে দেহের অলজ্জতাকে অলঙ্কারে ঢাকিতেছেন। নরনারীর মুক্ত কামনাকে ঢাকিয়াছে কেশের নিবিড় আবরণ। তাহারই তলে গোপনগভীর দেহপূজা এবং পূজান্তে কুসুম-তারকার বর্ষণ।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির অলঙ্কারও অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন। আলিঙ্গনত্রস্ত দেহের কেশপাশ হইতে কুসুম খসিতেছে। কবি দেখিলেন কেশ অন্ধকার পান করিয়া তারকা বমন করিতেছে। এইটুকু কথায় কবি কতখানি না বলিলেন! ইহাতে একদিকে কেশের ঘনকৃষ্ণত্ব সূচিত হইল—অন্ধকার পান করিয়া কেশের বর্ণ-বলাধান হইয়াছে; অন্যদিকে কেশ সত্যই নিশ্চন্দ্রতারকা-বিভাবরীর সমরূপতা পাইল। যতক্ষণ কুসুমালঙ্কৃত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত কেশ-রাশি ছিল তারকা-খচিত, এখন কৃষ্ণালিঙ্গনের গভীর অন্ধকারে প্রস্থানের কালে রাধার ঘনকেশ তাহার শেষ আলোকবিন্দুটিকে পরিহার করিল। তাছাড়া চিত্ররূপের দিক হইতে ঐ তারকা-বমন কল্পনাটি কি সুন্দর! কেশ অন্ধকার পান করিয়াছে—তাহা যেন সত্যই তরল কিছু—কিন্তু ঐ গভীর তরল পানীয়ে তারকাগুলি অবাঞ্ছিত কঠিন বস্তু—সেগুলিকে সহ্য করিতে না পারিয়া বমনে উদ্‌গিরণ করিয়া দিতেছে। ইহাকে বলে অলঙ্কারের সৌন্দর্য।

কেশ ও সিন্দুর-বিষয়ক একটি অলঙ্কারও উল্লেখযোগ্য—

"মদনের বিলাস-কাননরূপ কেশে সিন্দুরের রেখা, যেন সুন্দর নিবিড় মেঘের ভিতর হইতে অরুণ নিজের দেহ দেখাইতেছে" (৩০)।

এই অলঙ্কারের দুই অংশ—(১) কেশ হইল মদনের সুন্দর বিলাস [illegible] এবং তাহাতে সিন্দুরের রেখা আছে, (২) তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন নিবিড়

সুন্দর মেঘের ভিতর হইতে অরুণ নিজ দেহ দেখাইতেছে। প্রথম অংশে কেশকে মদনের বিলাস-কানন-রূপে বর্ণনার প্রশংসা করিতে হয়। কেশ স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগের পদার্থ নয়, ইহার সৌন্দর্য অনেকাংশে অবিমিশ্র। তবু কবি ইহাকে মদনের বিলাসকাননরূপে দেখিয়া মদনের রুচি-চারুত্ব দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় অংশে কেশকে ঘন মেঘ এবং সিন্দূরের রেখাকে প্রথমোদিত সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সিন্দূরের সঙ্গে সূর্যের তুলনা বহুবার বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায়, এবং সেটিকে অসঙ্গত তুলনার দৃষ্টান্তরূপেই বিবেচনা করিয়াছি। বিশাল সূর্যের সঙ্গে তুলনায় সুন্দর সিন্দূরবিন্দুটির ক্ষতি হইয়াছে। এই একটি অলঙ্কারে সেই অন্যথা-অসঙ্গত অলঙ্কারটি শোভনতা পাইয়াছে। এখানে সিন্দূররেখা সূর্য নয়—প্রথম সূর্যের আভাস। মেঘের ভিতর হইতে বিস্তারিত অরুণের একটি রক্তচ্ছটাকে যদি কবি ঘনকেশের সিন্দূরচ্ছটার সঙ্গে তুলনা করেন, তবে তিনি অন্যায় কিছু করেন নাই।

কেশ ও জলের দুইটি যৌগিক অলঙ্কার,—৬২৬ পদে চিকুরের জল দেখিয়া কবির মনে হইয়াছে—মেঘ মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে। এখানে সত্যের কল্পনা নয়, কল্পনাকে সত্য করিবার চেষ্টা। ৬২৭ পদে ঐ একই ব্যাপার দেখিয়া কবি যখন বলেন, চামরে মুক্তাহার ঝরিতেছে—তখন কল্পনা নিতান্ত গতানুগতিক।

কৃষ্ণের চূড়াবদ্ধ কেশের উপর ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া কবির মনে প্রথাবদ্ধ কল্পনা আসিয়াছে—ময়ূর সাপিনীকে (চূড়াকেশকে) আচ্ছাদিত করিয়াছে (৬৩০)।

বক্ষদেশ

(এই অংশে কুচ, কাঁচুলী, হার, পঞ্জর, গ্রীবা, কণ্ঠ, কণ্ঠস্বর, বচন, হাত, নখ, নখরেখা, করতল, হস্তাঙ্গুলি—এই সকল যুক্ত করা হইয়াছে)

কুচ

ভারতীয় কাব্যে বক্ষ-বর্ণনার আতিশয্য-বিষয়ে পূর্বেই মন্তব্য করিয়াছি। এদেশের কবি হৃদয়ের কথা বলিবার সময় ভিতরের হৃদয়ের সঙ্গে বাহিরের হৃদয়ের কথা বলিতে ভোলেন না। আধুনিক কাব্য-সমালোচকদের অভিযোগ হইল, পুরাতন কবিরা হৃদয়ের বাহির দুয়ারের রূপৈশ্বর্যে স্তম্ভিত হইয়া সেখানেই লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন, ভিতরে প্রবেশের প্রয়োজন বহু সময় বোধ করেন নাই।

বিদ্যাপতি তেমন একজন মুগ্ধ কবি। সকল দেহাঙ্গের মধ্যে বক্ষাঙ্গের অলঙ্কার তাঁহার রচনায় সংখ্যাগুরু। উৎকর্ষও উল্লেখযোগ্য।

কুচ সম্বন্ধে অলঙ্কারের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মতো। অলঙ্কারশাস্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যাপতির কল্পনা নানা নূতন পথে গমনের চেষ্টা করিয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্র নিজস্ব-ভাবেও কুচ সম্বন্ধে বহুবিধ কল্পনায় সমৃদ্ধ। কাম-জীবনে নারীবক্ষের মূল্যকে স্বীকার করিয়া অলঙ্কারশাস্ত্র বাস্তববোধের পরিচয় দিয়াছে।

কয়েকটি পদে কুচ সম্বন্ধে উপমানের তালিকা পাইতেছি—

৮৯ পদে—বেল, তালযুগল, সুবর্ণকলস, গিরি, কটোরি (বাটী)

২৬৪ পদে—কাঁচা সোনার ঘট ; শ্রীফল (বেল), বাটী ;

৬২১ পদে—পদ্মকোরক, ঘট, দাড়িম্ব, শ্রীফল, শম্ভু ;

অর্থাৎ—বেল, তাল, ঘট, বাটী, কলস, দাড়িম্ব, পদ্মকোরক, শম্ভু, গিরি। জিনিসগুলি প্রায়ই কাঁচা সোনায় তৈয়ারী। কুচের অন্যান্য অলঙ্কারও আছে, পরে আলোচনা করিব, এখন গতানুগতিক উপমান ধরিয়াই বিচার করা যাক।

শ্রীফল অর্থাৎ বেলের সঙ্গে শিব-শম্ভুর ভাব-সম্পর্ক আছে। বিদ্যাপতি বেল এবং শিব—দেবতা এবং দেবতার পূজাদ্রব্য—উভয়কেই তাঁহার নায়িকার বক্ষে দেখিয়াছেন। শ্রীফলের উপমানের দৃষ্টান্ত—

"স্বর্ণের সুন্দর শ্রীফল কাটিয়া অর্ধেক করিয়া কুচযুগল গঠন করিয়াছে"—(১৩০)

"হীরা মণি মাণিক্য প্রভৃতি নানা অতুলনীয় রত্ন বিক্রয় হয়। এক সাথে দুই সোনার মত শ্রীফল। অধর আছে আর অঞ্চলে শ্রীফল আছে। অধরের দামই বেশী।"—(২২২)

"কোমল কামিনীর দুই শ্রীফলের ছায়ায় নিজেকে শোয়াইলে।"—(৬০৭)

"ধনীর ক্ষীণ মধ্যদেশ কুচরূপ শ্রীফলের ভরে যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে"—(৯০২)

প্রথম এবং চতুর্থ উদ্ধৃতির বিষয়ে বলিবার কিছু নাই। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তব্য দেখা যাইতেছে। সেখানে রাধার অতুলনীয় দেহসম্পদের সেরা দুইটি রত্নরূপে অঞ্চলাবৃত শ্রীফলের কথা বলা হইলেও অধরের সঙ্গে তুলনায় কুচকে গৌণমূল্য করা হইয়াছে। কবি এইরূপ করিলেন কেন—চুম্বনের মধ্যে বৈদগ্ধ্য বেশী, আর কুচ শুধুই কামনার সম্পদ—এইজন্য কি ?

তৃতীয় উদ্ধৃতির বিষয়ে বলা চলে, এখানেও কুচের দৃশ্য-রূপ অপেক্ষা কাম-রূপকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভোগের একটি 'অবস্থান' অলঙ্কারটিতে ফুটিয়াছে।

নায়িকা-বক্ষে স্থান পাওয়া শম্ভুর পক্ষে ভাগ্য না দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা স্বয়ং শম্ভুই বলিতে পারেন, কিন্তু শৈব বিদ্যাপতি তাঁহার সর্বচারী দেবতাকে নায়িকার হৃদয়ে দেখিতে লজ্জা পান নাই। নায়ক-নায়িকার পক্ষেও শম্ভুর ঐ নিকট অবস্থান প্রয়োজনীয়। কুচকে কবিরা শম্ভু বলিয়া থাকেন, নায়ক তাহারই সুযোগে নায়িকার কুচশম্ভু স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিবার প্রতিজ্ঞা করিতে পারিয়াছিল, এবং নায়িকা, দেবতাকে স্পর্শ করিয়া ঐ বাগ্‌দান বলিয়া নায়কের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল—"আমার কুচযুগরূপ শম্ভু স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিল, তাই আমার বিশ্বাস হইল" (১৬৪)। কবিকল্পনায় নায়িকার আস্থার সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে মিলিতেছে। তাহার কুচযুগ যে শম্ভুর মতো, একথা নায়িকা কবির প্রতি বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাস করে।

নায়ক অবিরত এই শম্ভুর করুণাপ্রার্থী। কখনো স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, কখনো আকুলভাবে শরণ প্রার্থনা করে—"এই তিন জগতে বিমল যশ গ্রহণ কর, কুচযুগরূপ শম্ভুর শরণ আমাকে দাও।" (৩৩৯)

নায়িকাবক্ষে স্থান পাওয়ার যন্ত্রণাও কম নয়। প্রেমের এমন সব অবস্থা আছে, যখন চেষ্টা করিয়া শম্ভুকে ধ্যানস্থ হইতে হয়। নিজ শক্তি মহাকালীর কাণ্ড দেখিয়া একবার শিব শব হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-শক্তি রাধার বিপরীত কাণ্ডেও তিনি ধ্যানস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাপতি জানাইয়াছেন। বিপরীত রতির বর্ণনায় বলা হইয়াছে—"শম্ভু যেন সমাধিস্থ হইয়া মুখ নীচু করিয়া রহিয়াছে।" (৪১৫)

কুচের সঙ্গে শম্ভুর তুলনামূলক উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারগুলি যৌগিক অলঙ্কার অংশে মিলিবে।

তাল জিনিসটি কিছু সুন্দর নয়। কবিও কুচের উপমানরূপে তাল লইয়া বাড়াবাড়ি করেন নাই। তালকে তিল করিয়াছেন বুদ্ধিমানের মতো। এবং তিনি ঘটের কথাও বেশী বলেন নাই। একবার মাত্র মোহিত মনে নব-যৌবনাসীনা বালিকার হৃদয়ে কামকর্তৃক ঘটস্থাপনের দৃশ্য দেখিয়াছেন (৬১৩)। কবির বিশেষ আকর্ষণ ছিল দুইটি স্বর্ণ তৈজস পাত্রে : কলসে ও বাটীতে। ইহাদের প্রভূত ব্যবহার মেলে বিদ্যাপতির কবিতায়। কলসের দৃষ্টান্ত তোলা যাক—

"কন্দর্প আমার কুচকুম্ভ সুবর্ণে নির্মাণ করিল, আলিঙ্গন করিতে মনে হইবে ভাঙ্গিয়া যাইবে।" (৫২, ৩৪০)

"আধঢাকা আধখোলা কুচকুম্ভ আপনার আশা বলিয়া গেল।" (২৩০)

"কুচকুম্ভের উপর রোমাঞ্চ হইতেছে।" (৩০৯)

"কুচযুগল কাঞ্চন-কলস সমান, মুনিজন দেখিলেও তাহাদের জ্ঞান হয়।" (৪৩৯)

"একে অন্ধকার রাত্রি, পথ পিচ্ছিল, কুচযুগল কলসী করিয়া যমুনা পার হইল।" (৪৪৪)

প্রথমেই সরস পয়োধর-কুম্ভ স্পর্শ করিয়া আগ্রহবশে কত না আলিঙ্গন করে।" (৪৮৮)

"(গোকুলপতি) বিরহ-সিন্ধু মধ্যে ডুবিতেছে, তুমি গুণবতী ধনী, তোমার কুচকুম্ভে লক্ষ্য প্রদান করিতে দিয়া গোকুলপতিকে উদ্ধার কর।" (৬৬৪)

নিজ দেহে সমস্ত মঙ্গল করিব, কুচযুগ সুবর্ণ-কলস করিয়া রাখিব।" (৭৫৪)

অলঙ্কারগুলিতে লক্ষণীয় বস্তু হইল, কুচ ও কলসের বাহিরের রূপের সাদৃশ্য দেখাইতে কবি বিশেষ ব্যস্ত নন, তিনি গৃহসংসারে কলসের সাধারণ

ব্যবহারের প্রকৃতিকেই স্মরণ রাখিয়াছেন অলঙ্কার-প্রয়োগের সময়। কলসের একটি ব্যবহার—মেয়েরা কলস লইয়া জলে ভাসে (রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও)। সখী, বিরহিণী রাধার জন্য কৃষ্ণের করুণা চাহিয়া বলিয়াছে, রাধা কুচযুগলকে কলসী করিয়া অন্ধকার রাত্রে যমুনা পার হইয়া আসিয়াছে। রাধার মত অবস্থা কৃষ্ণেরও হইতে পারে। বিরহসিন্ধুতে নিমজ্জমান কৃষ্ণের জন্য রাধার কাছে সখীর অনুরোধ—হে গুণবতী, কুচকুম্ভ অবলম্বন করিতে দিয়া ডুবন্ত মানুষটিকে বাঁচাও। এই দুইটি অলঙ্কারের মধ্যে ভাবের পার্থক্য লক্ষণীয়। বেদনাময় অভিসারযাত্রার কালে রাধা কুচযুগলকে কলসী করিয়া সত্যই যমুনায় ভাসিয়াছেন। একটি মেয়ে আকুলভাবে নদী সন্তরণ করিতেছে —সখীর করুণাকাতর কণ্ঠে তাহারই চিত্ররূপ। কুচযুগলকে কলসী করিয়া নদী-সন্তরণের মধ্যে অসহায়তার ব্যঞ্জনা অপূর্বভাবে ফুটিয়াছে। অপরদিকে ঐ বিরহ যখন কৃষ্ণের—কৃষ্ণ যখন বিরহ-সিন্ধুতে ডুবিতেছেন—তখন কুচকুম্ভের অবলম্বন দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে বলার মধ্যে কল্পনার চতুরতাই বেশী—কুচকুম্ভ সেখানে কামার্ত পুরুষের জীবনের অবলম্বন—অলঙ্কারের সাহায্যে ভোগকামনা ব্যক্ত করাই কবির অভিপ্রায়। সুতরাং একই 'কলস' দুই অলঙ্কারে দুই ভিন্ন ভাবের প্রকাশক।

এই কলসকে আবার গৃহস্থ-গৃহের পূজাঙ্গনে মঙ্গল-কলসরূপে ব্যবহার করা হয়। রাধাও তাই নিজ দেহাঙ্গনে যখন প্রিয়-পূজা করেন, তখনো এই কলস মঙ্গল-কলসের স্থান নেয়। শেষ উদ্ধৃতিতে তাহা দেখিতেছি। আরো আছে—মঙ্গল-কলসের উপর আম্রপল্লব থাকে। কবি স্তনবৃন্তকে আম্রপল্লবরূপে বর্ণনা করিয়া কল্পনাপরিধি সম্পূর্ণ করিয়াছেন (৭৫৫)।

কলসের সাংসারিক ব্যবহার-রূপের মতই সৌন্দর্যরূপও কবির স্মরণে ছিল। কাঞ্চনকলস দর্শনে মুনিগণের জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনার কথা কবি বলিয়াছেন। সবচেয়ে সুন্দরভাবে কুচের প্রাণরহস্যের কথা বলিয়াছেন দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে। 'আধ-ঢাকা আধ-খোলা কুচ আপনার আশা বলিয়া গেল'—নবযৌবনা নায়িকা-সম্বন্ধে বর্ণনা। কত যথার্থ এই বর্ণনা, যেখানে সদ্য-জাগ্রত দেহ ও সদ্য-জাগ্রত মনকে এক করিয়া কবি দেখিলেন। নবযৌবনপ্রাপ্ত বালিকাটির মনে আশার মুখরতা, দেহেও তাই—দেহের যৌবনমুখে কামনার কণ্ঠধ্বনি। এই নায়িকা পূর্বরাগের, তাই মন এবং

দেহ সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠ নয়। কবি বলিয়াছেন—'আধ-ঢাকা আধ-খোলা কুচকুম্ভ'।

স্বর্ণকলসের পর আসে সোনার বাটী। 'কনক কটোরা'য় বিদ্যাপতির পদভাণ্ডার পূর্ণ। কলসের ক্ষেত্রে কবি উহার ব্যবহার-রূপকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন অলঙ্কারে, সোনার বাটী কিন্তু সৌন্দর্য-সম্পদরূপেই কাব্যে সংগৃহীত। রাধা দুইটি সুবর্ণ-বাটীর অধিকারিণী হইয়া কবিচিত্তে কিরূপ স্ফূর্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, নিম্নের উদ্ধৃতিগুলিতে তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে—

"আমার কুচ স্পর্শ করিও না, পর্বতময় সুবর্ণের বাটী ভাঙিয়া যাইবে।" (৫৩)
"তোমার গৌরবর্ণ পয়োধর অতিশয় বঞ্চিত হইল, যেন সোনার বাটী মাজিয়া রাখিল।"(৬৯)
"বারবার বিহ্বল হইয়া আমার কুচ স্পর্শ করিল, যেন নির্ধন সোনার বাটী পাইল।" (৭৬)
"গৌরবর্ণ স্তন মদনের ভাণ্ডার, যেন উপুড় করা সোনার বাটী।" (৩০৩)
"একে দেহ গৌরবর্ণ, স্থূল কাঁচুলী সোনার বাটীর তুল্য।" (৬২৪)*
"তাহাতে কুচযুগল উদিত হইল—সোনার বাটী উল্টাইয়া বসাইয়াছে।" (৬২৬)

কুচ কনক-কটোরারূপে রূপের ও রসের ভাণ্ডার। রস-ভাণ্ডার মানে মদন-ভাণ্ডার। কবি অন্যত্রও মদন-ভাণ্ডার বলিয়াছেন কুচকে। যেমন—"পীন পয়োধরভার মদনরাজার ভাণ্ডার, তাহার শীর্ষে রত্নহার জড়ানো রহিয়াছে" (৪৮), এবং "স্বর্ণকলস সঞ্চিত কামদেবের ভাণ্ডারের (ন্যায়) রসে পরিপূর্ণ" (৩০৩)। পূর্বে উদ্ধৃত অংশে দেখা গিয়াছে কুচ সম্বন্ধে অলঙ্কার দিতে কবি অতিশয়োক্তির চরম করিয়াছেন—'পর্বতসম সুবর্ণের বাটী'। পর্বতের মত বাটীর কল্পনায় অসঙ্গতি থাকিতে পারে, কিন্তু পর্বতের সঙ্গে কুচের রূপ-

* এই অনুবাদের মূল হইল :—

একে তনু গোরা কনক-কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।

আমি সংস্করণের অনুবাদ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু অনুবাদ কি যথার্থ? ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করিতে পারি এইভাবে—একে গৌরবর্ণ তনু, (তাহাতে) কনকের কটোরা, এবং (তাহাতে) কামতুল্য কাঁচুলী। আক্ষরিক অনুবাদের সমর্থনে কিছু যুক্তি উপস্থিত করা যায়। বিদ্যাপতি কয়েকটি পদে কুচকে বলিয়াছেন 'মদনের ভাণ্ডার'। মদন আপন ভাণ্ডার রক্ষা করিতে চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক—কাঁচুলীরূপে কুচকে জড়াইয়া

পরের পাতায়

সাদৃশ্য যখন কবিরা অনুভব করেন, তখন তাহার অতিশয়োক্তি কাব্যসঙ্গতিকে অতিক্রম করে না। ধরণীর স্তনরূপে পর্বতের কল্পনা এদেশে পুরাতন। রাধার দেহ-ধরণীর পর্বতকল্পনাও কবির পক্ষে অন্যায্য নয়। তাছাড়া কবিরা বারংবার গুরুভার যৌবনের কথা বলিয়াছেন—স্বতঃই ভারগুরু পর্বত উপমানরূপে উপস্থিত হয়। এইরূপ অলঙ্কার—

"কুচমণ্ডলের শোভা দেখিয়া কনকগিরি লজ্জায় দিগন্তরে গেল, এইরূপ কেহ কেহ বলেন।" (২৪)

"(বিরহে) আশাসমূহ দ্রুত পলায়ন করিল, সোনার পাহাড় যেন পুড়াইয়া গেল।" (৫৪১)

"(বিপরীত রতি) প্রভু কুচযুগলে পর্বত মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে পাছে প্রবেশ করে এই ভয়ে তাহাতে হাত দিলেন।" (৬৯৯)

"কুচযুগকে সুন্দর পাহাড় ভাবিয়া সে আশঙ্কা করিল যে বুঝি তাহার হৃদয়ে পড়ে, তাই সে হাত দিয়া ধরিল।" (৪৯৩)

কবি কখনো কখনো পার্বত্য পয়োধরের আকার-বিশালতা কিছু কমাইয়াছেন। সেক্ষেত্রে পয়োধর পাথর হইয়াছে। জয়দেবের কৃষ্ণের মতই বিদ্যাপতির অপরাধী কৃষ্ণও হৃদয়ের কারাগারে পয়োধরের পাথর বুকে চাপাইয়া লইবার মত কঠোর শাস্তি স্বেচ্ছায় চাহিয়াছেন। (৬৪৭)

পর্বতের সঙ্গে পয়োধরের তুলনা—আকারের, গুরুভারের বা কঠিনতার—যে-জন্যই কবি করিয়া থাকুন, ঐ পর্বত সকল ক্ষেত্রেই সুবর্ণের, এবিষয়ে তাঁহার কোনো সংশয় ছিল না। এমন কি পয়োধর যখন পর্বতাকার নয়, তখনো সোনার। বর্ণ ও লাবণ্যের বর্ণনার জন্য কবিকে কাঁচা সোনার দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে বারবার। কবি সুস্মিত বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে একবার জানাইয়াছিলেন—রাধার মুখ সৃষ্টি হইয়াছিল পূর্ণিমার চাঁদে সোনা কষিয়া। চাঁদের উদ্বৃত্ত অংশ হইতে তারার এবং সোনার উদ্বৃত্ত অংশ হইতে পয়োধরের

মদন তাহাই করিতে চাহিয়াছে। মদনের সঙ্গে কাঁচুলীর তুলনা এই ভাবে সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের এই পদে রূপাহত কৃষ্ণ নিজের উপর অনঙ্গের আক্রমণের কথাই পরপর বলিয়া যাইতেছেন; প্রথমে বলিয়াছেন—"আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি তবধরি দগধে অনঙ্গ"; তারপর—"একে তনু গোরা কনক-কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম";তারপর —"হার হরল মন, জনি বুঝি ঐসন, ফাঁস পসারল কাম",—এক্ষেত্রে 'অনঙ্গ' ও 'কাম-এর মত মদনের অন্য প্রতিশব্দ 'অতনু'কে সংস্কৃতের শব্দার্থ ও অনুবাদমত 'স্থূল' ভাবিব কেন? সংস্কৃতের শব্দার্থে আছে—অতনু=(তনু=ক্ষীণ) স্থূল।

সৃষ্টি (২২৯)। সে পদের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। আরো একটি পদে সোনার কথা—রসচঞ্চল সেই বর্ণনাটি অতীব উপভোগ্য—

গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোনা।

গোধূলির সময় অল্পবয়সী পুষ্পমালার মত একটি বালিকা আঁচলে উজ্জ্বল সোনা ঢাকিয়া যখন ঘর হইতে পথে নামিয়া পড়িল, তখন কৃষ্ণ বুকের জ্বালায় জ্বলিয়াছিলেন, আর কবির কাব্য জ্বলিয়াছিল রসের জ্বালায়।

পদ্মকোরকের সঙ্গে কুচের তুলনা চলে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। 'কমলতুল্য পয়োধর' বা 'কুচ-কমলকে' দেখিয়া ভ্রমরের ঔৎসুক্যের কথা কবি দুইটি পদে বলিয়াছিলেন (৬৭২, ২০৩)। কমলের সঙ্গে কুচের তুলনামূলক একটি বর্ণনা উল্লেখযোগ্য—"কমলের ন্যায় উচ্চ কুচযুগ বক্ষে ভার হইয়াছিল, এখন তাহা ফুটিয়া ম্লান হইল" (৮৭১)। এখানে কবি প্রশংসনীয় সঙ্গতি-বোধের পরিচয় দিয়াছেন। কমল, দেহের নানা অঙ্গের উপমান—মুখের, হাতের, পায়ের, পয়োধরেরও। বিভিন্ন সময়ে কমলের বিভিন্ন রূপ অথবা গুণ অলঙ্কারের উপাদান হয়। কুচের সঙ্গে যখন কমলের তুলনা করা হইতেছে, তখন যৌবন-মধুর আধাররূপ পয়োধরের কথা একদিকে ভাবা হইতেছে; অন্যদিকে কমলের সঙ্গে পয়োধরের রূপগত সাদৃশ্যের কথাও কবির মনে ছিল। পদ্ম কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্ণপদ্ম নয়, কবি অন্যত্র যেমন বলিয়াছেন—পদ্মকোরক, অর্থাৎ অনতিস্ফুট পদ্ম। স্ফুটনোন্মুখ পদ্মই যথার্থ উপমান। যে অলঙ্কারটির আলোচনায় এই সকল কথা বলিতেছি, সেখানে কবি নায়িকার বিরহক্লিষ্ট দেহের বর্ণনায় শিথিল বক্ষের সঙ্গে 'ফুটিয়া ম্লান' পদ্মের তুলনা সঙ্গতভাবেই করিয়াছেন।

পয়োধরের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করিতে কবি এক-শ্রেণীর গতানুগতিক অলঙ্কার ব্যবহার করেন। সেগুলিতে উদ্ভিন্নমান পয়োধরকে বিভিন্ন ফলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায়—বদরী, নারঙ্গী, ছোলঙ্গী, বীজপুর, বেল, তাল ইত্যাদি। (৪১৩, ৬১৩, ৬১৭, ৮৯২)

পয়োধর-সম্বন্ধীয় ভাবাত্মক ও রসাত্মক আরো কিছু উচ্চশ্রেণীর অলঙ্কারের সাক্ষাৎ পাইব নানা পদে। পয়োধরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলিও অনেক সময়

সৌন্দর্যময়। যেমন উরজাঙ্কুর (২২৬, ৬১৩), হৃদয়ের মুকুল (৬১০), হৃদয়ের রস, অঞ্চলে অমৃতসিঞ্চিত কুচের সগর্ব অবস্থান (৮৭১) ইত্যাদি। বর্তমানে ভাবাত্মক ও রসাত্মক যে অলঙ্কারগুলির কথা বলিতেছি, সেগুলিতে নায়ক এবং নায়িকা উভয়ের কাছেই প্রেমের অভিব্যক্তি-কেন্দ্ররূপে পয়োধর গৃহীত হইয়াছে। নির্ধনের নিকট পরম ধনের তুল্য এই পয়োধর—এইরূপ বর্ণনা কয়েকবার আছে। যথা—

"যেমন জীবনসম্পুশ নিধি পাইয়া নির্ধন ক্ষণে দেখে ক্ষণে ঢাকিয়া রাখে (তেমনি নায়িকা) কুচ দেখে ও ঢাকিয়া রাখে।" (২১৭)

"(নায়িকার উক্তি) কাঞ্চনে গড়া সুন্দর পয়োধর নাগরের জীবনের আধারস্বরূপ। উহা রত্নের মতন।" (৬৫৩)

"বসন খুলিয়া গিয়াছে, বুক হাত দিয়া চাপিয়া বহিয়াছে, (যেন) বাহিরে রত্ন রাখিয়া আঁচলে গেরো দেওয়া হইতেছে।" (৬৭৫)

"হাতে হাত দিয়া ধরিতে প্রেম জাগিল, দরিদ্র যেন ঘটভরা স্বর্ণ পাইল।" (৬৭৮)

উদ্ধৃতিগুলি হইতে একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, নায়িকার পয়োধরকে জীবন-নিধি কেবল নায়কই ভাবে নাই, স্বয়ং নায়িকাও সেরূপ ভাবিয়াছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, যেখানে পয়োধরকে নাগরের জীবনের আধারস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই উক্তি স্বয়ং নায়িকার, উহা বিত্তবতীর ধনগর্ব। নায়িকা নানা কারণে নিজ বক্ষকে মহামূল্য সম্পদজ্ঞান করিয়াছে, প্রথম উদ্ধৃতি অনুযায়ী এইরূপ করার কারণ নায়িকার নবজাগ্রত দেহচেতনা। তাহারই বশে বস্তুটিকে ক্ষণে দেখিয়াছে ও ক্ষণে ঢাকিয়াছে অতিমূল্য রত্নবৎ। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে হৃতবসনা নায়িকা বুকে হাত চাপিয়া লজ্জারক্ষা করিতে চাহিয়াছে, সেই ব্যর্থ প্রয়াস কবির সকৌতুক অলঙ্কার-প্রয়োগের কারণ হইয়াছে—'বাহিরে রত্ন রাখিয়া আঁচলে গেরো দেওয়ার চেষ্টা'। মিলন-মুখী নায়িকার অবস্থা-বর্ণনায় এই অলঙ্কারটিতে আছে কবির সহাস্য মনোভাবের প্রকাশ। অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে কিন্তু কবির কোনো হাসি ছিল না। কামুক নায়কের নিকট হইতে অব্যাহতিকামী বালিকার বর্ণনা কবি বেদনাভরে করিয়াছেন—"(বালিকা) কাঁচা সুবর্ণ পয়োধরকে দুইটি বাহুর দ্বারা চাপিয়া প্রাণের মত রক্ষা করিতেছে" (৫৯)। এখানে মুগ্ধার ব্যাকুল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চমৎকার ফুটিয়াছে। পয়োধরকে দুই বাহুতে চাপিয়া প্রাণের মত

রক্ষা করিতেছে, এই কথায় প্রাণপণ আত্মরক্ষা-প্রয়াসের অতিরিক্ত আরো একটু ব্যঞ্জনা আছে—প্রাণ হৃদয়ে থাকে, নায়িকা হৃদয়ে হাত চাপিয়া পয়োধরের সঙ্গে যেন প্রাণকেও রাখিতে চেষ্টা করিতেছে আপ্রাণ।

সামান্য পূর্বে বয়ঃসন্ধির প্রথম দেহোন্মেষের কালে গোপন ধনের মতো নিজ বক্ষ সম্বন্ধে নায়িকার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। আর একটি পদে কবি নবোদ্গত কুচের বর্ণনা করিয়াছেন অর্থবহ ভাষায়—"মনে হয় নবোদ্গত কুচ রক্তিম মুখের মত লাল হইয়াছে" (১৮)। এই অলঙ্কারটিতে কবি চাতুর্যের সঙ্গে দেহাঙ্গের বর্ণনায় মনোরূপের বর্ণনাও করিয়া লইলেন। নায়িকার তরুণ রক্তিম বক্ষের সঙ্গে রাগরক্তিম মুখের তুলনা সহজেই করা যায়। ঐ তুলনায় আরো একটু কথা ইঙ্গিতে পাইতেছি। মুখ অনুরাগে লাল হয়। নবযৌবনা রাধার পয়োধর বর্ণে রক্তিম—কবির বক্তব্য, অনুরাগে রক্তিমও বটে—বয়ঃসন্ধি-উত্তীর্ণ নায়িকার আত্মানুরাগ জাগিয়াছে, সেই আত্মানুরাগের রক্তিম অভিব্যক্তি যৌবন-মুখ পয়োধরে।

প্রথম যৌবনের পয়োধরের এই বর্ণনা। পূর্ণ-যৌবন-বক্ষের একটি শক্তিশালী বর্ণনা মিলিতেছে—"হৃদয়ের হস্তীশালা সুবর্ণে নির্মিত, তাহাতে কুচভার স্থির স্তম্ভ" (২৫২)। এখানে কবি বক্ষ-সহিত পয়োধরের বর্ণনা করিয়াছেন। পয়োধরের স্পষ্ট অলঙ্কার দিয়াছেন একটি—'স্থির স্তম্ভ'। স্তম্ভদুটি আছে হৃদয়ের হস্তীশালায়। কুচ যদি স্তম্ভ হইল, হস্তীশালার হস্তী তবে কি? কবি বলিয়াছেন, যৌবনই হস্তী। এবং এই বলাটি কি সুন্দর! উন্মত্ত যৌবনের সঙ্গে মদোন্মত্ত ঐ হস্তীর তুলনা। কিন্তু কুচকে প্রথমে 'স্থির স্তম্ভ' বলিলেও কবি কি শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঐ প্রকার নিষ্প্রাণ অনড় রাখিতে চাহিয়াছেন? মনে হয় না। বর্ণনার দ্বিতীয় অংশে কবি কুচের স্তম্ভ-রূপকে ভুলিয়া গিয়া কুচকে সম্ভবতঃ হস্তীই বলিয়াছেন। সেখানে বলা হইয়াছে—"যৌবনকেই হস্তী স্থির কর। যদি মদন-মদ-জলে উন্মত্ত হয়, প্রিয়তম অঙ্কুশ লাগাইয়া ধরিবে।" প্রিয়তম তাঁহার নখ-অঙ্কুশের আঘাত সচরাচর কুচের উপরই করে। তাছাড়া 'যৌবন' শব্দটি অর্থসঙ্কোচে কুচ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়; যৌবনোদয়ের প্রত্যক্ষগোচর প্রমাণ এখানেই মেলে, যেজন্য বলা হয় 'যৌবন-ভারনত', কিংবা 'যৌবনশোভা'।

কুচযুগলের সঙ্গে ভেলার তুলনা একটি পদে আছে। ১২৮ পদে রাধিকা বলিয়াছেন—"দুঃসহ যমুনা নদী কুচযুগলকে ভেলা করিয়া ভাগ্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম"। পূর্বে দেখিয়াছি কুচযুগলকে কলসী করিয়া রাধিকা নদী পার হইয়াছেন। রাধিকার দূতী কৃষ্ণের নিকট সেই বর্ণনা করিয়াছিল। তাহাতে ছিল প্রেমতাড়িত নারীটির জন্য নায়কের নিকট অনুগ্রহ-প্রার্থনা। বর্তমান ক্ষেত্রে রাধিকা নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—কুচযুগলকে ভেলা করিয়া আসিয়াছি। অলঙ্কার-প্রয়োগে লোক-জীবনের স্পর্শ আছে। ভেলা করিয়া নদী-সন্তরণের অভিজ্ঞতাকে অলঙ্কার-প্রয়োগের সময় ব্যবহার করা হইয়াছে। রাধার বুক-সাঁতারের ছবিটিও ফুটিয়াছে। কিন্তু এই অলঙ্কারের যৌক্তিকতায় একটি আপত্তি উঠিতে পারে—রাধার নিজ মুখে নিজের সম্বন্ধে এই ধরনের বর্ণনা কি সঙ্গত হইয়াছে? আমাদের মনে হয়, অসঙ্গত নয়। কারণ এই পদে রাধার বক্তব্যে অদ্ভুত তেজোময় আত্মগরিমা যুক্ত করা হইয়াছে। রাধা এখানে সর্বপ্রকার সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া, প্রেমিককে জয় করিতে চাহিয়াছেন। যখন রত্নের লোভেও চোর ঘরের বাহির হয় না, সেই বজ্রবর্ষী অন্ধকার রজনীতে রাধা পথে নামিয়াছেন, সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়াছেন, এবং যে সাহসে, শক্তিতে ও প্রেমের অহঙ্কারে তাহা করিয়াছেন, তাহারই দাবীতে রাধা অসঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিয়াছেন—"মাধব, অনুমতি দাও পঞ্চবাণ যুদ্ধ করুক, নগরে তোমার তুল্য নাগর আর নাই।" স্তম্ভিত চিত্তে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন কবি—"নারীর স্বভাব আপনার অভিলাষ উক্তিদ্বারা (স্পষ্টরূপে) জানায়।" নারীস্বভাব সম্বন্ধে কবির উক্তি সর্বত্র সত্য না হইলেও এই একটি ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সত্য। যে প্রখর জীবনদৃষ্টির সাহায্যে তিনি নারীর এই তেজোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব দেখিয়াছেন, সেই নারী নিজের সম্বন্ধে যদি বলে—কুচযুগকে ভেলা করিয়া নদী পার হইয়া আসিলাম, সে মোটেই অযথার্থ হয় না।

পয়োধর-বিষয়ক একটি অলঙ্কার লইব সর্বশেষে; এখানে কামনার সরোবররূপে পয়োধরকে দেখা হইয়াছে। বর্ণনায় বৈদগ্ধ্যের গাঢ় মুদ্রণ। উদ্ভ্রান্ত নায়ক বলিতেছে, "(তাহার) রূপ জাগিল, মন কুচকাঞ্চনগিরির সন্ধিপথে ধাবিত হইল, সেই অপরাধে মনোভাব মনকে সেখানেই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল।" (৩৮)

বাসনার উদঘাটিত রূপ। নায়িকাকে দেখিয়া নায়কের অধীর ও অসংযত মন। নয়ন দেহের অন্য অংশকে পরিত্যাগ করিয়া শেষপর্যন্ত একটি জায়গায় লুটাইয়া পড়িয়াছে—চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারিবে না—মনকে সেখানে যেন বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে—বাঁধিয়া রাখিয়াছে মদন—সে স্থানটি কি?—কুচ-কাঞ্চনগিরির সন্ধিপথ। কুচ-সন্ধিকে মনের বন্দীশালা বলার মধ্যে কবির বাস্তবতাবোধের প্রমাণ আছে। অর্ধাবৃত পয়োধরের সন্ধিরেখাটি হইল কামী-হৃদয়ের আবেগরেখা—ঐ পথেই মনের সুড়ঙ্গগমন। সন্ধির রহস্যে প্রেমজীবন বাঁধা, একথা কবি যথেষ্টই জানিতেন।

পয়োধরের অযৌগিক অলঙ্কারের আলোচনা এখানেই শেষ করিলাম। এই দীর্ঘ আলোচনার পরেও বলিতে হইবে আলোচনা সামান্যই হইয়াছে, কারণ পয়োধর-বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কারগুলি মিলিবে যৌগিক অলঙ্কারের প্রসঙ্গে। সে আলোচনা পরবর্তী অংশে আসিবে।

হার

পয়োধরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তবে হারের গৌরব, বিদ্যাপতির পদে। সুতরাং উত্তম অলঙ্কারগুলি যৌগিক অলঙ্কার অংশে পাইব। নিছক হারের চারটি অলঙ্কার মিলিতেছে। একটিতে চমৎকারভাবে কবি বিপরীত মিলনকালে নায়িকার কণ্ঠলম্বিত হারের দোলনের সঙ্গে আনন্দিত মদনের হিন্দোল-দোলনের তুলনা করিয়াছেন (৪৯৪)। হারকে অন্যত্র মদনের ফাঁদ বলা হইয়াছে (৬২৪)। এই হার বিরহকালে হইয়াছে সর্প, যাহাকে বিষের যোগান দিয়াছে মদন (৫৪৪)। হার সর্বাধিক মর্যাদা পাইয়াছে প্রিয়মিলনের ভাবস্বপ্নে আচ্ছন্ন নায়িকার কল্পনায়—মুক্তাহার সেখানে দেহমন্দিরে আলিপনা (৭৫৫)।

গ্রীবা : কণ্ঠ : কণ্ঠস্বর : বচন : পঞ্জর

গ্রীবা বা কণ্ঠ সম্বন্ধে কবির একটি উপমান তৈয়ারী আছে—কম্বু; যত্রতত্র ইহারই ব্যবহার করেন। (৮৯, ৩০৩, ৭৩৬ ইত্যাদি)

কণ্ঠস্বরের বর্ণনায় কবির অস্বাভাবিক কোকিলপ্রীতি। কোকিলের কূজন ছাড়া এ ব্যাপারে নূতন কিছু তিনি ভাবিতে পারেন নাই—কণ্ঠস্বর মিষ্টতায় কোকিলের মত, কিংবা অতি-মিষ্টতায় কোকিলের লজ্জার কারণ। কখনো কোকিলের কাছ হইতে কণ্ঠস্বর লওয়া হইয়াছে, কখনো বা কোকিলকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (৮২, ১৫৪, ১৮১, ২৭১, ৬২৯)।

অর্থবহ কণ্ঠস্বর অর্থাৎ বচনকেও কোকিলতুল্য বলা হইয়াছে কয়েকটি পদে (২৫, ৮৯, ২১৪)। বচনের সঙ্গে অমৃতের তুলনাও পাওয়া যায় (৮৯, ৪০২, ৫৩৪)। ৩৯৬ পদে নায়কের বচন বাহিরে সুধাসম হইলেও তাহার হৃদয় পাষাণ। নায়ক-বচনের এই স্বরূপটি সুন্দর ফুটিয়াছে একটি বর্ণনায়—তাহা যেন "মধুমাখা পাথর" (৩৭৭)। বচন কেবল মধুস্বাদ নয়, মধুসৌরভও বটে। কবি, দেখা যাইতেছে, বচনের শ্রবণ-রূপের মত ঘ্রাণ-রূপও জানিতেন (৯৮)।

পঞ্জরের কথা আছে মাত্র একটি পদে—৭৩৬। সেখানে বিরহক্ষীণা নায়িকার বর্ণনায় বলা হইয়াছে—দীর্ঘশ্বাসে পঞ্জরের বন্ধন যেন ধ্বসিয়া যাইতেছে।

কর : কর-নখ : নখরেখা : করতল : করাঙ্গুলি

৮৯ পদে হস্তের উপমান আছে—মৃণাল, পাশ ও বল্লরী। 'বাহুপাশ' নিতান্ত চলিত কথা—পাশ যে বাহুর উপমান একথা মনেও থাকে না। মৃণাল-বাহুর কথা কবি দু'একবার বলিয়াছেন (৩০৩, ৬২০)। বল্লরী চোখে পড়ে না। বাহুপাশের মত বাহুবল্লরী বা বাহুলতা কথার কথা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধহয় চোখে পড়ে নাই।

নখরের উপমান—করকবীজ, চন্দ্র ও রত্ন (৮৯)। নখের অন্য অলঙ্কার মিলিবে যৌগিক অলঙ্কার অংশে। নখক্ষতেরও সেখানেই।

করতলের সঙ্গে অরুণবর্ণ নবপল্লবের তুলনা আছে ৬২০ ও ৬৩৩ পদে।

করাঙ্গুলির অলঙ্কার মিলিবে যৌগিক অলঙ্কার অংশে।

বঙ্গদেশের যৌগিক অলঙ্কার

(ক) কুচ এবং—

কুচ কার্যতঃ দেহের মধ্যবিন্দু বলিয়া কুচের সঙ্গে অন্য অঙ্গের যৌগিক অলঙ্কার সংখ্যায় খুব বেশী। কিছু উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার এই অংশে পাওয়া যায়। অলঙ্কারগুলি একে একে লক্ষ্য করা যাক।

কুচ এবং মুখ

কুচ এবং মুখের যে দুইটি যৌগিক অলঙ্কার পাওয়া যায়—সে দুটিতে কল্পনার গতানুগতিক রূপ। গতানুগতিক মানেই অসুন্দর নয়। একটিতে বলা হইয়াছে—অপূর্ব কমলতুল্য কুচ বিকশিত নহে, কারণ সম্মুখে মুখরূপ চন্দ্র রহিয়াছে (৫)। কুচের উপমানরূপে কবি অবিকশিত পদ্ম অর্থাৎ পদ্মের কুঁড়িকে উপস্থিত করিতে চান। দৃশ্য-বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য কবির এই চেষ্টা। এক্ষেত্রে অসুবিধা হইল, পদ্ম চিরকাল কুঁড়ি থাকে না, ফুটিয়া ওঠে, এবং ফোটা পদ্ম কবির বড় আদরের সামগ্রী। অথচ ফোটা পদ্ম পয়োধরের উপমান সাধারণভাবে হইতে পারে না। কবিকে পয়োধরের সঙ্গে তুলনা করিতে পদ্মের নিত্য কুঁড়ির সন্ধান করিতে হইল। পাইয়াও গেলেন—সম্মুখে মুখচন্দ্র তো রহিয়াছে—পদ্ম চিরকাল চন্দ্রভীত। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্র কবির সুবিধার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

তবে পদ্ম শেষপর্যন্ত ফোটে—বক্ষ-পদ্মও। সে বিরহকালে। বিরহম্লান শিথিল বক্ষের সঙ্গে ফোটা পদ্মের তুলনামূলক একটি অলঙ্কার পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

২২৬ পদে বলা হইয়াছে—কুচযুগলের উপর বিরহিণীর মুখ স্থাপিত। অর্থাৎ বেদনায় আনত মুখ। রাহুর ভয়ে মুখরূপ চন্দ্র কুচরূপ সুমেরু পর্বতে আরোহণ করিয়াছে, এই কল্পনা। কল্পনায় নূতনত্ব নাই।

কুচ-কেশ : কুচ-কেশ মুখ : কুচ-কেশ-অধর :

কুচ-কেশ-হার

কুচ ও কেশের একজাতীয় কতকগুলি অলঙ্কার পাওয়া যায়—

"ঘন কৃষ্ণ বেণী কুচ-কলসে লুটাইয়াছে, যেন স্বর্ণগিরির উপর কৃষ্ণ সর্পিণী শয়ন করিয়াছে।" (১৬৮)

"বক্ষে কৃষ্ণ বেণী পড়িয়াছে, যেন কমলকোষে কৃষ্ণ সর্পিণী রহিয়াছে।" (২৬৫)

"ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেণী কুচকলসের উপর লুটাইতে লাগিল, যেন কৃষ্ণ সর্পিণী কনকের উপর শয়ন করিল।"—(৪৯৬)

"তাহার বক্ষে কৃষ্ণ বেণী পড়িয়াছে যেন কমলকোষে কৃষ্ণ সর্পিণী রহিয়াছে।" (৫৪৮)

ইহার সহিত আরো একটি অংশ যোগ করিয়া দেওয়া চলে, সেখানে কুচ ও কেশের সঙ্গে অধরকেও পাওয়া যায়—

"তোমার উত্তুঙ্গ পীন পয়োধরের উপর অধরের ছায়া দেখিতেছি যেন মদনদেবের শ্রেষ্ঠ মায়ায় কনকগিরির উপর প্রবাল উৎপন্ন হইল; তাহাতে আবার বিরহে মলিনা রমণীর বেণী পালটিয়া পড়িয়াছে, যেন কাল-নাগিনী নিঃশ্বাস-সমীরণ পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।" (২৪৬)

উদ্ধৃত অংশগুলিতে কুচ ও বেণী-প্রসঙ্গে প্রায় অনুরূপ দুইটি কল্পনা মিলিতেছে—এক, কনকগিরিতে শয়ান কৃষ্ণসর্পিণী, দুই, কমলকোষে শয়ান কৃষ্ণসর্পিণী। দ্বিতীয় কল্পনাটি অধিক বাস্তব। প্রথমটির সম্বন্ধে বলা চলে, যদি কনকগিরিতে শায়িত একটি কৃষ্ণসর্পিণী কল্পনানেত্রে দেখিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে সত্যই অবাস্তব-রমণীয় সৌন্দর্যের আস্বাদন সম্ভব হইবে। কমলকোষে সর্প সেই তুলনায় লোকঅভিজ্ঞতায় পরিচিত বস্তু।

কনকগিরির উপর সর্পের কল্পনা সবচেয়ে সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে সর্বশেষ উদ্ধৃতির অলঙ্কারে। সেখানে বিরহ-মলিন একটি নারীর চিত্র। ক্লান্ত বেদনাচ্ছন্ন মস্তক ঝুলিয়া পড়িয়াছে বুকের উপর, ফলে অধর ও পয়োধর সন্নিহিত। কবি দেখিলেন মদনের মায়ায় স্তন-কনকগিরির উপর অধর-প্রবালের অস্তিত্ব। অর্থাৎ আমরা কাঞ্চনে নির্মিত একটি গিরিকে পাইলাম, পাইলাম সেই গিরির উপর সমুদ্রোত্থ প্রবালের সঞ্চয়। কবির কল্পনা এখানেই থামে নাই, আরো আগাইয়াছে—ঐ গিরির কোনো কন্দর হইতে বাহির

হইয়াছে এক ক্ষুধার্ত কালনাগিনী—নিঃশ্বাস-সমীরণ পান করিবার জন্য আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিতেছে। আসল ব্যাপার বিরহ-মলিনা রমণীর বেণী বুকে পালটিয়া পড়িয়া আছে।

বেণীর সঙ্গে সর্পের তুলনা প্রচলিত। প্রচলিত হইলেও ইহার প্রাণশক্তি অটুট আছে। কবিরা বেণীকে সর্প করিয়াছেন বেণীর সঙ্গে সর্পের আকারগত সাদৃশ্যের জন্যই নয় কেবল—আরো কিছু প্রয়োজন আছে বলিয়া; কবি কুচ ও বেণী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কমলকোষে কৃষ্ণসর্পিণী। এখানে কুচ কমল এবং বেণী সর্পিণী। কিন্তু কুচ কি কেবলই মধুময় কমল—ঐ মধুর কি দংশন নাই? অবশ্যই আছে, কিন্তু কমলকে দিয়া তো দংশন করানো যায় না, তাই কুচকমলের উপর লম্বিত বেণীকে দিয়া সেই কাজটি সারিয়া লইতে হইল।

কেশ বাঁধনে বেণী—যখন অবন্ধনা, তখন আয়ত অপূর্বতা—মাথাভরা কেশের বিপুল পসরা। মেঘের মতো সেই কেশ মনে আনে ব্যাপ্তির চেতনা। বিস্ফারিত সুন্দরতায় মন ঢাকিয়া যায়। অজস্র কেশ, বেণীরূপে বাঁধা পড়ার পরেই হয় বিপদের সূচনা—আঁকাবাঁকা লুটাইয়া-চলা একটি রস-বিষাক্ত সর্পের উদয় হয়। মুক্ত কেশের বর্ণনায় ভীতিসৃষ্টি করা কবির অভিপ্রায় হইলে বলেন—কেশ রাহুর মত, রাহুর মতই বিশাল তাহার গ্রাস। বিপরীত ভাবসৃষ্টিও আছে। তখন কেশ চামরের মত, স্তবকপুঞ্জে আনন্দস্ফীত হইয়া দেবতায় ব্যজন করিয়া তাহা ধন্য হয়।

চামরের তুলনা মিলিতেছে নিম্নের উদ্ধৃতিতে—

"চাঁচর কেশ বক্ষে লম্বিত, যেন স্বর্ণশম্ভু চামরে আবৃত।" (৬১৭)

"মুক্ত কবরী উল্টাইয়া বক্ষে পড়িতেছে, যেন স্বর্ণগিরিতে চামর ধরিয়াছে।" (৭৪৭)

চামরের দ্বারা শম্ভু-পূজা করা বুঝি, স্বর্ণগিরিতে চামর দোলানো নেহাতই কবির স্বাধীনতা।

কুচ-কেশ-হারের একটি মনোরম অলঙ্কার মিলিতেছে—

"স্তনযুগলের উপর কেশ মুক্ত হইয়া প্রসারিত হইল, তাহাতে হার জড়াইয়া গেল, যেন সুমেরু-উপরে চন্দ্রবিহীন তারাসকল উদিত হইল।" (২১৪)

সুমেরু পর্বত অন্ধকারে ঢাকিয়া আছে তাহার উপর জ্বলিতেছে অগণ্য তারকা—এই এক নিসর্গচিত্র। চিত্রটি কবি মিলাইয়া দিয়াছেন একটি দেহচিত্রের সঙ্গে, সেখানে নায়িকার স্তনযুগলের উপর ছড়াইয়া আছে ঘনকৃষ্ণ

কেশ এবং তাহাতে জড়াইয়া আছে মাণিক্যদীপ্ত একখানি হার। পয়োধর হইল সুমেরু, কেশ হইল অন্ধকার, হার হইল তারকারাজি।

কুচ-কেশ-হার

ভারতবর্ষের গঙ্গা যে ভারতবর্ষের কতখানি ভারতবর্ষই বলিবে। ভারতের সভ্যতা গঙ্গার জলে ধোওয়া। এই ভারতধারা ভারতীর ধারাও বটে। কবিরা শতকণ্ঠে কহিয়াও গঙ্গামাহাত্ম্য শেষ করিতে পারেন নাই। বিশ্বকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন শঙ্করাচার্য, তিনিও গঙ্গার মাতৃমায়ায় ধরা দিয়া গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য গঙ্গাকে মানিয়াছেন মাতারূপে, স্বয়ং শঙ্কর মানিয়াছেন শক্তিরূপে। একদিন মহাদেব মাথা পাতিয়া স্বর্গের করুণা-কন্যাকে লইয়াছিলেন মর্ত্যের পাবন-কারণে, কিন্তু তাঁহার কী যে হইল, আঁকাবাঁকা চঞ্চলা মেয়েটিকে জটার বাঁধনে বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিলেন। মর্ত্যের অমৃত-জননীকে মস্তকের নটিনী কামিনী করিয়া ধূর্জটি অসীম সুখ পাইলেন।

এবং সে সুখ কবিরও—সেই সুখের দৃশ্য দেখিতে। শিবশিরে গঙ্গার ধারা দেখিয়া তাঁহার যেন তৃপ্তির সীমা নাই। গঙ্গা ও শিবকে একত্র দেখার বাসনা বিদ্যাপতির কবিতায় কয়েকটি মহৎ অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। বিদ্যাপতি রাধা-দেহের মধ্যে বিশ্বভুবন দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার শিবকে পাইয়াছেন রাধার বুকে, গঙ্গাকে পাইয়াছেন কণ্ঠের মুক্তাহারে। অলঙ্কারগুলি দেখা যাক—

অমর ভূধর সম পয়োধর
মহঘ মোতিম হার।
হেম-নির্মিত শম্ভু শেখর
গঙ্গ নির্মল ধার॥ (৩০)

"সুমেরু পয়োধরের উপর মহার্ঘ্য মুক্তাহার দেখিয়া মনে হয় যেন সুবর্ণ নির্মিত শিবের মাথায় গঙ্গার নির্মল ধারা।"

*

চন্দনে চরচু পয়োধর
গীম গজমুকুতা হার।
ভসমে ভরল জনি শঙ্কর
শির সুরনদি জল ধার॥ (৩

"তাহার চন্দনচর্চিত পয়োধর এবং গলায় গজমুক্তার হার—যেন শঙ্কর ভস্মে আবৃত হইয়াছেন এবং মাথায় বহিতেছে গঙ্গার জলধারা।"

*

গিরিবর-গরুঅ-পয়োধর-পরশিত
গীম গজমোতিক হারা।
কাম কম্বু ভরি কনক শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনীধারা॥ (৬২৩)

"কণ্ঠের গজমুক্তার হার গিরিভার তুল্য গুরু পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, (যেন) মদন কম্বু ভরিয়া স্বর্ণশম্ভুর উপরে গঙ্গারজলধারা ঢালিতেছে।"

প্রায় অনুরূপ আর একটি কল্পনা—

পীন পয়োধর অপরূপ সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥ (৪০)

"তাহার পীন পয়োধরের উপর অপরূপ সুন্দর মোতির হার, যেন কনকাচলের উপর স্বর্গসরিতের দুই বিমল জলধারা।"

অলঙ্কারগুলির মূল কথা শিবের মাথায় গঙ্গার ধারা। রাধার পয়োধর শিব, রাধার হার গঙ্গা। গলার হার বুকের বন্ধুর পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়াছে—কবি দেখিয়া পবিত্র উল্লাসে অধীর হইয়াছেন। উদ্ধৃতিগুলি যেসব পদের অংশ, সে সকল পদের বাকি অংশে যথেষ্ট ইন্দ্রিয়চেতনার পরিচয় আছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে—এই একটি দৃশ্যের সম্মুখীন যখন কবি হইয়াছেন—যখন দেখিয়াছেন হিরণ্যদ্যুতি বুকের উপরে মুক্তার শুভ্র লাবণ্যকে—তখনি ভাবাবিষ্ট হইয়া দেহের মন্দিরে দেবতাকে স্মরণ করিয়াছেন। কামনার ঊর্ধ্বগতির এই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির কাব্যে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অলঙ্কারগুলির মূল কথা শিবের মাথায় গঙ্গার জলধারা। বিভিন্ন পদে শিবের রূপে কিছু পার্থক্য ঘটান হইয়াছে। শিব—স্বর্ণশিব তো বটেই—কখনো সেই সোনার শিব ছাই মাখিয়াছেন ধূলার ধূলীতে। আসল ব্যাপার, নায়িকার বক্ষ ছিল চন্দনচর্চিত। শেষ উদ্ধৃতিতে শিব নাই, আছে কনকাচল, কনকাচল ভারতীয় কবি-কল্পনায় চিরদিনই শিবাকার।

গঙ্গার ধারা চারটি উদ্ধৃতিতে এক প্রকার। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে একটু বৈচিত্র্য আছে। এবং উদ্ধৃত অলঙ্কারগুলির মধ্যে তৃতীয়টি নিঃসংশয়ে সর্বোৎকৃষ্ট। সেখানে কামকে দিয়া শিবার্চনা করান হইয়াছে। কামের এই পূজারী-রূপটি অনবদ্য। বলা হইয়াছে, কাম কম্বু ভরিয়া কনক-শম্ভুর উপরে সুরধুনীধারা ঢালিতেছে। দেবপূজার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। কামকে করা হইয়াছে পূজারী। কামকে কেন? কারণ কবি কামনাকে অস্বীকার করিতে চান না। কৃষ্ণ, কামনার দৃষ্টিতেই রাধার রূপদর্শন করিয়াছেন আলোচ্য পদে। সেই কাম এখন আর শিবের তপোভঙ্গের ঔদ্ধত্যে অধীর নয়, সে এখন শিবের পূজায় ও সেবায় নিজের জীবনের পূর্ণ মূল্য পাইয়াছে। এবং কবি কিরূপ সুচারু কৌশলে কণ্ঠের সঙ্গে শঙ্খের তুলনাটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। শঙ্খ-কণ্ঠ হইতে হার দোলে—পূজারীর অঞ্জলিধৃত শঙ্খ হইতে গাঙ্গ্যবারি ঝরিতে থাকে,—দুইই এক চিত্র।

বাস্তবিক বিদ্যাপতি অসাধারণ সৃষ্টি করিয়াছেন এই অলঙ্কারে। কামকে আনিয়াছেন শিবের পূজায়, শিবকে রাখিয়াছেন কামের স্বীকারে, কাম ও শিবের যোগধারা করিয়াছেন গঙ্গাকে, এবং সমস্ত চিত্রটিকে ধুইয়া মাজিয়া তুলিয়াছেন সৌন্দর্যের রঙে ও শুচিতার আলোকে। অথচ সবই করিয়াছেন এদেশীয় কবিকল্পনার পুরাতন বন্ধনীর ভিতরে। ঐতিহ্যের প্রাণকর্ষণ এইভাবেই কবিরা করিয়া থাকেন।

কুচ ও হারের একত্র রূপের আরো অলঙ্কার আছে। যেমন জয়দেবের চালাকির অনুকরণ। মানিনী রাধার নিকট সাধুতার পরীক্ষা দিতে উদ্‌গ্রীব কৃষ্ণ রাধার স্তন-ঘটের হার-সর্পের উপর হাত রাখিতে উৎসাহী। কৃষ্ণ জানেন হার-সর্প কাটে না। যদি কাটেও তার পূর্বেই স্পর্শঘটিত আনন্দ পাইয়া যাইবেন, সেই যথেষ্ট লাভ (৬৪৭)। জয়দেব আরো একটি পদে আছেন; মদনপীড়িতা রাধা মদনের নিকট অনুনয় করিয়া বলিতেছেন—আমি শিব নই। তার প্রমাণও দিয়াছেন। একটি প্রমাণ হইল—"আমার বক্ষে সর্পরাজ নাই, উহা মণির হার।" (৭০৫)

পয়োধরকে কমল কল্পনা করার রীতি আছে। ২৫ পদে পয়োধরকে মেরু বলিয়া স্তনশিখরকে বলা হইয়াছে কমল। কিন্তু কমলের বাঁচিতে

গেলে জলের প্রয়োজন। সে জল কোথায়? অথচ কমল দুটি দিব্যি সতেজ। কবির উত্তর—হার গঙ্গাজল সরবরাহ করে।

এ ব্যাপারে কবি প্রাণবন্ত এক অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন বিপরীত-রতির বর্ণনায়। "উল্টাইয়া পড়া কুচযুগের উপর বিলম্বিত হার দুলিতেছে; যেন কনক কলস দুগ্ধধারা বমন করিতেছে।"

এক্ষেত্রে দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করা ছাড়াও অলঙ্কারটি আরো কিছু করিতেছে। মাতোয়ারা প্রেমের উদ্বেল রূপকে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছে কনকাচলের দুগ্ধ-বমনের কল্পনা। কুচ ও হার একদিকে আলঙ্কারিক চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, অন্যদিকে ঐ চিত্র হইতে প্রেমলীলার এক বিশেষ অবস্থার স্বভাবকে উন্মোচিত দেখিতেছি।

আর, কবি সুন্দর একটি স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন কৃষ্ণের রূপানুরাগের এক পদে। সুরপুর হইতে এক অনুপমা রমণী কৃষ্ণের আচ্ছন্ন নয়নের উপর দিয়া পৃথিবীতে নামিয়া গজেন্দ্রগমনে চলিতেছে—তাহার গ্রীবা হইতে মুক্তার হার দুলিতেছে; কৃষ্ণের মনে হইল গঙ্গার ধারা, আর মনে হইল দুই চক্রবাক সেই গঙ্গার ধারে চরিতেছে। চলার বেগে বক্ষের উচ্ছ্বাস ঐ বিহঙ্গ-উপমান ছাড়া আর কিসে ফুটিত?

কুচ-অশ্রু : কুচ-কাজল-অশ্রু : কুচ-চন্দন

নয়নধারা বুকে আসিয়া পড়ে। অবিরল অশ্রুধারার সঙ্গে নির্ঝরের তুলনা খুব স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যদি কাছাকাছি পার্বত্য কিছু পাওয়া যায়। কবি সহজেই তাহা পাইয়াছেন—পয়োধরের সঙ্গে কনকাচলের প্রভৃত তুলনা ইতিমধ্যে দেখিয়াছি। ৫৪১ পদে এই বিষয়ক অলঙ্কারের রূপ—

"সুন্দরীর নয়নজল যেন পীন পয়োধরে নির্ঝর রচনা করিল।"

নয়নের অশ্রুর সঙ্গে নয়নের কাজল গলিয়া পড়ে। তরল কাজল বস্ত্রে পড়ে, আর পড়ে বক্ষে। বক্ষে পড়িয়া সোনার বুককে কালো করিয়া দেয়। সুন্দরীর বুক বলিয়া সে কালোও আলোময়। কবি এক্ষেত্রে মৃগমদে স্বর্ণশম্ভু-পূজা দেখিয়াছেন আনন্দভরে। (৫৫১)

আমরা মনে করি, অলংকৃত হইয়া কোনো বস্তু সুন্দর হয়। কবি সর্বত্র তেমন মনে করেন না। যখন তিনি কুচকে শিব ভাবিয়াছেন, তখন শিবগাত্রে চন্দনচর্চা মন্দ নয়, তাহাতে শিবকে ভস্মাবৃত মনে হয়—কবি অন্যত্র সেকথা বলিয়াছেন পূর্বে দেখিয়াছি। কিন্তু যখন কুচ সুমেরু পর্বতের মত, তখন চন্দনচর্চা কবির চিত্তে ভীতি জাগাইয়াছে। কারণ তখন সুমেরু-শিখরে আবরণ পড়িবে, আলো থাকিবে না। কবি বলিতেছেন—তখন হিমে সুমেরু ডুবিয়া যাইবে। বলাবাহুল্য হিমতুষার সুমেরুর পক্ষে আনন্দের জিনিস নয়। (৯৭)

কুচের সঙ্গে পর্বতের তুলনা-প্রসঙ্গে আর একটি অলঙ্কারের উল্লেখ করিতে পারি। বিপরীত মিলনের সময় কৃষ্ণের মরকতবক্ষে রাধা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থাটি সম্বন্ধে কবির আলঙ্কারিক বর্ণনা—"জলধর উলটিয়া পৃথিবীতলে পড়িল, এবং তাহার উপরে সুন্দর পর্বতযুগল উদিত হইল" (৬৯৬)। এখানে জলধর বলিতে কৃষ্ণ, এবং পর্বতযুগল রাধার যুগল পয়োধর। সাধারণতঃ পর্বতের উপরে জলধরের উদয়। এখানে মাটিতে মেঘ এবং মেঘের উপর পাহাড়।

কুচ এবং বস্ত্র

কুচ এবং বস্ত্রের একটি অলঙ্কার গতানুগতিক—উন্নত কুচযুগকে নায়িকা বারংবার খুলিতেছে ও ঢাকিতেছে, এক্ষেত্রে কৃষ্ণের বক্তব্য, হিমগিরিকে কি লুকান যায়? কৃষ্ণ বলেন নাই, কিন্তু আমরা প্রশ্ন যোগ করিতে পারি—বস্ত্র-মেঘের আবরণে? (২৩)

একটি চমৎকার ভাবগর্ভ বর্ণনা মেলে এক্ষেত্রে—

"ওরে ভ্রমর, কপাট খুলিও না, অঞ্চলে পদ্মকুমার শয়ন করিয়া আছে। (২০৪)

এবং রূপসিদ্ধ চিত্রও পাইতেছি একটি পদে—

"পয়োধরের প্রান্তে সিক্ত বসন লাগিয়া রহিয়াছে, যেন সোনার বিল্বফলে তুষার পড়িয়াছে"। (৬২৯)

কল্পনাসৌন্দর্যের চমৎকার।

কুচ-কর : কুচ-করতল

কুচ নায়িকার। কর নায়িকা ও নায়ক উভয়েরই হইতে পারে। সাধারণতঃ দেহ-গোপনের প্রয়াসে সলজ্জ নায়িকা দুই হাতে বুক ঢাকিতে চেষ্টা করে—তাহার সেই সন্ত্রস্ত লজ্জার মাধুরী কবির রূপতৃষ্ণার উপাদান হইয়াছে। কবি অপরপক্ষে ব্যগ্র-হস্ত নায়কের ফলপ্রাপ্তিকেও অলঙ্কারযুক্ত করিয়াছেন।

কর বলিতে করতলই সাধারণভাবে বুঝিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রমও আছে।

কনকাচল কমলের দ্বারা ঢাকা অসম্ভব, একথা প্রাকৃতজন বোঝে। বরং কবিরাই অসম্ভব জিনিস ঘটাইয়া সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করেন। কবিদের অসীম স্বাধীনতা। তাঁহারা একবার উদ্ভট কিছু বলিয়া পাঠককে চমকাইয়া দিবেন, আবার অন্যত্র সমঝাইয়া দিবেন—অসম্ভব অসম্ভবই—সম্ভব হয় না। তার মানে দুই দিকের ভাগ তাঁহারা মারিবেন।

যেমন ধরা যাক—ঐ কনকাচল-কমলের ব্যাপারটি। রাধার কুচকে কনকাচল কবিরাই করিয়াছেন, এবং করকে করিয়াছেন কমল। যখন রাধা অনাবৃত বক্ষকে দুই হাতে ঢাকিতে চেষ্টা করেন, তখন কবি সেই প্রয়াসের ব্যর্থতা লইয়া কৌতুকপরায়ণ হইয়া ওঠেন—কনকাচলকে কি কমলে ঢাকা যায়? (৬৬, ১৮৬)।

পাঠক অবশ্য জানে, যদি কবি সম্পূর্ণ উল্টা কথাও বলেন, মুগ্ধ হওয়া ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। পাঠক মুগ্ধতার দায়বদ্ধ। অযৌক্তিকভাবে পাঠক এইরূপ ভাবে না। কেন না ঠিক বিপরীত কথাই কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"তাঁহার (হরির) করে কুচমণ্ডল লুকাইয়া রহিল, মনে হয় যেন কমল কনকগিরিকে ঝাঁপিয়া রাখিল।" (৫৬৬)

হাত দিয়া পূজা করা হয়, আর কাছেই আছেন হৃদয়-দেবতা শিব, কাজেই কর ও কুচ অংশে প্রচুর শিবপূজার বিবরণ পাইব। নখক্ষতের আলোচনায় এই শিবপূজার চূড়ান্ত হইবে। এখানেও অল্প নয়।

১৭৭ পদে রাধা "কররূপ কমল ও কুচরূপ শ্রীফল দিয়া শিবপূজা" করিয়াছেন। ৫৯৬ পদেও দুই অঞ্জলি ভরিয়া শিবপূজার কথা আছে। এই

আধ্যাত্মিক দেহদানের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। যখন রাধা কৃষ্ণপূজাতে ব্রতী তখনও তাঁহার "পীন পয়োধর পূর্ণ কলস", আর "কলস ঢাকিবার নব পল্লব" ছিল দুই কর (২৯৬)। কিন্তু আমরা শিবপূজার কথাই বলিতেছিলাম। এ বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার আছে ৮৯৪ পদে—"সুরত সমাপ্ত করিয়া হস্ত পয়োধরে স্থাপন করিয়া নাগর শয়ন করিল; যেন পূজারী সুবর্ণশম্ভু পূজা করিয়া কমলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিল।" এক্ষেত্রে কল্পনায় নূতনত্ব নাই, কবির কৃতিত্ব বিন্যাসে। মিলনোত্তর নায়ক-নায়িকার শিথিল সুপ্তি এখানে বর্ণিত। তার পূর্বেই স্বর্ণশম্ভুর পূজা হইয়াছে—বলা চলে তান্ত্রিক পূজা। এখন তাহার সমাপন। দেবতা পূজান্তে ফুলে ফুলে ঢাকিয়া গেলেন। কবি অন্য পুষ্পের পরিবর্তে করের কমল-পুষ্পকেই বেশী পছন্দ করিয়াছেন।

কুচ ও করের সর্বোত্তম তিন অলঙ্কার উদ্ধৃত করিতেছি নিম্নে—

"কুচযুগ যেন সুন্দর চক্রবাক-মিথুন, কে যেন (অথবা কোন্ দেবতা যেন) নিজ কুলে আনিয়া মিলন ঘটাইয়াছে। তাহারা পাছে আকাশে উড়িয়া যায়, এই ভয়ে বাহুপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" (২২৮)

"আজ কানাইয়ের আয়ত্তে পড়িলাম,......আপনার অঙ্গ অনায়ত্ত হইল। হাত দিয়া কুচ গোপন করি, বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাকা যায় না।" (৪৮৮)

"করযুগে পয়োধর-প্রান্ত আবৃত দেখিয়া চিত্ত চঞ্চল হইল, যেন হেমকমল চঞ্চল রক্তিম সূর্যতলে নিদ্রা গেল।" (৬২১)

প্রথম ও তৃতীয় উদ্ধৃতির অলঙ্কারে কল্পনাভঙ্গি পুরাতন। পুরাতন কল্পনাকেই সুচারু প্রয়োগে রসসৃষ্টির কিরূপ উপাদান করা যায়, বিদ্যাপতি তাহা দেখাইয়াছেন। প্রথম উদ্ধৃতির অলঙ্কারের ব্যাখ্যা পূর্বে করিয়াছি—সঙ্কুচিতা নায়িকা স্নানান্তে কুচযুগলের উপর দুই হাত চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উন্নত কুচযুগলের সঙ্গে উড়িতে ব্যগ্র চক্রবাকের, এবং লজ্জায় হাত দিয়া দেহগোপনের সঙ্গে পক্ষীবন্ধন-প্রয়াসের তুলনার মধ্যে মুন্সীয়ানা যথেষ্ট। এই অলঙ্কারের রস অবস্থানগত।

তৃতীয় উদ্ধৃতির অলঙ্কার সম্বন্ধেও সেইকথা। মূল পদে লীলাময়ী রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ মোহিত। সে নারী হাস্যময়ী ও লাস্যময়ী, যৌবনের আবেগে তরঙ্গময়ী। একবার সে হাসিল, পরক্ষণে দুই করে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

এবং পরক্ষণে—দেহের সেই লীলায়িত ছন্দেই মুখ হইতে হাত সরাইয়া কণ্ঠের তলায় বুকের উপরে রাখিল এবং সমস্ত শরীর ঝুঁকাইয়া দিল। এই কালেই কবি রক্তিম চঞ্চল সূর্যতলে স্বর্ণপদ্মের নিদ্রারূপ অলঙ্কারটি প্রয়োগ করিয়াছেন। করতল হইল রক্তসূর্য—কুচযুগল হইল স্বর্ণপদ্ম। সূর্য উঠিলে পদ্মের জাগরণ। পদ্ম সূর্যকামিনী। মুক্ত দলে সূর্যদান গ্রহণ করিয়া সে রক্তিম সুরভিত হইয়া উঠে। কমলের নিকট দিন যেন প্রেমের নিদ্রাহীন বিস্ফারিত রাত্রি। বিদ্যাপতি ভারতীয় কবি-কল্পনার রীতিকে লঙ্ঘন করিয়াছেন এখানে। তিনি বলিয়াছেন—পদ্ম নিদ্রা গেল সূর্যতলে। এইরূপ বলিয়া তিনি পুরাতন কল্পনাটির অর্থব্যাপ্তিই আনিয়াছেন। দিনে পদ্ম যে, জাগ্রত, সে প্রেমবশে। সেই প্রেম তাহাকে নিদ্রাও দিতে পারে। সূর্যের ঘনসান্নিধ্যে পদ্মের সেই গাঢ় সুখ-নিদ্রার কল্পনা করিয়া বিদ্যাপতি বাহিরে রীতিগত কল্পনাকে লঙ্ঘন করিলেও যথার্থভাবে কল্পনাসীমাকে প্রসারিতই করিয়াছেন।

সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ অলঙ্কার কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আছে—সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মৌলিক। দেহের সঙ্গে বিদ্যুতের তুলনার কথা জানি, কিন্তু কুচের সঙ্গে? বিদ্যাপতি এই অলঙ্কারে কুচকেই বিদ্যুৎ বলিয়াছেন। এবং সেকথা বলিয়াছেন এমন একটি পরিস্থিতির সুযোগে যে, তাহার বহিরঙ্গ রূপগত বাস্তবতা পর্যন্ত দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণস্পর্শে রাধা অনাবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি স্খলিতবসনা। দেহের স্বাভাবিক লজ্জায় নিজেকে দ্রুত সরাইয়া হাত দিয়া কুচ গোপন করিতে চাহিতেছেন। সেই অসম্পূর্ণ প্রয়াস সম্বন্ধে কবির অলঙ্কার, 'বিদ্যুৎ পড়িবার সময় ঢাকা যায় না।' দেহের চঞ্চল শিহরণে শুভ্র বক্ষ বিদ্যুতের রেখা টানিয়া দিল—এবং সেই বিদ্রোহী আলোক হাতের তুচ্ছ বাধা ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সহস্র ছটায়—বিদ্যাপতির অলঙ্কারের বক্তব্য ইহাই।

কুচ-হাত-নখ

প্রচলিত কল্পনাশ্রিত একটি অলঙ্কার আছে—নখ-সহিত দুই করে কুচযুগকে নায়িকা ঢাকিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন কনকশম্ভুকে

দুই কমলে ও দশ চন্দ্রে ঢাকা হইল। কমল, করের উপমান এবং চন্দ্র, নখের। (৩১)

কুচ-হাত-আঙুল-বস্ত্র

৬২২ পদে রস-চঞ্চল কয়েকটি অলঙ্কার পরস্পর সাপেক্ষতায় একত্রবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের বিখ্যাত পদ এটি—'গেলি কামিনী গজহু গামিনী' দিয়া যার সূচনা। কুহকিনী একটি নারীর কথা আছে পদে—তার গমন-গতি-পথের কয়েকটি রূপবিন্যাসকে কবি অঙ্কন করিয়াছেন কয়েকটি রেখায়। দুইটি রেখাচিত্র আমাদের আলোচ্য—একটির উপর অপরটি নির্ভরশীল। প্রথমটিতে আছে—কামিনী তাহার ভুজযুগ ঘুরাইয়া সুন্দর ছন্দে নিজমুখ বেষ্টন করিল। রূপের ও লীলার এই ছন্দটি এমনই অপূর্ব যে, কোনো অলঙ্কার না দিলেও চলিত—তবু অলঙ্কারপ্রিয় কবি এই সুন্দর সময়টিতে অলঙ্কারের আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। বলিয়াছেন, মদন চম্পকদামের দ্বারা শারদ চন্দ্রের পূজা করিল। দুইটি কোমল বাহুকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরাইয়া নায়িকা নিজ চিবুকের নীচে একত্র করিয়াছে, সেখানে যুক্ত মণিবন্ধ হইতে চম্পককলির মত আঙুলগুলি উপরে উঠিয়া চন্দ্র-মুখটিকে দুইপাশে ঢাকিয়াছে—আমার মনে হয় না কামের দ্বারা শারদ চন্দ্র-পূজার কথা কহিয়া কবি আর বেশী সৌন্দর্য বাড়াইতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয় রেখাচিত্র হইল—তারপরেই হঠাৎ-সচেতন কামিনী হাত নামাইয়া ত্রস্তভাবে বুকে অঞ্চল টানিতেছে। কিন্তু অতি চাঞ্চল্যের জন্য, বা যে কারণেই হোক, সে চেষ্টা আংশিক সফল হইল মাত্র। কবি অবস্থাটিকে অলঙ্কারবদ্ধ করিলেন এইভাবে—"চঞ্চলভাবে অঞ্চল দিয়া বুক ঢাকিবার সময় অর্ধ পয়োধর দেখিলাম। যেন পবনের দ্বারা পরাভূত শরৎকালীন মেঘ সুমেরুকে ব্যক্ত করিল।"

[illegible]রের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উত্থাপন করা যায়। নায়িকা বুকে আঁচল টানিতে চেষ্টা করিয়াছে অথচ অলঙ্কারে বলা হইয়াছে পবনের দ্বারা পরাভূত শরৎকালীন মেঘ সুমেরুকে ব্যক্ত করিয়াছে, অর্থাৎ ইচ্ছার প্রকৃতি ও অলঙ্কারের প্রকৃতি মিলিতেছে না। বিষয়ের ক্ষেত্রে আছে, চেষ্টা

সত্ত্বেও অসাফল্য, অলঙ্কারের ক্ষেত্রে চেষ্টার কথা ব্যক্ত নয়। অলঙ্কারে পূর্বতন অবস্থার বিপর্যয়মাত্র দেখান হইয়াছে, অথচ বিপর্যয়ের কারণ কবি বলেন নাই। সুতরাং অলঙ্কারে সঙ্গতির অভাব।

আমার সমালোচনা বাহিরের দিক দিয়া মাত্র সত্য, নচেৎ অলঙ্কারটিতে একটি গভীরতর সঙ্গতি আবিষ্কার করা যায়। কবি চঞ্চল করে অঞ্চল দিয়া বুক ঢাকিবার কথা বলিয়াছেন। এই চঞ্চলতা হইল দেহচাঞ্চল্য। ইহা বাসনার চাঞ্চল্য। ইহারই বশে নায়িকা বুকে কাপড় টানিতে চাহিয়াছে। আবৃত বক্ষও সে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, অনুরূপ ক্ষেত্রে। এবং সেই চেষ্টায়, আবরণের চেষ্টায়, যাহা আবৃত ছিল মুক্ত হইয়া পড়ে। কামনার চাঞ্চল্যই ঐ উন্মোচনের কারণ। কবি উপরিউক্ত অলঙ্কারে কামনার অস্থিরতাকেই ব্যঞ্জনায় পবন বলিতে চাহিয়াছেন, যে পবনের অর্থাৎ আত্মদ্রোহময় আত্মগোপন-প্রয়াসের অধীরতায় বক্ষ অর্ধেক উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কবি এইভাবে আপাত অসঙ্গতিকে গভীরতর সঙ্গতির কারণ করিয়াছেন।

কুচ-নখরেখা : কুচ-হার-নখরেখা : কুচ-নখরেখা-কাঁচুলী

প্রেমের সঙ্গে পীড়নের সম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে যাঁহারা প্রেমের কবিতা লিখিতেন পূর্বযুগে, তাঁহারা এ ব্যাপারে রীতিমত বাস্তববাদী ছিলেন। প্রেম তাঁহাদের কাছে যুদ্ধ। রুদ্ধদ্বার গৃহের সেই ভয়াবহ সংঘাত-কাহিনী ভারতীয় কবিগণ সাধুতার সহিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি এইরূপ একজন কবি।

সাধারণ যুদ্ধের মত এই প্রেমযুদ্ধেও প্রবল ও দুর্বল দুই পক্ষ। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রবল পুরুষপক্ষের রাজ্যলিপ্সা ও অত্যাচারের প্রভূত বিবরণ মিলিবে।

সবচেয়ে আপত্তির বিষয় হইল, পুরুষের পীড়নকীর্তিকে কবি বহু সময় সমর্থন করিয়াছেন। জগতের সর্বত্রই কবিদের সহানুভূতি পায় বিজিত পক্ষ। এই একটি ক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত দুর্বল পক্ষকে দেখিয়া কবির দুঃখের পরিবর্তে আনন্দ হইয়াছে। কবিদের সবই বিপরীত।

কবি রাধাদেহে নখরেখা দেখিয়া সুতৃপ্ত চিত্তে অলঙ্কার যোজনা করিয়াছেন। অলঙ্কারের পর অলঙ্কার। কবির খুশী তাহাতে ধরা পড়িয়াছে। দেহমেদিনীতে প্রেমের খননচিহ্নগুলিকে কবি সৌন্দর্যচিহ্ন করিয়াছেন। আমরা নখ-লেখনীর সৌন্দর্যস্বাক্ষর পাইয়াছি তাঁহার পদে।

কুচের উপর নখরেখা : কুচের কতকগুলি প্রচলিত উপমান আছে, যথা কনকাচল, মেরুশিখর, শম্ভু, কমল। নখরেখার উপমান—চন্দ্ররেখা বা রক্তবর্ণ কিংশুক ফুল। এই উপমানগুলিকেই নানাভাবে ভাঁজিয়া, নানা হাতে কবি বিলি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত লওয়া চলে।

মেরু-শিখরে নব শশধর—এই কল্পনা আনা হইয়াছে তিনটি পদে—৩, ৫১, ও ১৩৯। পয়োধরে চন্দ্ররেখার কথা আছে দুইটি পদে—৮০, ২৯৭। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পয়োধরকে স্পষ্টতঃ পর্বত বলা হয় নাই, অনুমানে ধরিতে হইবে, এবং ধরিতে হইবেই। কিন্তু যেখানে নখচিহ্ন সম্বন্ধে বলা হইল—'নব শশিতুল্য অনুরাগের অঙ্কুর' (৭৭), সেখানে পয়োধরকে পর্বত কল্পনা করার প্রয়োজন নাই, করিলে ঐ ভাবগর্ভ ছত্রটির সৌন্দর্য নষ্ট হইবে। এখানে প্রেমের পীড়নের কথা আমাদের মন হইতে মুছিয়া যায় ; প্রেমের উদ্‌ভ্রান্ত আবেগ রেখাচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—কবি তাহার সহিত চন্দ্ররেখার তুলনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, তাহা অনুরাগের অঙ্কুর।

এইরূপ আর একটি চির অম্লান পুরাতন কল্পনা—শিবশিরে চন্দ্রকলা। কুচকে শিব-কল্পনা করা হয় বলিয়া নখরেখাকে শিবের মাথায় চন্দ্ররেখা ভাবিতে কবি সহজেই পারেন, পারিয়াছেনও (২৯৩ পদে), কিন্তু ঐ সুন্দর কল্পনাটি যে পরিবেশে উন্মোচিত, সেখানে ভাব-সৌন্দর্যের নিতান্ত অভাব।

বিদ্যাপতি কুচের প্রসঙ্গে শিবের কথা ভুলিতে অসমর্থ। তাঁহার দেহপূজা ও দেবপূজা একত্রে। কুচ-নখক্ষতের প্রসঙ্গে শিবকে অন্যত্রও পাওয়া যায়। যেমন কিংশুক ফুলে শিবপূজার চিত্রটি। পয়োধর হইল শিব এবং নখক্ষত হইল কিংশুক ফুল। কৃষ্ণ রাধাবক্ষে নখ বসাইয়াছিলেন কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে, কবি কখনই এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন না। জিনিসটা সত্যও নয়। অথচ কামনার তাগিদে দেহ রক্তাক্ত হয়। কবি পীড়নকে শোধন করিলেন পূজার কল্পনায়—রক্তকিংশুক ফুলে শিবের অর্চনার কথা তাঁহার মনে জাগিল—

"তোমার পীন পয়োধরে সুন্দর নখচিহ্ন, সোনার শিবকে কেহ কিংশুক ফুলে পূজা করিয়াছে।"

কবি অন্যত্র বলিলেন—

"নখের রক্তরাগ দ্বারা পয়োধর-পূজা হইয়াছে।" (১৩১)

এখানে নখের রক্তরাগকে কিংশুক বা পয়োধরকে শিব স্পষ্ট বলা হয় নাই, অথচ কবি ব্যঞ্জনায় তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন, বিদ্যাপতির কল্পনারীতি অনুসরণ করিলে সহজেই বোঝা যায়।

শিবের উল্লেখমূলক অলঙ্কারের অন্যগুলির দৃষ্টান্ত এখানেই দেওয়া ভাল। নখক্ষতকে রূপরেখা-রূপে দেখিতে পারেন নাই কবি সকল সময়। কখনো কখনো তাঁহার স্বপ্ন ভাঙিয়াছে। সে ক্ষেত্রে, আঘাতের কারণে শিব ভাঙিয়া গিয়াছে—এরূপ বর্ণনাও করিয়াছেন দুই পদে (৬৮, ৪৮১)। পয়োধর যেখানে শিব নয়—সোনার বাটী মাত্র—সেখানেও ভাঙনের কথা আছে। ধৃষ্ট চোর নাগর কিভাবে সোনার বাটীর দিকে ধাবিত হইয়া ধরিবার চেষ্টায় তাহাকে নখের আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, তার চাতুর্যপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় ৬৯০ পদে।

কুচের সঙ্গে কমলের তুলনা করা হয়। তাই কুচ-নখক্ষতের ভাবনায় 'দুইটি পদ্মের উপর যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ' (২৬)—এই চিত্র কবির মনে জাগিয়াছে। ওদিকে কনকাচলে কিংশুকের কথাও পাইতেছি ২৯৮ পদে।

পয়োধরের চিত্রকল্পনায় কবি রীতিমত শৈব। অটুট পয়োধর হইলেও শিব, তাহাতে নখক্ষত থাকিলেও শিব (নখচন্দ্ররেখার ধারকরূপে)—শিব আছেনই—তার উপর আছে শিবের প্রিয় ফল বেল। নখক্ষত ভাবিতে কিংশুক ফুলও স্বতঃই আসিয়া যায়। একটি পদে তিনি শ্রীফল ও কিংশুককে মিলাইয়াছেন—"সে কাঁচা শ্রীফলে নখমূর্তি দিল, যেন কিংশুক ফুলের কুঁড়ি হইল।" (৭৭)

কিন্তু যত সৌন্দর্যই দেখুন, কবি শেষপর্যন্ত নখক্ষতের ক্ষুধারূপকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কামনার বিদারণ-রূপ কয়েকটি পদে ফুটিয়াছে। কম্পিত ভয়ার্ত নায়িকা নিজের উপর নায়কের নখাস্ত্রঘাতের বর্ণনা করিয়াছে ৪১১ পদে। আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ—"সুন্দর কুচযুগল নখের ক্ষতে ভরিয়া গেল—সিংহ যেন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করিল।"

এখনো তবু কামনার প্রবলতার কথা আছে—যে প্রবলতা গ্লানি হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল কেবলই ক্ষুধা, যেমন, যেখানে মুগ্ধাকে পিষিয়া কাঁচা বদরীকে নায়ক রক্তবর্ণ করিয়াছে (২৭৮), বা সর্বাপেক্ষা তীব্র চিত্র—"(কুচদ্বয়) শ্রীফলের ন্যায় ছিল, (এখন), আবরণশূন্য নারঙ্গ ফলের ন্যায় করিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন ......দুই হস্তে ছিল ক্ষুধিত নখর।" (২৯১)

কামনাকে কিরূপে সুন্দর করিতে হয়, তার কিছু নমুনা কুচ ও নখরেখার আলোচনায় দেখিলাম। বিদ্যাপতি সব কিছুকে সুন্দর দেখিতে চান—বেদনাকে, কামনাকে—সব কিছুকে। সব কিছুর উপর একটি রূপের আবরণ টানিতে না পারিলে যেন তাঁহার স্বস্তি নাই। এই কথাটি কুচ ও নখক্ষত বিষয়ে একটি বর্ণনা মধুরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—"প্রিয়তম যাহা কিছু দিল, সে কাঁচুলীতে ঢাকিয়া লইল এবং হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিল" (৬৪)। সামান্য কথায় অনেকখানি বক্তব্য এখানে।

অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে যুক্তভাবে কুচ এক শ্রেণীর অলঙ্কারের বিষয়বস্তু হইয়াছে, যেখানে কবি কতকগুলি বিসদৃশ বস্তুকে একত্র দেখার আমোদে ব্যতিব্যস্ত। যেমন ২৫ পদে সোনার কদলীর উপর সিংহ, তাহার উপর মেরু, তদুপরি দুই কমল, কমলের আবার নাল নাই ইত্যাদি (২৫, ২৬)। সোনার কদলী হইল উরু, সিংহ কটি, কমল কুচ। ২৬ পদে এগুলিকে শুধু একত্র করার আহ্লাদ, ২৫ পদে তিনি একটু ব্যাখ্যাপ্রবণ—জল বিনা কিভাবে পদ্ম বাঁচিয়া আছে, সেই রহস্যটুকু মোচন না করিয়া পারে নাই। গঙ্গাধারারূপী হার জলসঞ্চাররূপ সেচকার্যটি করিয়াছে।

এখানে অলঙ্কারের দোকানদারি।

(খ) হার এবং—

হার এবং কেশ: অলঙ্কার এই—"চুল খুলিয়া গেল, হারে জড়াইয়া গেল, যেন গঙ্গাযমুনার মিলন হইল" (৪৯৮)। বিপরীত রতির বর্ণনায় কথিত। হার গঙ্গা, কেশ যমুনা।

হার এবং নখক্ষত ঃ- এইরূপ একটি অলঙ্কার আছে, যার লক্ষ্য বুদ্ধি-চাতুর্যসৃষ্টি। সখীর নিকট উপভুক্ত নায়িকা ছদ্ম কৈফিয়ৎ দিতেছে। নিজ-বক্ষক্ষতের কারণরূপে বলিতেছে—"(বক্ষের বস্ত্র পবনে বিস্রস্ত হওয়ায়) মনোহর হার ব্যক্ত হইল, তাহা উজ্জ্বল সর্পের মত দেখাইল। সেইজন্য ময়ূর বেগে ঝাঁপ দিল, নখর বিদ্ধ করিল" (৩৫০)। নায়িকা এখানে নিজ রূপবর্ণনায় আলঙ্কারিক কবির স্থান লইয়াছে, এবং সখীকে সমঝদার হইতে বলিতেছে। সবই প্রেমের বৃন্দাবনের ব্যাপার।

(গ) কর এবং—

কর এবং মুখের একটি অলঙ্কারের আলোচনা আগেই করিয়াছি, যেখানে নায়িকা দুই হাত ঘুরাইয়া সুন্দর ছন্দে নিজের মুখকে বেষ্টন করিয়াছে, ও তাহা দেখিয়া কাম কর্তৃক চম্পক ফুলে শারদ চন্দ্রের পূজার কথা মনে হইয়াছে কবির। অলঙ্কারটিতে হাত ঘুরাইয়া মুখবেষ্টনের কথা বলা হইলেও একই সঙ্গে করাঙ্গুলি ও মুখের কথাও মনে রাখা হইয়াছে (৬২২)।

হাত-মুখ-কেশ-বস্ত্র একটি অলঙ্কারে মেলে—"(সে) মৃদু হাস্য করিয়া অর্ধ বদনচন্দ্র দেখাইল, এবং অর্ধ নিজ বাহুতে ঢাকিল। তাহাতে (বদনচন্দ্রের) কিছু একভাগ মেঘে ঢাকিল, কিছু ভাগ রাহু গ্রাস করিয়া রহিল" (৬২১)। অলঙ্কারের অর্থ—রাধা হাসিয়া মুখে খানিক কাপড় টানিয়াছেন। তাহাতে মুখ কিছুটা আবৃত হইয়াছে—ইহা হইতে নীলাম্বররূপ মেঘে চন্দ্র ঢাকিল, এই কল্পনা আসিয়াছে। তাছাড়া মুখের পিছনে কেশ তো রহিয়াছেই, সুতরাং মুখচন্দ্র কিছু পরিমাণে কেশ-রাহু-গ্রস্ত।

(ঘ) করতল এবং—

করতল এবং মুখ ঃ "করতললীন মুখচন্দ্র শোভিতেছে, যেন অভিনব অরবিন্দে কিশলয় মিলিত হইয়াছে" (১৭০)। একই দক্ষে কবি মুখের

দুইটি উপমান দিলেন, চন্দ্র ও অরবিন্দ। করতলের উপমান হইল কিশলয়। "অভিনব অরবিন্দে কিশলয়'—অভিনব কল্পনা।

করতলের দ্বারা করতলের গ্রহণের কথা আছে ২৯৬ পদে। কৃষ্ণ ও রাধার পরস্পর করগ্রহণে পাণিগ্রহণের কল্পনা। ইহা অলঙ্কার হইত না, যদি সত্যই কৃষ্ণ রাধার 'পাণিগ্রহণ' করিতে পারিতেন। আলোচ্য পদে বিবাহের রূপক বর্ণিত। সেখানে অসামাজিক পাণিগ্রহণকে কবি পরিণয়ের পাণিগ্রহণের মর্যাদা দিতে চাহিয়াছেন।

২৯৯ পদে করতল সংক্রান্ত অনেকগুলি অলঙ্কার—

(১) "করতলে মুখ ঢাকিও না, তোমার সুন্দর মুখের শোভা অত্যন্ত চপল হইল, কতক্ষণ লুকাইয়া রাখিবে?"—এখানে অলঙ্কার স্পষ্টোচ্চারিত নয়। করতলের আবরণ ভেদ করিয়া চপল মুখ বাহির হইয়া পড়িতেছে, এই চিত্রে সৌন্দর্য আছে।

(২) "রক্তকমলে যেন কমল বসাইল, তাহাতে নীলকমল, তাহার মধ্যে তিলক পুষ্প দেখিয়া ভ্রমর ধীরে আসিবে।" একেবারে পুষ্পবন। চারটি ফুলের তিনটি তিন জাতীয় পদ্ম। করতল হইল রক্তকমল, তদুপরি স্থাপিত বদন হইল সাধারণ কমল, এবং ঐ বদনের নয়ন হইল নীলকমল। ললাটে তিলক আছে, সেও একটি পুষ্প। এমন পুষ্পকাননে নায়ক ভ্রমরের বিহার-বাসনা স্বাভাবিক।

(৩) "করপল্লবে লগ্ন বিম্বফলতুল্য অধর, দাড়িম্ববীজতুল্য দশন দেখিয়া কীর (শুক) পক্ষীর লোভ হয়, কিন্তু ভ্রূকে ধনু মনে করিয়া সে কাছে আসে না।" বলিবার কিছুই নাই। কারণ কবি বলিতে কিছু বাকি রাখেন নাই।

করতল-হস্তাঙ্গুলি-নখের অলঙ্কার: "শাখাশিখরে চন্দ্রশ্রেণী, তাহাতে অরুণের সদৃশ নবপল্লব।" (৬৩০)। বাহু হইতেছে শাখা, অঙ্গুলি তাহার শিখর; নখ হইল চন্দ্র। করতল অরুণবর্ণ নবপল্লব।

(ঙ) নখ এবং—

নখ এবং কেশের অলঙ্কার : যুবতী স্নানকেলি করিয়া সানন্দে যমুনাতীরে উঠিল, কেশে জড়ানো হার গুছাইবার সময় যেন যূথে যূথে চাঁদের উদয় হইল" (২২৯)। এক চাঁদে রক্ষা নাই, যূথে যূথে চাঁদ। কবি কেশাকাশে চন্দ্রগুচ্ছ দেখিয়া খুব খুশী।

বঙ্গদেশের যৌগিক অলঙ্কার এখানেই শেষ।

নিম্নদেহ

(এই অংশে আছে—রোমাবলী, কটি, কিঙ্কিণী, নীবি, নাভি, ত্রিবলী, নিতম্ব, উরু জঙ্ঘা, চরণ, আলতা, পদনখ)

নিম্নদেহের বিভিন্ন অঙ্গের অযৌগিক বা যৌগিক, যে কোনো ধরনের অলঙ্কারেই 'দেহ' কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রিত। বিদ্যাপতির কাব্যে গোটা দেহের অলঙ্কার-রচনার ব্যাপারে দেহধর্মিতা স্পষ্ট। তবু ঊর্ধ্বদেহের ক্ষেত্রে কখনো কখনো সৌন্দর্যবর্ণে ধৌত চিত্র দেহের উগ্রতার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। কিন্তু নিম্নদেহ, যা লোকলোচনের প্রকাশ্য লক্ষ্যবস্তু নয়—কবির কামনাকণ্ঠের জয়ধ্বনি পাইয়াছে। নিম্নদেহ প্রভূত পরিমাণে কাব্যিক রূপসম্ভোগের আশ্রয় হইয়াছে—ইহা প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাপতি এই বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী। এ জাতীয় অলঙ্কারে বিদ্যাপতি সৌন্দর্যের দ্বারা কামনার প্রখর রূপকে অভিভূত করিতে পারিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ আগ্রহ রহিয়া গেল। এবং, তিনি কি এখানেও 'আধ্যাত্মিকতা' আনিয়াছেন !!

নিম্নদেহের অলঙ্কারে সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে বাধা অনেক। সে বাধাকে অতিক্রম করিতে বিদ্যাপতিকে বেগ পাইতে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অতি-মাংসলতা বিদ্যাপতির কাব্যের সাধারণ দোষ। সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্যধারার অনুসারক-রূপে প্রথাগত দেহবর্ণনায় তিনি বাধ্য। তিনি ইন্দ্রিয়-বিলাসী রাজসভার আশ্রিত কবিও বটেন। নিজস্ব ভাবেও দেহগত প্রেমে তাঁহার প্রীতি থাকিতে পারে। যেখানে কাব্য এতখানি দেহভারগ্রস্ত, সেখানে আরো বেশী চাপাইলে তাহা কামনার স্বেদপুঞ্জে রূপান্তরিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তেমন হইয়াছেও। তবু বিদ্যাপতি কবি ছিলেন, যথার্থই কবি, সুতরাং তাঁহাকে একই সঙ্গে ভাবিতে হইয়াছে, কিভাবে এই দেহের জাঙাল ভাঙিবেন। দেহকে অস্বীকার করিলে সহজেই তাহা ঘটিতে পারিত। বিদ্যাপতির পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না, তিনি তাহা বোধহয় চাহিতেনও না। নিম্নদেহের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য-রচনায় আরো একটি অসুবিধা ছিল, যার ইঙ্গিত পূর্ব অনুচ্ছেদে দিয়াছি—

দেহের এই অংশ (চরণতল ভিন্ন) সাধারণ দৃষ্টির গোচর নয় সাধারণভাবে। সেক্ষেত্রে সাধারণ সৌন্দর্যসংস্কারের সহায়তা কবি পান নাই। নিরত দৃষ্টবস্তুতে অদৃষ্টপূর্বের আবির্ভাব ঘটাইয়া কবিরা আমাদের চমকিত করেন। কিন্তু আবরণ লুঠিয়া অন্তরালে যাহা দেখিতে হয়, সে সৌন্দর্য লিখিতে গেলে তাহাতে ব্যগ্র হস্ত ও লুব্ধ নখরের রেখাচিহ্ন থাকিয়া যায়। বিদ্যাপতি কাব্যের এই গ্লানিচিহ্নকে এড়াইবেন কিভাবে? অথচ না এড়াইলে কবিতার মৃত্যু।

কবি দুইভাবে তাহা এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি নিম্নদেহের ব্যাপারে সৌন্দর্যদৃষ্টিকে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়লিপ্সার উপরে রাখিয়াছিলেন। ঊর্ধ্বাঙ্গের ব্যাপারে দেখিয়াছি, কিভাবে পুরুষ-গৃহীত নারীরূপ কাব্যের উপাদান হইয়াছে। নিম্নদেহ সম্বন্ধে বলা চলে, এখানে পুরুষ-পীড়িত রূপ কাব্যের বর্ণনীয় বস্তু নয় সাধারণভাবে। যদি হইত তাহা হইলে বিদ্যাপতি-পদাবলীর এই অংশকে নিছক কোকশাস্ত্র বলিতে বাধা থাকিত না। এখানে মূলতঃ কবি অক্ষত দেহকেই দৃষ্টি-নন্দিত করিয়াছেন। অর্থাৎ কবি সৌন্দর্যের অক্ষত, অক্ষয় রূপের বন্দনা করিতে চাহিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ কবি এই অংশের স্থূলতা হরণ করিতে অন্যান্য অংশের মতই অধ্যাত্মরূপকেও যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা অভ্যাসবশেও হইতে পারে। তবু নিম্নদেহের ক্ষেত্রে দেবতা-স্মরণ একটু বেশী সাহসের ব্যাপার। এবং সে সাহস-অবলম্বন বিশেষ উদ্দেশ্যবশেও হইতে পারে। বিদ্যাপতি হয়ত জপ-তপ-পূজা-দেবতাকে দেহের গোপন অংশে টানিয়া তাহার উপর দিব্য আলোকসম্পাত করিতে চাহিয়াছিলেন। সে প্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতার রূপ ক্রমে লক্ষ্য করিব।

নিম্ন দেহাঙ্গের অযৌগিক অলঙ্কার সংখ্যায় অল্প। অনেকগুলি অঙ্গকে একত্র দেখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ স্থানে। কবি যে, এক্ষেত্রে প্রতি অঙ্গবিষয়ে সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপদর্শনের আকর্ষণ কাব্যে দমন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সুখের বিষয়।

রোমাবলী

রোমাবলী হইল "হৃদয়-মধ্য হইতে নাভি পর্যন্ত লম্বিত সূক্ষ্ম রোমরাজি।" সুতরাং রোমাবলীর জন্য 'বক্ষদেশ' পর্যায়ের দাবীও যথেষ্ট। কিন্তু ইহার অধিকাংশ অলঙ্কার নাভির সঙ্গে যুক্ত থাকায় ইহাকে নিম্নদেহ অংশেই স্থাপন করিয়াছি।

নিছক রোমাবলী সম্বন্ধে অলঙ্কার একেবারেই মিলিতেছে না। ৮৯ পদ জানাইয়াছে—লতাগুচ্ছ, শৈবাল ও কজ্জল—ইহার তিন উপমান।

কটি

৮৯ পদে কটির উপমান—ডমরু ও সিংহ। ৩১ পদে আছে—'সিংহ জিনিয়া কটি'; ২৩৬ পদেও "কটি কেশরীর তুল্য"।

কিঙ্কিণী

কিঙ্কিণীর সুন্দর দুটি অলঙ্কার—মিলনে চরমোন্মত্ত নারীদেহের কিঙ্কিণী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"কিঙ্কিণীমালা মধুর বাজিতে লাগিল, যেন মদন-রাজের জয়তূর্য" (৪৯৫)। পদ বিপরীত রতির। সুতরাং মদনের চূড়ান্ত বিজয়। কিঙ্কিণীমালা সে বিজয়ের ঘোষণাবাদ্য। অপরপক্ষে যখন পূজা-শুচি অন্তরে স্বদেহে প্রিয়মন্দির রচনা করিতেছেন রাধিকা, তখন কিঙ্কিণী হইয়াছে উৎসবের মঙ্গলসজ্জা—আম্রপল্লব (৭৫৪)। প্রেমের দুই শিখরকে উৎকৃষ্ট-ভাবে কিঙ্কিণীকেন্দ্রিক অলঙ্কার দুইটি ফুটাইয়াছে।

নীবি

অলঙ্কার সংখ্যায় অল্প। নায়কের রূপাহত চিত্ত-বিষয়ে বলা হইয়াছে—নায়িকা যখন স্নানান্তে নীবিবন্ধের উদ্দেশ করিল, তখন নায়কের আকাঙ্ক্ষা চরম সীমা পাইল (৬২৬)। সতীশচন্দ্র রায়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী (সংস্করণে

উদ্ধৃত) 'শ্লথ কটিবসন-গ্রন্থি বন্ধনকালে, নায়ক নায়িকার নাভিমূল দর্শন করিতে পারার মতো সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিল। এখানে অলঙ্কার পাইতেছি না, কার্যতঃ ইহা চাতুর্যপূর্ণ বর্ণনা।

নীবিবন্ধ স্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়ার পরবর্তী অবস্থা আরো একটি বর্ণনার বিষয়বস্তু—"নীবি] স্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, দেহ দেহের শরণে লুকাইল" (২৪০)। কার দেহ কার দেহের শরণে লুকাইল? সংস্করণের ব্যাখ্যানুযায়ী নায়িকার দেহ নায়কের দেহের শরণে লুকাইয়াছিল। এই ব্যাখ্যা চলিতে পারে। কারণ ঠিক পূর্বেই রাধিকা বলিয়াছেন—'সজনি, আজ মাধবকে দেখিলাম, ফলে লজ্জা তাহার মহিমা ত্যাগ করিয়া পলাইল। সে ক্ষেত্রে বর্তমান বর্ণনার দ্বারা স্রস্ত-নীবি রাধিকা কৃষ্ণের আলিঙ্গনে আবৃত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু আলোচ্য বর্ণনার অর্থগৌরব বাড়িয়া যায়, যদি ছত্রটির আক্ষরিক অর্থকেই গ্রহণ করি—দেহ দেহের শরণে লুকাইল, মানে রাধার দেহ নিজ দেহের শরণেই লুকাইল। রাধা সখীর নিকট কৃষ্ণদর্শনে তাঁহার দেহবিকার বর্ণনা করিতেছিলেন। পদে স্পষ্টভাবে মিলনের বা আলিঙ্গনের কথা নাই। লজ্জা যে মহিমা ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল, এবং নীবি যে স্রস্তভাবে খসিয়া পড়িয়াছিল, সে অসহ্য দেহাবেগে। দেহের শিহরণ সমস্ত সংকোচ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে—আপনার অবশে বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে—কিন্তু তাহার পরেই ঐ অনাবৃত দেহ দেহেরই সংস্কারে সঙ্কুচিত হইয়াছে আপনার মধ্যে। রাধা সেই অবস্থাটিকে 'দেহ দেহের শরণে লুকাইল' এই বর্ণনার দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। রাধার সেই উদ্‌ভ্রান্ত, সঙ্কুচিত, অথচ বাসনা-শিহরিত অবস্থা পদের শেষ ছত্রে পরিস্ফুট—'সখি, সব দিকে সেই এক কানাইকেই দেখি।' যে কানাইকে দেখিয়া রাধার দেহ অধীর হইয়াছে, যাহা তাহার নারী-লজ্জা মহিমা নাশ করিয়াছে—চতুর্দিকে সেই কৃষ্ণেরই দৃষ্টিদর্পণে আপনাকে প্রতিফলিত দেখিয়া রাধা নিজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজেকে ঢাকিতে চাহিতেছেন—রাধিকার এই বিচিত্র মানসিক অবস্থার রূপ পদটিতে পাইতেছি।

নীবির একটি স্পষ্ট অলঙ্কার পাওয়া যাইতেছে ৬৬ পদে—"মুক্ত নীবিবন্ধন আনিয়া মিলাইল, যেন গঙ্গা উত্তর দিকে প্রবাহিত হইল।" অলঙ্কারের অর্থ—বসন নদীধারার মত—তাহা নিম্নমুখে ধাবিত হয় নদীর

[illegible]। গুহেন বসনে গ্রন্থি দেওয়া যেন নদীধারাকে উত্তরে অর্থাৎ বিপরীত দিকে চালিত করা। কিন্তু কবি বসনকে গঙ্গা করিলেন কেন? —নীলাম্বরীর স্বাভাবিক উপমান নীল যমুনা তো ছিলই।

এই উপমাটির দ্বারা নীবিবন্ধন সম্বন্ধে কবির মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধনের অবস্থায় নীবি অলঙ্কারের উপাদান নয়—বন্ধন ঘুচিলে তবে কবিরা আকৃষ্ট। দেহবসনকে নদীধারা করিয়া, ঐ নদীর স্বাভাবিক গতিকে নিম্নমুখী নির্দেশ করিয়া, কবি নীতিনিষ্ঠার পরিচয় দেন নাই।

নাভি : ত্রিবলী

নাভি-বিষয়ে অযৌগিক অলঙ্কার পাওয়া যায় না। আমাদের শেষাশ্রয় ৮৯ পদ নাভির উপমানগুলি জানাইয়াছে—সরোবর এবং পদ্মদল।

ত্রিবলীকে ৮৯ পদে বলা হইয়াছে, রঙ্গিণী তরঙ্গিণী। ৪৭৮ পদে নায়িকার নিম্নদেহকে দুর্গ বলা হইয়াছে, যাহা "ত্রিবলীরূপ তরঙ্গিণীর দ্বারা বেষ্টিত।"

নিতম্ব

সংস্কৃত সাহিত্যে নিতম্ব গুরুত্বে অসাধারণ। নিতম্বের গুরুভারের কথা বিদ্যাপতিও বলিয়াছেন। ৮৯ পদে নিতম্বের গতানুগতিক উপমান —গজকুম্ভ। ৭৫৪ পদে নিতম্বের সঙ্গে কদলীর তুলনা করিয়াছেন কবি— "কদলী রোপব হাম গরুআ নিতম্ব।" সংস্করণের অনুবাদে বলা হইয়াছে— "আমার গুরু নিতম্বরূপ কদলী রোপণ করিব।" নিতম্বকে কদলীর সঙ্গে তুলনা করা অভিনব। দৃশ্যতঃ অন্ততঃ কদলীতে ও নিতম্বে সাদৃশ্য নাই। আমার মনে হয়, ঐ অংশের অনুবাদ হইবে—গুরু নিতম্বে কদলী অর্থাৎ কদলীরূপ উরুদ্বয়, রোপণ করিব। এইরূপ করিলে অর্থসঙ্গতি আসে।

উরু : জঙ্ঘা

উরুর অযৌগিক অলঙ্কার নাই। ৮৯ পদে কদলী ও হস্তীশুণ্ড উরুদ্বয়ের উপমান।

"হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত অংশ"—জঙ্ঘা।

জঙ্ঘার একটি মাত্র অলঙ্কার মিলিতেছে, চমৎকার সেটি—"করভের কোমল শুণ্ডের ন্যায় সুশোভিত জঙ্ঘাযুগলের আরম্ভ, (প্রথমদিক) দেখিয়া মনে হয় যেন মদনরূপ মল্ল ব্যায়ামের জন্য সোনার স্তম্ভ গড়িয়াছেন" (৩০)। অলঙ্কারের প্রথম অংশে জঙ্ঘার বহিঃরূপ অলঙ্কারের উপাদান, করভের কোমল শুণ্ডের ন্যায় জঙ্ঘার রূপ। ঐ জঙ্ঘা কবির মনে আরো একটি অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দৃশ্যরূপ এবং চরিত্ররূপ উভয়ই প্রকাশিত। জঙ্ঘার আরম্ভ গোড়ালির কাছ হইতে। সেই অংশ অপেক্ষাকৃত সরু। ক্রমে স্থূল হইয়াছে। সুবর্ণাঙ্গী রাধার ক্রমস্থূল চরণাংশকে সহজেই মল্লের ব্যায়াম-মুদ্গর ভাবা যায়। কিন্তু এমন অপূর্ব মুদ্গরে ব্যায়াম করে কে? কবি উত্তর দিয়াছেন—মদন। মদনের উপরেও একজন আছেন—যাঁহার নাম মদনমোহন।

চরণ : আলতা

মধুর রসের বৈষ্ণবী কাব্য শ্রেষ্ঠাংশে চরণ-শরণ। জয়দেব বৈষ্ণবের কাছে মহাজন, কারণ তিনি লিখিয়াছেন—'দেহি পদপল্লবমুদারম্'। বিদ্যাপতির কৃষ্ণও রাধাচরণকে শিরোধার্য করিয়া ধন্য মানিয়াছেন।

চরণের অলঙ্কার কিন্তু বেশী নাই। ৮৯ পদে চরণের উপমান, স্থল-কমল। ২৫ পদেও বলা হইয়াছে—"চরণ, কমলের ন্যায় শোভিত।" এবং সেই একই কথাকে যতদূর উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় বিদ্যাপতি দুইছত্রে তাহা করিয়াছেন—

> যহাঁ যহাঁ পদযুগ ধরঈ।
> তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥

"যেখানে যেখানে পা দুটি পড়ে সেখানে সেখানে কমল ভরিয়া ওঠে"

আলতার একটি মাত্র উপমা, এবং তাই যথেষ্ট। কয়েকটি শব্দের সাহায্যে চরণের আলতা আগুনের বর্ণে জ্বলিয়া চিররূপত্ব পাইয়াছে—

চরণজাবক হৃদয়পাবক
দহই অঙ্গ মোর। (৬২২)

"তাহার চরণের আলতা আমার হৃদয়ের অগ্নিশিখা—সকল অঙ্গ দহন করিতেছে।"

পদনখ

পদনখ হস্তনখের মত সৌভাগ্যশালী নয়। হস্তনখ মন্মথের অন্যতম প্রধান অস্ত্র। নায়ক-নায়িকা নখের দ্বারা পরস্পরকে বিঁধিয়া ভালবাসা জানায়। পদনখ দিয়া বড় জোর বিরহকালে নায়িকা ভূমিতে দাগ কাটে।

৮৯ পদ, নখর সম্বন্ধে করকবীজ, চন্দ্র ও রত্নের যে উপমানগুলি দিয়াছে, তাহা হস্ত ও পদ উভয়বিধ নখ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। ৬৩০ পদে রাধিকা তাঁহার সখীর নিকট 'অপরূপ স্বপ্নস্বরূপ' এক দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন—

"কমলযুগলের উপর চাঁদের মালা, তাহার উপর তরুণ তমালবৃক্ষ" ইত্যাদি। ঐ পদে কৃষ্ণের রূপের আপাদমস্তক বর্ণনা—উদ্ধৃতাংশ তার পায়ের দিক। কমলযুগল হইল চরণদ্বয়, চাঁদের মালা নখপংক্তি, তরুণ তমালবৃক্ষ উরু।

নিম্নদেহের যৌগিক অলঙ্কার

(ক) রোমাবলী এবং—

রোমাবলী এবং দেহ সম্বন্ধে কবির বর্ণনায় অর্থগৌরব আছে—

"কোমল সুবর্ণ-নির্মিত মূর্তিরূপ পত্রে মদন মসী অর্থাৎ রোমাবলী লইয়া আপনার কথা লিখিল। অক্ষরপংক্তি পড়িতে পারি না, দেখিয়া দেহকান্তি (অর্থাৎ কান্তিময় দেহ) পুলকিত হয়" (২৩১)।

রোমাবলী বিষয়ে অলঙ্কারগুলিতে চিত্ররূপ ও অর্থরূপ দুইই আছে। চিত্ররূপের দৃষ্টান্তরূপে ২২ পদের অলঙ্কারটির উল্লেখ করা যায়—"নাভিবিবর

হইতে রোমাবলী বাহির হইয়াছে, যেন ভুজঙ্গিনী নিঃশ্বাস লইবার জন্ম বাহিরে চলিয়াছে, কিন্তু সে (ভুজঙ্গিনী) যেন নাসাকে গরুড়ের চঞ্চু মনে করিয়া কুচযুগের সন্ধিস্থলে নিবাস করিল।" রোমাবলী-নাভি-নাসা-কুচকে একত্র করা হইয়াছে এই অলঙ্কারের মধ্যে। নাভি হইতে বক্ষসন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত রোমরেখা কবির কাব্যে চিত্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে; অন্যদিকে ঐ চিত্রকে তিনি আলঙ্কারিক কবি-কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিয়াছেন সুকৌশলে।

উপরিউদ্ধৃত অলঙ্কার অপেক্ষা অর্থচারুত্ব অপর একটি অলঙ্কারে বেশী পাওয়া যায়—"কটি ক্ষীণ, দেহের ভারে উহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে—(দেহ) সাজাইয়া বিধাতার এই অনুতাপ হইল; তাই নীল রেশমের সূতা অতিশয় দৃঢ় জানিয়া উহা দিয়া রোমরাজি সৃষ্টি করিলেন" (২৪)। এই অলঙ্কারে রোমাবলী-কুচ-কটি একত্রিত। ঐ পদের অন্য অংশে অচলবৎ গুরুভার পয়োধরের কথা বলা হইয়াছে। ভারতীয় কাব্যকল্পনা অনুযায়ী কটি কিন্তু ক্ষীণ হইবেই। এই অবস্থায় দেহ খাড়া থাকা সম্ভব নয়। অথচ তাহা আছে। কবি এই অসঙ্গতি দূর করার ইচ্ছায় সন্ধানকার্য চালাইয়াছেন এবং সন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্ত আমাদের জানাইয়াছেন—"নীল রেশমের সূতারূপ রোমরাজি দিয়া কটি ও কুচ একসঙ্গে বাঁধা বলিয়া উধ্বাঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায় না।" কবির ব্যাখ্যায় ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্বাভাবিকত্বের পক্ষে সুনিপুণ সমর্থন পাইলাম। এই জাতীয় আর একটি অলঙ্কার 'ত্রিবলীর' আলোচনায় পাইব।

অদ্ভুত ব্যাপারের হেতু সন্ধানের জন্য কবি কিরূপ গবেষণা করেন দেখিলাম। সর্বত্রই কিন্তু তিনি দুর্জ্ঞেয়র কারণ নির্দেশ করিয়া চমকরস মারিয়া দেন না। কখনো কখনো পাঠককে অবাক করিয়া এবং নিজে অবাক হইয়া তবে তাঁহার আনন্দ। যেমন—"নদীর কূলে যেন গভীর এক কূপ, সেখানে জল নাই তবু শৈবাল জন্মিয়াছে।" এখানে রোমাবলী-নাভি-ত্রিবলী একত্রে যুক্ত। নদী হইল ত্রিবলী, কূপ—নাভি, এবং শৈবাল—রোমাবলী।

রোমাবলী-কুচ-নখক্ষত-নাভিকে একসঙ্গে পাওয়া যায় একই কল্পনার বেষ্টনীতে—"কুচযুগ কুম্ভস্বরূপ (হস্তীর মস্তক) হইল, তাহাতে বাঁকা নখক্ষত যেন অঙ্কুশের মত দেখাইতেছে। রোমাবলী হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, উহা যেন জলপান করিবার জন্য নাভিকূপের দিকে অগ্রসর হইতেছে"

(২২)। গোটা প্রকৃষ্ট হাতীর রূপকে আবৃত। উদ্ধৃত অংশের পরেই বালা সাজসজ্জা করিয়া যৌবনরূপ গজরাজে চড়িয়া চলিয়াছে, মদনরূপ মাহুত তাহার প্রসাধন করিয়াছে—এইরূপ বর্ণনা। উদ্ধৃত অংশের প্রথমে নখরক্ষিত কুচের সঙ্গে অঙ্কুশ-চিহ্নিত হস্তীমস্তকের তুলনা। অত বেশী অঙ্কুশ-প্রহার যখন করিতে হইয়াছে, তখন হস্তী নিশ্চয় অবাধ্যতাবশে ঘুরিয়াছিল। অতএব ক্লান্ত হস্তীর তৃষ্ণা স্বাভাবিক—হাতী তাহার রোমাবলী-রূপ শুণ্ড বাড়াইয়া দিল জলপান করিবার জন্য। জলের যোগান দিতেও কবির অসুবিধা হইল না, কারণ তাঁহার আলঙ্কারিক কল্পনা কূপ-নাভিকে কাছেই পাইয়া গিয়াছে। আলঙ্কারমালায় সজ্জিত এই পদ। এইরূপ অজস্র পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে মেলে।

প্রেমকাব্যে বিদ্যাপতির দুই প্রিয় রূপক—যুদ্ধ এবং পূজা। উভয় জাতীয় রূপক নানা প্রসঙ্গে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। রোমাবলীর সঙ্গে যুক্ত অলঙ্কারেও পূজা-রূপকের দুইটি দৃষ্টান্ত পাইতেছি। কিছু পূর্বে বলিয়াছি—নিম্নদেহের অলঙ্কারের ব্যাপারে ভোগস্থূলত্বকে বিদ্যাপতি কিভাবে পরিহার করেন, তাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইবে। বর্তমানে আলোচ্য দুইটি অলঙ্কারে কামনার মধ্যে সাধনার রূপ আনিয়া কবি হয়ত সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। প্রথম অলঙ্কারে প্রথম-সমাগমে আগত নায়িকার বিবর্ণ মুখের সঙ্গে চন্দ্রগ্রহণের তুলনা করিয়া সখী বলিতেছে—"মাধব। দেখ পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে। তাহার মুক্তাহার গঙ্গাধারার তুল্য, রোমাবলী যমুনার তুল্য, ত্রিবলী ত্রিবেণীর সমান, আর কামদেব পুরোহিত।" অতঃপর সখী কৃষ্ণকে মদনের পূজা করিতে অনুরোধ করিয়াছে, যাহাতে নায়িকার মুখচন্দ্র রাহুমুক্ত হয়। এই অলঙ্কারে রোমাবলী-হার-ত্রিবলী-কামদেব-মুখ একত্রিত।

সত্যই কিন্তু এই ধরনের পদে বা অলঙ্কারে অধ্যাত্মভাবের সৃষ্টি হয় না। তবে ইহাদের দ্বারা লালসারূপ আবৃত হয় কিছু পরিমাণে। উদ্ধৃত অলঙ্কারে নায়িকার ক্ষতিগ্রস্ত মুখ হইল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র। চন্দ্রগ্রহণের কথা যখন উঠিল, তখন কল্পনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিতে কবি উৎসুক হইলেন। রাধার দেহের হার ও রোমাবলীকে গঙ্গাযমুনার ধারা করিয়া ত্রিবলীর ত্রিবেণীতে তাহাদের সঙ্গম সৃষ্টি করা হইল। এমন স্থান তপস্যার পক্ষে অতীব উপযোগী।

পুরোহিতের দরকার যদি হয়—কবি কাম-পুরোহিতকে হাজির করিয়াছেন। এবং দেবতা? কবি এইখানে একটি কৌশল করিয়াছেন—ব্রাহ্মণই ব্রজা হইয়াছেন—কামদেব এক সঙ্গে পূজারী এবং পূজার্হ উভয়ই।

৪৯২ পদের অলঙ্কারে পুনশ্চ নিম্নদেহের প্রয়াগ-তপস্যার কথা পাইতেছি। সেখানে শ্যামল লোমলতা যমুনা, এবং হার গঙ্গার ধারা। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে মাধব রাধার বদনচন্দ্রের দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রার্থনা কেবল মুখচন্দ্রের দর্শনের জন্যই নয়, আরো কিছুর জন্য। মাধব এক পূজাদৃশ্য দেখিবার জন্যও উৎসুক। বিপরীত রতি বর্ণনামূলক এই পদের সূচনায় কবি পূজা-ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন—"মুক্ত কবরী ও অবনত আনন অনাবৃত স্তন স্পর্শ করিতেছে। যেন কাম কমল (বদন) লইয়া চামর (কেশ) চালিয়া স্বর্ণশম্ভু (পয়োধর) পূজা করিল।

(খ) কটি এবং—

গতানুগতিক কল্পনা আছে ২৫ ও ২৬ পদের অলঙ্কারে, যেখানে কটি-উরু-কুচকে একত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। সোনার কদলীর উপর সিংহ, তার উপর মেরু দেখিয়া কবি বিস্ময়াহত। সোনার কদলীকে উরুরূপে, কটিকে সিংহরূপে এবং মেরুকে পয়োধররূপে আত্যন্তিক বিশ্বাস করা হইতে এই জাতীয় অলঙ্কারের উৎপত্তি।

"স্বভাবতঃই ক্ষীণদেহ। তদুপরি মধ্য (কটি) যেন ভাঙিয়া দুইখান হইয়াছে" (২৯০)—এখানে ক্ষীণ কটি হইতে উরুদ্বয়ের উৎপত্তির বর্ণনা। কী বিস্ময়কর ব্যাপার।

নিছক কৌশলসৃষ্টি অন্য আরো অলঙ্কারে আছে। যেমন কটি-কুচ-গতির অলঙ্কারযুক্ত ৩৯৫ পদে—

> "কাম কৃত্রিম কনকাচল আনিয়া দুইটি করিয়া তোমার বক্ষস্থলে বসাইয়া দিয়াছে বোধ হয়। সেই পাপের (কনকাচলকে ভাগ করার পাপের) শাস্তিস্বরূপ তোমার কটিদেশ ক্ষীণ, সেইজন্য হংসের লঘুগতি অপেক্ষা তোমার গতি হীন।" (৩৯৫)

এখানেও কবির গবেষণামুখিতা—কেন নায়িকার কটি ঐ প্রকার অতি ক্ষীণ, কেন সে ধীর-গতি—এ বিষয়ে রহিয়াছে কাব্যিক টীকা। আমরা

কৌতুকভরে লক্ষ্য করিব, কবির ব্যাখ্যাটি। অপব্যাখ্যার কিরূপ চমৎকার দৃষ্টান্ত। পাপ করিল কাম, শাস্তি পাইল নায়িকা। মনে হয়, কবি বলিতে চান—অপরাধী অপেক্ষা অপরাধে সাহায্যকারী কম অপরাধী নয়। রাধা বিভক্ত কনকাচলকে আত্মসাৎ করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহার ঐ শাস্তি। কাম জন্ম-অপরাধী, শাস্তিতে তাহার কিছু হইবে না মনে করিয়া কবি তাহা উহ্য রহিয়াছেন।

২৪ পদে রোমাবলী-কুচ-কটির যৌগিক অলঙ্কারের সঙ্গে ২১ পদের ত্রিবলী-নিতম্বের অলঙ্কারটি কল্পনাভঙ্গিতে সম্পূর্ণ এক। ২৪ পদে গুরু পয়োধর-যুক্ত দেহের ভারে পাছে ক্ষীণ কটি ভাঙ্গিয়া যায়, তাই বিধাতা রোমের নীল সূতা দিয়া উভয়কে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ২১ পদেও ভঙ্গি একই—গুরু নিতম্বের ভারে পাছে ক্ষীণ কটি ভাঙিয়া যায়, তাই মদন উহাতে ত্রিবলী-লতা জড়াইয়া রাখিয়াছে। পয়োধরের বদলে নিতম্ব, রোমরাজির বদলে ত্রিবলী এবং বিধাতার বদলে মদন। ক্ষীণ কটি উভয়ক্ষেত্রেই ক্ষীণতার সমস্যারূপে বর্তমান।

(গ) ত্রিবলী এবং—

ত্রিবলী-উদরের একটি অলঙ্কার আছে। নায়ক বলিতেছে—"অনঙ্গকে সাক্ষী রাখিয়া আমি সত্য বলিতেছি, চন্দ্রমণ্ডলে যমুনাতরঙ্গ দেখিলাম" (২৩১)। ত্রিবলীর সকল অলঙ্কারেই নদীর কথা থাকে। যমুনা-তরঙ্গ হইল ত্রিবলী, এবং চন্দ্রমণ্ডল সম্ভবতঃ উদরদেশ। রোমরাজির সঙ্গে নীল যমুনার তুলনা করিতেই কবি অভ্যস্ত, কিন্তু মনে হয় এখানে ত্রিবলীর সঙ্গেই করিয়াছেন, কারণ চন্দ্রমণ্ডলকে উদর ছাড়া কিছু মনে হওয়া শক্ত। যদি উদরের সঙ্গে চন্দ্রমণ্ডলের তুলনা করা হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয়, উদরের নূতন এক উপমান পাইলাম এবং অলঙ্কার-জগতে চন্দ্র যে সর্বঘটের বস্তু, তাহাও প্রমাণিত হইল।

ত্রিবলী-পয়োধর-মুক্তাহারের এক অলঙ্কারে পাওয়া যায়—"ত্রিবলীর তরঙ্গে গঙ্গা-যমুনাতুল্য শ্বেত ও কৃষ্ণের সঙ্গমে পয়োধররূপ শম্ভু নির্মিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। (এখানে দান করিলে মহা পুণ্য)। তোমার প্রতি

যখন কাতরভাবে দান প্রার্থনা করিতেছেন, তখন হে ধনি, সর্বস্ব দান কর" (৪৩৭)। অলঙ্কারটিতে ত্রিবলীর তুলনা ত্রিবেণী। শম্ভু যে পয়োধর বলাই আছে। কিন্তু গঙ্গা ও যমুনাধারা কি কি? যমুনা সহজেই রোমরাজি হইতে পারে, কিন্তু গঙ্গা? গঙ্গা কি মুক্তাহার, না শুভ্র দেহাঙ্গ? বলা শক্ত।

এই পদেও বিদ্যাপতির অন্যতম প্রিয় রূপক—নদী-সঙ্গম এবং সঙ্গমের দেবতা শিব। কিন্তু এই ধর্ম-রূপকটির ব্যবহার গ্লানিকর হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুধিত নায়কের নিকট মানিনী নায়িকাকে আত্মদানে প্রলুব্ধ করিতেছে দূতী। সে বচনকৌশলে কাজ হাসিল করিতে চায়। এই বাক্‌চাতুরীর মধ্যে তীর্থক্ষেত্র, তীর্থদেবতা, দানের পুণ্য ইত্যাদি ব্যাপার না আনিলেই ভাবরক্ষা হইত।

কিন্তু ত্রিবলী এক সময় সত্যই পূত ধারার নদীখাত হয়। যেমন বিরহিণী নায়িকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়—"ত্রিবলী যেন গঙ্গা হইল, যেন বৃদ্ধি পাইয়া উপচিয়া পড়িল" (৫৪১)। নয়নজলের পুণ্য প্রবাহকে পথ করিয়া দিয়া দেহরেখা ত্রিবলী এখানে ধন্য।

(ঘ) উরু এবং—

উরু ও চরণের এক গতানুগতিক অলঙ্কার আছে—চরণ হইল কমল, আর তাহাতে বিপরীতভাবে আছে কদলীবৃক্ষ অর্থাৎ উরু।

উরু-চরণ-নখ-পীতধটীর এক সাধারণ স্তরের অলঙ্কার—"কমলযুগলের (চরণদ্বয়ের) উপর চাঁদের মালা (নখপংক্তি), তাহার উপর তরুণ তমাল-বৃক্ষ (উরু) উৎপন্ন হইল। তাহার উপর বিদ্যুল্লতা (পীতধটী) বেষ্টন করিল।" (৬৩০)

(ঙ) চরণ এবং—

গতানুগতিক ক্লান্তিকর অলঙ্কার চরণ-নখের—"বলহীন অরুণ (অনতি-উদিত সূর্যের মতন রক্তিমবর্ণ পদতল) শশিমণ্ডলের (পদনখের) মধ্যে লুকাইয়া আছে।" (২৬)

চরণ ও নয়নের এক অলঙ্কারে যথেষ্ট কৌশল আছে। কৃষ্ণের দিকে ধাবিত নয়নকে রাধা জোর করিয়া নিজের পায়ের উপর নামাইয়া রাখিয়াছেন; তার ফল—"মধুপানোন্মত্ত মধুকর যেমন উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে, (আমার নয়নও সেরূপ করিতে লাগিল)।" এখানে কবি রাধার মুখ দিয়া তাঁহার নিজ চরণকে কেবল পদ্ম বলান নাই, তারো বেশী করিয়াছেন—রাধার নয়নকে ভ্রমর করিয়া নিজ চরণপদ্মের মধুপানে উন্মত্ত করাইয়াছেন। অলঙ্কারের চতুরতা এখানে অতিরিক্ত।

তবে সেটুকু মানিয়া লইলে পরবর্তী চিত্ররূপটি উৎকৃষ্ট। রাধার উৎসুক অবাধ্য নয়ন, তাহাকে জোর করিয়া নিজের পায়ের দিকে টানিয়া আনা, তা সত্ত্বেও, মনের জোরে চোখকে নীচে ধরিয়া রাখার জন্য, আঁখির বিস্ফার এবং পক্ষ্মলোমের থরথর কাঁপন—সব কিছু মধুপানোন্মত্ত, উড়িতে অসমর্থ মধুকরের পক্ষবিস্তারের চিত্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলিয়া গিয়াছে।

পদ ও করতলের এক অলঙ্কারে প্রেমের প্রণত পূজাচ্ছবিটি ফুটিয়াছে—

"যখন হরি আসিবে (তাঁহার) চরণ ধারণ করিয়া রহিব, অরবিন্দ (আমার করপদ্ম) দ্বারা চন্দ্র (মাধবের চরণ) পূজা করিব।" (১৭৫)

বড় স্নিগ্ধ একটি অলঙ্কার—চরণ ও অশ্রুর—

"নয়নের জল চরণতলে গেল; স্থলকমল জলকমল হইল (চরণকে সাধারণতঃ স্থলকমলের সঙ্গে তুলনা করা হয়)।" (২৬৭)

সমগ্র দেহের রূপ, ছন্দ, গতি এবং কার্য

অতি বিস্তৃতভাবে এতক্ষণ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অলঙ্কারগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। বিভিন্ন অঙ্গ-উপাঙ্গকে পৃথক করিয়া বিচার করিতে হইয়াছে। ফলে পূর্ণ দেহরূপের আলোচনা হয় নাই। সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্যের ধারানুযায়ী বিদ্যাপতি দেহরূপকে কত খণ্ড-অঙ্গাংশে দেখা যায়, তার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছেন। সাধারণভাবে সংস্কৃতের রূপবর্ণনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা যায়, বিদ্যাপতির বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগ উঠিতে পারে—খণ্ডের প্রতি অতি-মনোযোগের জন্য পূর্ণের রূপ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। রূপ দেখিবার সময় মানুষ অত খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখে না। রূপের পূর্ণ ছন্দে ও উল্লাসে তাহার নয়ন-মন আলোকিত হয়। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ, গবেষকের সন্ধান এবং পণ্ডিতের ধৈর্য লইয়া বিদ্যাপতি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা কাব্য-প্রদর্শনীর বস্তু হইয়াছে, কাব্য হয় নাই।

এই সমালোচনা মাত্র আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য। এবং এই সমালোচনার পাত্র কেবল বিদ্যাপতি নন, প্রাচীন ভারতের সমস্ত কবিসমাজ। কাব্যের ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিলে কবির পক্ষে তাহাকে লঙ্ঘন করা কঠিন হয়। বিদ্যাপতি আবার বিশেষভাবে ঐতিহ্যবাদী কবি ছিলেন। তাছাড়া সমগ্র রূপের প্রতি আধুনিক কালের বিশেষ আকর্ষণের পিছনে আছে এ-যুগের গতিবেগ, যাহা এক ঝলকে কোনো কিছুকে দেখিয়া লইয়া পরমুহূর্তে অন্যবস্তুর সম্মুখীন হয়। অধীর তৃষ্ণা-কাতর বর্তমান যুগে মধ্যযুগীয় সুতৃপ্ত সৌন্দর্য-দর্শনকে ভাল না লাগারই কথা। বিদ্যাপতি-অঙ্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপের প্রতি বিরক্তি দেখাইয়া আমরা যুগপ্রভাবকেই প্রমাণ করিব।

সে কথা সত্য হোক বা না হোক—অতি-বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যাপতি দোষী হইতেও পারেন—কিন্তু বিদ্যাপতি সমগ্র রূপের ছন্দ দেখেন নাই, একথা সত্য নয়। তাহা কিভাবে দেখিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাই আলোচ্য।

এতক্ষণ স্থগিত কয়েকটি যৌগিক অলঙ্কারের উল্লেখ এখানে করিয়া লওয়া চলে তাহা হইল—কুচ ও দেহের কয়েকটি অলঙ্কার। এ জাতীয় চারটি অলঙ্কার মেলে ; চার ক্ষেত্রেই দেহ কনকলতা ;—বদলাইয়াছে কেবল কুচের

উপমান। যেমন—"কনকলতার উপর যুগলগিরি" (৩২); —"কনকলতার রক্তকমলের মুকুল (রক্তকমলের মুকুল হইল নূতন পয়োধর যাহা নায়কের স্পর্শে অরুণবর্ণ)" (৭১); —"কনকলতায় মেরু" (২৩২); —এবং "কনক-লতার উপর দ্বিখণ্ডিত শ্রীফল" (২৩৫)।

নায়ক নায়িকার দেহরূপ

দেহরূপের অলঙ্কারের আলোচনা শুরু করা যায় রূপ দেখিয়া কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসের উক্তি দিয়া। রাধারূপ কবিকে উন্মত্ত করিয়াছে। নবযৌবন দেখিয়া কবির কৃষ্ণ আবেগভরে বলিয়াছিলেন—"কি আ রে নবযৌবন অভিরামা! (২১৪)। সেরূপ আরো আবেগ-খণ্ড—

সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা॥ (২২)

কামিনী তিহুয়ন জীতী (৯২)
(কামিনী ত্রিভুবনকে জয় করিল।)

"ত্রিভুবনে অতুলনীয়া, রূপে গুণে কুশলা, কাঞ্চনপুতলী" (১৭৬)

"বিধাতা ত্রিভুবনজয়কারিণী অপূর্ব রূপের ধাম সুন্দরীকে গড়িয়াছেন।" (৮৪৮)

মূল কথা সুন্দরী ত্রিভুবনকে জয় করিয়াছে। এবং কামদেবকেও—

"আজ ত্রিভুবনের সার গজেন্দ্রগমনা শ্রেষ্ঠ যুবতীকে দেখিলাম, তাহাকে যেন বিধাতা সংসারে কামদেবের বিজয়বল্লীরূপে সৃষ্টি করিয়াছে।" (৬০)

'কামদেবের বিজয়বল্লী' কথার অর্থ কী—যে-বল্লী কামদেবকে জয় করিয়াছে, না, কামদেবকৃত-বিজয়ের বল্লী-নিশান? দুইই হয়।

রূপ সম্বন্ধে আরো বর্ণনা আছে। যথা—

"তোমার অপূর্ব নির্মাণ! আমার মনে হয় (তোমার দেহে) যেন পঞ্চবাণ সেনা সাজাইয়াছে।"

"কোথা হইতে ধনী রূপ চুরি করিয়া আনিল ?" (৬২৭)

"যাহার নয়ন যেখানে লাগিল সেখানেই শিথিল হইয়া গেল। তাহার রূপ সম্পূর্ণ নির্ণয় করে এমন কাহাকেও দেখি না। হে পদ্মাননে রাধিকে, জগতে যাহার বিনয় আছে আবার তাহার প্রশংসা করি।" (৩০২)

রূপ স্বভাবে অনির্দেয়। তবু বর্ণনায় ধরিতে, অলঙ্কারে সাজাইতে কবির প্রয়াস অসীম। কবি-প্রয়াসকে সুবিধার জন্য কয়েকভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমেই দুই ভাগ করা যাক—রূপের দীপ্তি-রূপ এবং রূপের কোমলকম্র রূপ। দীপ্তির মধ্যেও অবশ্য কোমলতা আছে এবং কোমলতার মধ্যে আছে দীপ্তি। রাধামোহন ঠাকুর দীপের সঙ্গে রাধার অঙ্গকান্তির তুলনা করিয়াছেন (৭৫৫)।

রাধারূপ জ্বলে এবং জ্বালায়। আবার স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়াও থাকে। যেমন—

"(সুন্দরীর রূপ সম্বন্ধে) বাছিয়া বাছিয়া কেবল জ্যোতির্ময় তারা দিয়ে যেন হার গাঁথা হইয়াছে।" (৪)

'পবনের স্পর্শে বসন বিস্রস্ত হইল, ...মনে হইল যেন নূতন মেঘের নীচে বিদ্যুতের চমক" (৫)

"গোধূলির সময় সুন্দরী গৃহের বাহির হইল, নব জলধর ও বিদ্যুৎরেখা বিবাদ বিস্তার করিয়া গেল।" (৩১)

সৌদামিনীকে দেহরুচি ফিরাইয়া দিল। (১৮১)

"(জ্যোৎস্নাভিসারে) তোমার দেহের জ্যোতি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইবে। ...তুমি অন্ধকারকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিও না, তোমার মুখ তিমিরারি।" (৩০৫)

"যেখানে যেখানে তাহার অঙ্গের জ্যোতির ঝলক পড়ে, সেখানে সেখানে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ ওঠে।" (৬১৯)

"সজনি, ভাল করিয়া দেখা গেল না, মেঘমালা (নীলবসন) সঙ্গে বিদ্যুল্লতা (রাধার রূপ) হৃদয়ে শেল দিয়া গেল।" (৬২৪)

সুতরাং রাধার রূপ তারকা—বিদ্যুৎ—জ্যোৎস্না।

রূপের কোমল লাবণ্য এবং সুকুমারতার আলঙ্কারিক বর্ণনার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। এই অংশে আরো দেখিব—নিসর্গ-প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু, বিশেষতঃ লতা, কি পরিমাণে কবি-কল্পনায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রূপবর্ণনায় লতার কথা বারবার কবির মনে আসিয়াছে। লতার কথা এবং ফুলমালার কথা। রাধাকে কামদেবের বিজয়লতা, বা ত্রিভুবনবিজয়ী মালা বলা হইয়াছে, অল্প পূর্বে দেখিয়াছি। এখানে আরো দৃষ্টান্ত—

ধনী অলপ বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা। (৩১)

"তনু শিরীষ ফুলে মিশিয়াছে···সুন্দরী যেন দ্রোণলতা, স্পর্শ করিলেই আউলাইয়া যায়।" (৮০)

"(দেহে) ঋতুরাজের শোভা করিবে।" (৮২)

"সুবর্ণলতা-সদৃশ সুন্দরী।" (২৩৬)

"স্পর্শে বুঝিলাম অঙ্গ শিরীষ পুষ্পের ন্যায়, মুখের সৌরভ কমলিনী সদৃশ।" (২৭৯)
(শিরীষ ফুলের ন্যায় কোমল—রাধা-অঙ্গ সম্বন্ধে এই বর্ণনা বেশ কিছু পদে। পূর্বোক্ত ৩০ পদ, বর্তমান ২৭৯ পদ ছাড়াও এরূপ বর্ণনা মেলে—২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ৬৭২, ৬৮৫ পদে)।

"আমার তনু কমলের কলির ন্যায় কোমল।" (২৮২)
(কমলের ন্যায় কোমল কামিনীর কথা আরো কিছু পদে—২৮৭, ৪১৪)

"(কৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায়) অর্ধেকের অধিক অঙ্গ সঙ্কুচিত হইল, ভগ্ন মৃণাল দ্বিগুণ তর হইল।" (৫৫৮)

"আমি নব কুরবকের ন্যায়।"—(৫৬২)

বিদ্যাপতি লতার কোমলতার ও লীলায়িত রূপের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু সুবর্ণের দীপ্তিও তাঁহার চাই। ফলে উভয় বস্তু মিশাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে সুবর্ণলতা। কনকলতার সঙ্গে রাধাদেহের তুলনা বহুক্ষেত্রে মেলে। দেহ ও কুচ-প্রসঙ্গে অল্প পূর্বে তেমন কিছু অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছি। এখানে সুবর্ণাত্মক আরো কিছু অলঙ্কার উদ্ধৃত করা যাক—

"গৌরবর্ণ মূর্তি কনকের দ্বারা নির্মিত"। (১৮)

"ধনী···সোনার প্রতিমার মত, তাহার মুখে কোনো কথা নাই।" (৫৭)

"ধনী···হেম-মঞ্জরী"। (৮৯)

"রূপে গুণে কুশলা কাঞ্চনপুতলী ছিল।" (১৭৬)

"সুবর্ণলতা সদৃশ সুন্দরী বিধাতা নির্মাণ করিয়া আনিল।" (২৩৬)

"সজনি অপরূপ রমণী দেখিলাম। কনকলতা-অবলম্বনে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইল।" (৬২৩)

মুগ্ধা সুন্দরী একবার "সোনার প্রতিমার মত স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল", আর একবার অবুঝ রাধিকা বসিয়াছিলেন—"পটে আঁকা ছবির মতো"। (৪৭)

সুন্দরীর আরো বর্ণনা পাই। সুন্দরী যখন কামনার আধার, তখন বলা হইয়াছে—"মদনের নূতন দোকান" (২৬৮)। 'মদন-দোকান' হইবার পূর্বে তাহার ক্রমোভিন্ন রূপ দেখিয়া কবির মনে তাহার সঙ্গে পুষ্পের তুলনার কথা উঠিয়াছিল, এবং ইঙ্গিতে তিনি সেকথা বলিয়াছেন—"এখন নবীন যৌবন সময় দেখিয়া আপনি বিকশিত হইয়া পড়িবে" (২৮১)। সুন্দরীর রূপের সৌকুমার্য দেখিয়া মনে হইয়াছে—"সে দেখিতে রাজকুমারীর সদৃশ" (২৩৬)। রাজকুমারীর রূপ—রূপ-সম্বন্ধে একটি আইডিয়া, নিশ্চয় সে কথা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। "বিদ্যুতের রেখার মত সুন্দর দেহ গগনমণ্ডলে শোভা পায়" (২৫০)—এমন বর্ণনা, বা উপভুক্ত দেহ সম্বন্ধে—"চন্দ্রের ক্ষীণ রেখা" (৪৯০)—এমন কথাও পাই। রাধার এই দেহ-রূপ চাঞ্চল্য হারাইয়া যখন প্রশস্ত ও প্রশান্ত বেদীস্বরূপ হইয়াছে (৭৫৫), তখনও সেই মঙ্গল-রূপকে কবি দেখিয়াছেন।

কৃষ্ণও রূপে কিছু কম যান না। রাধা, সে-রূপ বর্ণনায় অসাধ্য বলিয়াও, বলিতে ছাড়েন নাই—"সখি, কানুর রূপ কি কহিব? স্বপ্নের স্বরূপ কে বিশ্বাস করিবে? দেহ অভিনব জলধরের ন্যায় সুন্দর, সৌদামিনী-রেখার

শ্যায় পীতবসন পরিহিত" (৬২৯); এবং—"নীল কলেবর পীতবসনধারী, শ্বেতচন্দনের তিলক, যেন শ্যামল মেঘ বিদ্যুতে (পীতবসনে) মণ্ডিত হইয়াছে, আর তাহাতে শশিকলার (চন্দন-তিলকের) উদয় হইয়াছে।" (৩৫)

তবে শেষ পর্যন্ত রাধারই রূপ। ঐ রূপের দুইটি অবস্থানঘটিত সুন্দর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মেলে। সুন্দরী ঘোর অন্ধকারে অভিসার করিতেছেন—রূপের দ্বারা রাধা ঐ অন্ধকার দূর করিয়াছেন, এই কথা বলার লোভ দমন করিয়া কবি সুষ্ঠু অলঙ্কার প্রয়োগ করিলেন—"যেন ভ্রমরী কালিতে ডুবিল" (৯২)। রাধার সঙ্গে ভ্রমরীর তুলনায় মৌলিকতা আছে।

অভিসার অংশেই রাধারূপের আর একটি উৎকৃষ্ট অলঙ্কার পাই—"তোর শ্যাম অম্বরে এবং দেহের রঙে মিলিয়া তিমিরে আচ্ছন্ন চন্দ্রের মত হইবে।" (২৪৮)

নীলাম্বরীতে ঢাকা রাধা-দেহ তিমিরাচ্ছন্ন চন্দ্রের মত—কল্পনাটি সত্যই উচ্চাঙ্গের।

এমন রাধার সুমোহন একটি বর্ণনা সবশেষে উদ্ধৃত করি—

"যেন বিশালাক্ষী চন্দ্রবদনা ধনী ভ্রমরমালা ভূষিত পদ্ম। ...শ্যামা সুনয়না অপূর্ব ভূষণে সজ্জিত রতিস্বরূপা।" (৩০৩)

নায়িকার গতিভঙ্গি

সুন্দরীর দেহ ও দেহরূপের অলঙ্কারগুলি দেখিলাম। ঐ সুন্দর অলঙ্কারগুলি হইতে বিদ্যাপতি রূপের সামগ্রিক আবেদনকে কিভাবে কাব্যে স্বীকার করিয়াছেন তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। এখন রাধার গমনভঙ্গির অলঙ্কারগুলি লক্ষ্য করা যায়।

রাধার গতিভঙ্গির কথা বলিতে গিয়া কবি কিন্তু বহুক্ষেত্রে মৌলিকতাকে পরিহার করিয়াছেন। রাধার গতি গজগতির তুল্য, এই কথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক পদে বলিয়াছেন (১৯, ২০, ২৫, ৩৮, ৮৯, ২৩৬, ২৬০)। গজগতির মত রাধার গতির অন্য প্রচলিত তুলনা, হংস-গতি। তার কথা আছে—৮৯, ৩৯৫, ৫৫৬ পদে। সুবর্ণলতা বিনা অবলম্বনে চলিতেছে—এই বর্ণনা পাই ৫ পদে।

করিবর ও রাজহংসকে গমনে পরাজিত করিয়া রাধিকা অলঙ্কারশাস্ত্রের সমাদর করিয়াছেন। বর্তমানে আমরা তাহাতে বিশেষ চমৎকৃত নই। আমাদের চমৎকৃত করিবার মত কল্পনার উপহারও বিদ্যাপতি উপস্থিত করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিলেই চলিবে—

"সুন্দরী পবনের ন্যায় শীঘ্র চলিল, যেন অনুরাগ পশ্চাৎ হইতে ঠেলিল, কাম হাত ধরিয়া টানিল।" (৯২)

"গজগামিনী কামিনী একটু হাসিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া গেল, যেন বরনারী কুসুমসায়কের ইন্দ্রজাল ও কুহক বিস্তার করিয়া গেল।" (৬২২)

"সজনি, ভাল করিয়া দেখা হইল না। সে যেন মেঘমালার মধ্যে তড়িতলতার মত হৃদয়ে শেল দিয়া গেল।" (৬২৪)

"শ্বেতবস্ত্রে তনু আচ্ছাদিত করিয়া পবনগতি সঙ্গে করিয়া লইল। যেমন চন্দ্র পবনে চলিয়া যায় সেইরূপ রাধা কুঞ্জে উদিত হইল।" (৬৩৭)

কয়েকটি রেখাবিন্যাসে অপূর্ব ফুটিয়াছে রাধার গতিছন্দ। রাধার গতি যখন পবনের ন্যায়, তখন ঐ অস্বাভাবিক গতিশক্তি মন্থরচরণা মেয়েটি পাইল কিভাবে? না—ভালবাসা ঠেলিতেছে, কামনা টানিতেছে। কবি বাহিরের গতির সঙ্গে মনোগতিকে যুক্ত করিলেন। পবন-গতি রাধাকে বাহির হইতে কিরূপ দেখায় তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। পাতলা সাদা মেঘের উপর দিয়া যেমন চন্দ্র ভাসিয়া যায়—তেমনি শ্বেতাম্বরা রাধিকা দ্রুতগতিতে বসন উড়াইয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন জ্যোৎস্নাভিসারে। বাকি দুইটি অলঙ্কার বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপরিচিত—রাধাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত কৃষ্ণের আ-হা-হা ধ্বনি। পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি এখানে আর প্রয়োজন নাই।

দেহের অনুভাব

দেহের রূপের সঙ্গে থাকে দেহের 'অনুভাব'। যৌবনবতীর স্বাভাবিক দেহসৌরভ এবং মিলনকালের ঘর্ম ও শ্রমজলের কথা কবি বিস্মৃত হন নাই। পূর্বে একটি পদে কমলিনীর মতো মুখের সৌরভের কথা পাইয়াছি। ২১৪

পদে রাধাকে কমলগন্ধা বলা হইয়াছে। দেহবেদীতে প্রিয়পূজার সময় অঙ্গসৌরভকে ধূপ করিবেন, রাধার এইরূপ ইচ্ছার কথাও টীকাকার জানাইয়াছেন (৭৫৫)। দেহসৌরভের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও বাস্তব রস-সমৃদ্ধ বর্ণনা পাইতেছি ৫২৫ পদে—"(যৌবনাগমে) শয্যা পরিমল-যুক্ত হইল—ফুলের গন্ধের মত"। কবির মনকে কিছুই এড়ায় নাই দেখা যাইতেছে।

স্বাভাবিক দেহসৌরভ মিলনের মদগন্ধ হইয়া ওঠে স্বেদসহায়ে। ৮০, ২৩৯ ও ৪৩৯ পদে তার পরিচয় পাই। মুখের ঘর্মবিন্দু ও সুন্দর জ্যোতির অলঙ্কার দিয়াছেন—"সোনার কমলে মুক্তা" (৪৯৩)। এই অলঙ্কার প্রথাবদ্ধ। উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার আছে ২৩৯ পদে—"তনুতে ঘর্মবিন্দু প্রসারিত হইল, (যেন) তারকাবেষ্টিত চন্দ্র নির্মঞ্ছন করিয়া ফেলিয়া দিল। (তনু) পরম রসাল হইয়া কাঁপিল যেন তমাল মনসিজের জপ করিতে করিতে গলিয়া গেল।" বর্ণনা মদনাবিষ্ট কৃষ্ণের—রাধা করিয়াছেন। অলঙ্কারের প্রথম অংশ প্রথাগতভাবে সুন্দর, কিন্তু মৌলিক রূপসৌন্দর্য আছে স্বেদসিক্ত তনুর সঙ্গে মনসিজমন্ত্র জপ করিতে করিতে তমালের গলিয়া পড়ার কল্পনায়। এই অলঙ্কারটি পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি।

শ্রমজল-সম্বন্ধীয় অলঙ্কারের সৌন্দর্যও রীতিমাফিক। বদনে শ্রমজলবিন্দু, দেখিয়া মনে হয় মদন মুক্তা দিয়া চন্দ্রপূজা করিয়াছে (৪৯৭)। এটি পূর্বে ব্যাখ্যাত।

আলিঙ্গন

দেহচেষ্টার মধ্যে আলিঙ্গনই প্রধান। কাব্যে প্রেমের নিবিড়তম প্রকাশ চুম্বনে ও আলিঙ্গনে। পূর্বে ওষ্ঠাধর-প্রসঙ্গে চুম্বনের অলঙ্কারের আলোচনা করিয়াছি। এখানে দেহের প্রসঙ্গে আলিঙ্গনের রূপ দেখা চলে। প্রেম-মনস্তত্ত্বের আলোচনায় আগেই আলিঙ্গনের মূল্য বিশ্লেষণ করিয়াছি। বর্তমানে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিলেই চলিয়া যাইবে—

"(কৃষ্ণ) কমলমুখীকে বক্ষে ভরিয়া লইল।"

"দেহ দেহের শরণে লুকাইল" । (২৪০)

(পূর্বে আমি এই অংশটিকে রাধার দেহসংকোচের বর্ণনা বলিয়াছি। যদি সম্পাদক মহাশয়দের ব্যাখ্যা ঠিক হয় তবে ছত্রটির অর্থ, আমার দেহ তাহার দেহের শরণে লুকাইল, অর্থাৎ আলিঙ্গন।)

"(মূর্ছার বর্ণনা)। অঙ্কের নামে (তাহার) হৃদয় অবসন্ন হয়, যেন হস্তীর পদতলে মৃণাল পড়িল।" (২৮০)

"তরুবর লতাকে যেমন চাপিয়া ফেলে, হে সখি, আমাকে সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিল।" (৪৭৭)

"(মাধব কখন গেল জানিতে পারিলে) যাইবার সময় গাঢ় আলিঙ্গন দিতাম, যেমন জোয়ার পাড়ের উপর পড়িয়া খেলা করে।"(৫০০)

"প্রভুর দুই কর খেলা হইল।" (৫৩২)

(অর্থাৎ দুই কর—যাহা আলিঙ্গন করিয়াছিল—তাহার সে কাজ যেন খেলাচ্ছলে। কিংবা যেমন খেলনাকে শিশু জড়াইয়া ভালবাসে, পরক্ষণে তাহাকে ফেলিয়া দেয়, তেমনি নায়কের আলিঙ্গন। এই উক্তি বিরহিণীর।)

"নূতন হরিণীকে যেন হরিণ আবৃত করিতেছে।" (৬৭৬)

"চকোর চপল চাঁদের উপব পড়িল এবং প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গেল।" (৬৯০)

(এই পদে নাগরের ধৃষ্টতার বর্ণনা করিতেছেন রাধা, সখীর নিকট। আপাত বিরক্তির ভঙ্গি, কিন্তু সুখপূর্ণ কণ্ঠ। নাগর চকোরের মত, রাধা-চন্দ্রের দিকে লালসায় ধাবিত। রাধা বারবার সরিয়া গিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ রাধার উপর ঝাঁপিয়া পড়িলেন। তখন, যে রাধা এতক্ষণ ঠেলিয়া দিতেছিলেন, সহসা আবেগে অধীর হইয়া তিনি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। নিজের সেই আত্মবিস্মৃত প্রেমাবেগের কথাই আছে উদ্ধৃত অলঙ্কারে)।

"প্রিয়ের সম্মুখে আলিঙ্গনের আহুতি দিব।" (৭৫৫)

"দৃঢ় আলিঙ্গনে দেহ রোমাঞ্চিত, যেন দুই জনের স্নেহ পুনর্বার অঙ্কুরিত হইল।" (৮৫৩)

বিরহে দেহাবস্থা

সমগ্র দেহরূপের অলঙ্কার-সন্ধানে একটি বিশেষ অবস্থার কথা এতক্ষণ বাদ দিয়া রাখিয়াছিলাম—বিরহে দেহাবস্থা। এখন তেমন বর্ণনাগুলি চয়ন করা চলে। তাহাদের দ্বারা প্রেমে বেদনার রূপ-পরিস্ফুটনে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

"সেই ধনীকে দেখিলাম, যেন বাসি মালতীর মালার মত পড়িয়া রহিয়াছে।" (১৬৮)

"দিবসের চন্দ্রলেখার মত তাহার মলিন তনু।" (১৭৬)

"তোমার বিরহে দিন দিন (কৃষ্ণা) চতুর্দশীর চাঁদের মত ক্ষীণতনু হইতেছে।" (১৭৯)

"(তাহার দেহ) মলিন নলিনীতুল্য। (১৮২)

"সখীরা সাহস করিয়া ছুঁইতে পারে না, সূতার ন্যায় দেহ।" (১৮৫)

"দিন দিন দেহ অবসন্ন হইল, হিমে কমলিনীর ন্যায়" (৪৪৮)

"নয়নের নীরে নদী বহিতেছে, তাহার তীরে পড়িয়া আছে।···রাধী দিনে দিনে (কৃষ্ণা) চতুর্দশীর চন্দ্র অপেক্ষাও ক্ষীণ হইতেছে।" (৫৪২)

"নয়নের নীরে যেন নদী নির্মিত, কমলমুখী তাহাতে স্নান করে।" (৫৪৩ এবং ৭৪৭)

"তাহার দেহ যেন শয্যায় মগ্ন, অমাবস্যা তিথিতে যেমন শশীরেখা। সখীজন আঁচলে ঢাকিয়া রাখে, পাছে আপনার নিঃশ্বাসে উড়িয়া যায়।" (৫৪৯)

"রাধা কখনও অবসন্ন রহিতেছে, কখনও খেদ করিতেছে—যেন তরুণ সর্প মন্ত্রপাঠে নিশ্চল।" (৫৭২)

(তরুণ সর্প স্বভাবে চঞ্চল, সেই অবস্থা রাধার হৃদয়-ক্ষোভের। তার পরেই অবসন্নাবস্থা। তখন যেন সর্পকে মন্ত্রপাঠে নিশ্চল করা হইয়াছে। ইঙ্গিত এখানেই শেষ নয়। যেহেতু

তরুণ সর্প বলা হইয়াছে—সে সকল সময় নিশ্চল থাকিবে না, মন্ত্রশক্তি কিছু হ্রাস পাইলেই আবার ছটফট করিবে)।

"(কৃষ্ণপক্ষের) চাঁদ যেমন দিন দিন ক্ষীণ হয়, সে তেমনি পালটিয়া ক্ষীণ হইতেছে। (৬৫১)

"সে যেন চিত্রিত পুত্তলিকার মত একদিকে তাকাইয়া আছে।...তাহার দেহ যেন একটি ক্ষীণ স্বর্ণরেখার ন্যায়।" (৭৩৭)

"(রাধা যেন) অবনীতে লুণ্ঠিত সোনার পুতুল।" (৭৩৯)

"তাহার দেহ অত্যন্ত ম্লান, স্বর্ণকার কষ্টিপাথরে একটি সোনার রেখা কষিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।" (৭৪১)

"দেহ অমাবস্যার শশীর ন্যায় ক্ষীণ হইল।...তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দেহ কজ্জলের ন্যায় হইল।" (৭৪৩)

"মরকতনির্মিত হর্ম্যতলে সে বিরহক্ষীণ দেহে শুইয়াছিল, মদন যেন নিকষ-পাথরে কনকরেখা কষিয়াছে।" (৭৪৪)

"তোমার বিরহে সুন্দরীর অবস্থা তুষারপাতে নলিনীর অবস্থার মত।" (৭৪৫)

অলঙ্কারগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কবির কল্পনা প্রধানতঃ তিনটি জিনিসকে অবলম্বন করিয়াছিল—(১) চন্দ্ররেখা—দিবসে কিংবা অমাবস্যার রাত্রে; (২) মলিন পুষ্প—বাসি মালতী একবার, তুষারদগ্ধ কমলিনী কয়েকবার; এবং (৩) নিকষে ক্ষীণ স্বর্ণরেখা। ক্ষীণতা ও বেদনাবিপর্যস্ত অবস্থা ফুটাইবার উপযোগী উপমানগুলি। ক্ষীণতা ফুটাইতে কবি সূতার সঙ্গে তুলনাও করিয়াছেন। বেদনাস্তব্ধ রূপ ফুটাইতে মন্ত্রনিশ্চল সর্প বা চিত্রিত পুত্তলিকা। বর্ণমলিনতা ফুটাইতে কজ্জল। এবং গভীর ও পবিত্র অশ্রুময় যাতনা ফুটাইতে—নয়ননীরে স্নান। অলঙ্কারগুলি যে ভাবগভীর এবং রূপোত্তীর্ণ নিশ্চয় তাহা বলিতে হইবে না।

অবশিষ্ট অলঙ্কার

'অবশিষ্ট' বলিতে বুঝায়, যেন মুখ্য আলোচনা শেষ হইয়াছে, সামান্য কিছু বাকি আছে। এক্ষেত্রে সেরূপ নয়। 'অবশিষ্ট' শব্দটিকে আক্ষরিক ভাবে লইতে হইবে ; অর্থাৎ দেহের অঙ্গ-বর্ণনাত্মক অলঙ্কারগুলি বাদ দিয়া যাহা রহিয়াছে। আমি এতক্ষণ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-উপাঙ্গ সম্বন্ধে বিদ্যাপতি-রচিত অলঙ্কারসমূহের ব্যুৎপত্তি ও চিত্রসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া আসিয়াছি। বিদ্যাপতি দেহগত প্রেমের কবি বলিয়া তাঁহার পদাবলীতে দেহরূপের সম্বন্ধে অধিক বর্ণনা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া কোনো কবি দেহের রূপের মধ্যেই সমাপ্ত থাকিতে পারেন না। দেহের রূপের সঙ্গে মনের রূপও তাঁহার উপজীব্য। যে পরিমাণে দেহরূপ ও মনোরূপের অঙ্গীকরণ কাব্যে ঘটাইতে পারিবেন, সেই পরিমাণে তিনি সার্থক।

সুতরাং 'অবশিষ্ট' অলঙ্কার বিদ্যাপতি-প্রতিভার অন্যতম প্রধান পরীক্ষাস্থল। এইখানে, তিনি মনোরূপাত্মক এবং ভাবাত্মক। মনের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনায় তাঁহার দক্ষতা এই অংশেই চিনিয়া লইতে হইবে।

দেহাঙ্গগত অলঙ্কারের আলোচনাকে ইতিপূর্বে সর্বাত্মক করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রায় কোনো অলঙ্কার বাদ না যায় সে বিষয়ে সাবধানতা ছিল। অবশিষ্ট অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অলঙ্কার-সংগ্রহে 'সংযম' আনিতে হইবে। বিদ্যাপতি যেভাবে আদ্যন্ত আলঙ্কারিক কবি, তাহাতে সব কয়টি অলঙ্কার চয়ন করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে—প্রচুর পরিশ্রম করিয়াও এবং গ্রন্থের আকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়াও তাহা সম্ভব হইতেছে না। অলঙ্কার এ ক্ষেত্রে নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। তথাপি ক্ষীরটুকু তুলিয়া লইব, একথা সত্য নয়। পরিহার্যটুকুই মাত্র বাদ যাইবে।

মনোরূপাত্মক এবং ভাবাত্মক অলঙ্কারগুলি কিন্তু ইতিমধ্যে বহুলাংশে আলোচিত হইয়াছে। প্রেম-মনস্তত্ত্বের আলোচনাকালে অজস্র আলঙ্কারিক কাব্যাংশের নিজস্ব কিংবা পরিবেশাশ্রিত রসরূপের বহুল বিশ্লেষণ করিয়াছি। বর্তমান অংশে তাই রস-বিশ্লেষণের বাড়াবাড়ি করিব না। বহু-আলোচিত অলঙ্কারের উল্লেখে পর্যন্ত বিরত থাকিব।

ইন্দ্রিয়মূলক প্রেম বিদ্যাপতির কাব্যের মূল আশ্রয়। বিদ্যাপতির প্রেম এক সময় ইন্দ্রিয়াতিক্রমীও বটে। প্রেমের রূপ ও স্বরূপকে বিদ্যাপতি কিভাবে অলঙ্কারবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা শুরু করা যাক।

প্রেমের রূপ : মনোরূপাত্মক ও ভাবাত্মক অলঙ্কার

প্রেম-রূপক : আদর্শ প্রেম

বিদ্যাপতির পদে প্রেমের অগণ্য রূপের প্রকাশ-সম্বন্ধে আর মন্তব্য না করিলেও চলে। প্রেমের বহুল রূপের মতই অলঙ্কারও অসংখ্য। সব কয়টি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় এখানে। বিভক্ত করিয়া কিছু কিছু চয়ন করিব।

প্রেমের রূপ কখনো কখনো রূপক হইয়াছে বিদ্যাপতি-পদাবলীতে। পূর্বে প্রেম-বিষয়ে যুদ্ধ এবং তপস্যা—এই দুই রূপকের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। দেহমিলনকে বিবাহের রূপক দান করা হইয়াছে ২৯৬ পদে। তাহাও আলোচিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে অন্য দুই-একটির উল্লেখ করা যাক—

(১) ঋতুপতি দোকানদার অপ্রমাদী নহে, ন্যায্য মূল্যবাদী (জানিয়া) কামদেবকে মধ্যস্থ স্থির করিল। দ্বিজ কোকিল লেখক, মধু কালি, মধুকরের পদ লেখনী—চন্দ্র সাক্ষী করিয়া লেখা-পড়া হইয়া গেল।" (১১২)

(২) "মুরারি উদ্যানে একটি ফুলগাছ আনিলেন, (তাহাতে) যত্নপূর্বক সুবচন-জল সেচন করিলেন। চারিপার্শ্বে শীলতার আল বাঁধিলেন, (তাহাতে) বৃক্ষ জীবন অবলম্বন করিল (অর্থাৎ বাঁচিল), এইরূপ মনে করিলেন। তাহাতে অভিনব প্রেম-ফুল ফুটিল।...অতি অপূর্ব ফল পরিণত হইল; দুই জীবন ছিল এক হইয়া গেল। দুর্জন-কীট উহাতে লাগিল না। সাহস করিয়া ফল দিল।" (৪৪৩)

(৩) "দুইজনে যোগ লাগিল, মিলন ভাঙে না।...সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলাম—দুধ ও জলের প্রেমের তুল্য এই প্রেমের সমান দেখিলাম না। (দুগ্ধকে) যদি কেহ অগ্নির মুখে আনিয়া দেয়, দণ্ড দিয়া জল শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করে, তখনই ক্ষীর তাপে উথলিয়া পড়ে এবং বিচ্ছেদপূর্বে (অগ্নিতে) ঝাঁপ দেয়। আর যদি কেহ তখন জল আনিয়া দেয়, বিরহ-বিচ্ছেদ তখনি দূরে গেল।" (৭৫৯)

প্রণয়ের সঙ্গে পুরন্দরের অন্তরের নবচন্দ্রের তুলনার কথাই বলিয়াছেন। যে চন্দ্র পুরন্দরের হৃদয়ে ছিল গুপ্ত প্রণয় রূপে, পুরন্দরের শরীরে সেই চন্দ্রকে কবি ছিটাইয়া দিয়াছিলেন, যখন প্রণয় ব্যক্ত হইয়াছিল।

তৃতীয় উদ্ধৃতির অলঙ্কারও উল্লেখযোগ্য—মন্মথের চৌর্যবেশ—অর্গল খুলিয়া সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ ইত্যাদি। গুপ্ত প্রেমের ইহা অপেক্ষা সার্থক অলঙ্কার আর কি হইতে পারে?

প্রেমের নিকৃষ্ট রূপ কয়েকটি অপকৃষ্ট অলঙ্কারের বিষয়বস্তু—যেমন প্রেম পচা কুমড়া, কণ্টক (৫৫৭), বানরের মুখে পান, বানরের গলায় মুক্তার মালা, কুসুমে কীট (৭৮)।

প্রেমের ক্রমবিকাশ

প্রেমের ক্রমবিকাশ অলঙ্কারের আশ্রয় হইয়াছে। প্রেম নানাভাবে বিকশিত হয়। যেমন চন্দ্রকলার ন্যায় (২৮৯, ৭৩), যেমন অঙ্কুরের ন্যায়। প্রেমের সঙ্গে অঙ্কুর-বিকাশের তুলনা অনেকবার করা হইয়াছে। একবার বলা হইয়াছে—"বিনা পরিচয়েই প্রেমাঙ্কুর অনেক পল্লব প্রকাশ করিতেছে" (২২৪)। "প্রেমের" এই বিকাশ স্বাভাবিক দেহধর্মে। ইহা আসলে প্রেম নয়, কাম। প্রেমের আশ্রয় চাই। বিশেষ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাহা বৃদ্ধি পায়। "বিনা পরিচয়ে" প্রেম সম্ভব নয়। অপর পক্ষে বয়সের সঙ্গে বয়সের প্রয়োজন হাজির হয়। তার নাম কাম। অঙ্কুর হইতে শাখা-পত্রে বৃক্ষরূপে প্রেমের বা কামের বিকাশের কথা আছে কয়েকটি পদে (৪২৩, ৫৫১)।

প্রেমের গভীর ও অনির্দেশ্য রূপ

প্রেমকে গভীর ও অনির্দেশ্য রূপেও দেখা হইয়াছে। কিছু দৃষ্টান্ত-

"অবগাহন করিয়া বুঝিলাম যে সরোবরের জল গভীর।" (৪২৩)

"কানাই জলনিধিময়, তোমাকে কামতীর্থে জলদান করিবে।" (৭৩০)

"সে যেন মদনের মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎ পাইল।" (৬৭৫)

"প্রেম এমন অদ্ভুত যে ভাঙিলেও ভাঙে না, যেমন মৃণালের সুতা বাড়িয়া যায়।" (৬৬৩)

"আমি বুঝি না এই রস মিষ্ট কি তিক্ত। রসের প্রসঙ্গে আমি কাঁপিয়া উঠি, তীর লাগিলে হরিণী যেমন লাফাইয়া ওঠে।" (৬৮১)

প্রেমের অন্যান্য রূপ

প্রেমকে নদীস্রোতের সঙ্গেও তুলনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, নদীতে গাহন কর, চুপচাপ কূলে বসিয়া থাকিও না (৮৬)। অনুরাগী হৃদয়ের সঙ্গে জলধারার তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে, জলকে সযত্নে বাঁধিয়া রোধ করিলেও সে নিজ গতিতে নীচে স্থির হয় (৪৩)। প্রেমের বিনষ্ট রূপের তুলনা—ভগ্ন স্ফটিকের বলয় (৩৯১)। প্রেম দরিদ্রের ধন (৫১৯)। এই প্রেমকে লাভ করিতে হইলে প্রাণকে কুসুম করিয়া প্রণয়ের পূজা করিতে হয় (১১৯)। প্রেম যখন এত মূল্যবান, তখন ইহাকে রাখিতে হয় সযত্নে, ভোগ করিতে হয় সন্তর্পণে ; যেমন, ফুল না ভাঙিয়া ভ্রমর মধু খায় (২৮৯)। এবং, "কাটিলে যেমন কূপের জল বাড়ে," তেমনি এই প্রেমকে প্রয়াসের ও আয়াসের দ্বারা বাড়াইতে হয় (৪৩১)। অর্থাৎ প্রেম জীবনের পরম সাধনার ধন। ইহা থাকিলে জীবন সম্পদময়, না থাকিলে রিক্ত। যদি একবার ইহাকে লাভ করা যায়, তখন ইহাকে হারাণোর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নাই। সেই যাতনামূর্তি বিরহ-অংশে আমরা দেখিয়াছি, বিরহের অলঙ্কারের আলোচনায় আরো দেখিব। এখানকার জন্য জানাইয়া রাখি—সে প্রেম "কে বলে অমৃতের ধারা-স্বরূপ,…তাহা ভীষণ অঙ্গারতুল্য। বিষ খাইলে তবে প্রতিকার। মদন ভয়ানক মারক। এত সজল পদার্থ থাকিতেও ঘরে আগুন লাগিল" (৩৬৬)। এই প্রেমকে কবি মৃতসঞ্জীবনী বা অমৃততুল্য মনে করেন। এই প্রেমের বর্ণ শুভ্র (৩৭১)। কিন্তু সকল সময়ে নয়। অসময়ে, অর্থাৎ যৌবনগতে প্রেম-লাভের মূল্যহীনতা সম্বন্ধে

নায়িকার আলঙ্কারিক বর্ণনা—অসময়ে মেঘবর্ষণ, শীত-সমাপ্তিতে বসন, রজনী গেলে প্রদীপ, দিবসান্তে ভোজন এবং যৌবনাবসানে প্রেম (১৬১)। নায়কও তাই সময়ে প্রেমলাভ করার জন্য করুণ মিনতি করে, কারণ নায়কের নিকট নায়িকার প্রেমানুগ্রহ হইল গ্রীষ্মকালে প্রাণারামযুক্ত ছায়া লাভ। (১৩৩)

এইজন্য কবি চান, প্রেম নায়ক ও নায়িকা উভয়ের জীবনে সমমূল্য লাভ করুক। তাই রাগের মাথায় নায়িকা প্রেম অস্বীকার করিয়া বলিতে পারে বটে—"চক্ষু থাকিতে কেন কূপে পতিত হইব?" (২২৫), তাহা হইলেও নায়কহীন নায়িকার মূল্যহীনতা সম্বন্ধে কবির বক্তব্য—"হাটের ঘর যেমন দোকানদার না থাকিলে অর্থশূন্য হয়, তেমনি তোমার দেহও নিরর্থক" (২৪৯)। নায়ক-পক্ষেও এই কথা সমভাবে সত্য।

প্রেমের বাসনা-রূপ

প্রেমের এই নানামুখী বিকাশ, তাহার আলো ছায়া ও মায়ার সংখ্যাতীত রূপের মধ্যে কামনার প্রবলতা প্রকাশ করা বিদ্যাপতির অন্যতম প্রধান চেষ্টা। অবাধ আকুল বাসনাকে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগে উন্মোচন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার কবিশক্তির বিশেষ সার্থকতা এখানে মিলিবে। বিদ্যাপতির প্রতিভার দীপ্ত রূপের নিদর্শন এই অংশে যথেষ্ট। সে দীপ্তি প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ পদে আছে। নিশ্চয় সবগুলিকে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। আমি কয়েকটিমাত্র নির্বাচন করিতেছি। উহাদের মধ্যেই বিদ্যাপতিকে চেনা যাইবে। যেমন বার্ধক্যে অপরিতৃপ্ত যৌবনের ক্রন্দন—

"যৌবনের শেষ হইল, অঙ্গ শুকাইল, পিছনে ফিরিয়া দেখি উন্মত্ত অনঙ্গ গড়াইয়া পড়িতেছে।" (৬)

"যৌবনের শেষে অঙ্গ শুকাইয়া গিয়াছে। তথাপি পিছন হইতে উন্মত্ত অনঙ্গ তাড়া করিয়া ফিরিতেছে।" (ঐ—নেপাল পুথি)

অপরিগৃহীত যৌবনের অন্তর্জ্বালা—

"এমন বয়সে প্রভু ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেল, কুসুম (নিজের) মকরন্দ (নিজেই) পান করিল।" (১৬৪)

"হে সখি, হে সখি, তোকে কি কহিব, নাথ ভাল করিয়া আমাকে ভুলিল, কুসুমের মধু নিজ তনুতে ভ্রমণ করে।" (৫০৯)

"যৌবন-রতন যতদিন ছিল, ততদিন মুরারি আদর করিল, এখন কুসুমে রসও নাই, গন্ধও নাই...সরোবরে জল নাই।" (৪৫৫)

এই কালে ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আক্ষেপ—

"তাঁহার কথা কিসের জন্য বলিস ? যে আগুন নিভিয়া গিয়াছে, তাহাকে কেন জ্বালাস ?" (১১৮)

হৃদয়ের এই দাহ হইতে অনুমান করা যায়, প্রেম কিভাবে নায়ক বা নায়িকাকে অধিকার করিয়াছিল। কৃষ্ণকে দেখা মাত্র নায়িকার নিকট গলার হার ভার, মলয় সমীর দুঃসহ এবং চীর ও চন্দন অগ্নিবৎ মনে হইয়াছিল (২৪১)। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিকার বাড়িয়াছিল (৪০), এবং মনের সেই অগ্নিদাহ ও বিকার দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো দেহপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৪১)। এই সময় নায়িকার মনে হয়, মদনের পাশ গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে (৩০০), এবং নায়িকাকে সন্ধ্যাবেলা যমুনাতীরে দেখা মাত্র নায়ক উন্মত্ত হইয়া মদনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় (৭৬), ও "হৃদয় ভরিয়া যুবতীজনের সুখ গ্রহণ করিতে" সচেষ্ট থাকে (১০০)। দুইজনেই এই সময়ে ব্যাকুল, একই মদন দুইজনকে শরপ্রহারে পরাজিত করিয়াছে (১০৯), দারুণ ইন্দ্রিয় নিষেধ না জানিয়া ছুটিয়াছে (৫৫০), ক্ষুধিত লোকের মত নায়ক দুই হাতে খাইয়াছে (৬৮০)। সর্বাত্মক উপভোগ ভিন্ন নায়ক পরিতৃপ্ত নহে ; স্পর্শ, আঘ্রাণ, শ্রবণ ও পান করিয়াও অন্ধকারে নায়িকার দর্শনসুখ না পাওয়ায় নায়ক বাসনার্ত (২৭৯) ; প্রয়াগ মনে করিয়া নায়িকা-অনলে নায়ক ঝাঁপ দিয়াছে (১৫৪) ; উভয়ের এমন অসংবৃত অবস্থা যে, 'উভয়ে শয্যায় বস্ত্র সাবধান করে না, উভয়ে পিপাসিত, জলপান করিতেছে,...মদন দুইজনকে জয়পত্র দিল' (৪৭৯) ; জয়পত্র দিবার পরেও, যখন 'কোমল প্রিয়-রস কামিনী পান

করিয়াছে' এবং রতিরঙ্গে উভয়ের মন পূর্ণ, তখনও মদন ধনুর্গুণ ছাড়ে নাই (৭৫)। এই অবস্থায় নায়িকার পীড়িত প্রশ্ন—"বিধাতা কেন আমার দেহ কুলবতী করিয়া সৃষ্টি করিল? কামদেব হাত ধরিয়া গৃহের বাহির করিয়া দেয়, মন্দিরে কুলাচার পড়িয়া থাকে। সহিতে পারি না, চলিতে পারি না। খাঁচার মধ্যে সারীর মত অনবরত ফিরিতেছি।" (৬৩১)

এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি, সেই কবির কণ্ঠে কামনার 'আগ্নেয়' সমর্থন—

"বিদ্যাপতি বলেন, লজ্জা ও ভয় ত্যাগ কর। আগুনের যেখানে কাজ, সেখানে আগুন না জ্বালিলে কি চলে?" (৪৯১)

"বিদ্যাপতি বলেন, হে নারীশ্রেষ্ঠ, শোন, অনলদহনে অনলই প্রতীকার।" (৬৮৭)

"কবিরাজ বিদ্যাপতি বলেন, শোন, আগুনে পুড়িলে আবার আগুনের প্রয়োজন হয়।" (২৭৪)

এবং বিদ্যাপতির সমর্থন পাইয়া বিদ্যাপতির সখী রাত্রির কামোৎসবকে দিবাভাগে আহ্বান করিবার মত দুঃসাহসী প্ররোচনা দিয়াছে; রাত্রির গুপ্তপ্রেম সম্বন্ধে সে বলিয়াছে—

"অন্ধকূপের ন্যায় রাত্রির বিলাস, যেন চোরের মন ভয়ে ভয়ে থাকে।" (৩৩৪)

ইন্দ্রিয়াবেগের আলঙ্কারিক বর্ণনায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব আশা করি পরিস্ফুট হইয়াছে। অলঙ্কারগুলি কিরূপ অর্থ ও চিত্রবহ! ঐ শীর্ণ লোলদেহ বহিয়া অনঙ্গের গড়াইয়া পড়ার ছবি, কিংবা শুষ্ক দেহের মধ্যেও অধীর বাসনার রূপ—উন্মত্ত অনঙ্গের তাড়া করিয়া ফেরা—বর্ণনা-শক্তির দৃষ্টান্ত। কুসুম নিজের মধু নিজে পান করিল বা কুসুমের মধু নিজের তনুতে ভ্রমণ করিতেছে—অনুপচিত রসের পীড়ন এই ভাষা ভিন্ন আর কিভাবে ফুটিত? কিংবা ইন্দ্রিয়ের উন্মত্ত বহির্গমন, কুলাচারকে জীর্ণ বস্ত্রের মত গৃহে ফেলিয়া দিয়া কামের হাত ধরিয়া পথে নামিয়া পড়া, ক্ষুধিত লোকের মত দুই হাতে লুটিয়া খাওয়ার বর্ণনা—উৎকৃষ্ট বর্ণনার স্তরেই পড়ে। এই সকল স্থানে অলঙ্কার জীবনধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বেড়া ঠেলিয়া চঞ্চল লোকজীবন এখানে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রেমের বিহ্বল ও আত্মহারা রূপ

প্রেমের বিবশ বিহ্বল ও আত্মহারা অবস্থার নানা অলঙ্কার পাওয়া যায়—

"যখন শয্যাপার্শ্বে যাই, মুখের দিকে চাহিয়া হাসে, তখন ভাব এমন উৎপন্ন হয় যেন জগৎ কুসুমশরে পূর্ণ।" (৪৮০)

তনু পুলকে পূর্ণ হইল, আমোদিত মদন যেন সুললিত গান গাহিতেছে। (১৯৩)

"সখি! স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকটে আসিল, সে সময়কার হৃদয়ের আনন্দের কি বলিব? ধনুর্গুণ দেখি না, সন্ধানও দেখি না, চারিদিকে কুসুমের বাণ পড়িতেছে।" (৫৬৪)

"বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত, যেমন চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্র উদ্বেলিত হয়।" (ঐ)

"কোপ করিতে চায়—চোখের পানে চাহিয়া থাকে, হাসি ধরিতে পারে না। কঠিন কথা বলিতে চায়, মুখ অরুণবর্ণ থাকে না, চন্দ্র কি অগ্নির মত জ্বলে?" (২২৩)

"হৃদয়ের আনন্দে মুখ প্রকাশিত হয়, যেমন সূর্যের তেজে কমল বিকশিত হয়।" (৫৬৯)

"মুখ আড় করিয়া মধুর হাসিয়া সুন্দরী মাথা নীচু করিল, যেন উল্টানো কমলের কান্তি পূর্ণরূপে দেখা গেল না বলিয়া (দেখিতে দেখিতে) যুগ বহিয়া গেল।" (৩৯)

"কতবার না না করিব? উভয়ের মন রতিরঙ্গে পূর্ণ হইল—তবু মদন ধনুর্গুণ ছাড়ে না।" (৭৫)

"গজগামিনী কামিনী অল্প হাসিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া গেল, বরাঙ্গনা যেন কুসুমশরের ইন্দ্রজাল ও কুহক বিস্তার করিল।" (৬২২)

বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। অলঙ্কারগুলি স্বচ্ছ ও উদ্ভাসিত।

মদন

উদ্ধৃত অলঙ্কারগুলির উপজীব্য মদনার্তি। মদনার্তির মত মদনও কোনো কোনো অলঙ্কারের বিষয়। মদনকে মাহুত (১৯), পুরোহিত (৬৫),

চাতক (৪৮৬), ব্যাধ বা ব্যাধের অধিক (৭৭, ৫১৭ খ), ভুজঙ্গ (৫৪৭), হাঙ্গর (৬০৯), চোর (৫৮৬) ইত্যাদি নানাভাবে আখ্যাত করা হইয়াছে। আক্রমণকারী যোদ্ধা, শত্রুরাজরূপেও মদনের কল্পনা আছে (২১২, ৪৭৪, ৫৭৮)। মদনের সঙ্গে বৃক্ষ বা পত্রের অঙ্কুর, বা সম্পূর্ণ বৃক্ষের তুলনাও মেলে (৪১, ২৭৮, ২৯০)। একটি সুন্দর বর্ণনায় মদনকে বলা হইয়াছে —'মনের অতিথি' (৬৭)। এইরূপ—'হৃদয়ে উজ্জ্বল কামদেব' (৬৩৬), —'জগৎ কামের অগ্নিতে ভরিয়া গেল' (৭৪)। মদনের রচনায় উভয়ের দেহ কম্পিত (৭৫৮)—ইত্যাদি রসাত্মক বর্ণনাও পাওয়া যায়। এবং আরো বহু বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহা পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, কারণ বিদ্যাপতির কাব্য বহুলাংশে মদন-মঙ্গল।

যৌবনই মদনের অধিকার-কাল। যৌবন-বিষয়ে কিছু অলঙ্কার মেলে। যৌবনকে গজরাজ (৩৯, ২৫২), রাজা (ঐ), দোকানের প্রথম পসার (৫২), বলা হইয়াছে। যৌবনের রূপ-বর্ণনাত্মক প্রচুর অলঙ্কার ইতিপূর্বে দেখিয়াছি।

নায়ক : নায়িকা : নায়ক-নায়িকার একত্র রূপ

অধিক অগ্রসর হইবার পূর্বে নায়ক, নায়িকা এবং নায়ক-নায়িকার একত্র-রূপের অলঙ্কারগুলি দেখা ভাল। নায়ক ও নায়িকার বিষয়ে অলঙ্কারগুলি ইতিমধ্যেই প্রায় উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটিকে মাত্র একত্র সঙ্কলন করিতেছি।

নায়ক সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিশেষণ ও অলঙ্কার মেলে, সেগুলি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। অলঙ্কার বা আখ্যাগুলি প্রধানতঃ নায়িকাকণ্ঠ হইতে আসিয়াছে। প্রেমের বিভিন্ন অবস্থায় সেগুলি কথিত। অবস্থান্তর অনুযায়ী অলঙ্কারান্তরও ঘটিয়াছে। নিতান্ত নিন্দা কিছু আছে, অবিমিশ্র গালিগালাজ, যেমন—মূর্খ, পিতলের তাড়, পশু, ঢাকা কূপ, শিমূল (১১৭), গেঁয়ো লোক, কুসুমে কীট, বানর, ভেক। পীড়নকারী নায়ক সম্বন্ধেও অনেক নিন্দাবাণী আছে, সেগুলি বহু সময় ভিতরে রস-পুলকিত, যেমন—প্রোণলতাকে দলনকারী হস্তী (৬৯১) মদনের জুড়িদার (১২০), বজ্রের

সার (৬৮০)। মুগ্ধার আলোচনায় এই জাতীয় নায়কের বর্ণনা পাইয়াছি। নায়কের আবার উভয় সঙ্কট, পীড়ন করিলে দোষ, অব্যাহতি দিলেও ক্ষোভ, যেমন—'লোকে বলে ভুজঙ্গের ন্যায় তীব্র, (কিন্তু) রঙ্গ জানে না' (৭৯)। নায়কের 'ভুজঙ্গ' বিশেষণ তাহলে গুণেরই, যদি সে যথার্থ গরল-তীব্র ভুজঙ্গ হইতে পারে। বশীভূত নায়কের অলঙ্কার হইল—'লুব্ধ ভ্রমর', 'বাঁধা হরিণ' (২৫৫), 'বিহ্বল ভ্রমর' (৪৩)। অভিমানে শঠ নায়কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করিয়াছে নায়িকা বেদনাভরে। নায়ক সম্বন্ধে 'ঢাকা কূপ' অলঙ্কারটির কথা বলিয়াছি (৩৯৪)।—'কমল-বিলাসী ভ্রমর' (৩৯৮), 'শুনিলাম তুমি চন্দন তরু' (৪৪৯), 'সুরতরু জানিয়া কত যত্নে সেবা করিলাম' (৪৫১), 'প্রিয়, মধুকরতুল্য' (১২১), 'কেহ বলে মাধব, কেহ বলে কানাই, আমি অনুমান করিলাম সম্পূর্ণ পাষাণ' (৪২০), 'মাধব করুণাহীন পাষাণের সার' (৭৩৫)—এই জাতীয় বর্ণনা। পরম প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া প্রিয়-বন্দনাও করা হইয়াছে—'তুমি শুধু জলধর নও, জলধরের রাজা' (৪৫৯), 'প্রিয়তম দ্বিতীয় প্রাণের তুল্য' (৩৮৯), প্রিয়, নয়নের নিদ্রা, বয়ানের হাসি, হৃদয়ের সুখ (৭২৬), গোকুল-মাণিক (৭৩১), গোকুলচন্দ্র (৮৫১), তুমি অমৃত (৭৬৪), জগতারণ, দীন দয়াময়, ভবতারণ, আদি অনাদির নাথ (৭৬৩)।

নায়িকা সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছি, আর নূতন কোনো কথা বাহুল্য। কেবল কয়েকটি মধুর বিশেষণ ও সম্বোধন স্মরণ করাইয়া দিব—হে শ্যামলী (২৫৩), হে মল্লিকা (৫৫), তুমি রস-কামিনী, তুমি মধু যামিনী (৯৮)।

নায়ক-নায়িকার একত্র রূপের বর্ণনায় মিলনের অবস্থার অনেক অলঙ্কার পাওয়া যায়। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবি রাসস্থলীর বর্ণনাতেও সেই রূপ আঁকিয়াছেন। পুরাতন পদ্ধতিতে বিদ্যাপতি বলেন—তরুবর-লতা ভ্রমর-ফুল (৪২), চন্দ্রের নিকট তারা (৪৯৮)। উৎপীড়িত নায়িকার অবস্থা বর্ণনায়—নলিনী ও বজ্র, নলিনী ও পর্বত। কবির বর্ণনা সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয় যখন বলেন—এক বৃন্তে দুটি ফুল এবং মন্মথের এক শরে বিদ্ধ দুটি জীবন (২৫৯)।

প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা এবং নায়ক-নায়িকার সম্পর্কের রূপ ফুটাইতে ভ্রমর, কমল, জাতকী, কেতকী, কুন্দ, চন্দ্র-চকোর, পদ্ম-সূর্য, মালতী-ভ্রমর,

মধু, নাগর, ভ্রমর ইত্যাদির ছড়াছড়ি কবি কিরূপ করেন যথেষ্ট দেখিয়াছি—৩৭০, ৩৮৮, ৪১৬, ৪২১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৫৬, ৪৬৮, ৪৭৬, ৪৮২—পদগুলি এ ব্যাপারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

মুগ্ধার প্রেমের রূপ

এইখানে মুগ্ধা-বিষয়ক অলঙ্কারগুলি লক্ষ্য করা চলে। মুগ্ধা বলিতে সাধারণভাবে প্রেমের প্রারম্ভিক অবস্থা বুঝিয়াছি। ইতিপূর্বে মুগ্ধার মনস্তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। যথেষ্ট অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে কেবল অলঙ্কারগুলির উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ মুগ্ধার দৈহিক ও মানসিক অপরিণতির অবস্থা—তাহা কাঁচা ফল (৬৮১), বদ্ধ মুকুল (৫৮), সুকোমল পদ্মে বিলীন মধু, অবিকশিত মালতী (২৮৮) ইত্যাদি। বিদ্যাপতি, মুগ্ধা সব রস বোঝে না ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন—যেমন সাগরের গভীরতা মাপা যায় না (৫৮)। এখানে অলঙ্কার প্রয়োজনের তুলনায় গুরুভার।

মুগ্ধার ভীতি ও অস্বীকার সম্বন্ধে অলঙ্কারে—সিংহের নিকট হরিণী (২৮০, ২৮৪, ৬৭২), মাতঙ্গ-মুখে বা মাতঙ্গ-কোলে নলিনীর (৭১, ৬৮০, ৪৮৭) কথা প্রচুরভাবে বিদ্যাপতি বলিয়াছেন। ভ্রমর পদ্মকলি টানাটানি করিতেছে, পদ্মপত্রের মত ধনীর অঙ্গ টলমল করিতেছে (২৭৪), মন্ত্রে অবশীভূত ভুজঙ্গশিশুর মত নায়িকা অঙ্গ সঙ্কুচিত করিতেছে (৬৮৮, ৬৭৭, ৫৭২, ৬৭৯) এইসব বর্ণনা পাওয়া যায়।—"আমি রসের প্রসঙ্গে লাফাইয়া উঠি, হরিণী যেমন তীর লাগিলে লাফাইয়া ওঠে"—এই ধরনের বর্ণনা আছে (৬৮১)। মুগ্ধার অস্বীকারের সঙ্গে পলাইত সৈন্যদলের তুলনাও পাইতেছি (৫৯)।

মুগ্ধার সঙ্গে প্রেমে সাবধানতার মূল্য নানা অলঙ্কারে প্রকাশিত।—"যদি রমণী বাঁচিয়া থাকে তবে রমণে সুখ," সুতরাং পুষ্পকে রক্ষা করিয়া মধুপানের অনুরোধ জানানো হইয়াছে (২৮৩, ২৮৮); বলা হইয়াছে, মোহবশতঃ পদ্মকলির মত নায়িকাকে ভ্রমরের মত হুল বসাইও না (২৭০); 'কাঁচা দাড়িম্বের' প্রতি প্রীতিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া, নায়িকার অজ রসে নায়কের তৃষ্ণা

নিবারণের সম্ভাবনা নাই জানিয়া, 'প্রতিপদ হইতে চন্দ্রকলার বৃদ্ধির স্থায় অল্প অল্প চাহিতে' অনুরোধ করা হইয়াছে (৬৮৪)। শেষ বক্তব্য—'ধনীর প্রাণের ন্যায় তনুও যেহেতু কাঁচা, সেই হেতু পুনর্বার মিলিত হইবার উপায় রাখিয়াই অগ্রসর হওয়া উচিত, যেমন বণিকেরা সব সময় মূলধন রক্ষা করে' (২৯০, ২৯১)।

এতৎসত্ত্বেও নায়ক কথা শুনিবে এমন কোনো কথা নাই। নায়ক কথা না শোনায় অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে—"সিংহের কবলে হস্তিনী পড়িলে তাহাকে ছাড়ানো কঠিন।...যে শিরীষকুসুম ভ্রমরের ভয়ে ভীত, তাহাতে পাখী খেলা করিল" (৭৩);—"দ্রোণলতা গজদ্বারা দলিত হইল" (২৯১, ৬৯১);—"মন্মথ যেন বঁড়শি দিয়া মাছকে গাঁথিল" (২৮৭);—"কমলিনী নারীকে শিরীষকুসুম তুল্য কোমল দেখিয়াও তুমি বনমালি, তাহাকে দাঁত দিয়া দংশন করিয়াছ" (৬৮৭) ইত্যাদি। নায়কের সোহাগের সময় নায়িকার মানসিক ও দৈহিক অবস্থা একটি বাস্তব-রসাশ্রিত অলঙ্কারে কবি প্রকাশ করিয়াছেন;—"রোগী যেমন করিয়া ঔষধ পান করে" (৬৮২)। এই অলঙ্কারটি চুম্বন সম্বন্ধেও বিদ্যাপতি ব্যবহার করিয়াছেন (৬৭৭)।

মিলনের রূপ

নায়িকার জীবনে মুগ্ধার অবস্থা খণ্ড-কালীন। রাধা হইলেন 'প্রৌঢ়া পারাবতী'। তাঁহার ও তাঁহার কৃষ্ণের আনন্দময় উল্লাসময় কামনাই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। কামনার দাহরূপের অলঙ্কার ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এখানে আরো কিছু যোগ করা যাক।

নায়ক-নায়িকার মিলিত রূপের অলঙ্কার বেশ কিছু আছে। যখন কবি অসমান মিলনের কথা বলেন, তখন সিংহের নিকট হরিণী বা হস্তিনীর কথা আসে। হস্তী ও দ্রোণলতার কথাও পাই। যেখানে যোগ্যের সহিত যোগ্যা, সেখানে—তরুর সহিত মিলিত লতা (২০৮), বা মালতীর সহিত মিলিত ভ্রমর (৮৯৪)। এইরূপ আরো অনেক অলঙ্কার পাই, সেগুলি যথার্থ সুন্দর হইয়া ওঠে বিশেষ অবস্থানে—বিপরীত মিলন বর্ণনায় সেরূপ কিছু অলঙ্কার দেখিয়াছি। কৃষ্ণ শ্যামলবর্ণ ও রাধা গৌরাঙ্গী বলিয়া মেঘ ও

বিদ্যুতের উপমা সহজে আসিয়া যায়। এই কথাটিকে কবি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—মেঘ ও বিদ্যুতের চুরি (লুকোচুরি) (১০০)। এখানে মিলনের ছন্দটি আলোছায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। এবং এই অবস্থান-রূপ পূর্ব-কথিত ভ্রমর-মালতীর একটি গতানুগতিক উপমাতে চমৎকার ফুটিয়াছে—"মাধব কেলি বিলাস করিতেছে। ভ্রমরের ন্যায় মালতীকে রমণ করিয়া পুনরায় রতিরঙ্গের আশায় আগলাইতেছে।" সার্থক চিত্ররূপ। শিহরিতপক্ষ ভ্রমরের একবার মধুপান, এবং তাহার পরেই উড়িয়া পুষ্পটিকে চক্রমণ, এবং আবার আসিয়া পান—কবি তাঁহার দৃষ্টবস্তু তুলিয়া লইয়া আরোপ করিয়াছেন কাব্যের প্রেমজীবনের উপর।

ভোগোত্তর অবস্থা

ভোগোত্তর অবস্থাও বহুবিধ অলঙ্কারের আশ্রয়। নয়নের কাজল অধরে লাগিল, ইত্যাদি চণ্ডীদাসতুল্য বর্ণনা তো আছেই (১১৬), তাছাড়া, রসহীন উত্তাপ-শীর্ণ মৃণাললতা (৩), আগুনে ঝলসানো শ্যামবর্ণ (৬৯), আলিঙ্গন-মুক্ত নায়িকা 'যেন চন্দ্রের ক্ষীণরেখা' (৪৯০)। এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার—"তিলক বহিয়া গেল, কেশ আলুথালু হইল, কামদেব যেন হাসিয়া উপঢৌকন পরীক্ষা করিল" (২৯৮)। এইখানে আছে কবির হাসি, কামের হাসির পিছনে। বিপর্যস্ত দেহ দেখিয়া কবির আনন্দ অলঙ্কারে ফুটিয়াছে। দেহ ও দেহসজ্জায় ঐ বিমথিত অবস্থার পিছনে আছে কামের অত্যাচার, সন্দেহ নাই। মুগ্ধা অবস্থায় সে অত্যাচার অন্ততঃ একপক্ষে যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কিন্তু যখন অত্যাচারেই আনন্দ—কবি অলঙ্কার দিলেন—কাম উপঢৌকন পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্যই দেহের ও সজ্জার ঐ অবস্থা। 'রূপ-যৌবন উপঢৌকন দেবেন কন্যা তাহারে, তাই পরেছেন চীনাংশুকের পট্টবসন বাহারে'—আধুনিক কবি লিখিয়াছেন। যাহাকে উপহার দেওয়া হইবে, তিনি প্রিয়তম তো বটেই, আসলে কামই প্রিয়রূপ ধরিয়াছেন। সস্মিত, সকৌতুক, নাগরিক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ দেহভোগের উদঘাটক এই অলঙ্কারটি।

উপভুক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অলঙ্কার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করিয়াছি।

প্রভাত হইলে নায়িকাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেও অলঙ্কারের প্রয়োজন—"ভ্রমর কুসুমকে রমণ করিয়া আগুলিয়া থাকে না, নিজের ধন ধনী গোপন করিয়া রাখে, পরের রত্ন কি কেহ ব্যক্ত করে? চোর যদি চতুর হয় চুরি শোভা পায়" (৩৩৮)।

মানাবস্থা

মান প্রেমের বিশিষ্ট অবস্থা। মানকে 'আগুনের আকার' (১২৩), বিষতরু (১৩২), সর্প (৬৪৪), রত্ন (৬৫১) বলা হইয়াছে। মানিনীর নিঃসঙ্গ অবস্থার দৈন্যরূপ আছে এক অলঙ্কারে ; সখী মানিনীকে গঞ্জনা দিয়া বলিতেছে—'একটি তারা কেহ দেখে না, আকাশে উঠিলে অমঙ্গল গণনা করে।' (৮৫৪)

সুন্দরী নায়িকার পদতলে শায়িত পৃথিবীর রূপান্তরিত রূপ একটি মুগ্ধ অলঙ্কারের বিষয়বস্তু হইয়াছে—'একথা কে বিশ্বাস করিবে যে, পৃথিবী চাঁপা ফুলের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে?' (২৭)।

বিরহের ভাবরূপ

বিরহাবস্থাকে বহুভাবে অলঙ্কারে ধরা হইয়াছে। পূর্বে 'সমগ্র দেহের রূপ ও ছন্দের' অলঙ্কার আলোচনায় বিরহিণীর দেহরূপের আলঙ্কারগুলি তুলিয়াছি। এক্ষেত্রে তুলিব বিরহ-ভাবের আলঙ্কার।

বিরহকে বলা হইয়াছে পয়োধি (৫০৮, ৭২৯, ৪৬৭), অগ্নি (৫৩৬, ৭১৬), রাহু (৫৪৬)। বিরহকালে নায়িকা শীতল বায়ু, শীতল জল, কমলদলের শয্যাকে অগ্নিবৎ মনে করে, চন্দ্রকে সূর্য ভাবে, চন্দনকে ভাবে গরল (৭৩৮, ৭৪০)। যখন নায়িকা ও নায়ক উভয়ের সম-বিরহ, তখনকার তুলনা—বিচ্ছিন্ন চক্রবাকমিথুন (১৫৮)। যখন বিরহ নায়িকার (প্রায়শঃ নায়িকারই), তখন তাহার অবস্থা 'জলহীন মীনের মত' (২১৬), কৃষ্ণপক্ষের সময়ে একাদশীর চন্দ্রের মত (১৭৮)। পদ্ম বিনা সরোবর, সরোবর বিনা পদ্ম, কিংবা সূর্য বিনা পদ্মের মত তাহার দশা (১৬৩)। দেহনান্তরে নিজের

করুণ অবস্থাকে নায়িকা অলঙ্কারবদ্ধ করে, বলে, আমি কি সাঁঝের একেশ্বরী তারা, না ভাদ্রচতুর্থীর চাঁদ যে, অমঙ্গল-দর্শন ভাবিয়া আমার মুখ একবারও প্রিয়তম দেখেনা (১৫১)? এবং সখী এই অবস্থায় তাহাকে গঞ্জনায় বিদ্ধ করে—রূপ পথিকের নিকট আসে না, হাতের কাঁকণ দিয়া আয়নার কাজ চালাও (১৩৪)।

বিরহে প্রতীক্ষার দুটি মনোরম অলঙ্কার—"তোমার আগমনের আশায় তাহার কাছে নিদ্রা আসে না, চক্ষু দেউড়ীতে লাগিয়া থাকে" (৩৫৪), এবং —"দিবানিশি তোমার পথ দেখিতেছে, যেন যূথভ্রষ্ট হরিণী" (২৬৪)। শেষ অলঙ্কারটি যথার্থ সুন্দর, উহাতে প্রথমতঃ চিত্ররস—যূথভ্রষ্ট হরিণীর একাকী উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধানের রূপ, দ্বিতীয়তঃ ভাবরস—কৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে তবে রাধিকা যূথমধ্যে থাকেন, নচেৎ জনাকীর্ণ সংসার তাঁহার নিকট অপরিচিত অরণ্য—এ সকলই পরিস্ফুট। অন্যত্র রাধার উৎকর্ণ শ্রবণের উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিয়াছি—'জইসে কুরঙ্গিণী শুনয়ে সঙ্গীত' (৬১৩)। অনিমেষ দৃষ্টি সম্বন্ধে — 'দুইটি নয়ন নিমেষ নিরোধ করিয়া রহিল' (৬১৮)।

বিরহাবস্থার সুন্দর দুটি অলঙ্কার আছে। এক, "একতিল মাত্র প্রাণ আছে, যেমন তৈলশূন্য প্রদীপ জ্বলে" (১৬০), দুই, বিরহে খিন্ন তনু শীর্ণ হইল, কুসুম শুকাইয়া সুবাস মাত্র রহিল" (১৭০)। তৈলশূন্য প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোর বিস্তার, তার পরেই সহসা নির্বাপণ—মৃত্যুমুখীন রাধিকার সঙ্গে তুলনার যোগ্যবস্তু। প্রদীপ জ্বলে স্নেহ-তৈলের দ্বারা, রাধার জীবন-দীপও জ্বলে প্রেম-স্নেহের দ্বারা। এটুকু অংশেও তুলনার চমৎকৃতি নাই। আসল চমৎকার ঘটিয়াছে ঐ তৈলহীন অবস্থায় দীপশিখার জ্বলৎ-ক্ষণটুকু দেখার মধ্যে। তৈলহীন প্রদীপ সত্যই জ্বলিতে পারে না—যে সময়টুকু তথাপি জ্বলে, সে নিজেকে জ্বালাইয়া—তখন শিখার তুলা জ্বলিতেছে। তেমনি প্রিয়হারা রাধা বাঁচিতে পারেন না; তথাপি বিরহাবস্থায় যে বাঁচিয়া আছেন, সে নিজের দেহকে মারিয়া ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকুর জন্য। প্রদীপ, তৈল, শিখা, ইত্যাদির একটি অতি পরিচিত অলঙ্কারের মধ্য হইতে কবি উৎকৃষ্ট রসবস্তু নিষ্কাশন করিতে পারিয়াছেন।

বিরহে খিন্ন তনুর সঙ্গে কুসুম-সুবাসের তুলনাও সৌন্দর্যময়। সাধারণতঃ ম্লান কুসুমের অলঙ্কার আনা হয় এই অবস্থায়। কবি এখানে আনিয়াছেন

কুসুম-সুবাসকে রাধা-দেহের উপমানরূপে। দেহ একটা স্থূল বস্তু, সুবাস অশরীরী। বিরহে শরীরের প্রায় অশরীরী সূক্ষ্মতার রূপ এখানে ফুটিয়াছে ; তাহারো উপরে ব্যঞ্জিত হইয়াছে আরো একটি বস্তু—রাধা এখন আত্মরূপা। কুসুমের আত্মা তার ঐ সুবাস। রাধারও তাই—তাহার প্রেম। সুবাসকে ধারণ করে পুষ্প-দেহ, প্রেমকে ধারণ করে রাধা-দেহ। রাধার দেহ প্রেমেরই দেহ। প্রেমকে লীলায় আস্বাদনের জন্য এই দেহ। প্রিয়তমের অবর্তমানে যখন লীলা থাকে না, তখন দেহ ভাঙিয়া যায়, মাত্র প্রেম থাকিয়া যায়। বিরহকালে, কুসুম-সুবাসের মত রাধার সেই প্রেম পড়িয়া আছে। রাধা আজ সব ভুলিয়া প্রেমকেই চাহিতেছেন। নিজেকে ভুলিয়াছেন, দেহকে ভুলিয়াছেন, দেহ-কুসুম শুকাইয়া খসিয়া পড়িয়াছে, রহিয়াছে মাত্র প্রেম-সুবাস।

অথচ প্রেমের সঙ্গে নয়, দেহের সঙ্গেই সুবাসের তুলনা করা হইয়াছে অলঙ্কারে। কবির সূক্ষ্ম সঙ্গতিবোধের প্রমাণ তাহা। রাধা যে এখনো বাঁচিয়া আছেন! যত শীর্ণ হোক, তাঁহার দেহ আছে। সে দেহ কিন্তু 'দেহ' বলিতে যা বোঝায় তা নয়—প্রেমকে একত্রবদ্ধ রাখিতে যে ন্যূনতম আকারের প্রয়োজন সেইটুকু—কবির ইহাই বক্তব্য।

অলঙ্কারটিতে কারুণ্যের ভাবটিও পরিস্ফুট। সাধারণ মানুষের কাছে পুষ্প ছাড়া সৌরভ নাই। অদৃশ্য সৌরভ ভ্রষ্ট-কুসুমের বিষণ্ণ স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। সৌরভ-শেষ রাধাও কবিচিত্তে তাহাই করিতেছেন।

বিরহ-কারণ

বিরহের অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে প্রথমে পড়ে নায়কের অন্যায় আচরণ। সে বিষয়ে কিছু অলঙ্কার আছে। নায়ক মধুমাখা শরপ্রহার করে, মেকি সোনার মত তাহার প্রেম (৩৮০), সে তীব্র ক্ষতে লবণ ছিটাইয়া দেয় (৩৬৭), কেয়াফুলের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কমলিনী ছাড়িয়া সেদিকে ছোটে, পরে মুখে ধূলি ও গায়ে কাঁটা বিঁধিয়া ফিরিয়া আসে (৩৭৩), অদ্ভুত তাহার কুটিলতা, সে যেন বিষপূর্ণ স্বর্ণকলস, যাহার উপরে দুধের একটি স্তর আছে (৬৪১), উপরে গুড় লাগাইয়া কাঠের মোদক সে উপহার দেয় (ঐ),

ফেলিয়া দেওয়া ফুল লইয়া সে পূজা করে, তাহাতেই বাণ নির্মাণ করে (৬৪১)। নায়িকা তিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছে—ভেক কুসুমের মকরন্দ পান করে না, নিত্য দুগ্ধ সিঞ্চন করিলেও করেলা তিক্ত স্বভাব ত্যাগ করে না, মন্দ ব্যক্তি রসভেদ জানে না, মন্দস্বভাব বানরের মুখে পান শোভা পায় না (৪১৮)। নায়িকার তীক্ষ্ণতম উক্তি—কাকের মুখে কি বেদ উচ্চারিত হয়? (৩৫৪)।

নায়িকাও কখনো কখনো নায়কের তুল্য আচরণ করিয়াছে। নায়কের স্পর্শদোষ হইতে গা বাঁচাইয়া অহঙ্কৃত ভাষায় বলিয়াছে—'জলের ও স্থলের ফুলে কিরূপে মালা গাঁথা হইবে? (৫৪)। দীপের শিখা পবন সহে না, মতি ছুঁইলেই মলিন হয় (ঐ)। নায়কের বাড়াবাড়ি-রকম আবদারে তাহার ঘৃণাপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের অলঙ্কার—মূল্য পাঠাইলে ঘোল পায় না, মতিচ্ছন্ন ঘৃত ধারে চায়; থাকিবার জায়গা পায় না, খাইতে চায়; বসিতে বিচালী পায় না শয্যার সন্ধান করে; জীর্ণ মাদুর যার শয্যা, সে পালঙ্ক চায় (৫৬)।

মিলনদূতী কখনো কখনো বিচ্ছেদ-কারণ হইয়াছে। দূতীর বিশ্বাস-ঘাতকতা বিষয়ক অলঙ্কার—বিড়ালকে দুধরক্ষার ভার দান, কাপড়ে বাঁধিয়া তেলে মাছ ছাড়া, বদ্ধ ঘরে ইন্দুরকে রক্ষক রাখা, গোবরে বাঁধিয়া ঘরে বিছাকে নিক্ষেপ করা (৮৩)। এইরূপ দূতী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"দুধের মাছি" (৪৫৮)।

বিপরীত ভাগ্য : ভ্রান্ত বুদ্ধি

নায়িকা বিচ্ছেদকালে নিজের বিপরীত অদৃষ্ট লইয়া আক্ষেপ করিয়াছে। এই আক্ষেপ বিদ্যাপতি-পদাবলীতে বিপুল-পরিমাণ। অলঙ্কারও যথেষ্ট। যেমন—চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখে উচ্চারিত বেদতুল্য অভ্রান্ত সুপুরুষের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হইল (৩৮১), সময়ের দোষে জল অগ্নি উদ্গিরণ করিল (ঐ), ধবলগিরি হইতে জলদ আসিয়া মেঘবর্ষণ করিল (১৭১), শীতল মলয়গিরি ছায়াপ্রার্থীকে দাবানল দিল (৩১৭), সমুদ্র তৃষিতের জন্য রাখিল লবণাক্ত জল (ঐ), ঝটিকাতে মহীতরুর আশ্রয় আশাভরে লইলেও ডাল ভাঙিয়া কপালে পড়িল (৪৩৫), কর্মদোষে কনক কাঁচ হইল (৪৬৭), হার ভুজঙ্গ হইল (৬৪০), শীতল চন্দ্র কিরণে দগ্ধ করিল (৭১৫, ৭১৫), স্বর্গীয় তরু ছায়া

দিল না, সূর্য কিরণদ্বারা শীত নিবারণ করিল না, ধনপতির নিকট ধনপ্রার্থনা নিষ্ফল হইল, অমৃতসরোবরে স্নান করিয়া সংশয়াপন্ন হইল জীবন (৭১৫), মতির পুত্তলী বিষধর সর্প হইল (১১৯), অমৃতলতায় বিষফল ফলিল (৩৭৭)। ফলে কল্পতরুতলে সুখ-জন্ম কাটাইলেও নায়িকাকে এখন ধুতুরার তলে কার্যনির্বাহ করিতে হইতেছে এবং দেখিতে হইতেছে—ফল কাটিয়া কীট ভোজন করিতেছে অথচ ভ্রমর উদাসীন (৫২৪)।

এমন যে অবস্থা হইয়াছে তাহার জন্য নায়িকার ভ্রান্তবুদ্ধি কম দায়ী নয়। সেই ভ্রান্তবুদ্ধির পরিচায়ক অলঙ্কার আছে। নায়িকা বলিতেছে—অমৃতভ্রমে বিষপান করিলাম (১১৭), পরের কথায় মতিহীনের মতো কূপে লম্ফদান করিলাম (১১৩, ১১৭, ৬৪২), চন্দনভ্রমে শিমূলকে আলিঙ্গন করিলাম, (১১৭), পাত্র (অস্পৃশ্যজাতির ভোজনপাত্র) ছুঁইলাম, পেট ভরিল না (৩৭৯), নিজের শূল নিজের হাতে চাঁছিলাম (৬৪২)। নিজের অবিবেচনার কথা নায়িকা আত্মধিক্কারের সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—পরের কথায় কেহ গুঞ্জা ক্রয় করে না, যত যত্নেই বিক্রয় করা হোক না কেন?—কিন্তু নায়িকা তাহা করিয়াছে (১১৩)।

এই অবস্থায় নায়িকা নায়ককে জ্ঞান দিতে পারে—চন্দ্র যেমন অন্ধকার রন্ধ্রকে ত্যাগ করে না, তেমনি ভাল লোকের হৃদয় মন্দ লোককে ত্যাগ করে না (৩৮১), সাধু ব্যক্তির পক্ষে চুরি সাজে না (১১৩), ঢিল ছুঁড়িলে তাহা ফিরিয়া আসে (৪৩৫)।

নায়ককে জ্ঞান দেয় নায়িকা, আর নায়িকাকে জ্ঞান দেয় দূতী। বিলম্বিত প্রজ্ঞার মূল্যহীনতা সম্বন্ধে দূতীর অলঙ্কার—জল খাইবার পর জাতিবিচার (৬৪০)। নায়িকার অনুচিত ব্যবহার সম্বন্ধে দূতী পূর্বেই সতর্ক করিয়া বলিয়াছে, প্রথমে অমৃতের লোভ দেখাইয়া এখন বিষবচন কহিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছ (৪২২) এবং—নায়কের আশা খণ্ডন করা আর প্রবল বায়ু বহিবার সময় অগ্নিতে কাষ্ঠ দিয়া শয়ন করা একই কথা (৪২২)। এই অলঙ্কারে নায়িকার বাসনা-প্রবলতা উদ্‌ঘাটিত। সেই নায়িকা দুর্ভাগ্যকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, সে বিষয়ে অলঙ্কার—বনের বাঘকে ডাকিলে সে কি খায় না? (৬৪৪)।

এ সকলই সত্য, সবচেয়ে করুণ সত্য হইল নায়িকার অনিবার্য নিয়তির অলঙ্কারটি—হরিণী ব্যাধের হস্তে অপর হরিণীর নিগ্রহের কথা জানে, তবু ব্যাধের গীত শুনিতে সাধ করে (৬৪০)। হরিণী কেবল আপনার মাংসে আপনার বৈরী নয়, আপনার মানসেও আপনার বৈরী বটে। তাহার যৌবন বন, আর বিরহ আগুন (৭১৯)।

কিছু বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার

আরো কিছু অলঙ্কার, নানা বিষয়ের, একত্র করিয়া দেওয়া যায়, যেমন কলঙ্ক-প্রচারের রূপ সম্বন্ধে—'দুর্জনের বচনে ঢোল বাজিয়া উঠিল' (৫৮৫)। অসময়ে প্রার্থনা সম্বন্ধে—'সন্ধ্যাবেলা কি কেহ সেবা মাগে' (কাজ প্রার্থনা করে)? (৭৬৪)। সময়ে সাধ পূরণ না-হওয়া সম্বন্ধে—কমল শুকাইল, ভ্রমর আসে না ; পথিক পিপাসিত, জল পায় না ; দিন দিন সরোবর অগভীর হইল, পৃথিবীতে বারিবর্ষণ হইল না (৫২৩)। এবং অসময়ে অনুগ্রহ বিষয়ে—'দিবসে দীপ জ্বালিয়া কি ফল পাইবে?' (ঐ)। আশা সম্বন্ধে 'আশা-দীপ' বলা হইয়াছে (৪১, ১৪৬), জানানো হইয়াছে—'আশার বন্ধনে মন সাক্ষী' (৫৫৩)। 'আশার পাশ'-এর কথাও আছে (৬১৮, ৭৪২)।

উপভুক্ত নায়িকা কর্তৃক ছদ্ম কৈফিয়তে আত্মসমর্থনের বিবরণ পাওয়া যাইবে—৭০, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২ পদগুলিতে।

অস্থির অব্যবস্থিত মন : মনের নৈরাশ্য

মনোরূপাত্মক ও ভাবাত্মক অলঙ্কারের আলোচনা শেষ করিবার সময় আসিয়াছে। বিদ্যাপতির মন প্রেমাশ্রিত—সুতরাং আমরা দেখিলাম মনোরূপাত্মক অলঙ্কারগুলি প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। এখন আরো দুই-একটি অলঙ্কারের আলোচনা করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, মনোরূপের যে-সকল অলঙ্কার তুলিয়াছি, সেগুলি প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাকে প্রকাশ করিয়াছে—অতিরিক্ত সাধারণ মনস্তত্ত্বেরও তাহারা উন্মোচক। যেমন, প্রেম-নৈরাশ্যের

প্রকাশক অলঙ্কার জীবনের অন্যবিধ নৈরাশ্যের অলঙ্কারও বটে। এইখানেই অনুভূতির সর্বজনীনত্ব। জ্ঞানদাস বিরহিণী-কণ্ঠে 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' ইত্যাদি যে হাহাকারধ্বনি দিয়াছেন, সে হাহাকার সকল লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত মানুষের। বিদ্যাপতির অলঙ্কার সম্বন্ধেও তাহা বলা চলে।

বিদ্যাপতি অস্থির, অব্যবস্থিত মনকে প্রকাশ করিয়াছেন নানাভাবে। যেমন—

(১) "স্থির বস্তুকে ত্যাগ করিয়া যে অস্থিরের প্রতি মন দেয়, তাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায়—যে ঘর ছাড়িয়া সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে।" (২৫১)

(২) "কমলপত্রে জলের ন্যায় মন স্থির থাকে না, কখনো গৃহে, কখনো গৃহের বাহিরে। ...দ্রুত চলিতে চায়, পুনরায় খসিয়া খসিয়া পড়ে, যেন জালে বাঁধা হরিণী।" (৩১৫)

(৩) "নিবিড় প্রেমরসের বশীভূত আমার মন লক্ষবার পরাজয় পাইতেছে।" (৫৩৬)

(৪) "দীপের শিখা দেখিয়া মন স্থির থাকিতেছে না।" (৮৯৪)।

তৃতীয় উদ্ধৃতিতে অলঙ্কার নাই—সুন্দর বর্ণনা—মনের আনন্দময় পরাজয় যার উপজীব্য। বর্ণনাটির পিছনে উহ্য আছে একটি কথা—সমাজ ও সামাজিক সংস্কার দুর্গরক্ষা করিয়া আছে, কিন্তু নায়িকার প্রেমাবিষ্ট হৃদয় অন্তর্ঘাতী কাজ চালাইয়া আত্মরক্ষাকে অসম্ভব করিয়া তুলিতেছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির কমলপত্রে জলের সঙ্গে মনের তুলনা গতানুগতিক। উহাতে শুধু মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ। কবি আরো কিছু বলিতে চান, রাধার ঘর-বাহির করার অবস্থার সঙ্গে ঐ জালে-বাঁধা হরিণীর তুলনাই অধিক সঙ্গত, এবং ইহা প্রথমটির পরিপূরক। রাধা ঘর হইতে বাহিরে যাইতে চান, কিন্তু সে স্বাধীনতা তাঁহার নাই—ফিরিয়া আসিতে হয় সঙ্কোচে ত্রাসে। জালে-বাঁধা হরিণী উঠিয়া দাঁড়ায়, ছুটিয়া চলে, আবার জালের টানে লুটাইয়া পড়ে। এই উভয় বস্তুকে কবি এক করিয়াছেন। শুধুমাত্র পদ্মপত্রে জল বলিলে ঐ মনকে উন্মোচন করা যাইত না। প্রথম উদ্ধৃতিতে অস্থির মন নয়—অব্যবস্থিত মনের রূপ। ক্রীড়ামত্ত শুভাশুভ-বোধহীন একটি শিশুচিত্তকে আনা হইয়াছে মনের সেই রূপ ফুটাইতে। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে আপাততঃ মনোরূপ অঙ্কন লক্ষ্য নয়। বলা হইয়াছে, দীপশিখা দেখিয়া মন স্থির থাকিতেছে না। সে কথা সত্য, আরো একটু জিনিস ব্যঞ্জনায় সত্য—দীপশিখা দেখিয়া কেবল মন

অস্থির তাহা নয়—ঐ অস্থির দীপশিখাই মনের প্রতীক। কম্পমান শিহরিত দীপশিখা অনুরূপ মনের চিত্রকে আমাদের সামনে আনিয়াছে।

নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা, আর্তি ইত্যাদি প্রকাশক কয়েকটি অলঙ্কার দেখা যাক—

"অভিসারের স্থান দূরে, হৃদয়ে যেন রজনীর অন্ধকার নামিয়াছে।" (৬২২)

"গমন না করিলে প্রেম যায়, গমন করিলে কুল যায়, হস্তিনী চিন্তারূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইল।" (৩১৭)

"তৃষ্ণার্ত চকোর পান করিতে উৎসুক, (কিন্তু) মেঘের প্রকাশ হইতেছে না।" (৬৭৬)

"নির্ধন অনেক যত্নে ধন পাইল, (কিন্তু) অঞ্চল হইতে রত্ন খসিয়া পড়িল।" (৫৬৫)

"হাত হইতে পরশমণি খসিয়া গেল।" (৮৫০)

"দীপ জ্বলিয়া, বাতি জ্বলিয়া গেল, তথাপি প্রিয়তম আসিল না।" (৮৭০)

অলঙ্কারগুলি অতি সরল। উন্নত নয়, মহান নয়, কৌশলময় নয়—শুধু সরল ও মর্মস্পর্শী। ক্ষেত্রবিশেষে তাহাই যথেষ্ট। শেষ উক্তিটি অলঙ্কার নয়—বর্ণনা,—আমি তুলিয়াছি এইজন্য যে, এখানেও দীপ জ্বলিয়া, বাতি জ্বলিয়া নিঃশেষ হওয়ার মধ্যে কেবল সময়-ক্ষয়কে বোঝান হইতেছে না, ঐ দীপ প্রাণেরই প্রতীক। দীপ জ্বলিয়া ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, প্রতীক্ষায় প্রাণদীপও নির্বাপিত—ইহাই কবি ব্যঞ্জনায় বলিতে চান।

দেহবিকারের দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ

বিদ্যাপতির পদাবলীতে এমন বহু অলঙ্কার আছে যেখানে বাহির হইতে দেখিলে মনে, হয় কবির উদ্দেশ্য দেহের বহিরঙ্গ অবস্থারূপকে উপস্থাপিত করা। নায়ক বা নায়িকার অনুভাবের বর্ণনাত্মক অলঙ্কার সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুভাব-রূপ ঐ দেহবিকার আসলে মনোবিকার। সুতরাং অনুভাবের বর্ণনার সময় মনোবর্ণনাই অনেক ক্ষেত্রে কবির যথার্থ অভিপ্রায়। দেহরূপের দ্বারা মনোরূপের প্রকাশক কিছু অলঙ্কার এইস্থানে উদ্ধৃত করিতে পারি।

উদ্ধৃত করিবার পূর্বে পূর্বালোচিত এই জাতীয় অপর কিছু অলঙ্কার স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিহ্বল হইয়া কুচস্পর্শের আনন্দের সঙ্গে নির্ধনের সোনার বাটি লাভ (৭৬), দিবানিশি প্রতীক্ষার সঙ্গে যূথভ্রষ্ট হরিণী-মনের তুলনা (২৬৪), চিন্তামগ্নতার সঙ্গে হরিণীর ন্যায় চিন্তাজালে আবদ্ধ হওয়া, (৫১৭), হৃতবসনার বুকে হাত রাখিয়া লজ্জারক্ষার মনোভাবের সঙ্গে বাহিরে রত্ন রাখিয়া আঁচলে গেরো দেওয়ার মনোভাবের তুলনা (৬৭৫) প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এই সকল অলঙ্কারে নায়িকা-প্রয়াসের মধ্যে নায়িকা-মনের রূপ প্রকাশিত। নায়িকার দেহবিকারের মধ্যেও মনোরূপের অলঙ্কার পূর্বে যথেষ্ট দেখিয়াছি—নয়নের দূতীয়ালী (১৭), চকোরের মত নয়ন কর্তৃক মুখ-চন্দ্র-সুধা সন্ধান (৩৪), আশালুব্ধ ভিক্ষুকের মত নয়ন (৩৮), নিমেষ-নিরুদ্ধ দুই নয়ন (৬১৮), নয়নে আবদ্ধ সমস্ত দেহ (৪১৫), অনঙ্গের গুপ্ত রঙ্গের ইশারায় পূর্ণ কটাক্ষময় নয়ন (৩৮), অনুরাগ-রক্তিম মুখের তুল্য রক্তিম কুচ (১৮), দর্পণে প্রতিবিম্বের মত মনের বিকার দেহে (৪১), পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণের মত সমাগমভীত বিবর্ণ মুখ (৬৫), রাধা-হরিণীর উৎকর্ণ রস-সঙ্গীত শ্রবণ (৬১৩)—এই সকল অলঙ্কারের আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে। এই সকল স্থানে যদিও অনুভাবের চিত্ররূপ ফুটাইতে কবির প্রত্যক্ষ প্রয়াস, যথার্থতঃ কিন্তু তাহাদের দ্বারা অনুভাব নয় ভাবরূপই ফুটিয়াছে। এই জাতীয় অলঙ্কারে চিত্রিত-পুত্তলিকার সঙ্গে বেদনাস্তব্ধ হৃদয়রূপের (৭৩৭) তুলনাও দেখিয়াছি। আলিঙ্গনে উদ্ভূত দেহরোমাঞ্চকে পুরাতন স্নেহের নবাঙ্কুর বলার মধ্যে কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। ৬২৭ পদে যেখানে আর্দ্রবসনের স্খলিত জলবিন্দুকে, নায়িকার দেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় বসনের অশ্রুবর্ষণ রূপে কল্পনা করা হইয়াছে—সেখানে কল্পনা সত্যই চমৎকার। বসনের মতই নায়কের মন নায়িকার দেহে জড়াইয়া ছিল—নায়িকার বসন হইতে জল ঝরিয়াছে, নায়কের মন হইতে রস ক্ষরিয়াছে। এই ব্যঞ্জনাময় পদটির ত্রুটি ব্যঞ্জনার বিনাশে। বিদ্যাপতি ভণিতায় তাহা করিয়াছেন। বলিয়াছেন—মুরারি শুন, এইরূপ দেখিয়া তোমার কি বসনের ভাব পাইতে ইচ্ছা করে? কবি এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যঞ্জনাকে নষ্ট না করিলেই পারিতেন।

এই ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট আর তিনটি অলঙ্কার পাইতেছি। ঘর্মাক্ত কম্পমান

-রসাল কৃষ্ণ-তনুর সঙ্গে তমালের মনসিজ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে গলিয়া যাওয়ার (২৩৯) উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। ঐ পদেই আর একটি উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার আছে। রাধা কৃষ্ণের সুন্দর অঙ্গ লক্ষ্য করিলেন, "যেন পদ্মপত্র স্পর্শ" করিলেন। কৃষ্ণের পদ্মপত্রবৎ দেহ—পদ্মপত্রের চিক্কনতা, শ্যামলতা, শিহরণ, সায়রে আত্মসমর্পিত দেহের হিল্লোল—অপূর্ব সাদৃশ্য। এবং রাধার নয়ন জলবিন্দুবৎ সেই দেহপত্রে লাবণ্যনিটোল মুক্তার মতো সরিয়া বেড়াইতেছে—ইহাকেই বলে কবি-কল্পনার চমৎকারিত্ব! দর্শনের সঙ্গে স্পর্শনের তুলনায় অভিনবত্ব আছে—নয়নে দর্শন করিয়া রাধা কৃষ্ণ-দেহ স্পর্শ করিয়াছেন।

রাধার দর্শনানুরাগের মতই অনুরাগ-ভীতিকেও উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের উপাদান করা হইয়াছে। রাধার প্রেমভীত স্পর্শকাতর মন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যেমন রাত্রিতে তুহিন পড়িলে কমল করস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না (৪৭)। আশঙ্কার হিমস্পর্শে আহত একটি মন, কোনোক্রমে বাহিরে দেহের পল্লবসজ্জাটুকু ধরিয়া রাখিয়াছে—স্পর্শটুকুও সহিবার ক্ষমতা হারাইয়া —সেই অবস্থাটি অলঙ্কারে পরিস্ফুট।

নানা বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার

মনোরূপাত্মক ও ভাবাত্মক অলঙ্কারের আলোচনা শেষ হইল। বাকি রহিল প্রকৃতি-বিষয়ক কিছু কিছু অলঙ্কার। সেগুলির উল্লেখের পূর্বে, আরো বিক্ষিপ্ত যে-সকল অলঙ্কার আছে, সেগুলির কথা বলা যাক। সন্তরণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"বাহু দ্বারা নদী পার' (৯১)। অশক্ত দেহ সম্বন্ধে "কামানো সর্পের ন্যায় নির্বিষ" (৬০৭)। কৈশোর সম্বন্ধে—"শৈশব যৌবনে দ্বন্দ্ব" (৬১২)। বাঁশীর ফুৎকার-ধ্বনির সম্বন্ধে—গরল-নিঃশ্বাস (৬৩৩)। রসোন্মত্ততা সম্বন্ধে—'রসপ্রহার' (৬৮৯)। নারী-দলের সঙ্গে গলার হারের (৪৪৭), বা চাঁদের হাটের (৭৫৪) তুলনা আছে। সংসারবিষয়েও অলঙ্কার আছে। যেমন, পুত্র-মিত্র-পত্নীপূর্ণ সংসার সম্বন্ধে—উত্তপ্ত বালুকারাশি, যাহা জলবিন্দুবৎ কবিকে শুষিয়া লইয়াছে (৭৬৩)। পাপ সম্বন্ধে—পাপ-সমুদ্র (৭৬৪)। যুদ্ধের প্রবাহ সম্বন্ধে—পর্বত হইতে প্রবাহিত জলধারা, বাতাসের

মধ্যে গরুড়ের গতি, সূর্যের তেজ (৯)। তরবারিচালনা সম্বন্ধে,—বর্ষাকালের বারিধারার মধ্যে তরঙ্গিত বিদ্যুদ্দামের ছটা (৯)। মৃত্যু বোঝাইতে বলা হইয়াছে—শশধরকলার গগন-প্রস্থান (রাধার ক্ষেত্রে—৫৪৬), এবং সূর্যের আকাশে প্রত্যাবর্তন (দেবসিংহ সম্বন্ধে—৮)। যমকে বণিক বলা হইয়াছে একটি পদে—"আমার জীবন যমরূপ বণিক অঙ্গীকার করিল" (৫২২)। মাধবকে সাগর বলিয়া অন্যান্য দেবতাকে বলা হইয়াছে সাগরের লহরী (৬০৮)। শিব সম্বন্ধে সুমহান "জগতের কিষাণ" (৫৯৩, ৭৮১) বর্ণনা তো আছেই, শিবের কপালের চাঁদকে কপালের ফোঁটারূপে কল্পনা করা হইয়াছে (১২)। শঙ্কর গৌরীকে হাত ধরিয়া যখন বিবাহ-মণ্ডপে আনিলেন, তখনকার বর্ণনা—"যেন সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণ শশধর উদিত হইল।" (৭৮২)।

প্রকৃতি-বিষয়ক-অলঙ্কার

অলঙ্কারের শেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রকৃতি। বিদ্যাপতি প্রকৃতির কবি নন, কিন্তু তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি রহিয়াছে। বিদ্যাপতির কাব্যের নিসর্গ-প্রকৃতি বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে অলঙ্কারগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিব।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে বসন্ত ও বর্ষা স্বতঃই প্রাধান্য পায়। কারণ প্রেম—বসন্তে জ্বলন্ত এবং বর্ষায় সিক্ত। প্রেমের আহ্বান ও প্রতিরোধ ঐ দুই ঋতুতে। বিদ্যাপতির নিসর্গ-বিষয়ক অলঙ্কারগুলি বহুক্ষেত্রে হৃদয়বাসনায় রঞ্জিত।

ঋতুপতি বসন্তকে রাজা-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে কয়েকটি পদে। ঐ সকল স্থানে কিভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন বৃক্ষ লতা ও প্রাণী, ঐ রাজার বন্দনা ও সেবা করিয়াছে তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি। একটি পদে ঋতুপতি বসন্তকে মন্মথের দূত বলা হইয়াছে (৪৭৮); এবং বসন্তের প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনায় পাইতেছি—ঐ সময় দক্ষিণ পবনে নায়ক-নায়িকা সন্তরণ করে (১৭৯)।

বসন্ত-বিষয়ে অতি গভীর এক উক্তি আছে, যেখানে মাধবের উল্লাস মানে বৃন্দাবনের বসন্ত—এইরূপ বর্ণনা (৪৭৫)।

বসন্তে আম্রবৃক্ষের নব নব কিশলয়কে মদনের বহুসংখ্যক নূতন ধ্বজা মনে হয় (৫০৬), এবং পুষ্পোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে—'ফুলের আগুন'—কথাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসে—"কিংশুক ফুলে যেন আগুন লাগাইয়া দিল'' (২১৮),—"বিকচ পরাগ-অগ্নি জ্বলিতেছে" (৫০৬)। মলয় পবন এই বসন্তের বিজয় ঘোষণা করে (২১৮) ও যুবতীর মান পান করে নিঃশেষে (২১২)।

বসন্তে যুবতীর মান সম্বন্ধে কবির মন বিশেষ উত্তেজিত। তিনি মলয়ানিলকে দিয়া যুবতীর মান পান করাইয়াছেন, কোকিলকেও একই কাজে লাগাইয়াছেন। বসন্তে কোকিলের দুটি প্রধান কাজ, আম্রমঞ্জরী চিবান ও মানিনীর মান পান করা (১৭৩)। মানিনীর মানের পান-রসিক প্রাণী আরো আছে, যেমন ভ্রমর, কবি তাহার কথাও বলিয়াছেন (৪৭৫)। বসন্তে কোকিলের রব তূর্যনাদের মত শোনায় (৫০৬), এবং নক্ষত্র-বিরল প্রভাতের রূপ দেখিয়া কোকিল মন্দ হাসিতে থাকে (৩৮৫)।

কোকিলের যত আনন্দ বসন্তে—তত ক্রন্দন আর একটি প্রাণীর—কুসুমশরে আহত সারসের নিঃসঙ্গ ক্রন্দন কবি শুনিয়াছেন (৫০৫)।

চন্দ্র নাই এমন প্রেমও নাই ভারতীয় কাব্যে। চন্দ্র-চন্দন-বনিতা কাব্যের উপাদান। চাঁদ সম্বন্ধে বর্ণনার অজস্র রূপ অজস্রভাবে দেখিয়াছি। চাঁদ কেন কলঙ্কগ্রস্ত, কেন কলায় বিভক্ত, কেন রাহু তাহাকে গ্রাস করে—এইসব বিষয়ে আলঙ্কারিক গবেষণা আছে বিদ্যাপতির পদে (৩১৮)। অভিসারের সময় এই চন্দ্রের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ইহাকে চণ্ডালের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে (৯৯)। এই চন্দ্র প্রস্ফুটিত কুমুদের রসে লুব্ধ (১০২)। কিন্তু চন্দ্র অপেক্ষা চন্দ্রোদয়ের বর্ণনাই উৎকৃষ্টতর। অন্ধকার পান করিয়া চন্দ্রোদয় কিংবা তাহার দ্বারা চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি (৯০, ৩১৩), চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার কর্তৃক রাত্রিকে ত্যাগ (৯৮) প্রভৃতি বর্ণনা সুন্দর। এ বিষয়ে মাদকতাময় বর্ণনা—তমোমদিরা পানে উন্মত্ত মন্দ চন্দ্র (১০০)।

অন্ধকার সম্বন্ধে বিদ্যাপতির সভয় ঔৎসুক্য ছিল। অন্ধকারের সীমাহীন রহস্যসত্তা কোনো মহৎ কবি এড়াইতে পারেন না। বিদ্যাপতি চন্দ্রকে দিয়া অন্ধকার পান করাইয়াছেন, সূর্যকে দিয়াও করাইয়াছেন (৩২৫, ৩৮৫)।

তবু, আলোক অপেক্ষা অন্ধকার তাঁহার কাব্যে কম শক্তিশালী নয়। অন্ধকার রাত্রিকে যেমন চন্দ্রকিরণ আক্রমণ করে, তেমনি সূর্যোজ্জ্বল দিবসকে আচ্ছন্ন করে মেঘ-তিমির। বর্ষার বর্ণনায় যে-মেঘ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"মেঘ যেন রুষ্ট হইয়াছে" (৩৬১),—সেই মেঘই "রাহু হইয়া সূর্যকে গ্রাস করিয়াছে"—এমনভাবে করিয়াছে যে, দিবাভাগে লোক-পরিচয় কঠিন (৩০৭)।

অন্ধকারের প্রসঙ্গে রাত্রির কথা আসিয়া যায়, আসে বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির কথা। পূর্ণিমাকালে রাত্রি দিবসের মত উজ্জ্বল হয় বটে (১০১), কিন্তু রাত্রির ক্ষেত্রে অন্ধকারই অধিক সত্য। বিদ্যাপতির লেখনীতে সত্যকার শক্তি ভর করে যখন তিনি বলেন—অতি উচ্চাঙ্গের ভাষায়—রাত্রি কজ্জল উদ্‌গিরণ করিতেছে; রাত্রি কজ্জল বমন করিতেছে (১০৪, ৩২৬); রাত্রিকে কাজলে লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে (৩২৬, ৩২৯)। সে রাত্রি ভয়াল মহান হইয়া ওঠে, যখন—"রাত্রি সমুদ্রের মত গভীর, তাহার আর শেষ হয় না" (৪৯১)। বর্ণনাটি অবশ্য প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিযুক্ত নয়।

এই রাত্রিতে বৃষ্টি আসে—শরধারার মত যে বৃষ্টি (৩২৯),—অগ্নিদহনের মত যে বৃষ্টি (৭১৮)। তখন অন্ধকারের বন্ধু বিদ্যুৎ ছুটিয়া আসে (৩২৬), দশদিক বিদ্যুৎ-বিদ্ধ হয় (৭১৯), এবং ঘন অন্ধকারকে ক্ষণেকের জন্য ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ অন্ধকারকে বাড়াইয়া দেয় (৩৪২)।

বিদ্যাপতি প্রকৃতির এই ভয়ালরূপও দেখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির অলঙ্কারের পরিচয় এখানে শেষ করিলাম।

বিদ্যাপতির সৌন্দর্য-সাধনার স্বরূপ

অলঙ্কারের ত্রুটি

বিদ্যাপতির অলঙ্কারের সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে আলঙ্কারিক কবি-রূপে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আর আছে বলিয়া মনে হয় না। সত্যই তিনি অলঙ্কারের বড় কবি—বৈষ্ণব পদাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। বিদ্যাপতির অলঙ্কারগুলির চিত্ররূপগত বিস্তৃত বিশ্লেষণ যেখানে করিয়াছি, সেখানে তাঁহার গুণের পরিমাণ দেখিয়াছি। নানা মন্তব্যে দোষও উদঘাটিত হইয়াছে। আলঙ্কারিক কবি হিসাবে বিদ্যাপতি নির্দোষ নহেন। এমনকি অন্য মহৎ কবিদের অপেক্ষা তাঁহার দোষভাগ অধিক। যেন তেন প্রকারে অলঙ্কার দিতেই হইবে—এই তাঁহার প্রধান দোষ। প্রয়োজন থাক বা না থাক, অলঙ্কারের বর্ষণ। বিদ্যাপতির ঐশ্বর্যলুব্ধতা রুচিকে সম্মান করে নাই এবং কাব্যের ধারণ-সামর্থ্যের হিসাব লয় নাই বহু সময়। এমন সময় হইয়াছে যখন বিদ্যাপতি পূর্ব হইতে বেশ-কিছু অলঙ্কার গড়াইয়া রাখিয়াছেন, পরে সেই অলঙ্কার পরিবার জন্য প্রাণী খুঁজিয়াছেন। সে দায়গ্রহণে জীবন্ত কাহাকেও পাইলে ভাল, না পাইলেও ক্ষতি নাই, কবি পুতুল রচনা করিতে জানেন।

অতি-আলঙ্কারিকতার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে অলঙ্কারের গতানুগতিকতা। এ বিষয়ে যথেষ্ট মন্তব্য পূর্বে করা হইয়াছে। বিদ্যাপতির নূতনভাবে দেখিবার ক্ষমতা ছিল (দৃষ্টান্ত পূর্বে দিয়াছি),—কিন্তু তাহা যে ছিল তাহা দেখিবার ক্ষমতা ছিল না কবির। বিদ্যাপতির পদে কারিগরির অসাধারণ নৈপুণ্য, মৌলিক ভাবনার অনিশ্চিত জীবনের সামনে নিশ্চিন্ত সুখের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বিদ্যাপতির অলঙ্কারের আর একটি দোষ—তাঁহার অলঙ্কারে আপেক্ষিকভাবে ব্যঞ্জনা অপেক্ষা ব্যাখ্যা বেশী। তিনি চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের উপর বেশী নির্ভর করিয়াছেন। যাহা দেখিয়াছেন স্পষ্টভাবে বলিতে চাহিয়াছেন। অসমাপ্তির অতৃপ্তি অপেক্ষা সুসমাপ্ত সুতৃপ্ত অলঙ্কারে

তিনি সম্পদবান। বিবেচনায় বিবেকে বিদ্যাপতির অলঙ্কার সম্রাট ; কাব্যেও তিনি ক্রিটিক। তাঁহার প্রধান দোষ, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের 'অধ্যাপক' ছিলেন।

দোষের কথা বলিতে হয় বলিয়া বলিলাম। না বলিলে লোকে বলিত এ কী ক্রিটিক! গুণের কথা বলিতে ইতিমধ্যে কয়েকশত পৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছি। মনে হয়, তাহার দ্বারা দোষ-বিন্দুগুলি চন্দ্র-কলঙ্কের মত সৌন্দর্য-বৃদ্ধির সহায়ক—এরূপ প্রমাণিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির অলঙ্কারের আলোচনা-অংশের সাধারণ নাম দিয়াছি—কবির সৌন্দর্যসাধনা। বিদ্যাপতিকে সৌন্দর্যের কবি কোন্ অর্থে বলিতেছি? মূলতঃ রূপসৌন্দর্য ও দৃশ্যসৌন্দর্যের অর্থে ; অর্থাৎ বিদ্যাপতি-অঙ্কিত নরনারী ও নিসর্গ-প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্যের রূপের বিচারে। মানস-রূপের সৌন্দর্য প্রেমের কবি বিদ্যাপতি অংশে উপস্থাপিত হইয়াছে। সদ্য-কৃত আলোচনায় বহিরঙ্গ রূপ-সৌন্দর্যের অতিরিক্ত মনোরূপাত্মক ও ভাবাত্মক অলঙ্কারের বিচার হইল।

বিদ্যাপতির সৌন্দর্য-দর্শনের অবলম্বন অলঙ্কার। তিনি অলঙ্কারের আলোকে সব কিছু দেখিয়াছেন। সমালোচনা করিয়া বলা চলে, অলঙ্কারের তো পরজীবী আলোক। মূল দেহের ও প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আভা ভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহার ঔচিত্যহীন। বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে আমরা অলঙ্কারের বহিরঙ্গ কারুনৈপুণ্য যেমন দেখিয়াছি, তেমনি দেখিয়াছি অন্তরঙ্গ প্রাণ-প্রেরণা। বিদ্যাপতির প্রেম-মনস্তত্ত্বের আলোচনায় এ বিষয়টি যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে।

বর্তমান অধ্যায়ে 'কবির সৌন্দর্যসাধনা'র সৌন্দর্য কথাটি ব্যাপকার্থে নয়, সঙ্কুচিত কিন্তু স্পষ্টার্থে গৃহীত হইয়াছে। সৌন্দর্য মানে মূলতঃ রূপ-সৌন্দর্য হইয়াছে।

এখনো কিন্তু একটি আলোচনা অপেক্ষিত। সৌন্দর্য বলিতে বিদ্যাপতি ঠিক কী বুঝিতেন—তিনি কি "বিশুদ্ধ" সৌন্দর্যের ধারণায় সমর্থ ছিলেন? সৌন্দর্যের পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ কোনো সত্তা সম্বন্ধে তাঁহার কি কোনো ধারণা ছিল?

নিশ্চয় ছিল না। সাধারণভাবে বিদ্যাপতির উত্তমর্ণ সংস্কৃত কবিদেরও ছিল না—এরূপ কথা বলিতে পারি না। বিদ্যাপতি সংস্কৃত রীতির দ্বারা চালিত। ডঃ সুশীলকুমার দে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাইয়াছেন—সংস্কৃতে প্লেটনিক প্রেম বা ইনটালেকচুয়াল প্রেমের কোনো স্থান ছিল না। আমরা সেই সুরে এখানে বলিতে পারি—সংস্কৃতে প্লেটনিক সৌন্দর্য বা ইনটালেক-চুয়াল সৌন্দর্যের সমাদর নাই।

তবে কি বিদ্যাপতির সৌন্দর্যভাবনা নিতান্ত মলিন—বস্তুবিমিশ্র? কবি কি বাসনার পরকলা ভিন্ন রূপদর্শনে অক্ষম ছিলেন?

শুদ্ধ সৌন্দর্য সত্যই সম্ভব কিনা, সেই জটিল ও অসমাধেয় আলোচনায় প্রবেশের ইচ্ছা নাই। বত্তিচেল্লির ভেনাস ছবি, কিংবা রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাকেও নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা বিতর্কের বিষয়। তবে আধুনিক-পূর্ব ভারতীয় কবিগণ-এক হিসাবে সত্যই নিছক সৌন্দর্যের অর্চনা করিয়াছেন। সেই সৌন্দর্যবোধ হয়ত নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-সন্ধানমূলক তাত্ত্বিক দৃষ্টির দ্বারা চালিত নয়—তবু সৌন্দর্যকে সৌন্দর্যরূপেই দেখিবার তাহা একান্ত প্রয়াস। এখানে আমি ভারতীয় রসবাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে চাই। রসবাদিগণ কাব্যের উদ্দেশ্যরূপে রসসৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোনো অভিপ্রায়কে স্বীকারে অনিচ্ছুক। কাব্য শুভব্রত, নয়, রসব্রত। কাব্য-পরিণতিতে শুভকে লাভ করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কল্যাণসৃষ্টি কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য।

এই যেখানে রসবাদীদের মনোভাব, সেখানে সৌন্দর্য-দর্শনের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষতা আসে না কি? তাহা যে আসে তার প্রমাণ কাব্যালঙ্কারের প্রতি ভারতীয় কবিদের আসক্তি। কাব্যালঙ্কার এদেশে প্রথার অধীন—এমন অধীন যে, কবিরা তালিকা মিলাইয়া অলঙ্কার যোজনা করিয়াছেন তাঁহাদের কাব্যে। একই জাতীয় অলঙ্কারের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ভারতীয় কাব্যে নিরতিশয় ক্লান্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভারতীয় কবিগণ অমৌলিক উপমাসন্ধানের ও বর্ণনারীতির জন্য আধুনিককালে কম গঞ্জনার সম্মুখীন হন নাই। প্রয়োজনমতো আমিও গঞ্জনা যোগ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষেত্রে, এক-জাতীয় অলঙ্কার যোজনা করিয়াছে যে মন, তাহার প্রতি দৃষ্টি-ক্ষেপ করা যায়। ইহা কি কবিদের নিছক সৌন্দর্যস্পৃহার লক্ষণ নয়? অর্থাৎ

রূপাঙ্কনই উদ্দেশ্য—সে রূপ কাহার, কোন্ অবস্থানে প্রস্ফুট, সে চিন্তার অবসর পর্যন্ত যেন নাই—শুধু বর্ণে বর্ণে রূপ আঁকিয়া যাওয়া। প্রচলিতের অবলম্বন যেমন নিষ্ক্রিয় নিরুৎসাহ মনের লক্ষণ, তেমনি ঐ প্রচলিতকে সমস্ত কিছু ভুলিয়া শিল্পরচনায় ব্যবহার করা হইতেছে—ইহা এক ধরনের তন্ময় সৌন্দর্যবোধকেই উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

ভারতীয় কবির শুদ্ধ সৌন্দর্যাসক্তি আরো প্রমাণিত তাঁহাদের হৃদয়হীন সৌন্দর্যসম্ভোগের ক্ষেত্রে। এমন বহু স্থান আছে, যেখানে শিল্পী তাঁহার নায়ক-নায়িকার বেদনাখিন্ন রূপকে যথেষ্ট আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ রূপাঙ্কনের সময় শিল্পী হিসাবে তাঁহার যে নিরপেক্ষতা থাকা উচিত ছিল, তাহাও যেন কবি পরিহার করিয়াছেন, এবং আমরা বলিব, তাঁহার ঐ প্রকার সুখবিকার সৌন্দর্যকে যথাসম্ভব সৌন্দর্যরূপে দেখার বাসনার দ্বারা সৃষ্ট। এখানে কবি সেই মানসিক অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, যখন বেদনাকেও আনন্দোৎফুল্ল নয়নে নিরীক্ষণ করা যায়। এই জাতীয় দৃষ্টান্ত কালিদাস ও অমরুশতকে যথেষ্ট মেলে, বিদ্যাপতি হইতেও ইহা পূর্বে চয়ন করিয়াছি (যেমন ৪৪৩,৭৪৪ পদ)।

এইখানে ভারতীয় অধ্যাত্ম-প্রকৃতির একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যায়। ভারতবর্ষের মনে একটি ভয়ঙ্কর ঈশ্বর-ক্ষুধা আছে—তাহার মৃত্যুপ্রেম। মৃত্যুকে শ্যাম-মোহন করিয়া ভালবাসা নয়—মৃত্যুর সকল বীভৎসতা ও ধ্বংসরূপের সহিত যুক্ত সেই মৃত্যুপ্রীতি। সেই ভালবাসার পিছনে যে রূপাসক্তি,সেও শুদ্ধ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা। নচেৎ মৃত্যুকে বাসনায় সুন্দর দেখা যায় না।

বিদ্যাপতি ভারতীয় ধারার কবি। পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি তাঁহার বিষয়েও সত্য।

শেষ কথা

(ক)

"কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ"

বিদ্যাপতির মূল আলোচনা শেষ হইল। আলোচনায় যথেষ্ট স্থান ও সময় লইয়াছি। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য ছাড়াও প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য পদ বা আলঙ্কারিক চিত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছি। এই জাতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন আমি বোধ করি, কারণ মধ্যযুগীয় কবিদের সম্বন্ধে আমাদের একটা মুরুব্বিয়ানার মনোভাব আছে। দু'চারিটা পদ টিপিয়াই সচরাচর সিদ্ধান্ত করা হয়। তাহাতে সিদ্ধান্ত সুসিদ্ধ হয়, এমন সন্দেহ করি না। আর যাঁহারা সত্যই পদগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারা সে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ভক্তির আবেগে। ভক্তি গভীর দৃষ্টি দেয়—একথা সত্য। নিরপেক্ষ দৃষ্টি দেয়—একথা সমভাবে সত্য নয়।

ইহার ব্যতিক্রম আছে। যেমন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। 'ভক্তি' এবং 'নিরপেক্ষতা' প্রায় পরস্পরবিরোধী দুই শব্দ হইলেও ডঃ মজুমদারের তুল্য নিরপেক্ষ সমালোচক বৈষ্ণব সমালোচনায় দেখা যায় কিনা সন্দেহ। তিনি যে ভক্ত একথা ডঃ মজুমদার গোপন করেন নাই।

ডঃ মজুমদারের নিরপেক্ষতায় আমাদের দৃঢ় আস্থার কথা গ্রন্থমধ্যে বারবার বলিয়াছি। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় ডঃ মজুমদারের সংস্করণের প্রেরণা ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছি। সেই জন্য কোনো মূল সিদ্ধান্তে তাঁহার সহিত পার্থক্য থাকিলে, তাহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া উচিত।

একটি জায়গায় সত্যই বিরোধ হইতেছে। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে আত্মসমর্থন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নচেৎ বিদ্যাপতি-বিষয়ে আমার মূল প্রতিপাদ্য খণ্ডিত থাকিয়া যায়।

সাম্প্রতিককালে বিদ্যাপতির কবি-চরিত্র লইয়া সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আলোচনা ডঃ মজুমদার শুরু করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভূমিকায়

শেষের দিকে একটি অংশ যুক্ত আছে, যার শিরোনামা—"কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ।" নামেই প্রকাশ এই আলোচনা বিদ্যাপতির কবিচিত্তের ক্রমবিকাশের সূত্রসন্ধান করিবার জন্য করা হইয়াছে। মধ্যযুগীয় কবিদের কাব্য লইয়া 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনার প্রধান বাধা, কবিদের জীবন এবং জীবনের কোন্ অংশে তাঁহারা কোন্ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তথ্যের অভাব। বিদ্যাপতির ছায়াচ্ছন্ন জীবনকক্ষে ডঃ মজুমদার সন্ধানী আলোক-রশ্মিপাতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহার দ্বারা বিদ্যাপতির কবি-চিত্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের উপযোগী মূল্যবান কিছু উপাদান আমাদের হাতে আসিয়াছে।

বাস্তবিক মূল্যবান। আমরা একথা জানি, বিদ্যাপতি তাঁহার বহু পদে বিভিন্ন রাজা বা রাজপুরুষের নাম যুক্ত করিয়াছেন। ভণিতায় বিদ্যাপতি কিছু লোকের নাম যুক্ত করিয়াছেন, এই তথ্যটুকু মাত্র আমাদের জানা ছিল। বড় জোর, বিদ্যাপতির জীবন-কাল নির্ধারণে ঐ তথ্যের প্রয়োগ করা হইত। ডঃ মজুমদার দেখাইলেন, উহারই ভিতরে বিদ্যাপতির কবি-জীবন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপাদান রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি নানা তথ্য হইতে কবির জীবনের ব্যাপ্তিকাল স্থির করিলেন—বিদ্যাপতির আনুমানিক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়। তারপর ভণিতায় বিদ্যাপতি, যে-সকল ব্যক্তির নাম করিয়াছেন, তাঁহারা কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন—রাজা হইলে কখন রাজত্ব করিয়াছেন—ইতিহাস হইতে উদ্ধার করিলেন সেই সকল তথ্য। অতঃপর রাজ-নামাঙ্কিত পদগুলির আনুমানিক রচনাকাল স্থির করিতে বাধা রহিল না। বিদ্যাপতির আনুমানিক জন্মকালের সঙ্গে ভণিতায় উল্লিখিত রাজগণের রাজত্বকালের ব্যবধান-অনুযায়ী পদগুলি বিদ্যাপতির জীবনের কোন্ অংশে রচিত হইয়াছে, তাহা স্থিরীকৃত হইল। যেমন, ডঃ মজুমদার ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দকে বিদ্যাপতির জন্মকাল ধরিয়াছেন। শিবসিংহ রাজত্ব করিয়াছেন ১৪১০ হইতে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব শিবসিংহ নামাঙ্কিত দুইশত-মত পদ বিদ্যাপতি-জীবনের ৩০ বৎসর হইতে ৩৪ বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে। এইভাবেই ডঃ মজুমদার স্থির করিয়াছেন, ২১২ হইতে ২১৮ পর্যন্ত পদ বিদ্যাপতির প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে রচিত, কারণ ঐ সকল পদের ভণিতা-কথিত ব্যক্তিগণ ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ইহা

ছাড়া প্রার্থনামূলক কিছু পদ বিদ্যাপতির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁহার বার্ধক্যে রচিত।

এই ভাবে বিদ্যাপতির কিছু পদের রচনাকাল স্থির হইল। বিদ্যাপতির জীবনের কোন পর্যায়ে সেগুলি রচিত তাহা বোঝা গেল। এই পদগুলিকে ভিত্তি করিয়া ডঃ মজুমদার তাঁহার "কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ" আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। কিভাবে করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে শোনা যাক—

> "এত দীর্ঘদিন ধরিয়া যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, এবং যাঁহার জীবন সুখ-দুঃখের তরঙ্গদোলায় পুনঃ পুনঃ দোলায়িত হইয়াছে, ও যাঁহাকে ১০।১২ জন পৃষ্ঠপোষক রাজার উত্থান ও পতন দেখিতে হইয়াছে, তাঁহার কাব্যের মধ্যে একটা মানসিক ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ কবিতা কখন রচিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না বলিয়া এই ক্রমবিকাশের গতি এতদিন ধরা পড়ে নাই। আমরা সেই ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিবার জন্য রাজনামাঙ্কিত পদগুলি যতদূর সম্ভব কালানুযায়ী সাজাইয়া প্রকাশ করিতেছি। অবশ্য একথা জোর করিয়া বলা যায় না যে, রাজনামবিহীন সমস্ত পদই কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা। তবে একথা ঠিক যে, দেবসিংহ নামাঙ্কিত ৫টি পদ, গ্যাসদীন সুরতান নামাঙ্কিত ১টি, হরিসিংহ নামাঙ্কিত ১টি ও শিবসিংহ নামাঙ্কিত ২০২টি পদ, একুনে অন্ততঃ ২০৯টি পদ বা অকৃত্রিম পদের শতকরা অন্ততঃ ২৬টি পদ কবির তরুণ বয়সের রচনা। এই পদগুলির বিষয়বস্তুর ও ভণিতার সহিত রাজনামবিহীন যে সব পদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, সেগুলিও আমরা বিদ্যাপতির যৌবনকালের রচনা বলিয়া ধরিতে পারি।"

দেখা গেল, কতকগুলি পদ, সংখ্যায় অল্প নয়, ২০৯টি পদ, কবির যৌবনে রচিত। কয়েকটি পদ কবির বার্ধক্যে রচিত, ইহাও সুস্পষ্টভাবে বলা চলে। তার মধ্যে আছে প্রার্থনার কিছু পদ, যাহাতে কবি নিজের জরাগ্রস্ত অবস্থার কথা বলিয়াছেন এবং আর কিছু রাজনামাঙ্কিত পদ।

ডঃ মজুমদারের গবেষণা-অনুযায়ী বিদ্যাপতি কিছু পদের রচনাকাল যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্যরূপে পাইলাম। ইহাতে আমাদের নিতান্ত সুবিধা

হইয়াছে। ইহার দ্বারা বিদ্যাপতির অন্ততঃ এক যুগের—যৌবনকালের—(যৌবনবিষয়ক পদের রচনাকালই বেশী সংখ্যায় নির্ধারিত) কবিমন ও কাব্যরূপকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি। এই বোঝার উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যাপতির কবিমন সম্বন্ধে নানা প্রকার' সিদ্ধান্ত করিয়াছি ইতিপূর্বে।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ডঃ মজুমদারের গবেষণার জন্যই আমি করিতে পারিয়াছি, একথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি। বিদ্যাপতির মধ্যে প্রথমাবধি দুইটি মন ছিল—তিনি একই সঙ্গে ভোগমুখী এবং ভোগোত্তর চেতনায় অধিকৃত ছিলেন—ইহা আমার অন্যতম মুখ্য প্রতিপাদ্য। আমার প্রতিপাদ্য প্রমাণীকৃত হইত না যদি শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদগুলিকে স্পষ্টভাবে যৌবনের পদ বলিয়া ধরিতে না পরিতাম। শিবসিংহ-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্য হইতে সেই দুই জীবনের অস্তিত্ব আমি প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থমধ্যে বহু জায়গায় সেই প্রয়াসের বিবরণ আছে ('যৌবনের বিরহগান' ইত্যাদি অংশ)। ডাঃ মজুমদারের গবেষণা ভিন্ন আমার প্রতিপাদ্য প্রমাণ করিতে পারিতাম না।

আবার এইখান হইতেই ডঃ মজুমদারের সঙ্গে মতপার্থক্যের সূচনা। তিনি তাঁহার গবেষণালব্ধ তথ্যকে যে-সিদ্ধান্তে প্রয়োগ করিয়াছেন, আমি কার্যতঃ তাহার বিপরীত ভূমিতে দাঁড়াইয়া আছি। কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার।

তার পূর্বে একটি কথা স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল, কবিচিত্তের ক্রম-বিকাশকে সাধারণভাবে আমিও স্বীকার করি এবং করেন না কে? যে-কবি প্রায় শতাব্দীকাল অশান্ত ইতিহাসের মধ্যে বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহার মন অনড় থাকিতে পারে না। এবং বিদ্যাপতি তাঁহার শেষ-জীবনের পদে যেভাবে ভোগবিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার 'কবিচিত্তের' স্বাভাবিক বিকাশ অধ্যাত্মপথে, একথাও মানিতে হয়। বিদ্যাপতি বহু উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্ম পদ লিখিয়াছেন, সে পদগুলি মুখ্যাংশে যৌবনের অপেক্ষা পরিণত বয়সের রচনা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। সাধারণ নিয়মানুসারে যৌবনে ভোগ এবং বার্ধক্যে বৈরাগ্য। সুতরাং বিদ্যাপতির কবি-

চিত্তের অধ্যাত্মমুখী বিকার মানিবার দিকে আমাদের সকলেরই স্বাভাবিক প্রবণতা আছে।

এখন প্রশ্ন, বিদ্যাপতির কবিচিত্তের ক্রমবিকাশের প্রকৃতি কি? তাহা কি স্বাভাবিকভাবে ঘটিয়াছিল, না তাহাতে বহির্গত অতিরিক্ত কোনো প্রেরণা ছিল? বিদ্যাপতির মনের পরিবর্তনে বহির্গত প্রেরণার কথা বিশেষভাবে আসে এইজন্য যে, যাঁহাকে মহাজন-কবি বলিয়া সকলে জানে, তিনি রূঢ়-রকম ইন্দ্রিয়-মূলক পদ লিখিয়াছেন। সে রচনা ভক্তের হয় কিভাবে? অথচ বিদ্যাপতির নাম আছে পদগুলিতে। সুতরাং সিদ্ধান্ত, অন্যায় কাজটা বিদ্যাপতি যৌবনে করিয়া ফেলিয়াছিলেন, পরে পরিবর্তিত হইয়া তিনি অকৃত্রিম ভক্ত হইলেন। পরিবর্তনটিকে রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় করিবার উপযোগী রূপকথাও (!) পাওয়া গেল—একদা গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যার ফলে বিদ্যপতির লেখনীর রক্ত-রসে সঞ্চারিত হইল গঙ্গোদক।

ভাবোচ্ছ্বসিত মন এই রূপকথায় বিশ্বাস করে; উচ্ছ্বাস কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসও কমিয়াছে। কিন্তু একটি জিনিস এখনো বাধা দিতেছে—বিদ্যাপতি ছিলেন কুলধর্মে শৈব, তাঁহার শিবের গানও আছে, তিনি কিভাবে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদ লেখেন? সুতরাং বিদ্যাপতি নিশ্চয় এক সময় বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। এবং বৈষ্ণব হওয়ার পরেই যথার্থ ভক্তিভাবাশ্রিত পদাবলী তিনি রচনা করিতে পারিয়াছেন। ডঃ মজুমদার তাঁহার ক্রমবিকাশ-তত্ত্বকে বিদ্যাপতির উত্তর জীবনের বৈষ্ণব ভাবাকুলতা প্রমাণের কাজে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, একথা মনে করিলে কি অন্যায় হইবে?

অন্যায় হইবে না, কারণ ডঃ মজুমদার সত্যই এরূপ বলিয়াছেন—

> "বসন্ত-বর্ণন, অভিসার ও বিরহের শিবসিংহ নামাঙ্কিত পদগুলির সহিত পরবর্তীকালে লিখিত বিদ্যাপতির পদসমূহ তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, কবি প্রথম জীবনে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা লইয়া শৃঙ্গার রসের কবিতা লিখিলেও পরিণত বয়সে বৈষ্ণবীয় সাধনার রসে নিমগ্ন হইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলারস পান করিয়াছেন। বর্তমান যুগের মৈথিল পণ্ডিতেরা এই সহজ সত্যটি

মানিয়া লইতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, তাঁহার হরগৌরী গীতই মিথিলার শিবমন্দিরে গীত হয়।"

ডঃ মজুমদারের আরো বক্তব্য—

"কালানুযায়ী বিদ্যাপতির পদ না সাজাইবার দোষে ডঃ উমেশ মিশ্রের ন্যায় পণ্ডিতপ্রবরও বিদ্যাপতির চিত্তের ক্রমবিকাশের ধারাটি ধরিতে পারেন নাই।"

ডঃ মজুমদারের বিশ্বাস—

"অন্ততঃ দশ বৎসর কাল রাজবনৌলিতে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ও বিপদের মধ্যে বাস ও স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপি প্রস্তুত করার সময়ে তাঁহার মনের মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন আসিয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহার পদের ভাব ও ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল।"

দেখা গেল 'ক্রমবিকাশ' বলিতে ডঃ মজুমদার শৈব বিদ্যাপতির বৈষ্ণবীয় ভাবগ্রহণ বুঝিয়াছেন। মনে রাখিবেন, সাধারণ ভক্তিভাব নয়—বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাব। এবং রাজবনৌলিতে 'দারিদ্র্য ও বিপদের' মধ্যে বসবাস ও ভাগবতের প্রতিলিপি করার জন্যই তাহা আসিয়াছে। কিন্তু দারিদ্র্য ও বিপদ কি বিদ্যাপতি জীবনে সেই প্রথম দেখিলেন? এবং, 'দারিদ্র্য ও বিপদে' শান্তি দিবার পক্ষে কি শিবভক্তি অনুপযোগী—তাহার জন্য রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি চাই? এক্ষেত্রে ভিন্নমত মৈথিল পণ্ডিতগণের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া ডঃ মজুমদার জানাইয়াছেন,—বিদ্যাপতির সমকাল বা পূর্বকালের মিথিলা নিশ্ছিদ্র শৈব ছিল, একথা সর্বথা সত্য নয়, কেহ কেহ বৈষ্ণবও ছিলেন। এবং ডঃ মজুমদার ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়াছেন—বিদ্যাপতির শেষ জীবনের কয়েকটি প্রার্থনার পদ কি "তাঁহার শেষ জীবনের অনুতাপ ও বৈষ্ণবীয় ভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক নহে?"

বিদ্যাপতিকে কিন্তু আমি আদ্যন্ত শৈব বলিয়া মানি, ডঃ মজুমদারের যুক্তি সত্ত্বেও, এবং কেন মানি তাহা বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে জানাইয়াছি।

এখানে ডঃ মজুমদার যে সকল যুক্তির সাহায্যে ও পদের বিশ্লেষণে বিদ্যাপতির কবিচিত্তের বৈষ্ণবমুখীন ক্রমবিকাশ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেগুলির আলোচনা করিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতির-পদাবলীর কিছু পদকে যৌবনে লিখিত এবং কিছু পদকে বার্ধক্যে লিখিত বলিয়া ডঃ মজুমদার নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। মোটামুটি ধরা যাক, শিবসিংহ-নামাঙ্কিত পদগুলি যৌবনের এবং প্রার্থনার কিছু পদ ও ১১২ হইতে ১১৮ পর্যন্ত পদ প্রৌঢ়ত্বের বা বার্ধক্যের। যৌবনের রাজ-নামাঙ্কিত পদের সঙ্গে ভাবের ঐক্য দেখাইয়া তিনি রাজনামবিহীন আরো কিছু পদকে যৌবনের বলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। অনুমানমূলক সে পদগুলিকে এখন বাদ দিয়া রাখিতেছি।

এমন কি প্রার্থনার পদগুলিও এখন বাদ দিয়া রাখা ভাল। কারণ সেগুলি আত্মকথনমূলক—রাধাকৃষ্ণমূলক নয়। অথচ শিবসিংহ-পদ রাধাকৃষ্ণ বা নায়ক-নায়িকা মূলক। তাছাড়া প্রার্থনার পদ বিশেষভাবে কবির বৈষ্ণবীয় আর্তি প্রমাণ করে না, শিবের প্রার্থনার পদও আছে। প্রার্থনা-পদে বিদ্যাপতি বার্ধক্যে যতখানি বৈষ্ণব, সেই পরিমাণে বা ততোধিক শৈব ইহা পূর্বে প্রমাণ করিয়াছি।

সুতরাং বাকি থাকে যৌবনের ও বার্ধক্যের নায়ক-নায়িকা বা রাধাকৃষ্ণ-মূলক পদগুলির তুলনামূলক বিচার। যৌবনের পদ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের সিদ্ধান্ত এই—

> "শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে কবির মনের আনন্দ যেন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সব পদের রূপ, রস, বর্ণের ইন্দ্রধনুচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। চারিদিকে যেন একটা সুখের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে।...কল্প সৌন্দর্যের সমস্ত সৌন্দর্য যেন নায়িকার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।"

কবির পরিণত বয়সের পদ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার বলেন—

> "পরিণত বয়সে তিনি উপমা ও অতিশয়োক্তির আতিশয্য যথাসম্ভব পরিহার করিয়া মনের সহজ ভাবকে রসঘন, ব্যঞ্জনাময় ও আন্তরিকাপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

যৌবনের এবং বার্ধক্যের মনোভাবের পার্থক্যের রূপ বুঝাইতে ডঃ মজুমদার কয়েকটি পদ তুলনামূলক বিচারপ্রসঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। বিচারের কাজে

তিনি কিছু বাড়তি মন্তব্য করিয়াছেন। পদগুলি এবং তাঁহার মন্তব্যগুলিকে লক্ষ্য করা যাক।

মিত্র-মজুমদার সংস্করণের ভূমিকায় এবং সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধে (১৩৬৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা) তিনি বার্ধক্যের তিনটি পদের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যথা—

(১) অর্জুন রায়ের নামাঙ্কিত ২০৯ সংখ্যক অভিসার পদ প্রসঙ্গে তিনি শিবসিংহের আমলে রচিত অভিসার ও বিরহপদের "শব্দঝঙ্কার", "ভাবগাম্ভীর্য", "সরস কবিত্ব", সৌন্দর্যময়তা, ইত্যাদির প্রশংসার পরে বলিয়াছেন—

> "কিন্তু পরবর্তীকালেও কবি অর্জুন রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া অনুরূপ বিষয়ে যে পদটি লিখিয়াছিলেন (২০৯), তাহার আন্তরিকতা যেন আরো বেশী। সখী অভিসারিকাকে বলিতেছে—
>
> নিসি নিসিঅর ভীম ভুজম
> জলধর বিজুরী উজোর।
> তরুণ তিমির নিশি তইঅও চললি হাসি
> বড় সখি সাহস তোর।।"

ডঃ মজুমদার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, এই পদের অংশবিশেষে ঈষৎ চাপল্য আছে।

(২) শিবসিংহের আমলে বিরহপদ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের বক্তব্য, সেগুলি 'চিরাচরিত রীতি-অনুযায়ী লেখা', 'ভাসাভাসা রকমের', কবি সেখানে 'দুঃখের সুরটি ধরিতে পারেন নাই।' কিন্তু—

> "দুঃখের দিনে অর্জুন রায়ের আশ্রয়ে বসিয়া কবি যে বিরহের গানটি (২১০) লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শব্দ অল্প কিন্তু ভাব গভীর। চরম দুঃখের সময় উচ্ছ্বাসের স্রোত যে নিরুদ্ধ হইয়া যায় তাহা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই বলিতেছেন—
>
> সহজ সিতল ছল ছন্দ।
> সবতহ সে ভেল মন্দ।।
> বিরহ সহাইঅ নারি।
> জৈবককে না হানিঅ মারি।।

(৩) ঐ 'বিরহ' বিষয়েই ডঃ মজুমদার ২১৬ পদের উল্লেখ করিয়াছেন—

"শিবসিংহের পৌত্র পর্যায়ভুক্ত রাঘবসিংহের নামাঙ্কিত ২১৬ সংখ্যক পদটি কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা। তাহাতে দেখি বসন্ত, মলয়ানিল, চন্দ্র, কোকিল প্রভৃতি বিরহ-উদ্দীপক বাহিরের জিনিসের কোনো অপেক্ষা নাই। শুধু রাধিকার মুখের হাসিটি শুকাইয়া গিয়াছে—

জনি জলহীন মীন জক ফিরইছি
অহোনিস রহইছি জাগি ॥

তাহার নয়নের নিদ্রা কে হরণ করিয়া লইয়াছে ; ডাঙায় পড়িয়া মাছের অবস্থার মত তাহার দশা হইয়াছে। আর সে বিরহে কি অবলম্বন করিয়া পড়িয়া আছে ?—'অহনিশি জপ তুঅ নামে।"

(৪) বসন্ত ও বসন্তের প্রতিক্রিয়ার পদ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন, শিবসিংহের আমলে রচিত ঐ বিষয়ক পদগুলিতে নানা পুষ্প-পল্লবে বসন্ত-বরণ, নায়িকার মিলন-বাসনা, মিলন, কিংবা ব্যর্থতায় কর্মফলের দোহাই ইত্যাদি আছে। অপরপক্ষে—

"শিবসিংহের রাজ্যকালের অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে রুদ্রসিংহ নামাঙ্কিত পদে দেখা যায় যে, বসন্তের বিজয়-অভিযানের অন্তরালে যে সব বিরহিণীদের মর্মভেদী ক্রন্দন লুক্কায়িত আছে, তাহার প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—

বিরহি বিপদ লাগি।
কেসু উপজল আগি ॥" (২১৮)

যতখানি বিস্তৃতভাবে সম্ভব ডঃ মজুমদারের অভিমত তুলিয়া দিলাম। এখন আমাদের মত জানাইব।

প্রথমে হিসাব করা প্রয়োজন, আমাদের আলোচ্য পদগুলি কবির কোন্ বয়সে লিখিত। এক্ষেত্রে আমি ডঃ মজুমদারকেই অনুসরণ করিব অন্ধের মত।

শিবসিংহের আমলে বিদ্যাপতি দুই শতের মত পদ লিখিয়াছেন। তখন তাঁহার বয়স ৩০ হইতে ৩৪ বৎসর।

অর্জুন রায়ের আমলে ৫টি পদ। বয়স ৩৬।৩৭-এর পূর্বে। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ মজুমদারের মত অনুযায়ী)

কুমার অমরের আমলে লিখিত পদের সংখ্যা, দুই। পদের রচনাকালে বিদ্যাপতির বয়স কত ডঃ মজুমদাব স্পষ্টভাবে জানান নাই। কুমার অমর অর্জুন রায়ের মত শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা। তাঁহার নামাঙ্কিত পদের সংখ্যা ২১২ ও ২১৩ বলিয়া সেগুলিকে কবির "৩৬।৩৭ বৎসরের" পরবর্তীকালে রচিত ধরিতে হইবে।

কংসদলন সুন্দর নারায়ণের (ধীরসিংহের) আমলের পদ একটি। কবির বয়স পদের রচনাকালে ৬০।৬৭-এর মধ্যে।

রাঘবসিংহের আমলে রচিত পদের সংখ্যা, তিন। বয়স ৬০-এর পরে।

রুদ্রসিংহের সময়ের পদ সংখ্যায়, এক। বয়স ৭০-এর পরে।

মিত্র-মজুমদার সংস্করণের ভূমিকা এবং সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার প্রবন্ধের বক্তব্যের মধ্যে যেন ঈষৎ পার্থক্য দেখিতেছি। পরিষদ পত্রিকায় ডঃ মজুমদার স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন,—"দেবসিংহ নামাঙ্কিত পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জুন নামাঙ্কিত পদ পর্যন্ত ২১১টি কবিতা বিদ্যাপতির ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে।" পরিষদ পত্রিকার প্রবন্ধ সংস্করণের ভূমিকার পরবর্তীকালে লিখিত। সেক্ষেত্রে পরিষদ পত্রিকার মতকেই শেষ মতরূপে গ্রহণ করিতে পারি। তদনুযায়ী অর্জুন রায়ের আমলে লিখিত অভিসার ও বিরহ বিষয়ক ২০৯ ও ২১০ পদ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের যে-মত পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই নিজ মত ডঃ মজুমদার নিজেই কার্যতঃ প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব ঐ দুইটি পদ সম্বন্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। ইহাতে আমার পক্ষে আর একটু বেশী প্রমাণ হইতেছে। অর্জুন রায়ের আমলে লিখিত পদ যেহেতু "আন্তরিকতাপূর্ণ", "ভাবগভীর", উচ্ছ্বাসহীন,—যেহেতু তাহাতে "শব্দঝঙ্কার" ও "ভাসাভাসা রকমের" "রীতিমাফিক" রচনার অতিরিক্ত কিছু গভীরতা ও আন্তরিকতা আছে (ডঃ মজুমদারের মত অনুযায়ী)—সে কারণে ডঃ মজুমদারের অভিমত

অনুসরণ করিয়া সহজেই বলিতে পারি, যৌবনের পদেও বিদ্যাপতি ভাবের ও রূপের গভীরতা আনিতে পারিয়াছেন।

এখন তাহা হইলে বাকী রহিল মাত্র ৭টি পদ—২১২ হইতে ২১৮। ইহাদের উপর ডঃ মজুমদারের ক্রমবিকাশ মত নির্ভরশীল।

প্রথমেই প্রশ্ন করা চলে, মাত্র সাতটি পদের দ্বারা কবির কোনো এক সময়ের মনোরূপ পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব কি না, যেখানে ঐ সাতটি পদের একটিও ভাবের বা রূপের বিচারে প্রথম শ্রেণীর পদ নহে? ডঃ মজুমদার যদি তাঁহার মতকে সত্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, ঐ সামান্য কয়টি পদের মধ্যে এমন গভীর কোনো বৈষ্ণবতা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে, যাহা বিদ্যাপতির রাজবনৌলি-উত্তর জীবনের ভাবপরিবর্তনকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

ঐ ৭টি পদের মধ্যে ২১৩ পদকে বাদ দেওয়া যায়, কারণ ঐ পদটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারে ডঃ মজুমদার সমর্থ হন নাই। বাকি ছয়টি পদের মধ্যে রাঘবসিংহ নামাঙ্কিত ২১৬ এবং রুদ্রসিংহ নামাঙ্কিত ২১৮—এই দুই পদকে বিচারের 'কষ্টিপাথর' করা হইয়াছে।

২১৬ পদকে সংস্করণের ভূমিকায় এবং পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধে ডঃ মজুমদার বিশেষভাবে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন। সংস্করণের ভূমিকার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। উদ্ধৃত অংশে বসন্ত মলয়ানিল কোকিল ইত্যাদি বিরহ-উদ্দীপক বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া 'শুধু রাধিকার মুখের হাসিটি শুকাইয়া যাওয়া' এবং 'জলহীন মীনের মত' তাঁহার সঞ্চরণের ভাবগভীরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, এবং বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে একটি ছত্র—রাধিকার জপের বর্ণনা—'অহনিশি জপ তুয়া নামে।'

ঐ ২১৬ পদটি বাস্তবিক সুন্দর। বিরহের পদ-রূপে প্রশংসার যোগ্য। ডঃ মজুমদারের সুন্দর বিশ্লেষণ পদের রসগ্রহণে সহায়তা করে। কিন্তু প্রশ্ন, এইরূপ অবস্থার চিত্র কি কবির যৌবনের পদে নাই? যদি না থাকে তবেই মাত্র এই পদের মনোভাবকে কবির পরিবর্তিত মনোভাবের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

শিবসিংহের আমলের একটি পদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি—বিরহী কৃষ্ণের চিত্র—

তোহ্মি সয়াহলি তোহ্মি এ চিন্তা
তোহইহ তোহ্মি এ ঠাম ;
সপনেহু তোহি দেখি পুনু কএ
লএ উঠ তোহ্মিএ নাম ॥—(৪২—পাঠান্তর)

রাধা, কৃষ্ণের নাম জপ করেন, রাঘবসিংহ নামাঙ্কিত পদে। কৃষ্ণ, রাধার নাম লইয়া ওঠেন-বসেন শিবসিংহ নামাঙ্কিত পদে। রাজনামবিহীন যে সকল পদ হইতে 'নাম লওয়ার' দৃষ্টান্ত ডঃ মজুমদার দিয়াছেন, সেগুলিতে শিবসিংহ-নামাঙ্কিত পদের বক্তব্যের অতিরিক্ত কিছু নাই।

বিরহ-পর্যায়ের আলোচনায় 'যৌবনের বিরহগান' অংশে শিবসিংহ-আমলের পদের আধ্যাত্মিক ভাবচিত্র লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি, এখানে সে সব-কিছুর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই, কেবল যদি নিরলঙ্কার ভাব-স্নাত বিষাদ-চিত্র চান, আমি শিবসিংহ—আমলের একটি পদ দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত করিতে পারি (পদটি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি)—পাঠকগণ বিচার করিয়া লইবেন—

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিনু খেনে হাস।
কি কহএ গদগদ ভাষ ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল ॥
কাঁপএ দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ ॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
রূপনারায়ণ সাখি ॥

বক্তব্যের দিক দিয়া ইহার অপেক্ষা যাতনাক্লান্তর ছবি কোথায় আছে জানি না। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যায়।

ডঃ মজুমদার কবির বার্ধক্যের পদে 'অলঙ্কারের অপেক্ষা না রাখার' যে প্রশংসা করিয়াছেন সেই ধরনের উত্তীর্ণ-অলঙ্কারের কিছু অংশ শিবসিংহ-আমলের এক [illegible]—

ধন যৌবন রস রঙ্গে।
দিন দস দেখিঅ তলিত তরঙ্গে ॥...
সচকিত হেরএ আশা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাশা ॥
নয়ন তেজএ জলধারা।
ন চেতএ চীর ন পরিহএ হারা ॥ (১৫৩)

প্রায় একজাতীয় ভাব ১৭৬ পদে। শিবসিংহের আমলের এই ধরনের আর একটি পদ, বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর একটি শ্রেষ্ঠ পদ (১৮৫), পূর্বে আলোচিত বলিয়া এখানে আর বিশ্লেষণ করিলাম না।

শিবসিংহের আমলের সকল পদে ডঃ মজুমদার কামার্ততার কথা বলিয়াছেন। তাহা অতি সত্য। কিন্তু এই কালে দেহবিস্মৃতির ধারণাও কবির ছিল। যেমন ১৪৪ পদের এক চরণ—"কানাই, তোমার রূপে তাহার লোভ জন্মিল, দেহের কথা সে ভুলিয়া গেল, (চিত্তের) স্থিরতা হারাইল।"

রুদ্রসিংহ নামাঙ্কিত কবির বার্ধক্যে রচিত ২১৮ পদ সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের বক্তব্য—বসন্তের বিজয়-অভিযানের অন্তরালে লুক্কায়িত বিরহিণীদের মর্মভেদী ক্রন্দন কবি দেখিতে পাইয়াছেন। উহাই তাঁহার ভাবদৃষ্টির পরিচয়। যে পদটির ভাবের এত প্রশংসা ডঃ মজুমদার করিয়াছেন, সেটির অনুরূপ ভাব শিবসিংহের আমলের যথেষ্ট পদে পাওয়া যায়। ১৪২, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৫, ১৭৯, ১৮৮ পদগুলিতে বসন্ত এবং বসন্তে বিরহিণীদের জ্বালার কথা আছে। উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই।

কবির বার্ধক্যে রচিত ৬টি পদের মধ্যে ২১৬ ও ২১৮, এই দুটির ব্যবহার করিয়াছেন ডঃ মজুমদার। ঐ দুই পদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সদ্য বলিয়াছি। বার্ধক্যের বাকি চারটি পদকে এখন আমরা ব্যবহার করিতে চাই। বলা বাহুল্য, ডঃ মজুমদারের মতের খণ্ডনেই তাহা করিব।

কুমার অমর নামাঙ্কিত ২১২ পদে মানবমনে বসন্তের প্রভাব সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

"বৎসরে বৎসরে ঋতুরাজ বসন্ত আসে। রাত্রি ছোট হইল, দিবস বাড়িয়াছে, যেন কামদেব জয়বারি বিকাশিত করিয়াছেন। মলয়ানিল যুবতীর মান নিরসন করিতেছে।"

রাঘব-সিংহ নামাঙ্কিত ২১৭ পদেও অনুরূপ বসন্তের বিবরণ। পাগল-করা দুর্নিবার বসন্তের কথা সেখানেও আছে। ২১২ পদে যদি বসন্তে বিরহিণীদের বেদনার কথা থাকে, ২১৭ পদে বসন্তের পাগলামি মাতলামির কথা ছাড়া আর কিছু নাই। উভয় পদেই কামনার বসন্ত। অথচ বার্ধক্যে রচিত ঐ দুই পদ।

বাকি রহিল ২১৪ এবং ২১৫ পদ। ২১৫ পদে আছে বিরহের বর্ণনা। এই বিরহের চরিত্র কি ?—

"মদনের বেদনায় দেহ ও মন অস্ত হইতেছে। কান্ত বিদেশে, কাহাকে দুঃখ কহিব ? স্নেহ স্মরণ করিয়া গৃহ ভাল লাগে না, কোকিল ও ভেকের রব দারুণ। (পূর্ব প্রেম) স্মরণ করিয়া আজ নীবিবন্ধ খসিতেছে, মনোরথ প্রবল হইয়াছে, ঘরে প্রাণনাথের সঙ্গ নাই।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব-প্রেম স্মরণমাত্রে নীবিবন্ধখসা ভালবাসার প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য আধ্যাত্মিকতার অনুকূলে যাইবে না।

আর যদি ২১৫ পদের কথা ধরা যায়— সেটি বিদ্যাপতির চরম আলঙ্কারিক পদের অন্যতম—

"আহা কি সুন্দর যৌবন। যত দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না, ছয় অনুপম (পদার্থ) একস্থানে (আছে)। হরিণ, চন্দ্র, কমল, হস্তিনী, স্বর্ণ ও কোকিল, অনুমান করিয়া বুঝিলাম (এই ছয় হইল), নয়ন, আনন, (শরীরের) সুগন্ধ, গমন, দেহের কান্তি ও সুমধুর বাণী। স্তনযুগলের উপর কেশ মুক্ত হইয়া প্রসারিত হইল, তাহাতে হার জড়াইয়া গেল—যেন সুমেরু-উপর চন্দ্রবিহীন তারাসকল উদিত হইল। সুন্দর মণিমালা। কুণ্ডল কপোলে। অধর দেখিয়া বিম্ব নীচে যায়। ভ্রমরের (ন্যায়) সুন্দর নাসাপুট দেখিয়া শুক লজ্জা পায়।"

আর বেশী-কিছু বলার প্রয়োজন নাই। বিদ্যাপতি তাঁহার পরিণত জীবনে "রাধাকৃষ্ণের লীলারস গান করিবার সময়ে" "বৈষ্ণবীয় সাধনার রসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন" কিনা জানিনা—আমার বিশ্বাস তাহা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়— কিন্তু যদি তিনি তাহা হইয়াও থাকেন, ডঃ মজুমদার কবির পরিণত বয়সে রচিত ৭টি পদের সাহায্যে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। যেগুলিকে তিনি যৌবন-পদের লক্ষণ বলিয়াছেন—অতি-আলঙ্কারিকতা, কামনা-প্রাবল্য, অগভীরতা—সে সবই পরিণত বয়সের পদে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে সরল, ভাবগভীর প্রেমের অনলঙ্কৃত রূপের দৃষ্টান্ত আছে যৌবনের পদে।

এই সকল কারণে, যে-সকল তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে ডঃ মজুমদার বিদ্যাপতির কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, সেগুলিকে স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তবে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি— কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ আমি কিন্তু স্বীকার করি। বিদ্যাপতির মন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাও সত্য। তাহার পিছনে তাঁহার বৈষ্ণব ভাবপ্রীতি থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি দুঃখে-কষ্টে পড়িয়া বৈষ্ণব হওয়ার পরে তবে গভীর পদ লিখিয়াছেন, একথা সত্য নয়। তাঁহার মনের বিকাশ ক্রমিক—এবং তিনি প্রথমাবধি দ্বৈত সত্তাকে তাঁহার নিজের ভিতরে লালন করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে এত বেশী আলোচনা আগে হইয়াছে যে, আর বেশী বলা সত্যই বাহুল্য হইবে।

ডঃ মজুমদার বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তই ব্যবহার করা যাক। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে' ভোগোন্মাদনার মত ভোগ-নৈরাশ্যের বর্ণনা আছে। কড়ি ও কোমল রবীন্দ্র-নাথের যৌবনে রচিত। রবীন্দ্রনাথ যে-কাব্যগুলিতে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরপ্রেমিক, সেই গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যজীবনের রচনা, যাহার পরে প্রেমের কাব্য পূরবী, মহুয়া লেখা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে বিদ্যাপতির ইন্দ্রিয়ময় বয়ঃসন্ধির পদগুলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কবির পরিণত বয়সে রচিত হইয়াছিল। যৌবনে ঐ প্রৌঢ় নির্লিপ্ত রসিকতা আয়ত্ত করা শক্ত। ঐগুলি রসপরিপক্ক মনের দর্শন-সুখের সৃষ্টি।

(খ)

সৌন্দর্য-সাধনার পরিণাম

বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ শেষ করিলাম। কেবল "বাংলাদেশের" মহাজন কবিকে নয়, ভারতবর্ষের কবি বিদ্যাপতিকে দেখিতে চাহিয়াছি। সে বিদ্যাপতি প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। অজস্র পদের রূপ ও ভাবের আলোচনা তাহার জন্য করিতে হইয়াছে। এই আলোচনার দ্বারা বিদ্যাপতি সর্বযুগের কবি-সার্বভৌম রূপে গৃহীত হইলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

তথাপি শেষ পর্যন্ত বিদ্যাপতি কি রূপ ও রসকে চরম সম্মান দিয়াছেন? কোথায়? অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের পণ্ডিত কবির বার্ধক্যের ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে—

কত বিদগধ জন 'রস'-অনুমগন
আনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

বিদ্যাপতি কাঁদিতেছেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন সব মিথ্যা। জীবন মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা। সৌন্দর্য? তাহাও মিথ্যা। এত যে সৌন্দর্য-সাধনা, এর শেষ কোথায়? সকল হিন্দুর মত (বৈষ্ণব বাদে) বিদ্যাপতি উত্তর দিয়াছেন—শ্মশানে—যে-শ্মশানে শ্মশানেশ্বর, ভুবনেশ্বর আছেন। সেখানে মাধবও আছেন। জীবনের নশ্বরতার চিন্তা যৌবনের ভোগলগ্নেও বিদ্যাপতির মনে আসিয়াছিল। সেদিন যৌবন যে নশ্বর—এই অভিজ্ঞতাবুদ্ধি দ্রুত যৌবন-সুখ গ্রহণে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। জীবনের শেষকালে আসিয়া দেখিলেন, সৌন্দর্য সত্যই নশ্বর, উপভোগের আনন্দে তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। "সন্ধ্যাবেলায় ভিক্ষা মাগিবার লজ্জায়" আতুর বিদ্যাপতি শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন—

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥

আর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন অপূর্ব অভেদ ভালবাসার, যে-ভালবাসা রাধা-কৃষ্ণের—

তুঁহু কৈছে মাধব কহ তুঁহু মোর।
বিদ্যাপতি কহ দুঁহু দোঁহা হোর॥

—এবং যে-ভালবাসা উমার। যদি উমার মত ভালবাসিতে পারা যায়! সকলের মাথায় ঘা মারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—বৃদ্ধ, সর্বরিক্ত, শ্মশানচারী.

প্রেতসঙ্গী, নরকপাল-ভূষণকে দেখিয়া—কেবল উমার [illegible] কাঁপিয়াছিল প্রেম-রোমাঞ্চে। একমাত্র এইখানেই সৌন্দর্যের চিরবন্দীত্ব এবং ক্ষয়কারী কালের পরাজয়। যে-মন সৌন্দর্যে ধরা পড়ে না, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সেই মনেরই, বস্তু-উত্তীর্ণ মনাধীন সৌন্দর্য।

সৌন্দর্যের জননীর নিকট কবির প্রার্থনা—

> বিদ্যাপতি কবি তুঅ পদসেবক
> পুত্র বিসরু জনি মাতা॥

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ